৬ষ্ঠ খণ্ড] ১৩১২ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

কলিকাতার ইতিহাস।

বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাণিজ্য আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা রাজনীতির অর্দ্ধাঙ্গ। কারণ জাতিবিশেষের প্রাধান্য তাহার ধনের উপর নির্ভর করে, এবং ধন আবার প্রধানতঃ বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাই উহার মূলকারণ নহে, বাণিজ্যবিস্তারের প্রবল বাসনাই উহার মূলে নিহিত। সামরিক অভিযানসমূহের মূলেও ঐ প্রবৃত্তি নিহিত। পূর্ব্বে রাজারা প্রভুত্ব-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে দিগ্বিজয় ও রাজ্যাধিকার করিতেন; এখন কিন্তু

ধনস্পৃহাই উহার মূলীভূত কারণ। নীরস অনুর্ব্বর দেশের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে কোনও শক্তিশালী জাতিই ব্যগ্র হয় না। কথিত আছে যে, সংসর্গদ্বারা লোকের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ ইহাও সত্য যে, ধনের পরিমাণ দ্বারা জাতিবিশেষের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস, রোম বা ভারতে হয় ত এ ভাব প্রবল ছিল না; কিন্তু এখনকার অবস্থা ঐরূপই। অধুনা জাতিবিশেষের ক্ষমতা ইউরোপীয় মানদণ্ডানুসারে তাহার সামরিক শক্তিদ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে; পরন্তু সেটা অর্থের ব্যাপার, কারণ তাঁহারাই বলেন, অর্থই সমরের পেশী।

কলিকাতার ক্রমোন্নতিতে বাণিজ্যই প্রধান সহায়—বোধ হয়, সর্ব্বপ্রধান সহায়; সুতরাং বাণিজ্যদ্বারা এই নগরের কিরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। অপরাপর জাতি ও দেশের সহিত বঙ্গবাসীদিগের কোন্ সময়ে বাণিজ্য-সংস্রব ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার ভার পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। হীরেন, ম্যাক্‌ফার্স‍ন ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ এ বিষয়ে অনেকটা আভাস দিয়াছেন। সার উইলিয়াম হণ্টার তাঁহার উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা সমুদ্রে যাতায়াত করিত, কিন্তু বাণিজ্যের তদানীন্তন কেন্দ্র তমোলুক নগর ধ্বংস হওয়াতে তাহাদের সমুদ্র-গমন তিরোহিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যকালে বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকেই বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিত, এবং আর্কিপেলেগো অর্থাৎ ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রবাদবাক্য অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ওয়াল্‌টার হ্যামিল্‌টন সাহেব অনুমান করেন যে, "দেশীয় বণিক্‌দিগের দশ লক্ষ পাউণ্ডের কম মূল্যের কাপড় কলিকাতায় প্রায় মজুত হইত না, এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পণ্য দ্রব্যও ঐ অনুপাতে মজুত হইত।"

"অনুমিত হইয়াছে যে, সে সময়ে দেশীয় মহাজন ও বণিক্‌গণের ১,৬০ ০০০ পাউণ্ডেরও অধিক মূলধন খাটিয়া থাকে; ঐ অর্থ তাহারা কোম্পানির কাগজে নিয়োজিত করে, অপরাপর ব্যক্তিকে সুদে ও বাটায় দাদন করে, অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে এবং বিবিধ প্রকারে খাটায়।......১৮০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়; ঐ ৫০ লক্ষের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ১০ লক্ষ টাকা ছিল, এবং অবশিষ্ট

টাকা অন্যান্য ব্যক্তির। ঐ ব্যাঙ্ক হইতে যে সমস্ত নোট বাহির হইত, তাহাদের মূল্য ১০৲ টাকার ন্যূন ও ১০, ০০০৲ টাকার অধিক নহে।" *

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন সাহেবের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার হইতে নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টি করিলে প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে ১৮১১ সালের ১লা জুন হইতে ১৮১২ সালের ৩০শে এপ্রেল পর্য্যন্ত ১১ মাসের হিসাব ধরা হইয়াছে :—

আমদানি।

পণ্যদ্রব্য		১, ১৩, ৩৮, ৬৯২
অর্থ		৬৭, ৮৫, ৬৯৮
	সিক্কা টাকা ...	১, ৮১, ২৪, ৩৯০৲
		বা
	পাউণ্ড ...	২২, ৬৫, ৫৪৯

রপ্তানি।

পণ্যদ্রব্য		৩, ৪০, ০৩, ০০৯
অর্থ		৬, ১৪, ৬৭৩
	সিক্কা টাকা ...	৩, ৪৬, ১৭, ৬৮২
		বা
	পাউণ্ড ...	৪৩, ২৭, ২১০
মোট	টাকা	৫, ২৭, ৪২, ০৭২
		বা
	পাউণ্ড ...	৬৫, ৯২, ৭৫৯

* ওরিএণ্টাল কমার্স (প্রাচ্য বাণিজ্য) নামক পুস্তকে ব্যাঙ্ক-সংস্থাপন-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে :—

"বঙ্গদেশে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া ১৮০৯ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে সনন্দদ্বারা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত সমাজরূপে পরিণত হয়। ইহার মোট মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা এবং উহা ১০,০০০৲ টাকা করিয়া ৫০০ অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে ১০০টি অংশ গবর্ণমেণ্টের এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য লোকের। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ, ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ের জজগণ, এবং অপরাপর ব্যক্তি ব্যাঙ্কের অংশী হইতে পারেন। ইহার কাজকর্ম্ম নয় জন ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়; তিনজন গবর্ণমেণ্টের এবং অবশিষ্ট ছয় জন অপরাপর অংশীদারদিগের নির্ব্বাচিত। ব্যাঙ্কের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্যে ও অপরের প্রতিনিধি

১৮১১-১২ অব্দে কলিকাতায় আগত জাহাজাদি :—

	সংখ্যা।	টন।
ইংরেজের পতাকাধারী ...	১৯৩	৭৮, ৫০৪
পর্ত্তুগীজ পতাকাধারী ...	১১	৪, ১৮০
আমেরিকান্ পতাকাধারী ...	৮	২, ৩১৩
ভারতীয় পতাকাধারী * (দোনী সহিত) ...	৩৮৯	৬৬, ২২৭
	৬০১	১, ৫১, ২২৪

১৮১১-১২ অব্দে কলিকাতা হইতে গত জাহাজাদি :—

	সংখ্যা।	টন।
ইংরেজের পতাকাধারী ...	১৯৪	৭৭, ০৭২
পর্ত্তুগীজ ,, ...	১০	৪, ০২০
স্পেনীয় ,, ...	১	৬৫০
আমেরিকার ,, ...	৮	২, ৩৬৯
ভারতীয় পতাকাধারী (দোনী সহিত) ...	৩৮৬	৬৫, ৬৫০
	৫৯৯	১, ৪৯, ৭৬১

মিলবর্ণ সাহেবের ওরিএণ্ট্যাল কমার্স নামক পুস্তকে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা যাইতে পারে ; উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য।

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে লণ্ডন হইতে বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশ হইতে লণ্ডনে কত টাকার পণ্যদ্রব্যের ও ধনের আমদানি রপ্তানি

স্বরূপ ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া নিষিদ্ধ ; যথাসম্ভব বাটা কাটিয়া লইয়া লোকের সম্পত্তির দলিল বা নিদর্শনপত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া, নগদ টাকার হিসাব রাখা, টাকা জমা রাখা, এবং সুদের আদান প্রদান করা, কেবল এই সকল কার্য্যই ইহার করণীয় ; তদ্ভিন্ন ইহা পণ্য স্বর্ণরৌপ্যের পিণ্ড, নগদ অর্থ, রত্নালঙ্কার সোণা রূপার বাসন কোসন, ও অন্যান্য যে সকল মূল্যবান্ বস্তু সহজে নষ্ট হয় না বা ক্ষয় পায় না, সেই সকল দ্রব্য যুক্তি-সঙ্গত সর্ত্তে জমা রাখিতে বা নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে পারে।"

* সিংহলদ্বীপে ও মালাবার উপদ্বীপে একপ্রকার একমাস্তুলে ছোট জাহাজের প্রচলন আছে, তাহাকে দোনী বলে। অনুবাদক।

হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল, এবং ১৮০৫ সালে কি কি মাল আমদানি রপ্তানি হইয়াছে, তাহারও একটি বিবরণী দেওয়া গেল; পরন্তু ইহাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিজের বাণিজ্য ধরা হয় নাই।

লণ্ডন হইতে বঙ্গদেশে আমদানি।

অব্দ।	পণ্য দ্রব্য।	অর্থ।	মোট।
	সিক্কা টাকা।	সিক্কা টাকা।	সিক্কা টাকা।
১৮০২	৩৫, ৯০, ৬৮৩	১২, ৬৩, ৩৮৭	৪৮, ৫৪, ০৭০
১৮০৩	৩০, ৫৫, ৪০০	৯, ৮৫, ৬০১	৪০, ৪১, ০০১
১৮০৪	২৯, ৩৪, ৪৮৫	৭, ৯৭, ৬৮০	৩৭, ৩২, ১৬৫
১৮০৫	৩৬, ২৮, ৩০১	৮, ৬৯, ৫৭৬	৪৪, ৯৭, ৮৭৭
১৮০৬	৫৯, ১২, ৫০০	৫, ৬৮, ৯২১	৬৪, ৮১, ৪২১
মোট	১, ৯১, ২১, ৩৬৯	৪৪, ৮৫, ১৬৫	২, ৩৬, ০৬, ৫৩৪

বঙ্গদেশ হইতে লণ্ডনে রপ্তানি

অব্দ।	পণ্য দ্রব্য।	অর্থ।	মোট।
	সিক্কা টাকা।	সিক্কা টাকা।	সিক্কা টাকা।
১৮০২	১, ১১, ৪৫, ২৬১	... ...	১, ১১, ৪৫, ১৬১
১৮০৩	১, ০৮, ১৫, ৫৪৫	... ...	১, ০৮, ১৫, ৫৪৫
১৮০৪	৮৯, ১৬, ১৬৮	... ...	৮৯, ১৬, ১৬৮
১৮০৫	৬০, ৯৯, ০৬৫	... ...	৬০, ৯৯, ০৬৫
১৮০৬	৯০, ৩৪, ৮৬৯	... ...	৯০, ৩৪, ৮৬৯
মোট।	৪, ৬০, ১০, ৯০৮	... ...	৪, ৬০, ১০, ৯০৮

১৮০৫ সালের আমদানি মাল।

	সিক্কা টাকা।
পুস্তক	৯০, ৬৫৬
বুট ও জুতা	৫৪, ৭৩৫
ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র ও অন্যান্য লৌহদ্রব্য ...	১, ৩৯, ১৪৪
তামা	১৩৫

			সিক্কা টাকা।
গাড়ী	...	...	১, ১৬, ২১৮
দড়িদড়া	...	...	১৪, ১৭৮
কাচ ও দর্পণ	...	...	২, ৭৯, ৫৭৫
মোজা ও অন্যান্য পদাবরণ	...	...	১, ০৬, ৭৯৪
সূচ ফিতা ইত্যাদি	...	...	৯৫, ৪৪৮
সাহেবী টুপী	...	...	৮০, ৬২৯
রত্নালঙ্কারাদি	...	...	২৮, ৬৩০
লোহার জিনিষ	...	...	৬৫, ৯০৭
মেম সাহেবদের টুপী ও অন্যান্য মস্তকাবরণ		...	৯৭, ৭৪৬
যবাদি হইতে প্রস্তুত মদ্য	...	...	১, ৩৫, ২১২
নানাপ্রকার তৈল ও তৈলাক্ত দ্রব্য এবং লবণ-জলে ও সির্কায় জারা দ্রব্য	...	...	১, ৬৭, ৭৬৩
সুগন্ধি দ্রব্য	...	...	৬৩, ৬২৪
খাদ্য দ্রব্য	...	...	১৬, ৪৪৪
প্লেট্ ইত্যাদি (সাহেবদের বাসন কোসন)		...	৫৬, ৫৯১
ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম	...	...	১, ৩২, ৮২৭
মিষ্ট ও তীব্র মদ্য	...	...	৭, ৮৭, ২৬৫
ধাতু	...	...	১, ০৩, ৭৭৫
জাহাজের আবশ্যক দ্রব্য	...	...	৫৫, ৬৯৩
ষ্টেশনারি	...	...	৬১, ৪৮৭
পশমী দ্রব্য	...	...	১, ১৫, ৫৮০
বিবিধ	...	...	৬, ৯৪, ৪৫৩
অর্থ	...	...	৮, ৬৯, ৫৭৬
		মোট	৪৪, ৯৭, ৮৭৭

১৮০৫ সালের রপ্তানি মাল।

			সিক্কা টাকা।
পীস্ গুড্স্	...	...	৩, ৩১, ৫৮২
নীল	...	...	৪৫, ২৩, ১২৪
শর্করা	...	...	৫৪, ৪৭৮

			সিক্কা টাকা।
আদত রেশম	...	...	৭, ৮৭, ১০৬
তুলা	...	...	১, ১৮, ৯১২
হস্তিদন্ত	...	...	৯, ২৭৮
নানাপ্রকার বৃক্ষনির্য্যাস	...	...	২৪, ১৬০
আদা ও শুঁঠ	...	...	২, ৭৫০
Cossumba	...	...	৪, ৮১৫
Sal Ammoniac	...	...	২, ৬৮০
খদির	...	...	১, ০২৫
লাক্ষা	...	...	১২, ১৩৯
বিবিধ	...	...	৯, ৪৬৬
যে সকল আমদানি মাল পুনর্ব্বার রপ্তানি হইয়াছিল :—			
মিষ্ট ও তীব্র মদ্য	...	...	৫৫, ১৭৬
কর্পূর	...	...	৭২, ০০৯
মসলা	...	...	২০, ৩৬৬
বন্য দারুচিনি	...	...	২৪, ৯৮৩
পুস্তক	...	..	১৪, ৩৫৪
Coculus Indicus	...	...	৫, ৫৭১
কাফি	...	..	৪, ৬৭৬
Galls	...	...	২, ৫২০
বিবিধ	...	...	১৭, ৮৯৫
		মোট	৬০, ৯৯, ০৬৫

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে :—

আমদানি পণ্যদ্রব্য	...	সিক্কা টাকা	১, ৯১, ২১, ৩৬৯
লণ্ডনে রপ্তানি পণ্যদ্রব্য	...	...	৪, ৬০, ১৩, ৯০৮
আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক		...	২, ৬৮, ৯২, ৫৩৯
ঐ কালমধ্যে আমদানি ধন		...	৪৪, ৬৫, ১৬৫
পাঁচ বৎসরে বঙ্গে অর্থাগম		...	৩, ১৩, ৭৭, ৭০৪

বিনিময়ের হার টাকায় ২ শিলিঙ্‌ ৬ পেন্স ধরিলে ৩৯, ২২, ২১, ৩ পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৭, ৮৪, ৪৪২, পাউণ্ড ১২ শিলিঙ্‌।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সাত বৎসরের (অর্থাৎ ১৭৯৫ হইতে ১৮০১ পর্য্যন্ত) বঙ্গ ও লণ্ডনের বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ের আমদানি পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ১, ৬৪, ০৩, ১৭৫৲ সিক্কা টাকা এবং রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ৫, ৩০, ৪৩ ৫৭৯৲ সিক্কা টাকা; সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ৩, ৬৬, ৪০, ৪০৪৲ সিক্কা টাকা অধিক হইয়াছিল। আবার যদি ঐ সাত বৎসরে লণ্ডন হইতে বঙ্গে যে ৮২, ২৩, ৯২৪৲ সিক্কা টাকার অর্থ আমদানি হইয়াছিল, তাহা যদি পূর্ব্বোক্ত টাকার সহিত একত্র করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, ঐ কালমধ্যে বঙ্গের ৪, ৪৮, ৬৪, ৩২৮ সিক্কা টাকা অর্থাগম হইয়াছিল, এবং বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ২ শিলিঙ্‌ ৬ পেন্স ধরিলে উহাতে ৫৬, ০৮, ০৪১ পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৮, ০১, ১৪৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিঙ্‌ ৩ পেন্স হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, ১৮০২ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী সাত বৎসরের প্রতি বৎসরের গড় অর্থাগম তৎপরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের প্রতি বর্ষের গড় অর্থাগম অপেক্ষা ১৬, ৭০০ পাউণ্ড ২ শিলিঙ ৩ পেন্স অধিক হইয়াছিল।

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, ইংরেজদিগের পোতপরিচালনে অধিকতর নৈপুণ্য দেখিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেণীর বণিগ্‌গণ তাহাদের বিদেশে রপ্তানি-যোগ্য মাল ১৭১৫ সাল হইতে ইংরেজদিগের জাহাজে বোঝাই দিতে লাগিল; ঐ সকল মাল দৌত্যের পরবর্ত্তী দশবৎসরে মোট ১০,০০০ টন হইয়াছিল; তাহাতে অনেক লোকই কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষতি না করিয়া অথবা তাহাদের সম্পত্তি লইয়া গবর্ণমেন্টের সহিত বিবাদ না করিয়াও প্রচুর লাভবান্ হইয়াছিল, এবং কলিকাতার সর্ব্বশ্রেণীর প্রজা এরূপ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল যে, বঙ্গের অন্যান্য যে সকল প্রজা নবাবের অত্যাচারপূর্ণ শাসনাধীন ছিল, তাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বহির্বাণিজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একজন রিপোর্টার নিযুক্ত করেন এবং কিরূপ প্রণালীতে হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার সবিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি বঙ্গের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্য ও ধনের পরিমাণের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিবরণী এবং আমদানি রপ্তানি মালের নামের তালিকা প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বাণিজ্য পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বিভাগে বিভক্ত; যথা,—

১। লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য (ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ব্যতিরিক্ত); ইহার সহিত কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণের নিয়োজিত মূলধন, রাজা তৃতীয় জর্জের সময়ের ৩৩ আইনের ৫২ম অধ্যায়ানুসারে প্রদত্ত টনেজ হিসাবে অপরাপর ব্যক্তিদ্বারা চালানি মাল, এবং বঙ্গ হইতে পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার এবং তথা হইতে ইউরোপায় পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রত্যাগত হইবার অনুমতিপ্রাপ্ত দেশীয় জাহাজের মাল ধরা হইয়া থাকে।

২। ফরেন্ ইউরোপ নামে অভিহিত ইউরোপের অপরাপর অংশের সহিত অর্থাৎ ডেন্মার্ক, হ্বামবর্গ, লিস্‌বন্, ম্যাডিরা, কাডিজ প্রভৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্য।

৩। আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ নামক রাজ্যের সহিত বাণিজ্য।

৪। বৃটিশ (অর্থাৎ বৃটনাধিকৃত) এসিয়ার সহিত বাণিজ্য; ১৮০১ সালে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ঐ সময়ের পরে নূতন কতকগুলি স্থান অধিকৃত হইলেও পূর্ব্বের সেই ব্যবস্থাই চলিতেছে :—

(১) মালাবার উপকূল; দক্ষিণ ভারত-উপদ্বীপের সমগ্র পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) করমণ্ডল উপকূল; সমগ্র পূর্ব্ব-উপকূলভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) সিংহলদ্বীপ।

(৪) সুমাত্রার উপকূল।

৫। ১৮০১ সালে ফরেন্ (অর্থাৎ বৃটিশ অধিকারের বহির্ভূত) এসিয়া নামে পরিচিত নিম্নলিখিত স্থানগুলির সহিত বাণিজ্য; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি স্থান পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও পূর্ব্ব ব্যবস্থাই চলিতেছে :—

(১) আরব্য ও পারস্য উপসাগর।

(২) পেগু।

(৩) পেনাঙ্ ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহ।

(৪) মালাক্কা।

(৫) বাটাভিয়া।

(৬) ম্যানিলা।

(৭) চীন।

(৮) অন্যান্য স্থান। অন্যান্য স্থান বলিতে প্রধানতঃ এইগুলি বুঝিতে হইবে, যথা—মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, মোজাম্বিক ও আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলস্থ অন্যান্য বন্দর, নিউসাউথ ওয়েলস্, উত্তমাশা অন্তরীপ, সেণ্টহেলেনা, ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক বন্দরের সহিত অপর বন্দরের বাণিজ্যকে সাধারণতঃ দেশীয় বাণিজ্য বলে; ইহা সাধারণ লোকের হস্তগত ছিল, কোম্পানি ইহাতে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর ইহাও দেখা যায় যে, তৎকালে উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্ব্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া (এক জাপান ব্যতীত এমন কোনও বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল না যেখানে কোম্পানির অধিকারের অধিবাসী ইংরেজ বা দেশীয় বণিগ্‌গণ বাণিজ্য না করিত; ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শৈশবে জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বহুকাল পর্য্যন্ত এক ওলন্দাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত ইউরোপীয় জাতির পক্ষেই জাপানে গমন নিষিদ্ধ ছিল; এই নিষেধ সত্ত্বেও কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে প্রেরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৭৯৩ সালের আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ ও চীনের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সুতরাং কোনও সাধারণ ব্যক্তিকেই তাহার নিজ হিসাবে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত না। যদি কেহ কোম্পানির সুস্পষ্ট অনুমতি না লইয়া বাণিজ্য করিত, তাহা হইলে সে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডনীয় হইত, এবং তাহাকে 'ইণ্টার্লোপার' (অর্থাৎ অনধিকারে বাণিজ্যকারী) বলিত। ওয়াল্টার হ্যামিলটন সাহেব লিখিয়াছেন:—

"কলিকাতা হইতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে নানা স্থানে নৌ-চালনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে, বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও তাহার তোয়দা-সমূহ দিয়া হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে নানা স্থানে অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, এবং মফঃস্বলের মূল্যবান্ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও ঐ পথ দিয়া কলিকাতায় আনান যাইতে পারে। পরন্তু হুগলী-সেতু ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান্

রেলওয়ের নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এতাদৃশ অধিকপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, কস্মিন্ কালেও সেরূপ হয় নাই। উত্তরকালে নির্ম্মিত অন্য অনেক রেলওয়ের সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের সংযোগ হইয়াছে। হুগলী-সেতু 'ক্যান্টিলিভার' (লম্বমান্) প্রণালীতে নির্ম্মিত; উহা চিরকালই ঐ প্রণালীর একটি চমৎকার নিদর্শন হইয়া থাকিবে। ইহাতে তিনটি খিলান আছে; তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তী খিলানটি নদীর মধ্যস্থলে দুইটি সুদৃঢ় পিল্লার উপর অবস্থিত; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খিলান নদীর দুই তীর হইতে বহির্গত হইয়া মধ্যস্থিত খিলানের দুই প্রান্তের উপর অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র পিল্লা নাই। এইরূপে নদীর উভয় তীরস্থ দৃঢ় পাকাগাঁথুনি সেতুর দুই প্রান্তের এবং মধ্যস্থলের সুদৃঢ় পিল্লা দুইটি সেতুর অবশিষ্টাংশের অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে। মধ্যস্থলের পিল্লা দুইটির মূল সাগর-তলের ১০০ ফুট নিম্নে অর্থাৎ নদীগর্ভের ৭৩ ফুট নিম্নে প্রোথিত হইয়াছে। পিল্লা দুইটি ৬৪ ফুট বালুকা ও পলি, ১ ফুট তরঙ্গ চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, এবং ৮ ফুট পীতবর্ণ কঠিন এঁটেল মাটীর মধ্য দিয়া নিম্নাভিমুখে চালিত হইয়াছে। জল যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, সেই সর্ব্বোচ্চ সীমারও ৩৬৷৷০ ফুট উর্দ্ধে সেতুটি অবস্থিত; সুতরাং ষ্টীমার ও দেশীয় বড় বড় বাণিজ্য-নৌকা সেতুর নিম্ন দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। সেতুটি সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ ফুট দীর্ঘ; তন্মধ্যে নদীর উভয় তীর হইতে বিস্তৃত খিলান দুইটির প্রত্যেকে ৪২০ ফুট এবং মধ্যস্থলের খিলানটি ৩৬০ ফুট দীর্ঘ। সেতুটির নির্ম্মাণে সম্ভবতঃ প্রায় ৯০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

মিষ্টার এ. কে. রায় বলেন, বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রথমে বালেশ্বর হইতে আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের প্রথম জাহাজ 'ফকন' ৪০,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পণ্য স্বর্ণ রৌপ্যের পিণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া সাহসে ভর করিয়া নদী দিয়া হুগলী নগরে উপস্থিত হয়। কথিত আছে যে, ১৭০৪ সালে বন্দর-শুল্ক ৫০০৲ টাকা হইয়াছিল। টন হিসাবে 'পাসের' শুল্ক ৩৮৪৲ টাকা হইয়াছিল, এবং উহা মান্দ্রাজ ও ইউরোপ হইতে আগত জাহাজ হইতে আদায় হইয়াছিল। প্রতি টনে এক টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। কোম্পানি আপনাদের 'পাইলট'গণকে অপরের জাহাজে কাজ করিতে দিতেন না। কিন্তু পাইলটদিগের সাহায্য গোপনে গ্রহণ করা হইত বলিয়া কোম্পানি কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। পরন্তু ডিরেক্টর-

সভা নদীতীরে জাহাজ হইতে মাল নামান ও জাহাজের মাল বোঝাই কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে যুবকগণকে পাইলটের কার্য্যে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭১০ সালে বা তৎসমকালে প্রথম 'জেটি' নির্ম্মিত হয়।

এক সময়ে এ দেশ হইতে সোরার চালান অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। মিষ্টার এ. কে. রায় লিখিয়াছেন :—"মহারাণী য়্যানের সময় ইউরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সোরার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল; সেই জন্য কোম্পানির সৈন্যেরা পাটনা হইতে সোরা নদীর নিম্নাভিমুখে আসিবার সময়ে অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিত। ১৭২০ সালের সমকালে সোরার চালান হ্রাস পড়িয়া আসে।"

জাহাজ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি কলিকাতা রিভিউ পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

১৭৭০ সালের পর জাহাজনির্ম্মাণের কাজ বেশ একটু জোর চলিতে লাগিল; সে সময়ে শালকাঠই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। কাপ্তেন ওয়াট্সন তাঁহার খিদিরপুরের ডক্-ইয়ার্ডে যে জাহাজ নির্ম্মাণ করেন, তাহার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ জাহাজ জলে ভাসাইবার সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এবং তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে পরে যে ভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহারা উভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর লণ্ডন নগরে লেভেনহাক ষ্ট্রীটের সংস্পৃষ্ট ডক্-ইয়ার্ডের লোকেরা এবং জাহাজনির্ম্মাতারা ভারতের জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সাতিশয় ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এমন কি অনেক দিন পরে ১৮১৩ সালেও ইংলণ্ডের জনৈক লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—'কোম্পানি যে জাতির নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই জাতির প্রকৃত ক্ষতি ও প্রভূত হানি করিয়া ভারতবাসীদিগকে যে জাহাজ-নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করে, ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নহে?' এই ব্যাপারে কোম্পানি যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহাতে যদি অব্যাহত বাণিজ্য চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যাপার ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে; অধিক লাভার্থী ইংরেজ বণিকেরা যদি ইংলণ্ডের মূলধন ভারতবর্ষে লইয়া যায়, তাহা হইলে বোধ করি সে দেশে ডক্-ইয়ার্ড বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং

সেই অনুপাতে ইংলণ্ডের কারিকরদিগেরও ক্ষতি বর্দ্ধিত হইবে। বারাকপুরের নিকটস্থ টিটাগড় নামক স্থানে নদীতীরে একটি বৃহৎ জাহাজ-নির্ম্মাণশালা ছিল; তথায় ৫,০০০ টন বোঝাই লইতে পারে এরূপ একটা প্রকাণ্ড জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ জাহাজ ভাসাইবার সময়েও লিভারপুলের জাহাজনির্ম্মাতারা ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। যে স্থানে পুরাতন টাঁকশাল ছিল, ঐ স্থানে তৎপূর্ব্বে গিলবার্ট সাহেবের জাহাজ-নির্ম্মাণের আড্ডা ছিল।

১৭৬২ সালে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয়; কিন্তু ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। পয়সার তখন চলন ছিল না বলিলেই হয়। কড়ির প্রচলনই তৎকালে অধিক ছিল। ইহার বহুপূর্ব্বে ১৬৮০ অব্দে স্মিথ নামক কোন সাহেব ইংলণ্ড হইতে বার্ষিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে 'ঘ্যাসে-মাষ্টার' (মুদ্রা-পরীক্ষক) নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। পুরাতন টাঁকশাল সেণ্টজন্‌স্ চর্চ্চ নামক গির্জ্জার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; তথায় ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ সাল অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানি আপনার টাকা প্রস্তুত করিতেন। ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপরিস্থ নূতন টাঁকশাল ১৮৩২ সালে খোলা হয়। ১৭৯১ সালের পূর্ব্বে ফুরানে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। তাম্রমুদ্রা প্রধানতঃ প্রিন্সেপ্ সাহেব (পরলোকগত জেম্‌স্ প্রিন্সেপের পিতা) প্রস্তুত করিতেন; ফল্‌তায় তাঁহার একটি কারখানা ছিল। মুদ্রায় আপনাদের নাম মুদ্রিত করা (মোগলের মস্তক ও পারসী-লিপি সংবলিত হইলেও) ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি প্রথম প্রথম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন।

ইংরেজের বাণিজ্য যে কলিকাতাকে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, সেই বাণিজ্য দ্বারা ইংরেজ ধনীরা প্রচুর লাভবান্ হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংলণ্ডে এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা এই বাণিজ্যকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। কলিকাতা রিভিউ পত্রে একজন লিখিয়াছিলেন:— "ইংলণ্ডে একদল ক্ষমতাশালী লোক ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা উচ্চরবে তুমুল আন্দোলন ও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।" খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশের সহিত, বিশেষতঃ আমেরিকা, চীন প্রভৃতির সহিত, বাণিজ্য আরব্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যসমূহ আসল খরচা দামেরও অর্দ্ধমূল্যে ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ

উপস্থিত করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের অত্যন্ত আধিক্য হওয়ায়, ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন যে, সত্য সত্যই তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে, তখন তাঁহারা কোম্পানির রপ্তানি মালের উপর দেয় শুল্ক রহিত করিয়া দিলেন।

১৭৮৪ সালের জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান্‌স্‌ ম্যাগাজিন্‌ (Gentleman's Magazine) নামক পত্রে পশ্চাল্লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয় :—

"ইউরোপীয় বাণিজ্যের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতের সহিত বাণিজ্য-বিভাগটি যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর কোনও বিভাগেই সেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপের সামুদ্রিক শক্তিশালী জাতিগুলি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসিয়াতে যে সকল জাহাজ প্রেরণ করেন, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ পঞ্চাশৎ নহে; তন্মধ্যে ইংলণ্ড ১৪ খানি, ফ্রান্স ৫ খানি, হল্যাণ্ড ১১ খানি, ভিনিস্‌ ও জেনোয়া একত্রে ৯ খামি, স্পেন ৩ খানি এবং ইউরোপের অবশিষ্ট অংশমাত্র ৬ খানি জাহাজ প্রেরণ করেন। তৎকালে রুশিয়েরা বা ইম্পিরিয়ালিষ্টরা (সাম্রাজ্যানুরাগীরা) একখানিও জাহাজ প্রেরণ করেন নাই। ১৭৪৪ সালে ইংরেজেরা তাঁহাদের প্রেরিত জাহাজের সংখ্যা বাড়াইয়া ২৭ খানি করেন, এবং ভিনীস্‌ ও জেনোয়াবাসীরা মাত্র ৪ খানি ও ইউরোপের অবশিষ্টাংশ ন্যূনাধিক ৯ খানি প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে (১৭৮৪) ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির ৩০০ জাহাজ পূর্ব্ব ভারতীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে এক ইংলণ্ডেরই ৬৮ খানি; ইহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোট জাহাজ-সংখ্যা। গত বৎসর ফরাসীদিগের ৯ খানি, পর্ত্তুগীজদিগের ৪৮ খানি এবং অবশিষ্টগুলি রুশিয়া ও স্পেনীয়দিগের। কিন্তু এক্ষণে ভিনীস্‌ বা জোনোয়াবাসীরা ভারতবর্ষে একখানিও জাহাজ প্রেরণ করে না।"

সেকালে কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও আপন নামে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতেন, অনেক সময়ে প্রভু ও ভৃত্যের স্বার্থে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, এবং তাহার ফল যাহা হইত তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। বোল্টন্‌ সাহেব বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরা নিজে নিজে কলিকাতায় এক পৃথক্‌ কোম্পানির গঠন করিয়া লবণ,

সুপারি ও তামাকের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই কোম্পানির অস্তিত্ব দুই বৎসরমাত্র ছিল; আর কথিত আছে যে, এই সময় মধ্যে অংশীদারেরা মোট ১০,৭৪,০০২৲ টাকা লাভ পাইয়াছিলেন। এই কোম্পানির মূলধন ৬০ অংশে বিভক্ত ছিল। এইরূপ স্বতন্ত্র বাণিজ্যে কোম্পানির বাণিজ্যে ব্যাঘাত পাইত বলিয়া ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভা ইহা রহিত করিয়া দেন।

'ওরিএণ্ট্যাল কমার্স' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ নামে স্বতন্ত্রভাবে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯১ সাল পর্য্যন্ত যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন, তাহা লণ্ডনে কোম্পানির বিক্রয়ে নিম্নলিখিত পরিমাণে দাঁড়াইয়াছিল; ইহার ভিতর চীন হইতে আমদানি মালও ধরা হইয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য বার্ষিক ২,৫০,০০০ পাউণ্ড হইবে :—

অব্দ।			পাউণ্ড।
১৭৮৫—৮৬	...	...	৬, ১১, ২০৫
১৭৮৬—৮৭	...	..	৫, ৪৭, ৩৩৭
১৭৮৭—৮৮	...	...	৯, ১৮, ৩৮৯
১৭৮৮—৮৯	...	...	৮, ১০, ৫১৬
১৭৮৯—৯০	...	...	৮, ৩৮, ৪৮৪
১৭৯০—৯১	...	...	৯, ৩০, ৯৩০
১৭৯১—৯২	...	...	৭, ০৯, ৪৫০
১৭৯২—৯৩	...	...	৭, ০৩, ৫৭৮
			মোট...৬০, ৬৯, ৮৮৯

আট বৎসরে এই যে ৬০,৬৯,৮৮৯ পাউণ্ড হইল, ইহা হইতে চা, চীনা-বাসন, ন্যাঙ্কিনের কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি চীনা মালের আনুমানিক মূল্য বৎসরে ২,৫০,০০০ পাউণ্ড হিসাবে ৮ বৎসরে ২০,০০,০০০ পাউণ্ড বাদ দিলে ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য ৪০,৬৯,৮৮৯ পাউণ্ড দাঁড়ায়। বাণিজ্য-শুল্ক ইহার অন্তর্নিবিষ্ট আছে, কারণ এই সময়ে কি রপ্তানি মালের উপর, কি স্বদেশে ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর, সমস্ত শুল্কই কোম্পানিকে দিতে হইত, এবং পরে রপ্তানি মালে কাটিয়া লইতে হইত।"

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, "ইউরোপ হইতে বৈদেশিকগণ যে বাণিজ্যের

পরিচালনা করেন, তাহা সাতিশয় হিতকর, কারণ তাঁহাদের আমদানি মালের অধিকাংশই অর্থ⋯⋯তাঁহাদের লাভ দেশে নির্ম্মিত দ্রব্যে করা হয়⋯⋯ আর এই বাণিজ্যদ্বারা বাঙ্গালার যে অর্থাগম হইয়াছে, তাহা বার বৎসরের গড় করিলে শুল্ক ব্যতীত বৎসরে ৫,০০,০০০ পাউণ্ড হয়; তদ্ভিন্ন কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের লাভ আছে,—তাঁহারই যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান এজেণ্ট (কর্ম্মকর্ত্তা)।"

কলিকাতা রিভিউ পত্রে জনৈক লেখক ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে মর্লের্স নামক একজন ওলন্দাজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মর্সেল ওলন্দাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"বহু বৎসর যাবৎ তাহারা উৎকট মহাপাপসমূহের ও অতীব গর্হিত অসাধুতার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে; কোম্পানি বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হস্তে যে সকল দ্রব্য দিয়াছেন, সেগুলি তাহারা আপনাদের লুণ্ঠন সামগ্রী গণ্য করিয়াছে; তাহারা অতীব নির্লজ্জভাবে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত চালানে লিখিত মূল্য কৃত্রিম করিয়াছে।" বণিক্‌দিগের নীতিজ্ঞানের অভাবই তাহাদের দোষের একমাত্র কারণ নহে; আলস্যও ইহার একটি প্রধান কারণ। গ্র্যাণ্ড প্রী মাদ্রাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কলিকাতা সম্বন্ধেও তাহা বেশ খাটে। তিনি লিখিয়াছেন:—"পণ্ডিচারি অপেক্ষা মাদ্রাজের বাণিজ্য আরও সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকায়দিগের করায়ত্ত, কারণ তথাকার কুঠিগুলি অধিকতর বিস্তৃত ও লাভজনক এবং বিক্রয়ও খুব বেশী। ইউরোপীয় বণিক্ হিসাবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বাবগুলি মোটেই দেখেন না, তাঁহার দোভাষী তাঁহাকে হিসাবের যে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান দেখায়, কেবল তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; তিনি কারবারের স্থানের বহুদূরে বাস করেন এবং যে ভাবে জীবন যাপন করেন, তাহাতে এরূপ তাচ্ছীল্য ও উপেক্ষার ভাব স্বাভাবিক, কারণ তিনি দিবসে একবারমাত্র কারবারের স্থানে গমন করেন, তাহাও নিয়মিতরূপে নয়, এবং দিনের মধ্যে বড় জোর দুই তিন ঘণ্টা কাজ কর্ম্ম দেখেন।"

সিভিলিয়ান্‌দিগের নীতিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ছিল না। ক্লাইভ্, সমার ও ভেরেলেষ্ট সিভিলিয়ান্‌দিগের চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করেন; তাঁহারা ১৭৬৫ সালে ডিরেক্টর

সভার নিকট এইরূপ রিপোর্ট করেন :—"তাহাদের চরিত্রের কথা বলিতে হইলে, তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক চক্র উৎকোচগ্রহণ-দোষে দূষিত, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ভাব সর্ব্বত্র প্রবল, এবং উৎকট অর্থলালসায় উদারতার প্রত্যেক কণা, প্রত্যেক ভাব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত।" ইতিহাসে এরূপ প্রমাণও বিরল নহে যে, এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহারা কোম্পানির চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসিতেন, এবং তৎপরে নিজ নামে কারবার খুলিয়া কোম্পানির চাকুরি ছাড়িয়া দিতেন। উইলিয়াম বোল্টস্ নামক একজন সাহেব ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার ধমনীতে জার্ম্মান শোণিত প্রবাহিত ছিল। তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারী হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, কিন্তু চাকুরি ছাড়িয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন এবং আট বৎসরে নয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া বসেন। পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে উইলিয়াম বোল্টসই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন, এবং তিনি "Consideration of Indian Affairs" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি হাঙ্গামাপ্রিয়তা ও অসচ্চরিত্রার জন্য নির্ব্বাসিত হন।*

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মল্লভূমে দুর্গোৎসব।

যেমন ৺মদনমোহন জীউ মল্লভূমের রাজবংশের কুলদেবতা, তেমনি ৺মৃণ্ময়ী মাতাও উক্ত বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজিও বিষ্ণুপুরে বিরাজমানা আছেন। ইনি দশভূজা রূপধারিণী। প্রত্যহই ইঁহার পূজাদি হইয়া থাকে। শরৎকাল সমাগত হইলে কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে ইঁহার নবমাদি কল্প আরম্ভ হয়। এই দিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে ৺মাতার পূজার দালানের সম্মুখে দরবার হইয়া থাকে। সহরের বৃদ্ধা বেশ্যারা ঐ দরবারে উপস্থিত

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত The Early History and Growth of Calcutta নামক পুস্তকের অনুবাদ।

হইয়া বিশুদ্ধ তান-মান-লয়-সহযোগে সঙ্গীতাদি আলাপ করিয়া থাকে। যুবতী বেশ্যাদের দরবারে উপস্থিত হইবার রীতি নাই। রাজা ও রাজপারিষদ্‌গণ দরবারে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন। বেশ্যাদের জন্য ষোল বিঘা নিষ্কর জমি প্রদত্ত হইয়াছে। তাহারা বিনা করে রাজধানীতে বাস করিতে পারিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে।

প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল, ৺মৃণ্ময়ী মাতা ৭০০ সাত শত বৎসর পরে নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। মল্লবংশীয় রাজারা পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রবাদ এই যে, দেবদেবীরা তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইতেন। দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর দিন মল্লভূমের রাজা মৃণ্ময়ী মাতার দালানের এক পার্শ্বে যোড়হস্তে ধ্যানস্থ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইলে রাজাবাহাদুর দেবীর আগমনসূচক কোলাহল শুনিতে পান এবং তিনি "শুভং" এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র দুর্গপ্রাচীরস্থিত একটী ব্যাঘ্রমুখবিশিষ্ট প্রকাণ্ড কামানে অগ্নি সংযোগ করা হইয়া থাকে; ঐ কামানের শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে এবং ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত মল্লভূমবাসী প্রজাগণ সন্ধিক্ষণ সমাগত জানিয়া দেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া থাকে। মল্লভূমে আজিও এই প্রথা প্রচলিত আছে। গত বৎসর কামান ফাটিয়া গিয়া এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা সন্ধিক্ষণের সময় পুরুষানুক্রমে অগ্নিসংযোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জন্য ভূতপূর্ব্ব রাজারা নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন। লেখকের বাড়ী বিষ্ণুপুর হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত; লেখকের বাড়ীতেও দুর্গোৎসব হয়। লেখকও ঐ কামানের শব্দ অনুসরণ করিয়া দেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরের তোপের শব্দ না পাইলে মল্লভূমে কেহই দেবীর নিকট বলি প্রদান করেন না।

মল্লভূমে ইদপর্ব্ব।

ইদ পর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার; ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। লেখক এবার স্বচক্ষে এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছেন। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের সজীবতা দেখিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঢেঁকির ন্যায় কাষ্ঠ মাটিতে পতিত থাকে। বিষ্ণুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের অসভ্য সাঁওতাল-গণ ও তাঁহাদের পত্নীরা এই উৎসবে সমবেত হয়। সাঁওতাল পুরুষগণ মাদল

বাজাইতে থাকে ও স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের কটিদেশ ধারণ করিয়া গান করিতে করিতে নৃত্য করে ও চক্রাকারে পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ ভাদ্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাচ তাহাদের নৃত্য ও গীতের বিরাম নাই। তাহাদের গাত্র হইতে অনর্গল ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মস্তকে পুষ্প, ময়ুর-পাখা ও কাহারও কাহারও মস্তকে বৃক্ষপত্রসকল সজ্জিত রহিয়াছে। এ বৎসর প্রায় ৩।৪ হাজার সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়াছিল। ঐ দিনে ইহাদের এমন ঔৎসুক্য দেখা যায় যে, ইহারা বাটী হইতে বাহির হইয়াই পথে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়া দেয়; ক্রমে যতই পর্ব্ব স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ইহাদের ঔৎসুক্য অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজা হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ইদ কাষ্ঠদ্বয়কে উর্দ্ধে উত্তোলিত করা হয়; তৎপরেই সন্ধ্যাসমাগমে সকলে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করে। অষ্টাহ পরে সেই ইদ কাষ্ঠদ্বয়কে পুনরায় ভূতলশায়ী করিয়া দেয়, ইহাকেই ইদ্ পর্ব্ব বলে। এই পর্ব্ব উপলক্ষে অসংখ্য নরনারী সমবেত হয় ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি মেলাস্থলে ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। এই মেলার স্থায়িত্বকাল একদিনমাত্র।

পোকা বাঁধ।

বিষ্ণুপুর সহর পূর্ব্বপশ্চিমে ২॥০ মাইল ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১॥০ মাইল বিস্তৃত হইবে। ইহাতে কৃষ্ণ, যমুনা, কালিন্দী, শ্যাম, লাল, পোকা ও গাঁতাই নামে অভিহিত সাতটী প্রকাণ্ড জলাশয় বা বাঁধ আছে। ঐ সকল জলাশয়ের জল অতি উৎকৃষ্ট; বিশেষতঃ পোকা বাঁধ ও লাল বাঁধের ন্যায় উৎকৃষ্ট পানীয় জল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পোকা বাঁধের জলে অসংখ্য পোকা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহারা বায়ুভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া বাঁধের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেছে। এখানকার লোকেরা কলসীর মুখে ৩।৪ পর্দ্দা বস্ত্র দিয়া ঐ জল ছাঁকিয়া লয় ও পানার্থ ব্যবহার করে। ইহার জলের পরিপাকশক্তির বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর ইহার অতি অল্পপরিমাণ জল পান করিলেও অত্যল্প সময়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্যসকল পরিপাক হইয়া যায়।

শিল্পকার্য্য।

বিষ্ণুপুর শিল্পিপ্রধান স্থান। স্বাধীন রাজাদিগের সময় হইতে এখানে বহুপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তসর বস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার তন্তুবায়েরা তসর শিল্পে বেশ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। এখানকার গৃহস্থের পুরাঙ্গনারাও অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে। বহুকাল গত হইল মল্লভূমির রাজারা স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, কিন্তু এখনও রাজধানী শ্রীহীন হয় নাই। বাঁকুড়া অপেক্ষা বিষ্ণুপুর এখনও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা।

স্বাধীন রাজাদিগের অধিকার সময়ে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতবিদ্যায় বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। তৎকালে ইহা "ছোট দিল্লি" নামে অভিহিত হইত। আজিও বিষ্ণুপুর সঙ্গীতাচার্য্যশূন্য হয় নাই। এখানকার শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতার ঠাকুর বংশাবতংস প্রসিদ্ধ মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে সঙ্গীতাচার্য্য আছেন। সেবার মহামহিমান্বিত রাজপুত্র আলবার্ট ভিক্টর মহোদয় কলিকাতায় আগমন করিলে উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার নিকট কানুন নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া তাঁহাকে মোহিত ও আনন্দিত করিয়াছিলেন। আর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেঘরিয়া মহাশয় কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতাচার্য্য আছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন গোস্বামী মহাশয় ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে, শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাড়াজোলাধিপতির বাটীতে ও শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের বাটীতে সঙ্গীতাচার্য্য আছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর, যদুভট্ট, জগৎচাঁদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতাচার্য্যগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক্ষণে কীর্ত্তিচাঁদ গোস্বামী ও হারাধন দেঘরিয়া প্রভৃতি মহোদয়গণ কাহারও বাটীতে চাকরী স্বীকার না করিয়া বিষ্ণুপুরে থাকিয়াই দেশের লোকদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত একটী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানকার অনেকে এই বিদ্যালয়ে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

সহরের অবস্থা।

বিষ্ণুপুর সহরটী বোলতলার বাজার, কাদাকুলী, গড়দরজা, শাঁখারি বাজার, শ্যামরায়ের বাজার, কৃষ্ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লীতে বিভক্ত। কৃষ্ণগঞ্জে সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পোকা বাঁধের নিকট একটী নূতন বাজার প্রস্তুত হইয়াছে, বোলতলার বাজারেও মিউনিসিপ্যালিটীর একটি বাজার আছে। বিষ্ণুপুরে জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী সকল দ্রব্যই সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। নানা স্থান ও জঙ্গলমধ্যস্থ সাঁওতালগণের নিকট হইতে সহরে বিস্তর দ্রব্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে বিষ্ণুপুরের এক মাইল দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিয়াছে। বিষ্ণুপুরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ইহা বাঁকুড়া জেলার একটী সব্‌ডিবিজান বা মহকুমা। এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুইটী আদালত, মিউনিসিপ্যাল অফিস, সব্‌রেজিষ্টরি অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, এণ্ট্রান্স স্কুল, গুরু ট্রেনিং স্কুল, ও একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। এখানকার লোকেরা কিছু আমোদপ্রিয়। ইহারা সর্ব্বদাই কিছু না কিছু আমোদজনক কার্য্য লইয়া মত্ত থাকে। অনেকেই শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে। এখানকার তামাক খুব উৎকৃষ্ট। এই তামাক নানা দেশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। দুই বৎসর গত হইল, বিষ্ণুপুরের রাজা নীলমণি বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৫ম বর্ষীয় একটী পুত্র বর্ত্তমান। রাজাবাহাদুর মৃত্যুকালে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি, ঋণপরিশোধের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তামাকব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র কর মহাশয়কে ৫১ বৎসরের জন্য ইজারাসূত্রে দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত কর মহাশয় সমস্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন এবং রাজ-পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থ মাসে মাসে একটী নির্দ্দিষ্ট উপস্বত্ব দিয়া থাকেন।

প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুর।

বিষ্ণুপুর সহরের ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে প্রদ্যুম্নপুর নামক গড়বেষ্টিত একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা এই গ্রাম পদুমপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। কথিত আছে, প্রদ্যুম্ন নামক এক রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। গড়ের মৃৎপ্রাচীর ও সিংহদ্বার আজিও বিদ্যমান থাকিয়া অতীত

কালের স্মৃতি মানবের মানসপথে উদিত করিতেছে। গড়ের চতুষ্পার্শ্বের পরিখা সকল যদিও কালধর্ম্মে মজিয়া গিয়াছে, তথাপি উহা দেখিলেই পরিখা বলিয়া বোধ হয়। গড়ের মধ্যে কানাই সায়ের নামে একটী পুষ্করিণীর আছে; ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত এক বৃহৎ অট্টালিকার নিদর্শন আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পুষ্করিণী ও অট্টালিকা সম্বন্ধে এদেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। গড়ের মধ্যে এক্ষণে নানাজাতীয় লোক বাস করিতেছে।

দেব ও দেবালয়াদি।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিষ্ণুপুরের রাজারা অত্যন্ত দেবদ্বিজপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব ও দেবালয় বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের প্রতিষ্ঠিত গন্ধেশ্বর, ভুবনেশ্বর, দেউলেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটী শিবঠাকুর গোকুল নগর নামক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধেশ্বর শিবের ন্যায় প্রকাণ্ডকায় শিব ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে আছেন কি না তাহা লেখকের জানা নাই। গৌরীপট্ট সমেত গন্ধেশ্বর ঠাকুরকে তিন জন লোকেও বেষ্টন করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইনি অতি জাগ্রত দেবতা। প্রতি সপ্তাহের সোমবার দিবসে ইঁহার নিকট পূজা দিবার মানসে অসংখ্য নরনারী সমাগত হয় এবং নানাপ্রকার উপচারে বাবার পূজা দিয়া থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রীলোকেরাও পূজার উপকরণাদি সঙ্গে লইয়া পদব্রজে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অনেকে এই স্থানে রোগমুক্তির জন্য "হত্যা" দিয়াও থাকে এবং অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে, তাহারা বাবার কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছে। ভুবনেশ্বর নামক শিবটী ভূতলশায়ী অবস্থায় পতিত আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিও সাতিশয় প্রকাণ্ডকায়। কথিত আছে দস্যুরা রত্নলোভে ইঁহাকে ভূতল-শায়ী করিয়া দিয়াছে। আজিও শিবঠাকুরের তলদেশে ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল গর্ত্তেই শিবপ্রতিষ্ঠাকালে রত্ন নিহিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহাঁর পূজাদি হয় না। দেউলেশ্বর নামক শিবটী একটী ভগ্ন দেউলের মধ্যে অবস্থিত আছেন। ইহাঁর মস্তকেও একটী আঘাতের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, দস্যুরা ইহাঁর রত্ন অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু ইনি পাতালের দিকে নামিয়া যাওয়ায় তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই। সেই জন্য দস্যুরা ক্রোধে অস্ত্রদ্বারা ইহাঁর মস্তকে আঘাত

করিয়াছিল। এই গ্রামে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত গোকুলচাঁদ নামক একটী বিগ্রহ ও অনন্তশয্যাশায়ী ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটী প্রস্তর-নির্ম্মিত। ভাস্করেরা পাথর কাটিয়া তদ্দ্বারা যে সকল নাগমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা পরিদর্শন করিলে ভারতবর্ষবাসীরা তদানীন্তনকালে যে ভাস্কর বিদ্যায় কিরূপ পারদর্শী ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই গোকুল-চাঁদের সেবার জন্য রাজারা বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রত্যহ ভোগ হইয়া থাকে এবং তৎকালে উপস্থিত অতিথি প্রভৃতি সকলে সেই প্রসাদ উপভোগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, সাবড়াকোণ গ্রামে ৺রামকৃষ্ণ দেব, রাধামোহনপুরে রাধামোহন জীউ ও বীরসিংহ গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্র নামক ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেবতার সেবার জন্য রাজারা বিস্তর ভূমিসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। সেই আয় হইতে আজিও সেবাকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। যৎকালে ৺মদনমোহন জীউ বিষ্ণুপুরে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার রাস উপলক্ষে রাজারা পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহসকলকে আনয়ন করিয়া মদনমোহন জীউর সহিত রাসমঞ্চে উপবেশন করাইতেন। রাজাদিগের অধঃপতন ও মদনমোহন জীউর অন্তর্ধানের পর হইতে আর ঐ সকল বিগ্রহ বিষ্ণুপুর রাজধানীতে সমাগত হন নাই। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বীলসী গ্রামে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ নামক এক জাগ্রত নারায়ণ-শিলা ও একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর হইল, কোন্ দুর্বৃত্ত যে ঐ শিলা ও শঙ্খ অপহরণ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তির দিন ঐ স্থানে এক মেলা হইত এবং ঐ মেলায় অসংখ্য নরনারী সমাগত হইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিত। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কার্য্য লোপ পাইয়াছে।

কতুলপুরের গরুহাট।

যদি কেহ নারকীয় ভীষণ দৃশ্য দেখিতে চান, তবে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুরে আসিয়া গরুর হাট দর্শন করুন। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে এই হাটে গোধনসকল ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে; এ দেশের কতকগুলি মুসলমান, গৃহস্থের বাটী হইতে অতি স্বল্পমূল্যে রুগ্ন, জীর্ণ, বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত গোধনসকল ক্রয় করিয়া আনিয়া এই হাটে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা গোধনসংগ্রহের জন্য নাগপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি সুদূর

মধ্যপ্রদেশেও গমনাগমন করিয়া থাকে। একে ত গরুগুলি জীর্ণশীর্ণ, তাহাতে আবার সুদূর প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসায়, পথিমধ্যে অনাহারে, অনিদ্রায় ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। শুক্রবারে উপস্থিত না হইলে আবার সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া, নির্দ্দয় মুসলমানগণ গরুগুলিকে প্রবল তাড়নায় পরিচালনা করে। গোধনসকল পথশ্রমে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানার্থ পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর দিকে লোলুপ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু গোব্যবসায়িগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট দিবসে হাটে উপস্থিত হইবে তজ্জন্য নির্দ্দয়তার সহিত তাহাদিগের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইরূপে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শত শত গোধন দলবদ্ধ হইয়া কোতলপুরাভিমুখে গমন করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের সবেগ গমনোত্থিত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হয়। যে সকল রাস্তা দিয়া কোতলপুর প্রবেশ করা যায়, তাহার প্রত্যেক পথেই বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি স্থানের গোব্যবসায়ীরা এই সকল গোধন খরিদ করিয়া লইয়া গিয়া কসাইখানায় প্রেরণ করে। এই হাটে কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত বৃদ্ধ গবাদি বিক্রয় রহিত করিবার জন্য কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইন্‌ষ্টিটিউশনের করুণহৃদয় সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ সেনগুপ্ত এম. এ. মহোদয় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে যদি অসাধারণ অর্থশালী, দানশৌণ্ড, প্রাতঃস্মরণীয় মাড়োয়াড়ি মহোদয়েরা এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, তাঁহারা সোদপুর এবং বালীগঞ্জের নিকট ওয়ারিয়ায় পিঁজরাপোল করিয়া গোজাতিকে অপমৃত্যু ও অনশন হইতে রক্ষা করিয়া সংসারে অতুলকীর্ত্তি ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কি এই বাঁকুড়া জেলার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? শুনিয়াছি, ওয়ারিয়ার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উক্ত হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে আশ্বাসবাণীও দিয়াছিলেন, কেবল দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অনিচ্ছায় উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

শ্রীফকীরদাস চট্টোপাধ্যায়।

অপৌরুষেয় সামর্থ্য

১।

ইংলণ্ডের একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রে সম্প্রতি একজন সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় লেখক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীর অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ কৌতুককর বিবরণসংবলিত যে সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বোধ হয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাতে বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; কারণ এতদপেক্ষা অধিকতর কৌতুককর বা বিস্ময়কর ঘটনা নিত্য নিত্য আমাদের সম্মুখে, গোপনে বা প্রকাশ্যে, সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, আমরা তাহার সমাচার রাখি না বা রাখিতে পারি না, কিংবা তাহার অনুসন্ধানে বা প্রত্যক্ষ দর্শনে আমাদের যত্ন বা সামর্থ্য থাকে না। সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানব তাহার সামান্য জ্ঞানে প্রকৃতির এবং প্রকৃতাতীত লীলার রহস্য সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে ও বুঝাইতে চিরদিনই অসমর্থ। ধর্ম্মভীরু ও সুপণ্ডিত ইউরোপীয় লেখক মহাশয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ঘটনাসমূহ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তদ্ব্যতীত এরূপ অলৌকিক ঘটনা অসংখ্য পুস্তকে, সমাচারপত্রে, মাসিক পত্রিকায়, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং বিশ্বস্ত পুরুষদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। যাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয়ভক্তমধ্যে গণ্য, যাঁহারা তপোবলে প্রতাপী, যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গে কঠোর সাধনবলে ভগবৎসামীপ্য অবস্থায় উপনীত, সেই সকল অপৌরুষেয় সামর্থ্যশালী মহাপুরুষদিগের লীলাও অলৌকিক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহা পশুরাজ সিংহের কার্য্য তাহা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ছাগশিশুর কার্য্য নহে। যাহা বিহঙ্গদলপতি গরুড়ের আয়ত্তাধীন, তাহা নগণ্য চটাই পক্ষীর সাধ্যাতীত; সুতরাং মহাপুরুষদিগের অপৌরুষেয় সামর্থ্যবলে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহা অসামান্য এবং অলৌকিক; সাধারণ নরনারীর তাহা ক্ষমতাতীত এবং বুদ্ধিরও অগম্য। যুক্তি, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, ব্রহ্মবাক্য, বহুদর্শিতা, ব্রহ্মবিদ্যা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ইহার অকাট্য প্রমাণ। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় লেখক মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন,

এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। তিনি লিখিতেছেন ;—

"একদা আমি ভারতবর্ষ পরিব্রজন করিতে করিতে বরোদা নামক দেশীয় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলাম। সে সময়ে বরোদা রাজবাটীর বিশাল প্রাঙ্গণে অপৌরুষেয় সামর্থ্যবান্ এক হিন্দু সাধু অবস্থান করিতেছিলেন। বরোদাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাশয় ঐ মহাত্মাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। বহুল সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পুরুষের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ সাধু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ। আমি স্বচক্ষে তাঁহার দুই একটা আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম, কিন্তু সাধু মহাত্মারা বাজারের বাজীকর কিংবা ব্যবসায়ী লোক নহেন, তাঁহারা কাহারও প্রজা, খাতক বা ভৃত্য নহেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের ক্ষমতা তাঁহারা সংগোপনে রাখিতেই সতত সযত্ন থাকেন; সুতরাং আমার মনোবাঞ্ছা কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে তাহাই আমি ভাবিতেছিলাম। সহজে সাধুদিগকে চেনা যায় না ; কখন্ ইঁহারা কি ভাবে এবং কি সাজে থাকেন বা বেড়ান, তাহা বুঝিয়া উঠা কাহার সাধ্য ? হয় ত ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া তুমি এক সাধুর সহিত বাস করিতেছ অথচ তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলে না। যাহা হউক, একদিন আমি বরোদার ঐ মহাত্মাকে দেখিতে যাইলাম। সাধুর কটিদেশে দুই হস্ত দীর্ঘ একখানি গৈরিক বসন ভিন্ন দেহের আর কোন অংশে (মাথায়, গায়ে বা পায়ে) আর কিছুই দেখি নাই। সঙ্গে ছত্র, ছড়ি বা কোনপ্রকার আসবাব বা জিনিষ থাকিত না। তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেখানে একটা মৃণ্ময় পাত্রে দিবারাত্র কাষ্ঠের অগ্নি জ্বলিত এবং ঐ অগ্নির পার্শ্বে ভূমির উপরে প্রায় দ্বাদশহস্ত দীর্ঘ একটা লৌহশৃঙ্খল প্রসারিত ছিল। শুনিয়াছি, তিনি যেখানে যাইতেন, ঐ লৌহশৃঙ্খলকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন ; কখন কখন কটিদেশে জড়াইয়া রাখিতেন। আমি যখন মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি অন্য দিকে মুখ ও চক্ষু রাখিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন ; আমাকে তিনি দেখেন নাই। সে সময়ে তথায় আর কোন মনুষ্যও উপস্থিত ছিল না। তিনি ঐ বৃহৎ লৌহশৃঙ্খলকে হাতের উপর রাখিয়া ঘুরাইতেছিলেন। ইত্যবসরে ক্রমে ক্রমে নগরের বহুলোক সেখানে উপস্থিত হইল, প্রতিদিন সুবিধামত নগরের লোকেরা সাধুসমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। যাহা হউক সাধু মহাত্মা ঐ শৃঙ্খল ঘুরাইতে ঘুরাইতে

অকস্মাৎ আকাশের দিকে সজোরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন, এত বড় শৃঙ্খল আকাশ হইতে পতিত না হইয়া আকাশের কোলে লাগিয়া রহিল; সমুদয় শৃঙ্খলটা সুন্দররূপে প্রসারিত হইয়া অনন্ত আকাশে যেন ভাসিতে লাগিল। আমরা গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী মহাশয় উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া ঐ শৃঙ্খলে দুইটা হস্তক্ষেপপূর্ব্বক রীতিমত ঝুলিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, ইঁহাদের কাছে বিজ্ঞান হারি মানিয়া যায়।" ইত্যাদি।

তিনি আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহেব বলেন, "আর এক সময়ে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা-সম্পন্ন হিন্দু সন্ন্যাসী একটা পুরাতন আম্রফলের বীজ (আঁটী) লইয়া ভূমিতে প্রোথিত করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইতে না হইতে ঐ বীজের উপরে এক প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ দেখিলাম, এই গাছ সাধারণতঃ আমগাছের সমতুল্য। ইহাতে রীতিমত শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফল ছিল; উচ্চতায় ইহা একট বড় আমগাছের অপেক্ষা কম নহে। কয়েক জন লোক ঐ গাছের উপরে আরোহণ করিয়া ফল উত্তোলন করিয়াছিল। গাছ এত বড় যে, উহার উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইলে আরোহীর বাঁচিবার আশা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। আমি ঐ গাছের ফটোগ্রাফ লইয়াছিলাম। এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড আমি আর কখন দেখি নাই। ভারতবর্ষীয় সাধুদিগের বাস্তবিক অপৌরুষেয় সামর্থ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" ইত্যাদি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র বা লক্ষাধিক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী, সংশয়চিত্ত, অভক্ত, অতপস্ক, অশ্রদ্ধাবান্ এবং কুটিলহৃদয়সম্পন্ন তাহাদিগের সম্মুখে এবম্প্রকার কোটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও তাহারা বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মজ্ঞান এতই দুর্ব্বল যে, তাহারা এরূপ ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না। মানবের সাধারণ ক্ষমতা ব্যতীত মানবাতীত ক্ষমতা নামে যে এক প্রকার অপৌরুষেয় সামর্থ্য জন্মিতে পারে, এবম্প্রকার বিবেচনা তাহাদের অনুর্ব্বর মানসক্ষেত্রে আদৌ স্থান পায় না। কেহ কেহ এরূপও কহিয়া থাকেন যে, ইউরোপীয় লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি না; যদি বিবরণ সত্য হয় তাহা হইলে উহা অতিরঞ্জিত কি না; যদি অতিরঞ্জিত না হয়, তাহা

হইলে সাহেবের দেখিবার ভ্রম ছিল কি না; আর কেহ সাক্ষী আছে কি না; ইত্যাদি বহুপ্রকারের অর্থশূন্য ও বিরক্তিকর প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উৎপাদন করিয়া তাহারা সময় নষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং অকারণে ভক্তের মনঃকষ্ট বিধান করে। এরূপ প্রকৃতির লোকের কাছে এরূপ অপৌরুষেয় সামর্থ্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা বৃথামাত্র, এই জন্যই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্য মহর্ষিগণ তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন,সংশয়চিত্ত, নাস্তিক, ক্রূর,অশ্রদ্ধাবান্, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন এবং নির্ব্বোধের নিকট ধর্ম্ম, ধর্ম্মতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক বিদ্যার গূঢ় রহস্যের কথা ব্যক্ত করিও না; এই জন্যই অর্জ্জুনকে ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছিলেন,—"হে অচ্যুত! এই পরম গুহ্য যোগবিদ্যার অশেষ হিতকর মর্ম্ম যেন তোমার নিকট হইতে অবিশ্বাসী ও অভক্ত ব্যক্তিরা জানিতে না পারে।" জগৎপ্রখ্যাত সাধু পল লিখিয়াছেন, দন্তহীন দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর পক্ষে দুগ্ধই একমাত্র আহার, মাংস ভক্ষণে তাহার অধিকার নাই এবং মাংসভক্ষণে ও অস্থিচর্ব্বণে শিশু অশক্ত, সুতরাং শিশুকে মাংস খাইতে দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম। মহামতি যিশু কহিতেন, শূকরের সম্মুখে বহুমূল্যবান্ মণি বা মুক্তা ছড়াইয়া ফল কি? পদদ্বারা বহু-মূল্য মুক্তা ও মণিকে শূকরশাবক ভগ্ন করিয়া ফেলিবে এবং তৎপরক্ষণেই সুবিধা পাইলে হয় ত মুক্তার অধিকারীকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হইবে। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, গুরুগম্ভীর স্বরে বারংবার কহিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বজ্ঞানহীন, সর্ব্বপ্রকার আচার ও সাত্ত্বিকতা-হীন, সকলপ্রকার বিবেক ও বিচারবিহীন ব্যক্তির নাম শূদ্র। যে ব্যক্তি শূদ্র, সমগ্র বিশ্বজ্ঞানময় বিরাট বেদশাস্ত্রে তাহার অধিকার নাই। পবিত্র গ্রন্থ, পবিত্র স্থান, পবিত্র সংসর্গ, এই সমুদায় শূদ্রের ঘৃণার বিষয়, সুতরাং শূদ্র অস্পৃশ্য এবং তাহার জল অনাচরণীয়। সমুদয় শাস্ত্রে ও ব্রহ্মবিদ্যার সে অনধিকারী।" বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পাঠকেরা এতক্ষণে ঋষিদিগের ব্যবস্থার মুখ্য মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক পাঠকেরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "অপৌরুষেয়" শব্দের অর্থ কি? উত্তরে বলা যায়, যাহা পুরুষের (অর্থাৎ মানবের) সাধ্যাতীত, তাহা অপৌরুষেয়। ইহাতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, সাধুরা কি মনুষ্য নহেন? তাঁহারা কি পুরুষ মধ্যে গণ্য নহেন? ইহার উত্তর এই যে, সাধু মহাত্মারা পুরুষ নহেন, পরন্তু "মহাপুরুষ"। তাঁহারা যে কোন কারণেই হউক,

যে অসাধারণ সামর্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই সামর্থ্যগুণে তাঁহারা মনুষ্যাকারে দেবতার লীলা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন। যে কোন কারণেই হউক, যদি কেহ লৌহকে বিশুদ্ধ এবং অকৃত্রিম কাঞ্চনে পরিণত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে লৌহকে আর লৌহ বলিবার তোমার অধিকার কোথায় থাকে? সেই লৌহখণ্ড সুবর্ণরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর লৌহত্ব নাই, সুতরাং তাহা আর লৌহ নয়, এক্ষণে তাহা খাঁটি সোণা। মানুষ সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই বলা যায়। যাহা হউক, কি কারণে মনুষ্য মধ্যে এবম্প্রকার অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিতে পারে, তাহা আলোচনার বিষয় বটে। হিন্দুশাস্ত্রে এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; যাহা হউক আমিও এ বিষয়ের যথাশক্তি সংক্ষিপ্তভাবে পুনরালোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। শাস্ত্রের কথা কঠিন, অনেক স্থলে বিশেষ জটিল, অনেক সময়ে পাঠক বা শ্রাবকেরা সহজে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়েন না। আমি সহজ ভাবে ইহার আলোচনা করিব এইরূপ মনে করিয়াছি, কিন্তু এই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "সামর্থ্য" শব্দটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আরও কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করি, এই কারণে আরও কতিপয় মহাত্মার অলৌকিক সামর্থ্যের কথা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে "অপৌরুষেয় সামর্থ্য" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও বিচিত্রতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান্ পাঠক মহাশয়েরা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। আমি প্রথমে সামর্থ্যের দৃষ্টান্তগুলি বর্ণনা করিয়া তদনন্তর প্রস্তাবান্তরে সামর্থ্যের উৎপত্তির মূলের ইতিবৃত্তে হস্তক্ষেপ করিব।

এক সময়ে আমি বোম্বাই নগর হইতে রাজপুতানা আসিতেছিলাম। পথিমধ্যস্থ এক রেলওয়ে ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য নিস্তব্ধ হইল; এই বৃহৎ ষ্টেশন ঐ লাইনের অন্যতম প্রধান জংশন। গাড়ীর যে শ্রেণীর কামরায় আমি বসিয়াছিলাম, সেই শ্রেণীর সেই কামরায় একজন মুসলমান ফকির নীরবে বসিয়াছিলেন; তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছিলেন না। গাড়ী থামিলে, তিনি অবতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তিনি নিকটস্থ এক সরোবরে স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রখানা হাতে লইয়া রেলওয়ে প্লাট্‌ফরমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রৌদ্র

ছিল, তাঁহার ছোট কাপড়খানা তিনি রৌদ্রে প্রসারণ করিয়া দিয়া, রীতিমত আসনবিস্তারপূর্ব্বক প্লাট্‌ফরমের উপরে 'নেমাজ' করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নেমাজ সমাপ্ত হইবার ঠিক্ দুই মিনিট পরে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইল; ফকির মহাশয় তখন "মালা" হাতে লইয়া প্রশান্ত হৃদয়ে ও সহাস্য বদনে সেই প্লাট্‌ফরমে উপবেশনপূর্ব্বক ভগবানের নাম জপিতে আরম্ভ করিলেন; পথিকদিগের মধ্যে দুই একজন চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, "ফকির মহাশয়! ফকির মহাশয়! গাড়ী চলিতেছে, শীঘ্র আসুন! নতুবা গাড়ীতে আরোহণ করিবার আর সুবিধা পাইবেন না"। বলা বাহুল্য এই ষ্টেশন হইতে বহুদূরে গেলে তবে ফকির মহাশয়ের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। যাহা হউক ফকির মহাশয় উত্তর দিলেন, "চিন্তা নাই, চিন্তা নাই, তোমরা এই গাড়ীতে চলিয়া যাও, আমার জন্য এই গাড়ী শীঘ্রই ঘুরিয়া আসিবে, আমি না গেলে তোমাদের কাহারও যাওয়া হইবে না।" ফকিরের এই কথার অর্থ অনেকে তখন বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, গাড়ী চলিতে লাগিল; এ দিকে প্লাট্‌ফরমে বসিয়া মুসলমান সাধু ভগবানের নাম জপিতে লাগিলেন। আমরা ক্রমে চারিটা ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম; পঞ্চম ষ্টেশনের অভিমুখে গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে ষ্টেশন-মাষ্টার তারের সংবাদ দ্বারা এই মর্ম্মে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, "বাষ্পীয় শকট যেন আর অগ্রসর না হয় এবং ষ্টেশনেও দণ্ডায়মান না থাকে। বিপদ্ উপস্থিত; লাইন বন্ধ। গাড়ী যেন পশ্চাদ্দিকে ঘুরাইয়া জংশনে আনয়নপূর্ব্বক দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।" অগত্যা তাহাই হইল, আমরা সেই গাড়ীতে বসিয়া পুনরায় সেই জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাধু মহাশয় তখন প্লাট্‌ফরমে বসিয়া আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছিলেন, আমাদের গাড়ীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু মধুর হাসিতে লাগিলেন।" এস্থলে বলা আবশ্যক, প্রোক্ত বিপদের কথা জংশন ষ্টেশনের লোকেরা অথবা পথিমধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনের লোকেরা ইতঃপূর্ব্বে আদৌ জানিত না। গাড়ী ফিরিয়া আসিবার ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও কল্পনাতেও আসিতে পারেন নাই। ফকির মহাশয় যেন নখদর্পণের ন্যায় এই ভাবী ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা পূর্ব্বসূচনা করিয়াছিলেন।

সিংহল দ্বীপের হাইকোর্টের আড্‌ভোকেট্ জেনেরলের নাম পি, রমানাথম্, এম্, এ; এল্, এল্ বি। ইনি মান্দ্রাজের বৈশ্যজাতীয় পরম হিন্দু। অনারেবল

সুপ্রসিদ্ধ রমানাথম্ এক্ষণে সিংহলবাসী। আমি সিংহলে গিয়া ইঁহার বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। ইনি যেমন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ধনবান্, বদান্য, সচ্চরিত্র, তেমনি পরমধার্ম্মিক ও সত্যবাদী পুরুষ বলিয়া সুপরিচিত। ইনি আমাকে কহিয়াছিলেন, "আমি একদা সরকারী কার্য্য-উপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়া এক বন্ধুর বাটীতে কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ঐ বন্ধু মাদ্রাজের লোক এবং আমার আত্মীয়। তাঁহার বাটীতে গিয়া দিবারাত্র তাঁহাকে বিষণ্ণবদনে দেখিতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, আমার পূজনীয় ইষ্ট (গুরু) দেব ৺কাশীধামে আছেন; একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। অনেক অনুরোধের পরে তিনি শুভাগমন করিতে স্বীকৃত হইয়া লিখিয়াছিলেন 'নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে যে দিন হউক নিশ্চয় পৌঁছিব।' অদ্য মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ দিন। তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন না; তিনি না আসিলে আমার অবর্ণনীয় ক্ষতি হইবে, সমস্ত জীবনে ঐ ক্ষতির পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" আমি কহিলাম, বিশ্বাস করুন, তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, মহাত্মাদিগের বাক্য মিথ্যা হয় না। বন্ধু কহিলেন, "রেল ও ষ্টিমারের সময় শেষ হইয়াছে, আর আসার আশা করা বৃথা।" যাহা হউক, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমরা আহার করিয়া শয়ন করিলাম। সমুদয় বাটী বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই ক্রমে ক্রমে নিদ্রাগারে গমন করিল। আমি যে কামরায় শয়ন করিয়াছিলাম তাহারই পার্শ্বের কামরায় বন্ধু একাকী শয়ন করিলেন। মধ্যে মাত্র একটা দেওয়ালের ব্যবধান, দেওয়ালের মধ্যস্থলে গবাক্ষ; গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলাম, অতি সামান্যমাত্র খোলা রহিল। রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় অকস্মাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমার বোধ হইল যেন পার্শ্বের কামরায় দুইজনের কথোপকথন হইতেছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভূমির উপরে বন্ধু বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি এক অসাধারণ লাবণ্যবান্ যোগী পুরুষ বসিয়া বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন। আমি গোপনে এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। কথা শেষ হইলে, আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বন্ধুকে ইংরাজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার গুরুদেব কি আসিয়াছেন?" আমার মুখ হইতে কথা শেষ হইতে না হইতেই ঐ কামরার প্রদীপ

মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই দৌড়িয়া আসিয়া ঐ কামরার দ্বারে দাঁড়াইলাম, কামরার দ্বার তখনও ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ঘরের তিনটি জানালা, তাহা লৌহের শিক দ্বারা বেষ্টিত, তাহাতে একটা ক্ষুদ্র বিড়ালও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমি বন্ধুকে কহিলাম "কামরা খুলিয়া দেও।" ঘরের আলো জালিয়া বন্ধু কামরা খুলিয়া দিলে পর আমি ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেই মহাত্মার ব্যাঘ্রচর্ম্মও নাই এবং সেই মহাত্মাও নাই!!"

২।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন ত্রিবাঙ্কুড় নামক করদ রাজ্যের অন্তর্গত পদ্মনাভপুর জেলার যিনি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট কলেক্টর ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ রাও, বি, এ। ইনি মাদ্রাজনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও সাহেব নহেন। ইন্দোররাজ্যের এবং ত্রিবাঙ্কুড়ের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, জগদ্বিখ্যাত রাজা সার, টি, মাধব রাও মহোদয় যাঁহার সহোদরাকে সহধর্ম্মিণীরূপে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইনি সেই রঘুনাথ রাও, বি, এ। আমি যে রঘুনাথের কথা কহিতেছি, ইনি সর্ব্বপ্রথমে ত্রিবাঙ্কুড়ের বর্ত্তমান মহারাজের ইংরাজিশিক্ষক ছিলেন, তদনন্তর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন। ত্রিবাঙ্কুড়ে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটগণ দেওয়ান পেস্কার আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। আমি একদা রঘুনাথ রাও বাহাদুরের বাটীতে অতিথি হইয়া কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। রাও বাহাদুর এক্ষণে ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের অন্যতম অধিবাসী। তিনি যেমন শিক্ষিত তেমনি সম্ভ্রান্ত; তিনি যেমন সাত্বিক ও সদাচারী হিন্দু, তেমনি সত্যবাদী এবং ধার্ম্মিক পুরুষ। এরূপ সদাশয় ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি আমাকে কতিপয় হিন্দু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছিলেন, এস্থলে আমি অবিকল তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "সুপ্রসিদ্ধ কুমারিকা অন্তরীপ আমারই এলাকাস্থিত অর্থাৎ পদ্মনাভপুর জেলার অন্তর্গত। কন্যাকুমারী গ্রাম আকারে ক্ষুদ্র, এখানে ব্রাহ্মণের বসতি অধিক, এবং শাস্ত্রবিখ্যাত কুমারীকন্যা দেবীর মন্দির এস্থানে অবস্থিত থাকায় নানাদেশ হইতে গৃহী ও সাধু পুরুষগণ সতত এখানে

গমনাগমন করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। একদা আমি এক গুরুতর মোকদ্দমার তদারক করিবার জন্য ঐ গ্রামে গিয়াছিলাম। গ্রামে শুনিলাম, এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তিনজন গৈরিক বসনধারী ও জটাজূট-সংবলিত সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন। শুক্রবারে বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু আসিয়াছিলেন এবং মঙ্গলবারে আর দুইজন সাধু একত্র আগমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুইজন সাধু মান্দ্রাজদেশীয় এবং প্রথমোক্ত সাধু (বয়োজ্যেষ্ঠ মহাত্মা) হিন্দুস্থানের লোক ছিলেন। শেষোক্ত দুই জনের সহিত প্রথম সাধুর ইতঃপূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না। হিন্দুস্থানী সাধু মহাশয় দাক্ষিণাত্যের ভাষা বুঝিতেন না এবং শেষোক্ত দুইজন সাধু হিন্দুস্থানী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অবকাশ ও সুবিধা অনুসারে আমি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। শুনিলাম, প্রথম সাধু মহাশয় ইঙ্গিত দ্বারা অপর সাধুদিগের সহিত মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। যাহা হউক, একদিন সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইল; রাত্রি দুইটার সময় এমন গরম বোধ হইতে লাগিল যে, আমি আর আমাদের সরকারী বাংলো ঘরের মধ্যে শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। একগাছি ছোট যষ্টি হাতে করিয়া সমুদ্রতীরে একাকী বেড়াইতে গেলাম। সমুদ্রতীরে একটা লোকও দেখিলাম না। গ্রামের কোন লোককে গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেও দেখি নাই। অনেক দূরে যাইবার পরে দেখিলাম, সমুদ্রের প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের উপরে তিনজন সাধু (মহাত্মা) উপবেশন করিয়া আছেন। পূর্ণিমার রাত্রি—পৃথিবী তখন আলোকময়ী ছিল; আমি দূর হইতে সাধুদিগকে দেখিয়াই বুঝিলাম, ইঁহারাই সেই তিনজন সাধু। আকৃতি ও বেশভূষার কথা আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি অতি ধীরে ধীরে অন্য একটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া পদচারণা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিলাম। সাধুগণ আমাকে দেখিতে পান নাই এবং আমার আগমনের কোন লক্ষণই জানিতে পারেন নাই। একজন মান্দ্রাজী সাধু তামিল ভাষায় হিন্দুস্থানী সাধুকে কহিলেন, দাক্ষিণাত্যে ছয়টা ভাষা প্রচলিত; তামিল, তেলুগু, কাণাড়ী, মালয়ালী, মুণ্ডী এবং টোপাই; আপনি ইহাদের একটা ভাষাও আয়ত্ত করেন নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দী ভাষায় হিন্দুস্থানী সাধু উত্তর দিলেন, "তোমার কথায় মর্ম্ম বুঝিতে পারি, কিন্তু ভাষা না জানায় কহিতে পারি না।" অনন্তর মান্দ্রাজী

সাধু বলিলেন "যাহাতে আপনি দাক্ষিণাত্যের সমুদয় ভাষাতেই কথা কহিতে পারেন, আমি এক্ষণে তাহার সদুপায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা কহিয়া মাদ্রাজী সাধু বলিলেন, আমার সঙ্গে যতক্ষণ আপনি কথোপকথন করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি দাক্ষিণাত্যের যে কোন ভাষা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। আমি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই ক্ষমতা আপনাকে দিলাম, তাহার অধিক সময় দিবার ক্ষমতা আমাকে গুরুদেব দেন নাই। এই কথা লইয়া, মাদ্রাজী সাধু হিন্দুস্থানী সাধুর মুখের ভিতর এক হস্ত এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে এক হস্ত স্থাপন করিয়া প্রায় ছয় মিনিট কাল পর্য্যন্ত কি একটা অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শুনিলাম, ঐ হিন্দুস্থানী সাধু অতি পরিষ্কার তামিল ভাষায় মাদ্রাজী সাধুদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। হিন্দুস্থানী সাধু কহিলেন, "ভায়া! তোমার ক্ষমতা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তুমি তবে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতে পার না কেন?" মাদ্রাজী সাধু উত্তর দিলেন, "যাহা আমাদের দেশের ভাষা নহে, তাহার উপরে আমার অধিকার নাই, তাহা শিক্ষার প্রয়োজন।" যাহা হউক, অতঃপর সাধুদিগের মধ্যে পরস্পর যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, আমি তাহা বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। হিন্দুস্থানী সাধু কহিলেন, "তুমি এখন কোথা হইতে আসিয়াছ? পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?" মাদ্রাজী সাধু উত্তর দিয়া বলিলেন, "আমি এক্ষণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ হইতে আসিলাম। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমি গোদাবরীতটে শ্রীরঙ্গ নামক তীর্থে মৃত হইয়াছিলাম। তথাকার গোস্বামিগণ আমার মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, আমি দশ বৎসরকাল জলে সমাধি করিয়াছিলাম। দশ বর্ষ পরে মথুরা নগরীর কেশীঘাটে পুনরুত্থিত হই। ঐ তীর্থে দ্বাদশ বর্ষ তপস্যা করিয়া পুনরায় মৃত হই, তদনন্তর হিঙ্গলাজ তীর্থে পুনরুত্থিত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর তপঃসাধন করিয়া পঞ্চভৌতিক দেহ তথায় রাখিয়াছিলাম। ইহার পরে পুনানগরীর পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরে পুনরুত্থিত হইয়া দেখিলাম, দেহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয়াছে। বাঁচিতে হইলে দেহের পুনঃ সংস্করণ আবশ্যক, সেই জন্য কয়েক বৎসর হইল "কায়াকল্প"* ক্রিয়া সমাপন করিয়াছি।"

* যে গুপ্ত ক্রিয়াদ্বারা মহাপুরুষেরা জরাজীর্ণ প্রবৃদ্ধাবস্থাকে তরুণ অবস্থায় পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার নাম "কায়াকল্প।"—লেখক।

হিন্দুস্থানী সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এক্ষণে বয়ঃক্রম কত হবে?" মাদ্রাজী সাধু বলিলেন, "ঠিক্ দুইশত তের বৎসর।" বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু কহিলেন, "তুমি আমার অপেক্ষা ২২ বৎসরের ছোট, কিন্তু তাহা হইলেও সামর্থ্যে বড়।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহাত্মাদিগের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার পায়ের মারাঠী জুতার শব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। সাধুরা নয়ন ফিরাইয়া আমাকে দেখিবামাত্র একটু বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন। ইত্যবসরে মাদ্রাজী দুই সাধু দণ্ডায়মান হইয়া অতি দ্রুতপদে আমার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া (প্রায় দুই হস্ত দূর দিয়া) চলিয়া গেলেন; প্রায় ৩ মিনিটের মধ্যে সেই বিশাল ময়দানের মধ্যে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ দিকে সমুদ্রতটে চাহিয়া দেখিলাম, হিন্দুস্থানী সাধু নাই। মন্দিরে অনুসন্ধান করিলাম, তাঁহাদিগকে দেখিলাম না। অতি শীঘ্র সরকারী বাংলো গৃহে প্রত্যাগমন-করিয়া একজন হেড্ কনেষ্টবল ও দুইজন সিপাহীকে গ্রামের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের ঘরে সাধুদের অনুসন্ধান জন্য পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে, মহাত্মারা অর্দ্ধরাত্রে বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মৃগচর্ম্ম, শার্দ্দুলচর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যাদি এবং কাঠের দুইটা কমণ্ডলু ও একটা ত্রিশূল ব্রাহ্মণের গৃহে আছে। এই কথা শুনিয়া আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণের ঘরে গেলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মারা কোথায় গিয়াছেন জানি না, আমি অতি যত্নে তাঁহাদের আসন, ত্রিশূল ও কমণ্ডলু একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া ঐ ঘরে তালা বন্ধ করিয়াছি। চাবি আমার নিকটে আছে।"

আমি ব্রাহ্মণকে কহিলাম, "তালা খুলিয়া দেও।" তালা খোলা হইলে দেখিলাম সাধুদের কোন দ্রব্যই নাই। ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! তাঁহারা আগমন করিলে আমি কেমন করিয়া মুখ দেখাইব?" আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলাম "তুমি কাঁদিও না। মাহাত্মারা তাঁহাদের অপৌরুষেয় সামর্থ্য-বলে তাঁহাদের দ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত কহিয়া শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাও পুনরপি কহিলেন, "এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ,মাদ্রাজের গবর্ণরের সুপারিস-পত্র লইয়া ত্রিবাঙ্কুরের অরণ্যে শিকার করিতে আসিয়াছিল। সমুদ্র, অরণ্য এবং পর্ব্বত এইগুলি ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা

হউক; এক নিবিড় মহারণ্যের ধারে সাহেবদের জন্য শিবির স্থাপিত হইল। মহারাজের আদেশে আমাকেও সাহেবদের সঙ্গে বনে যাইতে হইয়াছিল। কয়েক দিবস পরে শিকার সমাপ্ত হইলে ইংরাজ ভদ্রলোকগণ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন, আমি দুই এক দিনের জন্য তথায় রহিলাম; ইহার কারণ এই যে,আমার এক নিকটআত্মীয়ের উৎকট পীড়া হইয়াছিল। বৈদ্যেরা কহিয়াছিলেন এই বনে এক প্রকার লতা পাওয়া যায়, সেই লতা ভিন্ন রোগের ঔষধ প্রস্তুত হইবে না। ঐ লতার অনুসন্ধান জন্য একজন কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। দুই দিবসের অনুসন্ধানেও যখন ঐ ঔষধিলতা পাওয়া গেল না, তখন আমি হতাশাস হইয়া শিবিকা উঠাইবার আদেশ দিলাম। আমরা প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ তড়িতের ন্যায় এক মহাপুরুষ সেই গহন কাননাভ্যন্তর হইতে আগমন করিয়া আমার সম্মুখে একগুচ্ছ লতা ফেলিয়া দিয়া কহিল "লেও, ইয়ে বুটী তোমরা ওয়াস্তে লায়া হুঁ" অর্থাৎ "লও, এই লতা তোমার জন্য আনিয়াছি।" মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মহাপুরুষ কাননে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি বুঝিলাম, ইনি সেই সমুদ্রতটের হিন্দুস্থানী মহাত্মা। কবিরাজ কহিলেন, "এই লতাই আমরা চাহিয়াছিলাম।" ইত্যাদি।

যাঁহারা ইংরাজি সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্য সুপ্রসিদ্ধ অনারেবল জম্বুলিঙ্গম্ মুদালিয়র, এম,এ, বিএল; সি, আই, ই, মহোদয়ের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ইনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল এবং গবর্ণর বাহাদুরের কৌন্সীলের মেম্বর। এক্ষণে তথাকার ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত। ইনি আমাকে কহিয়াছিলেন, "একদা আমার মাদ্রাজের বাটীতে মধ্যাহ্ন কালে এক পঞ্জাবী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানা মৃগচর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি উলঙ্গ থাকিতেন, কিন্তু অনেকের অনুরোধে স্বদেশীয় মোটা কম্বলের একটা আলখাল্লা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন *। ইঁহার আগমনের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি কয়েক জন বিদেশীয় সাধুকে আমার গৃহে স্থান দিয়াছিলাম। সেই দুষ্ট ব্যক্তিরা আমার অনেক টাকা এবং দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। আমি সেই অবধি কোন সাধুকে গৃহে আশ্রয় দিতে সাহসী বা সম্মত হইতাম না; কিন্তু এই পঞ্জাবী সাধুকে দেখিবামাত্র, কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁহাকে

* গলদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিচ্ছদবিশেষের নাম আলখাল্লা।——লেখক।

অভ্যর্থনা করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। আমি তাঁহাকে সাদরে গৃহে স্থান দিলাম। তিনি মৃগচর্ম্ম বিস্তার করিয়া উপবেশন করিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" আমি কহিলাম "আমার নাম জম্বুলিঙ্গম্"। সাধু বলিলেন, তুমি জম্বুবানের ন্যায় বীরপুরুষ বটে। যাহা হউক তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইয়াছ, এজন্য আমি তোমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম"। আমি হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝিতাম, সুতরাং কহিলাম ;—

"পর্‌দেশী কি সাথ কোই
করতা হ্যায় প্রীৎ।
যোগী ভয়া, ভায়া!
কিস্‌কা মিৎ॥"

অর্থাৎ অপরিচিত লোকের সহিত কেহ বন্ধুতা করে না, আর যোগী কাহারও সহিত মিত্রতা বা বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ রাখে না। এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "যাহা হউক, কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে দিবে?" আমি তৎক্ষণাৎ একটা ক্ষুদ্র কামরা খুলিয়া ভৃত্যকে কহিলাম, "এই ঘরে সাধুর মৃগচর্ম্ম বিস্তার কর। ইনি এই ঘরেই থাকিবেন। এই কামরায় ইঁহার মৃগচর্ম্ম ব্যতীত যেন আর কোন দ্রব্য না থাকে।" চাকর তাহাই করিল। ঐ ঘরে সাধুর মৃগচর্ম্ম এবং রাত্রির আলোকের জন্য একটা বিলাতী ল্যাম্প ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই রহিল না। সাধু সেই ঘরে গিয়া উপবেশনপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "আমি এই কামরার দ্বার বন্ধ করিব, কেবল সন্ধ্যার সময়ে এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে আসিব, তদ্ভিন্ন দিবারাত্র এই ঘর ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখিব। সন্ধ্যাকালে তোমার ভৃত্য এই কামরার ভিতর গিয়া ল্যাম্প জ্বালাইয়া দিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না; আমি বাহিরে না আসিলে, কেহ যেন আমাকে না ডাকে। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি না?" আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম, কিন্তু অগত্যা সাধুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "আহারের কিরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে?" সাধু কহিলেন, "আমি ভোজ্য দ্রব্য চাই না। তোমরা সে জন্য চিন্তা করিও না। পানের জন্য জলও চাই না। মাসের মধ্যে এক দিন স্নান করি, তামাকু প্রভৃতি ব্যবহার করি না, সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও"। আমরা সাধুর সমস্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম এবং "সাধুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া স্ব স্ব কামরায় চলিয়া

গেলাম। সাধু পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইটী জানালা এবং দ্বার, ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ পঞ্চ দিবস ও পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। কেবল সন্ধ্যার সময় তিনি একবার ঐ গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেন এবং বারান্দায় পদচারণ করিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। এই পঞ্চ দিবসের মধ্যে তাঁহাকে স্নান, মলমূত্রপরিত্যাগ, জলপান বা আহার করিতে কেহ দেখে নাই। এইরূপে আরও ছয় দিবস কাটিয়া গেল। একাদশ দিবস উঁহাকে উপবাসী দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম, অথচ তাঁহার আকৃতির কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। ত্রয়োদশ দিবস প্রাতে আমার ভৃত্য আসিয়া আমাকে গোপানে কহিল, "হজুর! গতকল্য রাত্রি আনুমানিক দেড়টার সময় আমি প্রস্রাব পরিত্যাগ করিবার জন্য আমার কুটীরের বাহিরে আসিয়া সাধুর কামরার গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম, তিনি নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি সহ অতি তৃপ্তির সহিত অন্ন আহার করিতেছেন। কোথা হইতে কেমন করিয়া এ সকল দ্রব্য আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।" আমি ভৃত্যের কথা বিশ্বাস না করিয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং সায়ংকাল সমাগত হইলে সমুদয় অট্টালিকার চারি দিকে গোপনে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলাম। রাত্রি দেড়টার সময় দেখা গেল, সাধু মহাশয় তাঁহার কামরায় বসিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনাদি এবং দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা মিষ্টান্ন, চাটনি প্রভৃতি সহ অন্ন ও রোটি আহার করিতেছেন। পান করিবার জলের গ্লাস, মুখ ধুইবার জন্য পিত্তলের বাসন, দুগ্ধের বাটী, ঘৃতপাত্র, অন্নের থালা ইত্যাদি যথারীতি মজুত রহিয়াছে। গামোছা পর্য্যন্ত তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। এরূপ রোটি মাদ্রাজ অঞ্চলে কেহ প্রস্তুত করিতে জানে না। ব্যঞ্জনাদি মাদ্রাজী লোকের হাতের প্রস্তুত নহে। মিঠাই প্রভৃতি এদেশে পাওয়া যায় না। অন্নের থাল, জলের গ্লাস এবং ঘৃতপাত্র যে প্রকার তাহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে কোথাও বিক্রয় হয় কি না সন্দেহ। আমার বাটীর মধ্যে সন্ধ্যার পরে কোন লোক প্রবেশ করে নাই। সাধুর গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; জানালার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া আমরা এই সকল ব্যাপার পরিষ্কাররূপে দেখিয়াছিলাম। সাধুর ভোজন শেষ হইলে, অকস্মাৎ ঘরের আলোক নিবিয়া গেল। আমরা আপনাপন কামরায় আসিয়া শয়ন করিলাম। অতি প্রভাতে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া আছি, এমন সময়ে সাধু আপনা হইতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। আমি

কহিলাম, "প্রভো! গতকল্য রাত্রে আমরা আপনাকে ভোজন করিতে দেখিয়াছি। আরব্য উপন্যাস নামে এক ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, এক রাজার অধীনে কয়েকটা প্রেত ছিল; রাজা যখন যাহা আনিতে ইচ্ছা করিতেন, আজ্ঞামাত্র প্রেতেরা তাহা আনিয়া দিত। আমাদের শাস্ত্রেও ভূতসিদ্ধি, প্রেতসিদ্ধি, পিশাচসিদ্ধি প্রভৃতির কথা আছে। আপনি বোধ হয় এইরূপে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ।" ঈষৎ হাস্য করিয়া সাধু কহিলেন, "কৈ! কামরার মধ্যে ত কিছুই নাই।" আমরা তাঁহার কামরা মধ্যে গিয়া মৃগচর্ম্ম ব্যতীত এক কণাপ্রমাণ কোন দ্রব্য দেখিলাম না, কেবল উপরে ল্যাম্পটাকে লম্বিতভাবে দেখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধু কহিলেন, "অদ্য আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সাধু পুরুষ আর একদিনও রহিলেন না, কোথায় বা কোন্ দিকে তিনি চলিয়া গেলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না।"

ইটোয়া নগরীর সুপ্রসিদ্ধ ধনবান্ শেঠ শ্রীযুক্ত লালা কুঞ্জবিহারী আগর-ওয়ালা, আমেদাবাদের বিখ্যাত ধনী অনারেবল রায় রণছোড়লাল বাহাদুর, সি, আই, ই, এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত গঙ্গাবরম্ পল্লীর (তৎকালীন) কন্‌ট্রাক্টর সর্দ্দার রতনচাঁদ বাজপাই, হরিদ্বার আশ্রমী একই মহাপুরুষের শিষ্য ছিলেন। যে দিবস লালা কুঞ্জবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিবরধারী লালের বিবাহোৎসব হইয়াছিল, সেই দিবসে রতনচাঁদ ও রণছোড়লালের বাটীতেও উৎসব ছিল। তিন জনেই পত্রদ্বারা গুরুদেবকে তাঁহাদের বাটীতে শুভাগমন করিতে বিশেষ অনুনয়সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অথচ পরস্পরে এই অনুরোধের কথা জ্ঞাত ছিলেন না। পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ঐ উৎসবের দিবস তিন স্থলেই একই গুরুমূর্ত্তি একই ভাবে উপস্থিত থাকিয়া তিনজন প্রিয়শিষ্যের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য কি মিথ্যা পাঠকেরা একটু অনুসন্ধান করিলেই সহজে জানিতে পারেন। ইটোয়া হইতে আমেদাবাদ এবং আমেদাবাদ হইতে গঙ্গাবরম্ অতি দ্রুতগামী স্পেশাল গাড়ীতেও এক দিনে যাওয়া যায় না। ইহাকেই বলে "অপৌরুষেয় সামর্থ্য।" এবম্প্রকার আরও শত শত দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মরূপ পাঠশালায় এখনও ক খ গ শিক্ষা করেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই, ইহা উচ্চ-শ্রেণীর ভাবুকদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও অশ্রদ্ধাবান্

নাস্তিকেরা মাতৃগর্ভে যেমন আছেন তেমনই থাকুন, তাহাতে ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-জগতের ক্ষতি নাই, কিন্তু ভক্ত পুরুষপুঙ্গবেরা এতাদৃশ সামর্থ্য লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভে সক্ষম হউন, আমার ইহাই প্রার্থনা। এরূপ অপৌরুষেয় সামর্থ্য লাভের উপায় সম্বন্ধে প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

স্বপ্ন।

মধুময় মধুমাসে কৌমুদী রজনী ;
জল, স্থল, নীলাম্বর নীরব অবনী।
কবি যথা ভাষাহীন ভাবেতে বিভল ;
চিত্রকর তুলি করে ভ্রমে কুতূহল।
নদীকূলে, তরুতল কুটীর শোভিত
প্রকৃতির ফুল্লহাসি সুষমামণ্ডিত।
প্রেম আশা ভালবাসা কৃষক দম্পতি,
সুখে বাস করে তথা হরষিত মতি।
দম্পতির হৃদি-কণা প্রেমের বন্ধন,
প্রকৃতির নবকায়া মুরতি মোহন।
এই ক্ষুদ্র পরিবার মিলি তিন জন,
প্রকৃতি করুণা স্নেহে লালিত জীবন।
গৃহস্থের হৃদিশিক্ষা অতিথি হরিণী,
আসিছে কুটীর দ্বারে নির্ভয় রঙ্গিণী।
কৃষিবধূ সুহাসিনী আনি ফলরাশি,
স্বকরে অতিথি-পূজা করে প্রেমে হাসি।
জীবনী লভিতে পুনঃ সকলি নিদ্রিত,
সুধা লাগি চকোরিণী সুখে জাগরিত।
বকুল চম্পক যূথী কিবা প্রফুল্লিত,
সৌরভ, ঝঙ্কার, মধু মলয়ে পূরিত।
পূর্ণিমা নিশীথে যুবা প্রিয়া পুত্র সনে,
আশ্রিত নিদ্রার বুকে কুটীর প্রাঙ্গণে।

এলান কুন্তলদাম বিচ্যুত বসন,
দুলিছে পরশি মৃদু মলয় পবন।
আকুল মদিরাময় জোছনা পরশে,
চেতনা স্বপনে ভ্রমে প্রাণের হরষে।
হেরিল কৃষক যুবা বিচিত্র স্বপন,
জাগিল যে নিদ্রা হ'তে রোমাঞ্চিত মন।
গাহিল পাপিয়া পিক উড়ি নভঃ তলে,
পড়িল প্রেমের বিষ শান্ত নদী জলে।
প্রতিধ্বনি ক্ষীণ তানে ও পারে ডাকিল,
জীবনের কোন্ লীলা গোপনে কহিল?
প্রকৃতি-লাবণ্যে হেন কৃষক পরাণে,
স্বপনের চিত্রাবলী সত্য বলি জানে।
হায় রে! কৃষক যুবা ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস,
হেরিল উদাস প্রাণে আপন আবাস।
নিথর নিদ্রার মোহে প্রেমচিত্রবর,
তবুও লভিছে শান্তি কিবা মধুময়।
জোছনার স্রোতে মগ্ন কুটীর প্রাঙ্গণ,
কমনীয় ফুলকলি, নিদ্রিত আনন।
ঘুমঘোরে প্রিয়া পুত্র সহসা কাঁদিল,
শুনি যুবা স্বপ্ন তার সকল জানিল।
চলিল কেন যে যুবা সেই নিশিশেষে,
অসহায় প্রিয়জনে ছাড়িয়ে নিমিষে।
পথিপাশে তন্দ্রাগতে পতি-সোহাগিনী,
হাসিছে কৌমুদী-প্রেমে বন কুমুদিনী।
ভুলেও নিঠুর তবু হেরিল না আর
প্রেমের জীবন্ত চিত্রে ফিরি একবার।
যে পথে জীবনে আর যায়নি কখন,
সেই পথে কোন্ দেশে করিল গমন।
পর্য্যটক বেশ ধরি দূর দেশদেশে,
উপনীত কৃষিযুবা এক বর্ষ শেষে।

কোথা তার নিকেতন মাধুরীজড়িত;
একি দেশ শূন্যময় হিমধবলিত!
অপরূপ গুল্মতরু দু চারিটী কোথা,
জনপ্রাণী সমাগম নাহি যেথা সেথা।
বাসগৃহ ক্ষুদ্রতম অদ্ভুতনির্ম্মাণ;
কোথা বা বরফস্তূপ পর্ব্বতপ্রমাণ।
স্বপনেতে হেরেছিল চিত্রাবলী যত,
নয়ন সমীপে তাহা একি বিরাজিত!
সেই দেশ, সেই গৃহ, সেই জলাভূমি,
তুষার নীহারে শোভে সীমাচক্র চুমি।
গৃহস্থের সেই গৃহ হিম হ্রদ তীরে,
বিস্ময়ে যুবার হৃদি কেবলি শিহরে।
সহসা আইল সেই গেহের প্রাঙ্গণে,
ভয়-দুঃখ-চমকিত অবশ পরাণে।
উদাসে উঠিল ত্বরা অলিন্দ উপর;
অতিথি হইতে কেন কাঁপে কলেবর?
"এসো গৃহবাসি, হেথা"—অতিথি ডাকিল;
এক বৃদ্ধা কন্যাসহ পুলকে আইল।
হেরিয়ে তাঁ'দের যুবা নিমিষে মূর্চ্ছিত,
অমনি বালিকা, ত্রাস্ত তক্ষেতে বিস্মিত।
বৃদ্ধার পরশে ত্বরা লভিয়ে চেতন,
জানিল হৃদয়ে যুবা প্রকৃত স্বপন।
বিচিত্র মানব তারা, হেরি পুনরায়
কহিল বৃদ্ধারে অর্দ্ধ অস্ফুট ভাষায়,
"কোথা নারি, পতি তব? কহ প্রকাশিয়া—
এতদূর আসিয়াছি তাহার লাগিয়া।"
কাঁদিয়া কহিল বৃদ্ধা শিরে হাত করি,
"বিংশবর্ষ স্বামী মোরে গিয়াছেন্ ছাড়ি।
যে দেশে পথিক গেলে ফিরে না কখন,
থাকে না যথায় কভু প্রেমের বন্ধন

নির্ম্মম মানুষ তথা ; তবে কি কখন,
ভুলিতে পারিত মোরে হৃদয় রতন্ ?
না জানি নিঠুর পারে ভুলিতে আমায়,
কেমনে ভুলিল তার প্রিয় দুহিতায়।
পূরিল নয়নজলে বৃদ্ধার নয়ন;
লুপ্ত শোক নব যথা হেরিলে স্বজন।
বিস্ময়ে আতঙ্কে যুবা কাঁপিতে লাগিল,
যেই স্বপ্ন সামঞ্জস্যে মোহ উপজিল।
প্রাণের লুকান যত অতীতের কথা,
কহিল বৃদ্ধারে যুবা প্রাণে পেয়ে ব্যথা।
অমনি বিস্ময়ে বৃদ্ধা চকিত বিভল,
যুবার হৃদয়তন্ত্রী উদ্ভ্রান্ত বিকল।
বিকট চীৎকার করি যুবক সত্রাসে,—
"আমি তব সেই পতি!"—কহিল নিমেষে।
হায় রে বিদেশী যুবা বৃদ্ধার ক্রোড়েতে
ত্যজিল আপন প্রাণ বিচিত্র দেশেতে।
জন্মান্তর-রহস্যের হেন চিত্র হেরি,
ভাবিল অবশ প্রাণে সেই বৃদ্ধা নারী।
"মম পতি দেহান্তরে যুবা রূপ ধরি,
ভুলিল না ভালবাসা এত প্রেম মরি!
কোন্ দেশে কিবা নামে লভিয়ে জনম
তবু তার প্রিয়া করে ত্যজিল জীবন।"
জ্যোতিহীন পরিম্লান গ্রহ অস্তপ্রায়,
বৃদ্ধার হৃদয় একি কোথা চলে যায়!
দীপ্ত কলেবরে গ্রহ পুন সমুদিবে,
নবভাবে দোঁহা হৃদি কোথা প্রকাশিবে ?

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

পদ্যগীতা।

দশম অধ্যায়।

বিভূতি-যোগ।

কহিলা কেশব "হে কুন্তিনন্দন!
শুন পুনঃ মম পরম বচন
যাহা প্রীতিমান্ তোমার এখন
কহিতেছি তব হিতের তরে ॥১

কিবা দেবতারা কি মহর্ষিগণ
কেহই আমার হে কুন্তিনন্দন!
অদ্ভুত প্রভব অবগত নন
আদি আমি এই চর অচরে ॥২

অজ ও অনাদি সর্ব্বলোকেশ্বর
বলিয়া আমার জ্ঞাত যেই নর,
নরমধ্যে মোহ-বিশূন্য অন্তর—
নিষ্পাপ সে জন বিমুক্ত হয় ॥৩

শম দম সুখ জ্ঞান বুদ্ধি আর
ক্ষমা অসংমোহ চিত্তে অনিবার
যথা জ্ঞান-ভাব দুঃখের সঞ্চার
ভাব ও অভাব অভয় ভয় ॥৪

অহিংসা সমতা তুষ্টি তপঃ দান
যশোঽযশ ভূতগণের ধীমান্!
যে সব স্বতন্ত্র ভাব বিদ্যমান
আমা হইতেই সে সব ভবে ॥৫

সন্ততি যাঁদের এ লোকনিচয়
সে আদি সপ্তর্ষি-মুনিচতুষ্টয়,
আমা হইতেই উৎপন্ন বিজয়!
আমারই মানস-সম্ভূত সবে ॥৬

যথার্থ রূপেতে হে পার্থ! যে জন
যোগ ও বিভূতি মম জ্ঞাত হ'ন
তিনি যে অটল সমাধিতে র'ন,
নাহিক কিছুই সংশয় তা'য় ॥৭

আমিই সবার প্রভব ভারত!
জাত আমা হ'তে ভূতরাজি যত
বুধগণ ইহা হ'য়ে অবগত
ভাব-সহকারে পূজে আমায় ॥৮

মদগত মচ্চিত্ত তা'রা ধনঞ্জয়!
করি পরস্পর ভাব-বিনিময়
আমারই কথায় যাপিয়া সময়
প্রেম ভক্তি সুখ লভয়ে সবে ॥৯

চিত্ত মোতে তা'রা অর্পি অনুক্ষণ
প্রীতি সহ মোর করয়ে ভজন
লভি' বুদ্ধি-যোগ তা'রা সে কারণ
আমা হ'তে পার্থ! আমায় লভে ॥১০

দেখা'তে করুণা তা'দের উপর
আত্মভাবে আমি রহি' নিরন্তর
দীপ্ত জ্ঞান-দীপে হে কুরুপ্রবর!
নাশি' তাহাদের মোহ-আঁধার" ॥১১

কহিলা কিরীটী—"হে বৃষ্ণিতনয়!
পরব্রহ্ম তুমি পরম আশ্রয়
শাশ্বত পুরুষ অজ সর্ব্বময়
দিব্য আদিদেব বিভু সবার ॥১২

দেবর্ষি নারদ আর ঋষিগণ
অসিত-দেবল ঋষি দ্বৈপায়ন
ক'রেছেন তোমা বর্ণনা যেমন
তুমিও তেমতি কহিছ এবে ॥১৩

কহিলে আমার যে সব কেশব!
সত্য সে সকল (ই) নহে অসম্ভব,
যেহেতু হে কৃষ্ণ! দেব-দৈত্যসব
আবির্ভাব তব জ্ঞাত না ভবে ॥১৪

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন!
হে ভূত-ঈশ্বর! হে পৃথ্বীপালন!
হে দেব-দেবতা! হে সর্ব্বকারণ!
নিজেকেই তুমি নিজেই জ্ঞাত ॥১৫

যে বিভূতি-যোগবলেতে তোমার
আছ' ব্যাপি' তুমি এ বিশ্বসংসার,
শুনিতে নিঃশেষে সাধ তা' আমার
কহ সে দিব্য বিভূতি যত ॥১৬

হে যোগিন্! আমি কেমনে নিয়ত
চিন্তিয়া তোমায় হ'ব অবগত
কোন্ কোন্ ভাবে আমায় সতত
ভাবনা তোমায় করিতে হ'বে ॥১৭

যোগৈশ্বর্য্য আর বিভূতি তোমার
কহ জনার্দ্দন! বিস্তারে আবার
যে হেতু ও সুধা বচনে তোমার
চিত্ত মম তৃপ্তি শেষ না লভে" ॥১৮

কহিলা বিধাতা—"হে কুরুপ্রধান!
বিভূতি আমার দুস্তর মহান্
তবে তা'র মাঝে যেগুলি প্রধান
তাহারই কীর্ত্তন করিব এবে ॥১৯

সর্ব্বভূত হৃদে হে কুন্তিকুমার!
আত্মরূপে আমি স্থিত অনিবার
আদি মধ্য অন্ত আমি সবাকার
দৃশ্যমান্ এই বিপুল ভবে ॥২০

বিষ্ণু আমি পার্থ! আদিত্য গণেতে
অংশুমান্ সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মধ্যেতে
মরীচি-মরুৎ গণের মাঝেতে
নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা ॥২১

চতুর্ব্বেদ মধ্যে সামবেদ আমি
দেবগণ মাঝে আমি শচীস্বামী
ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনঃ আমি
ভূতনিবহের মধ্যে চেতনা ॥২২

রুদ্রগণ মধ্যে আমি হে শঙ্কর
যক্ষরক্ষোমধ্যে আমি বিত্তেশ্বর
বসুগণ মধ্যে আমি বৈশ্বানর
সুমেরু হে আমি শিখরিগণের ॥২৩

পুরোধাগণের মধ্যেতে ভারত!
বৃহস্পতি আমি হও অবগত
সেনানীগণের মধ্যে "স্কন্দ" খ্যাত
রত্নাকর পুনঃ সরসীগণে ॥২৪

ভৃগুঋষি আমি মহর্ষি নিকরে
ওঙ্কার নিখিল অক্ষর ভিতরে
যজ্ঞ মধ্যে জপ-যজ্ঞ আমি নীরে
স্থাবরের মধ্যে হিমাদ্রি খ্যাত ॥ ২৫

বৃক্ষগণ মধ্যে আমি হে অশ্বত্থ
দেবর্ষিগণের মধ্যেতে নারদ
গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ
সিদ্ধগণ মধ্যে কপিল খ্যাত ॥২৬

অশ্বগণ মধ্যে আমাকে ভারত!
উচ্চৈঃশ্রবা ব'লে হও অবগত
গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত
নরমধ্যে নৃপ আমায় জেনো ॥২৭

অস্ত্রমধ্যে আমি বজ্র ভয়ঙ্কর
ধেনুগণ মধ্যে কপিলা সুন্দর
সংসারেতে আমি কাম-জন্মকর—
সর্প মধ্যে মোরে বাসুকি জেনো ॥২

নাগগণ মধ্যে অনন্ত হে আমি
জলচর মধ্যে আমি জলস্বামী
সংযমিগণের মধ্যে যম আমি
পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা আর ॥ ২৯

দৈত্য মধ্যে আমি কয়াধু-তনয়
বশীকার মধ্যে কাল ধনঞ্জয়!
মৃগ মাঝে আমি মৃগেন্দ্র বিজয়!
বৈনতেয় আমি বিহঙ্গে আর ॥ ৩০

বেগবান্ মধ্যে আমি হে পবন
শস্ত্রধারী মধ্যে ভৃগুর নন্দন
মীনেতে মকর হে কুন্তিনন্দন!
প্রবাহের মধ্যে জাহ্নবী আমি ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তু মধ্যে আমি ধনঞ্জয়!
ইহ সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
বিদ্যা মধ্যে আমি "অধ্যাত্ম" বিজয়!
বাদিগণ মধ্যে বাদ হে আমি ॥ ৩২

অক্ষরের মাঝে আমি হে অ-কার
সমাসেতে "দ্বন্দ্ব" হে কুন্তিকুমার!
ক্ষয়শূন্য আমি কাল-দুর্নিবার
পুনঃ সর্ব্বাত্মক বিধাতা আমি ॥ ৩৩

সর্ব্বহর মধ্যে মৃত্যু আমি ভবে
আমা হ'তে ভাবী প্রাণীরা উদ্ভবে
আমি কীর্ত্তি-বাক্-স্মৃতি নারী সবে
মেধা-ধৃতি-ক্ষমা দ্যুতিও আমি ॥৩৪

সামমন্ত্রে আমি বৃহৎ সাম খ্যাত
ছন্দোমধ্যে আমি গায়ত্রী ভারত!
মার্গশীর্ষ আমি মাসে* হও জ্ঞাত
ঋতুর মধ্যেতে বসন্ত আমি ॥ ৩৫

দ্যূত আমি পার্থ! বঞ্চকগণেতে
তেজস্বীতে আমি তেজঃ স্বরূপেতে;
জয় পুনঃ আমি উদ্যমিগণেতে
সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ (ও) সে আমি ॥৩৬

বৃষ্ণিবংশে আমি দেবকী তনয়
পাণ্ডবের মাঝে আমি ধনঞ্জয়
মুনিমধ্যে পরাশরের তনয়
কবিকুলে পার্থ! উশনা আমি ॥৩৭

দণ্ডদাতা যেই আমি দণ্ড তা'র
সামনীতি আমি জিগীষু সবার

* অর্থাৎ মাস মধ্যে।

শুহ্য বিষয়েতে মৌন ভাব আর
তত্ত্বজ্ঞানীদের জ্ঞান হে আমি ॥ ৩৮

চরাচর মাঝে হে কুন্তিনন্দন!
সকলেরই আমি বীজ সনাতন—
অবজ্ঞায় মোরে করিয়া বর্জ্জন
কিছুই সংসারে তিষ্ঠিতে নারে ॥ ৩৯

বিভূতির অন্ত নাহিক আমার
নামমাত্র শুধু হে কুন্তিকুমার!
কহিনু কিঞ্চিৎ সকাশে তোমার,
তাহাও আবার সঙ্ক্ষেপ ক'রে ॥ ৪০

যা' কিছু সংসারে ঐশ্বর্য্য-পূরিত
সম্পত্তি-প্রভাব বল-সমন্বিত
জানিও সে সব হে পার্থ! নিশ্চিত—
আমারই তেজাংশ সম্ভূত ব'লে ॥ ৪১

অথবা এ সব ঐশ্বর্য্যে আমার
পৃথগ্বিধ জ্ঞানে কি কাজ তোমার?
অবস্থিত আমি হে কুন্তিকুমার!
নিখিল সংসার একাংশে ধ'রে" ॥৪২

শ্রীহরিগোপাল বসু।

প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রাশয় বর্ণন।

আমাদের সুবিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের সকলেই অবগত আছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর, কি চেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই সর্ব্ববিষয়ক সর্ব্বোচ্চজ্ঞানসম্পন্ন পরম পুরুষ, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, কোন স্থানে লঘু উপায়ে কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিতে উপায়ের গৌরব স্বীকার করেন নাই। মধুমক্ষিকায়া যে সমষট্‌কোণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুপাত্রে মধু সঞ্চয় করে, তাহা দেখিয়াই সেই আদি শিক্ষকের গণিতনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর একটী কথা এই—পদার্থের যে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নির্ণীত হয়, অথবা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তদ্বারা সিদ্ধ হয়, আমাদের শাস্ত্র কোন স্থানে তাহার বিরুদ্ধ হয় না, অনুগতই হইয়া থাকে। সত্য নির্ণয়ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ভুল করা শাস্ত্রের মত নহে।

বহুজ্ঞ পুরুষগণ বস্তুর যথার্থ ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াই শাস্ত্র করিয়া থাকেন। যে তত্ত্ব সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দেয়। এই জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে, কতকগুলি বিষয় এরূপ আছে যে, আমরা প্রত্যক্ষাদি দ্বারা তাহার যাথার্থ্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যেমন "স্বর্গকামো-

স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি। যিনি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন ইত্যাদি স্থলে অশ্বমেধ যজ্ঞ যে স্বর্গগমনের হেতু, ইহা আমরা প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জানিতে পারিতেছি না। এই জন্য এইরূপ বিষয় গুলিকে শাস্ত্রকারেরা স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। অন্য প্রমাণে জানিতে পারা যায় না, এই জন্যই কেবল আপ্ত বাক্য ইত্যাদি স্থলে প্রমাণ হইয়া থাকে।

কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত পদার্থসকল ইহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কারণ এই শাস্ত্রে বর্ণিত সকল পদার্থই বুদ্ধিমান্ লোকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অথবা গণিতের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা বিশুদ্ধভাবে অবগত হইতে পারে। সুতরাং এই শাস্ত্রে বর্ণিত কোন পদার্থই স্বতঃ প্রমাণ নহে। এতদ্বর্ণিত পদার্থগুলির উপপত্তির অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষাদি আর্য্যগণ চিরকাল করিয়া আসিতেছেন।

প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বস্ত পণ্ডিতের কথাই প্রমাণ হয় না। এ বিষয়ে একটী উদাহরণ দেখুন;—কোন একজন ধনী ব্যক্তি, তাঁহার বৈবাহিকের মৃত্যুসংবাদ কোন বিশ্বস্ত পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পুত্রবধূর দ্বারা মহাসমারোহে বৈবাহিকের আদ্যশ্রাদ্ধ করাইয়া, মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার বৈবাহিক স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া উক্ত ধনী ব্যক্তি বলিলেন;—বৈবাহিক মহাশয়, আমি শুনিয়াছি, "আপনি মরিয়াছেন"। ইহা শুনিয়া বৈবাহিক উত্তর করিলেন;—"যদি আমি মরিয়াছি, তাহা হইলে তোমার চক্ষুর সমীপে স্বশরীরে কিরূপে উপস্থিত হইলাম?" ইহা শুনিয়া উক্ত মহাত্মা উত্তর করিলেন, যে পণ্ডিত আপনার মৃত্যু সংবাদ বলিয়াছেন, তিনি মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন এবং 'আপনি জীবিত আছেন' ইহা স্বীকার করিলে, আমি যে এত অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার শ্রাদ্ধ করিয়াছি, তাহা বৃথা হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। অতএব আপনি যে জীবিত আছেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াও স্বীকার করিতে পারিব না।

যে সকল মহাত্মা এই ব্যক্তির সহচর বা সদৃশ, তাঁহাদিগকে নমস্কার। তাঁহাদিগের জন্য এরূপ প্রবন্ধ নহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রহভ্রমণ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্গণের দুই মত প্রসিদ্ধ আছে।

এক মতে—পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে।

অপর মতে—সূর্য্য স্থির রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে পৃথিবীর সহিত সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে।

প্রথম মতবাদীদিগের প্রত্যেক গ্রহ পূর্ব্বগতিতে ভ্রমণ করিয়া যত সময়ে এক পর্য্যায় (Revolution) পূর্ণ করে, সেই কাল অনুসারে অনুপাত করিয়া গ্রহের একদিন সম্বন্ধি সমান গতি নিশ্চয় করিয়া তাহা হইতে নক্ষত্র চক্রে নির্ণীত স্থানকে তাঁহারা মধ্যম গ্রহ শব্দ দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইমতে সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্যমগতি তুল্য হইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যমগ্রহ স্থানও সমানই হয়।

অপর মতবাদীরা পৃথিবীর সহিত প্রত্যেক গ্রহের সূর্য্যের চারিদিকে একবার পরিভ্রমণের কাল নির্ণয় করিয়া, তাহা হইতে অনুপাত করিয়া গ্রহের একদিনের মধ্যম গতি নিশ্চয় করিয়া, তাহা হইতে অভীষ্ট কালে ভচক্রে নির্ণীত স্থানকে মধ্যম গ্রহশব্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই মতে বুধ শুক্রের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান পূর্ব্বমত সিদ্ধ মধ্যগতি মধ্যমস্থান হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। কারণ পৃথিবীর চারিদিকে একবার ভ্রমণ পূর্ত্তিকাল ও সূর্য্যের চারিদিকে একবার ভ্রমণ পূর্ত্তিকাল এক নহে।

সূর্য্য ও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যস্থলে কখনই আগমন করে না এরূপ গ্রহ, যেমন—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, ইহাদের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান, আদ্যমত সিদ্ধ মধ্যমগতি ও মধ্যম স্থান হইতে কোন অংশে ভিন্ন হয় না, একই হইয়া থাকে। কারণ এই তিন গ্রহ, সূর্য্য ও পৃথিবী উভয়কেই সমান কালে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, কতকগুলি ভগণ (Revolution) আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অনাদি অনন্ত কালের অতিদীর্ঘ এক নির্দ্দিষ্ট খণ্ডকে গ্রন্থকারেরা কল্প বলিয়াছেন। এই কল্পকালে যে গ্রহ যতবার পরিভ্রমণ করে,সেই গ্রহের তত কল্পভগণ হয়। একবার পরিভ্রমণ করাকে,একভগণ বলে।

যে সকল মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়া এক ভগণ নির্ণয় করিয়া এই কল্প ভগণ-গুলি লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীন আচার্য্য বলিলাম। প্রাচীন আচার্য্যেরা সকল গ্রহের কল্পভগণ ও সকল গ্রহের পাতভগণ (Revolution of the Nodes of the planets)

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পাতভগণগুলি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সূর্য্য পরিতঃ গ্রহ ভ্রমণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহাদের সূর্য্য পরিতঃ গ্রহ ভ্রমণ স্বীকারের পক্ষে পাতভগণগুলি, উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রবন্ধে তাহাই বিশদভাবে দেখান যাইতেছে।

অগ্রে বর্ণিত উভয় মতেই বিক্ষেপ কেন্দ্র * সাধন করিতে মন্দস্পষ্ট গ্রহে (Heliocentric place of the planets) পাত যোগ করা হইয়া থাকে। অতএব বিক্ষেপ কেন্দ্র উভয় মতবাদিগণের তুল্যই হয়।

যদি বিক্ষেপকেন্দ্র = বি
পাত = পা
মন্দস্পষ্ট = ম
তাহা হইলে, বি = ম + পা

যে সকল মধ্যম গ্রহ, উভয় মতেই সমান, যথা কুজ, গুরু ও শনি তাহারা স্ব স্ব মন্দফল (First equations of the planates) সংস্কৃত হইলেও তুল্যতা ত্যাগ করে না। মন্দ ফল সংস্কৃত মধ্যম গ্রহই মন্দস্পষ্ট। অতএব কুজ, গুরু ও শনির বিক্ষেপ কেন্দ্র উভয়মতে তুল্য হওয়াতে তাহাদের পাত ও উভয় মতে অবশ্যই তুল্য হইবে। এই কারণে তাহাদের পাতভগণও উভয় মতে সমান, কিন্তু আদ্য মতে মধ্যম বুধ ও শুক্র, মধ্যম সূর্য্যের তুল্য, এবং অন্যমতে মূলগ্রন্থোক্ত স্ব স্ব শীঘ্রোচ্চের তুল্য। এই অন্যমতে বুধ, কিঞ্চিৎ ন্যূন ৮৮ অষ্ট আশি সাবন দিনে একভগণ পূর্ণ করে। অতএব তাহার মধ্যম গতি ২৪৫ কলা ৩২ বিকলা। এই মতে শুক্র, ২৪ দিন ৪৫ দণ্ডে একভগণ পূর্ণ করে। অতএব তাহার মধ্যমগতি ৯৬ কলা ৮ বিকলা। এই দুই মধ্যম গতিই মূলগ্রন্থে উক্তগ্রহদ্বয়ের শীঘ্রোচ্চগতি নাম দিয়া লিখিত হইয়াছে। অতএব এই দুই গ্রহের পাত উভয় মতে কখনই সমান হইতে পারে না, কারণ বিক্ষেপ কেন্দ্রের তুল্যতা থাকিলেও মধ্যম গ্রহের প্রভেদ আছে। অতএব এই দুই গ্রহের পাতভগণও কোন প্রকারে এক হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকারেরা, বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপ কেন্দ্র সাধন করিতে মন্দস্পষ্ট বুধ শুক্রে পাতযোগ না করিয়া মন্দ ফল সংস্কৃত তাহাদের শীঘ্রোচ্চে অর্থাৎ অন্যমতীয় মন্দ স্পষ্ট বুধ শুক্রে, যোগ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা

* যে চাপীয় জাত্য ত্রিভুজ আশ্রয় করিয়া শর (Tatitude) সাধন হয়, ঐ ত্রিভুজের কর্ণকে বিক্ষেপ কেন্দ্র নাম দিয়াছেন। সূর্য্য কেন্দ্রীয় গোলাই এই ত্রিভুজ সিদ্ধ হয়।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সূর্য্যকেন্দ্রক গ্রহ ভ্রমণই প্রাচীন আচার্য্যদিগের অভিপ্রেত ছিল।

উভয় মতেই, বিক্ষেপ কেন্দ্রের মধ্যে মন্দফলের সংস্কার আছে। অতএব মন্দ ফলের সংস্কারের বিষয় ত্যাগ করিয়া যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, কুজ, গুরু, ও শনির কল্পভগণ আদ্য মতে ও অন্যমতে একই। উক্ত কল্পভগণ হইতে উৎপন্ন মধ্যম কুজ, গুরু ও শনি, উভয় মতে সমান। কুজ, গুরু ও শনির কল্পের পাতভগণও এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে উৎপন্ন পাত; উক্ত প্রকার মধ্যম কুজ, গুরু ও শনিতে যোগ করা যাইতে পারে। আর বুধ ও শুক্রের পক্ষে ভূকেন্দ্রক ভ্রমণের বিরুদ্ধ যে কল্পভগণ অর্থাৎ তাহাদের শীঘ্রোচ্চের যে কল্পভগণ তদুৎপন্ন যে মধ্যম বুধ ও শুক্র তাহাতে যোগ করা যাইতে পারে এরূপ পাত যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ কল্প পাতভগণ তাহাদের সম্বন্ধে কি কারণে লিখিত হইল? যদি সূর্য্যকেন্দ্রক গ্রহ ভ্রমণই প্রাচীন আচার্য্যগণের অভিপ্রেত না হইত তাহা হইলে তাঁহারা আদ্যমত সিদ্ধ মধ্যম বুধ ও শুক্রে যোগ করা যাইত পারে এরূপ পাত, যাদৃশ কল্পভগণ স্বীকার করিলে উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ কল্পপাতভগণ তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহারা লিখিতেন। অর্থাৎ শীঘ্র কেন্দ্র ভগণাধিক পাতভগণই লিখিতেন।

অতএব ভৌমাদি পঞ্চতারা গ্রহেরই সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণ প্রাচীনদিগের অভিমত। তাহা না হইলে সূর্য্যকেন্দ্রক গ্রহভ্রমণের উপযুক্ত পাতভগণ কি জন্য তাঁহারা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ভূকেন্দ্রক গ্রহ ভ্রমণের উপযুক্ত পাতভগণ নির্ণয় করাই তাঁহাদের উচিত ছিল।

যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, বুধ ও শুক্রেরই পাতভগণ সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণের উপযুক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতএব বুধ শুক্রেরই সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণ প্রাচীনদিগের অভিমত, কিন্তু কুজ, গুরু ও শনির সেরূপ নহে, ইহাদের সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণ ও ভূকেন্দ্রক ভ্রমণে কোন প্রভেদ নাই, এবং ইহাদের পাতভগণেও কোন প্রভেদ নাই বা হইতেও পারে না। এরূপ সন্দেহও করা যাইতে পারে না। কারণ সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণ স্বীকার না করিলে সূর্য্য ইহাদের শীঘ্রোচ্চ হইতে পারে না। সুতরাং সূর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণই প্রাচীনদিগের অভিমত। সূর্য্য যদি শীঘ্র প্রতি বৃত্তের কেন্দ্র স্থানে অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে সূর্য্যাভিমুখে শীঘ্রোচ্চ কেন কল্পিত হইয়াছে।

সূর্য্যাভিমুখে কেন্দ্রের অতিরিক্ত স্থলে সূর্য্যের স্থিতি, অথচ শীঘ্রোচ্চ, সূর্য্যের সমান গতিতে সূর্য্যাভিমুখে ভ্রমণ করে, এরূপ কল্পনা করা অপেক্ষা সূর্য্যকেই কেন্দ্রস্থানে স্বীকার করায় লাঘব আছে।

যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, সূর্য্যকেন্দ্রক গ্রহভ্রমণই যদি প্রাচীনদিগের অভিপ্রায়, তাহা হইলে পৃথিবীর চারিদিকে গ্রহগণ ঘুরিয়া থাকে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কেন লিখিয়াছেন? তাহার উত্তর এই যে, সাধারণ প্রতীতির অনুসরণ করিয়া গোল স্থিতি সহজে বিদ্যার্থীদিগের মনে যাহাতে ধারণা হয়, তদনুসারে সূর্য্যের ধর্ম্ম পৃথিবীতে আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহা তাঁহারা জানিতেন। এইরূপ আরোপ রসিক আচার্য্যগণ, বালকদিগের সুখবোধের জন্য সাধারণ প্রতীতির অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর সচলত্ব, ধর্ম্ম, সসূর্য্য নক্ষত্রচক্রে ও সসূর্য্য নক্ষত্রচক্রের অচলত্ব ধর্ম্ম, পৃথিবীতে আরোপ করিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে ছিল। বৈকালে পশ্চিমদিকে আসিয়াছে। এইরূপই সর্ব্বসাধারণের বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথিবীর রাশি সঞ্চার সূর্য্যে ও সূর্য্যের স্থিরত্ব, পৃথিবীতে আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু অগণ্য নক্ষত্র সমূহের ভূকেন্দ্রক ভ্রমণ অপেক্ষা একটী পৃথিবীর ভ্রমণ কল্পনায় অত্যন্ত লাঘব আছে।

অতএব সসূর্য্য নক্ষত্রচক্রের ভ্রমণ সজাতীয় পৃথিবীর স্বাক্ষ পরিতঃ ভ্রমণ, এবং সূর্য্যভ্রমণের সজাতীয় পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণই প্রাচীনদিগের অভিপ্রেত। এই বিষয়টী নব্য গ্রন্থকারেরা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিক্ষেপকেন্দ্র সাধনার্থ মন্দ স্ফুটে পাত যোগ, কুজ, গুরু ও শনির সম্বন্ধে, উপপত্তি যুক্ত নিশ্চয় করিয়াছেন। অথচ বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপকেন্দ্র সাধনে মন্দফল সংস্কৃত তাহাদের শীঘ্রোচ্চে পাতযোগপক্ষে কোন উপপত্তি নাই জানিয়া উপলব্ধিকেই উপপত্তি বলিয়াছেন, এবং উপপত্তিশূন্য কল্পনা করিয়াছেন যে, বুধশুক্রের শীঘ্রোচ্চ স্থানে, পাতের পরিমাণ যাহা হয়, সর্ব্বত্রই পাতের পরিমাণ, তাহাই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে উপলব্ধিই উপপত্তি। কেহ বা বলিয়াছেন মূলগ্রন্থে বুধ ও শুক্রের যাহা পাতভগণ পঠিত হইয়াছে তাহা অল্প পঠিত হইয়াছে। পাঠ সৌকার্য্যার্থই এরূপ করা হইয়াছে। কিন্তু বুধ ও শুক্রের পাতভগণ যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহাই তাহাদের বাস্তবিক পাতভগণ, সূর্য্যকেন্দ্রক গ্রহভ্রমণ বুঝিলেই আর এ বিষয়ে কোন অনুপপত্তি থাকে না।

ভাগ্যক্রমে আর্য্যভটের বুদ্ধিপথে পৃথিবীর স্বাক্ষ পরিতঃ পরিভ্রমণের বিষয়টী আরূঢ় হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন ;—

অনুলোম গতি র্নৌ স্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিম গানি লঙ্কায়াম্॥

সচল নৌকায় উপবিষ্ট ব্যক্তি, তীরের অচল বৃক্ষাদিকে যেমন বিপরীত দিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ সচল পৃথিবীর নিরক্ষদেশীয় লোকে, অচল নক্ষত্রদিগকে সমানভাবে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখিয়া থাকে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রকাশিত করিলেও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়াছেন ;—

আবর্ত্তন মুর্ব্ব্যাশ্চেন্নপতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ।

যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী-স্থিত উন্নত বস্তু পতিত হইতে পারে, তাহা কি কারণে হয় না?

ভ্রমণারম্ভের পূর্ব্বে কোন বস্তু পৃথিবীতে সংযুক্ত থাকিলে পড়িতে পারিত, কিন্তু ভ্রমণারম্ভের পরে সংযুক্ত হইলে আর পড়িতে পারে না, এই বস্তু-ধর্ম্মটি জানিতে পারেন নাই। ভ্রমণারম্ভ কালে বস্তুর স্বভাব যেরূপ হয়, তাহা দেখিয়াই উক্তরূপ লিখিয়াছেন।

লল্ল লিখিয়াছেন ;— যদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদা
স্বকুলায়ং কথমাপ্নুয়ুঃ খগাঃ।
ইষবোঽপি নভঃ সমুজ্ঝিতাঃ
নিপতন্তঃ স্যু রপাং পতে র্দিশি॥
পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমে ভুবো
বরুণাশাভি মুখো ব্রজেদ্ ঘনঃ।
অথমন্দ গমাৎ তথা ভবেৎ
কথমেকেন দিবা পরিভ্রমঃ॥

যদি পৃথিবী ভ্রমণ করে, তাহা হইলে পক্ষিসকল উড়িয়া কিরূপে পুনর্ব্বার আপন আপন বাসা পাইবে? যদি আকাশে শরক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ঐ শর সকল পশ্চিম দিকে যাইয়া পড়িবে। পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ স্বীকার করিলে মেঘসকল সর্ব্বদা পশ্চিমাভিমুখে যাইবে। যদি পৃথিবী মন্দভাবে গমন করিতেছে এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে এক দিনে কিরূপে একবার পরিভ্রমণ সম্পন্ন হইবে?

চতুঃপার্শ্বস্থ ভূবায়ুর সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই বিষয়টি জানিতে না পারিয়া লল্ল উক্তরূপ লিখিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী শ্রীপতি বলিয়াছেন ;—

যদ্যেব মম্বর চরা বিহগাঃ স্বনীড়
মাসাদয়ন্তি ন খলু ভ্রমণে ধরিত্র্যাঃ।
কিঞ্চাম্বুদা অপি ন ভূরি পয়োমুচঃ স্যুঃ
দেশস্য পূর্ব্ব গমনেন চিবায় হন্ত ॥
ভূগোল বেগ জনিতেন সমীরণেন
কেত্বাদয়ো হ্যপরদিগ্ গতয়ঃ সদাস্যুঃ।
প্রাসাদভূধর শিরাং স্যপি সম্পতন্তি
তস্মাদ্ভ্রমত্যুভগণ স্বচলা চলৈব ॥

যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে আকাশবিহারী বিহঙ্গমগণ আপন আপন বাসা পাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের পূর্ব্বগমনহেতুক মেঘ সকল কোন দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না। পৃথিবীর ভ্রমণের প্রবল বেগে উৎপন্ন বায়ুদ্বারা আকাশে উড্ডীন পতাকাদি সর্ব্বদাই পশ্চিমদিকে উড়িতে থাকিবে। উচ্চ দেবমন্দির ও পর্ব্বতের চূড়াসকল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অতএব নক্ষত্রচক্রই ভ্রমণ করিতেছে, অচলা নাম্নী পৃথিবী অচলাই আছে।

শ্রীপতি পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার ধর্ম্মই অবগত ছিলেন না, সেইজন্য ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমান্ ভাস্করাচার্য্য এই সকল গ্রন্থকারদিগের পরবর্ত্তী, তথাপি তিনি পূর্ব্বজ গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টান্তে আর্য্যভটের মত খণ্ডন করেন নাই। স্বগ্রন্থে প্রমাণস্থলেই আর্য্যভটের উল্লেখ করিয়াছেন। খণ্ডনস্থলে কোথায়ও আর্য্য-ভটকে আনয়ন করেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি আর্য্যভটের বিপক্ষ ছিলেন না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, সূর্য্যের চারিদিকে ক্রান্তিবৃত্তে পৃথিবীর ভ্রমণ স্বীকার করিলে, সূর্য্যের ন্যায় স্থির নক্ষত্রগণেরও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কেন হয় না, এবং ধ্রুবতারারও বার্ষিক উন্নতিভেদ কেন উপলব্ধি হয় না? ইহার উত্তরে এই বলিতে হইবে যে, নক্ষত্রগণ যেরূপ অপ্রমেয় দূরে অবস্থিত, সে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর ভ্রমণমার্গ অতি ক্ষুদ্র, এইজন্য উক্ত প্রভেদ উপলব্ধ

হয় না। ইহাতেও যদি কেহ প্যাটের আড়ত হইতে আসিয়া বলেন যে, সূর্য্য সিদ্ধান্তে লিখিয়াছে—"ভবেদ্‌ভকক্ষা তীক্ষ্ণাংশোর্ভ্রগণং ষষ্টি তাড়িতম্।"

সূর্য্যকক্ষার ৬০ গুণ নক্ষত্রকক্ষা, অতএব নক্ষত্রগণ অপ্রমেয় দূরে কিরূপে বলা যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, সকল সিদ্ধান্তেই ছেদ্যকে কক্ষা-বৃত্তে ও প্রতিবৃত্তে একই দিকে মেষাদি স্থিতি দেখাইয়া মূলকারেরা যে অপ্রমেয় দূরে নক্ষত্রগণের স্থিতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। সুতরাং এ বচন কোন অল্পজ্ঞ লোকে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অন্তর্গত করিয়াছে।

শেষ বক্তব্য এই যে, স্বর্গীয় অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রাচার্য্যাশয় বর্ণনে যাহা লিখিয়াছেন ও সময়ে সময়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা অবলম্বন করিয়াই এ প্রবন্ধ লিখিলাম; অতএব ইহার গুণের অংশ, শ্রীগুরুর চরণে সমর্পিত হউক। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, সে দোষ আমার।

শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

দশ বৎসরের

বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচন।

উপন্যাস, ১৯০৩।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

২। **বাসর-শয়ন** সংসারের নিত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহার উপাখ্যানাংশ সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

হৃষীকেশ নামক একটি সচ্চরিত্র যুবক বিদ্যালয়ে সুখ্যাতির সহিত লেখা-পড়া শিখিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইল। কিন্তু ভবিতব্যতার বিধানে তাঁহার পরিণাম অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইল। ঘটনাক্রমে সরমা নাম্নী একটি ব্রাহ্ম যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। পরিচয়ের পর উভয়ে বেশ ভাব

হইল, এবং ক্রমে সেই ভাব প্রণয়ানুরাগে পরিণত হইল। সরমার পিতাও হৃষীকেশের সহিত তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই হৃষীকেশের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। মণিমোহন নামে সরমার এক মাতুল ছিল। সেই মাতুলই পূর্ব্বে ভাগিনেয়ীর প্রণয়পাত্র ছিল। এক্ষণে মাতুল মণিমোহন দেখিল যে, কোথা হইতে এক কণ্টক আসিয়া জুটিয়া তাহার হৃদয়েশ্বরীকে কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে। ইহাতে তাহার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি দারুণ ঈর্ষ্যানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং কিরূপে সেই কণ্টককে দূরীভূত করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন প্রণয়ি-যুগল সরমার পিত্রালয়ে গোপনে বসিয়া প্রেমালাপে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছে এবং কিরূপে সুখের ঘরকন্না পাতাইবে, তাহার কল্পনা আঁটিতেছে, এমন সময় মাতুল মণিমোহন তথায় প্রবেশ করিয়া সরমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু সহোদরকে খুন করিয়া অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিল। সন্দেহটা হৃষীকেশের উপরেই পড়িল। হৃষীকেশই হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলেন, এবং বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হইয়া আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে হইল না। তথাকার কারাধ্যক্ষের পত্নীর অনুগ্রহে তিনি কিছুকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়া স্বগ্রামে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই পরলোকগত হইয়াছেন।

অতঃপর তিনি ভবানীপুরে সরমার অনুসন্ধানে গমন করিলেন, এবং যাইয়া দেখিলেন যে, মাতুল মণিমোহনের সহিত ভাগিনেয়ী সরমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর তিনি মণিমোহনকে এক প্রকাণ্ড সভায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে অপমান করিলেন এবং তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পাষণ্ডের ন্যায় মণিমোহন একজন ভীরু কাপুরুষ ছিল। সরমা সকল কথা জানিতে পারিয়া হৃষীকেশের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিল এবং সাশ্রুনয়নে তাহার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর হৃষীকেশ পূর্ব্বপ্রণয়ের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছায় সরমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনও পক্ষেরই অনিষ্ট হইল না। এইখানে গল্পেরও উপসংহার হইল।

মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপ ঘটনাধীন বা ভবিতব্যাধীন এই উপন্যাস পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। যুবক হৃষীকেশের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক; স্কুল কলেজে তিনি

বরাবরই সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়া আসিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ সংসারে শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সর্ব্ববিধ সুলক্ষণই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু একটা ঘটনায় সমস্ত মাটী হইয়া গেল। সরমার সহিত সাক্ষাৎ-রূপ কাল-ঘটনাতেই একটা ভাল লোকের জীবন নষ্ট হইয়া গেল। সংসারে ইহা নিত্যই ঘটিয়া থাকে। তুল্যরূপ গুণসম্পন্ন দুই ব্যক্তির একজন অনুকূল ঘটনায় পড়িয়া উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হয়, এবং অপর জন প্রতিকূল ঘটনায় পড়িয়া অবনতির নিম্নতলে পতিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, বাসর-শয়নে স্বাভাবিক ঘটনার অতি সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাসর-শয়নে স্ত্রীচরিত্র অধিক নাই। স্ত্রীচরিত্র মাত্র দুইটি,—সরমা ও লেখা। লেখা হৃষীকেশের এক সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর কন্যা। শৈশব হইতেই দুইজনে বেশ ভাব হইয়াছিল, এবং লেখার পিতাও হৃষীকেশের সহিত দুহিতার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রণয়ি-যুগলও আশা করিয়াছিল যে, একদিন তাহারা বাসর ঘরে সুখশয্যায় শয়ন করিবে। বোধ করি, সেই জন্যই গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'বাসর-শয়ন'। সে যাহা হউক, লেখার জননী দরিদ্রের পুত্রের সহিত তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। কাজেই ধনবানের সহিত লেখার বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর কয়েক মাসের মধ্যেই লেখা বিধবা হইল।

অতঃপর হৃষীকেশ সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভায় সপ্রমাণ করিলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। ইহাতে লেখার পিতা তাঁহার সহিত লেখার পুনর্বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হৃষীকেশ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন লেখা হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়া দানাদি লোক-হিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিল। গ্রন্থকার এইরূপে কেমন সুকৌশলে ব্রাহ্মকন্যা সরমার ও হিন্দুকন্যা লেখার চরিত্রের বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সরমা যদি ঐরূপ চঞ্চলচিত্ত না হইত, সে যদি 'এটা যায় যাউক, আমার আর একটা ত আছে' এইরূপ ভাবিয়া হৃষীকেশকে অসময়ে বিপৎকালে পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে তাঁহাকে কারাক্লেশাদি দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না, এবং আমরা তাঁহার জীবনস্রোত অন্য পথে প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাইতাম। এইখানেই হিন্দুরমণীর শ্রেষ্ঠতা। গ্রন্থকার অতি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাহারই চিত্র অতি বিশদ ও সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ

৩। **উড়িষ্যার চিত্র** নাম দিয়া একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় রাজ-কার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল উড়িষ্যার নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সেখানকার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এই চিত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই সকল চিত্রে তিনি উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থাসকল যতদূর সম্ভব অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এ চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। উড়িষ্যার যে সকল নরনারীর প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কতকগুলি বাস্তব, আর কতকগুলি কাল্পনিক হইলেও তাহাদের উপাদান সত্যমূলক। জনৈক কবি এই গ্রন্থ সমালোচনা কালে বলিয়াছেন :—"লেখক উড়িষ্যাকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশী দিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোকে জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্ব্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার জানিলেই জানানো যায় না। যতীন্দ্র বাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" আমরা এই সমালোচকের বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিতেছি।

১৮৯৬ হইতে ১৯০৩ পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের উপন্যাস সমালোচিত হইল। আর দুই বৎসরের উপন্যাস সমালোচনা করিবার পর নাটক শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর পুস্তকের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র

সাহিত্য-সংহিতা

(সাহিত্য সভার মাসিক পত্রিকা)

ষষ্ঠ খণ্ড ১৩১২ সাল।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল,

এফ, আর, জি, এস,

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত

২০৭।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, অন্তপুর প্রেসে,

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ টাকা।

সাহিত্য-সংহিতা।

১৩১২

কেশরঞ্জন তৈল।

সামান্যের বিশেষত্ব।

অর্শোরোগ শুনিতে সামান্য, কিন্তু অনেক সময়ে এই রোগে এত অধিক রক্তস্রাব হয় যে, তাহাতে প্রাণ বাঁচান কঠিন হইয়া উঠে। অর্শোরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। যথানিয়মে এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ ও তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূযাদির স্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়।

অর্শঃ হইয়াছে বলিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সেবন করিয়া দেখিবেন, কত অল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পারে।

অর্শোহর বটিকা এক কৌটায় চল্লিশটী ...ক; মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ... ৵০ তিন আনা।

... কেশরঞ্জন তৈল ...রেন।

... কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করেন।

নামজাদা ব্যারিষ্টারে কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করেন।

জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করেন।

...ঙ্গের কুললক্ষ্মীরা কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করেন।

...ঙ্গের প্রতি গৃহে কেশরঞ্জন তৈল সমাদৃত হইতেছে।

কেশ বৃদ্ধিতে কেশরঞ্জন তৈল অদ্বিতীয়।

আপনি এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করুন।

...ল্য প্রতি শিশি ... ১৲

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।৵০

অশ্বগন্ধার—অশেষ গুণ।

অশ্বগন্ধার গুণ। শাস্ত্রে অ... গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই তদ্ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে যে অনেক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানা দিক্ দেখিয়া আমরা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রভূত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। যাঁহাদের শরীর ধাতুগত পীড়ায় ক্ষীণ, যাঁহারা শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির হ্রস্বতা, এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রস্তুত "অশ্বগন্ধারিষ্ট" হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রভূমি করিয়া রাখেন? আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফলপ্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ সাত আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

৮১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "অন্তঃপুর প্রেসে" [illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। [১ম ও ২য় সংখ্যা।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস।

এবং

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা। } শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,

উদ্দেশ্য

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
[illegible]

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। [১ম ও ২য় সংখ্যা।

নূতন বর্ষ।

বার মাস ঘুরি ফিরি দেশ দেশান্তর,
ফিরে কি আসিলে ওহে বরষ নূতন!
দেখা দিতে সোহাগের চির পুরাতনে?
নূতনের দাস তুমি, সদা হাস্যময়,
শেষ বসন্তের ওহে প্রিয় সহচর,
হে বরষ, এস তুমি এসহে আবার,
চেয়ে দেখ কিছু তব নাহি পুরাতন।
ধরা-রাণী, ফল ফুল করি অলঙ্কার,
নবোদ্গম কিশলয়ে পরিয়া বসন;
শ্যাম শষ্পে পা দুখানি যতনে পাতিয়া—
বড় সাধে বিনাইয়া সুচিকণ বেশ,
সুরভি কুসুমে তোমা করি আবাহন,
বিদায় দিয়াছে তার চৈত্র বর্ষশেষ।
বেল বকুলের গাঢ় সুমিষ্ট সুবাস,
গরবিনী চম্পকের তিক্ষীণ সৌরভ,
সকলি জুটিছে আজি তোমারি আহ্বানে!
সুদীর্ঘ ধবলপুচ্ছ বিস্তারি হরষে
চূত-শাখে দেখা দেছে 'সাহেব বুলবুল'।
হেথা বউ কথা কও, হোথা খোকা হ'ক,
তোলপাড় করে সবে বনফল-ফুল।
মজা বিলে মরা ঘাস দেখিতে তোমারে
নূতন আশ্বাসে বুঝি গজাইয়া উঠি,—
"আয়—আয়" ডেকে ওরে নূতন বরষ
উল্লাসে মাতিয়া যেন পড়িতেছে লুটি!
চন্দ্রমা নূতন করি পরাইবে টিপ,
যুবতী বরিবে পুন দিয়ে সান্ধ্য-দীপ,
অই দেখ বজ্র পিছু চপলার হাসি,—
বরিতে তোমারে আজি দেখা দেছে আসি।
শান্তিহীন দীন বঙ্গ ব্যাধি সমাকুল,
উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ মুখে নাহি হর্ষ;
দাও শক্তি, দেশ-ভক্তি, আত্ম-বলিদান
পুণ্যমাস প্রকৃতির ওহে নব বর্ষ?

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আমাদের বেদ।

এই পরিদৃশ্যমান বিপুল মানবসমাজের আদিম অবস্থা কি, তাহা জানিবার জন্য অনেকের অন্তঃকরণেই কৌতূহলের উদ্রেক হইয়া থাকে এবং সেই কৌতূহলনিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বুদ্ধির অনুরূপ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কতিপয় পণ্ডিতের মত এই যে, মানবগণ পূর্ব্ব-সময়ে পশ্বাদির মত অনাবৃত গাত্রে ধরণীতলে

বৃক্ষের ফল প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং দেহের পরিপুষ্টি হইত, এমন কি তাহাদিগের পরস্পরের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপ ভাষাও সেই সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং অসভ্যজনোচিত "কাঁই মাই" শব্দ এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা তাহারা যথাকথঞ্চিৎ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিত এবং তাহাতেই তাহাদিগের জীবনযাত্রার উপযোগী ব্যবহার সম্পন্ন হইত। তাহারা ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত মত আর্য্যজাতির অনুমোদিত নহে, আর্য্যগণ আদিম অবস্থা নির্ণয় করিতে যাইয়া বেদবাক্যকেই প্রধান প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন. কারণ কেবল অনুমান দ্বারা এতাদৃশ বিষয়ের সম্পূর্ণ নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং দৃশ্যমান জগৎরূপ কার্য্যেরও একটা কারণ আছে, যে যে পদার্থের স্থূলত্ব এবং সাবয়বত্ব আছে, সেই সমস্ত পদার্থই কার্য্য, জগতেরও স্থূলত্ব এবং সাবয়বত্ব আছে, সুতরাং জগতও কার্য্য। এইরূপ সাধারণ অনুমান-বলে প্রথমতঃ জগতের কার্য্যত্ব স্থির করিয়া, আর্য্যগণ পরমেশ্বরকেই তাহার (জগতের) কারণরূপে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান এই পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াই বিরত, আর অধিকদূর অগ্রসর নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও, তিনি কি প্রণালীতে জগতের প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই বিশেষটুকু অনুমানের গম্য নহে। সেই বিশেষটুকু কেবল বেদবাক্য দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে। যেমন কোন একটী শিশু দেখিলে আমরা অনুমান-বলে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, ইহারও আমাদের মত মাতা পিতা আছে, কিন্তু সেই মাতা পিতার নাম কি, বাসস্থান কোথায়, বয়স কত, তাহারা আঢ্য কি দরিদ্র, এই সমস্ত বিশেষ জ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ। উপদেশ ব্যতীত অনুমানবলে ইহার বিন্দুমাত্রও বুঝিবার শক্তি নাই। সেইরূপ জগতের আদিম অবস্থাও উপদেশ ব্যতীত কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সেই সময়ে কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না; সুতরাং উপদেষ্টার অভাববশতঃ উপদেশের আশাও সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় আর্য্যঋষিগণ বেদবাক্যকেই সেই অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বেদ এবং বেদানুযায়ী গ্রন্থ পাঠে ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক সময় এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব ছিল না, কেবল সমস্ত কারণের কারণ ব্রহ্মপদার্থই বর্ত্তমান ছিলেন। সৃজ্যমান্ প্রাণিবর্গের পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে হিরণ্যগর্ভনামক সেই পরমেশ্বর মনের সৃষ্টি করিলেন, এই মনোদ্বারা মনস্বী হইয়া আমি ভূতবর্গের সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়েই প্রথমতঃ মনের সৃষ্টি হইল। অনন্তর সেই পরমেশ্বর বেদবাক্যের স্মরণপূর্ব্বক আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত স্ব স্ব অর্দ্ধাংশ এবং অন্যান্য ভূতের অষ্টমাংশের মিশ্রণে স্থূলভূত বা মহাভূতরূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বকালে যে প্রাণীর যে নাম এবং যেরূপ স্বভাব ছিল, তদনুসারেই বর্ত্তমান জগতের প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। পরমেশ্বর প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই মৌলিক চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর সেই মৌলিকজাতির সংমিশ্রণে নানাবিধ সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাই শরীরিরূপে প্রাদুর্ভূত

হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে চারিবেদ গীত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞানরাশি—বেদমধ্যেই মানবগণের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক প্রয়োজন সম্পাদনের যাবতীয় উপায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। আদিশরীরী ব্রহ্মাই বেদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। কোন ঋষি ব্রহ্মার মন হইতে এবং কেহ কেহ অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ঐ সমস্ত ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকটেই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদি অধস্তন সন্ততিগণও সেই মহর্ষিগণের নিকটেই বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশঃ বেদচর্চ্চার বিস্তৃতি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের মন হইতে এবং হস্তাদি অবয়ব হইতে মানবের উৎপত্তি আপাতদৃষ্টিতে অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হইলেও বিচারদৃষ্টিতে তাহা সুসঙ্গতরূপেই প্রতিভাত হইবে। কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বাংশে লৌকিক দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে না, ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে লৌকিক কার্য্য—কারণভাবের অনুবর্ত্তী হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বই সম্ভবপর হয় না, ভক্তপ্রবর পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন ;—

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং,
কিমাধারোধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থোহতধিয়ঃ,
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥"

ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কিরূপ শরীর ধারণ করিয়া কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এবং কোন্ আধারে স্থিত হইয়া এই ত্রিভুবন নির্ম্মাণ করেন, হে পরমেশ্বর! ঈদৃশ আমার কুতর্ক যাহা অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশালী তোমাতে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে, তাহা জগতের মোহের নিমিত্ত কতক লোকের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কোনও একটা ফলের অভিপ্রায়েই প্রবৃত্ত হয়। সেই প্রবৃত্ত পুরুষ শরীর দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কার্য্যসম্পাদনার্থ সেই পুরুষ নানাবিধ যন্ত্র প্রভৃতি উপায়ের অবলম্বন করে। কোনও আধারে উপবিষ্ট হইয়াই কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং কার্য্যনিষ্পাদনের উপযোগী উপাদানকারণের সাহায্যেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিতে এইরূপ প্রণালী কোথায়? যে সময়ে রাত্রি নাই, দিন নাই, আকাশ নাই, বায়ু, জল, তেজ, পৃথিবী প্রভৃতি কোন পদার্থই নাই, ঐ সময়ে তিনি কি উপাদানে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? তিনি কোথায় দাঁড়াইয়া এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ করিলেন, মানব তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে সমর্থ নহে। মানুষ সমর্থ নহে, কিন্তু তাহার কৌতুকের নিবৃত্তি হয় কিসে? এই কৌতুক নিবৃত্তির জন্ত বেদই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ অচিন্ত্য-রচনারূপং মনসাপি জগৎখলু" যে বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার যোগ্য নহে, মানুষের বুদ্ধিবলে যাহার নির্ণয় হইতে পারে না, এমন বিষয়ে তর্কের অবতারণা করিবে না, জগতের নির্ম্মাণ প্রণালী মনেও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ঐ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক করা চলে না। এই কথায় বুঝিলাম কি? বুঝিলাম, এই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই জগৎ-নির্ম্মাণের অসাধারণ হেতু। তিনি ইতর কারণে নিরপেক্ষ, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিই নির্ম্মিতির একমাত্র মূল, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হইয়া থাকে, যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। এই জন্তই দার্শনিকগণ জন্ত পদার্থ মাত্রের প্রতি ঈশ্বরেচ্ছার কারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সৃষ্টজগতের অন্তঃপাতী

মানবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য তাঁহার মুখ হইতে বেদের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রবহমাণ জগৎ অনাদি, বেদও অনাদি, সুতরাং বেদের ভাষাই আদিম মানবের ভাষা। মানুষ হীন অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই, প্রত্যুত উন্নতাবস্থা হইতেই হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মার মন হইতে বশিষ্ঠ প্রভৃতির উৎপত্তি এবং অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত ঈশ্বরোৎপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ছিল। শাস্ত্রে তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য-দার্শনিকগণ অসন্দিগ্ধচিত্তে এই সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠেই তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। মহাত্মা উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন;—"জন্ম-সংস্কার-বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণোঃ-হ্রাস-দর্শনতো · হ্রাসঃ সংপ্রদায়স্য জীয়তাং।" জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, স্বাধ্যায়, এবং কর্ম্মের হ্রাস দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু বেদ পাওয়া যায়, তাহাও এক সময়ে বিনষ্ট হইবে। কারণ যে বস্তুর হ্রাস দেখা যায়, তাহার সমুচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। উক্ত শ্লোকের বিবরণে লিখিয়াছেন;—"পূর্ব্বং হি মানস্যঃ প্রজাঃ সমভবন্ ততোঽপত্যৈক-প্রয়োজন-মৈথুনসম্ভবাঃ ততঃ কামাবর্জ্জনীয় সন্নিধি জন্মানঃ—ইদানীং দেশকালান্ত ব্যবস্থয়া পশু ধর্ম্মাদেব ভূয়িষ্ঠাঃ।" পূর্ব্বকালে মন হইতেই প্রজা অর্থাৎ সন্তানের উৎপত্তি হইত, তৎপরে সন্তানমাত্র—প্রয়োজন সঙ্গমে উৎপন্ন হইত, তৎপরে উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ অনিষিদ্ধ সময়ে সঙ্গমজনিত সন্তান জন্মিত; বর্ত্তমান সময়ে দেশ কাল বিচার না করিয়া পশুদিগের ন্যায় ব্যবহারে জন্ম হইতেছে।

অন্যান্য আস্তিক গ্রন্থকারগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-সময়ের মানবগণ বর্ত্তমান সময়ের মানবগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল। ক্রমশঃ মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে। সুতরাং আদিম মানবজাতি অসভ্য ছিল, তাহাদিগের কোন প্রকার সভ্যজনোচিত ভাষা ছিল না, এইটী আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত নহে। আদিম মানবগণ বৈদিক ভাষা দ্বারাই কথোপকথন করিত, তৎপরে ক্রমশঃ মানবজাতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে আদিম ভাষা হইতে ম্লেচ্ছভাষা বা অপভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে এই দ্বিবিধ ভাষারই উল্লেখ দেখা যায়।

বেদ বলিতে আমাদের প্রাচীন মনীষিগণ কি বুঝিতেন, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে। আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণের মতে বেদবাক্য নিরপেক্ষ প্রমাণ। বেদের প্রামাণ্য এবং স্বরূপ সম্বন্ধে আর্য্য দার্শনিকদিগের মতই প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দার্শনিকগণ স্বাধীন চিন্তার বশবর্ত্তী হইলেও আর্য্য দার্শনিকগণ সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ স্বাধীন মত প্রকাশে সমর্থ নহেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে অবনত মস্তকে বেদবাক্যকে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বেদের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিবার শক্তি এবং সাহস নাই। এক শব্দের নানাপ্রকার অর্থ থাকিলেও যে অর্থ চিরপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাদির সহিত সঙ্গত হয়, তাহাই যে গ্রহণযোগ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং যাঁহারা আবহমানকাল পুরুষানুক্রমে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারাই যে বেদের যথার্থ প্রকাশে একমাত্র সমর্থ, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যুক্তিপ্রধান আন্বীক্ষিকী

শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র প্রণেতা প্রাচীনতম ভগবান্ গৌতম ঋষির মতের উল্লেখ করা যাউক। গৌতমের মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। এই চারি উপায়ের অন্যতম দ্বারাই মনুষ্যের প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের তৃতীয় সূত্র "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই সূত্রে প্রমাণ চতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশের ৭ম সূত্রে শব্দের লক্ষণ অর্থাৎ কীদৃশ শব্দ প্রমাণরূপে গ্রহণীয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" আপ্ত ব্যক্তির উপদেশশব্দ প্রমাণ। যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎরূপে জানিয়াছেন, যিনি নিজের পরিজ্ঞাত বিষয় যথার্থরূপে উপদেশ করেন, তাঁহারই নাম আপ্ত এবং তাঁহার উপদিষ্ট বাক্যই আপ্তবাক্য বা শব্দপ্রমাণ। অষ্টম সূত্রে এই শব্দপ্রমাণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা "সদ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ" সেই আগম দুই প্রকার, দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। যে বাক্যদ্বারা লৌকিক ব্যবহার সম্পন্ন হয়, তাহার নাম দৃষ্টার্থ, এবং যদ্দ্বারা অলৌকিক পদার্থ অর্থাৎ পাপপুণ্যাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম অদৃষ্টার্থ। অলৌকিক পাপপুণ্যাদির পরিজ্ঞাপক বেদবাক্য, সুতরাং অদৃষ্টার্থ আগমশব্দে বেদবাক্যই অভিহিত হইয়াছে।

এইভাবে প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে অদৃষ্টার্থ আগমের অর্থাৎ বেদবাক্যের উদ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা সময়ে বেদবাক্যের বিশেষরূপে বিভাগ করিয়াছেন। যথা "বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ" বিধি অর্থবাদ এবং অনুবাদ এই তিন ভাগে ব্রাহ্মণ বাক্য বিভক্ত। "বিধির্ব্বিধায়কম্"। যে বাক্য কর্ত্তব্য বিষয়ে মনুষ্যকে প্রবৃত্ত করে, তাহার নাম বিধি। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" যাহার স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা থাকে, সেই মানব অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ করিবে। "স্তুতির্নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ" স্তুতি নিন্দা পরকৃতি এবং পুরাকল্প এই চারি প্রকার অর্থবাদ। বিধির অর্থাৎ বিধেয় কর্ম্মের ফল বিশেষের উল্লেখ করিয়া প্রশংসাকারক যে বাক্য, তাহার নাম স্তুত্যর্থবাদ। "সর্ব্বজিতাবৈ দেবাঃ সর্ব্বমজয়ন্ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্য জিত্যৈ সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি সর্ব্বং জয়তি।" দেবগণ সর্ব্বজিৎ নামক যজ্ঞদ্বারা সমস্তকে জয় করিয়াছিলেন। যিনি সমস্তকে পাইতে এবং সমস্তকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ করিবেন, ইহা দ্বারা সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সমস্তকেই জয় করা যায়। এই বাক্য দ্বারা "সর্ব্বজিতা যজেত" অর্থাৎ সর্ব্বজিৎ নামক যাগ করিবে। এই বিহিত কর্ম্মের ফলকীর্ত্তন দ্বারা প্রশংসা করা হইয়াছে, সুতরাং এইটী স্তুত্যর্থবাদ। অনিষ্ট ফলের প্রকাশক বাক্যের নাম নিন্দার্থবাদ। যেমন "স এষ বা প্রথমো যজ্ঞোযজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমো য এতেনানিষ্ট্বাঽন্যেন যজতে গর্ত্তে পততি"। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমই প্রথম অর্থাৎ প্রধান যজ্ঞ। যে জন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ না করিয়া অন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি গর্ত্তে পতিত হয়। এই বাক্য দ্বারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অকরণে অনিষ্টফলের উক্তি দ্বারা নিন্দা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইটী নিন্দার্থবাদ। যেস্থলে নিজের মত প্রকাশ করিয়া অন্যের মত প্রকাশ করা হয় এবং তাহার উপর কটাক্ষ করা হয়, তাহার নাম পরকৃতি। যেমন "হুত্বাবপামেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং তদুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেঽভিঘারয়ন্তি অগ্নেঃ প্রাণাঃ

পৃষদাজ্যং স্তোমমিত্যেব মভিদধতি"। হবন অর্থাৎ হোমের অনন্তর বপাকেই প্রথমতঃ ধারণ করিবে, তৎপরে পৃষদাজ্য গ্রহণ করিবে। চরক নামক ঋত্বিগ্‌গণ পৃষদাজ্যকেই প্রথম গ্রহণ করেন, পৃষদাজ্য অগ্নির প্রাণ এই কথা বলিয়া থাকে। এই বাক্যটী পরকৃতি। ঐতিহ্যবৃত্তান্তযুক্ত বাক্যের নাম পুরাকল্প। যেমন "তস্মাদ্বা এতেন পুরা ব্রাহ্মণাবহিঃ পবমানঃ সামস্তোমমস্তৌষন্‌ যজ্ঞং প্রতনবামহ"। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ বহিঃপবমান নামক সামস্তোম গান করিয়াছিলেন।

"বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ" বিধিবাক্য দ্বারা যাহার বিধান করা হইয়াছে, সেই বিষয়ের পুনশ্চপ্রকাশক বাক্যের নাম অনুবাদ। এই প্রকারে মহর্ষি গৌতম বেদের ব্রাহ্মণভাগের উল্লেখ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণাংশের প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্ত্রভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" বিষভূত বজ্রনিবারক মন্ত্রের যেরূপ প্রামাণ্য, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকল তত্তৎ রোগ বিনাশে সমর্থ, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের যেমন প্রামাণ্য, সেইরূপ সমস্ত বেদবাক্যই প্রামাণ্যযুক্ত, যেহেতু আপ্তপ্রামাণ্যের উভয় স্থলেই তুল্যতা আছে, অর্থাৎ যে পরমেশ্বর আয়ুর্ব্বেদের এবং মন্ত্রের বক্তা, তিনিই বেদের অন্যান্য অংশেরও বক্তা, আয়ুর্ব্বেদের এবং মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ, সুতরাং প্রত্যক্ষবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। আপ্তকথিত এক অংশের যদি প্রামাণ্য স্থির হয়, তবে অন্যাংশেরও প্রামাণ্য অনুমিত হইতে পারে। এই স্থলে একটী কথার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, ভারতীয় প্রাচীন মনীষিগণের যেরূপ বিশ্বাস ছিল, আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ বা বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মহর্ষি গৌতম এত বড় দার্শনিক হইয়াও আয়ুর্ব্বেদের ঔষধের ন্যায় মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদত্ব স্বীকার করিলেন, অন্ততঃ ২৫ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভূতাশনিপ্রতিষেধার্থানাং" অর্থাৎ বিষভূত বজ্রনিবারক মন্ত্র সকলের, দার্শনিক হইয়া ভূত স্বীকার করা, এবং মন্ত্রবলে ভূত ছাড়ান, বিষের শক্তি মন্ত্র দ্বারা নষ্ট করা, ইত্যাদি আপাততঃ অসম্ভাব্য বিষয় তাহাদের অন্তঃকরণে কি প্রকারে স্থান পাইত।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে আস্তিকতা এবং নাস্তিকতাই অলৌকিক বিষয়ের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূল। আস্তিক এবং নাস্তিকের বিশ্বাসগত তেজস্তিমিরবৎ পার্থক্য, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কারিরী প্রভৃতি অনেক যাগ আছে, যাহা দৃষ্টফলক। কারিরী যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া অনেক প্রাচীন মনীষি স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৃদ্ধনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, আমার পিতামহ গ্রামকামনায় যজ্ঞ করিয়া রাজার নিকট হইতে গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত আছি। সুতরাং অলৌকিক বিষয়ের বিশ্বাসই যদি বর্ব্বরতার পরিচায়ক হয়, তবে ভারতীয় সমস্ত আস্তিক গ্রন্থকারগণই একাসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অধিক আলোচনা করিব না। প্রকৃত বিষয়ের বহুতর বক্তব্য আছে। মহর্ষি গৌতম মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় ভাগকেই সমান চক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসক ভগবান্‌ জৈমিনির মত সম্প্রতি প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" ২।১।৩০। বিহিত কর্ম্মেতে সম্বন্ধ পদার্থের অর্থাৎ দেবতাদ্রব্যাদির

বোধক বেদভাগের নাম মন্ত্র। "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ"। ২।১।৩১।

মন্ত্র ভিন্ন বেদ ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। এইরূপে প্রথমতঃ বেদবাক্যকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মন্ত্রভাগের ঋক্ সাম প্রভৃতি বিভাগ করিয়াছেন। যথা "ঋক্ যত্রার্থ বশেন পাদব্যবস্থা" ।২।১।৩৪।

যেস্থলে ছন্দের অনুসারে পাদবিভাগ অর্থাৎ অংশ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহার নাম ঋক্। "গীতিষুসাম" ।২।১।৩৪।

যে ঋক্ স্বরসংযোগে গীত হয় তাহার নাম সাম। "শেষে যজুঃ শব্দঃ"।

ঋক্ এবং সাম ভিন্ন বেদের নাম যজুঃ। অর্থাৎ যজুতে ছন্দ নাই। এই প্রকারে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীনতম ভাষ্যকার শবর স্বামী বলিয়াছেন ;—"মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বেদঃ" মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ। সামান্য ধর্ম্মযুক্ত যে পদার্থ, তাহারই পরস্পর বিরুদ্ধব্যাপ্যধর্ম্ম পুরস্কারে প্রতিপাদনের নাম বিভাগ। বেদস্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়েতেই আছে, সুতরাং সেই বেদস্বরূপ সামান্য ধর্ম্মাক্রান্ত বাক্যনিচয়েরই পরস্পর বিরুদ্ধ মন্ত্রত্ব এবং ব্রাহ্মণত্বরূপ ব্যাপ্যধর্ম্মরূপে প্রতিপাদন অর্থাৎ জ্ঞাপনরূপ বিভাগ হইয়াছে। ঋক্ প্রভৃতির যে লক্ষণ জৈমিনি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল প্রাচীনতম ঋষিগণের ভূরি ব্যবহার অর্থাৎ এই লক্ষণযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ বলা হয় এবং সাম বলা হয় ইত্যাদি ব্যবহারানুসারেই জৈমিনি তত্তন্নামে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্তি দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন ;—"এবং জাতীয়কেষু মন্ত্রেষু অভিযুক্তা উপদিশন্তি ঋচোঽধীমহে ঋচোঽধ্যাপয়ামঃ ঋচোবর্ত্তন্তে ইতি"।

এই জাতীয় মন্ত্রেতে (অর্থাৎ যাহাতে পাদবিভাগ আছে অগ্নিমীলে ইত্যাদি) নিপুণগণ উপদেশ করিয়া থাকেন যে, আমরা ঋক্ অধ্যয়ন করি, আমরা ঋক্ অধ্যাপনা করি, ঋক্ বর্ত্তমান ইত্যাদি। মীমাংসকাচার্য্য মহর্ষি জৈমিনির মতে বেদের যে স্বতঃ প্রমাণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত বিধিবাক্যেরই—অন্য ভাগের নহে। তিনি বলিয়াছেন, "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ তস্যজ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" ১।১।৫

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাব নিত্য, অতএব এই নিত্য সম্বন্ধানুসারেই বেদবাক্য অর্থাৎ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বাক্য ধর্ম্মের প্রতিপাদক। যে হেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অনুপলব্ধ অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ কিনা বেদবাক্য জন্য বোধ, অব্যতিরেক অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের অব্যভিচারী, অতএব অন্যের অনপেক্ষরূপে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে বিধিঘটিত বাক্য ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ। বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাসদেবের এই মত। এই প্রকারে বিধি বাক্যের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থির করিয়া তদতিরিক্ত বেদভাগের অর্থাৎ অর্থবাদ অংশের প্রামাণ্যের প্রতি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা দানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" কর্ত্তব্য প্রতিপাদক বেদভাগেরই প্রমাণত্ব, অতএব কর্ম্মের অপ্রতিপাদক বস্তু মাত্র বাচী অর্থবাদভাগ অনর্থক, সুতরাং তাহা ধর্ম্মের প্রতি প্রমাণ হইতে পারে না। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন, "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতারূপে বিধেয় কর্ম্মের স্তুতি দ্বারা অর্থবাদ বাক্য ধর্ম্মবিষয়ে

প্রমাণ। এইরূপ মন্ত্র সম্বন্ধেও পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া দ্রব্যাদির প্রতিপাদকত্বরূপেই মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, বিধি-বাক্যের মত স্বতঃপ্রামাণ্য স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রদর্শিত জৈমিনি সূত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই তিনি আম্নায় শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কেবল মন্ত্রকে বেদ-সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝেন নাই। এবং বেদের যে অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ের পক্ষেই কেবল মন্ত্রভাগের নহে। কারণ তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে বেদবাক্যকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে বেদবাক্যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ ভাগে-রই অন্তর্গত। এবং বেদ ভিন্ন প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহাও তৎকর্ত্তৃক উক্ত হই-য়াছে। জৈমিনি প্রথমতঃ "চোদনালক্ষণোঽ-র্থোধর্ম্মঃ" ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য অর্থাৎ কুর্য্যাৎ কর্ত্তব্যং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম। এই সূত্রদ্বারা বেদমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্ম্মত্ব স্থির করিয়া অন্য প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কেন ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধি জন্ম তৎপ্রত্যক্ষং অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভন-ত্বাৎ।" ১।১।৪। সৎপদার্থে অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুতে মানবের ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ, সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা, ভবিষ্যৎকালে ধর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে, জ্ঞান সময়ে ধর্ম্মের অস্তিত্বই নাই। বিদ্যমান বস্তু প্রকাশক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবিদ্যমান অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সত্তাশালী ধর্ম্মনির্ণয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এইরূপ অনুমান এবং উপমানাদি প্রমাণও ধর্ম্মের নির্ণায়ক হইতে পারে না। কারণ অনুমানাদি সমস্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক, যেস্থলে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহ-চার দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই হেতু দর্শনে সাধ্যের অর্থাৎ কার্য্যের অনুমান হয়। যেমন বহ্নি ও ধূমের সহভাব অর্থাৎ একত্র স্থিতি বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ধূম মাত্রের দর্শনে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে ঈদৃশ সাহচর্য্য নাই, কাজে কাজেই তাহাতে অনুমানাদি খাটিতে পারে না। ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মের আপ্তোপদেশমাত্র গম্যত্ব, অর্থাৎ কেবল শব্দপ্রমাণ বিষয়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। বেদে ব্যক্তিবিশেষের নাম দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী বেদের আধুনিকত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইঁহারাই যে কেবল আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণও ইহাতে নীরব ছিলেন না। তবে উভয়গত পার্থক্য এই যে মহর্ষিগণের যাহা পূর্ব্বপক্ষ পাশ্চাত্যগণের তাহাই নির্ণয়। মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ সূত্র "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ।" ১।১।২৭। বেদ পুরুষ-কৃত অর্থাৎ মানবকৃত, সুতরাং বেদ প্রমাণ হইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ কাঠ কালাপক নামে অভিহিত। কঠকর্ত্তৃক উক্ত অংশ কাঠ, এবং কলাপক কর্ত্তৃক উক্ত অংশ কালাপক, ইত্যাদি নিরুক্তি দ্বারাই বুঝা যায় যে বেদের ঐ ঐ অংশ মনুষ্যবিশেষ প্রোক্ত।

অনিত্য দর্শনাচ্চ।" ১।১।২। কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে, "বর্ব্বরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত" বর্ব্বর প্রাবাহনি অর্থাৎ প্রবহনের অপত্য কামনা করিয়াছিলেন। উক্ত স্থলে অনিত্য অর্থাৎ জন্মমরণশীল প্রবহন পুত্রের উল্লেখ

আছে, সুতরাং বেদ অনিত্য। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বকত্বং।" ১।১।২৯। আমরা অধ্যেতৃদিগের শব্দ পূর্ব্বকত্ব বলিয়াছি। অর্থাৎ বেদবাক্য নিত্য, ঋষিগণ কেবল তাহার অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন। তবে কাঠ কালাপক প্রভৃতি সংজ্ঞা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "আখ্যাপ্রবচনাৎ।" ১।১।৩০। কঠকলাপ প্রভৃতি ঋষিগণ অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ঐ অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তত্তৎশাখার নাম কাঠ এবং কালাপক হইয়াছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

জাতিভেদ।

(১) বেদ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসম্প্রদায়ের মূলকারণ, তাহা আবার জাতিভেদভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ কাল্পনিক বা সামাজিক বিদ্বেষমূলক নহে, জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত, বেদ পুরাণেতিহাসাদি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুসরণে ভারতবর্ষে জাতিভেদ, অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। জাতিভেদ-বিদ্বেষিগণ, নানারূপ কৌশল ও বিবিধ কূট তর্ক উত্থাপন করিলেও শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু-সন্তানগণ অদ্যাপি অচল অটল ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন। নিন্দকের দুরভিসন্ধিপূর্ণ অসার তর্কাবলীর প্রবল মায়াজাল অতিক্রম করিয়া এখনও তাঁহারা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রেখামাত্রও অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নহেন।

কারণ বর্ণাশ্রমিগণ স্বভাবতঃ বৈদিক প্রাণে অনুপ্রাণিত; বৈদিক উপদেশরূপ অভেদ্য বর্ম্ম প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণ হইতে আজও তাঁহাদের রক্ষা বিধান করিতেছে। যাঁহাদের বিবাহে বেদ, গর্ভাধানে বেদ, জাতকর্ম্মে বেদ, উপনয়নে বেদ, শ্রাদ্ধে বেদ, অগ্নিকার্য্যে বেদ, এমন কি, যাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক নিখিল কার্য্যেই শাস্ত্রানুশাসনে বেদ মন্ত্রোচ্চারণে সুসম্পন্ন হয়; ঐহিকে, পারলৌকিকে, জননে-মরণে সর্ব্বত্রই অচিন্ত্যপ্রভাব বেদের একাধিপত্য, তাদৃশ জাতির প্রতিকূলতায় কুতার্কিকগণ, প্রতি পদেই যে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ অবস্থায় প্রতিবাদিগণ কিরূপ কৌশলে সাম্যবাদ স্থাপন করিবে? কিরূপেই বা বেদ-বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় প্রাকার অতিক্রম করিয়া সুরক্ষিত হিন্দুরাজ্যে স্বকীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দুগণের বেদবিশ্বাস কুণ্ঠিত না হইলে, তদীয় ধর্ম্মরাজ্যের জাতিভেদ নামক আধার ভিত্তি বিপাটিত হইবে না; জাতিভেদ বিধ্বস্ত না হইলে হিন্দুরাজ্য বর্ণাশ্রমাচার-ধর্ম্ম-বিধৃত এ স্বর্গীয় রাজ্য, কল্পান্তমগ্না বসুন্ধরার ন্যায় অতল জলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইবে কেন?

জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে, সুমেরু সর্ষপে ইন্দ্র গর্দ্দভে, অমৃত মূত্রে, গিরি সমুদ্রে, এক হইয়া যাইবে; তৎকালে জগৎ একার্ণবীকৃত উচ্চনীচাদি প্রভেদশূন্য! শাস্ত্রানুসারে ইহাই প্রলয়াবস্থা। অভেদবাদী পণ্ডিতগণ, অকালে মহাপ্রলয়সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অধুনা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর উৎকট তর্কবিজৃম্ভিত অসার উপদেশে বর্ণা-

প্র... হিন্দুসন্তানগণের বেদবিশ্বাস উন্মূলিত হইবে না, তাহাতেই উপায়ান্তরবিরহিত হইয়া নিগূঢ় যুক্তি উদ্ভাবন করিলেন, "কণ্টকেনাপি কণ্টকম্।"

যে বেদবাক্যে হিন্দুগণের অভ্রান্ত বিশ্বাস, ঐ বেদানুসরণেই তাহাদিগকে সন্দিগ্ধ ও দিগ্‌ভ্রান্ত করিতে হইবে; তাহা হইলে জাতিভেদ আপনা আপনি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এই অভিসন্ধি মূলেই প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতেছেন, "বেদ ঈশ্বরকৃত নহে, বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্নকালে বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত ও বহুকালের পর বেদব্যাস নামক কোনও পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে পরে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে যে পুরুষ সূক্তের—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি মন্ত্রে জাতিভেদের স্পষ্টতঃ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ পুরুষসূক্ত, নিতান্ত আধুনিক রচিত; কারণ, প্রাচীন মন্ত্রসমূহের সহিত ভাষাগত বৈজাত্য থাকায় পাশ্চাত্য. পণ্ডিতগণও উহা পশ্চাদ্রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন।" আমরা বলি পুরুষসূক্তের সহিত "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি প্রতিবাদ কথিত মৌলিক মন্ত্রসমূহের ভাষাগত বৈচিত্র্য কি? উভয় মন্ত্রের অর্থই ত একান্ত দুর্ব্বোধ নহে, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে উভয় মন্ত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। অথবা ভাষাগত বৈজাত্য থাকিলেই যে বিভিন্ন কালিক বা বিভিন্ন কর্ত্তৃক রচনা বলিতে হইবে এ কথা কিরূপে স্বীকার করিব?

যে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

এইরূপ ভাবকাঠিন্যপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তিনি আবার উক্ত অধ্যায়েই—

নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি শ্লোকে কতরূপ বৈচিত্র্য পূর্ণভাব ও ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, ঐ সকল শ্লোক ব্যাসদেবের সমকালিক রচনা নহে? স্বর্গীয় ভূদেব বাবু প্রভৃতি সুলেখকগণের সাহিত্যিক ও পারিবারিক প্রবন্ধের ভাষাগত বৈচিত্র্য দর্শন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিষয় ভেদে রচনার ভেদ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, পুরুষ সূক্ত যেমন সর্ব্বজন প্রয়োজনযোগ্য অর্থের বোধক; সুতরাং তদীয় রচনা আপেক্ষিক সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাতে আর নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিয়া কি হইবে?

প্রতিবাদিগণ যে বেদ পুরাণাদি আর্য্য শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক জাতিভেদের প্রতিকূলে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, ঐ শাস্ত্রই আবার বেদমন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

স তপোঽতপ্যত, তস্মাৎ তপস্তপনাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থ;—তিনি তপস্যা করিলেন, তদীয় তপঃপ্রভাবে বেদত্রয় সমুৎপন্ন হইল; আর বেদ মন্ত্রের উপর যে ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও বেদমন্ত্রের রচয়িতা নহেন, মাধবাচার্য্য বলেন, "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" নিরুক্তকার আচার্য্য যাস্ক বলেন, "ঋষির্দর্শনাৎ" যে মহাপুরুষ যে মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহার ঋষি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন ;—

মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা, যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ॥

পরমেশ্বর হইতে মন্ত্র অবগত হইয়া যিনি নিজ তপস্যাবলে তাঁহাকে সিদ্ধ করেন, তিনিই উক্ত মন্ত্রের ঋষি বা প্রচারক। সুতরাং বেদ ঋষিগণের রচিত নহে, চাষার গীতিও নহে বেদ অচিন্ত্যমহিম তপঃপ্রভাবে হিরণ্যগর্ভের নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদান্তদর্শন অনুমান করেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ॥ ৩ ॥

বেদান্তদর্শন—১ অঃ ১ পাঃ ৩ সূঃ।

মহত ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বকল্পস্য, যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য, সর্ব্বজ্ঞ-গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, সততোঽপ্যধিকতরবিজ্ঞান, ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদ-ভিন্নস্য, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণ–বর্ণাশ্রমাদি–প্রবিভাগ--হেতো ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানা-করস্য, অপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্ যস্মাৎ মহতো ভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইতি শ্রুতেঃ। শাঙ্করভাষ্য।

অর্থ ;—ঋগ্বেদ্ মহাশাস্ত্র নানা বিদ্যার আকর, সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতুল্য ; সেই ঋগ্বেদ প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন অসর্ব্বজ্ঞ হইতে এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত মহৎ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যে পুরুষ হইতে যে বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে সে পুরুষের সে শাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান থাকে ; ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব অসংখ্য শাখাসমন্বিত দেব তির্য্যক্‌মনুষ্যবর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু সর্ব্বজ্ঞানের আকর ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে মহান্ ভূত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, সে মহান্ ভূত যে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, ইহা বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে মহান্ ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রুতিও বলিতেছেন ; "যাহা ঋগ্বেদ, তাহা সেই মহান্ ভূত হইতে নিশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে উৎপন্ন হইয়াছে।

সুতরাং বেদমন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিলেন, অশেষ বেদবিজ্ঞানপ্রবুদ্ধ প্রাজ্ঞ বেদান্তকর্ত্তা ব্যাসদেব যেরূপ অনুমান করিলেন, আর ভাষ্যকার শঙ্করাবতার (স্বামী) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহা যেরূপ প্রতিপাদন করিলেন, তাহাতে মাদৃশ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি বেদকে ঋষিগণের কবিত্বশক্তিপ্রস্ফুরিত নাটক নভেলাদির ন্যায় না বলিয়া ঈশ্বরবাক্যরূপে বিশ্বাস করিলে কোনও অপরাধ হইতে পারে কি ?

কনাদঋষি বলেন,—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"। ৩॥ প্রথম অঃ ১ আঃ।

বৈশেষিক দর্শন।

"তদ্বচনাত্তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্"॥ উপস্কারঃ।

ঈশ্বর বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদ 'আর্য্যগণের রচিত' এ কথা গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না।

বেদের ঈশ্বরকর্ত্তৃকত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

অগ্নে ঋগ্বেদো বায়ো র্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ-

শতপথ ব্রাহ্মণ কাঃ ১১, অঃ ৩ প্রাঃ ২।

জগদীশ্বর, সৃষ্টি প্রারম্ভে অগ্নি বায়ু ও

আদিত্য এই তিন জন (শিক্ষক) ঋষি দ্বারা বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আর মহর্ষি মনুও এই ব্রাহ্মণভাগের ছায়া লইয়াই বলিতেছেন ;—

অগ্নি বায়ু রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্ যজুঃ সামলক্ষণম্॥২৩
মনুসংহিতা। ১ম অধ্যায়।

পূর্ব্বকল্পে যে বেদা স্তু এব পরমাত্মমূর্ত্তে ব্রহ্মণঃ স্মৃত্যারূঢ়াঃ। তানেব কল্পাদৌ অগ্নি বায়ু রবিভ্য আচকর্ষ। ইতি কুল্লুকভট্টঃ।

ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মা, কল্পারম্ভে অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্যনামক দেবতা দ্বারা পরমাত্মা হইতে বেদ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদ শ্রবণরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

উপনিষদ্ বলেন—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ
* * *

শ্বেতাশ্বর উপনিষদ্—৬ অঃ, ১৮ পংক্তি।

যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্ন্যাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন, সেই পরম ব্রহ্মকে আমরা সাদরে নমস্কার করি ইত্যাদি।

সুতরাং বেদ বলিলে বিস্তারত্ন মহাশয়ের টোলের কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি বুঝিবেন না, অথবা বারিষ্টার মহাশয়ের হাতের চক্‌চকে মলাট কেতাব বুঝিবেন না। মাধবাচার্য্য স্বীয় বেদভাষ্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "অনধিগতবাধিতার্থবোধকঃ শব্দো বেদঃ" যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, এইরূপ পদার্থ জ্ঞাপনার্থ প্রবৃত্ত শব্দকে বেদ কহে। বেদ বলিলে ব্রহ্মবিদ্যা বা বিশ্ববিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ, ঋষিপরম্পরাক্রমে সম্প্রসারিত হইলেও যিনি সেই জ্ঞানের প্রকাশক এবং প্রেরক সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই বেদদ্রষ্টা বলা উচিত। এইরূপেই বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদ স্বতঃ প্রমাণ ভ্রমপ্রমাদযুক্ত মনুষ্য রচিত নহে, ইহাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

২। আর প্রতিবাদিগণের এ কথাও অগ্রাহ্য যে, "পুরুষসূক্ত নামক আধুনিক মন্ত্র ভিন্ন ঋক্‌বেদের অন্য কোনও মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতির উল্লেখ নাই। কিন্তু, দেখিতে পাই, ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এস্থলে আমি একটী মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ইমে যে নার্ব্বাঙ্ নপরশ্চরন্তি
ন ব্রাহ্মণাসো নসুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্যপাপয়া
সিরীস্তন্ত্রং তম্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ।
ঋগ্বেদ অঃ ৮।২।২৪।১।

ভাবার্থঃ—যাহারা বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি ইহকালের কি পরকালের উন্নতি না করিয়া ব্রহ্মধ্যানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ নামের এবং প্রজ্বাহিত চিন্তাদি দ্বারা করাস (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়) নামের সার্থকতা না করিবে, তাদৃশ জড়স্বভাব মূর্খগণ ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণাদির অনর্হ, ক্ষেত্রকর্ষণরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক। ইত্যাদি মন্ত্রেই স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ বহুসহস্রমন্ত্রসমন্বিত বিপুল ঋক্‌বেদের স্থানে স্থানে বহুবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, এখন বৈদিককাল নহে, আমাদেরও তাদৃশ বেদচর্চ্চা নাই। সুতরাং স্বাধীনভাবে বেদ সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করিয়া কি হইবে? সম্প্রতি ঘোর তামস কলিকাল মানবের চিত্ত নিয়ত তমোভাবে পরিপূর্ণ; তাহাদের পঙ্কিল চিত্তক্ষেত্রে, সাত্ত্বিকীবৃত্তি সহসা প্রস্ফুরিত হয় না। সুতরাং আধুনিক

মনুষ্য, স্বতন্ত্রভাবে বেদার্থ উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাতেই মন্বাদি মহর্ষিগণ নিখিল বেদসমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক অমূল্য উপদেশ রত্ন অতি সরলভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানবেরও তদনুযায়ী হইয়া শ্রুত্যর্থ অবধারণ করিতে হয়, বেদের অর্থ জ্ঞান সম্বন্ধে ভাষ্যকার স্বামী শঙ্করাচার্য্য বলেন ;—

পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ
স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতু-
মশক্নুবন্তঃ, প্রখ্যাতপ্রণেতৃকেষু
স্মৃতিবনেষবসমেবরন্ তদ্বলেন
চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্।

বেদান্তভাষ্য।

যাহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ, পরোপদেশ ব্যতীত কোনও বিষয়ে তত্ত্ব নির্দ্ধারণে অসমর্থ, তাহারা নিজপ্রতিভাবলে শ্রুত্যর্থ অবধারণ না করিয়া প্রখ্যাত মহর্ষিগণ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র আশ্রয়পূর্ব্বক তদনুযায়ী হইয়া শ্রুতির অর্থ অবধারণ করিবেন, অন্যথা বিপরীতার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক জগৎ আকুলিত করিয়া তুলিতে পারেন। সম্প্রতিই বুঝি বা শঙ্করাচার্য্যের আশঙ্কা, কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতেছে।

বেদের যথাযথ অর্থ জানিতে হইলে মন্বাদি স্মৃতির অনুসরণ করিতে হয়, বেদও মনুকে প্রশংসা করিয়াছেন ;—

"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্"

মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত হিতকর। আর স্মৃতি বলিতেছেন ;—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো
মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে
সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

মনু যে কোনও ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন, তৎ সমুদয়ই অভ্রান্ত বেদমত বুঝিবে, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

যঃ কশ্চিদিত্যাদি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বেদের বহু শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, যড়ঙ্গ বেদ মনুর কণ্ঠস্থ ছিল। ভারতে শাস্ত্র বিপ্লবের পর, নিজ স্মৃতি হইতে মহর্ষি মনু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কোনও অংশ লুপ্তাবশিষ্ট বেদ মধ্যে পরিলক্ষিত না হইলেও তাহাও সপ্রমাণ বৈদিক মতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালের বেদাধ্যয়নে, মন্বাদি (ধূর্ত্ত) ব্রাহ্মণের লিখিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, সম্প্রতি বেদাধ্যয়নের বহুল প্রচলন। তাহাতে আর বাচ্যাবাচ্য নাই, চাণ্ডালাদি ব্রাহ্মণান্ত সকলই বেদাধ্যয়ন তৎপর। প্রাচীনকালের অধ্যয়নের সহিত এ অধ্যয়নের অনুষ্ঠানে ও ফলে কিঞ্চিৎবৈলক্ষণ্য আছে ; প্রাচীন সময়ের বেদাধ্যয়নের অনেকটা পূর্ব্বানুষ্ঠান ছিল।

মনু বলেন ;—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং
শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ
সন্ধ্যোপাসনমেবচ॥ ৬৯॥

২ অঃ—মনুসংহিতা।

উপনয়নান্তর আচার্য্য, শিষ্যকে প্রথমতঃ শৌচ, আচার অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা-শিক্ষা করাইবেন। অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল না হইলে তাহাতে বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না ; বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না ; এই নিমিত্ত জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন, বাহ্য শৌচ ও মানসিক মন শুদ্ধিরূপ অন্তের শৌচ, মানসিক স্বচ্ছতার অব্যভিচরিত হেতু। চিত্তের নির্ম্মলতা বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণাম রজঃ ও তমোগুণের পরিভব না হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিস্ফুরণ হইতে পারে না ;

সুতরাং তৎসাধক বলিয়া বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে তাহার শিক্ষা প্রদান করিতে হয়। শৌচের পর আচারশিক্ষা, গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় কোন্ দ্রব্য গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহার শিক্ষার নামই আচারশিক্ষা।

মনু বলেন ;—

বর্জ্জয়েৎ মধু মাংসঞ্চ মাল্যং
গন্ধান্ রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি
প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরূপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভ
মুপঘাতং পরস্য চ॥১৭৭—১৭৯

মনুস্মৃতি, ২য় অধ্যায়।

গুরুগৃহে বাসকালে মধু মাংস, মাল্য, গন্ধ উদ্রিক্ত রস (গুড়াদি), স্ত্রী, কাম, ক্রোধ লোভ, নৃত্য, গীত ও বাদ্য, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। পলিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, প্রাণিহিংসা করিবে না, তৈলাভ্যঙ্গ, নেত্রে অঞ্জনপ্রদান, ছত্র ও পাদুকাধারণ এই সকল একান্ত নিষিদ্ধ, দুষ্টভাবে নারীজনদর্শন ও স্পর্শন ইহাও পাঠাবস্থায় একান্ত দূষণীয়। এইত গেল প্রাচীনকালের ব্রহ্মচারিগণের অবস্থা। বর্ত্তমান কালের বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারিদলের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র, এখন আর বেদাধ্যয়ন কার্য্যে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা থাকে না ; শৌচ শিক্ষারূপ প্রধানাঙ্গ কিঞ্চিদ্বিচিত্র ভাবেই প্রতিপালিত হয়। অগ্নিকার্য্য জলন্ত সিগারেট্ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এখন আর মধু, মাংস, মাল্য, গন্ধ প্রভৃতি রজস্তমোভাবপ্রবর্দ্ধক বিষয় সেবা পরিত্যাগ করিতে হয় না ; বরং তাহাই আবার পূর্ণমাত্রায় আধুনিক বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারিসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বেদাধ্যয়ন জন্য অরণ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে বেদমন্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে হয়। যাহাদের ভাগ্যে তাদৃশ গুরুর লাভ অসম্ভব, তাহারা অন্ততঃ ভারতে থাকিয়াই তৎস্বভাবাপন্ন কোনও ব্রহ্মবাদীর অন্তেবাসিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বেদার্থ জ্ঞানে চরিতার্থ হন। কেহ কেহ বা, স্বকীয় অমানুষিক প্রতিভাবলে, মন্বাদিস্মৃতি নিরপেক্ষ হইয়াও বেদালোচনায় কৃতকৃত্য হন। কেহ কেহ ইহা বলিতেছেন যে, শাস্ত্রে সকলেরই সমানাধিকার ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হাড়ি, মুচি, ম্লেচ্ছ, যবন, সকলই ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী ; সুতরাং সকলেরই সমানাধিকার! "ত্রৈবর্ণিক ভিন্ন অন্য কেহ বেদাধ্যয়ন করিতে পারিবে না" এরূপ প্রতিষেধ কেবল ব্রাহ্মণগণের পক্ষপাতিতামূলক। ব্রাহ্মণগণ, নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শূদ্রাদি নীচ জাতিকে উন্নত হইতে না দেওয়ার অভিসন্ধি মূলে বেদকে নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এখন ইংরেজ রাজত্ব, সে স্বার্থপরতা আর বহুদিন থাকিল না ; সম্প্রতি বেদজ্ঞান সকলেরই সুলভ হইয়াছে।" ইত্যাদি—

আমরা তদুত্তরে বর্ত্তমানে দু একটী মাত্র কথা বলিব। ত্রৈবর্ণিক ভিন্ন অন্য জাতীয়ের বুদ্ধি আপেক্ষিক অমার্জ্জিত—বলিয়া তাহাদের বেদ পাঠে অধিকার নাই, (বেদ পাঠে অধিকার না থাকিলেও, নিখিল বেদার্থপূর্ণ মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থ পাঠে তাহাদের অধিকার আছে)।

এ কথা বেদ ও ইঙ্গিতে বলিতেছেন ;—

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো,
মনোজবেষ সমাভূবুঃ।
আদঘ্নাসঃ উপকক্ষাস উত্বে
হ্রদাইব স্নাত্বা উত্বে দদৃশ্রে

ঋগ্বেদ অঃ ৮।২।২৪।৭।

অর্থ।—বন্ধুগণ সমান চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট ও দেখিতে একরূপ হইলেও মানসিক বলে সমান নহেন। এই বেদরূপ হ্রদে কেহ কেহ মুখপরিমিত জল পর্য্যন্ত গমন করিতে দেখা যায়, কতিপয় বন্ধু কক্ষপ্রমাণ জল পর্য্যন্ত গমন করেন, কোনও কোনও বন্ধু তাহাও পারেন না; তাঁহারা কটিপ্রমাণ বা জানুপ্রমাণ বা তাহা হইতেও স্বল্প জলে স্নান মাত্র করিয়াই কৃতার্থ হন। ফলিতার্থ এই যে, এই হ্রদের অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়া তলস্পর্শপূর্ব্বক রত্নোদ্ধার করা সকলের কার্য্য নহে।

বেদ আরও স্পষ্টতঃ বলিতেছেন;—

উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ মুতত্বঃ
শৃণ্বন্ ন শৃনোত্যেনাম্।
উতোত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উসতী সবা সাঃ।

ঋগ্বেদ ৮।২।২৩।৪

অর্থ—কোনও কোনও ব্যক্তি বেদের অক্ষরগুলি দেখিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই দেখিলেন না; কেহ কেহ বা গুরু মুখে বেদ শুনিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই শুনিলেন না; তবে ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, তৎসম্বন্ধে বেদবাণী, পতি সংসর্গ লাভের জন্ত সুবেশা ঋতুস্নাতা পত্নীর ন্যায় স্বয়ংই আত্মভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পাঠকগণ! এইত শুনিলেন, বেদ কাহার নিকট কিরূপভাবে প্রকাশ পান? সুতরাং অধিকার অনুসারে শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়; পূর্ব্ব সাধন আয়ত্ত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়; ব্রহ্মচর্য্য শৌচ আচার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বসাধন।

অধিকারের অনুপযোগিশাস্ত্রালোচনাই বর্ত্তমান অর্থবিভ্রাটের একমাত্র কারণ। শাস্ত্র কামদুঘ, যিনি যেরূপ অর্থ করিবেন, তাহা কেবল তাহারই চিত্তের পরিচারক, শাস্ত্রের নহে। এক ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত উপদেশে* ইন্দ্র ও বিরোচনের বিভিন্নচিত্তে বিভিন্নরূপ জ্ঞানোদয় হইল। সাত্ত্বিকচিত্তে সাত্ত্বিকার্থ রাজস ও তামস অন্তঃকরণে তত্তৎ সমুচিতার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

কবি বলিতেছেন;—

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্-
গ্রাহে মণি, র্ন মৃদাংচয়ঃ"

স্বচ্ছ স্ফটিক মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ডে কদাচ বিম্বোদ্‌গ্রাহিকা শক্তি থাকে না। আমাদের অন্তঃকরণ মৃৎপিণ্ড হইতেও জড়, অনাদি অবিদ্যা কলুষিত এবং কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য, হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতির অদ্বিতীয় লীলাক্ষেত্র। আমরা যে, চিন্তানুরূপ বেদার্থ উপলাভ করিয়া বেদ কৃষকের সঙ্গীত, বেদ, বিহঙ্গমকণ্ঠের মধুর ধ্বনি, বেদ, প্রাচীন সমাজের চিত্রপ্রদর্শক ইতিহাস বলিয়া বেদের প্রতি সমধিক অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি, তাহা অবশ্য আমাদের সাত্ত্বিকতার ও নিগূঢ় বুদ্ধিতার সুলভ নিদর্শন;

সিংহ ক্ষুণ্ণ করীন্দ্র কুম্ভ
পতিতং দৃষ্ট্বৈব মুক্তাফলং
কান্তারে বদরীভ্রমাদ্ দ্রুত
মগাদ্ভিল্লীর পত্নী মুদা।
পাণিভ্যা মবগৃহ্য গাঢ়-
কঠিনং সংপৃশ্য দূরে জহা
বস্থানে পততা মতীব
মহতা মেতা দৃশী দুর্গতিঃ॥

অর্থ—সিংহ কর্ত্তৃক করিকুম্ভ বিচ্যুত মুক্তাফল, বনমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া বদরী ফল ভ্রমে শবরপত্নী, দ্রুতপদে গমন

* ব্রহ্মোপদেশ শ্রবণেং বিকৃতকৃতার্থা পরামর্শাদৃত্তে বিরোচনবৎ। সাংখ্যসূত্র চতুর্থ অধ্যায়। ভাষ্য দেখুন।

করিল ; পরে দুই হাতে গ্রহণ করিয়া দৃঢ়রূপে টিপিতে টিপিতে কঠিন বোধে দূরে নিক্ষেপ করিল। মহৎগণ অস্থানে পতিত হইলে এইরূপই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আমাদের সমালোচনায় বেদ যতই নিন্দিত হউক না কেন, বেদের মাহাত্ম্য কিন্তু অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

"প্রিয় মাংস মৃগাধিপোজ্ঝিতঃ
কিমবস্তঃ কাহ কুম্ভজো মণিঃ"

মাংসলোলুপ সিংহ, অনাবশ্যক বোধে মণি পরিত্যাগ করিলেও করিকুম্ভসম্ভূত মণি, অল্পমূল্যে বিক্রীত হয় কি? বেদ সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

ভালবাসার প্রতিফল।

(রঙ্গমহলের একটী গল্প।)

(১)

আজি নওরোজ-মহোৎসব। মোগল সম্রাট্‌গণ, পারস্যের সাহাদিগের আদর্শে এই বার্ষিক আনন্দোৎসব-প্রথা ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত করেন। মহান্ মোগলের আগ্রাস্থ সুসজ্জিত প্রাসাদের সর্ব্বাঙ্গ আজি অগণিত আলোকমালায় সমুজ্জল। সেই মৃদু মধুর দীপালোকরাশি, সুচিক্কণ মর্ম্মর-প্রাসাদে প্রতিফলিত হইয়া, যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে, তাহা কেবলমাত্র মহান্ সাজাহানের প্রাসাদেই সম্ভব।

বাস্তবিক প্রাসাদ আজি পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু মহোৎসবের কেন্দ্রস্থল মীনাবাজারে যেরূপ শোভা-সৌন্দর্য্যরাশি প্রতিফলিত হইয়াছে, অন্যত্র ততটা নহে। প্রাসাদের এক স্থানের চারিদিক্ লোহিত পাষাণপ্রাকার-বেষ্টিত, চতুপার্শ্বে বিপণী-শ্রেণী, মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। সমৃদ্ধিশালী সাজাহানের শাসনে যতদূর সজ্জা-সৌন্দর্য্য সম্পাদন সম্ভব, এই ক্ষুদ্র স্থানটীতে প্রচুর পরিমাণে তৎসমস্তের সমাবেশ হইয়াছে। ইহা অন্তঃপুরবাসিনী রমণীকুলের সখের বাজার ; এখানে সাম্রাজ্যের আমীর ওমরাহগণও বৎসরে এই একদিনের জন্য আপন আপন পরিবারস্থ কামিনীদিগকে প্রেরণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে বিশেষ গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। সখের বাজারটী যেমন পরম রমণীয়রূপে সুসজ্জিত, সমবেত রমণীমণ্ডলীর সমুজ্জল বেশভূষাও সেই মত আলোকরাশির মৃদুল কিরণে প্রতিফলিত হইয়া, পরস্পরে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। হীরক-মণি-মরকত-কনক, সকলেই কামিনীকুলের কমনীয় অঙ্গে বিরাজ করিয়া, পরস্পারের প্রতি তীব্র মধুর দৃষ্টিদান করিতেছে। আজি এই আনন্দবাজারে অতুলনীয়া রূপবতী—বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী কামিনীকুলের বদনকমলের কমনীয় কান্তি চারিদিকে যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু আজি সৌন্দর্য্যের দুর্দ্দিন। পাঠক!

এই যে, মহামূল্য বসন ভূষণ শোভিতা মহিলা-মণ্ডলী আপনার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেই রূপসীদিগের সৌন্দর্য্যের দুর্দ্দিন নহে—ঐ যে অনাঘ্রাতা নবোৎফুল্লা নলিনী, যিনি ঐ সামান্য সূক্ষ্ম হরিতাভ ওড়নায় আপনার সমস্ত কলেবর আচ্ছাদিত করিয়াছেন, ঐ সুন্দরীপুঞ্জের মধ্যে একাকিনী আপনার স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল বদনখানি আবরিত করিয়াছেন, উহাঁর সৌন্দর্য্যেরই আজি দুর্দ্দিন। সম্রাট্ সাজাহান, সেই সখের বাজারের যবনিকার অন্তরালে সিংহাসনে বসিয়া, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য-দর্শন-সুখ-সম্ভোগ করিতেছিলেন; তাঁহার দৃষ্টি সেই নব-বসন্ত-সমাগমে ললিত লবঙ্গলতার ন্যায় প্রফুল্লা ললনার প্রতি পতিত হইল।

সম্রাট্ সাজাহানের নয়নযুগল, সেই রূপসীর প্রতি পলকবিহীন দৃষ্টিদানে মুহূর্ত্ত মাত্র ক্ষান্ত রহিল না। সুন্দরী, যতই একটী বিপণী হইতে অন্য বিপণীতে গমন, একটী দৃশ্য-শোভা দর্শনের পর আর একটী দৃশ্য দর্শন জন্য ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন, সাজাহান ততই তাঁহার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিদানে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্শ্বস্থ বিশ্বাসী খোজাকে আহ্বান করিয়া, সম্রাট্ বলিলেন, 'রৌষণ! ঐ ফুলটী কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী সম্রাটের কাননের উপযুক্ত নহে?'

উত্তর হইল, 'জাহাঁপনা! সত্যই বলিয়াছেন। আপনার অনুমতি পাইলে এ দাস জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ সম্রাটের আনন্দের জন্য ঐ ফুলটীকে চয়ন করিয়া আনিতে পারে।'

সম্রাট্ কহিলেন, 'বেকুব! তোর মত হতভাগ্য বর্ব্বরের হস্ত দ্বারা ঐ কুসুমটী চয়ন করা বড়ই লজ্জার কথা। এ ফুলটী অতি সন্তর্পণে চয়ন করিতে হইবে। উহার নাম কি, এবং পিতা মাতাই বা কে, তাহা জানিতে চেষ্টা কর।'

রৌষণ, অবিলম্বে সেই দৌত্যকার্য্যে চলিল।

আগাবেগের বিশাল অট্টালিকার একটী কক্ষে একটী নবীন যুবক বসিয়া আছেন, বিংশতিবর্ষ বয়স হইলেও গুলজারকে কিন্তু বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হয়। গুলজার, আগ্রার সর্ব্বপ্রধান বণিক্ আগাবেগের ভ্রাতুষ্পুত্র—জাতিতে তাতার। ধনবান্ পিতৃব্যের গৃহে আলস্য-বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হওয়ায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং অঙ্গ সঞ্চালনের অভাবে গুলজারের শরীর অনেকটা রমণী-স্বভাব-সুলভ কোমলভাবপ্রাপ্ত। বিশেষতঃ তাঁহার আন্দোলিত ভ্রমরকৃষ্ণতুল্য কেশরাশি, আগ্রহান্বিত নয়নযুগল এবং মুখমণ্ডলে যৌবনসুলভ শ্মশ্রুর অভাব, তাঁহার সেই কোমলতা যেন আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। গুলজার যখন একাকী বসিয়া কল্পনা-সঙ্গিনীর সহিত মনে মনে আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য-তনয়া জিনাৎ উন্নিষা, কক্ষমধ্যে আনন্দোত্তেজিত হৃদয়ে গুলজারের দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। এই দুই ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময়ই একত্রবাসে ও সময়োপযোগী ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুলজারের বয়স বিংশতি বর্ষ হইলেও দেখিতে সে বয়স্ক বালকের মত; আর জিনাতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ হইলেও দেখিতে সে পূর্ণা যুবতী। উভয়েই উভয়ের সমুপযুক্ত এবং সংমিলনের সমযোগ্য পাত্র পাত্রী বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু তাহা কি চিরজীবনের জন্য?

জিনাৎ যেমন গুলজারের প্রতি ধাবমানা হইয়া আসিলেন, গুলজার অমনি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। জিনাৎ, সেই সময়ে চাতুরী করিয়া কক্ষতলে পড়িয়া যাইলেন।

গুলজার তখন উচ্চহাস্যে প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত করিলেন।

জিনাৎ কহিলেন, 'এ কি! হো হো করিয়া এত হাসি কেন?'

'জিনাৎ! আমি দেখিতেছি, তোমার মাথাটা একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে। ব্যাপার খানা কি?'

'আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে! সে কি? আমার মস্তক আমার স্কন্ধে যেমন ছিল, তেমনই আছে। আমি যে পড়িয়া গিয়াছিলাম, তাতে যদি আমার মাথাটা একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তুমি বড়ই আহ্লাদিত হইতে।'

জিনাৎ যে ক্রোধান্বিতা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুলজার, এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া অবোধের ন্যায় শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। বাস্তবিক যে কোন লোক ঐরূপ হইলে, গুলজারের বিবেচনাবিহীনতার পরিচয়স্বরূপ তাঁহার বদনে হাস্যের আবির্ভাব হইত। গুলজার, কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ পটু; কোন বাধা না পড়িলে, সে একজন বাগ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ; কিন্তু সামান্য বাধা পড়িলেই একেবারে তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। জিনাতের প্রকৃত কোপ দর্শনে গুলজার নিতান্ত অপ্রতিভ এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে এই স্থানে যাহা বলা উচিত, যাহা করা উচিত, তিনি তাহার কিছুই বলিতে বা করিতে পারিলেন না। মূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। জিনাৎ, তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, এই কোপকলহ শীঘ্রই অদৃশ্য হইল, জিনাৎ অবিলম্বে উচ্চহাস্যে এই কোপাভিনয়ের যবনিকা পতন করিলেন।

জিনাৎ কহিলেন, 'নির্ব্বোধ! তুমিই কি হারিলে না?'

যুবতীর এই মধুর অথচ ব্যঙ্গমিশ্রিত কথায় গুলজারের হৃদয়ে শান্তির উদয় হইল বটে, কিন্তু তিনি তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না।

'আমি দৌড়িয়া আসাতে তুমি যে পাশব ছলে আমাকে ভূপাতিত করিলে, বল দেখি, তোমাকে কি বলিবার জন্য আমি দ্রুতপদে আসিয়াছিলাম।' জিনাৎ মৃদু হাস্যসহকারে এই প্রশ্ন করিলেন।

'আমার বোধ হয়, তোমার হংসী একটী স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিয়াছে, এই কথা বলিবার জন্যই তুমি অত দৌড়িয়া আসিয়াছিলে।'

'নির্ব্বোধ! তাহা অপেক্ষাও ভাল সংবাদ—অতি সুসংবাদ দিবার জন্য।' জিনাৎ এই কথা বলিয়া, আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে গুলজারের করপল্লব ধারণ করিয়া, এবং তাহার নয়নে স্বীয় অনিমেষ দৃষ্টি রক্ষা করিয়া বলিলেন, 'গুলজার! শুন, অতি সুসংবাদ—আমি বেগম হইব।'

যুবতীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে যেন আনন্দস্রোত উথলিয়া পড়িতেছিল এবং যখন তিনি এই আনন্দের সংবাদ তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদকে বিজ্ঞাপিত করিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু গুলজার স্তম্ভিত হইয়া কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন।

গুলজার সবিস্ময়ে কহিলেন, 'বেগম?—সত্য না কি?'

'সত্য।'

কম্পিতকণ্ঠে গুলজার বলিলেন, 'সে কি? তুমি কেমন করিয়া বেগম হইবে?'

জিনাৎ সানন্দে কহিলেন, 'বাদসাহ আজি আমার পিতাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি আমার পাণিগ্রহণের কথা বলিয়াছেন। গত কল্যকার মীনাবাজারে আমাকে দেখিয়া, তাঁহার মনে এই কামনার

উদয় হইয়াছে ;—ও কি ? অমন শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন ? গুলজার! আমি প্রকৃতই বেগম হইব।’

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে গুলজারের সমুজ্জল কান্তি একেবারে বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে বিষম আঘাত লাগিল, তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। গুলজার, স্বীয় বক্ষে সহস্র তীক্ষ্ণ বাণ সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু এই অপ্রিয় সংবাদটী তাঁহার বক্ষে তদপেক্ষা বিষম আঘাত করিল।

গুলজার কি জিনাৎকে ভালবাসিত বলিয়াই হৃদয়ে এই আঘাত পাইলেন? কিন্তু সত্য বলিতে কি তিনি নিজেই তাহা জানিতেন না। শৈশব হইতে দুইজনে একত্র বসবাস, একত্র লালন পালন, একত্র ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং জিনাৎ উন্নিবার সহিত সৌহৃদ্য তাঁহার হৃদয়ে অতীব আনন্দ-সুখশান্তি উৎপাদিত করিত। কিন্তু গুলজার, জিনাৎকে স্বীয় প্রিয়সঙ্গিনী এবং বয়স্যা ব্যতীত অন্য চক্ষে দেখিতেন কি না, এই বেগম হইবার সংবাদপ্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা তিনি জানিতেন না। কিন্তু জিনাৎ যে তাঁহার অভিপ্রায়া, ইহা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে খোদিত। এই বেগম হইবার সংবাদটী চিরবিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাষ—ইহা উভয়ের আবাল্য-সম্বন্ধ-সংস্রব-লোপকারী। গুলজার, তাঁহার জীবনের মধ্যে এই প্রথম ইহা অনুভব করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, জিনাৎ অপসারিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করা হইল।

জিনাতের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছুতেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। গুলজার, জিনাতের সেই আনন্দপূর্ণ বচনাবলীর নিকট হইতে উদাস এবং হতাশভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। গুলজার সেরূপ বিষাদ-বিষণ্ণ দীনভাবে নীরবে সরিয়া যাইলে, জিনাতের তখন চিন্তার সহিত আলাপ আরম্ভ হইল। গুলজারের সেই বিষাদবিষণ্ণ-বদন জিনাতের অন্তরের অন্তস্তলে বিষম আঘাত করিল, এবং তখন তাঁহার মনোমধ্যে এই সত্যটী প্রভাসিত হইল যে, গুলজার, তাঁহার কেবল সুহৃদ্ এবং বাল্যসহায় নহে, তাঁহার প্রণয়প্রার্থী, কিন্তু আজি তিনি তাঁহাকে হতাশ্বাস করিলেন। এই চিন্তাটী তাঁহাকে বড়ই দুঃখনীরে নিমজ্জিত করিয়া দিল। সরলা জিনাৎ, এতদিন গুলজারকে প্রিয় মিত্র ব্যতীত অন্য কোন ভাবে দেখেন নাই। কিন্তু আজি তাঁহার নারী-হৃদয় বুঝিল যে, তিনি তাঁহার প্রণয়প্রার্থীর হৃদয়ে বিষম বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং তিনি বুঝিতে না পারিয়া যে সংবাদটী গুলজারকে শুনাইলেন, সেই সংবাদই বাণটীকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। এই চিন্তায় জিনাতের সরল কোমল হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব দারুণ যাতনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সকল চিন্তার পর জিনাৎ একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—এই তাঁহার প্রথম হতাশ-নিশ্বাস। কিন্তু হায়! ইহাই তাঁহার শেষ হতাশ-নিশ্বাস নহে।

সেই দিন হইতে আগাবেগের আলয়ে গুলজারকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। জিনাৎ উন্নিষা নিজে গুলজারের এই দুঃখের—স্বেচ্ছানির্ব্বাসনের কারণ জানিয়া চক্ষের জলে কোমল বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। জিনাৎ জানিতেন যে, তাঁহার প্রিয় বাল্যসহচরকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেগম হইবার কামনা পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ইহাও উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাহা হইলে সম্রাটের কোপ উদ্রিক্ত হইবে এবং সেই সূত্রে, তাঁহার আত্মীয়বর্গের মৃত্যু এবং বংশ ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। পরিবারের সকলের

অশ্রুপাতের সহিত জিনাৎও চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া পিত্রালয় ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময়ে তিনি অন্তরে অন্তরে জানিলেন যে, তাঁহার এই সৌভাগ্যোদয়ের দিনে, এই চির-বিদায়কালে সেই প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ তাঁহার বেগমস্বরূপে প্রাপ্য মহামূল্যবান্ সমস্ত হীরকালঙ্কার অপেক্ষা মূল্যবান্ সেই অমূল্য হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ, তিনি পাইলেন না।

৩

জিনাৎ উন্নিষা ছলচাতুরী-বিহীনা—সরলা, কিন্তু তিনি বেগম হইবেন, এই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে নানা আশা, নানা কামনার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি নানা আশা লইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অমিশ্র আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি গুলজারের অনন্ত দুঃখের নিরপরাধ কারণস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা এই সময়ে তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়ায়, তিনি সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে জিনাৎ সরলা অনভিজ্ঞা হইলেও সম্রাটের অন্তঃপুরে মহৈশ্বর্য্যসম্ভূত দৃশ্যাবলী, বহুল আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া নয়ন জুড়াইবে এবং কোনরূপে রঙ্গমহলে অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখশান্তি সম্ভোগ করিবে, এই আশার আনন্দে তাহার হৃদয় নবভাবে উদ্বেলিত হইতেছিল।

সম্রাটের বেগম মহলে প্রথম প্রবেশে জিনাতের হৃদয় নিরাশ হয় নাই। রঙ্গমহলের সেই বিশাল প্রাঙ্গণ পরম রমণীয়রূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল; মহান্ সম্রাটের নিরুপমা নবীনা পত্নীকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিবার জন্য সাম্রাজ্যের নানা স্থান হইতে আনীতা শত শত শ্রেষ্ঠতমা রূপসী বেগম সেই প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। জিনাৎ উন্নিষা, সুসজ্জিতা শিবিকারোহণে রঙ্গমহলের দ্বারে আগমন করিবামাত্র সহস্র সহস্র রমণীর সমুৎসুক নয়ন তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। জিনাৎ শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রবল তরঙ্গ—সাজাহান নিজে যে সৌন্দর্য্যরাশির সমাগম করিয়াছেন, সেই নয়নসুখকর সৌন্দর্য্য দর্শনে যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দে আপ্লুত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে প্রাঙ্গণে কমনীয় কুঞ্জ কানন। দেখিলেন, শত শত বৃক্ষে অগণিত সুপক্ক দ্রাক্ষা ঝুলিতেছে; যেন বেগমগণ, কোমল করপল্লব দ্বারা তাহাদিগকে সযত্নে তুলিয়া লইবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। জিনাৎ ধীর পাদসঞ্চারে সেই শোভনীয় কানন মধ্য দিয়া মর্ম্মর প্রাসাদশ্রেণীর নিকট—লোহিত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে যে মর্ম্মর সৌধগুলি যেন সতীত্বের জীবন্ত চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান—সেই প্রাসাদশ্রেণীর নিকট উপনীত হইলেন। পরে পাষাণ-সোপাণশ্রেণী আরোহণে সম্রাটের অন্তঃপুরের সাধারণ-সমাবেশ কক্ষ খাসমহলের সম্মুখে আগমন করিলে সম্রাট্ সাজাহানের কুমারী কন্যা জেহানারা জিনাৎকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে লইয়া যাইলেন। সেই কক্ষটী দুগ্ধফেণনিভ শ্বেত প্রস্তরস্তম্ভপরিশোভিত চিত্তাকর্ষক কারুকার্য্যোজ্জ্বল।

জিনাৎ উন্নিষা, সেই সাদরসম্ভাষণ ও অভ্যর্থনায় অবশ্যই আনন্দিত হইলেন। রঙ্গমহলের যেদিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার নয়নযুগলকে ঝলসাইতে লাগিল। তাঁহার সম্মানার্থ যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, অননুভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখে—যাহা তিনি

স্বপ্নেও ভাবেন নাই—আনন্দ-সাগরে ভাসমানা হইলেন।

নৃত্যগীত সমাপ্তের পর জেহানারা নিজে জিনাৎকে সঙ্গে করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া একটী মর্ম্মর কক্ষে লইয়া যাইলেন। মোগল সংসারে প্রচলিত বিনয়মধুর সম্মানসূচক বাক্যে জেহানারা জিনাৎকে জানাইলেন যে, এই কক্ষ তাঁহার ভবিষ্য আবাসস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জিনাৎ সম্রাট্-সংসারের আদবকায়দা—রীতিপ্রথা কিছুই জানিতেন না, সুতরাং জেহানারার সাদর মধুর বচন অকৃত্রিম এবং আন্তরিক জ্ঞানে তিনি মনে মনে বড়ই হৃষ্ট হইলেন। জেহানারা জিনাতের প্রতি প্রকাশ্যে অকৃত্রিমভাবে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিয়া সে দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সম্রাটের অন্তঃপুরে পুনরায় এই এক নূতন সুন্দরীর আবির্ভাবে জেহানারা মহাকোপে বিচলিতা হইয়াছিলেন। সম্রাট্, এই যে নবীনা সুন্দরীকে পত্নীরূপে মনোনীতা করিয়াছেন, ইহার অনুপম-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য রূপরাশি, জেহানারার চক্ষে ইহাঁকে যেন আরও শতগুণে অপরাধিনী করিয়া তুলিল। এ কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে, কুমারী জেহানারা স্বীয় পিতা সম্রাট্ সাজাহানের হৃদয়ের উপর বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। জেহানারা সেই রঙ্গমহলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, সর্ব্বোপরি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, সুতরাং জিনাৎ উন্নিষার আবির্ভাবে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সুন্দরী যুবতীর আগমনের পূর্ব্বে অপরাপর শত শত বেগম আসিয়া, প্রথম প্রথম যখন নবীন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বলে সম্রাটের চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার অধিকারের কতকটা খর্ব্বতা সাধন করিয়া রঙ্গমহলে তাঁহার গৌরব লাঘব করিয়াছিলেন, জিনাৎও সেইরূপ করিবেন। কিন্তু যদিও জেহানারা, পূর্ব্ববর্ত্তিনী বেগমদিগের সেই প্রভুত্ব সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সরলা ছলচাতুরীবিহীনা নবীনা যুবতীর সরল হাস্য, অপাপপঙ্কিল উদার হৃদয় দর্শনে জেহানারা বড়ই কুপিতা হইলেন এবং বেগমমহলের এই অতুল সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-শোভা সন্দর্শনে জিনাৎ যে প্রকাশ্যে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিলেন, ইহা নিতান্ত কলঙ্কজনক জ্ঞানে জিনাতের আগমন তাঁহার চক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

হৃদয়ের জ্বালায় জেহানারা, মমতাজের নিকট উপনীত হইলেন। জগতের মধ্যে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী—জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নিকেতনে যাঁহার অমর দেহ বিরাজিত, সেই মমতাজ, আজিকার এই উৎসবে আদৌ যোগদান করেন নাই। তিনি সম্রাট্ সাজাহানের গুপ্ত কক্ষপার্শ্বস্থ স্বীয় সুরম্য কক্ষ মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং যে সময়ে জেহানারা তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন, তখন তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন। কনক পর্য্যঙ্কোপরি মূল্যবান্ শয্যায় ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী সম্রাজ্ঞী তখন দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। মমতাজ, সুকোমল উপাধানে সেই অতুলনীয় বদনকমল গোপন করিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতেছিলেন।

জেহানারা কহিলেন, 'মা! জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর পক্ষে রোদন করা ভাল দেখায় না।'

সম্রাজ্ঞী মমতাজ, সজল নয়নে কহিলেন, "জেহানারা! তোমার এই কথাটী যেমন অসাময়িক, তেমনই কঠোর। তুমি চিরকুমারী, তুমি রমণীহৃদয়ের কথা কি জানিবে? তুমি যাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছ, তুমি যদি তাহাকে হারাও, তাহা হইলে যে কি যাতনা হয়, তুমি কেমন করিয়া তাহা অনুভব করিবে?

সম্রাট্, মহান্ এবং জ্ঞানী, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা যে উত্তম তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার এ হৃদয় যে নারী-হৃদয়, রোদন ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে?”

“মা! আমি আপনাকে বিরক্ত বা কুপিত করিতে আসি নাই। আমি চিরকুমারী হইলেও আমি রমণী। রমণীস্বভাবসুলভ জ্ঞানত আমার আছে? আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, সম্রাটের এই কার্য্যটী নিতান্ত অত্যাচারমূলক। ইহাই কি আপনার রোদনের কারণ? কিন্তু মা! আপনার পক্ষে রোদন করা শোভা পায় না।” জেহানারা এই কথা বলিয়া, মাতা মমতাজের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঘন ঘন শ্বাসকম্পিত কণ্ঠে সজল নয়নে সম্রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন, “আমি আর কি করিতে পারি? যে ভাগ্য আমাকে নারী জন্ম দিয়াছে, তাঁহাতে যে নারী সম্রাট্‌কে ভালবাসিতে সাহস করে, তাহাকে অভিশাপ দিতে পারি মাত্র। আমি জানি, সম্রাট্ এরূপ মহৎ যে, তাঁহার তুলনা নাই, এবং আমার মত সামান্যা নারীর ভালবাসার বন্ধনীর মধ্যে তিনি থাকিবার যোগ্য নহেন, তাহাও জানি। জেহানারা! তবুও বলি, আমি যেমনই হই না কেন, আমি সম্রাট্‌কে অন্তরের সহিত ভালবাসি। একমাত্র তাঁহারই প্রসাদের জন্য আমার এই শরীর বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছি এবং একমাত্র তাঁহার সেই প্রমোদসাধনই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। জেহানারা! আমার সমস্ত ভালবাসা—আমার দাসীত্ব সম্রাটের পক্ষে যথেষ্ট ভাবিয়া কি আমার এই চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারি?” মমতাজের নয়নযুগল হইতে অজস্র জলধারা বহিতে লাগিল। মমতাজ মুখমণ্ডল লুকাইলেন।

জেহানারা তখন ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “একটা মার্জ্জার-শাবককে হত্যা করুন, তাহার মাতা কি করিবে?—কেবল চীৎকার আর রোদন করিবে মাত্র। একটা সিংহশাবককে আঘাত করুন, জননী সিংহী, আপনার উপর তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া, আপনার সমস্ত শরীরের রক্ত পান করিবে। মা! সম্রাজ্ঞী কখনই রোদনসম্বলা বিড়ালী নহেন, তেজস্বিনী সিংহী। আপনার এই ভালবাসা যে পদতলে বিদলিত হইল, ইহা সহ্য করিয়া কেবল রোদন করাই কি উচিত? সম্রাট্ একটা সামান্যা স্ত্রীলোকের প্রেমে ক্রীড়া-কৌতুক করিবেন, ইহা দেখিয়া, আপনার কি স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য? আপনার ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত, সেই রক্তের পক্ষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞীর পক্ষে ইহা অশোভনীয়। সিংহীর ন্যায় আপনার সেই গর্ব্বকে উত্তেজিত করুন; আপনি আপনার প্রণয়পাত্র এবং সেই সামান্যা নারীর মধ্যে দণ্ডায়মান হউন, নিজের সামর্থ্য শক্তি প্রকাশ করুন এবং সম্রাটের ভালবাসা এবং সম্মান—যাহা কেবলমাত্র আপনারই প্রাপ্য, তাহা আপনিই রক্ষা করুন। কেহই যেন আপনাকে সমুচ্চ-সম্মানের পদ হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে। আমি বলি, কেবল ইহাই সম্রাজ্ঞীর—মহান্ সম্রাটের পত্নীর—উপযুক্ত কর্ম্ম।”

মমতাজ, জেহানারার সেই বাক্য শ্রবণে উদ্দীপিতা হইয়া কিছুক্ষণ সেই উপদেশ বাক্যগুলি চিন্তা করিতে লাগিলেন। জেহানারা বুঝিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না, কারণ তাঁহার সেই কথাগুলি তাঁহার বিমাতার হৃদয়ে বিশেষরূপে বদ্ধ হইয়াছিল। মমতাজকে চিন্তামগ্না করিবার জন্য জেহানারা পরক্ষণেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মমতাজ

অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার রমণী স্বভাব, প্রণয়কোপ, এবং প্রতিহিংসার দিকে তাঁহাকে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাঁহার সেই প্রশংসনীয় সুরম সম্রাজ্ঞী স্বভাব, সেই চিন্তাস্থলে দণ্ডায়মান হইল। মমতাজ যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ততই যাতনা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি শান্তির আশায় শয্যা ত্যাগ করিলেন। আগ্রার সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে যে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম, সুন্দর এবং সুসজ্জিত, যে স্থানে মমতাজ এবং সাজাহান পরম প্রমোদে বহু দিন রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, যে স্থান হইতে নীলাঙ্গী যমুনার লহরী-লীলা দর্শনে নয়নের প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, মমতাজ তদভিমুখে চলিলেন।

এখনও সন্ধ্যা সমাগস হয় নাই। সম্রাট্ সাজাহান যে, এ সময়ে স্বীয় অন্তঃপুরে আসিবেন, এ আশাও কেহ করে নাই, সুতরাং মমতাজ, সেই নিভৃত অথচ পরম প্রমোদময় স্থানে নীরবে স্বভাবসুন্দরীর সহিত আলাপ করিবার জন্য তথায় যাইতে অভিলাষিণী হইলেন, কারণ স্বভাবসুন্দরীর সহিত সেইরূপ আলাপে তিনি অনেক সময়ে হৃদয়ের জ্বলন্ত জ্বালা নিবারণের অমোঘ ঔষধ প্রাপ্ত হইতেন। মমতাজ, স্বীয় কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যেমন বহির্দ্দেশে আসিলেন, অমনি দেখিলেন, সম্রাটের কক্ষাভিমুখীন পথে বিদ্যমান জিনাৎ! জিনাৎ উন্নিষা, নবীন মহামূল্য বেশভূষার সুশোভিতা হইয়া, নবীন প্রেমের নবীন আনন্দোৎফুল্ল আননে সেই স্থানে ধীর পদবিক্ষেপে যাইতেছিলেন। মমতাজ, এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার মাত্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন—জিনাতের সেই সুরম সুন্দর বদনখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, একবার তাহা না দেখিয়া থাকা যায় না—মমতাজ পর মুহূর্ত্তেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। সম্রাট্ সে দিন ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু শীঘ্র অন্তঃপুরে আসিয়া, নববিবাহিতা পত্নীকে স্বকক্ষ মধ্যে থাকিবার জন্য আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মমতাজের হৃদয়ে কঠিন আঘাত পড়িল, তাঁহার সুখের জীবনে এই প্রথম এরূপ আঘাত। মমতাজ মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার বিষাদিনী সহচরী ফতিমা, তাঁহাকে সাগ্রহে ধারণ করিল।

মমতাজ, চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সহচরীর প্রতি ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, 'ফতিমা! আমি এখন কি করি?'

ফতিমার কৃষ্ণ নয়নযুগলে অগ্নির উদ্দীপনা দেখা দিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। মমতাজকে ক্রোড়ে করিয়া, তাঁহার শয্যায় শয়ান করিয়া দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

৪

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। জেহানারা, সম্রাটের এই নবীন প্রেম ব্যর্থ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাতে সফল হইলেন না। আর বাঁদী ফতিমা নিম্নতলস্থ গৃহে বসিয়া বৃথা অন্তরের কোপ অন্তরে পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যতই দিন অতীত হইতে লাগিল, মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরের আনন্দ-উৎসব জিনাতের পক্ষে ততই গুরুভার বোধ হইতে লাগিল। সেই ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর—সেই নয়নোদ্দীপক শোভা-সৌন্দর্য্য বেগম জেনাতের পক্ষে আর নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল না। যখন রঙ্গমহলের সেই নৃত্যগীত আনন্দোৎসব তাঁহার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল, তখন জিনাৎ

বুঝিতে পারিলেন যে, এ সমস্তই অসার। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অন্তঃপুরের এই শোভাসৌন্দর্য্য কেবল বাহ্য চাকচিক্য মাত্র এবং প্রচুর সাজসজ্জার মধ্যে জীবনের অলঙ্কার ও প্রকৃত আনন্দস্বরূপ মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই। অচিরেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, এই অবিশ্রান্ত উৎসব-তরঙ্গের মধ্যে প্রকৃত সুখ এবং শান্তির পূর্ণ অভাব এবং প্রিয় সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচনাবলীর মধ্যে প্রেম বা হৃদয় নাই, সকলই বাহ্য মৌখিক। বাহ্য সৌন্দর্য্য দর্শনের পক্ষে রঙ্গমহল রমণীয় স্থান বটে, কিন্তু যাহার হৃদয় আছে, মন আছে, সে কখনই এখানে শান্তি পাইতে পারে না। প্রমোদ-বিলাসিতার পরীক্ষায় জিনাতের সরল হৃদয় সুশিক্ষা পাইল এবং তাঁহার আড়ম্বরবিহীন সরল জীবনের হৃদয় শীঘ্রই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল, এবং একটী বর্ষ অতীত হইতে না হইতে প্রমোদ বিলাসিতার দ্বারা অত্যাচারাবনতা চিন্তাশীলা যুবতীর ন্যায় জিনাৎ প্রকৃত এবং উৎকৃষ্ট সুখশান্তির জন্য আগ্রহান্বিতা হইলেন।

কেবলমাত্র সম্রাটের নিকট অবস্থানই তাঁহার নিরানন্দ জীবনের মধ্যে একমাত্র শান্তির রেখা দেখা দিয়াছিল। সাজাহান বাস্তবিকই হৃদয়বান্ এবং মহোচ্চমনা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত মোহিনী আকর্ষণী শক্তি সেই নবীনা যুবতী জিনাতের সমগ্র জীবনীশক্তিকে যেন স্বায়ত্তাধীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

জিনাৎ সম্রাটের সেই কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শন এবং মধুর প্রণয় সম্ভাষণে বাস্তবিকই অতীব সুখশান্তি লাভ করিতেন। প্রাসাদস্থ সেই নিভৃত অথচ পরম রমণীয় স্থানে জিনাৎ প্রায় সম্রাটের বামে বসিয়া, উদ্বেলিতহৃদয় যমুনার নীলাদর্শন এবং সম্রাটের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া, যেন স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেন। সম্রাটের সেই প্রেমালিঙ্গনজনিত আনন্দ জিনাৎ যেন অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় সম্ভোগ করিতেন। হায়! তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র কামনা এই যে তিনি যেন একাকিনী সেই প্রমোদ-প্রীতি-সহবাসসুখের আজীবন অধিকারিণী থাকেন। এ জগতে সম্রাট্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসা ব্যতীত যদি তাহার জীবনের আর কোন কার্য্য না থাকে, যদি সর্ব্বগুণময় সম্রাট্ একমাত্র তাঁহাকেই ভালবাসেন, তাহা হইলে জিনাতের কি আনন্দই হয়।

কিন্তু সে আশা বৃথা। তাঁহার ভাগ্যে এ জগতে আজীবন স্বর্গীয় সুখসম্ভোগ নাই। জিনাৎ বুঝিয়াছিলেন যে, এ জীবনে তাঁহার আনন্দ সুখসম্ভোগের সময় সংকীর্ণ এবং সামান্য। কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন এবং জিনাতের সহিত প্রণয়ে তিনি অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। অন্যপক্ষে বেগমমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র মমতাজ ব্যতীত তাঁহার প্রতিযোগিনী আর কেহই ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৎসরটী রাজকার্য্যসাধনে সতত নিরত সাজাহানের জীবনের মধ্যে অতি শ্রম সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৎসর তিনি দিবারাত্র কেবল শাসন কার্য্যে ও সামাজিক বিবিধ কার্য্য নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিকই এ সময়ে প্রমোদসম্ভোগের উপযুক্ত অবসর পাইতেন না। এ সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী বেগমগণ প্রায়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিতেন না।

এই কারণেই এই সময়ে জিনাতের দিন কেবলমাত্র রঙ্গমহলের বাহ্য অসার আনন্দের নিরাশাব্যঞ্জক তরঙ্গে আপ্লুত হইত এবং তাহাতে তিনি নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। জিনাৎ স্বীয় কক্ষের নিভৃত বাতায়নে বসিয়া যখন যমুনার নীলাম্বুরাশির তরঙ্গরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতেন, তখন তাঁহার বাল্যস্মৃতি

আসিয়া দেখা দিত। জিনাৎ যে বাল্যকালে প্রকৃত হৃদয়ের অন্তঃস্তলের কথা শুনিতে পাইতেন এবং সরল সুখপ্রদ আনন্দ উপভোগ করিতেন, সেই স্মৃতি তাহা তাঁহার মানস-চক্ষের সমক্ষে ধরিত। তাঁহার পিত্রালয়ে তিনি যে সরলভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন, এখন সেই স্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে সেই কামনার উদ্রেক করিয়া দিল এবং সেই সঙ্গে গুলজারের সেই বিষণ্ণ বদনখানি আসিয়া যেন তাঁহার সমক্ষে প্রতিফলিত হইলে, তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হইত। জিনাৎ, গুলজারের জীবনকে চিরদুঃখময় করিয়া একেবারে বিচূর্ণ করিয়াছেন, ইহা যখন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত, তখনই তিনি নীরবে নিভৃতে বসিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেন। জিনাৎ যখন ভাবিতেন যে, গুলজারের হৃদয়, মানবজাতির আদর্শস্বরূপ, কিন্তু তিনি নিজে অনিচ্ছায় সেই হৃদয়টী পদদলিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার যাতনার সীমা থাকিত না। তাঁহার হৃদয় তখন কাঁপিয়া উঠিত।

জিনাৎ যখন গবাক্ষ হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, তখন যমুনার পর পারে একটী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। কিছুক্ষণ অনিমেষনয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপের পর সে মূর্ত্তি কাহার তাহা জানিতে পারিয়া স্তম্ভিতা হইলেন। সেই পুরুষটী কে? অন্য কেহ নহে;—গুলজার।

অচিরেই জিনাৎ হতচৈতন্যা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যখন তাঁহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল, তখন ভাবিলেন, "এখন করি কি?" ভাবিলেন, এতদিন পরে যখন গুলজার দেখা দিয়াছে, তখন অবিলম্বে যদি চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া, তাহার বাটীতে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু জিনাৎ নিজে উপায়বিহীনা। সম্রাটের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীর পক্ষে বহির্দেশের কোন পুরুষের সহিত কোন বিষয়ে কোন প্রকার সংস্রব রাখা রীতিবহির্ভূত। জিনাৎ, সম্রাট্‌কে বলিতে পারিতেন বটে, কিন্তু সম্রাট্ এখন দিল্লীতে। অন্যপক্ষে স্বীয় পিতার নিকটও এই সংবাদ পাঠাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু কে জানে যে, তাঁহার পিতা যতক্ষণ না আসেন, গুলজার ততক্ষণ ঐ স্থানে থাকিবেন? জিনাৎ, গুলজারকে তখনই কৌশলে বন্দী করাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু গুলজারকে বন্দী করিলে, গুলজার মহা অপমান বোধ করিবে, এইজন্য সে উপায় অবলম্বন করিতেও সাহস করিলেন না। অবশেষে একটী নিতান্ত দুঃসাহসিক কল্পনা করিলেন, কিন্তু সে কল্পনাটী যে কোন মুহূর্ত্তেই জিনাতের সৌভাগ্যকে ধ্বংস করিতে পারে। জিনাৎ একখানি পত্র লিখিয়া স্বীয় বিশ্বাসিনী বাঁদীর দ্বারা গুলজারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অন্য একখানি পত্রে গুলজারের এই আগমনসংবাদ লিখিয়া স্বীয় পিতার নিকটেও পাঠাইতে বিলম্ব করিলেন না।

৪।

জিনাৎ যে বাঁদীর হস্তে পত্র দিয়া দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে এই ব্যাপারটী কৌতূহলজনক বলিয়া ভাবিল এবং দৌত্যকার্য্য সাধনের পূর্ব্বে পত্রমধ্যে কি লিখিত আছে, তাহা পড়িয়া কৌতূহল নিবারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিল। সে পত্রখানি লইয়া, সম্রাজ্ঞী মমতাজের বাঁদী ফতিমাকে ডাকিয়া স্বীয় গৃহমধ্যে সেই পত্রখানি পড়িতে দিল। পত্রমধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী কথা লিখিত ছিল;—

'গুলজার! আমি তোমাকে এত দিন পরে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি এখানে উদাসভাবে কাল কাটাইতেছি। সুতরাং তোমাকে দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম,

আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। তুমি প্রত্যহ ঐ স্থানে আসিও।

জিনাৎ।'

দুইটী বাঁদীই পত্র পড়িয়া, ইহা বড় মজার ব্যাপার স্থির করিল। ফতিমা বুঝিল যে, এই পত্রে তাহার উদ্দেশ্য যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ হইবে। সে প্রথমে মনে মনে ভাবিল যে, পত্রখানি সম্রাট্‌কে দেখাইবে, কারণ এই উপযুক্ত বাণেই পক্ষীটিকে বধ করা যাইতে পারে। কিন্তু চতুরা ফতিমার চাতুরীপূর্ণ মস্তিষ্ক শেষে অন্য একটা বিষম সংঘাতের উপায় স্থির করিয়া জিনাতের বাঁদীকে যথাস্থানে পত্র দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

জিনাতের বিশ্বস্তা বাঁদী, পত্র লইয়া দুর্গ অতিক্রমপূর্ব্বক যমুনাপারে যে স্থানে গুলজার দণ্ডায়মান ছিলেন, তদভিমুখে চলিল। এদিকে চতুরা ও বুদ্ধিমতী ফতিমা, গুপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়া—প্রাসাদের চারিদিকেই সুড়ঙ্গ বিদ্যমান—দুর্গপ্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল। যে প্রহরীর উপর উক্ত স্থান রক্ষার ভার ছিল, সে সময়ে সময়ে ফতিমার নিকট অনেকপ্রকার উপকার পাইত, সুতরাং ফতিমার আদেশে সে তৎক্ষণাৎ একখানি মই আনিয়া দিলে, ফতিমা দুর্গপ্রাকার হইতে অবতরণ করিল। নিকটস্থ একখানি ক্ষুদ্র তরী আরোহণে যমুনা পার হইয়া গুলজারের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। এদিকে জিনাতের বাঁদী তখনও দুর্গদ্বারের অর্দ্ধপথেও পৌছিতে পারে নাই।

ফতিমা ডাকিল, 'গুলজার!'

গুলজার বয়সে যুবক বটে, কিন্তু দেখিতে বয়স্ক বালকের মত। একটী রমণী তাহাকে ডাকিল দেখিয়া গুলজার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। শেষে ভয়-সচকিত-নেত্রে চাহিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু চতুরা ফতিমা তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া বলিল, 'ভয় কি? আমাকে বল দেখি, তুমি কি এখনও জিনাৎকে ভালবাস?'

গুলজার বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'কে তুমি? দেখিতেছি যে তুমি সকলই জান।'

'আমি রঙ্গমহলের একটী বাঁদী। সেখানে আমার কিছু ক্ষমতা প্রতিপত্তি আছে। আমি কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছি যে, ঐ প্রাসাদের পাষাণ অঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাক,—যেন শক্তি থাকিলে কেবল ঐ দৃষ্টির দ্বারাই ঐ পাষাণগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলাই তোমার উদ্দেশ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখনও কি জিনাৎকে ভালবাস?'

'তাকে ভালবাসি!—সে আমার অস্থির অস্থি—হৃদয়ের হৃদয়। কিন্তু আমার এই জীবন বৃথা বিধ্বস্ত হইতেছে। যে রমণীকে জগদীশ্বর আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হায়! তোমাদের সম্রাট্, তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছেন। রমণি! ভালবাসার কথা বলিতেছ? জিনাৎ যে আমার কি এবং এখন তাহার স্মৃতি আমার পক্ষে কি, তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না! আমি প্রতিদিনই এইখানে আসিয়া থাকি,—প্রতিদিন ঐ পাষাণ-প্রাসাদের দিকে এই আশায় চাহিয়া থাকি যে, যদি একবার সেই বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরীর মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাই, কিন্তু সে আশা প্রায় পূর্ণ হয় না!' গুলজার এই কথাগুলি হুতাশ কাতরকণ্ঠে বলিলেন।

চতুরা ফতিমা যেন সহানুভূতিপ্রকাশক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'জিনাৎ উন্নিষা বেগম কি একবারও তোমার নয়নপথে পতিত হন নাই?

'আমি দেখিয়াছি, কিন্তু হায়! সেই দর্শনের স্মৃতি যেন জলন্ত দাবানলের ন্যায় অহরহ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। ঐ সুন্দর প্রাসাদ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-গৌরবভূষিতা জিনাৎ উন্নিষাকে দেখিয়াছি! কিন্তু কোথায়?—দেখিয়াছি তাহাকে সম্রাটের ক্রোড়ে—দেখিয়াছি

উভয়ে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে একাসনে অবস্থিত। উঃ! সেই দৃশ্য মনে পড়িলে, এখনও এই ভগ্ন হৃদয়ে বজ্রাঘাত হয়।' গুলজার এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া বলিলেন, 'তোমাকেই বা কেন সে সব কথা বলিতেছি? কে তুমি? আমার হৃদয়ের কথাগুলি তুমি সব বাহির করিয়া লইলে? যাও।'

ফতিমা মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, 'গুলজার! আমি তোমার বন্ধু এবং ইচ্ছা করিলে তোমার এই প্রেমের সাহায্যও করিতে পারি। তুমি কি জিনাতের কাছে সতত অবস্থান এবং অনুক্ষণ তাঁহার মুখচন্দ্রিমা দেখিতে ইচ্ছা কর না? আমি শুনিয়াছি যে, প্রণয়ীরা এইরূপ প্রবল কামনাই করিয়া থাকে, এবং সে জন্য অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।'

'কি বলিলে?—আমি তাহা ইচ্ছা করি না? জিনাতের নিকট অবস্থান এবং কেবলমাত্র তাহার বিধুবদন দর্শন জন্য আমি কোন্ স্বার্থ না পরিত্যাগ করিতে পারি?'

'যদি তুমি তাহার নিকট অবস্থান করিতে বাস্তবিকই অভিলাষী হও, তাহা হইলে আজ সন্ধ্যার সময় এই স্থানে আসিও। আমি তোমাকে রঙ্গমহলে লইয়া যাইব।'

'তুমি লইয়া যাইবে?' গুলজার এই প্রশ্ন করিয়া পুনরায় সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —'কিরূপে?'

'আমার কথায় বিশ্বাস কর। তুমি এই স্থানে সন্ধ্যার সময় আসিও। কিন্তু একটা কথা বলি, আসিবার কালে তোমার বেশভূষার দিকে একটু নজর দিও।' এই কথা বলিয়া ফতিমা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবামাত্র গুলজার সাগ্রহে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি কি সত্য কথা বলিতেছ? বাস্তবিকই কি তুমি আমাকে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে?'

'নিশ্চয়; আমাকে বিশ্বাস কর। ফতিমা কখনও মিথ্যা কথা কহে না।'

আহ্লাদিত হইয়া গুলজার বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা কর, আমি এ জগতে সকল বিষয়েই একটী বিশ্বস্ত জীব। আমার উপর দয়া কর। আমার জীবনের একমাত্র আশা-স্বরূপ এই কার্য্যে আমায় নিরাশ করিও না।

ফতিমা পুনরায় আশ্বাস বাক্যে গুলজারকে তুষ্ট করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। সে তরীতে উঠিবামাত্র দেখিল, যমুনাবক্ষে আর একখানি তরী আসিতেছে। সে গুলজারকে সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, 'জিনাৎ তোমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা ঐ নৌকাতে আসিতেছে; কিন্তু সাবধান, যে বাঁদী পত্রখানি লইয়া আসিতেছে, তোমায় আমায় যে সকল কথা হইল, তাহা তাহাকে কিছুই বলিও না।' ফতিমার ক্ষুদ্র তরী অনতিবিলম্বে যমুনার মধ্যস্থলে উপনীত হইল। জিনাতের প্রেরিতা দূতী, যমুনা পার হইবার পূর্ব্বেই ফতিমা দুর্গপ্রাকার উত্তীর্ণ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, গুলজার ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে ফতিমাকে দেখিয়া মনে মনে নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি ফতিমার প্রস্তাবমত এই যে বিষম দুঃসাহসিক এবং অন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মনে ইহা উদিত হইল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। গুলজার প্রণয়ের প্রবল উত্তেজনায়—ভালবাসার বিষম তাড়নায় অন্ধ হইয়া প্রস্তাবিত কার্য্য-সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

জিনাতের বিশ্বস্তা দূতী আসিয়া, গুলজারের হস্তে যখন পত্রখানি দিল, তখন তাঁহার চিন্তানিদ্রা ভঙ্গ হইল। গুলজার সাগ্রহে সানন্দে পত্রখানি পাঠ করিয়া দূতীকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন যে, 'বেগম সাহেবকে

আমার হাজার হাজার সেলাম জানাইও।' এখন গুলজারের উৎকণ্ঠা একেবারে বিদূরিত হইল—এখন সে নিশ্চয় জানিল যে, তাহার প্রণয়িনীর সহিত প্রিয় সংমিলনের আর কোন সন্দেহ নাই।

সেই রজনীতে যে সময়ে দিল্লী হইতে প্রত্যাগত সম্রাট্ সাজাহানকে সসম্মানে গ্রহণ জন্য দুর্গস্থ সকলে দুর্গদ্বারে সমাগত হইতেছিল, যে সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীমণ্ডলী, যোধাবাই মহলের ছাদে সমবেত হইয়া, সম্রাটের আগমনদর্শনজন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুচতুরা ফতিমার অনুগ্রহে গুলজার বাঁদীবেশে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। গুলজারের আকৃতি, তাঁহাকে রমণীরূপে সজ্জিত করিবার কোন বাধাই দেয় নাই। তখন ফতিমা, স্বীয় চক্রান্তটী বেশ সফল হইল দেখিয়া মনে মনে বড়ই হৃষ্ট হইল।

৫

পরদিন আবার ঠিক একবর্ষ পরে সম্রাটের সেই অন্তঃপুরে নওরোজ-উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বর্ষকাল-পরিত্যক্ত সেই মীনাবাজার, পুনরায় সময়োপযোগী আলোকমালা ও শোভা-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছে, এবং সম্রাটের অন্তঃপুর-রমণী এবং নগরবাসিনী শত শত সম্ভ্রান্তা মহিষী মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতা প্রদর্শন জন্য সমবেত হইয়াছেন। কেবলমাত্র মমতাজ অনুপস্থিত। এই উৎসব উপলক্ষে জিনাৎ উন্নিষা যেন সজীব হইয়াছেন, কারণ কেবল এই একমাত্র উৎসবে তিনি প্রাসাদের বহির্দ্দেশের রমণীমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে অবসর পাইয়াছেন। জিনাৎ সমস্ত মহামূল্য অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র সম্রাট্ সাজাহান স্বহস্তে তাঁহাকে যে হীরক-বলয় এবং শিরোভূষণ পরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সে দিন কেবল তাহাই স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। গতবর্ষের নওরোজের দিন তিনি যে বেশ পরিধান করিয়াছিলেন, সে বেশটী প্রণয় ও সৌভাগ্যের শুভচিহ্নস্বরূপে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি সম্রাটের পরম প্রিয়তমা পত্নী তাঁহার সেই প্রথম সৌভাগ্যক্ষেত্র—সেই মহোৎসবপ্রাঙ্গণে সেই বেশে ধীর-পদবিক্ষেপে উপস্থিত হইলেন। পথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের নয়নযুগল উভয়ের বদনমণ্ডলে অর্পিত হইবামাত্র উভয়ের অধরেই মৃদুহাস্য দেখা দিল—উভয়ের হৃদয়ই উভয়ের মূর্ত্তি-দর্শনে হৃষ্ট হইল। সম্রাট্ সহাস্যে বলিলেন, 'দেখিতেছি, এই কুসুমটী সামান্য আবরণে আবরিত হইয়া সরলতা এবং মধুরতার সহিত আজি এই মধুযামিনীতে প্রস্ফুটিতা হইতেছে।'

বেগম জিনাৎ উন্নিষা মৃদুহাস্যসহকারে বলিলেন, 'জাঁহাপনার যেরূপ কৃপা। আপনার এই দাসী, সামান্য বেশে যে আপনার ভালবাসা লাভ করিয়াছে, ইহাপেক্ষা অন্য কোন বেশকেই সে মহামূল্য বা সমুজ্জ্বল জ্ঞান করে না।'

'জিনাৎ! তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ। এই সামান্য বেশ যেরূপ প্রশংসার পাত্র, তুমি তদপেক্ষা ইহার প্রশংসা করিতেছ। বেশ বেশই থাকে, কিন্তু যে সেই বেশ পরিধান করে, সেই-ই বেশকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে।'

'জাঁহাপনা! মদন কেবল অন্ধ নহে। লোকে বলে, প্রণয়ও অন্ধ।'

'তাহা হইতে পারে, কিন্তু তোমার বুদ্ধিটী তত প্রখর নহে, কারণ তুমি আমার এই বৃদ্ধ মুখখানিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মুখগুলির মধ্যে একখানি মুখ বলিয়াছ।'

'এখন আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। জাঁহাপনা! আমি তাহাদিগের মধ্যে একখানি বলি নাই; আমি বলিয়াছি, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—মনোহর।'

জিনাৎ অলসভাবে সম্রাটের অঙ্গে অঙ্গ

ঢালিয়া দিবামাত্র সম্রাট্ দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে, শত শত চুম্বনে সেই প্রেমালাপের পরিসমাপ্তি করিলেন।

জিনাৎ তখন মানাবাজারে এবং সম্রাট্ গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। আজি গুলজার আর সে গুলজার নাই—আজি তিনি ফতিমার কৃপায় মহামূল্য বসনে ও সমুজ্জ্বল ভূষণে বিভূষিত হইয়া একটী ধনবতী রূপসী মূর্ত্তিতে পরিণত! ফতিমা তাঁহাকে স্বীয় কক্ষেই সঙ্গোপনে আশ্রয় দিয়াছিল। গুলজার, সেই ছদ্মবেশে—সেই সুন্দরী যুবতী-মূর্ত্তিতে মীনাবাজারে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় হৃদয়ের রাণী—ভালবাসার পরমপাত্রীর পদানুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জিনাতের নিকট-বর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিতেও অসমর্থ হইলেন না। জিনাৎ কিন্তু গুলজারকে চিনিতে পারিলেন না। এমন কি, তাঁহার মনে কোন প্রকার সন্দেহেরও উদয় হইল না, বরং ছদ্মবেশী গুলজারের সহিত যতই আলাপ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে যেন গুলজারের সহিত আলাপসম্ভাষণের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের সহিত আলাপে অতীব প্রীত হইয়া পরস্পরের করধারণে সেই মীনাবাজারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সম্রাট্ রাজকার্য্য সমাধার পর মীনাবাজারের সৌন্দর্য্যদর্শন-সুখ-সম্ভোগজন্য সেই যবনিকার অন্তরালস্থ সিংহাসনে উপবেশন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম যে দিন জিনাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় সম্রাটের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছিল, আজি জিনাৎকে সেইরূপ উৎফুল্ল এবং সজীব দর্শনে সম্রাট্ সেইমত বিমুগ্ধ হইলেন। এই সময়ে ফতিমা আসিয়া সভয়ে কম্পিতকলেবরে সম্রাটের নিকট পতিতজানু হইয়া করযোড়ে বলিল, 'জাঁহাপনা! যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আপনার বাঁদী আপনার নিকট একটী নিবেদন করিতে পারে।'

সম্রাট্ তাহার অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং সোৎকুল্লে প্রশ্ন করিলেন, 'মমতাজের কি কিছু হইয়াছে?'

'না, জাঁহাপনা!—যদি ক্ষমা করেন, একটী অতি গুরুতর বিষয় নিবেদন করিতে পারি।'

'কি বলিতে চাহিস্, বল্।'

'জাঁহাপনা! নূতন বেগম সাহেব, মীনাবাজারে একটী পুরুষের করধারণ করিয়া বেড়াইতেছেন।'

'হতভাগিনী বাঁদি! তুই মিথ্যা কথা কহিতেছিস্, আর মিথ্যা কহিতে পারিবি না। এখানে কে আছ, এখনই আমার সমক্ষে এই বাঁদীর জিহ্বা কাটিয়া দাও।'

দুইটী অসিধারিণী তাতাররমণী সেই মুহূর্ত্তে সম্রাটের সেই আজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু ফতিমা করযোড়ে কাতর-কণ্ঠে কহিল, 'জাঁহাপনার এই আজ্ঞা অবশ্যই পালিত হইবে, কিন্তু যদি জাঁহাপনা অন্য কাহাকেও তদন্ত করিতে পাঠান, তাহা হইলে আমার এই কথা যে সত্য, তাহা নিশ্চয়ই সহজে প্রমাণিত হইবে।'

ক্রোধান্বিত সম্রাট্ সাজাহান, বাঁদী ফতিমাকে সবলে ধারণ করিয়া সেই যবনিকার নিকট টানিয়া আনিয়া জিনাৎ এবং গুলজারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'বাঁদি! ঐ দেখ, জিনাৎ অন্য এক রমণীর সহিত বেড়াইতেছেন।'

চতুরা ফতিমা কহিল, 'জাঁহাপনা! ও রমণী নয়, পুরুষ।'

এই কথা শুনিয়া সম্রাট্ স্তম্ভিত এবং অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তিনি উভয়ের প্রতি মনোযোগের সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ যখন দেখিলেন যে, জিনাতের সঙ্গী জিনাতের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিদান করিতেছে,

এবং এরূপ বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে যে, সে নিশ্চয় নারীবেশধারী পুরুষ, তখন সম্রাটের ক্রোধানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কুপিত কণ্ঠে আজ্ঞা দিলেন যে, জিনাৎ ও তাঁহার সঙ্গীকে বন্দী করিয়া যেন অবিলম্বে এখানে আনয়ন করা হয়। কিন্তু ফতিমা বাধা দিয়া বলিল যে, ঐ ব্যক্তি বাস্তবিক পুরুষ কি স্ত্রীলোক, অগ্রে তাহার তদন্ত করা কর্ত্তব্য।

সম্রাট্ তাহার কথা ন্যায়সঙ্গত ইহা স্বীকার করিয়া তাতারবীরনারীদিগকে তদন্ত জন্য পাঠাইয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে দেওয়ানি আমে গমন করিলেন।

সম্রাটের এই নূতন আজ্ঞায় ফতিমার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল না যে, গুলজার তখনই ধৃত হইয়া, সম্রাট্ সকাশে নীত হয়; কারণ তাহা হইলে হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িত যে, ফতিমা নিজেই এই চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছে। সে কথা প্রকাশ হইলে, ফতিমার যে প্রাণদণ্ড হইত, তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। সেই জন্যই ফতিমা, তাতার রমণীদিগের সহিত মীনা-বাজারে গিয়া গুলজারকে একটু দূরে লইয়া আসিল। তাতার-রমণীদ্বয় যখন পরীক্ষা করিয়া আসিল যে, ফতিমা যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তখন একটী তাতার রমণীকে এই সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রকাশ জন্য পাঠাইয়া দিল এবং যতক্ষণ না এ সম্বন্ধে সম্রাটের অনুমতি আইসে, ফতিমা ততক্ষণ দ্বিতীয়া তাতার-রমণীর সহিত যেন গুলজারের প্রহরী স্বরূপে রহিল। কিন্তু চতুরা ফতিমা, সেই দ্বিতীয় তাতার-রমণীকে কি যেন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিবে বলিয়া একটু দূরে লইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই ফতিমার ইঙ্গিতাধীন গুলজার চকিতের মধ্যে মীনাবাজারের বিশাল দ্বার পার হইয়া, প্রাঙ্গণে সরিয়া গেল। সেইস্থানে যে একটী অতি গুপ্ত কক্ষ ছিল, যে কক্ষের অস্তিত্ব অতি সামান্যসংখ্যক লোকেই জানিত, ফতিমা পূর্ব্বেই সেই গুপ্ত কক্ষের কথা গুলজারকে বলিয়া রাখিয়াছিল।

এদিকে চতুরা ফতিমা, কথোপকথন শেষ করিবামাত্র সেই দ্বিতীয়া তাতার-রমণী দেখিল যে, গুলজার অদৃশ্য হইয়াছে! ইত্যবসরে প্রথমা তাতার-রমণী সম্রাটের নিকট হইতে আসিয়া বলিল যে, 'জিনাৎ-উন্নিষা বেগম ও ছদ্মবেশী পুরুষটীকে সম্রাট্ তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।' কিন্তু গুলজার কোথায়? তখন মীনাবাজারে অনুসন্ধানের মহাধূম পড়িয়া গেল। প্রত্যেক স্থানে অনু-সন্ধান করা হইল বটে, কিন্তু কোথাও সেই পুরুষটীকে পাওয়া গেল না। গুলজার লুক্কায়িত হইয়া ফতিমার পূর্ব্ব উপদেশমত নারীবেশ ত্যাগপূর্ব্বক খোজা প্রহরী মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

ফতিমা, নবীন খোজা মূর্ত্তিধারী গুলজারকে দেখিয়া, সম্রাট্ যে কক্ষে বসিয়া এই ঘটনার তদন্ত দর্শন করিতেছিলেন, সেই কক্ষ পর্য্যন্ত গুলজারকে এই ভাবে ধরিয়া আনিল যেন উভয়ে অদৃশ্য পুরুষটীর অনুসন্ধানে দুইজনে বড়ই ব্যস্ত। সেইস্থান হইতে একটী গভীর গুপ্ত সুড়ঙ্গ রঙ্গমহল পর্য্যন্ত গিয়াছে, সুতরাং উভয়ে সেই পথে অদৃশ্য হইল। গুলজার অনতিবিলম্বে বাঁদী মহলে ফতিমার নিজের গৃহে সচ্ছন্দে আসন গ্রহণ করিল।

যখন সংবাদ আসিল যে, সেই ছদ্মবেশী পুরুষের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সম্রাট্ ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি দেওয়ানি আমের সম্মুখস্থ স্থলে ক্রোধ পরি-চালিত চরণে বিচরণ করিতে লাগিলেন— অধরোষ্ঠ কোপে কম্পিত হইতে লাগিল, নয়ন

যুগল আরক্তিম মূর্ত্তি ধরিয়া সকলেরই ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। পরক্ষণে বিচলিত সম্রাট্ তত্রত্য কৃষ্ণ মর্ম্মরাসনে বসিয়া বেগম জিনাৎ উন্নিষাকে তথায় আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞায় সকলেই চমকিত হইল, কারণ এরূপ ঘটনা ঘটিলে, প্রায়ই গুপ্ত কক্ষে সরাসরি বিচার হইয়া থাকে, এবং বিচারের পর একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গমধ্যস্থ কক্ষে অপরাধিনীর প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে।

অপরাধিনী বেগমকে এরূপ প্রকাশ্য স্থানে মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আনয়ন করা অন্তঃপুর-প্রথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া সকলেই সেই আজ্ঞায় বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়, সুতরাং প্রহরীগণ সেই আজ্ঞা পালন জন্য ধাবিত হইল।

পরমুহূর্ত্তে সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহাক্রোধে অধীরভাবে পাদচারে বেড়াইতে লাগিলেন। একবার মুহূর্ত্তের জন্য অপর দিকে স্থাপিত শ্বেত মর্ম্মরাসনে বসিয়া যমুনার প্রতি দৃষ্টিদানে চিত্তকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয় জ্বলন্ত অনলে বিধ্বস্ত হইতেছিল, সুতরাং স্থির থাকিতে পারিলেন না। সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বেগম-মহলের প্রবেশ-পথেই তিনি অপরাধিনী জিনাৎ উন্নিষাকে দেখিতে পাইলেন। জিনাতের সর্ব্বশরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কিন্তু ঘনঘন কম্পিত। তিনি সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া একটু কঠোর স্বরে কহিলেন, 'একে এখান হইতে লইয়া যাও। এখনই ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাও। একে জানাও যে অবিশ্বাসিনী বেগমের অদৃষ্টে কি দণ্ড হয়। এখনই লইয়া যাও।'

সম্রাটের এই বিষম আজ্ঞায় জিনাৎ আত্মসংযম করিয়া, স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক স্বীয় পতির প্রতি দুইটী নিরপরাধ নয়ন অর্পণ করিয়া কহিল, 'আমার প্রভু! আমার পতি! জাঁহাপনা! আমি কি করিয়াছি?' তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদর জলধারা বহিয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

সম্রাট্ সক্রোধে কহিলেন, 'কি করিয়াছিস্? তুই আমার হৃদয়ে নরকের আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছিস্। উঃ! আর আমি সহ্য করিতে পারি না। ঐ কোমল নয়নযুগল, ঐ নম্র-দৃষ্টি, উঃ! ঐ দুটী বিষাক্ত বাণেই তুই আমার হৃদয়ে সমস্ত নরকযাতনার উদ্রেক করিয়াছিস্। এখনই ইহাকে লইয়া যাও, এখনই এই মূর্ত্তিমতী প্রেতিনীকে লইয়া যাও। আমি ইহাকে দেখিতে পারি না। এখনই ইহার ফাঁসী দাও।'

মূর্চ্ছান্বিতা জিনাৎকে অবিলম্বে তথা হইতে অপসারিত করা হইল। সমস্ত বেগমমহল উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেরই মুখে জিনাতের এই দণ্ডের কথা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ কাঁদিল, কেহ কেহ হাসিল, এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বয়স্কা, তাহারা রঙ্গমহলের অতীত ইতিহাসের এইরূপ ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিল।

মমতাজ, একাকিনী তাঁহার কক্ষে দুঃখিত চিত্তে বসিয়া কবি হাফেজের কাব্য পাঠে চিত্তকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বাঁদী ফতিমা আসিয়া, জিনাতের ভাগ্যে যে দণ্ড বিধান হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানাইল। মমতাজ, পর মুহূর্ত্তেই কাব্যখানি দূরে ফেলিয়া সবিস্ময়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

সকাতরে মমতাজ কহিলেন, 'এ কথা কি সত্য? হা অভাগিনি! ভগবন্! তুমি সাক্ষী, তাহার প্রতি আমার কোন কোপই নাই।' পরক্ষণেই বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী মমতাজের নয়নযুগলে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল।

'ফতিমা! সম্রাট্ এখন কোথায়?' মমতাজ

সোৎসুকে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্তর হইল, যূথিকা প্রাসাদে।'

'তুমি এখনই সেখানে গিয়া, তাঁহাকে বল যে, আমি একবার তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ইচ্ছা করি।'

ফতিমা বলিল, 'এখন আপনার এই অনুগ্রহ লাভের কোন আশা নাই। কারণ সম্রাট্ বলিয়াছেন, আজ রাত্রিতে তিনি একাকী থাকিবেন।'

'তা হ'ক তুমি যাও। আমি অবশ্যই তাঁহার সহিত দেখা করিব, সেই অভাগিনী বালিকার জীবন অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।'

'আপনি অবোধের মত কাজ করিবেন না। যে আপনার জীবনের সুখশান্তি আনন্দ মঙ্গলের অতীব অন্তরায়স্বরূপ ছিল, সেই অন্তরায় অপসারিত হওয়ায় আপনি বরং আনন্দিত হউন।'

'ফতিমা! কি লজ্জা! আমি এতদূর নীচ হইব, ইহা ভাবিতেও যে লজ্জা বোধ হয়। ওরূপ কথা তুমি আর কখনও বলিও না। যদিও সে আমার প্রতিযোগিনী, কিন্তু তথাপি আমি তাহাকে ভালবাসি। সে পবিত্র-হৃদয়া সরলা বালিকা—সে রঙ্গমহলের পক্ষে উপযুক্ত নহে।'

মমতাজের এই উক্তিতে ফতিমা সবিস্ময়ে বলিয়া ফেলিল, আমিই যে চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি, তাতে আমি উপযুক্ত পুরস্কারের পাত্রী নহি, অবশ্য আপনি এ কথা বলিবেন না।'

'কি! তুমি এই সব কাণ্ড বাধাইয়াছ? এ কথার অর্থ কি?'

'বেগম জিনাৎ উন্নিষা সম্পূর্ণ নিরপরাধা। বাস্তবিক তিনি জানিতেন না যে, তিনি যাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সে একটী পুরুষ। আমিই সেই পুরুষটীকে এখানে গোপনে আনিয়া যাহাতে বেগমের সহিত ঐরূপ সংঘটন হয়, তাহার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছিলাম।'

মমতাজ, ফতিমার এই কথায় সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'পাপীয়সি! তুই সেই নিরপরাধা বালিকার রক্তপাতের গুরু পাপভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করিলি! তুই এখনই এখান হইতে দূর হইয়া যা। তুই আর আমার কাছে আসিস্ নি। হে আল্লা! হে খোদা! এই পাপভার হইতে আমাকে রক্ষা করুন।' মমতাজ গভীর দুঃখভারে অবনত হইয়া হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মুখোত্তোলন করিবামাত্র, সম্মুখে ফতিমাকে দেখিয়া, কোপসহকারে কহিলেন, 'তুই এখনও এখানে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছিস্? দূর হ, আমি আজ্ঞা দিতেছি, এখনই প্রাসাদ হইতে দূর হ, নহিলে যে ফাঁসীকাঠে জিনাতের প্রাণদণ্ড হইবে, তোকেও সেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে হইবে।'

ফতিমা এরূপ পুরস্কারের আশা করে নাই, সুতরাং সে বিফলমনোরথ হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

মমতাজের মনে একটী কল্পনার উদয় হইল, তিনি ফতিমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি পুরস্কারের লোভে এই জঘন্য কাজ করিয়াছ। এখন এই চক্রান্তরহস্য ভেদ করিয়া জিনাৎকে বাঁচাও, তোমাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিব।'

'আমিই যে এই চক্রান্ত বিস্তার করিয়া এই অঘটন সংঘটন করিয়াছি, ইহা সম্রাট্ বা বেগমেরা জানিতে পারিলে প্রাণদণ্ডই আমার পুরস্কার হইত। কিন্তু এখন আমি এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে, আমি জিনাৎ উন্নিষা বেগমের প্রাণ বাঁচাইব।'

'যখন জীবনের সমস্ত প্রিয়ধন হারা হইল,

তখন জীবন ত অতি সামান্য। বালিকা জিনাৎ উন্নিষা, সম্রাট্‌কে যেরূপ ভালবাসিত, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং আমি তাহাকে যেরূপ বলিয়া বুঝিয়াছি, সে যদি যথার্থই সেইরূপ হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে জীবন ভিক্ষা করা অপেক্ষা সে শীঘ্রই মরিতে চাহিবে। যাহা হউক, অন্ধকার রাত্রিতে যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড না হয়, এমন উপায় দেখ, পরে আমি যাহা করিতে পারি, তাহা করিব।'

এই কথা শুনিয়া ফতিমা চলিয়া যাইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। মমতাজ কি করিবেন, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া কক্ষমধ্যে উৎকণ্ঠিতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় অবশেষে তিনি স্বীয় কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সম্রাট্‌ যে নিতান্ত ক্রুদ্ধ—নিতান্ত অসন্তুষ্টভাবে আছেন, দ্বারস্থ স্ত্রী-প্রহরীগণ মমতাজকে তাহা নিবেদন করিল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রবেশের কোন বাধা দিতে সাহস করিল না। মমতাজ অনতিবিলম্বে সম্রাটের সমক্ষে উপনীত হইলেন।

সম্রাট্‌ তখন করযুগলে বদনাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতেছিলেন। মমতাজ ধীরপাদবিক্ষেপে পতির সমক্ষে আসিয়া, ভূপাতিত-জানু হইয়া, করযোড়ে প্রিয়তমের মুখের প্রতি দৃষ্টিদানে করুণকণ্ঠে কহিলেন, 'জাঁহাপনা! দাসীর একটী ভিক্ষা আছে।'

সম্রাট্‌ মমতাজের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টি দান করিয়া কহিলেন, 'মমতাজ! আমি অতি গুরুতর দুঃখ পাইয়াছি।'

সম্রাটের সেই গভীর দুঃখোচ্ছ্বাস মমতাজের অন্তরের অন্তস্তলকে যেন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মমতাজ তখন স্বীয় পতির হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংবিদ্ধ দুঃখ-বাণটীকে সমূলে উৎপাটনজন্য জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয় আছে, তৎসমস্ত দান করিতে মনে মনে অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, সময়োপযোগী একটী কথাও তাঁহার রসনাগ্রে আসিল না। যদিও সম্রাটের সেই দুঃখে মমতাজের হৃদয়ে গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তিনি একটী প্রিয়কথা বলিয়া পতির ক্ষতহৃদয়ে অমৃত প্রদান করিতে পারিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন এবং উভয়ের হৃদয় যেন নীরবেই কথোপকথন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সম্রাট্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'তুমি কি চাও?'

মমতাজ কহিলেন, 'জাঁহাপনা! আমি একটী ক্ষুদ্র বালিকার—যে বালিকা আপনার কোপের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাত্রী, সেই বালিকার জীবন ভিক্ষা করিতেছি।'

এই কথা শুনিয়া, সম্রাটের মূর্ত্তি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তিনি এরূপ নীরব হইলেন যে, সেই নীরবতাই যেন সুন্দরী মমতাজের রসনাকে অবশ করিয়া ফেলিল। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে সম্রাট্ বলিলেন;—'এইরূপে আমার হৃদয়ের জ্বালাকে বৰ্দ্ধিত করিবার জন্যই কি তুমি এই রাত্রিতে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ?'

'জাঁহাপনা! কেবল সেই বালিকার জন্য নহে—আপনার জন্যও আমি এই ভিক্ষা চাহিতেছি। কেন আপনি এত দুঃখিত হইয়াছেন? আপনি তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়াই কি এই দুঃখ এত গুরুতর হয় নাই? আপনি এখনও কি তাহাকে ভালবাসেন না? আপনি জিনাতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন; বালিকা যে আপনার এই আজ্ঞায় সহাস্য আস্যে, ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবলি দিবে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি না।

জাঁহাপনা! বালিকার সেই প্রাণদণ্ডে আপনার হৃদয়ে শান্তি দেখা দিবে, ইহা যদি আপনি ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আপনি এখন আত্মবিস্মৃত। আমি রমণী, আমি জানিতেছি যে, এ জগতে সকল রমণী অপেক্ষা তাহাকে আপনি অধিক ভালবাসেন। আপনি ভাবিতেছেন যে, বালিকা আপনার ভালবাসার বিপরীত প্রতিফল দিয়াছে। সেই জন্যই মহাক্রোধে আপনি তাহাকে হত্যা করিতেছেন। তাহার সেই প্রাণদণ্ডে আপনি শান্তি পাইবেন বলিয়া যে স্থির করিয়াছেন, ইহাতে কেবল আপনার বিষণ্ন হৃদয়কেই প্রতারিত করিতেছেন মাত্র। কিন্তু কাল যদি আপনি জানিতে পারেন যে, জিনাৎ নিরপরাধা, তাহা হইলে এই দুঃখ কি দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া আপনার হৃদয়কে বিধ্বস্ত করিবে না? হৃদয়স্থ ক্রোধ চণ্ডালস্বরূপ—সেই চণ্ডালই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলে। জাঁহাপনা! আপনার হৃদয়কে বৃথা ছিন্ন হইতে দিবেন না। আমার ভিক্ষা, বালিকার জীবনদান করুন।'

সম্রাট্ ধীরে ধীরে কহিলেন, 'আমি হৃদয়ে যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা তুমি জান না।'

'নাথ! আমি তাহা জানি। আপনি অকস্মাৎ একটা কাজ করিয়া, তাহার ফলস্বরূপ আপন হৃদয়ের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন যাহাতে না করেন, সে বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করি, জিনাৎ কি বাস্তবিকই অবিশ্বাসিনী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে? আপনি কি তাহার অপরাধের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন? আপনি তাহার এই কঠোর দণ্ড বিধানের পূর্ব্বে সে কি বলে, তাহা কি তাহার মুখে শুনিয়াছেন? আপনি কি নিশ্চিত বলিতে পারেন যে, সেই পুরুষ কেবল কল্পনাপ্রসূত ছায়া মাত্র? অথবা আপনি কি বলিতে পারেন যে, রঙ্গমহলের কোন কুচক্রী স্ত্রীলোক জিনাতের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য এই কাণ্ড উপস্থিত করিয়া দেয় নাই? আপনি কি নিশ্চিত জানিয়াছেন যে, জিনাৎ কোন প্রতিযোগিনী বেগমের ষড়যন্ত্রে পতিত হয় নাই? জাঁহাপনা! আপনি জিনাতের প্রমুখাৎ কিছুই শুনেন নাই, সে বাস্তবিক অপরাধিনী কি না, তাহারও প্রকৃত বিশ্বাস্য প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং সে যদি নিরপরাধা হয়, তাহা হইলে, মনে রাখিবেন, শেষ বিচারের দিনে তাহার রক্ত, আপনার বিপক্ষে উত্থিত হইবে। যদি সে বাস্তবিক অপরাধিনী হয়, সে মরুক, কিন্তু সে কি বলিতে চাহে, তাহা যেরূপে হউক, একবার আপনি শ্রবণ করুন। জাঁহাপনা! অপরের জন্য নহে, কেবল মাত্র আপনারই জন্য আমি এই ভিক্ষা চাহিতেছি।'

সম্রাট্ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, মমতাজ! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। সে কি বলে, তাহা শুনা উচিত। কিন্তু তাহাকে এখন আর দেখিতে পারিব না। এই ঘটনায় আমার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। তুমিও বিচার করিও। আজিকার রাত্রিটা তাহার জীবন রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিলাম।'

৭

সেই রজনীতে যাহাতে জিনাতের প্রাণদণ্ড না হয়, সম্রাটের এই আজ্ঞা বেগমমহলের কারাধ্যক্ষ খোজার নিকট যথাস্থান দিয়া প্রেরিত হইল। প্রাসাদের নানা কর্ত্তৃপক্ষের মধ্য দিয়া সেই আজ্ঞা যে সময়ে প্রেরিত হইতেছিল, বাস্তবিক রঙ্গমহলের সর্ব্বপ্রধানা কর্ত্রী সম্রাট্‌কুমারী জেহানারা যখন ভাবিতেছিলেন যে এই আজ্ঞা এখন পাঠাইব, কি প্রাণদণ্ড হইয়া যাইলে পাঠাইব,

সেই সময়ের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিল যে, সেই আজ্ঞা বিফল হইয়া গেল। উক্ত আজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্বেই জিনাৎকে তাঁহার কক্ষ হইতে নিম্নতলস্থ ঘনঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক কুণ্ডবৎ গৃহের মধ্য দিয়া—সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া একটী ভয়ানক অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। গৃহটী এত অন্ধকারপূর্ণ যে, দিনের বেলাতেও তথায় অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণালোক কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না। একটী অস্ত্রধারিণী তাতার-রমণী, প্রজ্বলিত মশাল ধরিয়া অগ্রে অগ্রে এবং আর একটী অস্ত্রধারিণী তাতার-রমণী পশ্চাতে চলিয়াছে।

এদিকে ফতিমা, দ্রুতপদে স্বীয় গৃহে উপনীত হইল। গুলজার সেই গৃহে বসিয়া, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। ফতিমা যেন প্রবল বাত্যার ন্যায় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই গুলজারকে বাহিরে আনিয়া কাণে কাণে ক্ষীণস্বরে কহিল, 'যদি জিনাতের প্রাণ বাঁচাইতে চাও, শীঘ্র এস।' গুলজার, সশস্ত্র খোজা প্রহরীর বেশেই ছিলেন; তিনি কোন কথা না বলিয়া ফতিমার অনুসরণ করিলেন। দুইজনেই দ্রুতপদে রঙ্গমহলের প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলেন। ফতিমা পাষাণ-প্রাসাদের গাত্রস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বার উদঘাটন করিল। একটী যুবতী প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ফতিমা সেই মশাল কাড়িয়া লইল এবং পরমুহূর্ত্তেই গুলজারকে লইয়া ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহারা গুপ্তপথ অতিক্রম করিয়া, যেখানে জিনাতের প্রাণদণ্ডের আয়োজন হইতেছিল, অচিরেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন প্রাণদণ্ডের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। একজন কদাকার আবিসিনীয় দাস, যাহার উপর এই জঘন্য কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল, সে সমস্ত আয়োজন করিয়া কেবল জিনাতের গলদেশে ফাঁসী রজ্জু সংলগ্ন করিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই রজ্জু সংলগ্ন হইলে, বধমঞ্চের কাষ্ঠখানি টানিবামাত্রই সেই সুন্দরী জিনাতের শরীর নিম্নস্থ কূপের ঘনকৃষ্ণ জলের উপর পতিত হইত। গুলজার নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হত্যাকারীর দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু ফতিমা বাধা দিয়া, সেই জল্লাদের হস্তে আসরফীপূর্ণ একটী থলিয়া দিয়া কহিল, 'এই নাও। এ বালিকাকে ছাড়িয়া দাও।'

সেই নর-রাক্ষস তখন বলিল, 'বটে? ইহার বদলে আমার ফাঁসী হউক। না, তা কখনই পারিব না।'

ফতিমা একখানি ছাড়পত্র দেখাইয়া কহিল, 'রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই এই ছাড়পত্র দেখাইয়া, তুমি প্রাসাদের বাহিরে সহজেই যাইতে পারিবে। এই এত আসরফী তখন কেবল তোমারই হইবে। আর এই মহামূল্য মুক্তার থলী নাও।' ফতিমা এই কথা বলিয়া, মমতাজপ্রদত্ত মুক্তার থলী তাহার হস্তে দিল।

কিন্তু জল্লাদ কিছুতেই সম্মত হইল না। সে জিনাতের করধারণ করিয়া আকর্ষণ করিল। ঘাতকের করস্পর্শে জিনাৎ চৈতন্যবিহীনা হইয়া পড়িল। তখন গুলজার আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীরে অমানুষিক বল আসিয়া দেখা দিল। তিনি দণ্ডদ্বারা ঘাতককে বিষম সংঘাত করিলেন। ঘাতক ভূপতিত হইল। ফতিমা পরমুহূর্ত্তে স্বীয় হস্তস্থ প্রজ্বলিত মশাল দ্বারা দণ্ডায়মান অপর তাতার-রমণীর মশালের উপর আঘাত করিল। দুইটী মশাল নিম্নস্থ কূপে পড়িয়া গেলে গৃহটী প্রায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর একটী অব্যর্থ আঘাতে গুলজার সেই তাতার-রমণীকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিলেন।

পরমুহূর্ত্তে গুলজার এবং ফতিমা, অচৈতন্যা জিনাৎকে লইয়া অদৃশ্য হইল। তখন সেই ঘোর অন্ধকারে জহ্লাদ এবং তাতার-রমণীদ্বয় পরস্পরকে ধরিয়া ভাবিল যে, তাহারা ফতিমা ও গুলজারকে ধরিয়াছে। তিনজনেই সেই ঘোর অন্ধকারে পরস্পরকে টানাটানি করিতে লাগিল।

গুলজার, জিনাৎকে ক্রোড়ে লইয়া, ফতিমার বসনাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক সেই অন্ধকারময় কক্ষ ত্যাগ করিয়া যূথিকা-প্রাসাদের নিম্নস্থ ভূগর্ভের মধ্যে একটী নিভৃত কক্ষে আসিয়া পৌঁছিল। তত্রত্য একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া দুর্গের নিম্নপ্রাকার দেখা যাইতেছিল। গবাক্ষের বন্ধনী কাষ্ঠদণ্ডগুলি অতি প্রাচীন ছিল, সুতরাং গুলজারের সবল সংঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইল। তখন উভয়ে জিনাৎকে লইয়া দুর্গের সেই নিম্ন প্রাকারের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। তত্রত্য প্রহরী, ফতিমার বিশেষ পরিচিত ছিল। ফতিমা তাহার হস্তে আসরফীপূর্ণ একটি থলিয়া দিল। প্রহরীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই প্রহরীর সাহায্যে গুলজার, জিনাৎকে ক্রোড়ে লইয়া যমুনার বালুময় তীরে উপনীত হইল। ফতিমা অদূরস্থ একখানি অতিক্ষুদ্র তরী দেখাইয়া দিল। গুলজার, জিনাৎকে লইয়া তদারোহণে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন ফতিমা, দুর্গমধ্যে স্বীয় কক্ষে থাকিয়া আপনার কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত ছাড়পত্রের সাহায্যে সেই রজনীতেই প্রাসাদ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। মমতাজের সহিত একবার দেখা করিয়া পারিতোষিক চাহিবে, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর মমতাজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তাহার নিকট যাইতেও সাহস করিল না। কিন্তু ফতিমা মমতাজকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত—এখন এই পলায়নের সময় ম্লানে মনে বলিল, 'বেগম মমতাজ! ভাল, ভালবাসার প্রতিফল!'

৮

গুলজার ইতঃপূর্ব্বে যমুনাকূলে যে কুটীরে অবস্থান করিতেন, জিনাৎকে লইয়া সেই কুটীরে উপনীত হইলেন। অচৈতন্যা জিনাৎকে শয্যায় শায়িত করিয়া, স্বীয় বুদ্ধি-কৌশল এবং অভিজ্ঞতামত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একজন হাকিমকে আনিয়া, জিনাৎকে তাহার চিকিৎসাধীনে রাখিলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তিন দিন পরে জিনাতের চৈতন্য হইল। তিন দিন পরে জিনাৎ সবিস্ময়ে, নয়ন উন্মীলন করিয়া চারিদিকে চকিত নেত্রে দৃষ্টিদান করিতে লাগিল। গুলজার তদ্দর্শনে ভীত হইয়া জিনাতের নিকট আসিয়া বলিলেন। গুলজারকে দেখিয়া জিনাৎ ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?—আমি কোথায়?—সম্রাট্ কোথায়?'

'আমি গুলজার। প্রিয়তমে! এটী আমার কুটীর। এখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তি ও বিশ্রাম উপভোগ কর। সম্রাট্ আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।'

'অনিষ্ট?—তুমি কি বলিতেছ?—এখানে আমাকে কে আনিল?'

জিনাতের এই প্রশ্নে গুলজার মনোমধ্যে বড়ই দুঃখ পাইল। ভাবিল ইহা জিনাতের আত্মবিস্মৃতি ও উন্মাদের লক্ষণ। অতি ধীরে ধীরে স্নেহপ্রীতিসহকারে গুলজার, তাঁহাদিগের উভয়ের অতীত জীবনের কথাগুলি একে একে জিনাতকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সে সকলই বৃথা হইল। আরও দুইটী দিন অতীত হইলে পর জিনাৎ

আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

জিনাৎ এই অপ্রত্যাশিত বিপদে নিতান্ত দুর্ব্বল—নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডলে যে বিষাদমিশ্রিত সৌন্দর্য্যরেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, সচরাচর তাহা দেখা যায় না। তাঁহার সেই সমুজ্জল নয়নযুগলে সম্রাজ্ঞীর মহত্ত্ব যেন বিস্ফুরিত হইতেছিল, এবং সম্রাজ্ঞীর পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও আকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। জিনাৎ সঙ্কেতে গুলজারকে আপনার নিকট আসিতে বলিয়া, ক্ষীণ অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "গুলজার! তুমি একজন বিশ্বাসহন্তা কাপুরুষ। তুমি সম্রাট্‌পত্নীকে কোন্ সাহসে হরণ করিয়া আনিলে?"

গুলজার এরূপ বাক্য শুনিবার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না এবং এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহাও জানিতেন না। তাঁহার মুখ হইতে "প্রিয়তমে!" এই কথাটী বাহির হইবামাত্র জিনাৎ কঠোরভাবে বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি ওরূপ সম্ভাষণে আমার সহিত কথা কহিতে পাইবে না। তুমি আমাকে এখানে আনিয়া অতি জঘন্য কাজ করিয়াছ। আমার পতি আমার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, তুমি কেন তাহাতে বাধা দিলে?"

"জিনাৎ কেবল তোমার জন্তই আমি ইহা করিয়াছি। তোমার এই কোমল সুরম জীবনটী এই ভাবে বিপর্য্যস্ত করা অপেক্ষা রক্ষা করাই কি বিহিত নহে? সম্রাজ্ঞী হইবে বলিয়া তুমি সৃষ্ট হও নাই। আল্লা তোমাকে আমার জন্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই পুনরায় তোমাকে আমার করে অর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার হও, আমরা উভয়ে অনন্ত প্রেম—অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব।"

জিনাৎ ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! কোন্ সাহসে তুমি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? আমার স্বামী কি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ নহেন? তিনি কি আমাকে মরিতে আজ্ঞা দেন নাই? পতি পত্নীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইবার তোমার কি অধিকার আছে? আমি তোমার হইব! ভিখারী—চোর—বিশ্বাসহন্তার পত্নী হইব? সম্রাট্‌পত্নীর অদৃষ্টের এ উপযুক্ত ব্যবস্থা বটে!"

কুপিতা জিনাৎ স্বীয় প্রক্ষেপ জন্ত একটু থামিলেন। কিন্তু ঐ কথাগুলি শুনিয়া গুলজারের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার পক্ষে এই জগৎ অতীব একটী বর্ষের ন্যায় দুঃখ-শোক-জ্বালা-যাতনাময় বোধ হইতে লাগিল। জিনাৎ কি তাঁহাকে ভালবাসিতেন না? জিনাৎ কি রঙ্গমহল হইতে সেই প্রীতিপ্রদ পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন নাই? সেই পত্রখানি কি গুলজার অমূল্য ধনস্বরূপে সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন না? অবোধ গুলজার ভাবেন নাই যে, তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের করে সমর্পণ করিবার জন্তই জিনাৎ সে ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন।

কথা কহিবার সামর্থ্য হইবামাত্র জিনাৎ পুনরায় বলিলেন, "তুমি ভাবিয়াছিলে যে, তুমি আমার মহোপকার করিবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তুমি আমার প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিলে। যাহা হউক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কারণ তুমি অযোগ্য পাত্রে ভালবাসা অর্পণ করিয়া—সেই ভ্রান্ত ভালবাসার দ্বারা চালিত হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ।" জিনাৎ পরমুহূর্ত্তে গলদেশ হইতে মুক্তার মালা উন্মোচন করিয়া, গুলজারের প্রতি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, "এই মুক্তার মালা লইয়া যাও। আমাকে একখানি শিবিকা আনিয়া দাও। আমি আর এক

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সম্রাটের নিকট যাইতে চাহি।

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি? আমি যাহা বলিব, তোমাকে অবশ্যই তাহা শুনিতে হইবে, যদি না শুন, অপরের দ্বারা আমার আজ্ঞা পালন করাইব। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

গুলজার, দুঃখ বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বলিল;—ভাল, ভালবাসার প্রতিফল!

৯

জিনাৎ উন্নিষার পলায়ন-বার্ত্তা প্রাসাদ মধ্যে বিঘোষিত হয় নাই। যাহাদিগের উপর জিনাতের প্রাণদণ্ডের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা পরস্পরে একমত হইয়া সে সম্বন্ধে মিথ্যাকথা কহাই বড় সুবিধাজনক বোধ করিল। রঙ্গমহলে প্রচার হইয়াছিল যে জিনাতের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

মমতাজ এই সংবাদে অত্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন। জেহানারা শ্বাসপ্রক্ষেপে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই সংবাদ শ্রবণে প্রকাশ্যে ঔদাস্যভাব জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘটনাপূর্ণ জীবনের মধ্যে এই ঘটনাটী তাঁহার হৃদয়ে অতি বিষম সংঘাত প্রদান করিল। মমতাজ দারুণ দুঃখে সম্রাট্‌কে গুরুতররূপে ভর্ৎসনা করিলেন, একটী নিরপরাধা বালিকার রক্তপাতরূপ মহা পাপের জন্য ভয় দেখাইলেন, এবং অবশেষে তিনি ফতিমার নিকট এই দুঃখজনক ব্যাপারের যে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা আমূল সম্রাট্‌কে জানাইলেন, কিন্তু তথাপি সম্রাটের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি প্রকাশ্যে হৃদয়ের অশান্তির কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু মমতাজ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, অদৃষ্টা জিনা? সম্রাটের হৃদয়ে যে গভীর আঘাত করিয়া গিয়াছে, সেই আঘাতে অন্তরের অন্তঃস্তল রক্তপ্লাবিত হইতেছে। শেষে মমতাজ, যখন ভাবিলেন যে, তিনি আবার এই আঘাতটিকে আরও গুরুতর করিলেন, তখন তিনি মনে মনে আপনাকে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন।

এই শোচনীয় ব্যাপারে সম্রাট্ সাজাহান স্বীয় মনকে সাধ্যমত প্রবুদ্ধ করিয়া শান্তি আনয়নের চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যচক্র, এই সময়ে পুনরায় এরূপ একটি ঘটনার আবির্ভাব করিয়া দিল যে, তাহাতেই সম্রাট্ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই দিন প্রাতঃকালে সম্রাট্ দেওয়ানি আমে নিয়মিত দরবার করিতেছিলেন। সহস্র সহস্র লোক, দেওয়ানি আমের সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে সমবেত, সম্রাট্ ময়ূরাসনে সমুপবিষ্ট, মুক্তাবলী-শোভিত দরবার-কক্ষে সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান এবং প্রধান মন্ত্রী সিংহাসনের নিম্নস্থ আসনে উপবিষ্ট। সম্রাট্ এরূপ দরবারে সাধারণতঃ কোনমতে প্রথারক্ষার জন্য আসিয়া অল্পক্ষণ মাত্র বসিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রীই এই দরবারে বসিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করিতেন। কিন্তু জিনাতের অনুমিত মৃত্যুর পর হইতেই সম্রাট্ নিজেই দরবারে বসিয়া সমস্ত বিচারকার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, উদ্দেশ্য এই যে ইহার দ্বারা বিধ্বস্ত হৃদয়কে সুস্থির করিতে পারিবেন।

দরবারের কার্য্য শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে একখানি শিবিকা সেই দেওয়ানি আমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমবেত প্রত্যেকের দৃষ্টি সেই শিবিকার উপর পতিত হইল। পরক্ষণে একটী ক্ষীণকায়া সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি হরিদ্বর্ণের ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ

আচ্ছাদিত করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইল। সেই মূর্ত্তিটী, স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবামাত্র সম্রাট্ সবিস্ময়ে দেখিলেন—জিনাৎ উন্নিষা!

জিনাৎ অচঞ্চল নয়নে সম্রাটের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, অভিবাদনের পর বলিলেন;—'প্রভো! আপনি আমাকে মরিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আমি এখনও মরি নাই, এজন্ত আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে এখনও জীবিতা আছি, ইহা আমার দোষ নহে। আমার সামর্থ্য থাকিলে, আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতাম। আমি অচৈতন্যা হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে সেই অবস্থায় স্থানান্তরিত করিয়াছিল। আজি প্রাতঃকালে আমার প্রথম চৈতন্ত হইবামাত্রই আমি জাঁহাপনার আজ্ঞার জন্ত এই স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমি যে এতক্ষণ জীবিত ছিলাম, এজন্ত আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যখন আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন আমার বাঁচিবার সাধ ছিল না। কিন্তু আমি তখন মরিতে পারি নাই। আমি যদি একটীবার মাত্র তখন আপনার ঐ মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে পারিতাম, এবং মরিবার পূর্ব্বে কেবল একটীবার মাত্র বলিতে পারিতাম যে, আমি নিরপরাধা, তবে আমার আক্ষেপ থাকিত না। জাঁহাপনা! আপনি ব্যতীত আমার অন্তরের অন্তস্তলে কোন পুরুষকেই জানি না, এবং এ জীবনে আপনার সান্নিধ্য ব্যতীত আর কাহারও সান্নিধ্য কামনা করি নাই, যদি করিতাম তাহা হইলে আমার মরিতে কোন দুঃখ হইত না। নাথ! আপনার এই দাসী অবিশ্বাসিনী নহে, আমি এমন বিশ্বাসঘাতিনী নহি যে, আমার যে জীবন সম্রাটের পদতলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, আমি সেই জীবন আর রক্ষা করিব। আমি এখন আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনার জল্লাদকে আজ্ঞা করুন এখনই যেন সে আমার প্রাণনাশ করে। কিন্তু সাবধান! দেখিবেন, এবার যেন পুনরায় আর কেহ আপনার এই আজ্ঞা পালনের বাধা না দেয়।

সম্রাট্ অবাক্ হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আনন্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি স্বীয় পদ-গৌরব এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্ত সুস্থিরভাবে বসিয়া জিনাৎকে রঙ্গমহলে লইয়া গিয়া তিনি পূর্ব্বে যেরূপ পদগৌরবে অবস্থান করিতেন, সেই ভাবে পুনরায় রক্ষা করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু জিনাৎ পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, 'জাঁহাপনা, আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসি নাই, আমি আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পালন জন্ত আসিয়াছি। যখন আমার উপর আপনার একেবার বিশ্বাসভঙ্গ হইয়াছে, তখন আমার এ জীবন আর কোন মতেই রক্ষা করা উচিত নহে। যদিও আপনার শয্যা আমার স্বর্গস্বরূপ, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী একদিকে হইলেও আমি আর সে শয্যার অংশভাগিনী হইতে পারিব না। নাথ! আমি মরিবার জন্ত আসিয়াছি, অবশ্যই মরিব। রাজাজ্ঞায় রাজ্ঞীর যে ভাবে প্রাণদণ্ড সাধিত হয়, আপনি কেবল সেইরূপ প্রাণদণ্ড সাধনের আজ্ঞা দিউন। আমাকে ক্ষমা করিবেন না। জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজ্ঞীর পক্ষে ক্ষমা উপযুক্ত নহে।' দুর্ব্বলা জিনাৎ উন্নিষা হৃদয়ের আবেগে সবিশেষ উত্তেজনায় এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তাঁহাকে রঙ্গমহলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সম্রাট্ও দ্রুতপদে তাঁহাকে দেখিবার জন্ত চলিলেন।

কিন্তু জিনাৎ উন্নিষা নাই! ক্ষমার প্রতি সেইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই তাঁহার

মহান্ আত্মা এই জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই অনন্ত সুখময় ধাম স্বর্গে চলিয়া গেল! জিনাৎ মরিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং আজীবন তিনি যে মহত্ব ও গৌরবের অধিকারিণী ছিলেন, সেই মহত্ব ও গৌরবের সহিতই তিনি মরিলেন। তিনি সম্রাজ্ঞীরূপেই জন্মিয়াছিলেন, এবং আজীবন সম্রাজ্ঞী-রূপেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আবার এই মরণের সময়েও সেই সম্রাজ্ঞীর ন্যায় মহোচ্চ মহত্ব এবং গৌরব প্রদর্শন করিয়া গেলেন।

অন্তঃপুরবাসিনী সমগ্র রমণী, জিনাতের মৃত মুখখানি দেখিবার জন্য ধাবিত হইল। মমতাজ, সমগ্র হৃদয়ের সহিত জিনাৎকে প্রীতি আলিঙ্গনে ধরিয়া তাঁহার বিষণ্ণ শীতল মুখমণ্ডলে শতশত চুম্বন করিতে লাগিলেন। সকলে আশা করিয়াছিল যে, এখনও বুঝি জিনাতের জীবন আছে, কিন্তু হাকিম শীঘ্রই সে আশা ভ্রান্ত ইহা বলিয়া দিল। সম্রাট্ সাজাহান যখন তথায় উপনীত হইলেন, তখন সকলেই জানিয়াছিল যে জিনাৎ জীবিতা নাই, কিন্তু সকলেই দেখিল তাঁহার সেই মৃত মুখমণ্ডলে সেই সতীত্বগর্ব্ব এবং বিনয়নম্রতা-রেখা যেন অঙ্কিত রহি-য়াছে, তাঁহার অধরোষ্ঠ যেন ক্ষমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ জন্য কম্পিত এবং তাঁহার সেই বিশ্ববিমোহন নয়নযুগল যেন অনন্তশান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রার আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

সম্রাট্কে সেই শোচনীয় সংবাদ দিবার কাহারও সাধ্য হইল না। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, মমতাজ জিনাতের বসনাঞ্চলে স্বীয় মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রত্যেকের মুখের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া শেষে জিনাতের দিকে দৃষ্টিদানে জানিতে পারিলেন যে, জিনাৎ নাই!

সম্রাট্ সাজাহান, সেই মৃত অধরে একটী কোমল চুম্বন করিয়া নীরবে একটু দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই নিশ্বাসই সমস্ত জগৎকে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখের গভীরতা অনুভব করিতে সমর্থ করিল। এই প্রিয়তমা মহিষীর দ্বিতীয়বার মরণে সম্রাট্ সাজাহানের হৃদয় একেবারে চিরদিনের জন্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দূরে দণ্ডায়মান রহিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মমতাজ, বদনোত্তোলন করিলেন, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাটের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, পরক্ষণে সম্রাটের করযুগল স্বীয় অঙ্গে ন্যস্ত করিয়া সম্রাটের হৃদয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল লুক্কায়িত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, 'নাথ! এ কি করিলেন? ভাল, ভালবাসার প্রতিফল!'

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

মনিয়া।

১

মানসের সহিত বঙ্কুবিহারীর প্রণয়ের আমরা দুইটী কারণ অবগত আছি। প্রথম, মানস ইংরাজি পোষাক পরিত; একজন ইংরাজের ছেলের অভাবে, একটি ইংরাজি-পোষাক-পরা বাঙ্গালীর ছেলের সহিত আলাপ করা, শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী চক্রবর্ত্তী সমধিক শ্লাঘার কথা মনে করিত। দ্বিতীয়, শ্রীমান্ মানস কুমার রায় নিজে যতই বোকা হউক, সে বঙ্কুবিহারীর ন্যায় একটী বুদ্ধিমান্ সহপাঠীর সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইত। এই দুইটী কারণে, প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দুইটী ছাত্রের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল।

শ্রীমান্ মানসকুমার বিলাত-প্রত্যাগত একজন ডাক্তারের পুত্র। আর বঙ্কুবিহারীর পিতা একজন ছোট খাট জমীদার। তাঁহার বাড়ি বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত বোকড়া গ্রামে। মানস ও বঙ্কু উভয়েই সমবয়স্ক; উভয়েরই বয়স আঠার উনিশ বৎসর। মানসরা ব্রাহ্ম, এবং তাহাদের চালচলন সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণের। বঙ্কু হিন্দু; কিন্তু সে চসমা পরে, ব্রাহ্মসমাজে যায়, মানসদের বাড়ি চা খায় এবং মানসের পনের বৎসরের ভগিনী নানার সহিত একত্রে বসিয়া অনেক সময়ে গল্প স্বল্পও করে।

মানসের পিতা ডাক্তারি করিয়া মাসে সাত আট শত টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তাহাতে, ইংরাজি-পোষাক-পরা পুত্র এবং রেশমী-কাপড় ও হরেক রকম লেস্-আঁটা-ব্লাউস-পরা স্ত্রীকন্যা লইয়া, এবং ইংরাজ পাড়ার বাড়ি ভাড়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত বড় শক্ত কাজ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে জানে না। তাঁহার যথেষ্ট ঋণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই ঋণের জন্য, তাঁহার উচ্চ আশাগুলি কিছু ছোট করিতে হইয়াছিল। বঙ্কুবিহারী যদি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারে, কিংবা এ দেশে থাকিয়া অন্ততঃ একটা ডেপুটীও হইতে পারে এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্কুবিহারীর সহিত নানার বিবাহ দিতে ঋণগ্রস্ত ডাক্তার সাহেবের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। পরন্তু এমনই ভাবের কথা, তিনি একদিন যখন তাঁহার এক বন্ধুর নিকট বলিতেছিলেন, তখন পার্শ্বের ঘর হইতে এক জোড়া কৌতূহল আকৃষ্ট কর্ণ তাহা গোপনে শুনিয়াছিল।

কন্যা নানা পিতার ঋণের কথা ভালরূপ অবগত ছিল না। সুতরাং একটি বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তারের কন্যার মনে যতটুকু উচ্চাভিলাষ থাকা উচিত, তাহার সবটুকু নানার মনের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। বন্ধুর নিকট পিতার গোপন প্রস্তাবটা, বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ বলিয়া কন্যার অনুভব হইয়াছিল।

২

ব্রাহ্ম হইবার জন্য এবং নানাকে বিবাহ করিবার জন্য একটা প্রবল অভিলাষ সর্ব্বদাই বঙ্কুর মনের মধ্যে জাগিয়া থাকিত। কিন্তু তাহার পিতাকে, তাহার এই অভিলাষের কথা এ পর্য্যন্ত সে জানাইতে পারে নাই। লজ্জা তাহার কারণ নহে; কেননা, কলেজে পড়িলে, এবং নাকে চসমা আঁটিয়া দিলে এ-সব সম্বন্ধে বাপ মাকে লজ্জা করিবার তত আবশ্যক থাকে না।

তাহার আসল কারণটা এই যে, বঙ্কুবিহারীর পিতা একজন গোঁড়া হিন্দু; তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভূত ও অখাদ্যখাদক ঘোমটাবিহীন পুত্রবধূ ঘরে আনা অপেক্ষা পুত্রকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া বেশী সঙ্গত মনে করিবেন। বঙ্কু ইহা মনে মনে বুঝিয়াছিল। আর বুঝিয়াছিল বলিয়াই পিতাকে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই।

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মানস বি, এ, পাশ করিতে না পারিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্ম বিলাত চলিয়া গেল এবং বঙ্কু ভালরূপে বি, এ, পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। নানার বয়স এখন সতের বৎসর, আর বঙ্কুর বয়স কুড়ি বৎসর; কাজেই এ সময় প্রণয়ের বেগটা অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কুবিহারী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ি ফিরিল যে, এবার যে কোনও উপায়ে হউক, পিতার নিকট নিজের বিবাহের কথা পাড়িবে।

বঙ্কু একদিন আবেগপূর্ণ কম্পিত স্বরে, খুবই সাহসের সহিত পিতার নিকট নিজের বিবাহের কথাটা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া, বঙ্কুর পিতা বঙ্কুকে এমনই ভর্ৎসনা করিলেন যে, বঙ্কু খুব ভাল ছেলে হইলেও বাপের উপর বিষম চটিয়া গেল; এবং বাপকে কিরূপে জব্দ করিবে, তাহার একটা উপায় মনে মনে ভাবিয়া লইল। বঙ্কুবিহারী রাত্রের মধ্যেই বাড়ি ছাড়িয়া দূরদেশে পলাইয়া যাইবে; তাহা হইলেই, তাহার পিতা একমাত্র পুত্রের অদর্শনে বড়ই কাতর হইবেন; এবং অবিলম্বে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া সেই বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি দিবেন। বঙ্কু এটাকে অতি সদুপায় বলিয়া স্থির করিল।

৩

পরদিন সকালে, যখন বাটীর চাকরগণ এবং পল্লীর ভদ্রলোকগণ অনুদ্দিষ্ট বঙ্কুর সন্ধান না পাইয়া তাহার পিতার নিকট আসিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী রাণীগঞ্জ ও এসানসোল রেলওয়ে ষ্টেসানের মাঝে রেলগাড়িতে বসিয়া, ছোট ছোট শালগাছের দ্বারা আচ্ছাদিত প্রস্তরময়, বন্ধুর, ভূমিখণ্ডের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়াছিল। কিন্তু এক একবার তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইতেছিল। সেই জলে, পিতার উপর পূর্ব্বদিনের সমস্ত রাগ ভাসিয়া যাইতেছিল। যদি রেলগাড়ি হঠাৎ পশ্চাৎগতি হইয়া মেমারি ষ্টেসানে ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে গাড়ি হইতে নামিয়া, বোকুড়া গ্রামে ফিরিতে বঙ্কুবিহারীর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

কিন্তু এঞ্জিন-চালক তাহার মনের ভাব বুঝিল না। গাড়ি প্রথমে এসানশোল এবং পরে মধুপুরে আসিয়া পৌছিল।

হাজারিবাগ যাইতে হইলে, মধুপুরে নামিয়া গিরিডির গাড়িতে চড়িতে হয়, এবং গিরিডিতে নামিয়া, এক প্রকার কুলি-টানা গাড়িতে চড়িয়া প্রায় বাহাত্তর মাইল জঙ্গল অতিক্রম করিয়া হাজারিবাগ পৌছিতে হয়। বঙ্কুবিহারীর হাজারিবাগ যাইবার ইচ্ছা ছিল এবং সেই উদ্দেশে মেমারি ষ্টেসান হইতে গিরিডির টিকিট খরিদ করিয়াছিল। টিকিট বাবুর নিকট ধরা পড়িবার ভয়ে, একটি হিন্দুস্থানীকে একটি টাকা দিয়া, টিকিট খানি তাহার দ্বারা খরিদ করিয়া আনাইয়াছিল।

মধুপুরে পৌছিয়া বঙ্কুবিহারী ভাবিল, বাড়ি ফিরিয়া যাইব; কিন্তু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে গিরিডির গাড়িতে উঠিয়া বসিল, এবং গাড়ির ঘণ্টা বাজিবার পরও গাড়ি হইতে নামিল না। তাহার পর গাড়ি ছাড়িল এবং ক্রমে তাহা গিরিডিতে আসিয়া থামিল।

কলিকাতার পাঠের খরচের জন্য পিতা মাসে মাসে বঙ্কুকে যে টাকা দিতেন, তাহা সমস্ত খরচ না করিয়া, বঙ্কু তাহা হইতে প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু বাঁচাইত। এইরূপে তাহার হাতে প্রায় সাত শত টাকা জমিয়াছিল। বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে কেবলমাত্র এই জমান টাকা লইয়া আসিয়াছিল; কাপড় চোপড় বা অন্য কোন জিনিষ কিছুই লইয়া আইসে নাই।

এক্ষণে গিরিডিতে পৌঁছিয়া, একটা টিনের বাক্স এবং একজন হিন্দুস্থানী বালকের উপযুক্ত কিছু কাপড় জামা ইত্যাদি ক্রয় করিল। এবং অবিলম্বে, সেই কাপড় জামার সাহায্যে বাঙ্গালী যুবকটী সহজেই একটী হিন্দুস্থানী যুবকে পরিণত হইল।

বঙ্কুদের বাড়িতে একজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছিল, তাহার নাম নন্দলাল মিশ্র। তাহার বাড়ি ছাপ্‌রা জেলার একমা থানার অন্তর্গত একটা পল্লিগ্রামে, তাহার সকল পরিচয়ই বঙ্কু বিলক্ষণ অবগত ছিল। এখন সে আপনার নাম রাখিল নন্দলাল মিশ্র এবং সে যেন একটী চাকুরির চেষ্টায় হাজারিবাগ যাইতেছে।

কুলি-টানা গাড়িতে চড়িয়া, কয়লার খনি এবং ভুসো-মাখা ভোমরার ন্যায় কয়লার গুঁড়া মাখা কাল রংএর কুলি-শ্রেণী দেখিয়া, বরাকর নদী পার হইয়া, পরেশনাথ পর্ব্বতমালার ধার দিয়া, ঘন ও নিবিড় শাল বন ভেদ করিয়া, পলাতক বঙ্কুবিহারী পরদিন বিকাল বেলায় হাজারিবাগ আসিয়া পৌঁছিল।

সেখানে বড় রাস্তার ধারে, মহাবীর মিশ্রের জলখাবারের দোকান ছিল। বঙ্কু বাসস্থান সন্ধান করিবার জন্য সেই দোকানে গিয়া বসিল। মহাবীর মিশ্র তাহাকে স্বজাতি ও লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক জানিয়া আদর করিল এবং সেই দিনের জন্য বঙ্কুকে সেইখানেই থাকিতে বলিল।

দোকানের পশ্চাতে মহাবীরের বাসবাটী। বঙ্কুবিহারী সচ্ছন্দে সেইখানে রাত্রি যাপন করিল।

মহাবীরের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের কন্যা, মহাবীরের কাছে থাকিত এবং বিনা-বেতনে কেবল মাত্র ভাত কাপড় পাইবার প্রত্যাশায়, মহাবীরের দোকানের এবং গৃহের যাবতীয় কাজ করিয়া দিত। তাহার নাম মনিয়া, তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। মেয়েটী দেখিতে বেশ। মনিয়ার মাথায় অনতিদীর্ঘ ঈষৎ কটা চুলের ভার, গৌর বর্ণ, হাস্যদীপ্ত চক্ষু এবং বুদ্ধিপ্রভাসিত সুগঠিত ললাট। বল এবং স্বাস্থ্য, নীল শিরার দ্বারা অঙ্গে লিখিত ছিল।

পরদিন সকালে, দরজার সম্মুখে, একটা জলপূর্ণ লোটা রাখিয়া মনিয়া বঙ্কুবিহারীকে মুখ ধুইতে বলিল। বঙ্কুবিহারী মনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুড়ি বৎসরের যুবকগণের চরিত্র বোঝা বড় কঠিন। যে দুই দিন আগে নানার জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিল, সে আজ অবিচলিতচিত্তে মনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! ছি!

মুখ রক্তবর্ণ করিয়া মনিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর সে বঙ্কুবিহারীকে দেখা দিল না।

হাজারিবাগের নিকট পদ্মা নামে একটী ছোট রাজ্য আছে। তারিণীবাবু নামে একটী বাঙ্গালী উকিল রাজার কাজকর্ম্ম করিয়া দিতেন। মহাবীর তারিণীবাবুর বাটীতে মিষ্টান্ন যোগাইত। সে তারিণীবাবুকে বলিয়া, নিজের আত্মীয় পরিচয়ে, বঙ্কুবিহারীর জন্য রাজসরকারে একটি তহশীলদারী কাজ করিয়া দিল। বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা। আদায় তহশীলের সুবিধার জন্য, হাজারিবাগের

নিকটবর্ত্তী 'লাখে' নামক এক পল্লীগ্রামে বঙ্কুবিহারীকে থাকিতে হইবে।

৫

"এ মনিয়া, তোর সাদি হবে কবে?"

উকিল শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে মনিয়া যখন মিষ্টান্ন যোগাইতে গিয়াছিল, তখন তারিণীবাবুর রসিকা গৃহিণী মনিয়াকে ঐরূপে সম্ভাষণ করিলেন।

মনিয়া বাঙ্গালীদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছিল। সে বলিল;—আমার সাদি হ'বে না; আমি আইবুড়ো থাক্‌বো।

নিকটে একটা 'দাই' দাঁড়াইয়াছিল, সেও বাঙ্গালা জানিত। সে বলিল, মনিয়ার বর মিলিয়াছে, শীঘ্রই সাদি হ'বে।

তারিণীবাবুর স্ত্রী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন;—'কে? কে? কে মনিয়ার বর হ'বে।'

দাই। মিসির ঠাকুরের কিছু বুদ্ধি নেই

তারিণী বাবুর স্ত্রী বলিলেন, কেন?

দাই। লাখের তহসীলদার নন্দলাল মিসিরের সঙ্গে তাহার কত দোস্তী; তাহার সহিত মনিয়ার বিয়ে দিলে কত আচ্ছা হয়।

মনিয়া বুঝিল, সত্যই মহাবীর মিশ্রের কিছুই বুদ্ধি নাই; তা না হইলে, একটা নক্‌রাণী যে কথা বুঝিল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না কেন? কিন্তু নন্দলালের নাম শুনিয়া মনিয়ার চোখ দু'টো এমন স্বচ্ছ হইয়াছিল যে, তারিণী বাবুর চতুরা স্ত্রী সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া মনিয়ার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সহজেই দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, সেখানে, নন্দলালের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। দেখিয়া, মনিয়ার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, তিনি দাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—দাই, পরশু মাসকাবার, মহাবীর টাকা নিতে আস্‌চে, এলে আমাকে বলিস্‌ত, আমি নন্দলাল তহসীলদারের সঙ্গে মনিয়ার বিয়ের কথা বল্‌বো।

কিসে কি হয় বলা যায় না। তারিণী স্ত্রীর কথাটা শুনিয়া, মনিয়ার স্বচ্ছ চক্ষু দুটো স্বচ্ছতর হইয়া উঠিল। ছল্ ছল্ করিয়া, তাহা জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটা ভালবাসা-পূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, দুইটা মুক্তাফলের রূপ ধরিয়া, গণ্ড বহিয়া তারিণী বাবুর স্ত্রীর পায়ের কাছে মাটীর উপর পড়িয়া গেল।

মনিয়ার যে একটা বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, তাহা মহাবীর অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিল। কিন্তু একটা দূরসম্পর্কীয়া মাতাপিতৃহীনা বালিকার জন্য খরচপত্র করিয়া দেশে যাওয়া এবং ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া অনেক দিন দেশে থাকিয়া, পাত্র অন্বেষণ করা মহাবীরের পক্ষে কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই।

এক্ষণে তারিণীবাবুর স্ত্রীর নিকট কথাটা শুনিয়া, মনিয়াকে বিবাহিত করিবার চাপাপড়া ইচ্ছাটা হঠাৎ জাগিয়া উঠিল এবং নন্দলালকে একটা অনায়াসপ্রাপ্য সুপাত্র বলিয়া বোধ হইল। মহাবীরের মতে নন্দলাল এমন সুপাত্র যে, মহাবীর নন্দলালের কথা ভাবিয়া, নিজের একটা কন্যা না থাকার জন্য দুঃখিত হইয়া পড়িল।

লাখে গ্রামে, একটা দরজীর একটা ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল, তাহার মাসিক ভাড়া পাঁচ টাকা। সেইখানে নন্দলালের বাসা। মহাবীর অনেকবার সেই বাসায় বেড়াইতে গিয়াছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, মহাবীরের অগোচরে মনিয়াও অনেক বার সেই ক্ষুদ্র গৃহটী দেখিয়া আসিয়াছে; বুঝি বা রত্নের অভাবে, রত্নাধার দেখিয়া মনিয়ার মত একটী বালিকা সুখী হইতে পারে।

সেই বাটীর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, যথায় শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী ওরফে নন্দলাল বসিয়া বসিয়া কারেন্তী হরফের আলোচনা করিতেছিলেন,

সেই স্থানে মহাবীর একটী ভুঁড়ি এবং ভুঁড়ির অপেক্ষাও ছোট একটী মির্জাই এবং একটী মাথা এবং মাথার অপেক্ষা বড় একটী পাকড়ি লইয়া এবং সেই মাথাতে আর ভুঁড়িতে একটী কন্যাভারগ্রস্ত লোকের বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত হইল।

নন্দলাল মহাবীরকে একখানা চেয়ারে বসিতে দিল।

এখন কথাটা হচ্ছে এই যে, নন্দলালের গৃহটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং চেয়ার জিনিষটা এমন বদ্‌, যে, সেই গৃহের মধ্যে সেই চেয়ারে বসিলে, মহাবীরের বোধ হইত, যেন চেয়ারের হাতল দুটো সজীব হইয়া তাহার বুকের কথা সমস্ত চাপিয়া ধরিয়াছে। সুতরাং দোকানে বসিয়া নন্দলালকে যে কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, তাহা বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মহাবীর সহজে সে কথা গুলো বলিয়া উঠিতে পারিল না।

তথাপি বাড়ি ফিরিবার আগে মহাবীর আসল কথাটা বলিয়া ফেলিল। বলিল যে 'মনিয়াকে তোমায় বিবাহ করিতেই হইবে; তা না হইলে, মনিয়ার বিবাহ হওয়া বড়ই মুস্কিল।'

যদিও মনিয়ার সুগঠিত অবয়ব এবং সুন্দর মুখশ্রী নন্দলালের হৃদয়মধ্যে এক অভিনব প্রেমকাহিনী গাহিতেছিল, যদিও মনিয়ার স্মৃতি নন্দলালের আত্মীয়বিচ্ছেদব্যথিত মানসে একটা সুখকর প্রলেপস্বরূপ অনুভূত হইতেছিল; যদিও অদর্শনে, নানাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্খাটা আস্তে আস্তে মন হইতে তিরোহিত হইতেছিল, তথাপি বোকড়ার জমীদারপুত্র একটা মিঠাইওয়ালার পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কিন্তু মহাবীরও ছাড়িবার পাত্র নহে; বড় জেদ, বড় অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মহাবীরকে নিরস্ত করিবার জন্য, নন্দলালকে বলিতে হইল, "আজ থাক, দুই এক দিনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া একটা উত্তর দিব।"

রাত্রি হইয়াছিল। মহাবীর কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিবার জন্য রাজপথে বাহির হইল।

৭

দুই দিন পরে মহাবীর শর্ম্মা পূর্ব্বোক্ত ধড়া চূড়া পরিয়া নন্দলালের গৃহে আবার দেখা দিল।

দুই দিন ধরিয়া নন্দলাল নানা কথা ভাবিতে লাগিল। একটী অভিভাবকশূন্য, গুপ্তপরিচয় যুবক, একটী সুন্দরী যুবতীকে ঘরে আনিবে কিনা বিবেচনা করিতেছিল। তাহাতে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই বিবেচনার ফলে, নন্দলাল বুঝিয়াছিল যে, তাহার বন্ধুবিচ্ছেদতিক্ত জীবনে, এক আগ্রহময় বন্ধুত্বের মধুরতা অনুভব করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মনিয়ার কি চমৎকার মুখ, মনিয়াই এই বন্ধুত্বের উপযুক্ত পাত্রী। কিন্তু তাহাকে বিবাহ না করিলে, তাহার বন্ধুত্ব লাভ করা যায় কিরূপে? অতএব তাহাকে সে বিবাহ করিবে। অপমান? কিসের অপমান? আর ত তাহার গৃহে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আর ত সে জমীদারের নামের বা অর্থের উত্তরাধিকারী নহে; সে এখন লাখের তহশীলদার। একটা তহশীলদার একটা মিঠাইওয়ালার পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহাতে আর অপমানই বা কি, আর লজ্জাই বা কি?

সেই চেয়ারখানা টানিয়া, নন্দলাল মহাবীরকে বসিতে দিল। কিন্তু মহাবীর এবার সতর্ক হইয়া আসিয়াছিল; সে চেয়ারে বসিল না; একখানা টুলের উপর আদায় তহসীলের জন্য কয়েকখানা বহী ছিল, তাহা উঠাইয়া চেয়ারে রাখিয়া, সেই টুলের উপর বসিল, এবং নন্দলালের সহিত কয়েকটা বাজে আলাপ করিয়া, কথা কহিবার শক্তিটা একটু শাণিত করিয়া লইল।

পরে বিবাহের কথা পাড়িল। আজ নন্দলাল সহজেই সম্মত হইল। মহাবীর তাড়াতাড়ি তখনই বিবাহের একটা দিন স্থির করিয়া ফেলিল।

কথা হইল, মহাবীর তাহার আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিয়া হাজারিবাগে লইয়া আসিবে, কেননা হাজারিবাগ ছাড়িয়া বিবাহ দিবার জন্য দেশে যাইলে, ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। নন্দলাল কি করিবে? সেও কি তাহার আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দিবে? সে মহাবীরকে বুঝাইয়া বলিল, দেখ মহাবীর, আমি আমার আপনার লোকের অনুমতি না লইয়াই বিবাহে রাজি হইয়াছি, এখন আমার আত্মীয়স্বজন এখানে আসিলে আমাকে হয়ত এ বিবাহ করিতেই দিবে না; তুমি ত তাহাদের জন্য বেশী টাকা খরচ করিতে পারিবে না। "আমি তাদের খবর দিব না"

মহাবীর কথাটা বড় সঙ্গত মনে করিল।

৮

মনিয়ার সহিত নন্দলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মনিয়া এখন লাখে গ্রামে নন্দলালের বাটীতে থাকে। সে আর কাহারও বাটীতে যায় না। একটী অগ্নিশিখাসম যৌবন, মূর্ত্তিমান্ হইয়া, নন্দলালের ক্ষুদ্র গৃহ আলোকিত করিয়া, গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুইটী চঞ্চল চক্ষু, বস্ত্রাঞ্চল ভেদ করিয়া, নন্দলালের সন্ধানে, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ পাঠাইয়া দেয়। দুইটী সুগঠিত বাহু গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়া, গৃহমধ্যে এক সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। হাসিভরা ঠোঁট দুটী, অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত নন্দলালের চোখের কাছে ফুটিয়া থাকে। নন্দলালের সামান্য খাদ্যদ্রব্যগুলি, এক অমৃতময়ীর পরশে, অমৃত হইয়া যায়। সুখের সেই নন্দনকাননে থাকিয়া, নন্দলাল নানাকে ভুলিয়াছে, বাপ মাকে ভুলিয়াছে। বুঝি সে আপনাকেও ভুলিয়াছে।

আর মনিয়া? তাহার সুখের বর্ণনা করা যায় না। স্বামীর ভালবাসা পাইলে, স্ত্রী যে কত সুখী হইতে পাবে, তাহা ভাবিবার জিনিষ, তাহার বর্ণনা করিবার জন্য কেহ কাহাকেও অনুরোধ করিও না। পতি-সোহাগিনীর মনে যে স্বর্গের সৃষ্টি হয়, তাহার বর্ণনা করিও না। পার যদি, হে পুরুষ! তবে তাহার সৃষ্টি করিও।

কিন্তু মনিয়া একদিন দেখিল যে তাহার এ সুখের একটা সীমা আছে! নন্দলালময় নন্দনকাননের একটা কণ্টকময় বেড়া আছে!

৯

কলিকাতার কয়েকটী ভদ্রলোক, হাজারিবাগে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একদিন তাঁহাদের মধ্যে একজন, হিন্দুস্থানী-বেশধারী বঙ্কুবিহারীকে হাজারিবাগের এক রাস্তায় দেখিতে পাইয়া তাহার হাত ধরিলেন। বলিলেন, "তুমি এখানে আছ? ছি! তোমার বাপ মা তোমার জন্য পাগল হইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর তুমি হিন্দুস্থানী সাজিয়া, হাজারিবাগে লুকাইয়া বসিয়া আছ? চল, আজই তোমার বাড়ি লইয়া যাইব।"

বিশ বৎসরের এক পলাতক যুবক, পিতার আলাপী এক বিজ্ঞ ভদ্রলোকের নিকট যদি হঠাৎ ধরা পড়ে, এবং যদি সে সময়ে, সে এক ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ পরিহিত থাকে, তাহা হইলে, তাহার মনোভাব যে কিরূপ হয়, তাহা বোধ হয় যুবক পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বিবাহের কথা দূরে থাকুক, বঙ্কুবিহারীর একটী মাত্র কথা কহিবারও সাহস হইল না। ধৃতহস্ত ছাড়াইয়া লওয়াও সহজ নহে;—শিশুর শরীরে যে বল থাকে, বঙ্কুবিহারীর তখন তাহাও ছিল না। তাহার

ভয়, পাছে রাস্তায় একটা গোলযোগ ঘটিয়া সে বাঙ্গালী বলিয়া ধরা পড়ে, এবং মহাবীর সে কথা জানিতে পারে। বধ্যভূমিতে নীত একটী ছাগশিশুর ন্যায় বিশুষ্ক মুখে বঙ্কুবিহারী সেই ভদ্রলোকটীর অনুগমন করিল।

বাটীতে পৌছিয়া, বঙ্কুবিহারীর পিতাকে তারে সংবাদ দেওয়া হইল যে, বঙ্কুবিহারীকে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই স্বদেশ যাত্রা করা হইবে। তাহার পর জিনিষ পত্র বাঁধা হইয়া, সকাল সকাল আহার করা হইল, কুলি-টানা গাড়ি ডাকা হইল এবং বন্দীকৃত পলাতককে সঙ্গে লইয়া গিরিডি অভিমুখে যাত্রা করা হইল।

মনিয়া নন্দলালের কোন সংবাদই পাইল না। সে এ সকল ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিল না।

বঙ্কুবিহারী মনে করিয়াছিল দেশে ফিরিয়া সকল ত্রুটী স্বীকার করিয়া মনিয়াকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিবে।

১০

পিতা মাতা এবং পুত্রের কান্নাকাটী শেষ হইলে একদিন বঙ্কুবিহারীর পিতা, তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র বঙ্কুবিহারীকে পড়িতে দিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল ;—

"ডাঃ শ্রীযুক্ত—

"মহাশয়, আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই ; কিন্তু আমার পুত্রের নাম বলিলে আমি কে তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী চক্রবর্ত্তী আমার একমাত্র পুত্র। সে আপনার নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। আপনার পুত্র তাহার সহপাঠী, এবং আপনার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবার জন্য সে আপনার অনুমতি পাইয়াছিল।

"এই বিবাহের জন্য, বঙ্কুবিহারী আমার সম্মতি প্রার্থনা করিলে জাত্যভিমানে এবং ধর্ম্মানুরোধে, আমি প্রথমতঃ বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া বঙ্কুবিহারী দেশত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে সে দেশে প্রত্যাগত হইয়াছে।

"আমার একান্ত অনুরোধ যে মহাশয় আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন। আমার পুত্র আপনার কন্যার একান্ত অনুরক্ত এবং সে নিতান্ত নিঃস্ব নহে। আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি তাহার নামে লিখিয়া দিয়াছি।

"নিবেদক শ্রী—"

পত্রখানি পড়িয়া বঙ্কুবিহারীর চক্ষে জল আসিল। ভাবিল, পিতার এই স্নেহ ছাড়িয়া সে কোথায় গিয়াছিল !

সেই পত্রখানা, একটা খামের মধ্যে বদ্ধ হইয়া ডাকযোগে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

হায় ! অভাগিনী মনিয়া !

১১

কিন্তু তোমরা বঙ্কুবিহারীকে দোষ দিও না। মানুষ সব সময় আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে না। একজন হিন্দুস্থানী মিঠাই ওয়ালার পালিত কন্যাকে, মিথ্যা পরিচয় দিয়া বিবাহ করিয়াছি, এ কথা বলিলে, পাছে স্নেহময় পিতার মনে কষ্ট হয়, এ জন্য বঙ্কুবিহারী সে কথা পিতাকে বলিতে পারিল না। যে নানার জন্য, পিতামাতাকে কাঁদাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিব না, এই কথার ভিতর এমন একটা অসঙ্গতি ছিল যে, প্রবাসপ্রত্যাগত, লজ্জাপীড়িত বঙ্কুবিহারী সে কথাও পিতাকে বলা দুষ্কর মনে করিল।

সে ঘটনার স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিল এবং অনিদ্র নিশীথে সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

হাজারিবাগ ত্যাগ করিবার সময়, বঙ্কুবিহারী মনে করিয়াছিল যে দেশে ফিরিয়া সে মনিয়াকে একখানি পত্র লিখিবে। কি বলিয়া পত্র লিখিবে," এই কথাটা ভাবিতে এত দীর্ঘ

সময় অতীত হইল যে, এ দীর্ঘ সময় গতে তাহাকে মোটেই পত্র লেখা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে বঙ্কুবিহারীর মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল।

বাস্তবিক, মনিয়াকে তখন পত্র লিখিলে সে তাহা পাইত না। সে হাজারিবাগ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

১২

মানসকুমার অবকাশ পাইয়া কয়েক মাসের জন্য বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের রাজধানীটাকে মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে। কলিকাতায় ইংরাজি পোষাক পরিবার মোটেই সুবিধা হয় না।

[illegible] সহিত নানার বিবাহের কথা-বার্ত্তা ঠিক হইয়া গেলে, মানসকুমার একদিন তাহার বাপকে বলিল,—"ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম করিয়া, আপনার শরীরটা মাটী হইয়া গিয়াছে। আপনার কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার। চলুন, আমরা কিছুদিনের জন্য দারজিলিং যাই।

ডাক্তার সাহেবকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ জানা নাই। কিন্তু, ইংরাজি পোষাকাবৃত দেহের মধ্যে, তাঁহার যে গুটিকতক একান্ত বাঙ্গালী রকমের রোগ সঞ্চিত ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। আর দারজিলিংএর হাওয়াতে যে সেই রোগগুলা কম পড়ে, এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। অতএব স্থির হইল যে, তাঁহারা অতি সত্বর দারজিলিং যাইবেন।

যথাসময়ে বঙ্কুবিহারী মানসের নিকট হইতে ইংরাজিতে একখানি পত্র পাইল। তাহার বাঙ্গালা এইরূপ ;—

"প্রিয়তম বঙ্কু, আমি দেশে ফিরিয়াছি, নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকিব। তুমি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলে কেন? আমরা দারজিলিং যাইতেছি, তোমার নানাও যাইবে। তুমিও আসিও, বড় আমোদ হইবে। দারজিলিংএর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে বিস্তর শীকার আছে, তোমার বন্দুকটা সঙ্গে আনিও। তোমাকে দারজিলিং পাঠাইবার জন্য বাবা তোমার বাবাকে পত্র লিখিয়াছেন, নিশ্চয় আসিও।

তোমার স্নেহের

মানস।"

বঙ্কুর পিতা ডাক্তার সাহেবের অনুরোধ মত বঙ্কুকে দারজিলিং পাঠাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। দারজিলিং হইতে প্রত্যাগত হইলে নানার সহিত বঙ্কুর বিবাহ হইবে।

মানস দারজিলিং পৌঁছিয়া বঙ্কুর জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিল, আর একটা চাকর ঠিক করিল।

চাকরটা জাতিতে লেপ্‌চা। তাহার দ্বারা সকল কাজ চলিবে। সে জল তুলিবে, বাজার করিবে, রাঁধিবে এবং দরকার হইলে বঙ্কুবিহারীর জুতাও 'বুরুস্' করিবে।

যিনি দারজিলিংএ গিয়াছেন, তিনি এই লেপ্‌চা চাকরদের গুণ জানেন।

লেপ্‌চারা সিকিম দেশের আদিম অধিবাসী। তাহারা অত্যন্ত সুরূপ, খর্ব্বাকার এবং কর্ম্মঠ। দুঃখের বিষয়, এই জাতি ক্রমে বিরল হইয়া পড়িতেছে। লেপচা পুরুষদিগের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ শ্মশ্রুশূন্য এবং তাহাদিগের দীর্ঘ কেশ বেণী গ্রথিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বিত। তাহাদের দেহ প্রচুর বিচিত্র বস্ত্রে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত।

যে লেপ্‌চা বালককে মানসকুমার বঙ্কুবিহারীর জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল, সে সাধারণ লেপ্‌চা বালকদিগের মত সুরূপ নহে। তাহার গালে একটা 'আব' ছিল এবং একটা চক্ষু অন্ধ। তাহার বর্ণও সাধারণ লেপ্‌চাদের মত

গৌর নহে। ইহার উপর তাহার আর একটা দোষ ছিল, সে অতিশয় তোৎলা।

তবে এমন চাকর মানসকুমার বঙ্কুবিহারীর জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল কেন? তাহার কারণ ছিল, পাঠকগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

সেই লেপ্‌চা চাকরটার নাম "কায়লা গোজিং"। সচরাচর লোকে তাহাকে "কায়লা" বলিয়া ডাকিত। কায়লার বয়স ষোল বৎসরের অধিক হইবে না।

কায়লা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া খুব যত্নের সহিত গৃহটী আবর্জ্জনাশূন্য করিল এবং রন্ধনের ও আহারের বাসন এবং বিছানা বালিশ যাহা বঙ্কু আগে পাঠাইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিল।

১৪

সত্য কি না বলিতে পারি না, তথাপি এমন একদল সাহেবী ধরণের পিতামাতা বাঙ্গালা দেশে আছেন, যাঁহারা মনে করেন, দারজিলিংএর শীতল হাওয়ায় প্রেম বড় সজীব হইয়া উঠে। বাল্যবিবাহের বিরোধী হইলেও কন্যার বাল্যকাল চলিয়া যাইতে না যাইতে যুবকগণের প্রেমাভাব মনে করিয়া তাঁহারা বিশেষ বিস্মিত হন এবং যুবকের দল দারজিলিংএ আমদানি হইবার পূর্ব্বেই অবিবাহিতা বিদুষী কন্যাগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত থাকেন। ভাবেন, যদি একটা যুবকেরও প্রেম সজীব হয়, তাহা হইলে একটা কন্যার বিবাহিত হইবার আশা থাকিবে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, আমাদের ডাক্তার সাহেব অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা হইলেও, তাঁহার দারজিলিং আসিবার উদ্দেশ্য, সজীব-প্রেম যুবকের অনুসন্ধান নহে। কিন্তু অনুসন্ধানপর না হইলেও কোথা হইতে একটী সজীব-প্রেম যুবক আসিয়া, দুই দিনের মধ্যে নানার সহিত এমন পরিচয় করিয়া ফেলিল এবং আপনার সম্পদ্ ও বিদ্যাবুদ্ধির এমন পরিচয় দিল যে, ডাক্তার সাহেব বঙ্কুকে আর কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতে পারিলেন না।

তাই বন, পর্ব্বত ও ঝরণার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, রেলগাড়িতে বসিয়া, নানার সহিত সাক্ষাতের প্রথম উচ্ছ্বাসের বঙ্কুবিহারী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, দারজিলিং পৌঁছিয়া, নানাকে দেখিয়া সেই স্বপ্নটা নিতান্ত অলীক মনে হইল। ডাক্তার সাহেবের সম্ভাষণটাও তাহার তত পছন্দ হইল না।

কিন্তু মানুষের মনটা এমনই অপূর্ব্ব যে, সে যখন একটা জিনিষ অপছন্দ করে, তখন সেই একটীমাত্র জিনিষ অপছন্দ করিয়া সে ক্ষান্ত হয় না। তখন পৃথিবীর যে জিনিষ তাহার সম্মুখে আইসে, সে তখন তাহাই অপছন্দ করিয়া ফেলে।

ডাক্তার সাহেবের বা নানার প্রথম সম্ভাষণটা মনোমত হয় নাই বলিয়া, আপন বাসায় আসিয়া নিযুক্ত লেপ্‌চা ভৃত্য এবং তাহার কাজ কর্ম্ম, কিছুই বঙ্কুবিহারীর পছন্দ হইল না। গরীব ভৃত্য তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াও অকারণ তিরস্কৃত হইল। ভৃত্য কোন মতে প্রভুর প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে পারিল না।

১৫

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বঙ্কুবিহারী আপনার মনোভাব আপনিই বুঝিতে পারে নাই। তুষার-মণ্ডিত, রজত-ধবল পর্ব্বতমালার উজ্জ্বল দৃশ্য, নানার বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাষণ কিংবা একটী নূতন স্থানের নবীনত্ব—এই সকল ভাল না লাগিবার কারণ সে বাহিরে অনুসন্ধান করিয়াছিল। লেপ্‌চা ভৃত্যের কার্য্যের অপটুতার মধ্যে আপনার অপ্রসন্নতার কারণ খুঁজিয়াছিল। দারজিলিংএর শীতলতার মধ্যে আপনার

হৃদয়ের জড়তার কারণ অন্বেষণ করিয়াছিল। একবারও অন্তরের ভিতর অন্বেষণ করে নাই।

একবার অন্তরের ভিতর অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারিত যে, সেখানে এক মহিমাময়ীর মূর্ত্তি, অপমান-লুণ্ঠিত হইয়া, হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তিকে ধুলি-ধুসরিত করিয়া দিয়াছিল। মনিয়া মনোমধ্যে যে আত্মদাহ জ্বালিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ধূমে বাহিরের সমস্ত সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গিয়াছিল।

১৬

বহুবার তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াও কায়লা বঙ্কুবিহারীকে ত্যাগ করে নাই। সে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে গৃহকার্য্যগুলি নীরবে ও সযত্নে সম্পন্ন করিতে লাগিল।

একদিন, মানসের সহিত দারজিলিংএর নানাস্থান দেখিয়া বঙ্কুবিহারী গৃহে প্রত্যাগত হইল। ভ্রমণের পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইতেছিল। মনেও কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। কেননা সেই দিন মানসকুমার, তাহার পিতার আদেশ অনুযায়ী, বঙ্কুকে বলিয়াছিল যে, নানার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কোন আশা নাই; অন্যের সহিত তাহার বিবাহ হইবে; একথা স্থির হইয়া গিয়াছে।

মনের অশান্তি ও শরীরের ক্লান্তি, এই দু'টীর ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। গভীর রাত্রে জ্বরের প্রকোপে বঙ্কুবিহারী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

কায়লা ঘুমায় নাই; গৃহদ্বারে জাগিয়া বসিয়াছিল। পীড়ায় প্রভুর কাতরতা দেখিয়া, সে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া তাপ অনুভব করিল। সে কি ভাবিল, কে জানে? ভাবিয়া একটী টীপয়ের উপর একটী কাচের গেলাশে জল রাখিয়া, লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহির হইল।

বাহির হইয়া, রাস্তা বাহিয়া, সে মানসদের বাটীতে গেল। সেখানে, বেহারার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া মানসকুমারকে জাগরিত করিল, এবং কাতর স্বরে বঙ্কুবিহারীর পীড়ার কথা বলিয়া, ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, তখনই বঙ্কুবিহারীকে দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

রাত্রি তখন দেড়টা; দারজিলিংএর শীত; টিপ্ টিপ্ করিযা বৃষ্টিও পড়িতেছিল; তাহার উপর ডাক্তার সাহেবের শরীর অসুস্থ। কাজেই, বঙ্কুবিহারীকে দেখিতে যাইবার জন্য, মানস তাঁহাকে কোন ক্রমে সম্মত করিতে পারিল না। মানসকুমার একাই অসুস্থ বাল্য সহপাঠীকে দেখিতে গেল।

কায়লা কিন্তু মানসকুমারের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিল না। সে অন্য ডাক্তারের অনুসন্ধানে অন্যত্র গেল।

১৭

কায়লা যখন ডাক্তার লইয়া গৃহে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। তখন বঙ্কুবিহারীর জ্বরের প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী, তিনি বঙ্কুবিহারীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য জ্বর হইয়াছিল, এখন মগ্ন হইতেছে। বিশ্রাম ও সামান্য ঔষধেই সারিয়া যাইবে; ভয় নাই।"

তাহার পর ডাক্তার বাবু ঔষধ লিখিয়া দিলেন। মানসকুমার কাগজখানি লইয়া বলিল, "আমি লোক পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া দিতেছি। কায়লা সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়াছে ও ভিজিয়াছে; ওর আর ঔষধ আনিতে যাইয়া কাজ নাই; ও একটু বিশ্রাম করুক।"

বঙ্কু। না, না, ওই যাইবে।

কায়লা দ্বিরুক্তি না করিয়া, একান্ত আগ্রহের সহিত কাগজখানি মানসকুমারের হাত হইতে লইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বঙ্কুবিহারী মানসকে

জিজ্ঞাসা করিল, "নানা কি আমার এই পীড়ার সময়ও একবার আমাকে দেখিতে আসিবে না।" প্রশ্নটা অতি সহজ; কিন্তু তাহা শুনিয়া মানসকুমার হঠাৎ বিচলিত হইয়া, চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল কায়লার হাত হইতে সেই কাগজখণ্ডটী পড়িয়া গিয়াছে, সে মস্তক অবনত করিয়া তাহা তুলিয়া লইতেছে।

মানসকুমার বলিল, "তুমি আর নানাকে দেখিতে চাহিও না।"

বন্ধু। যাহার জন্য একদিন দেশত্যাগী হইয়াছিলাম, আজ তাহাকে কি একবার দেখিতেও পাইব না?"

মানস। না; তাহার সহিত দেখাশুনার আর আবশ্যক কি?.........

এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বলিয়া মানসকুমার ইংরাজিতে বলিল, "তোমার চাকরের সম্মুখে এসব কথার আবশ্যক নাই।"

বন্ধুবিহারী ইংরজিতেই উত্তর দিল। বলিল, "না, না, ও বাঙ্গালা কিছুই বুঝে না; বুঝিলেও ওর মত নির্ব্বোধ লোক আমাদের কথার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে না; যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ, তখন আর আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই কহিব না।"

কায়লা ঔষধ লইয়া প্রত্যাগত হইলে মানসকুমার বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গেল।

১৮

উপরোক্ত ঘটনার পর, দশ দিন চলিয়া গিয়াছে। ঠিক হইয়া গিয়াছে যে, বন্ধুবিহারী নানার আশা ত্যাগ করিয়া, আগামী সোমবারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। সেই দিন বৃহস্পতিবার; সোমবার আসিতে এখনও কয়েক দিন বিলম্ব ছিল। বন্ধু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল এ কয় দিন কি করিবে;—কেমন করিয়া দীর্ঘ দিনগুলি অতিবাহিত হইবে?

সহসা বন্ধুর গৃহে মানসকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নানা অপরাধী; নানার- তুমি মুখদর্শন না করিতে পার, কিন্তু আমরা তোমার কাছে কি দোষ করিলাম, আমাদিগকেও তুমি দেখা দাও না কেন?"

বন্ধু। চল, এখনই তোমার সহিত বেড়াইতে যাইতেছি চল।

মানস। শুধু বেড়াইতে যাইলে চলিবে না। একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। কাল খুব ভোরে আমরা 'সেঞ্চল' পাহাড়ে বেড়াইতে যাইব; সেইখান হইতে সূর্য্য উদয় দেখিতে হইবে। বল, তুমিও আমাদের সহিত যাইবে?

বন্ধু বড় অনিচ্ছায় স্বীকৃত হইল।

মানস বহু চেষ্টা করিয়া, একটা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে শীকার করিবার জন্য "পাশ" সংগ্রহ করিয়াছিল। সে বন্দুক লইয়া যাইবার জন্য বন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিল।

১৯

পরদিন সকালে একটী পার্ব্বত্য অশ্বে আরূঢ় হইয়া শ্রীমান্ বন্ধুবিহারী "সেঞ্চল" অভিমুখে যাত্রা করিল। কায়লা বন্দুকটী স্কন্ধে করিয়া দ্রুতপদে প্রভুর অনুসরণ করিল।

যখন তাহারা 'সেঞ্চল পহুঁছিল, তখনও মানসরা তথায় আইসে নাই। পরে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শুভাগমন ঘটিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া, কিংবা তাহাদের সহিত নানাকে না দেখিয়া বন্ধুর মনে হইল, যেন "সেঞ্চল" পাহাড়ের যাবতীয় ভার তাহার মস্তক হইতে নামিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখা হইলে, সকলে শীকার অন্বেষণে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কায়লাও তাহাদের সহিত কিছু দূর গেল। সে একটী নির্ঝরের ধারে নীরবে বসিয়া, জলপ্রবাহের কলরব শুনিতে লাগিল।

কাহার হস্ত লক্ষ্যচ্যুত হইল কে জানে? কিন্তু অলক্ষিতের নিক্ষিপ্ত এক গুলি আসিয়া, ক্ষণেকে কায়লাকে উপলরাশির মধ্যে বিলুণ্ঠিত করিয়া দিল। ডাক্তার সাহেব উপর হইতে

এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলেন; তিনি দ্রুতপদে কায়লার দিকে নামিয়া আসিলেন। আসিবার সময় একজন কুলিকে শীকারিগণের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন।

মানসকুমার ও বঙ্কুবিহারী অতি অল্পকালের মধ্যেই কায়লা যেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মানসকুমার সহসা বঙ্কুর হস্ত ধারণ করিল। বলিল "বঙ্কু, বঙ্কু, ভাই, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।"

"কেন?"

২০

রাত্রের অন্ধকার অপসারিত হইলে পদ্মের প্রফুল্লতা তোমরা ত দেখিয়াছ; রঙ্গমঞ্চে যবনিকা উত্তোলনের পর দৃশ্যপটের শোভা তোমরা ত দেখিয়াছ; ভস্মাবৃত অগ্নিরাশিকে ভস্মাবরণ মুক্ত করিলে কি চমৎকার দেখায়, তাহা ত তোমরা দেখিয়াছ; তবে, ডাক্তার সাহেবের হস্তপ্রক্ষিপ্ত জলসিঞ্চনে যখন কায়লার মুখের কৃষ্ণানুলেপন বিধৌত হইয়াছিল, যখন অঙ্গুলি সঞ্চালনে ডাক্তার সাহেব কায়লার মুখমধ্যস্থিত বর্ত্তুলটী বাহির করিয়া, সুকোমল গণ্ডের স্বাভাবিক শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, যখন শিশিরসিঞ্চিত দুইটী স্থলপদ্মের ন্যায় জলনিষিক্ত কায়লার দুইটী বিশাল চক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন মনিয়ার মুখমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বঙ্কুবিহারী ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চাহিয়া দেখ দেখি কায়লা কে? পাপীষ্ঠের মত যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে; দেখ, সে তোমায় পরিত্যাগ করে নাই;—ছায়ার ন্যায় সে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়াছে। তুমি মনিয়াকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে, কিন্তু মনিয়া তোমায় ছাড়ে নাই। কিন্তু আজ বুঝি সে তোমায় ছাড়িয়া যায়!

বঙ্কুবিহারী অত্যন্ত কাতর হইয়া, ডাক্তার সাহেবকে বলিল, "ডাক্তার বাবু, মনিয়া আমার বিবাহিতা স্ত্রী; আমি পশুর মত উহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম; একদিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়া, উহার জীবন রক্ষা করুন।"

ডাঃ রায়। তুমি বিবাহিত হইয়াও আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে আসিয়াছিলে; মানসকুমার আমাকে সতর্ক করিয়া না দিলে হয়ত তোমারই সহিত নানার বিবাহ হইত। তুমি অত্যন্ত পাপীষ্ঠ। তুমি ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

২১

তথাপি, যিনি মানুষকে করুণ করিবার জন্য, তাহার হৃদয়ে দিবারাত্র অবস্থিতি করিতেছেন,—হায়! যে অকরুণ, জানিও তাহার হৃদয় হইতে ভগবান্ চলিয়া গিয়াছেন,—সেই করুণাময় বঙ্কুবিহারীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; ক্ষমা চাহিবার আগেই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। যে গুলি মনিয়ার জীবন নাশ করিতে পারিত, তাঁহার ইচ্ছায় তাহা কেবলমাত্র পঞ্জরদেশের চর্ম্ম কিয়দংশ বিক্ষত করিয়াছিল। মনিয়া, বঙ্কুবিহারীর যত্নে সহজেই জ্ঞানলাভ করিল, এবং মনিয়া কিরূপে কায়লা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ, বঙ্কুবিহারীর অনুরোধক্রমে, তাহার নিকট বিবৃত করিল।

জলভরা চক্ষু লইয়া, হৃদয়ভরা আনন্দ লইয়া, মস্তিষ্কভরা উন্মত্ততা লইয়া মনিয়া কেমন করিয়া, বঙ্কুবিহারীর নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এই ক্ষুদ্র কাহিনীকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করা হইবে। তবুও আমার কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকের তৃপ্তির জন্য সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বিবৃত হইল;—

বিবাহের পরেই মনিয়া—বুদ্ধিমতী, প্রেমময়ী মনিয়া—বুঝিয়াছিল যে নন্দলাল হিন্দুস্থানী

নহে,—বাঙ্গালী। কিন্তু পাছে নন্দলালের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়, এজন্য সে যাহা জানিয়াছিল, তাহা নন্দলালকে বুঝিতে দেয় নাই। মনিয়া বিবাহের পর নন্দলালের সহিত দুই বৎসর লাথে গ্রামে বাস করিয়াছিল। এই দুই বৎসর কাল মনিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষা নন্দলালের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। নন্দলাল, মনিয়াকে বলিয়াছিল যে বাঙ্গালা দেশে থাকার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে।

যে দিন নন্দলাল ধৃত হইয়া হাজারিবাগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রে, লাথে গ্রামের সেই বাটীতে, একাকী বসিয়া মনিয়া চিন্তার কূল দেখিতে পায় নাই। পরদিন মনিয়া প্রত্যূষে নন্দলালের উদ্দেশে গ্রামের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। যেখানে যত ইঁদারা আছে, চক্ষুতে তীব্র শক্তি পুরিয়া, তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিয়াছিল। এইরূপে অনাহারে সেই দিন অতীত হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যূষ হইতে আবার অন্বেষণ আরম্ভ হইল। হাজারিবাগের রাস্তায় রাস্তায় মনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।

হঠাৎ একজন দাই-শ্রেণীর পরিচিত স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল যে, দুই দিন পূর্ব্বে সে নন্দলালকে, বাঙ্গালীর পোষাকে, গাড়ির অপিসে দেখিয়াছে। হাজারিবাগ ও গিরিডি যাতায়াতের কুলি-টানা গাড়ির একটা আড্ডা ছিল, তাহাকে তদ্দেশীয় লোকেরা গাড়ির অপিস বলে। মনিয়া সেইস্থানে যাইয়া, নন্দলালের অনুসন্ধান করিল। অনুসন্ধানের ফলে বুঝিল যে, নন্দলাল দুইদিন পূর্ব্বে, দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত গিরিডি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সেই দিনই বাটী ফিরিয়া মনিয়া পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কিছু অর্থ লইয়া, মহাবীর ও অন্য সকলের অজ্ঞাতসারে গিরিডি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

গিরিডি আসিয়া গাড়ির অপিসে ও ষ্টেসনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, হাজারিবাগ হইতে আগত তিনটী ভদ্রলোক মেমারীর টিকিট খরিদ করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে যাত্রা করিয়াছেন। মনিয়াও মেমারীর টিকিট খরিদ করিয়া গাড়িতে উঠিল। অতঃপর মেমারী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, এবং তথায় অতি সহজেই বঙ্কুবিহারীর সন্ধান পাইল, কেন না, যে দোকানে মনিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার বাহিরে বসিয়া দুইজন যাত্রী, বোকড়ার জমীদারপুত্র বঙ্কুবিহারীকে কিরূপে হাজারিবাগের রাস্তায় পাওয়া গিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

তারপর মনিয়া বোকড়ায় যাইয়া বঙ্কুবিহারীকে দেখিয়াছিল এবং তাহার কার্য্যকলাপের প্রত্যেক সংবাদটী লইয়াছিল। লইয়া অভিমানে সহসা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।

দারজিলিংএ চাকুরির প্রত্যাশায় যখন সে মানসকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়ায়, সে মানসের নিকট যথার্থ পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

২২

সকল বৃত্তান্ত বঙ্কুবিহারী তাহার পিতাকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখিল। তদুত্তরে বঙ্কুবিহারীর পিতা লিখিলেন ;—

"তুমি কখনই আমার ত্যাজ্য নহ। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, সেই আমার পুত্রবধূ ; পুত্রবধূর মত আদরে তাহাকে আমরা গৃহে লইব। সমাজ আমাকে নিন্দা করিতে পারে ; কিন্তু ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাজ আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি পুত্রস্নেহ ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি বধূমাতাকে লইয়া সত্বর বোকড়ায় আসিও।"

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভগবৎ সেবা।

এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে অনেকেই হতাশ হইয়া কহিয়া থাকেন, "হায়! হায়! এই মানব-জন্ম বৃথায় কাটিয়া গেল; যে জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া ধরাধামে মনুষ্যদেহে আগমন করিলাম, তাহার কিছুই হইল না। পরকালের কাজ কিছুই করিতে পারিলাম না; ভগবৎ সেবার কিছুই হইল না।" কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সৎগুরু পাইলাম না, সুশিক্ষা দিবার লোক পাওয়া গেল না, ভগবৎ সেবার উপায় জানিতে পারিলাম না, হায়! হায়! এই নরজন্ম বৃথায় যাপিত হইল।"

যাঁহারা এই প্রকারে আক্ষেপ করেন, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ শান্তি ও সুবিধার জন্য আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। যাঁহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দীক্ষা-গুরু বা শিক্ষা-গুরু মিলে নাই, যাঁহারা সাধুসঙ্গ অভাবে অথবা শাস্ত্রজ্ঞানাভাবে ভগবৎ সেবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভগবৎ সেবা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঠ করা ও জ্ঞান লাভ করা স্বতন্ত্র কথা; আবার জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করা আরও স্বতন্ত্র। যে সকল উপায়ে ভগবানের সেবা করা যায়, সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি এস্থলে তাহাই বর্ণনা করিতেছি। পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই তাঁহার সেবা করা হয়। এই সেবায় আত্ম-প্রসাদ জন্মে; আত্মপ্রসাদে যে বিমল আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দ দ্বারা ঈশ্বরের সেবা বুঝিতে পারা যায়। ভগবৎ সেবাদ্বারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধান হইলেই, সেবককে (ভক্তকে) ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করেন, এই ঐশী আশীর্ব্বাদ দ্বারা ভক্তের জীবনে নানা-প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে; এই সুখময় ও শুভময় পরিবর্ত্তন দ্বারা ভক্ত জানিতে পারেন যে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন।

ভগবৎ সেবা দশপ্রকার, অর্থাৎ সাধ্য ও সুবিধা অনুসারে দশ উপায়ে ভগবানের সেবা করা যাইতে পারে। এই দশবিধ উপায়ের নাম এই;—১। ধ্যান; ২। চিন্তা; ৩। পূজা; ৪। কর্ত্তব্যপালন; ৫। কর্ম্ম; ৬। চরিত্র; ৭। স্তুতি; ৮। প্রচার; ৯। শিক্ষা; ১০। প্রার্থনা। এইবারে এই কয়েকটি উপায়ের অর্থ শ্রবণ করুন। শাস্ত্রানুসারে আসন-বিশেষে উপবেশনপূর্ব্বক যথারীতি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করার নাম ধ্যান (Devotion)। ধ্যানের উচ্চতর অবস্থার নাম সমাধি। যোগীর যোগের ফল ধ্যান এবং ধ্যানের সুফল নানাপ্রকার। ধ্যানে সিদ্ধি লাভ হয় এবং অলৌকিক সামর্থ্য জন্মে। যাঁহারা ধ্যানে অশক্ত অথবা যোগাসনে উপবেশন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া থাকেন, এই চিন্তার ইংরাজি নাম Contemplation. পবিত্র দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করা ও তাঁহার শরণাগত হওয়ার নাম পূজা (Worship)। যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার পূজক। পূজা দেখিয়া, পূজক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা সহজে বুঝা যায়। কর্ত্তব্যপালনেও ভগবানের সেবা করা যায়, কারণ কর্ত্তব্যগুলি ভগবানের নির্দ্দিষ্ট অনুজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং দেশ, সমাজ, পরিবার, সমস্ত জীব ও জগৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের

কর্ত্তব্য আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ সম্বন্ধেও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কর্ত্তব্যের ইংরাজি নাম Duty. পুণ্যময় কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়; দান, পরোপকার, শুভ কর্ম্ম ইত্যাদি কর্ম্ম বলিয়া গণ্য, কর্ম্মের ইংরাজী নাম Good works; সংস্কৃত পর্য্যায় পুণ্য। চরিত্রবান্ না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না; চরিত্র না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান, সৎকর্ম্ম, কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং বিমল চরিত্র (Good character) সহ জীবন যাপন করা ভগবানের অতীব প্রীতিপ্রদ এবং বিমলচরিত্রবান্ পুরুষেরই সেবা ভগবান্ গ্রহণ করেন। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন, মহিমা-গান, মহিমা-পাঠ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার স্তুতি (Praise) করা হয়, সুতরাং ইহাও সেবা মধ্যে গণ্য। ধর্ম্মপ্রচার, ভগবানের অন্যতম সেবা। প্রচারকবৃন্দ ভগবানের সৃষ্টিকৌশলে, অপার সামর্থ্য, অশেষ গুণ, অনির্ব্বচনীয় মহিমা, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের প্রতি মানবের ভক্তি ও বিশ্বাস উদ্রেক করিয়া দেন এবং কঠিন বিষয় সমূহ সরল করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা অতীব সুখময় সেবা। শাস্ত্রে ভগবান্ কহিয়াছেন, যাঁহারা আমার (ঈশ্বরের) গুণকীর্ত্তন, মহিমা প্রচার ও নীতিসমূহ প্রচার বা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও প্রিয়।" কথকতা, পাঠ, বিদ্যালয়-স্থাপন, শিক্ষকরূপে উপদেশ দান প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষাচ্ছলে ভগবানের সেবা করা হয়। প্রচারের ইংরাজি নাম Preaching এবং শিক্ষার ইংরাজি নাম Teaching. প্রার্থনার ইউরোপীয় সংজ্ঞা "প্রেয়ার" (Prayer). "প্রার্থনা" শব্দ অতি মনোহর; ইহার কিছু বিশদ ব্যাখ্যা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। শাস্ত্রসমূহ ঈশ্বরের বাক্য, শাস্ত্র দ্বারা আমরা ভগবানের কথাসমূহ পরিজ্ঞাত হইতে পারি, কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা ভগবান্ আমাদের মনের কথা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। God speaks to us through the sacred scriptures and we speak to God through our Prayer to Him. মনে কর, তোমার এক বন্ধু বোম্বাই নগরে অবস্থান করিতেছেন এবং তুমি কলিকাতা নগরীতে অবস্থান করিতেছ; বোম্বাইস্থ বন্ধুকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, তাঁহাকে কোন কথা ঝটিতি জানাইতে হইলে টেলিগ্রাফের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ দ্বারা যেমন তুমি তোমার দূরস্থিত অদৃশ্য বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতে পার, "প্রার্থনা" দ্বারা তেমনি আমরা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির অতীত পরমারাধ্য পরমেশ্বর-সমীপে আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া থাকি। তারে খবর পাঠাইতে হইলে যেমন তাহার "ফী" (fee) দিতে হয়, "প্রার্থনা" রূপ টেলিগ্রাফের "ফী"এর নাম "ভক্তি"। ভক্তি না থাকিলে প্রার্থনা বৃথা হয়, 'ফি' না দিলে টেলিগ্রাফ-মাষ্টারগণ তারের খবর গ্রহণ করেন না। অনেক সময়ে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ফল ফলে; কোন কোন সময়ে অল্প বিলম্ব বা অধিক বিলম্বে ফলে; কিন্তু যে প্রার্থনা গৃহীত হয় না, তাহার মোটেই ফল হয় না।

পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে সুবিধা ও সাধ্য মত এই দশবিধ উপায়ের মধ্যে সুলভতর উপায়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ক্ষমতা ও সুবিধা থাকিলে কেহ কেহ একাধিক উপায় অবলম্বন করেন, কেহ কেহ অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া মানব-জীবন সার্থক করিয়া থাকেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুর্ব্বাসা—মুনিবিশেষ। দেবর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বামদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তপস্যায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়া ইনি অতি তেজঃসম্পন্ন যোগী হন। শঙ্করের আদেশে ইনি শ্বেতকীরাজের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের যাজনক্রিয়া করেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক শিষ্য ছিল।

দুর্ব্বাসা ঔর্ব্বতনয়া কন্দলীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে শ্বশুরের অনুরোধে কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কলহপ্রিয়া কন্দলী অতি অল্পকালের মধ্যে শতসংখ্যক অপরাধের সীমা অতিক্রম করায় ইনি তাঁহাকে শাপ প্রদানে ভস্মীভূত করেন। যাদববংশীয়া একনাংশা নাম্নী আর এক কন্যাকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

দুর্ব্বাসা অতিশয় স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। ইঁহার কোনও বিষয়ের নিয়ম ছিল না। সুতরাং ইঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজসাধ্য ছিল না। একদা ইনি কুন্তিভোজ নরপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তি (পাণ্ডবজননী) ইঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। মুনিবর তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তির সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করা যাইবে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। আর এক সময়ে ইনি দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবনিগ্রহে গমন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে ইঁহার প্রয়াস বিফল হয়। একদা মুনিবর দেবরাজকে একছড়া মালা প্রদান করেন। দেবেন্দ্র তাহা নিজে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের মস্তকে রক্ষা করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। অন্য এক সময়ে ইনি কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পতিধ্যান-পরায়ণা শকুন্তলা ইঁহার সংবর্দ্ধনা না করায় ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদানে দীর্ঘকাল পতিবিরহ-যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপ কোপন-স্বভাব হেতু একবার দুর্ব্বাসাকে মহাবিপদে পড়িতে হইয়াছিল। একদা ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ইনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে, রাজা ব্রতজন্য তিন দিবস উপবাসের পর পারণার সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের উপদেশক্রমে জলগ্রহণ করেন। মুনিপুঙ্গব প্রত্যাগত হইয়া এই কথা শ্রবণ করেন, এবং কুপিত হইয়া স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে এক উগ্রমূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র তাহাকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বাসাকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল। মুনিবর প্রাণভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণুর উপদেশে অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।

রামচন্দ্র কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইয়া আপনার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে বলেন। রামের নিষধ সত্ত্বেও ইঁহার ভয়ে লক্ষ্মণ তথায় গমন করায় রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সুরাপানমত্ত যাদবগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া এবং তাঁহার কৃত্রিম গর্ভাকার উদরস্ফীতি রচনা করিয়া ইঁহার নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহার প্রসবকাল গণনা করিয়া দিতে বলেন। মুনিবর যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া উত্তর করেন যে, এই গর্ভে একটী মূষল হইয়া যদুকুল নির্ম্মূল করিবে। কিছুকাল পরে কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—নৃপতিবিশেষ। চন্দ্রবংশীয় ঐতিরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হন। অতঃপর সেই স্থলেই গান্ধর্ব্ববিধানমতে ইঁহাদের বিবাহ হয়। রাজা পরমানন্দে কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতেই শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়। অনন্তর ইনি অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরি শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হন। কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে শকুন্তলা দুষ্মন্তের ঔরসে স্বীয় গর্ভে জাত ভরত নামক পুত্রকে লইয়া হস্তিনায় স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। রাজা প্রথমে শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রসহ ভার্য্যাকে গ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন।

দূষণ—এই রাক্ষস সম্বন্ধে রাবণের মাতৃষস্রেয় ছিল, এবং তাহার আদেশে দণ্ডকারণ্যবাসী খর নামক রাক্ষসের সেনাপতি হইয়া দশাননভগিনী শূর্পণখার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদিত হইলে, দূষণ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

দেবকী, দৈবকী—কৃষ্ণের জননী। ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের ঔরসজাতা কন্যা ছিলেন। ইঁহার স্বামীর নাম বসুদেব। ইঁহাদের বিবাহোৎসবকালে উগ্রসেনতনয় কংস জানিতে পারেন যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। তখন কংস ভগিনীপতি সহ ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং দেবকীর এক একটি সন্তান যেমন জন্মিতে লাগিল, অমনি কংস তাহাকে লইয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব গোপনে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক দেবকীর নিকট রাখিয়া দিলেন। পরদিন কংস সেই কন্যার প্রাণবধে চেষ্টিত হইলে দৈববাণীতে অবগত হন যে, তাঁহার জীবনহন্তা অন্যত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। অতঃপর কংস পতিসহ ভগিনী দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস

নিহত হইলে দেবকী পুত্রমুখ দর্শনে অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব যোগা-বলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার অনুগামিনী হন। কথিত আছে যে, দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপা নামে খ্যাত ছিলেন। ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গবী প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করায়, ব্রহ্মার শাপে পুনরায় মানুষী হইয়া দেবকী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি পিতার অতিশয় স্নেহপাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতি-তনয় কচ দেবাদেশে সঞ্জীবনী-মন্ত্র শিক্ষার্থে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে অবস্থিতিকালে দেবযানী তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ক্রমে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। অসুরগণ কচের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বধ করিলে দেবযানী পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনং পুনর্জ্জীবিত করেন। অতঃপর কচ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমনোদ্যত হইলে, দেবযানী তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। গুরুকন্যা সহোদরা-জ্ঞানে কচ তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাঁহার মন্ত্র নিষ্ফল হইবে। কচও অভিসম্পাত করেন যে, দেবযানী ক্ষত্রিয়-ভোগ্যা হইবেন।

দৈত্যরাজতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেব-যানীর সখীভাব ছিল। একদা উভয়ে একত্রে জলক্রীড়ায় গমন করেন। স্নানান্তে শর্ম্মিষ্ঠা অগ্রে তীরে উঠিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ে কলহ হইতে হইতে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে আঘাত করিয়া এক শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। মহারাজ যযাতি দৈবক্রমে মৃগয়ার্থ সেই বনে গমন করেন, এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কূপমধ্যে দেব-যানীকে দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। দেবযানী যযাতির সৌজন্যে ও রূপে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইনি পিতার নিকট শর্ম্মিষ্ঠার দুর্ব্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বৃষপর্ব্বরাজের রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন দৈত্য-রাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টিবিধান করেন।

অনন্তর আর এক দিন দেবযানী ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাতিও মৃগয়ার্থ তথায় উপস্থিত হন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনন্তর শুক্রাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ ইঁহাকে রাজভবনে লইয়া যান। যযাতির ঔরসে ইঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন দেবযানী সমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধভরে পিতৃগৃহে গমন করেন।

দেবরাত—মহারাজ পরীক্ষিৎ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র ; পরীক্ষিৎ যখন তাঁহার জননী অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগ-বলে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহাকে

রক্ষা করেন; এই জন্য তিনি দেবরাত নামে খ্যাত হন।

দেবল—মুনিবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম অসিতঋষি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। ইনি যখন কঠোর তপশ্চরণ করেন, সে সময়ে জৈগীষব্য ইহাঁর আশ্রমে বাস করিতেন। জৈগীষব্য অগ্রে সিদ্ধ হওয়ায় দেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেবল মোক্ষপদলাভের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং শান্তনুর ভ্রাতা, ইনি স্বীয় তপস্যা-প্রভাবে বিশ্বামিত্র ও সিন্ধুদ্বীপের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দ্যুমৎসেন—নৃপতিবিশেষ, সত্যবানের পিতা। শালদেশে ইহাঁর রাজ্য ছিল। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন, এবং সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্য-শাসন করিতেন। বিধিনির্ব্বন্ধে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায়, ইহাঁর শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া ইহাঁকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইনি ভার্য্যা ও শিশুপুত্র সত্যবান্‌সহ অরণ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। সত্যবান্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শসতী সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইলে পতিগতপ্রাণা সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্মবলে ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হন। অনন্তর দ্যুমৎসেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুত্রকলত্রাদিতে পরি-বেষ্টিত হইয়া বহুকাল রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অবশেষে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক জীবনের অব-শিষ্টাংশ ধর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করেন।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ, পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ইনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত একত্রে এক গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যাদি সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং উভয়ের সমবয়স্কতা বশতঃ পরস্পরের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ইহাঁর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হন, কিন্তু ইনি পদগৌরবে মত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া দ্রোণ হস্তিনায় গমন করিলেন, এবং তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া কুরু-পাণ্ডববালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ বলিলেন যে, "যদি তোমরা গুরুর প্রার্থনানুরূপ গুরু-দক্ষিণা দিতে চাও, তবে আমি আর কিছুই চাহি না; তোমরা কেবল পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস"। এই কথা শুনিয়া কুমারগণ পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একে একে সকলকে পরাস্ত করি-লেন। অবশেষে মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনিয়া দিলে, দ্রোণ ইহাঁকে ক্ষমা করিয়া ইহাঁর রাজ্যের উত্তরাংশ স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাংশ ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় দ্রুপদের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর ইনি কাম্পিল্য নগরে রাজধানী স্থাপন-পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশে সক্ষম

পুত্রের কামনা করিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে ইহাঁর কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) নাম্নী কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণের শিরশ্ছেদন করেন। দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে আর একটি পুত্র ছিলেন।

কৃষ্ণা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ অর্জ্জুনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করেন; কিন্তু জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া ইনি লক্ষ্যভেদ-পণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন। এই বিবাহ-উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে রাজগণ পঞ্চালে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যবেধে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহা বিদ্ধ করিলে, দ্রুপদ তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন অর্পণ করিলেন, কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধে পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী হইলেন [দ্রৌপদী দেখ]। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাটরাজপুরীতে প্রকাশিত হইলে, দ্রুপদ জামাতৃগণের নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর কুরুপাণ্ডবে সমর উপস্থিত হইলে, দ্রুপদ সবান্ধবে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসীয় রণে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

দ্রোণ—ভরদ্বাজমুনির পুত্র, অশ্বত্থামার পিতা। ঘৃতাচী নাম্নী স্বর্বেশ্যাকে দেখিয়া ভরদ্বাজমুনির রেতঃস্খলন হওয়ায় মুনিবর তাহা এক দ্রোণীমধ্যে রক্ষা করেন; সেই দ্রোণীতে (ডোঙাতে) জন্ম হওয়ায় ইহাঁর নাম দ্রোণ (দ্রোণী শব্দ+ষ্ণ)। বাল্যকালে দ্রুপদের সহিত একত্রে থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ভরদ্বাজের দেহত্যাগের পর দ্রোণ তপশ্চরণদ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতিলাভ করেন। অনন্তর বংশরক্ষার্থ গৌতমতনয়া কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর পরশুরাম সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন শুনিয়া দ্রোণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সমগ্র ধনুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইনি দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপনীত হন। অনন্তর, দ্রুপদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়া অর্থাভাবে ক্লিষ্ট দ্রোণ বাল্যসখার আশ্রয়প্রার্থী হইলে, দ্রুপদ ইহাঁর আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণ যে রাজাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হইয়াছেন, এই অপরাধে ইহাঁকে নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন। এইরূপে দারুণ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম ইহাঁকে সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তদবধি ইনি দ্রোণাচার্য্য নামে খ্যাত হন।

রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ইহাঁকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ! যদি প্রকৃত গুরুদক্ষিণা দান তোমাদের অভিমত হয়, তবে পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া নৃপনন্দনগণ পঞ্চাল আক্রমণ ও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমরে জয়ী হইয়া গুরুর আদেশানুরূপ দক্ষিণা দান করিলেন। তখন

দ্রোণ দ্রুপদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে! এখন আমাকে চিনিতে পার কি? দেখ, তোমার রাজ্য ও জীবন আমার করতলগত; কিন্তু আমি পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে অতঃপর যাহাতে তুমি আমাকে দরিদ্র বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে না পার, এজন্য তোমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অপর অর্দ্ধাংশ তোমাকেই দিলাম।" এইরূপে ভাগীরথীর উত্তরে দ্রোণের রাজ্য হইলে, ইনি অহিচ্ছত্র নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক পুত্রকলত্রসহ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদ মর্ম্মান্তিক অপমানে জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনার্থ দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণা নামে কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হন। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরকালে দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের পর একাদশ দিবসে ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতিপদে বরিত হন। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি অপর ছয়জন রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে বালক-বীর অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে ইনি তুমুল সংগ্রাম করিয়া দ্রুপদের ও বিরাট-রাজের জীবনান্ত করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইলে, কৃষ্ণের কৌশলে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এইরূপ রব উঠিল। দ্রোণ মনে করিলেন, আমার একমাত্র পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ইনি পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে ইঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন।

দ্রৌপদী—ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা; ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাতা হন। এই নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিতা। পঞ্চাল দেশে জন্ম হওয়ায় ইঁহার আর এক নাম পাঞ্চালী। দ্রুপদের আর এক নাম যজ্ঞসেন, এই জন্য কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী নামেও বিদিতা। দ্রৌপদী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ ইঁহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি লক্ষ্যবেধপণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন, এবং অতি উচ্চ স্থানে লক্ষ্যবস্তু স্থাপনপূর্ব্বক এক সুদৃঢ় কার্ম্মুক নির্ম্মাণ করাইলেন। পাঞ্চালীর রূপগুণের কথা শুনিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে রাজগণ ও নৃপনন্দনসমূহ রমণীরত্নলাভের আশায় পাঞ্চালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাকুক, অনেকে সেই শরাসনে জ্যারোপণই করিতে পারিলেন না। বীরবর কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী সর্ব্বজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূতপুত্রকে কদাচ বরমাল্য প্রদান করিব না।" ইহাতে কর্ণ লজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণার পতি হইবার অধিকারী হইলেন। অতঃপর দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুনসহ রজনীতে ভার্গবের কুটীরে

উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। বিধিনির্ব্বন্ধে ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইল। অনন্তর পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী পতিগণসহ সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপতির ঔরসে, ইহাঁর যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

দ্রৌপদীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী ভূমণ্ডলে নিতান্ত বিরল। এই জন্যই ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। ইহাঁর সরল, অকপট, সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলে ইহাঁর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। পরিবারবর্গের পরিচর্য্যায় বা তত্ত্বাবধানে ইহাঁর বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। যুধিষ্ঠির যেরূপ আদর্শ-নরপতি ছিলেন, দ্রৌপদীও তদনুরূপ আদর্শ-মহিষী ছিলেন। পতিসেবায় দ্রৌপদী অতুলনীয়া ছিলেন। ইনি স্বয়ং সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, "আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কামক্রোধ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক প্রযত্নপরায়ণ হইয়া পতির পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। নিয়ত অনুকূলকারিণী ও আলস্যশূন্যা থাকি। আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, তৎসমুদায় আমি পরিবর্জ্জন করি। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। পতি অস্নাত, অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিলে, আমি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না। আমার সাবধানতা, নিয়ত উত্থমশীলতা ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারাই ভর্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম্ম।" ইহাই আর্য্য হিন্দুমহিলার প্রকৃত শিক্ষা, যথার্থ ধর্ম্ম, সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য। কিন্তু হা দগ্ধ ভাগ্য! আমরা অধুনা পাশ্চাত্য বিকৃত শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া এই সনাতন ধর্ম্ম অতল জলধিতলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদের অঙ্কলক্ষ্মীগণকে মেম সাজাইয়া চেয়ারে বসাইয়া, ভূমণ্ডলের যাবতীয় বিলাস-সামগ্রী তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রান্তমতিকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছি! ধন্য যুগমাহাত্ম্য! দ্রৌপদীর এইরূপ নিঃস্বার্থ পতিপরায়ণতা ছিল বলিয়াই তিনি পঞ্চপতির পত্নী হইয়াও আদর্শ-সতীরূপে পূজিতা।

দ্রৌপদী আদর্শ-গৃহিণীও ছিলেন। এ সম্বন্ধে ইনি সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডবেরা আমার উপর যাবতীয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। অপিচ সমস্ত অন্তঃপুরবর্গের এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৃত্যবর্গের কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত। আমি গৃহ, গৃহোপকরণ, ভোজনদ্রব্য, সমস্ত সুন্দর, পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি; সংযত হইয়া খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করি। পরিচারকেরা অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করিতে ইচ্ছা করি না। আমি চিরকাল সকলের পর শয়ন করি এবং সকলের অগ্রে শয্যা পরিত্যাগ করি।" ইহাই হইল হিন্দু-গৃহিণীর যথার্থ ধর্ম্ম। পরিতাপের বিষয়, আধুনিক অস্মদ্দেশীয়া গৃহিণীগণ তাঁহাদের

স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া অথবা শিক্ষা না করিয়া নাটক নভেল পড়িতে বা বেশবিন্যাস করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন,—গৃহের আর কিছু দেখিবার তাঁহাদের সময় হয় না—সে সকল কার্য্যের ভার দাসদাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য-সাধন হইল বলিয়া মনে করেন।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের কপট দ্যূতে রাজ্য, ধন, জন ও শেষে পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত হারেন। সেই সময়ে দ্রৌপদী অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করেন। দুরাত্মা দুঃশাসন, দুর্জ্জন দুর্য্যোধনের আদেশে ইহাঁকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়াছিলেন, সুতরাং দ্রৌপদীর পরিহিত বসনও তখন দুর্য্যোধনের হইয়াছে। সুতরাং পাপমতি দুর্য্যোধন ইহাঁর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লইতে আদেশ করিলে, দুঃশাসন তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাঁর কাতর-বচনেও সভাস্থ কেহ তাহা নিবারণ না করিলে ইনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া অতি দীনভাবে দীননাথ হরির শরণাগত হইয়া আর্ত্তস্বরে আপ্লুতনয়নে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বিপদ্‌ভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, জগন্নাথ শ্রীহরি অদ্ভুত কৌশলে দুর্ম্মতি দুঃশাসনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইহাঁর লজ্জা নিবারণ করিলেন। অতঃপর ইনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দ্রৌপদী পুত্রগণকে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং পতিগণসহ পদব্রজে বনগামিনী হইলেন।

বনবাসকালে কৃষ্ণা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন পাণ্ডবদিগকে বনে দর্শন করিতে আসিলে ইহাঁর শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইল। দ্রৌপদী সাতিশয় কৃষ্ণভক্তা ছিলেন, এবং তাঁহাকে আত্মীয় হইতেও আত্মীয় জ্ঞান করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইনি শোকাবেগধারণে অসমর্থা হইয়া অভিমানভরে অতি বিনীতভাবে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—"হে বিভো! আমি তোমার সখী, বিশ্ববিজয়ী পাণ্ডবদিগের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী হইয়াও কৌরবসভায় অপমানিতা ও আকৃষ্টা হইলাম! হে মধুসূদন! আমি বুঝিয়াছি, আমার স্বামী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার বান্ধব নাই, আমার ভ্রাতা নাই, আমার পিতা নাই, এবং আমার তুমিও নাই। তোমরা কেহ থাকিলে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ কি আমাকে সভামধ্যে অপমান ও উপহাস করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার সম্বন্ধ, প্রভুত্ব, সখ্য, ও গৌরবভাব আছে; এই চারিটি কারণে আমি সর্ব্বদা তোমার রক্ষণীয়া।" কৃষ্ণ ইহাঁর দুঃখে দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে ইহাঁকে সান্ত্বনা করিলেন।

এই বনবাসকালে একদা ইনি জয়দ্রথ কর্ত্তৃক হৃতা হন। পরে পাণ্ডবেরা পাপিষ্ঠের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক ইহাঁকে দুরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর

ভোজনান্তে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে প্রেরণ করেন। ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে অতিথি-সেবায় ক্রটী হইলে সর্ব্বনাশ হইবে বুঝিয়া দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন, এবং সাতিশয় কাতরা হইয়া দীনবচনে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন; কৃষ্ণের যোগবলে ও কৌশলে দুর্ব্বাসা ভোজনে বীতস্পৃহ হইয়া শিষ্যগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে দ্রৌপদীর দুঃখকষ্টের ও অপমানলাঞ্ছনার শেষ ছিল না। ইনি রাজকন্যা ও রাজমহিষী হইয়াও সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজমহিষীর পরিচারিকারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিন শত শত দাস দাসী যাঁহার আদেশপালনার্থ সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত, আজ তাঁহাকে অপরের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হইল। ভাগ্যচক্রের কি অদ্ভুত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! এই অবস্থায় কৃষ্ণার একমাত্র সাহস ও সান্ত্বনার বিষয় এই ছিল যে, ইহাঁর সহিত পতিগণও ছদ্মবেশে ইহাঁর সহিত এক পুরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কায়ক্লেশে দশ মাস অতীত হইলে দ্রৌপদী রাজশ্যালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিতা হইলেন। পাপাশয় ইহাঁর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা ইহাঁকে কার্য্যব্যপদেশে আপনার গৃহে লইয়া যায়, এবং ইহাঁর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ইনি দৌড়িয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হন। দুর্বৃত্ত কীচকও ইহাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে ইহাঁকে পদাঘাত করে। কীচক বলে রক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। তখন দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখিয়া রজনীতে ভীমের নিকট গমনপূর্ব্বক কীচকের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীর কপট সঙ্কেতক্রমে কীচক নিশাকালে নাট্যশালায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীবেশী ভীম দুর্বৃত্ত কীচককে পশুবৎ বধ করিয়া দ্রৌপদীর শঙ্কা দূর করিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরকালে পাঞ্চালী পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে ইহাঁর পঞ্চ পুত্র বিনষ্ট হইলে, ইনি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া ভীমকে পুত্রহন্তার প্রাণসংহারার্থ প্রেরণ করেন। বৃকোদরকে সে কার্য্যে অসমর্থ জানিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন সহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া ও প্রাণভিক্ষা লইয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদানপূর্ব্বক বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া রাজাকে প্রদান করেন। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়ী হওয়ায় ইনি বাহ্য সুখসাগরে ভাসমানা হইলেন বটে, কিন্তু ইহাঁর অন্তরে দারুণ দাবানল জ্বলিতে লাগিল; সমরে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি শোকশল্যে ম্রিয়মাণা হইলেন। অতঃপর হস্তিনায় পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হইলে দ্রৌপদী পুনরায় রাজমহিষী হইলেন, এবং সাধ্যানুসারে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী ভর্ত্তৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন। ইহাঁর পঞ্চপতির

মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি মনে মনে ইঁহার অনুরাগ কিছু অধিক ছিল। একমাত্র এই পক্ষপাতিত্বরূপ পাপে দ্রৌপদী স-শরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থা হইয়া সুমেরু শিখরে গমন সময়ে ভূধরপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তনুত্যাগ করেন।

দ্বিবিদ—কামরূপ বানরবিশেষ। কপিবর লঙ্কাসমরে সুগ্রীবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্গারোহণ-কালে ইঁহাকে কলিযুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বলিয়া যান। ইঁহার সহিত নরকাসুরের মিত্রতা ছিল। কৃষ্ণ কর্তৃক নরক নিহত হইলে, দ্বিবিদ যাদবদ্বেষী হইয়া অতিশয় অত্যাচারপরায়ণ হইলেন। একদা বলদেব ভার্য্যাসহ রৈবতক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করায়, বলরাম ইঁহার প্রাণবধ করেন।

ধনপতি—বণিক্‌বিশেষ। ধনপতি সদাগর উজানি নগরে বাস করিতেন এবং বাণিজ্যার্থে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে ইঁহার দুই ভার্য্যা ছিল। সপত্নীদ্বয়ের কলহে ইঁহাকে সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতে হইত; পারিবারিক সুখ ইঁহার ছিল না বলিলেই হয়। রাজা বিক্রমকেশরী কর্ত্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইলে, ইনি তথায় কালিদহে কমলে কামিনী দর্শন করিয়া রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহার সহিত গমন করেন, কিন্তু কমলেকামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতির কথা মিথ্যা বিবেচনায় তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। দীর্ঘকাল পরে ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে গমনপূর্ব্বক রাজাকে কমলে কামিনী দর্শন করাইয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর ধনপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের উপর সমস্ত বিষয়কার্য্যের ভারার্পণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

ধর্ম্মধ্বজ—রাজর্ষিবিশেষ। ইনি সত্যযুগে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চশিখনামক ঋষি ইহাঁকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেন। নানাস্থান হইতে বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মচারী ব্যক্তিগণ ইহাঁর নিকট আগমন করিতেন। একদা সুলভানাম্নী ব্রহ্মচারিণী ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইহাঁর নিকট আগমন করেন এবং ইহাঁর সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

ধর্ম্মব্যাধ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধবিশেষ। এই ব্যাধ মিথিলা দেশে বাস করিতেন, এবং সাধু পথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন। জনকজননীর পরিচর্য্যার ফলে ইনি ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। কৌশিক নামক জনৈক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইহাঁর নিকট আগমন করিলে, ইনি তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ গৃহে গমনপূর্ব্বক মাতাপিতার সেবায় প্রবৃত্ত হন।

ধাবক—কবিবিশেষ। ইনি মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ধাবক প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পরে যত্ন ও প্রতিভাবলে কবিত্বশক্তি লাভ করেন। অনন্তর, এক শত সর্গে নৈষধচরিত রচনা করিয়া মহারাজ

শ্রীহর্ষকে অর্পণ করিলে, তিনি পারিতোষিক স্বরূপ কবিকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দান করেন। ধাবক রত্নাবলী নাটকেরও রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ধুন্ধু—অসুরবিশেষ, মধুকৈটভের পুত্র। ধুন্ধু কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দেবদানবাদির অবধ্য হইবার বর লাভ করে। এই বরলাভে দৃপ্ত হইয়া অসুর দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং উতঙ্কমুনির আশ্রম সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার তপশ্চরণের ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। অবশেষে উতঙ্ক মুনি বিষ্ণুর আদেশে কুবলয়াশ্ব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসুর বধার্থ অনুরোধ করিলেন। রাজা একবিংশতি পুত্রসহ অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্ধু রাজার অষ্টাদশ পুত্রের প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল।

ধূমাবতী—দেবীবিশেষ, দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা, দুর্গা। কথিত আছে যে, একদিন পার্ব্বতী শঙ্করের নিকট আহার প্রার্থনা করেন। শঙ্করের তাহা দিতে বিলম্ব হওয়ায় ঠাকুরাণী শঙ্করকে গ্রাস করেন। তাহাতে দেবীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইয়া ইহাঁকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শঙ্কর বলিলেন, "দেবি! যখন তুমি আমাকে গ্রাস করিলে, তখন তোমার বিধবা-বেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই বেশে তুমি জগতের পূজনীয়া হও, এবং তোমার এই মূর্ত্তি ধূমাবতী নামে খ্যাত হউক।"

ধূম্রলোচন—অসুরবিশেষ, দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভের দূত অম্বিকাকে আনিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে [অম্বিকা দেখ] দৈত্যরাজ ধূম্রলোচনকে সসৈন্যে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধে রণশয্যায় শয়ন করে।

ধৃতরাষ্ট্র—পাণ্ডুরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়;—

ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি জন্মান্ধ বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের অপর পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু রাজপদ প্রাপ্ত হন। গান্ধারপতি সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা হয়। যুযুৎসু নামে বৈশ্যাগর্ভজাত ইঁহার আর একটি পুত্র ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বে ও সরল, সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগের যশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে অসূয়ার উদয় হইল। এদিকে উপযুক্ত পুত্র দুর্য্যোধনও পাণ্ডববিনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিলে, তাঁহারা দুষ্ট দুর্য্যোধনের পরামর্শে তাঁহার নির্ম্মিত জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহদাহ ও পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের পর যখন অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্যসাধন করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিতে বলিলেন।

পাণ্ডবদিগের উন্নতি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের

মন পুনরায় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ইঁহাকে প্রকাশ্যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। দুর্য্যোধনই সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, ইনি কেবল সেগুলি অনুমোদন করিতেন। ইঁহার মত করাইয়া দুর্য্যোধন কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত, জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিলক্ষণ অপমান ও লাঞ্ছনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সভায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের সেই দুষ্কার্য্যে অনুমোদন করিলেন। তাহার পর যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা অসাধ্য হইল, তখন পাঞ্চালীকে দৈববলসম্পন্না মনে করিয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। অতঃপর ইঁহার মত লইয়া দুর্য্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া কপটক্রীড়ায় তাঁহাদিগকে কেবল রাজ্যচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য বনবাসী করিল। পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরকে কর্ত্তব্যবিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলায় ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন করাইলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষান্তে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের জন্য চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু পুত্রগণ তখন আর তাঁহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট সমরক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ শুনিতে লাগিলেন; অবশেষে ইঁহার পুত্রগণ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, ইনি যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইঁহার শত পুত্র ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, বৃকোদরের উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কৃষ্ণ ইঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, এক লৌহময় নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ভীম বলিয়া তাহা ইঁহার নিকট অর্পণ করিলে ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চদশ বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। তৎপরে সস্ত্রীক বনগমনপূর্ব্বক সার্দ্ধ দ্বিবৎসর তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে দাবদাহে ভস্মীভূত হন।

ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি চেদিরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন। শুক্তিমতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বনগমন করিলে, ইনি বনে যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে ইনি বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্যের বিনাশসাধন

করিয়া অবশেষে দ্রোণের হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদরাজপুত্র। দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় দ্রুপদ রাজা যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ইহাঁর উদ্ভব হয়। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে ইনি সভায় ভগিনীর রক্ষকস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী-সহ চলিয়া গেলে ইনি পাণ্ডবদিগের অনু-গমন করেন এবং তাঁহাদিগের কুটীরের নিশাকালীন ঘটনাবলী অবগত হইয়া পিতার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে, ইনি বনে যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডব-পক্ষের সেনানী হইয়া অনেক কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া, শোকে ম্রিয়-মাণ হন, এবং রথোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বন করেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া খড়্গা-ঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অশ্ব-থামার নৃশংস নৈশহত্যাকাণ্ড সময়ে ধৃষ্ট-দ্যুম্ন সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত ও অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন।

ধেনুক—অসুরবিশেষ। এই অসুর বৃন্দা-বনের নিকটে বাস করিত। কৃষ্ণের পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন করিলে, ধেনুক অত্যন্ত উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর বলরামের সহিত যুদ্ধে অসুর নিপতিত হয়।

ধৌম—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ইনি অসিত ঋষির পুত্র। উৎকোচক নামক তীর্থে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া ইনি বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন। পাণ্ডবগণ ইহাঁকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পৌরোহিত্যে বরণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া কি রাজত্বকালে কি বনবাসকালে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের হিত-চেষ্টা করিতেন, কেবল পাণ্ডবদিগের এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসকালে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পঞ্চালে দ্রুপদরাজের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন।

ধ্রুব—উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুনীতির গর্ভজাত। একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া বালক ধ্রুবও তথায় যাইতে সমুৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে ইহাঁর বিমাতা সুরুচি ইহাঁকে নানা-প্রকার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তুই আমার উদরে না জন্মিয়া তোর অপ্রাপ্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইবার জন্য কেন বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছিস্? তুই কি জানিস না যে, সুনীতির গর্ভে তোর জন্ম?" বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে এবং পিতার অনাদর-শল্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধ্রুব মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! ইহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। একমাত্র দীনশরণ হরি ভিন্ন দীন জনের আর উপায় নাই তিনি কৃপা করিলে সকল দুঃখ দূর হইতে পারে।" জননীর এই কথা শুনিয়া হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্ত ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃ-অঙ্ক পরিত্যাগ

করিয়া বনে বনে হরির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালকের মনে এখন হরি ভিন্ন অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা স্থান পাইল না। একমাত্র হরিই তাঁহার ধ্যান, হরিই তাঁহার জ্ঞান, হরিই তাঁহার লক্ষ্য, হরিই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল হরিই দেখিতে লাগিলেন। বনে বৃক্ষ, লতা, স্থাণু প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার সেই হরি?"

তন্ময়চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, এরূপ ভক্তের পক্ষে হরিলাভের পথ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অতঃপর দৈবক্রমে নারদের দর্শন পাইয়া ধ্রুব তাঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে যোগযুক্ত হইয়া মধুবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে নানাপ্রকারে ইহাঁর তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহার অন্তর বাহির হরিময়, যাঁহার নিজের পৃথক্ সত্বা নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে হরিতে ডুবিয়া আছেন, তাঁহার নিকট কৌশল খাটিবে কেন? দেবতাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে হরির দর্শন লাভে ও ইচ্ছানুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হরি যাঁহার উপর প্রসন্ন, জগতে তাঁহার প্রতি কে অপ্রসন্ন হইবে? রাজা উত্তানপাদও এক্ষণে আর ধ্রুবের প্রতি বিরূপ নহেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। ধ্রুব ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া ক্রমশঃ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দারপরিগ্রহ করিলে ইহাঁর শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে, তথায় যক্ষের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ধ্রুব যক্ষদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন। পরিশেষে পিতামহ মনুর উপদেশে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। যক্ষরাজ কুবের ইহাঁর প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ধ্রুব এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, "আমার মন নিয়ত যেন হরিপদে রত থাকে।" বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া ধ্রুব দেহান্তে স্বোপার্জ্জিত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

বায়ু পিত্ত কফ।

আয়ুর্ব্বেদের বায়ু পিত্ত কফ কি জিনিষ তাহা জানিবার জন্ত আজকাল কি চিকিৎসক-সমাজ, কি সাধারণ সকলেই নানারূপ আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ বায়ু-পিত্ত-কফের মৌলিকত্ব রক্ষা করিবার জন্ত অনুকূল তর্ক করিতে যাইয়া প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্মভেদ করিতে পারেন নাই। এরূপ বিকৃতভাবে শাস্ত্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা কোন কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ অযথার্থ তর্কদ্বারা দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক সম্ভাবনা। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত তত্ব সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও তাহা দোষের বিষয় নহে। কিন্তু অনধিকারচর্চ্চা কিংবা নিজে না বুঝিয়াও অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা অথবা বুঝিয়াছি বলিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা, অত্যন্ত দোষের বিষয়। যাহা হউক, আমি সে সকল মত উদ্ধৃত করিয়া বিবাদের সূত্রপাত করিব না। আমি এই বায়ু পিত্ত কফ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত তত্ব নির্দ্ধারণ পক্ষে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, সুধীগণ তাহার বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানশাস্ত্র। ইহা কোনও কাল্পনিক ভিত্তির উপর অবস্থিতি করিতে পারে না। বায়ু পিত্ত কফ কাল্পনিক জিনিষ নহে। ইহাকে কাল্পনিক বলিলে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এ পর্য্যন্ত বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত রহস্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া কেহই দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিকট আয়ুর্ব্বেদের অধিকতর হতাদর। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এই সকল অত্যাবশ্যক জটিল বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা না হইলে এই শাস্ত্রের কখনও উন্নতি হইতে পারে না।

মানব।

আয়ুর্ব্বেদের বায়ু পিত্ত কফ কি জিনিষ, তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ মানব কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক। তদনন্তর তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে তন্তুতে তন্তুতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে যে, বায়ু পিত্ত কফ মানবের কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং আমরা প্রথমে মানবের উৎপত্তি এবং নাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া পরে বায়ু পিত্ত কফ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মানব সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন ;—

"পঞ্চ মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ ইত্যচ্যাত। তস্মিন্ ক্রিয়া" অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত এবং জীবাত্মার সংযোগে এই মানবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। উপরোক্ত পঞ্চমহাভূত শুক্র-শোণিত ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত সুশ্রুত বলিতেছেন ;—

"স্ত্রী-পুংসয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজোঽনিল সন্নিপাতাচ্ছুক্রং চ্যুতং যোনিমভিপ্রতিপদ্যতে সংসৃজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নি সোম সংযোগাৎ সংসৃজ্যমানোগর্ভঃ গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞো

ভূতাত্মনা সহাব্যক্তং মনোজাত্মা গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যাবতিষ্ঠতে ॥"

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ হইলে বায়ু শরীর হইতে তেজঃ উদীরিত করে। অনন্তর তেজঃ ও বায়ুর সাহায্যে শুক্র নির্গত হইয়া যোনি প্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তবসহ মিলিত হয়। অনন্তর অগ্নি ও সোমযোগে গর্ভের সৃষ্টি হয় এবং উহা গর্ভাশয়ে গমন করে। যখন সেই গর্ভের সৃষ্টি হয়, সেই মুহূর্ত্তেই জীবাত্মা, মনঃ, আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের সহিত অর্থাৎ জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া মনোবেগে সেই গর্ভে প্রবেশ করে। সুতরাং পঞ্চমহাভূত মানব এবং শরীরী অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহযুক্ত আত্মা ইহাদের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকেই সজীব মানব বলে এবং এই সজীব মানবই চিকিৎসার বিষয়ীভূত। পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন আমাদের এই দেহকে স্থূল দেহ বলে। জীবাত্মা যে দেহকে অবলম্বন করে, তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চতন্মাত্র আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বরজস্তমোময় মনের সংযোগে উৎপন্ন হয়। জীবাত্মার এইরূপ শরীর সম্বন্ধে অনাদি কর্ম্মজন্য এবং রজস্তমোময় মনঃ সম্বন্ধ হইতে হইতেছে। আত্মা স্বয়ং চৈতন্যময়, নির্ব্বিকার এবং নিষ্ক্রিয়, কিন্তু কর্ম্মবশে এই সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহে প্রবেশ করতঃ সুখ দুঃখ ভোগ করেন। উপরোক্ত পঞ্চমহাভূতই আয়ুর্ব্বেদের বিষয় এবং এই পঞ্চমহাভূতের উপরই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পঞ্চমহাভূতের অতিরিক্ত কোন্ কথা বলিবে না। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন ;—

"ভূতেভ্যোহি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে" অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে ভূত ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই। সুতরাং এই চিকিৎসাশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু বলা হইবে, সমস্তই ভৌতিক বুঝিতে হইবে।

গর্ভ সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম এই যে বিশুদ্ধ শুক্র, বিশুদ্ধ শোণিত, নির্দ্দোষ যোনি এবং গর্ভধারণোপযোগী গর্ভাশয় হইলে এবং ঋতুকালে সংযোগ হইলে তবেই গর্ভ হয়, এবং সেই সংযোগ হইবামাত্রই তাহাতে জীবাত্মা প্রবেশ করে এবং তখনই মানবীয় সমস্ত ভাবের বীজ উহাতে উৎপন্ন হয়। সেরূপ উৎপত্তির কারণ একমাত্র মানবীয় গর্ভাশয়। এই জন্যই মানব হইতে মানব, পশু হইতে পশুর উৎপত্তি হয়। পঞ্চমহাভূত অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন মানবদেহও জড়। কিন্তু চৈতন্যসহযোগে এই অচেতন দেহও সচেতন হয়। তখন ইহাকে পুরুষ বলে। শুক্রে কিংবা শোণিতে জীব থাকে না, ইহাই আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা মহর্ষিদিগের মত। মহর্ষিগণ বলেন, যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে এবং যাহার ত্বক উৎপন্ন হয়, তাহাই সজীব, শুক্র কিংবা শোণিতের হ্রাস বৃদ্ধি নাই এবং ত্বকেরও উৎপত্তি হয় না, সুতরাং শুক্র কিংবা শোণিত সজীব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে শুক্রে যাহা বীজবৎ পদার্থ দেখা যায়, তাহা বীজ নহে, উহা শুক্র-কীট। শুক্র কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুক্রের মধ্যে সাঁতার কাটে, দৌড়াদৌড়ি করে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উহাই যদি গর্ভাশয়ে আর্ত্তবসহ মিলিত হয়, তবে মানবের আকার ধারণ করে। যেমন অঙ্কুরিত ধান্য ক্ষেত্রে পতিত হইলে তাহা ধান গাছরূপে পরিণত হয়। কোন্ মত সাধু তাহা বলিতে পারি না। তবে শেষোক্ত মতে উৎপত্তি-নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কারণ সন্তরণকারী কীট যদি মানবের প্রথম উৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে সে পুনরায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার উৎপন্ন হয়, একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের সেরূপ নিয়ম দেখা যায়

না। অঙ্কুর গর্ভাশয় হইতে একবার নির্গত হইলে তাহা আর কোন গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে না। তবে যাহা গর্ভাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাকে গর্ভাশয় না বলিলে আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না।

শুক্রকীট দেখিতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয় না। উহা তেমন ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু আমরা কখনও শুক্রকীটের সন্তরণ দেখি নাই, অথবা উহার ত্বকও দেখি নাই। শুক্রকীট অপেক্ষা ক্ষুদ্র কীট দেখিয়াছি, তাহাদের গতি এবং ত্বক সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু শুক্রকীটে গতি কিংবা ত্বক দেখি নাই। কিন্তু মহর্ষিগণের মতে উহাতে কীটরূপী যে পদার্থ দেখা যায়, উহাই জীবসঞ্চারোপযোগী পদার্থ। যে শুক্রে ঐ কীটরূপী বীজ নাই, কিংবা নষ্ট হইয়াছে, সে শুক্র নির্দ্দোষ আর্ত্তব, যোনি, গর্ভাশয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা গর্ভ উৎপন্ন হয় না। গর্ভ বৃদ্ধি পক্ষে জীব যেমন একটী কারণ, মাতার আহারজনিত রসও তেমনি একটী কারণ। রসের স্নেহ দ্বারাই প্রথম গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শুক্র যেমন পাঞ্চভৌতিক, তেমন সমস্ত ধাতুর সার বলিয়া উহাতে সপ্ত ধাতুরই বিদ্যমানতা রহিয়াছে। ক্রমে মাতার রসাদি ধাতু হইতে গর্ভস্থ শিশুর রসাদি ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমান দ্রব্য দ্বারা সমান দ্রব্যের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন জল জলের দ্বারা, অগ্নি অগ্নিদ্বারা, রসাদি সপ্ত ধাতু রসাদি সপ্ত ধাতু দ্বারা, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—মাংসমাপ্যাযতে মাংসেন ভূয়ো ভূয়ো স্তেভাঃ শরীর ধাতুত্বঃ। তথা লোহিতং "লোহিতেন, মেদো মেদসা, বসা বসয়া, অস্থি তরুণস্থা, মজ্জা মজ্জয়া, শুক্রং শুক্রেণ, গর্ভস্থাম গর্ভেন।" ইতি।

এই গর্ভই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানবরূপে পরিণত হয়। এই মানব দেহের সহিত যতক্ষণ চৈতন্য সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই মানবদেহ সজীব থাকে। জীবাত্মার বিভাগ হইলেই জড়দেহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পতিত হয়। ইহারই অপর নাম মৃত্যু। সেই দেহীর অলৌকিক সংযোগ নষ্ট হয় বলিয়াই শারীর যন্ত্রের কোনও ব্যতিক্রম না হইলেও মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বাহ্য জগৎ যেমন পঞ্চ মহাভূতের বিকার এবং জল, বায়ু ও অগ্নি দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, আমাদের এই স্থূলদেহও সেই প্রকার পঞ্চ মহাভূতাত্মক এবং জল, বায়ু ও অগ্নি দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। অগ্নি দ্বারা শোষণ, পরিপাক প্রভৃতি, জলদ্বারা স্নিগ্ধতা, সন্ধিবন্ধ প্রভৃতি এবং বায়ু দ্বারা প্রেরণ, ধারণ, আকুঞ্চণ, প্রসারণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে। পার্থিব অংশ দ্বারা শরীরের অবয়ব বৃদ্ধি হইতেছে। জীবাত্মা এই সকল দৈহিক সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলেও বিনা হেতু এবং বিনা উপাদানে কিছু করিতে পারেন না, বিনা উপাদানে কেবল ইচ্ছা দ্বারা জাগতিক সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এরূপ মনে করা যায় না। এই জন্যই কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার একটী সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করিতে হয়, এবং স্থূলদেহ ভিন্ন পার্থিব সুখ দুঃখের ভোগ হয় না বলিয়া জীবাত্মা এই স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পার্থিব সুখ দুঃখ ভোগ করেন। আমাদের এই স্থূলদেহে যে গতি, শৈত্য এবং উষ্ণক্রিয়া দেখা যায়, তৎসমস্তই পঞ্চ মহাভূতের ক্রিয়া। পঞ্চমহাভূত না থাকিয়া কেবল জীবাত্মা থাকিলে এই সকল ক্রিয়া হইতে পারিত না; উপরোক্ত গতি, শৈত্য এবং উষ্ণক্রিয়া ভিন্ন আমাদের এই স্থূলদেহে স্নিগ্ধত্ব, রুক্ষত্ব, শীতলত্ব, কঠিনত্ব, মার্দ্দব, বিশদতা, খরত্ব, চলত্ব এবং মধুর, অম্ল, লবণ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা সমস্তই পঞ্চভূতের সংযোগ বিভাগ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এই

স্থূলদেহের রস, রক্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, মস্তিষ্ক কিংবা যন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তাহাও সেই পঞ্চমহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, এই দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়াই পঞ্চ মহাভূতের—কেবল চৈতন্ত পঞ্চমহাভূতের নয়। এই জন্যই মহর্ষিগণ জ্ঞানবলে এই দেহকে পঞ্চভূতের সংযোগ এবং বিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেন না।

এই জন্যই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

"ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে।"

অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে পঞ্চভূতের চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। রস, রক্ত, শারীরিক যন্ত্র, রোগ এবং তাহার ঔষধ প্রভৃতি সমস্তই যখন পঞ্চমহাভূত হইতে হইতেছে, তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতের চিন্তা ভিন্ন আর কিসের চিন্তা থাকিতে পারে? তবে দেশ-কাল-পাত্র এবং সংযোগ-ভেদে এই পঞ্চমহাভূত হইতেই অনন্ত প্রকার দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম হইতেছে। সেই জন্যই রস রক্ত স্নায়ু ধমনী এবং শারীরিক যন্ত্র প্রভৃতি বহুপ্রকার এবং বিবিধ ক্রিয়াবিশিষ্ট হইতেছে। কিন্তু সমস্তেরই মূলে সেই পঞ্চমহাভূত ভিন্ন আর কিছুই নাই। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ জগতের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, জাগতিক উৎপদ্যমান যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য সমস্তই পঞ্চমহাভূতের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের এই নশ্বর স্থূল দেহও যে পঞ্চমহাভূতের বিকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন, চিকিৎসা-বিষয়ে পঞ্চমহাভূতের চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শুধু তর্কশাস্ত্র নয়, ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্র। মহর্ষিগণ কেবল তর্কের অনুরোধেই যে আমাদের দেহকে পঞ্চমহাভূতের বিকার বলিয়াছেন, তাহা নহে। পঞ্চমহাভূতের গুণক্রিয়া ভিন্ন যে আমাদের দেহে অন্য কোন গুণক্রিয়া নাই, তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। রস রক্ত প্রভৃতি ধাতু এবং মল, যন্ত্র এবং মধুর রস প্রভৃতি, আমাদের শরীরে পঞ্চমহাভূত হইতে কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই সকল জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতেও ক্রটী করেন নাই। এই যে আমাদের দেহের অনন্ত প্রকার রোগকে একসূত্রে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরম সীমা নহে? মহর্ষিগণ শিরা ধমনী অন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য স্বীকার করিতেন না, তাহা মনে করা উচিত নয়। কোন্ যন্ত্রের কোথায় কি কার্য্য হইতেছে, তাহা কি তাঁহারা বলেন নাই? এবং এই দেহের উৎপত্তিমূলে যে কত প্রকার বিকৃতি-বিষম-সমবায়-সম্বন্ধ অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ রহিয়াছে এবং সেই সকল সংযুক্ত দ্রব্য যে সংযোগী দ্রব্য হইতে পৃথক্ গুণক্রিয়াবিশিষ্ট হইতেছে, তাহা কি তাঁহারা দেখিতে পান নাই? এই শরীরের আপাদমস্তক অতি সূক্ষ্মভাবে যে কিছু পদার্থ আছে এবং তাহা দ্বারা শরীরের অনন্ত প্রকার রোগের যে সকল লক্ষণ হইতে পারে, তাহা সমস্তই কি তাঁহারা দেখাইয়া যান নাই? তাহা না দেখাইতে পারিলে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা থাকে এবং নূতন রোগের চিকিৎসাই হইতে পারে না, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। মহর্ষিগণ আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সে সকল অভাব রাখেন নাই। এই সকল কারণেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আজিও আমাদের দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। রস, রক্ত, শিরা, ধমনী, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও এই সকলের মূলে আরও কিছু দেখিতে পাইতেন।

তাহারই নাম পঞ্চমহাভূত। এই পঞ্চমহাভূতের যে সকল ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে

শৈত্য, উষ্ণ এবং গতি, এই তিনটী ক্রিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই তিনটী ক্রিয়া জল, অগ্নি এবং বায়ু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। ইহা আর প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, কারণ শরীরের না হইলেও বাহিরের জল, বায়ুএবং অগ্নি দ্বারাই ইহা নিয়ত প্রমাণিত আছে। এই ভূতত্রয়কেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষিগণ বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বায়ু।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বায়ু, অগ্নি, জল-কেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বায়ু পিত্ত কফ এই সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। এস্থলে সংশয় হইতে পারে যে, বায়ু অগ্নি এবং জলই যদি বায়ু পিত্ত কফ হয়, তবে বায়ু অগ্নি এবং জল না বলিয়া বায়ু পিত্ত কফ সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; তাহা যথাস্থানে প্রমাণ করা হইবে। বায়ু অগ্নি জলই যে বায়ু পিত্ত, কফ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মহর্ষি স্থশ্রুত বলেন;—

"বা গতি গন্ধ নয়ো রিতিধাতুঃ কৃদ্বিহিতে প্রত্যয়েন বাত ইতি রূপং ভবতি।"

অর্থাৎ গতিক্রিয়াবিশিষ্টের নামই বায়ু। বায়ু গতিক্রিয়া দ্বারা মানবদেহের দোষ ধাতু এবং অগ্নির সমতা রক্ষা করে। এই সমতা রক্ষা হইলেই দেহ রোগশূন্য হইয়া দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। কারণ বায়ুর শক্তিতেই শারীর যন্ত্র এবং শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি শক্তিমান্ থাকিয়া যথানিয়মে রস রক্তাদির সঞ্চালন, উৎপত্তি এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। বায়ুর গতিক্রিয়া ভিন্ন শরীরে আরও কতকগুলি গুণ এবং কার্য্য আছে। তন্মধ্যে অবিকৃত বায়ুর লক্ষণ দেখিলেই তাহার গুণ জানা যাইবে।

"রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোহথ বিশদঃ খরঃ।"

আয়ুর্ব্বেদমতে বায়ু রুক্ষ গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ বায়ু স্নিগ্ধ নয়। শীতল, লঘু, অর্থাৎ কোনরূপ গুরুত্ব পরিমাণবিশিষ্ট নয়। সূক্ষ্ম অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বাবয়বে প্রবেশ করিতে সক্ষম। চল অর্থাৎ গতিক্রিয়াবিশিষ্ট। বিশদ অর্থাৎ অপিচ্ছিল। খর অর্থাৎ শ্লক্ষ্ণ বা কোমল নয়।

এ স্থলে রুক্ষতা প্রভৃতি অন্যান্য গুণ থাকিলেও গতিক্রিয়াই প্রধান বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ বায়ুর গতিশক্তি দ্বারাই অন্যান্য শারীর যন্ত্র সকল এবং শিরা স্নায়ু ধমনী সকল শক্তিমান্ থাকিয়া যথানিয়মে রস রক্তাদির সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষিগণ যে বায়ুর কথা বলিয়াছেন, তাহা লঘু এবং সূক্ষ্ম। বাহ্য চরিষ্ণু বিকৃত বায়ুর ন্যায় স্থূল নহে। বাহ্য জলভূত বায়ু সূক্ষ্ম নহে, উহা স্থূল, স্নিগ্ধ, এবং গুরুত্বপরিমাণবিশিষ্ট। পঞ্চমহাভূতান্তর্গত মূল বায়ু ও এই জল ভূতবাহ্যস্থূল বায়ু নহে। বাহ্য বায়ু স্থূল এবং গুরুত্বপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়াই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। আমরা যে বায়ুর কথা বলিতেছি, লঘু এবং সূক্ষ্ম বলিয়াই দেহের সর্ব্ববিধ অবয়বে মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বাহ্য বায়ু সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যে বায়ু যে পরিমাণ জল আকর্ষণ করে, সেই বায়ু সেই পরিমাণ গুরুত্বপরিমাণবিশিষ্ট হয়। নিম্ন বায়ু অপেক্ষা ঊর্দ্ধবায়ু অধিক লঘু। মেঘের উপর যে বায়ু, তাহা আরও লঘু, আবার যে বায়ুতে কিছু মাত্রও জল নাই, তাহার গুরুত্ব-পরিমাণও নাই। মহর্ষিগণ পঞ্চভূতান্তর্গত যে বায়ুর কথা বলিয়াছেন, তাহা জলভূত বাহ্য বিকৃত বায়ু নহে। সূক্ষ্ম, রুক্ষ, এবং লঘুগুণবিশিষ্ট বায়ুর কথাই বলিয়াছেন। বায়ুর গুরুত্ব

পরিমাণ যে শুদ্ধ জলসংযোগেই হয়, তাহা অহরহ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালের বায়ু অধিক ভারি। মহর্ষিগণ যে বায়ুর কথা বলিয়াছেন, তাহা এ পারের বায়ু নয়, পরপারের বায়ু। তাঁহারা শুদ্ধ উপর উপর দেখিতেন না। তাঁহারা বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর দৃষ্টিশক্তির বিশ্রাম দিতেন না। তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ভিতরের সংবাদ লইতেন। তাঁহারা এই বেগবান্ বায়ুর আবিষ্কারের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী এবং জ্ঞানহীন, আমরা সেই মহাত্মা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিদিগের উপদেশ বুঝিতে না পারিয়া এবং ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিতেছি। তাই আজ আমাদের বড় দুর্দ্দশা। আয়ুর্ব্বেদের বায়ু সেই পরপারের বাহ্য ও মহাভূতান্তর্গত সূক্ষ্ম বায়ু। সেই বায়ুই সর্ব্বশরীর অবস্থিতি করিয়া শব্দ, কিরণ এবং স্রোতের ন্যায় রস রক্তাদি দ্বারা শরীরকে রক্ষা করিতেছে। একটী শব্দ করিবামাত্র সেই শব্দটী যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সর্ব্বশরীরে রস রক্তাদি বহন করিতেছে। কোথাও বা স্রোতের ন্যায় বহন করাইতেছে। দেখিতেছেন, তাঁহারা এ সকল ব্যাপার কোন্ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন? ইহা কি শুদ্ধ মৃতব্যবচ্ছেদের জ্ঞান? শব্দ যেভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, রসরক্তাদি সেই ভাবে শরীরে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা কি জ্ঞানের শেষ সীমার কথা নয়? বৈজ্ঞানিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নয়? আয়ুর্ব্বেদ হাতুড়ে বৈদ্যের লেখা নয়। ভারতবর্ষ প্রাচীন শিক্ষিত সভ্য দেশ ছিল। এখানে পূর্ব্বে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজকাল কি সেরূপ আছে? তাঁহাদের সমকালে—সেই সকল জ্ঞানিগণের সমকালে আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল? আয়ুর্ব্বেদ উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে—ইহার গভীরতা বহুদূরে। এই বায়ুই উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্যে সর্ব্বপ্রধান হেতু। বায়ু অচিন্ত্যশক্তি এবং অব্যক্ত। অব্যক্ত অবস্থায় বায়ু শরীরাভ্যন্তরে কি ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। পারি না বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কম। সে কালের জ্ঞানের তুলনায় আমরা সহস্র বৎসর পশ্চাতে সরিয়া পড়িতেছি। এই দেখুন, বিদ্যুতের ক্রিয়া আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যুতের অসাধারণ শক্তি কে অবগত ছিল? কে বলিতে পারিত, বিদ্যুৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে? কে বলিতে পারিত, অচিন্ত্যশক্তি বিদ্যুৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হয়? কে বিশ্বাস করিত যে, বিদ্যুৎ আত্মশক্তিদ্বারা নিমেষ মধ্যে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারে? মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদে বায়ুর শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিদ্যুতের ন্যায়। মহর্ষিগণ এই বেগবান্ আশুকারী বায়ুর শক্তি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভি শব্দিতঃ।"

এই বায়ু অচিন্ত্যশক্তি এবং অব্যক্ত হইলেও ব্যক্তকর্ম্মা। অর্থাৎ স্বরূপ ও প্রকাশ না পাইলেও ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ পায়। এই যে আমরা মহাবলশালী বীর পুরুষ বলিয়া গর্ব্বভরে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু আজ যদি আমাদের এই বায়ু বিকৃত হয়, তবে আমাদের সে শক্তি কোথায় থাকে? যেমন বীরপুরুষই হউক না কেন, আক্ষেপক রোগে আক্ষিপ্ত অঙ্গ স্থির করিতে পারেন কি? হস্তপদাদি কোন অঙ্গ অবসন্ন হইলে তাহা উত্তোলন করিবার শক্তি থাকে কি? শ্বাস-রোগীর শ্বাস যখন প্রবল ঝড়ের ন্যায় বহন করে, তখন তিনি চক্ষু উল্টাইয়া বসেন কেন? ধনুষ্টঙ্কার-রোগে

মানবকে ধনুর মত বক্র করে কে? ইহা কি শুধু স্নায়ু ধমনীর কাজ? কখনই নয়। ইহাই মহর্ষিগণের অচিন্ত্যশক্তি অব্যক্ত এবং ব্যক্ত-কর্ম্মা বায়ু। মহর্ষিগণ এই সুবিশাল বিজ্ঞানময় জগৎকে ঘটের কার্য্য পটের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না। দুর্ব্বলের ঘাড়ে প্রবল বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। এই অব্যক্ত এবং ব্যক্তকর্ম্মা পদার্থই মহর্ষিগণের বায়ু। এই বায়ুই অব্যক্ত ভাবে সর্ব্ব শরীরে ব্যাপৃত থাকিয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈহিক সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। আবার প্রকোপ হেতু প্রাপ্ত হইয়া নিমেষ মধ্যে শরীরে নানাবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে। বিদ্যুতের ন্যায় শক্তিশালী এবং বিদ্যুতের ন্যায় আশুকারী পদার্থকেই মহর্ষিগণ বায়ু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্নায়ু, ধমনী, এবং শারীরযন্ত্রসকলের কোন ক্রিয়া নাই, বায়ু পিত্ত কফই সকল কার্য্য করে এ কথা মহর্ষিগণ বলেন নাই এবং রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু শিরা স্নায়ু, ধমনী, ফুস্‌ফুস্, হৃদয় প্রভৃতি সকলেরই কার্য্য বলিয়াছেন। শিরা ধমনী প্রভৃতির নলের কার্য্য, যন্ত্র সকলের ইঞ্জিনের কার্য্য এবং বায়ু, পিত্ত, কফকে ষ্টিমের কার্য্য স্বরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শক্তিমান্ বায়ু আত্মপ্রকাশক, হেতু লাভ করিয়া এই সকল যন্ত্রের উপর ষ্টিমের কার্য্য করিতেছে। শারীর যন্ত্র সকল যদি বায়ুর শক্তি লাভ না করিত, তবে জড়বৎ পতিত থাকিত। মৃত ব্যক্তির যান্ত্রিক-ক্রিয়া হয় না। কারণ চৈতন্য-সংযোগ নষ্ট হওয়ায় বায়ুর আর তাদৃশ ক্রিয়া থাকে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ইহার কারণ। স্নায়ুযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বতন্ত্র ক্রিয়া হইতে পারে না। পার্থিব পদার্থের স্বতন্ত্র ক্রিয়া স্বীকার করা অনুভববিরুদ্ধ। তাহাদের ক্রিয়া অন্যকে অপেক্ষা করিয়া হয়। অন্যকে অপেক্ষা করিয়াই শিরা স্নায়ু ধমনী প্রভৃতি ক্রিয়াশীল, একথা বলিলে আমাদের সহিত কোন বিরোধ নাই। আমরাও যে বায়ু পিত্ত কফ ভিন্ন দৈহিক যন্ত্র কিংবা রস রক্তাদির ক্রিয়া স্বীকার করি না, তাহা নহে। তবে সকলেরই মূলে আমরা সেই বায়ু পিত্ত কফ দেখিতে পাই, এবং এই অদ্ভুত আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসা-জগতে মহর্ষিগণ সকলেরই শীর্ষস্থানীয়। প্রত্যেক শারীর-যন্ত্রের রস রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি স্বতন্ত্র ক্রিয়া স্বীকার করিলে, একই যন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ অনন্ত প্রকার ক্রিয়ার জন্য অনন্ত প্রকার ঔষধের কল্পনা করিতে হয়, এবং রোগীর শরীরে কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা স্থির করাও অত্যন্ত কঠিন হয়। চিকিৎসক রোগী প্রাপ্ত হইলে অন্ধকার দেখেন এবং আনুমানিক প্রয়োগে অনেক সময় হিত করিতে গিয়া বিপরীত করাও অসম্ভব নয়, এবং যে রোগ পূর্ব্বে দেখেন নাই, কিংবা জানেন না, সে সকল রোগের চিকিৎসায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় সেরূপ অসুবিধা নাই। কারণ সকল রোগেই তাঁহারা বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দেখিতে পান। সুতরাং নূতন রোগ হইলেও অর্থাৎ যে রোগ কেহ কোন কালেও দেখে নাই, কিংবা শুনে নাই, সে সকল রোগেও অক্লেশে চিকিৎসা করিয়া আরাম করিতে পারে। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন ;—

"বিকারনামাকুশলোনজিহ্রীয়াৎ কদাচন। নহি সর্ব্ব বিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবাস্থিতিঃ।"

অর্থাৎ হে চিকিৎসক! তুমি রোগের নাম বলিতে পারিতেছ না বলিয়া লজ্জিত হইও না। সকল রোগ নামদ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, অসংখ্য মানবদেহে অসংখ্য প্রকৃতিতে অসংখ্য সংযোগে অসংখ্য প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। নাম দ্বারা সে সকল বলা অসম্ভব। কিন্তু সকল প্রকার রোগেই বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দেখিয়া

চিকিৎসা করিলেই রোগের উপশম হইতে পারে। এই ধ্রুবসত্য কৌশলটী আয়ুর্ব্বেদে আছে বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম না হইয়াও সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইতেছেন। রোগ নির্ণয় না হইলেও ঔষধে উপকার হইতেছে দেখিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ চিকিৎসক অম্লান বদনে বলেন, আয়ুর্ব্বেদের ঔষধগুলি ভাল, কিন্তু চিকিৎসক ভাল নয়। এই বায়ু পিত্ত কফরূপ চরম সিদ্ধান্ত আছে বলিয়াই চিকিৎসা-জগতে আজ পর্য্যন্তও আয়ুর্ব্বেদের নাম সসম্মানে গৃহীত হইতেছে এবং এই জন্যই আজ বৈদেশিক চিকিৎসার ভীষণ সঙ্ঘর্ষণেও আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদে এই বাত, পিত্ত, কফের চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসা। এতদ্ভিন্ন প্রতি রোগের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা আছে; চিকিৎসা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই এস্থলে সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিব না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং অব্যক্ত কিন্তু ব্যক্তকর্ম্মা সূক্ষ্ম, লঘু, আশুকারী এবং মহাশক্তিশালী বিদ্যুতের ন্যায় পদার্থবিশেষ, যাহা মানবমাত্রের শরীরে এবং সমগ্র জগতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই আয়ুর্ব্বেদের বায়ু।

শ্রীহরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ।

১৩১৩ সালের বঙ্গদেশীয়

সাহিত্য-সমালোচনা। *

কোন প্রদেশের পূর্ণ এক বৎসরের সাহিত্য-সমালোচনা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিস্তর সময়সাপেক্ষ ও বহু শ্রমসাধ্য। অথচ এ প্রবন্ধ সাহিত্য-সভায় এক অধিবেশনে পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। সুতরাং সমালোচ্য বর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশে যে বহুসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সবিস্তার সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সকলগুলির নামোল্লেখ করাও একপ্রকার অসাধ্য। অতএব আমরা সর্ব্বপ্রধান কয়েকখানি পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইব। ভরসা করি, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকার ও লেখকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উপন্যাস।

আমরা প্রথমে উপন্যাসের কথা বলিব। সমালোচ্য বৎসরে ১৫০ খানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গের ইদানীন্তন লেখক-সিংহ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত **নৌকা-ডুবি** নামক উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে হয়। সংসারের নিত্য-ঘটনা অবলম্বনে ইহা লিখিত। ইহার উপাখ্যানাংশ অতি সংক্ষেপতঃ এইরূপ;—রমেশচন্দ্র নামক একটী হিন্দু যুবক, হেমনলিনী নাম্নী একটী ব্রাহ্মকুমারীকে ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার পিতা সুশীলা নাম্নী একটী হিন্দু বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ

* সাহিত্য-সভার ১ম বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিলেন। বিবাহের পর রমেশ নবোঢ়া ভার্য্যাকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিলেন। ইতোমধ্যে পথে প্রবল ঝড় উত্থিত হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্ন হইল, এক রমেশ ব্যতীত নৌকাস্থিত আর সকলেই ডুবিয়া গেল। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরের উপর উঠিলেন। ঝড় থামিলে পর তিনি দেখিলেন, ঐ চরের অপর প্রান্তে একটী বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। বালিকার অঙ্গস্থিত বিবাহকালোচিত পট্টবস্ত্র ও অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, বালিকাটী নবোঢ়া। তিনি সুশীলাকে নিজের অনিচ্ছায়, কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি বিবাহ-রাত্রে সুশীলার মুখ ভাল করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে চরের উপর ঐ নবোঢ়া বালিকাকে দেখিয়া রমেশ স্বতঃই তাহাকে আপনার বিবাহিতা পত্নী মনে করিলেন এবং তাহাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে রমেশ স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই কয়েক মাস নানা কারণে রমেশের সহিত তাঁহার কল্পিতা বালিকা-পত্নীর সহবাস ঘটিয়া উঠে নাই। রমেশ প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন বটে, কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে বালিকার মনে দারুণ ক্ষোভ ও ক্লেশ জন্মে, এই আশঙ্কায় রমেশ এ কথা বালিকাকে জানিতে দিলেন না।

এ দিকে রমেশ গোপনে গোপনে বালিকার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি নানা কৌশলে বালিকার নিকট হইতে তাহার বিস্তারিত পরিচয় জানিবারও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটী ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং তাহার নাম কমলা। রমেশ আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কমলাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে একটী বালিকা-বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া দিলেন; তথায় কমলা রমেশের পত্নী-এই পরিচয়ই প্রকাশ থাকিল। অতঃপর রমেশ পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মকুমারী হেমনলিনীর অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবারও উপক্রম হইয়া উঠিল; কিন্তু দৈব পুনরপি তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। অক্ষয় নামক আর একটি যুবকও হেমনলিনীর পাণিপীড়নাকাঙ্ক্ষী ছিল। সেই অক্ষয় কমলার ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কমলা যে রমেশের বিবাহিতা পত্নী, তাহাও প্রচার করিয়া দিল। তখন রমেশ লজ্জায় ও ঘৃণায় তাড়াতাড়ি কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, প্রকৃত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া খুলিয়া বলিবারও অবসর পাইলেন না। তিনি কমলাকে লইয়া ষ্টীমারযোগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রমেশ আপনার চরিত্র ও কমলার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে বালিকার মনে সময়ে সময়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সরলা বালিকা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অতঃপর রমেশ কমলাকে লইয়া গাজিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল।" দৈবগত্যা একদিন কমলা হঠাৎ আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হেমনলিনীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা জানাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পত্রখানি ডাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ পত্র কোনক্রমে কমলার হস্তগত হইলে পত্রপাঠে কমলার চক্ষু ফুটিল। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইল। অতঃপর কমলা রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন

করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইল। তথায় নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর কমলা আপনার প্রকৃত স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিল। তাহার স্বামী তাহাকে নিষ্কলঙ্কচরিত্রা জানিয়া পত্নী-ভাবে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত লেখকের অদ্ভুত উদ্ভাবনা-চাতুর্য্যের ও লিপি-কৌশলের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রণে রবিবাবু অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ আছে। সকল গুলিই অতি মনোহর হইয়াছে। বিশেষতঃ রমেশের চরিত্র অতীব পরিপাটীরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। রমেশ নিজেই আপনার পায়ে বিষম ফাঁদ জড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে প্রথম জানিতে পারেন যে, কমলা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী নয়, সেই সময়েই যদি তিনি প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে সকল গোল চুকিয়া যাইত, তাঁহাকে উত্তরকালে নানারূপে বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এ সমস্তই সত্য বটে, কিন্তু জগতের নিকট চরিত্রের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার রমেশকে তাহা করিতে দেন নাই। পাছে বালিকার কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় রমেশ বাহিরে কমলাকে আপনার পত্নী বলিয়াই পরিচয় দিতে থাকিলেন, অথচ যাহাতে বালিকার ধর্ম্ম রক্ষা পায়, সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। ফলতঃ গ্রন্থকার যেভাবে রমেশকে স্বকৃত বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে পবিত্র চরিত্ররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে রবি বাবুর উচ্চচরিত্রাদরের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ এই শ্রেণীর উপন্যাসদ্বারা জগতের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা নাই। গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল, কারণ বঙ্গদেশে রবিবাবুর লেখা পড়েন নাই এরূপ একজন লোকও আছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমালোচ্য গ্রন্থে রবিবাবুর যশঃপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

দেশে যে নূতন জাতীয় জীবনের উন্মেষ ও স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ আশুফল সাহিত্য-ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই আন্দোলনকে সজীব রাখিবার ও সফল করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকখানি উপন্যাস ও নাটক আছে। উপন্যাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এল্, এম্, এস্ প্রণীত

স্বদেশ ও সরমা বা পূর্ণাহুতি নামক গ্রন্থ প্রথম উল্লেখযোগ্য। এতদ্দেশীয় যুবকগণ অধুনা যেভাবে স্কুলকলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমাদের উপযোগী নহে, এবং কি প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে এদেশের উপকার দর্শিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার নায়ক ভবনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২০টী ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে আহারবাসস্থানাদি প্রদান করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ যথোচিতভাবে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া উত্তরকালে প্রকৃত কর্ম্মবীর হইয়া দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে। ভবনাথ বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের নিকট নিজের শিক্ষাপ্রণালীর যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—বালকগণকে দশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুস্তক পড়িতে না দিয়া কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়া তাহাদিগের কোমল মনে নানাপ্রকার সদ্ভাবের অঙ্কুর জন্মাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়াইতে

হইবে। অতঃপর ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শন-শাস্ত্র এবং ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মাণী, জাপানী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। তৎপরে পাঁচ বৎসরকাল তাহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করিবে। এইরূপে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইলে তাহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, মঠ, চিত্রশালিকা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকে আবার কতক-গুলি করিয়া ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে এবং অন্যান্যপ্রকারে দেশের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতঃপর তাহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া সংসারীও হইতে পারে, অথবা চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। ইহাই গ্রন্থকারের নবোদ্ভাবিত শিক্ষাপ্রণালীর সার মর্ম্ম। ভবনাথের সাধ্বী পত্নী সরমা এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য দিননাথ ভবনাথের উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়। এই দুই জনের সহ-কারিতাতেই ভবনাথ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন। গ্রন্থখানি প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্চ ভাবে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার উপসংহারে মহাপ্রাণ ইংরেজজাতির নিকট সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা করিয়া-ছেন যে, তাঁহারা যেন এই অধঃপতিত অধীন জাতিকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া ও জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়া আপনাদের মহনীয় ঔদার্য্যগুণের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন। পুস্তকখানি যে সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ফুলওয়ালী -একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহাতে এতদ্দেশে ইংরেজ-শাসনের প্রথমাবস্থার একটি চিত্র প্রকটিত। ওয়ারেন হেষ্টিংয়ের সময়ে বাহির বন্দ পরগণার প্রজা-দিগকে বলপূর্ব্বক দাদন দিয়া ইংরেজ-বণিকেরা তাহাদের উপর কি প্রকার অসহ্য অত্যাচার করিত, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে হিন্দু ও মুসল-মান—উভয় শ্রেণীর প্রজারা, ধর্ম্মঘট করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যুদ্ধে প্রজা-পক্ষেরই পরাজয় ঘটে। এই সকল নিদারুণ অত্যাচার-কাহিনী ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলে, কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণ হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড কর্ণওয়া-লিসকে গভর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠান। তিনি আসিয়া দশশালা বন্দোবস্ত করিলে প্রজারা অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বীর-পূজা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর রাজপুত বিক্রমের একটি চিত্র ইহাতে প্রকটিত। গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রই নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মোটের উপর পুস্তকখানি সুখ-পাঠ্য বটে

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সকল গ্রন্থাদির উদ্ভব হইয়াছে, প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রাজভক্ত নামক উপন্যাসখানি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। এখানি একটি বিচিত্র বস্তু। ইহার ভাষা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়-প্রবর্ত্তিত "একলিপি-বিস্তার-পরিষদ" নামক সভার ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত। সভার নামেই বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতে একই প্রকার অক্ষরের প্রচলনই সভার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান সহায় এবংবিধ গ্রন্থের প্রচার। সভার আশা এই যে, ভারতের

অন্যান্য প্রদেশবাসী হিন্দুরা দেবনাগর অক্ষরের সাহায্যে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আস্বাদ পাইবেন ও সমাদর করিতে শিখিবেন, এবং ক্রমে ভারতবাসী সর্ব্বজাতীয় হিন্দুই বাঙ্গালা ও অপরাপর প্রাদেশিক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাহার ফলে ভারত-বাসী সকলেই এক বিশাল ও প্রবল জাতিতে পরিণত হইবে। উদ্দেশ্য যে অতীব মহৎ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সভা যে উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইতে-ছেন, তাহা কতদূর সফল হইবে, বলা যায় না। যখন বঙ্গদেশের সকলের এ বিষয়ে একরূপ মত নয়, বাঙ্গালীরাই যখন বাঙ্গালা অক্ষর ছাড়িতে সম্মত নয়, তখন অন্যান্য প্রদেশবাসীরা যে সহজে নিজ নিজ প্রচলিত অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগর অবলম্বন করিবে, সে আশা যেন সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ডিটেক্‌টিভ উপা-খ্যান বা গোয়েন্দাকাহিনীও প্রচারিত হই-য়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ। ইহা-দের সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই; তবে ইহাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় যে বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইতেছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সংগ্রহ-পুস্তকও কয়েকখানি প্রকাশিত হই-য়াছে। এইরূপ পুস্তকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার কৃত "কথা-নিবন্ধ" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত "ষোড়শী" এই দুইখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুস্তক দুই খানিই সুখপাঠ্য হইয়াছে। শেষোক্তখানির নামেই বুঝা যাইতেছে, উহাতে ষোলটি ছোট ছোট গল্প আছে।

নাটক।

সমালোচ্য বর্ষে প্রায় ১০০ খানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক অধিক নাই। উল্লেখ-যোগ্যগুলির মধ্যে কয়েকখানি ঐতিহাসিক, আর কয়েকখানি স্বদেশী-আন্দোলন-প্রসূত। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে তিনখানি সবি-শেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ তিনখানি সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

সুপ্রসিদ্ধ নাটককার নট-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মীর-কাশিম নামক নাটকে গ্রন্থ-কার এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপনের এবং তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশে তিনি গ্রন্থের নায়ক ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব কাশিম আলি খাঁকে একজন প্রকৃত বীরপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং বঙ্গের ঔপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় চন্দ্রশেখরে যে তকিখাঁকে অতি কুৎসিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই তকিখাঁকেই গিরীশ বাবু তিনি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া-ছেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তই গ্রন্থকার তারা-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তারা দেশমধ্যে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে, এবং কোম্পানীর অধীন ইংরেজ-পুরুষগণ উভয় জাতিরই ঘোর শত্রু, তাহাদের বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। দেশমধ্যে যে সদ্ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, ইহা যে তাহারই ফল, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **"কেদার রায় বা বঙ্গের শেষ বীর"** নামক ঐতিহাসিক নাটকেও হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব-সংস্থাপন-প্রয়াসের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই বোধ হয় প্রবলপ্রতাপ দ্বাদশ ভৌমিক অর্থাৎ বার ভূঁইয়ার বৃত্তান্ত অবগত আছেন। কেদার রায় এই দ্বাদশ জনের মধ্যে সর্ব্বশেষ ভৌমিক। তিনি অতিশয় বীরপ্রকৃতি ছিলেন। মোগল শাসনে দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল-সম্রাটের অধীনতা-পাশ-ছেদনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীপুর নগরে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস পান। তাঁহার দমনার্থ রাজা মানসিংহ প্রেরিত হন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু জনৈক হিন্দু গুপ্ত ঘাতকের হস্তে হত হন। তদবধি বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা তিরোহিত হয়। গ্রন্থের স্ত্রীচরিত্রসমূহের মধ্যে অনিতার নাম উল্লেখযোগ্য।

লেখকপ্রবর সুকবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত **"দুর্গাদাস"** অতি উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক। প্রখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজের রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষী ও সন্তানগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতদিগের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সে বিষয়ে ইহা অনেকটা অমর বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" উপন্যাসের অনুরূপ। এই গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে দুর্গাদাসই সর্ব্বপ্রধান। দুর্গাদাসের চরিত্র প্রভূত নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্গাদাস বীর পুরুষ। অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব গৌরবের উচ্চসীমায় আরোপণ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটের সৈন্যগণকে বার বার পরাস্ত করিয়াছিলেন; স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, দুর্গাদাস সে সমস্তই করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি জীবনের মহাব্রত-উদ্যাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতাতেই গ্রন্থকারের প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দুজাতি নৈসর্গিক ও অন্যান্য কারণে অধঃপাতের পথে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল; দুর্গাদাসের মত লোক স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াও সে গতি রোধ করিতে সক্ষম হন নাই। এ সম্বন্ধে স্বয়ং দুর্গাদাস দুঃখিত-চিত্তে কি বলিতেছেন শুনুন;—

"ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুল্‌তে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জ্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছি, দেখেছি যে কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে। সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলেও পদাহত স্থবির কুক্কুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্ত্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগলসাম্রাজ্য থাক্‌বে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না!"

দুর্গাদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীতেই গ্রন্থকারের এই নাটকপ্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। দুর্গাদাসের এই মর্ম্মভেদী উক্তি যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি মুসলমানচরিত্রের

অবতারণা আছে। তন্মধ্যে সম্রাটের সেনাপতি দিলির খাঁর চরিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। দিলির খাঁ যেমন সাহসী বীর পুরুষ, তেমনই উদারচেতা ও গুণগ্রাহী। দুর্গাদাস হিন্দু ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও দিলির খাঁ তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি যে ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি আওরঙ্গজেবকে কূটনীতি ও অসমদর্শিতা পরিত্যাগ করিয়া সরল নীতির অবলম্বনে ন্যায়বিচার ও সমদর্শিতা দ্বারা ভারতের পরস্পর বিবদমান জাতিসমূহকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আপনার "রাজসিংহ" উপন্যাসে আওরঙ্গজেবকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বীয় "দুর্গাদাস" নাটকে তাঁহাকে তদপেক্ষা সমধিক সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাতেও ইদানীন্তন বঙ্গীয় লেখকদিগের মুসলমান-সমাজের সহিত সদ্ভাব ও প্রীতি-সমাকর্ষণ-চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাকে অবশ্য একটা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। এ জন্য এই শ্রেণীর লেখকগণ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে যে সমস্ত গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে এগার খানি নাটকের নাম পাওয়া যায়। বঙ্গবিভাগজনিত মনঃক্ষোভে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যে এক নবভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে, সেই ভাব জীবন্ত ও জাগ্রৎ রাখাই এই সকল গ্রন্থ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাটকেই কোন রাজা, নবাব বা জমিদারকে প্রথমে স্বদেশী-আন্দোলনের ঘোর বিরোধী রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই ঐ সকল বিরোধী মহাপুরুষেরা স্বদেশী-স্রোতের প্রবল প্রতিরোধের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় বিফলপ্রযত্ন ও নানারূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া পরিশেষে দেশের লোকের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের এই নবীন ভাবের উদ্দীপনাই, বোধ হয়, অধুনা বঙ্গভাষায় কল্পনামূলক ও প্রণয়ানুরাগঘটিত উপন্যাসনাটকাদির অসদ্ভাবের প্রধান কারণ। তথাপি প্রবীণ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী স্বরচিত

"দেব কৌতুক" নামক নাটক প্রকাশ করিয়া এই অভাবের কতকটা পূরণ করিয়াছেন। কামজায়া রতি ও বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এই দুইটী দেবীর বিবাদই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। দেবীদ্বয়ের মধ্যে কে কোন্ আসনে বসিবেন, ইহা লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত। বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল যে, মনুষ্যের উপর যিনি যে ভাবের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচার হইবে। দেবীদ্বয় দুইটী মানবজাতীয়া বালিকা বাছিয়া লইলেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতা-অনুসারে আপন আপন নির্ব্বাচিতা বালিকাকে গুণাবলী প্রদান করিয়া ভূষিত করিলেন। রতিদেবীর অনুগৃহীতা কুমারী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া হইয়া উঠিল, এবং লক্ষ্মীদেবীর অনুগৃহীতা কুমারী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অপেক্ষাকৃত হীনা হইলেও সর্ব্ববিধ মানসিক গুণে বিভূষিতা হইয়া সকলের বরণীয়া হইয়া উঠিল। পরন্তু রতিদেবীর বালিকা যে যুবককে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, সে যুবক সেই অতুল সুন্দরীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর অসুন্দরী বালিকাকে পরম সমাদরে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীরই জয় হইল। গ্রন্থকর্ত্রী এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক কেবল আপনার শারীরিক বাহ্য সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, প্রত্যুত রমণীর মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারাই পুরুষের হৃদয় মুগ্ধ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে আমরা একখানি সংস্কৃত নাটকের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই নাটক খানির নাম "প্রভাত স্বপ্নম্।" ইহার লেখক সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন। রামায়ণোক্ত রামের বিবাহই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ইহা নির্দ্দোষ সংস্কৃতে লিখিত। ইহার উপাখ্যানাংশ অতি সুন্দরভাবে কল্পিত। স্থানে স্থানে মূল রামায়ণের সহিত মিল নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় অতি সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। সমস্ত ভারতবর্ষে না হউক, সমগ্র বঙ্গদেশে নির্ভুল, নির্দ্দোষ ও সুন্দর সংস্কৃত এবং প্রাকৃত রচনায়, বোধ হয়, তর্করত্ন মহাশয়ের সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই।

পদ্য সাহিত্য।

সমালোচ্য বর্ষে অনেকগুলি পদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বা গাথার সমষ্টীভূত কোষকাব্য, এবং কয়েকখানিমাত্র বৃহৎ কাব্য। প্রথমোক্ত কোষকাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই রবিবাবুর আদর্শের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু তেমন তেজস্বিতা ও ভাব কোথায়? যেন স্বপ্নময় অমূলক কল্পনায় পরিপূর্ণ, যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই অসরল। ইহাদের প্রত্যেকখানির সমালোচনা করা দূরে থাকুক, নামোল্লেখ করিবারও অবসর আমাদের নাই। এস্থলে কেবল দুই একখানির বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব। একখানির নাম

"মহাব্রত"। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র। ইহাতে স্বদেশী-আন্দোলন, বরিশালের কাণ্ড, জাতীয় মহাসভা (ন্যাশন্যাল কংগ্রেস), ও অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা আছে। জনসাধারণের হৃদয়ে দেশভক্তির উদ্রেক করা এবং তাহাদিগকে বর্ত্তমানশাসন-প্রণালীর দোষ ও ত্রুটি বুঝাইয়া দেওয়াই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

বৃহৎ কাব্য কয়েকখানির মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল হোসেন প্রণীত

"যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজুদ্দৌলা উপন্যাস"

নামক গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের নামেই উহার বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে নবাবের সৈন্যগণের হস্তে কলিকাতার পতন, ও কাশিম বাজারস্থ ইংরেজদিগের কুঠি লুণ্ঠন হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণ নবাবের শোচনীয় হত্যা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত। সাধারণতঃ সিরাজের প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের আরোপ করা হইয়া থাকে, কবি মহোদয় সে সমস্ত অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার এবং তরুণ নবাবকে অতি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কবির মতে সিরাজের একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সাতিশয় দূরদর্শী ছিলেন;—এ দেশের লোক ১৫০ বৎসরে যাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই, তাহা তিনি তখনই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সিরাজ যৎকালে প্রতি মুহূর্ত্তে জল্লাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলে নবাব দেবীকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, 'মাগো! সর্ব্বদা হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে চেষ্টা করিও, এবং তোমার বিশ্বাসঘাতক প্রজাদিগকে কখনও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিও না।' লেখক সম্ভবতঃ সুকবি নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্য হইতে আপনার গ্রন্থের ভাব সংগ্রহ

করিয়াছেন। সমালোচ্য কাব্যখানি এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। সেই ছন্দ অনেক স্থলে গদ্যের মত হইলেও বেশ সরল এবং সুললিত। গ্রন্থখানিতে উচ্চকাব্যোচিত সদ্গুণাবলীর বাহুল্য না থাকিলেও ঐ ছন্দের জন্য একপ্রকার সুখপাঠ্য হইয়াছে।

এস্থলে আর একখানি কবিতা গ্রন্থের নামোল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এখানির নাম

"কিরাতার্জ্জুন"। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্। এখানি সুকবি ভারবি কৃত সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুন কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ইহা যে অনুবাদ, একথা কবিবর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; নচেৎ যাঁহারা সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুন পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই ইহাকে অনুবাদ বলিতে পারিতেন না, মৌলিক রচনা বলিয়াই বুঝিতেন। অনুবাদকারকের পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। দাস মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে রঘুবংশ, শিশুপালবধ, আকাশকুসুম ও শোকগীতি এই কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সবিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ শতমুখে এই সকল গ্রন্থের সুখ্যাতি করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, অজিতানন ন্যায়রত্ন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, শিবনারায়ণ শিরোমণি, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ দেশের সর্ব্বপ্রধান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নবীনবাবুর কবিত্বশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবি-গুণাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সমালোচ্যগ্রন্থের অনেক স্থলেই তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা সমুজ্জ্বলভাবে সুপরিস্ফুট। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, স্থান ও অবকাশের অভাবে আমরা সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমরা কবিবরের নিকট অপরাধী। ভরসা করি, তিনি নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

কবিগুণাকর মহাশয় কেবল যে বাঙ্গালা লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি ইংরেজী লিখিতেও সুপটু। রাজভাষায় রচিত তাহার Ancient Geography of Asia, Miracles of Buddha, এবং A note on the Antiquity of Ramayana এই তিন খানি গ্রন্থও যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। নবীন বাবু রাজাধীন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন প্রখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। এরূপ দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর রাজসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি যে সাহিত্য-সেবার অবসর পাইতেছেন, ইহাই সমধিক প্রশংসার বিষয়। এক্ষণে ভগবানের নিকট আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, তিনি এই উদীয়মান নবীন কবিবরকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁহাকে চিরকাল এইরূপ সাহিত্যসেবায় ও স্বদেশের হিতসাধনে রত রাখুন।

ইতিহাস।

সমালোচ্য বৎসরে ৪৫ খানি ইতিহাস বাহির হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য আজিকালি যেন অনেকেরই হৃদয়ে প্রবল প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে। তাহারই ফলে সমালোচ্য বর্ষে কয়েকখানি নূতন ইতিহাস-গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, অধুনাতন লেখকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ইংরেজী-অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়া মূল গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিয়াছেন এবং যে সমস্ত তত্ত্ব পূর্ব্বকালীন লেখকগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই, বা যাহা তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত

হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাঁরা প্রকৃত সত্য অবধারণের প্রয়াস পাইয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে দুইখানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একখানির নাম

"প্রতাপাদিত্য"। ইহার লেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়। যে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য প্রবল-প্রতাপ মোগল-সম্রাট্‌কে ২০ বৎসরকাল উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেই পুণ্যচরিত মহাপুরুষের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্ত্তি-কথার প্রকৃত তত্ত্ব বহুপ্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের মৌলিক গবেষণা-শক্তির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানুভব প্রতাপ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই গ্রন্থকার পরিশিষ্টের আকারে পুস্তকের শেষভাগে সংযোজিত করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক দ্বারা এক দিকে যেমন বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি হয়, অপর দিকে তেমনই বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় খানির নাম

মিরকাসিম। ইহার রচয়িতা প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইহাতে কাসিম আলি খাঁর সিংহাসনারোহণকাল হইতে ইংরেজ কোম্পানির হস্তে তাঁহার পরাভব ও পতন পর্য্যন্ত তাবৎ ঘটনা বিবৃত। ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, এবং প্রথম খানির ন্যায় ইহাতেও অত্যদ্ভুত গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থপাঠে বুঝা যায় যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইতিহাসের আলোচনা সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এই জ্ঞান-পিপাসা যে দেশের পক্ষে প্রভূত মঙ্গলসাধক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবনচরিত।

আলোচ্য বৎসরে ১৭ খানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যে জীবন-বৃত্তান্ত পনর বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়া তিন খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সমালোচ্য বর্ষে তাহার চতুর্থ অর্থাৎ শেষখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইল। মহাত্মা কেশবের জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই এই চারিখণ্ডে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে। শেষ খণ্ডে এই মহাপুরুষের জীবনের শেষাংশের, অর্থাৎ যে সময়ে তিনি "নববিধান সংহিতার" রচনায় প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ের, বৃত্তান্ত প্রকটিত। কেশবচন্দ্রের এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত আর নাই।

যে রঘুনাথ দাস সাধারণতঃ দাস গোস্বামী নামে পরিচিত তাঁহার এবং ৺কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর, এই দুইজনের জীবনচরিত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবসমূহে পরিপূর্ণ; সুতরাং গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহাদের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত একরকম ঢাকিয়া পড়িয়াছে। রঘুনাথ দাস স্বয়ং চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন না। তিনি মহাপ্রভুর শিষ্যগণের দ্বিতীয় পুরুষের সমসাময়িক। অগাধ ভক্তি ও বৈরাগ্যের গুণেই তিনি গোস্বামী নামে প্রখ্যাত হইয়া অনেকের গুরু হইয়া উঠেন। শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী এই মহাপুরুষের জীবনচরিত লিখিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের অনেক নূতন

কথা জানিতে পারা যায়। দ্বিতীয়খানি পরমহংসদেবের শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত। এই গ্রন্থে সুরেন্দ্রবাবু উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যত্বেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শিল্প।

শিল্পবিষয়ে যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বস্ত্র-শিল্পই প্রধান। এতৎসম্বন্ধে যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেন্‌রি এইচ্‌ ঘোষ প্রণীত Hand Loom Weaving (হ্যাণ্ড লুম উইভিং অর্থাৎ হস্তচালিত তন্ত্রে বস্ত্র-বয়ন) এবং শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত "বিবিধ বস্ত্রবয়ন-শিক্ষা" এই দুইখানিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থদ্বয়ে বস্ত্রবয়নপ্রণালীর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশে বিলাতী-বসন-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞাকাল হইতে যত প্রকার নূতন নূতন তাঁতের প্রচলন হইয়াছে, সেই সমস্ত তাঁতের সবিস্তার পরিচয়ও এই দুইখানি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। শিল্পসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানিতে গীতবাদ্যের আলোচনা আছে, এবং অবশিষ্টগুলিতে নানাপ্রকার বিলাসসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান।

এতদ্বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত

"ধনবিজ্ঞান" নামক পুস্তকখানিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, বঙ্গভাষার ইতঃপূর্ব্বে আর একখানিমাত্র এই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের যে বিশিষ্ট উপকার হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সমালোচ্য বৎসরে ৩ খানি মাত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক

"চীন-ভ্রমণ" নামক যে গ্রন্থ লিখিয়া প্রচারিত করিয়াছেন, সেইখানিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে চীনদেশ সম্বন্ধীয় এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক নূতন কথাই বর্ণিত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইন্দুবাবুর গ্রন্থকলেবর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত। ইহার ছাপাও অতি পরিপাটী হইয়াছে।

ধর্ম্মগ্রন্থ।

সমালোচ্য বর্ষে ধর্ম্মবিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকাদির প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রবীণ চিন্তাশীল সুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত

"ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য-বিচার" নামক গ্রন্থখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে সুযুক্তিসম্মত প্রণালীতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত এবং হিন্দুজাতির অবনতি ও অধঃপতনের কারণ-পরম্পরা আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে বিচক্ষণ গ্রন্থকার যেরূপ অকাট্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা ও সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে; এমন কি, তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতের মিল হইবে না, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। গ্রন্থকারের মতে হিন্দুজাতির অধঃপতনের প্রধান

কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। পাঁড়ে মহাশয় বলেন, বৌদ্ধপ্রচারকেরা মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার প্রচার করিয়া আর্য্যজাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাহার উপর আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম পালি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহ প্রসার লাভ করায় ভারতের বিভিন্ন জাতি ও প্রদেশ সমূহের পার্থক্য অধিকতর প্রসারিত করিয়া তাহাদিগের একতাবন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের উদ্ধারলাভের যে কয়েকটি উপায় গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান। ভারতবাসীদিগের এক্ষণে পাশ্চাত্য বিলাসপ্রিয়তা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের নির্দেশপালন, সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণবর্গের প্রতিপালন, গো জাতির ধ্বংস-নিবারণ এবং লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার সাধন করা উচিত। পাঁড়ে মহাশয় বলেন, এতদ্ব্যতীত ভারতোদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। কথাগুলি যে অতীব সমীচীন, তৎপক্ষে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সে যাহা হউক, পাঁড়ে মহাশয় এই উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া বঙ্গবাসী মাত্রকেই যে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহা দ্বারা একপক্ষে যেমন বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনই জনসাধারণের জ্ঞানলাভের পথ সুগম হইয়াছে।

বিবিধ।

পূর্ব্বোক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় না, এরূপ কয়েকখানি পুস্তকও সমালোচ্য বর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। এবংবিধ গ্রন্থগুলিকে আমরা "বিবিধ" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে বি এ, বি এল প্রণীত "হুগলি—অতীত ও বর্ত্তমান" এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, এফ্ আর্ এম্ এস্ প্রণীত "রত্ন-পরীক্ষা" এই দুইখানিই উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত খানিতে পর্ত্তুগীজদিগের কর্ত্তৃক হুগলি নগরের অধিকারকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হুগলি সহরের ও হুগলি জেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নহে। শেষোক্তখানির আলোচ্য বিষয় উহার নামেই বুঝা যাইতেছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অবলম্বনে হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তরের পরীক্ষা-প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ "জল সরবরাহের কারখানা" নামক একখানি নূতন ধরণের পুস্তক লিখিয়া সমালোচ্য বর্ষমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীজীর আসল নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ' এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'এল্ সি ই' উপাধিধারী এবং পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। এরূপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। সুতরাং এই গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, এ কথা বলিতেই হইবে। পুস্তকখানি ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, এবং এতদ্দেশীয় মিউনিসিপালিটী সমূহের অধ্যক্ষগণের জন্য লিখিত।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয় ব্যতীত বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী-আন্দোলন-সম্বন্ধে যে বহুসংখ্যক পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। বঙ্গবিভাগপ্রণালী প্রায় সকলেরই নিকট নিন্দিত

হইলেও দুইটি কারণে অনেকের নিকট ইহা এক্ষণে নিতান্ত অনাদরণীয় নহে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, বঙ্গবিভাগ যখন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন আর এ সম্বন্ধে আন্দোলন আবেদন করিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ ইহাদ্বারা যখন বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত হইয়াছে, তখন ইহাকে "শাপে বর" জ্ঞান করিয়া ইহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করা উচিত। এই সকল গ্রন্থকারের মত এই যে, বঙ্গবিভাগ যেন আর রহিত বা পরিবর্ত্তিত না হয়, কারণ তাহা হইলে লোকের মনে নবোদ্দীপ্ত এই স্বদেশপ্রীতির ভাবও তিরোহিত হইতে পারে। সে যাহা হউক এতদ্বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তগুলিরই উপদেশ এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের চেষ্টা ব্যতীত দেশোদ্ধারের অন্য উপায় নাই। সকলগুলিতেই প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার এবং বিদেশী-দ্রব্য-বর্জ্জনের ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞারক্ষার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় স্বপ্রণীত

"মেয়েলী ব্রত ছড়া" নামক পুস্তকে "স্বদেশ ব্রত" নামধেয় একটি নূতন ব্রতও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, এতদ্দেশীয়া হিন্দু মহিলারা অন্যান্য ব্রতের ন্যায় এই ব্রতটিও যথানিয়মে পালন করিবেন, এবং তাহার ফলে তাঁহাদের মনে স্বদেশসেবার কথা সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে, সুতরাং তাঁহারা বিদেশী অসার চাকচিক্যময় বিলাস সামগ্রী ব্যবহারের জন্য ব্যগ্র হইবেন না, স্বদেশের মোটা জিনিসেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

মাসিক পত্রিকাদি।

মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কোন কথাই এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, উহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং উহাদের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও বহু সময়সাপেক্ষ, অধিকন্তু তাহাতে শ্রোতৃ-মহোদয়গণের বিরক্তি জন্মিতে পারে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে দুই চারি কথা না বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম।

সমালোচ্য বর্ষে মোট ৭০ খানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কতকগুলি নূতন অর্থাৎ এই বৎসরে নব প্রচলিত হইয়াছে, আবার অনেকগুলি পুরাতন পত্রের প্রচার রহিতও হইয়াছে। এই সমস্ত পত্রের মধ্যে কয়েকখানি সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক, কয়েকখানি ইতিহাস বিষয়ক, কয়েকখানি চিকিৎসা বিষয়ক, কয়েকখানি শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক, কয়েকখানি ব্যবস্থা (অর্থাৎ আইন) বিষয়ক, কয়েকখানি ইতিহাস বিষয়ক, কয়েকখানি ধর্ম্ম বিষয়ক, এবং অবশিষ্টগুলি বিবিধ বিষয়ক। পুরাতন পত্রগুলির মধ্যে প্রবাসী, ভারতী, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা অতীব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে এবং আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে; বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখকগণ আপনাদিগের সুরচিত প্রবন্ধ সমূহদ্বারা এই সমস্ত পত্রের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং জনসমাজে জ্ঞানবিস্তারের মহনীয় যত্ন চেষ্টা করিয়া সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে হইলে, আমাদের মতে প্রবাসীকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে হয়; শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় উহাতে যে সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলি জ্ঞান-গবেষণার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বলবান্ জামাতা, আমার উপন্যাস প্রভৃতি ছোট ছোট কৌতূহলোদ্দীপক গল্পগুলি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনেক মাসিক পত্রিকাতেই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে প্রবাসী-পত্রিকায় তাঁহার জ্ঞানগবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের জ্যোতিনির্ব্বাণ উপন্যাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রভৃতি প্রবাসীর লেখকগণ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের নেশন বা জাতি, রবীন্দ্র বাবুর দেশনায়ক, শিক্ষা-সমস্যা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বিশেষত্ব, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সাহিত্য পত্রিকায় ভাষা ও আদিরস, স্বদেশপ্রেম, প্রাচীন বঙ্গ, আমাদের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। নব্যভারতে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা আছে।

গত বৎসর যে সকল নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত “অঙ্কুর” এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত “স্বদেশী” পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যেরূপ সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ বাহির হইয়াছে, এবং যেরূপ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, এই পত্রিকাদ্বয় এক সময়ে প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকারূপে পরিগণিত হইবে। এই দুইখানি পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, এই মাসিক পত্রিকা দুইখানি মাসে মাসেই বাহির হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় আমাদের সাহিত্য-সংহিতার পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। “স্বদেশী” পত্রিকায় তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।

অতি সংক্ষেপেই আমাদের এই সমালোচনা কার্য্য সমাধা করিতে হইল। ইচ্ছা স্বত্বেও অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না, অনেক বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়াও যেরূপভাবে আলোচনা করা উচিত, সেরূপভাবে আলোচনা করিতে অসমর্থ হইলাম। মাসিক পত্রিকার অনেক সুলেখকের প্রবন্ধের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। অনেক গ্রন্থের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না। এই ত্রুটির জন্য, সেই সমস্ত গ্রন্থকার ও লেখকগণের নিকট করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা।

১

অশনি-শবদ সম
একি কথা শুনি হায় !
বসুন্ধরে ! দ্বিধা হও,
অভাগী লুকাবে তায় !

২

কি ফল জীবনে আর ?
কারে না দেখাব মুখ।
প্রত্যাখ্যাতা যেই নারী,
কোথা তার আছে সুখ ?

৩

মোহিনী আশার ব্রত
আজি হ'লো উদ্যাপন।
দগ্ধ এ জীবনে আর,
নাহি কোন প্রয়োজন !

৪

আমার ভাবিয়ে যারে,
সঁপিলাম মনঃ প্রাণ।
দারুণ অবজ্ঞা তার
পাইলাম প্রতিদান !

৫

ও চরণ পূজা যদি,
করে থাকি কায় মনে,
দিনু এই অভিশাপ
স্মৃতির বাড়বাগুণে ;—

৬

জ্বলিবে যে অহরহ,
না রহিবে শান্তি-লেশ।
চলিল এ অভাগিনী
জনম মতন শেষ।

৭

বন ফুল বনে ছিনু
কতই আমোদ ভরে।
নাহি ছিল কোন জ্বালা,
স্নেহময় পিতৃ-ক্রোড়ে।

৮

উষার কনক কোলে,
জাগিলে বিহঙ্গদল।
সরোবরে বিকসিত,
আনন্দিত শতদল।

৯

কুসুম-সুবাস মাখি,
ছুটিত যে সমীরণ।
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী সনে,
করিতাম বিচরণ।

১০

ভাগীরথী কলতানে,
বহিত সাগর পানে।
উথলিত বনস্থলী,
পাপিয়ার পিউ তানে।

১১

কত সাধে হেরিয়াছি,
প্রমোদে সঙ্গিনী সনে।
প্রকৃতির শান্তি কোলে,
ছিলাম পবিত্র মনে।

১২

কেন বা ভুলিনু হায় !
শঠের সে প্রলোভনে।
কেন বা বিকানু হৃদি,
ক্ষণেকের দরশনে।

১৩

প্রতিফল বিধিমতে,
ভাল পাইলাম তার।
সুধা-ভ্রমে হৃদয়েতে,
ধরিলাম বিষভার!

১৪

অন্তরে গরল ভরা,
কথা যেন মধুমাখা।
এমন পাষাণে ভাল
বেসেছি, কপাল-লেখা!

১৫

না না বৃথা এ গঞ্জনা,
সকলি অদৃষ্ট মম।
চলিনু জনম মত,
ক্ষমা কর প্রিয়তম!

শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম-দর্শনে।

১

গম্ভীর নিনাদ কি এ!—ওই শুনা যায়?
সুকোমল এ গম্ভীরে শ্রবণ জুড়ায়!
গগনে যেদিকে চাই, মেঘ-ঝড় চিহ্ন নাই,
কেমনে ঝটিকা শব্দ হবে রে হেথায়?
গম্ভীর নিনাদ কি এ!—ওই শুনা যায়?

২

গম্ভীর নিনাদ কি এ!—ওই শুনা যায়?
এক-সম-উচ্চ-তানে জীবন জুড়ায়।
নাহি হেথা প্রস্রবণ, মহা জল-প্রপাতন,
তাদের সে শব্দ ওরে হবে না হেথায়!
গম্ভীর নিনাদ কি এ!—ওই শুনা যায়?

৩

গম্ভীর নিনাদ কি এ!—ওই শুনা যায়?
বুঝেছি বুঝেছি—গঙ্গা সাগরে মিশায়!
কেঁদেছে কত যে সতী, দেখিতে না পেয়ে পতি,
বিচ্ছেদে খুঁজেছে কত পতির আশায়;
পতি দেখে এবে সতী উন্মাদিনী প্রায়!

৪

পতি দেখে এবে সতী উন্মাদিনী প্রায়।
নেচে নেচে তাই গঙ্গা সাগরে মিশায়!
চলেছে আপন মনে, কোন বাধা নাহি মানে,
দ্রবময়ী হয়ে আহা! পতির চিন্তায়!
শেষে হেসে পশে গঙ্গা সাগর-হিয়ায়!

৫

শেষে হেসে পশে গঙ্গা সাগর-হিয়ায়!
হর্ষে বিস্ফারিত দেহ হয়েছে রে তায়!!
আনন্দ তরঙ্গ তার হৃদে খেলে অনিবার,
নানা ছাঁদে হেলে দুলে পতিপাশে যায়;
কলনাদে কল্লোলিনী প্রেম-গীতি গায়!

৬

কলনাদে কল্লোলিনী প্রেম-গীতি গায়!
সিন্ধুর হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠে তায়!
সঙ্গীত শুনিতে পেয়ে, সিন্ধু আসে ধেয়ে ধেয়ে,
মিলিতে প্রিয়ার সনে পুলকিত কায়!
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে উচ্ছ্বাস বাড়ায়!

৭

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে উচ্ছ্বাস বাড়ায়!
সে উচ্ছ্বাস-স্রোত দেখি দুকূল ভাসায়।
আনন্দের কোলাহলে, সাগর-গঙ্গার জলে,
দুয়ে মিলে খেলা করি' পাতকী তরায়;—
ভক্তিভরে "পূর্ণচন্দ্র" সৈকতে লুটায়।

৮

ভক্তিভরে "পূর্ণচন্দ্র" সৈকতে লুটায়।
পদে রেখো মাতর্গঙ্গে! ভুলনা তাহায়।
ভাগ্যবান্ ভগীরথ খুলেছে স্বর্গের পথ,
পতিতপাবনী মাকে এনেরে ধরায়;—
গঙ্গাজলে তনু-ত্যাগে বিষ্ণু-লোকে যায়!

৯

গঙ্গাজলে তনু-ত্যাগে বিষ্ণু-লোকে যায়!
"বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গা"—এই মহিমায়!
নির্গম হ'য়েরে গঙ্গা, নাম পায় "শিব-গঙ্গা";—
গোপনে রাখে যে শম্ভু আপন জটায়!
ভক্ত ডাকে গঙ্গা ছোটে জহ্নু দেখা পায়।

১০

ভক্ত ডাকে, গঙ্গা ছোটে, জহ্নু দেখা পায়।
মোক্ষ পাবে স্থির ভেবে জহ্নু তাঁরে খায়।
জঠরে পুরিয়া মাকে নিজে সে অভয়ে থাকে,
কেমনে রহিবে মাতা নিশ্চিন্ত তথায়?
আবার ডাকে যে ভক্ত গঙ্গা ছোটে তায়!

১১

আবার ডাকে যে ভক্ত গঙ্গা ছোটে তায়!
এবারে ধরিতে শম্ভু করেছে উপায়।
ভবিতব্য পূর্ব্বে জানি, উদ্ধারিবে সুরধুনী,
সগরতনয় যারা মরেছে হেথায়;
জলমূর্ত্তি ধরে "ভব"—সাগর রেখায়!

১২

জলমূর্ত্তি ধরে "ভব"—সাগর রেখায়!
পড়েছে গঙ্গা যে এবে বড় সমস্যায়—
এক দিকে ভক্ত টানে, শিবে সদা পড়ে মনে,
নয়নে নয়নে গঙ্গা রাখে যে তাঁহায়;
পতিপ্রাণা ব্যাকুলিতা হ'য়েছিল তায়!

১৩

পতিপ্রাণা ব্যাকুলিতা হ'য়েছিল তায়,
তাই কেঁদে কেঁদে গঙ্গা খুঁজেছে ভর্ত্তায়।
দেখা পেয়ে পরস্পরে, প্রসারিয়া দুই করে
গঙ্গা আর গঙ্গাধরে মিলেছে হেথায়;—
এমন সঙ্গম-স্নানে সাযুজ্য মেলায়!

১৪

এমন সঙ্গম-স্নানে সাযুজ্য মেলায়!
কোটী লোক এসে তাই "মকরেতে" নায়।
কপিলের সিদ্ধাশ্রম, হ'ত যাতে স্বর্গ-ভ্রম
শান্তিনিকেতন সেই ছিলরে হেথায়;
আজি সে তাপস-ভূমে শ্বাপদ বেড়ায়!

১৫

আজি সে তাপস-ভূমে শ্বাপদ বেড়ায়!
মহা-জ্ঞানী সেই মুনি না দেখিয়ে হায়!
বিশাল-পয়োধি-তীরে, অনন্ত আকাশ শিরে,
ধ্যানে মগ্ন থেকে যোগী বিশ্বের চিন্তায়,
ব্রহ্মাণ্ড সংক্ষিপ্ত করে চব্বিশ সংখ্যায়।

১৬

ব্রহ্মাণ্ড সংক্ষিপ্ত করে চব্বিশ সংখ্যায়।
ফোটেরে "ঈশ্বর" কিবা সংখ্যার আভায়!
এত কাল ছিল যেই আঁধারে ঢাকিয়ে ওই,
সংখ্যার পরেতে সেই সুপ্রকাশ পায়।!
এ বিশ্ব "ঈশ্বর-হীন" কেন কহে—হায়!

১৭

এ বিশ্ব "ঈশ্বর-হীন" কেন কহে—হায়!
এ নহেত কপিলের কভু অভিপ্রায়।
সাঙ্খ্যেতে "ঈশ্বর" নাই, একথা বোল না ভাই,
নির্লিপ্ত দেখিতে পাই "পুরুষ" আখ্যায়;
সখ্যাময়ী "প্রকৃতি" ঐ ঘুরিছে আজ্ঞায়!

১৮

ধন্য হে কপিল তুমি বিষ্ণু অবতার!
ভারত উঠেছে শীর্ষে "দর্শনে" তোমার;
সংসার-ললাম এই তোমার "আশ্রম"
ছাড়িতে নারি যে আমি হেরি অনুক্ষণ।
প্রণাম করি হে মুনে! উদ্দেশে তোমার;
সাঙ্খ্য-রত্ন পরিবর্ত্তে কি দিব হে আর?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ফটীক জল !

ফটীক জল !—তোমরা আমায় চিন কি ?—আমি কে ?—আর তোমরা ?—তোমরা 'সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা' সোণার বাঙ্গালার বাঙ্গালী। আমি ক্ষুদ্র পাখী—চাতক। আজি তোমাদের দু-দশ কথা শুনাইয়া দিব, তাই তোমাদের মুক্ত বাতায়নে আসিয়া বসিয়াছি। ও কি ?—মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছ যে ? হাসিবার কথা বটে ; কোথায় আমি বিমানবিহারী ক্ষুদ্র চাতক, আমার সম্বল কেবল—ফটীক জল। আর কোথায় তুমি মানব, তোমার সম্বল জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যা-বল। জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া, তোমার দর্প-গর্ব্ব আছে। ভাল

'তোমার ভাল তোমাতে থাক্,
আমায় ত তার ভাগ দিবে না।'

তোমাদের ও দর্প-গর্ব্বের ভাগ আমি চাহি না। আমি কেবল দু কথা শুনাইতে চাহি। ও কি ?—শৈলশ্রেষ্ঠ হিমাচলে মহাদেব বিপত্নীক অবস্থায় যখন যোগে মগ্ন ছিলেন, গৌরী পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা সরস-বসন্ত-সমাগমে—মলয় মারুত-সঞ্চালনে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিলে, তিনি যেমন ভ্রূভঙ্গি করিয়াছিলেন, তুমিও যে দেখিতেছি আমার কথায় সেই মত বিষম ভ্রূভঙ্গি করিতেছ। আবার ও কি ? জগন্নাথী ফিকা বা বলরামী বিড়ী বা সুভদ্রা-সিগারেট, স্বদেশী চকমকির ঘর্ষণে (স্বদেশী দিয়াকাটীর অভাবে) প্রজ্বলিত করিয়া, ধূমোদগীরণপূর্ব্বক আমার দিকে চালাইতেছ যে ? আমি ত তোমাদের যোগ ভঙ্গ করিতে আসি নাই, দু কথা বলিতে আসিয়াছি, বলিবই।

আমার অনেক দিনের সাধ আজ কি পূর্ণ হইবে না ? তোমাদের কবির কথা—

'যখন প্রবাসে, যায় গো সে,
তখন বলি বলি, আর বলা হল না !'

আমার মনেও এই দুঃখই ছিল যে, 'বলি বলি, আর বলা হল না।' কিন্তু আজি যখন তোমার মুক্তবাতায়নে ঢুকিয়া তোমাকে পাইয়াছি, তখন বলিবই। যদি না শুনিতে চাও, তোমাদের 'কাছা-কোঁছা' ধরিয়া—ও হরি ! এখন যে, তোমাদের মধ্যে অনেকেই 'তোবা তাল্লা, কাছাখোল্লা মিঞা মোল্লা।' এখন যে, তোমাদের কাছা-কোঁচার স্থানটা পায়জামা-প্যাণ্টালুন দখল করিয়াছে। তা' হ'ক, না হয়, তোমাদের কোটের লাঙ্গুলটা ধরিয়াই বলিব।

একবার আমার সঙ্গে যাইবে কি ?—বিমানে। কপালে চক্ষু তুলিলে যে ? তুমি না জীবশ্রেষ্ঠ মানব ? তুমি না জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-বলে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ ? তবে বিমানে উড়িবার কথায় চমকিয়া উঠিলে কেন ? তোমরা যতই জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া দর্প-গর্ব্ব কর না কেন—আপনাকে আপনি বড় ভাব না কেন, এখনও তোমাদের শক্তি পূর্ণতা পায় নাই, এ কথাটা মান কি ? যা'ক সে কথা। কল্পনা নামে তোমাদের একটা প্রিয়সঙ্গিনী আছে না ? তোমরা ছোট বড় সকলেই এক একটী ছোট খাট কবি। সেই কল্পনাই তোমাদের মস্তিষ্ক দখল করিয়া, আজীবন তোমাদের নাকে দড়ী দিয়া চালায়—ভাব-সাগরে ভাসায়—আপদে বিপদে বাঁচায়—সুখসম্পদে নাচায়—ধনমদে মাতায়—প্রণয়ে মজায়—শেষে কাঁদায়। সেই কল্পনা-সঙ্গিনী না থাকিলে, তোমাদের জীবনটা বড়ই কষ্টকর বোধ হইত নাকি ? একবার সেই কল্পনা সঙ্গিনী-সঙ্গে নীলিম আকাশে—নিথর বাতাসে ধীরে ধীরে চল। বল—ফটীক জল !

ঐ দেখ—তোমাদের কবি কালিদাসের সেই মেদিনীর মানদণ্ড। আর তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের পাগলপ্রায় পাহাড়। চিনিতে পারিলে কি? বঙ্কিমচন্দ্রের একটী নায়িকার কুচযুগলের উচ্চতা দেখিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া যাহার মাথা গরম হইয়াছিল, যে আজি পর্য্যন্ত সেই জন্যই অবিশ্রান্ত মাথায় বরফ ঢালিতেছে, ঐ সেই ভূধর। এখন চিনিলে? (এখন বন্ধনীর মধ্যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—অভ্রভেদী শুভ্রদেহী হিমাচল অপেক্ষা তোমাদের যে নায়িকার কুচযুগল সমুচ্চ, সেই নায়িকার দেহখানা কত বড়? অবশ্য বহু যোজনব্যাপী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব! যখন সেই নায়িকা অন্ততঃ দশ যোজন-পরিমিত বদন—অক্টারলোনি মনুমেণ্ট—চিতোরের জয়স্তম্ভ বা কুতবমীনারীর মত রদনরাজিবিরাজিত বদন ব্যাদান করিয়া, হাস্য করিতে থাকেন, তখন তোমরা—নায়কেরা মূর্চ্ছা যাও কি না? আর একটা কথা—বাঙ্গালীর মেয়েরা খাড়া বা ডাঁটা চিবাইতে বড়ই ভালবাসেন। এই বঙ্কিমী নায়িকা যখন বোটানিকাল গার্ডেনের সহস্রশীর্ষ-সহস্র-বাহু-সহস্রপাদ বটবৃক্ষের ন্যায় একযোগে দশ বিশ গাছা খাড়া চিবাইতে থাকেন, তখন তোমরা সেই শোভা দেখিয়া প্রণয়রসে আপ্লুত হও কিনা? ধন্য তোমাদের কল্পনা! ধন্য তোমাদের উপমা! ঐ দেখ, হিমানী-মণ্ডিত নগাধিরাজ। কি অপূর্ব্বদৃশ্য! বালারুণ-করোজ্জ্বল শুভ্রতুষারশোভিত শরীরে দণ্ডায়মান হইয়া, মহান্ মহেশের কিরূপ সৃষ্টির মহত্ব ঘোষণা করিতেছে! এই মহান্ দৃশ্য দেখিয়াই

'রবির প্রেয়সী ফুটে কবির হৃদয়ে।'

ওকি?—চমকিয়া উঠিলে যে? জানি, রবি তোমাদের ঠাকুর। রবি ঠাকুরের প্রেয়সীকে মানব-কবির হৃদয়ে তুলিয়া দিবার কথাটা তোমাদের নিকট বড়ই অন্যায় বোধ হয়। কিন্তু তোমরা কথাটা কুভাবে লও কেন? তোমরা যাই বল, রবি একটা জড়পিণ্ড মাত্র। রবির বালা-মূর্ত্তি, তোমাদের চক্ষে ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু রবির পশ্চাতে যে বেয়াড়া বিদ্‌কুটে ছায়া আছে, সেটার খবর রাখ কি? যাই হ'ক, আমি কিন্তু নিজে ঐ কথা বলি নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তোমাদেরই একজন কবি বলিয়া গিয়াছেন। সে কবি কে, জান?

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

যাউক ও রবির কথা। এখন ঐ দেখ—ঘুরে ফিরে ধীরে ধীরে নয়নানন্দদায়িনী নির্ঝরিণী কেমন এঁকেবেঁকে—নেচেনেচে একটী শিখর হইতে আর একটী শিখরে পড়িয়া, রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ-শোভা বিস্তার করিয়া, কেমন মধুর নিঃস্বনে চলিয়াছে! দূর হইতে নির্ঝরিণীর এই নৃত্যধ্বনি শুনিয়া তোমাদের গৃহিণীর নূপুর-মল-সিঞ্জিত পদপল্লবধ্বনি মনে উদয় হইতেছে না?—প্রাণে প্রাণে কাণে কাণে সেই মলের তান কি বাজিয়া উঠিতেছে না? ও হরি! এখন যে, নূপুর-মল নির্ব্বাসিত হইয়াছে! এখন যে মোজা-বুট-শ্লিপার সেই স্থান অধিকার করিয়াছে! এখন সে প্রাণ-জুড়ান তান শুনিবে কিরূপে? এখন সে রুণুঝুনু শব্দের পরিবর্ত্তে হুটমুট-দুপদাপ্ শব্দ। যাউক সে কথা। এখন বল দেখি, ঐ নির্ঝরিণীর সিতস্বচ্ছ সলিল পান করিবার জন্য কি তোমার কামনা হইতেছে না? পান কর, হৃদয় শীতল হইবে, রসনা তৃপ্ত হইবে, তৃষ্ণা মিটিবে। কিন্তু আমার? আমারত ও নির্ম্মল জলে তৃষা মিটে না, মিটিবে না। আমি চাই—ফটীক জল!

এখন একবার তোমাদের মহাপুরাণ স্মরণ কর। ভূর্লোক-পালক গোলোক-আলোক

নারায়ণ, মধুর সংগীতে এমনি বিমোহিত হইলেন যে, ভাবাবেশে তাঁহার রাতুল চরণ যুগল দিয়া দর দর জলধারা বহিতে লাগিল। সেই জল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আসিয়া পড়িল, কিন্তু স্থান হইল না। শেষ বুড়া শিবের মাথায় আসিয়া জটাজালের ভিতর ঢুকিয়া, সেই জলরাশি কুলু কুলু ধ্বনি করিতে লাগিল। ভোলানাথ হাস্ত করিলেন। সেই জলরাশি প্রকৃতি, মহাদেব পুরুষ। জলের নাম হইল গঙ্গা। প্রকৃতি গঙ্গা, পুরুষ মহাদেবের মাথায় চড়িয়া মহাশক্তি দেখাইলেন—পুরুষের মাথা টলিল, পুরুষ হারিলেন। গঙ্গা জটাজুট ভেদ করিয়া—পুরুষকে পরাস্ত করিয়া মধুর হাসি হাসিয়া, শেষ অবনীতে অবতীর্ণা হইলেন। ঐ দেখ সেই সুরধুনী। ঐ দেখ, জাহ্নবী, হিমালয় হইতে প্রবল তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে দুকূল ভাসাইয়া, কেমন উদার হাসি হাসিয়া সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছেন। কত অগণিত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী কতকাল হইতে এই পবিত্র জলপানে কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর মনের কথা—

'এই বাসনা মনে।

দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জীবনে।'

কত পুণ্যাত্মা এই পতিতপাবনীর কূলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া, জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত—

'অর্দ্ধ অঙ্গ রবে কূলে, অর্দ্ধ নাভি গঙ্গাজলে'

তোমার মরিতে সাধ হয় কি? যাউক সে কথা। এই পবিত্র গঙ্গাজল তোমার ঊর্দ্ধতন শত শত পুরুষ পান করিয়া গিয়াছেন, তোমারও ত সেইমত পান করিতে ইচ্ছা হয়। অঞ্জলি ভরিয়া পান কর—সকল পাপ ক্ষয় হইবে, তৃষ্ণা মিটিবে। কিন্তু আমার? ও জলেত আমার তৃপ্তি হইবে না, তৃষা মিটিবে না। আমি চাই—ফটিক জল!

এখন আর একটু এগিয়ে চল। ঐ দেখ বিশালবপু বারিধি, উত্তাল বীচিমালা বিস্তার করিয়া অবিশ্রান্ত নাচিতেছে। যে দিকে চাও, জলে জলময়—যেন সীমা নাই! তুমি জীবশ্রেষ্ঠ মানব! এই সাগরকূলে দাঁড়াইলে, অবশ্যই আপনার মানব-মহত্বটুকু ভুলিয়া, বিশ্বস্রষ্টার মহত্ব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিবে। এই নীল জলরাশির লহরী-লীলা দেখিয়া, অবশ্যই তোমার হৃদয়ে অননুভূত পূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হইবে। এখন বল দেখি, এই জলধির এই অনন্ত জলে কত জীবের তৃষা না নিবারিত হয়? জল লবণাক্ত বটে, তুমি সহজে পান করিতে চাহিবে না, তাহাও জানি, কিন্তু এমন সময় মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে যে, ঐ জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চাহে। কিন্তু আমার? ও জলে আমার তৃষা মিটিবে না। আমি চাই—ফটিক জল!

এখন একবার একটু পাছু হাঁটিয়া চল। কবি রায় গুণাকরের কথা মনে পড়ে কি? তাঁহার অক্ষয় কাব্যের অমর নায়ক-নায়িকার কথা মনে পড়ে কি?

'কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।

ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥'

এই সেই বর্দ্ধমান। আমরা মনোরথে আসিয়াছি, ছয় মুহূর্ত্তও লাগিল না। তুমি কি ভাবিতেছ যে, আমি তোমাকে হীরা মালিনীর সাধের মালঞ্চে লইয়া যাইব? হীরার সেই

'ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার

চারদিকে মালঞ্চ-বেড়া।

ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুমবনে,

আমার এই ফুলবাগানে

বসন্ত নয় ভিলেক ছাড়া।'

তোমার সাধ মিটিবে না—সে মালঞ্চ এখন নাই। হীরার বাড়ীর সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গও বহুকাল হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একটা

কথা বলি, কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান লইয়া, সেই সুড়ঙ্গমূলে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ বসাইয়া দিলে ভাল হয় না কি? যাউক সে কথা। এখন ঐ দেখ, বর্দ্ধমান রাজধানীতে রাণীসায়র, শ্যামসায়র প্রভৃতি কত সরোবর। কেমন সুন্দর—কেমন বিশাল—কেমন কাকচক্ষু-সলিলপূর্ণ। ঐ দেখ রাণীসায়র, অধীর ভ্রমরচুম্বিত পূর্ণস্ফুটিত—অর্দ্ধস্ফুটিত নলিনীদলশোভিত সরোবর কেমন মনোহর। ঘাটে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণ আকণ্ঠ জলে সজীব কমলদলের ন্যায় হাস্য-বদনে কেমন শোভা বিস্তার করিতেছেন, কুম্ভ পূর্ণ করিয়া পানার্থ জল লইয়া যাইতেছেন। তোমার কি এই নির্ম্মল জল পানে প্রবৃত্তি হয় না? অঞ্জলি ভরিয়া পান কর, তৃষা মিটিবে। কিন্তু আমার? আমার ত ও জলে তৃপ্তি হইবে না—তৃষা মিটিবে না। আমি চাই—ফটিক জল!

এখন চল এক লম্ফে প্রয়াগে। হাসিলে যে? তোমরা ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মন্ত্রশিষ্য। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহাই তোমাদিগের অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস, আর ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাদিগের নিকট বন্যবর্ব্বর বাতুলের প্রলাপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত না বলিয়া গিয়াছেন যে, বানরই মানবদিগের আদিপুরুষ? তাহাই যদি হয়, তবে কেনই বা এক লম্ফে প্রয়াগে যাইতে পারিবে না? না পার, মনোরথেই এস। ভয় নাই, প্রয়াগে লইয়া গিয়া, তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিবার ব্যবস্থা করিব না। ঐ দেখ, ব্রহ্মা-প্রতিষ্ঠিত প্রথম তীর্থ প্রয়াগের যুক্তবেণী। ঐ দেখ, কেমন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—সিত-নীল-জলের কেমন সুন্দর মিলন! নীলাঙ্গী যমুনার ধীর-স্থির-স্নিগ্ধ-সুন্দর জলরাশির শোভা কি মনোলোভা! অঞ্জলি ভরিয়া পান কর, তোমার তৃষা মিটিবে। কিন্তু আমার? এ জলে ত আমার তৃষা মিটে না—মিটিবে না। আমি চাই—ফটিক জল!

আর ঐ দেখ, পশ্চাতে প্রাচীন রাজধানী প্রয়াগ—পরমস্বাস্থ্যপ্রদ কূপরাজিবিরাজিত এলাহাবাদ। ঐ দেখ, সুশোভনা সুবসনা ললনাকুল, সুদীর্ঘ রজ্জুসহযোগে সেই সুগভীর কূপ হইতে নির্ম্মল জল তুলিতেছেন—রজ্জুর আকর্ষণবিকর্ষণে ললিত অঙ্গ সঞ্চালিত হইতেছে, সুমধুর বলয়-কঙ্কণ-নিক্কণে দৃশ্যটী কি মনোরম! ঐ জল পান করিয়া, শরীরের স্বাস্থ্য কতই না পূর্ণতা লাভ করে। বাঙ্গালি! অঞ্জলি ভরিয়া, ঐ জল পান কর, তৃষা মিটিবে। কিন্তু আমার? ও জলে ত আমার তৃষা মিটে না। আমি চাই—ফটিক জল!

মানব! এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে কত নদ, কত নদী, কত হ্রদ কত জলধি, কত কূপ কত সরোবর, কত জলপ্রপাত কত নির্ঝর বিরাজিত! স্থল অপেক্ষা জলভাগই অধিক—যে দিকে চাই, কেবল জল। কিন্তু এত জল থাকিতেও আমা হেন একটী অতি ক্ষুদ্র পক্ষীর তৃষা মিটে না। এ জল আমি চাই না—চাই না। এখন আর একবার আমার সঙ্গে এস। দারুণ নিদাঘ! মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে ব্রহ্মাণ্ড যেন ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি কাতরকণ্ঠে বলিতেছ;—

'একি গুমটের দাপ,
একি গুমটের দাপ।
ছাতি ফেটে প্রাণ যায়,
বাপ বাপ বাপ।'

তোমার প্রাণ বিপর্য্যস্ত; দারুণ তৃষায় বলিতেছ;—

'সঘনে বদনে সবে বলিছে কেবল।
দে জল, দে জল, বাবা।
দে জল দে জল।'

ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে উত্তর পশ্চিমাকাশে নবনীলনীরধর কেমন সুন্দর মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। ঐ দেখ, সহচর পবন, কেমন জলধরের আগমনের পূর্ব্বেই বিষম আবর্ত্তে চারিদিক ঝাঁটাইয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, নীলিম নীরদ দেখিতে দেখিতে ঘনঘোর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। প্রকৃতি রাণী, ঘোর তমোময় কৃষ্ণবসনে অঙ্গ ঢাকিতেছে। ঐ দেখ, সোহাগিনী সৌদামিনী, মেঘের কোলে বসিয়া, এক একবার প্রেমানুরাগে মধুর হাসি হাসিয়া, আপনার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যে ত্রিভুবন উজ্জ্বল করিতেছে। ঐ দেখ, পরক্ষণেই—সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত প্রেমিক জলধর, বিকট অট্টহাস্যে জগৎকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। জীবশ্রেষ্ঠ মানব! তুমি ত এ সময়ে স্বীয় কক্ষের দ্বার গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া আপন প্রাণভয়েই অস্থির। চপলার এই যে, অনুপ লীলা-খেলা—মধুর হাসি—প্রেমের প্রাণের হাসি, তুমি স্বচক্ষে তাহা একবার দেখিতেও সাহস করিতেছ না! তুমি ভাবিতেছ, আজি কি দুর্দ্দিন। কিন্তু তোমাদেরই একজন কবি গাহিয়াছেন ;—

'তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদ্দিনে হরি-কথাহতং।
ন খলু দুর্দ্দিনং তদেব যদ্দিনে ঘনঘনাবৃতং॥'

কিন্তু তোমার এই দুর্দ্দিনে আমার সুদিন। আজি আমার কি আনন্দ! তুমি জীবশ্রেষ্ঠ মানব হইলেও খড়খড়ির পাখী খুলিয়া একবার দামিনীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখিতেও সাহস করিতেছ না, কিন্তু এই দেখ, আমি ক্ষুদ্র পাখী, কেমন মহানন্দে সাহসভরে বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া—পক্ষবিস্তার করিয়া, শূন্যে উঠিতেছি—সঘনে বদনে বলিতেছি—ফটীক জল! এই জলদ-চপলার প্রেমখেলার সঙ্গে সঙ্গে যে বিন্দু বিন্দু বারি পড়িতেছে, এই দেখ, ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে পান করিতেছি, সেই অমৃত-বিন্দু ফটীক জল। চাহিতেছি—ফটীক জল! এজগতে অনন্ত জলরাশি থাকিলেও আমার সম্বল কেবল এই—ফটীক জল! এই জলেই আমার তৃষা মিটে।

বাঙ্গালি! বিজাতীয় সমুচ্চ শিক্ষায় তোমাদিগের মস্তিষ্ক এখন প্রসারিত, বক্ষঃ স্ফীত, গর্ব্ব-গৌরবে হৃদয় উদ্বেলিত। তোমরা ত জগতের ইতিহাস—প্রত্যেক জাতির ইতিবৃত্ত পড়িয়াছ। জগতের প্রত্যেক দেশের মানচিত্র এখন তোমাদের চক্ষের সমক্ষে যেন প্রতিফলিত। চল দেখি, একবার কল্পনা-যানারোহণে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসি। ঐ দেখ—নব অভ্যুত্থিত আমেরিকা-য়ুরোপ, আর ঐ দেখ, প্রাচীন পতিত এসিয়া—আফ্রিকা। ঐ দেখ—অগণিত জাতি, অগণিত ভাষা। কিন্তু দেখ প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকলেই মাতৃভাষার সেবক—সকলেই মাতৃভাষানুরাগী—মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ব্রতী। দেখাও দেখি, ইহাদিগের মধ্যে এমন একটী জাতি, যে জাতি মাতৃভাষার বক্ষে পদাঘাত করিয়া, কেবলমাত্র বিজাতীয় ভাষার সেবা করিতেছে? দেখাও দেখি এমন একটী জাতি—উন্নত হউক বা পতিত হউক, শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিত হউক, সভ্য হউক বা বন্য বর্ব্বর হউক, যে জাতি মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণে আপনাদিগকে 'শিক্ষিত' বলিয়া দর্প করা দূরে থাকুক, 'মনুষ্য' বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত? পারিবে কি? কখনই না। জগতে তোমাদের মত পতিত, পরাধীন, পরপদদলিত জাতিও আছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও মাতৃভাষা-হত্যাকারী কুপুত্র দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তোমরা সোণার বাঙ্গালার বাঙ্গালী!—তোমরা?—সত্য বলিতে কি তোমরা এ বিশ্বের এক প্রকার অদ্ভুত

জীব। অনন্ত-হীরকালঙ্কার-মণ্ডিত আর্য্যভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তোমার নিকট 'অশিক্ষিত' 'মূর্খ,' আর বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তোমরা গর্ব্বিত! কিন্তু পাঁচ পল ধরিয়া, মাতৃভাষায় কথা কহিতে বসিলে, তোমরা কুড়িটা বিজাতীয় শব্দরূপ অম্ল উদগার করিয়া ফেল! মাতৃভাষায় দুই ছত্র লিখিতে হইলেই তোমাদের গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়—তোমাদের সিদ্ধহস্ত কম্পিত হইতে থাকে, তখন তোমাদের লেখনী, মসী সহযোগে দশ গণ্ডা বিজাতীয় অণ্ড প্রসব করিয়া বসে! মনে কি কিছুমাত্র ঘৃণা হয় না?—ধিক্কার বোধ হয় না? তোমরা অম্লানবদনে দর্প কর যে, তোমরা 'শিক্ষিত'! এখন বল দেখি, জগতে কি এমন আর একটী জাতি আছে, যে জাতি, তোমাদের মত ভিন্ন-ভাষা-ভাষী হইয়া, এইরূপ আত্মগৌরব (রৌরব) অনুভব করে? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ঐ যে তোমার গো-শালায় কপিলা রহিয়াছে, ঐ পশুও ত 'হাম্বা' রব ছাড়িয়া, 'ঘেউ ঘেউ' করিতে চেষ্টা করে না। ঐ যে তোমার টেবিলের নিম্নে—তোমার পদতলে বুলটেরিয়ার লাঙ্গুল নাড়িতেছে, ঐ পশুও ত কখন 'ঘেউ ঘেউ' ছাড়িয়া, 'মেও—মেও' ডাকার চেষ্টা করে না। আর ঐ যে, সরস-বসন্তে-বিকচ কিশলয়-শোভিত শাখায় বসিয়া, 'বউ কথা কও' বলিয়া পাখিটী মানিনী বধুর মান ভাঙ্গিতেছে, ঐ পাখীও ত কখন কোন রূপবতী রমণীর সমুজ্জল রূপ দর্শনে বলে না—'চোক গেল!' জগতের প্রত্যেক জাতি যাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন কি কোন পশুপক্ষীও যাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে, তোমরা বাঙ্গালি! আজি তাহাই করিতেছ! তোমরা কেবল মানবাধম নহ—পশুপক্ষীরও অধম। ছি! কবে তোমাদিগের আত্মসম্মান বোধ হইবে? কবে তোমরা বুঝিবে যে, মাতৃভাষার সেবা—মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত জগতে ব্যক্তিগত—জাতিগত উন্নতি হয় না—মনুষ্য নামে পরিচয় দিবার অধিকার জন্মে না?

অবশ্য এখন তোমরা বিজিত, সুতরাং রাজভাষার সেবা অপরিহার্য্য, কারণ তাহা অর্থকরী ভাষা। যত পার, রাজভাষার সেবা কর, কোন আপত্তি নাই। কেবল রাজভাষা কেন? জগতে যত ভাষা আছে, সকল ভাষারই চর্চ্চা কর, আপত্তি নাই। সকল ভাষা হইতেই অলঙ্কার সঞ্চয় করিয়া মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য—অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি কর। মাতৃভাষাকে অযত্নে অনাদরে অবজ্ঞায় দূরে রাখিয়া, কেবল বিজাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়সূত্রে ব্যক্তিগত পশুত্ব ব্যতীত জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এ জগতে মাতৃদ্রোহীর সুখশান্তি কোথায়? আমি ক্ষুদ্র পক্ষী চাতক, জগতে অনন্ত জলরাশি থাকিলেও আমার যেমন একবিন্দু ফটিক জল ব্যতীত তৃষা মিটে না, সেই মত এ জগতে প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক জীবের তৃষা মাতৃভাষা ব্যতীত কখনও মিটে না। কিন্তু 'শিক্ষিত' বাঙ্গালি! তোমার? তোমার যদি বিন্দুমাত্র বিবেক-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কখনই আপনাকে আজি 'শিক্ষিত' বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতে না। কবে তোমাদের চৈতন্য হইবে? কবে বিমাতার বিষাক্ত ক্রোড় ত্যাগ করিয়া স্বীয় জননীর প্রীতি-পুণ্যপ্রদ পদতলে পড়িয়া, 'মা!—মা!' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে শিখিবে?

যাইবার সময় একটা নিধুর টপ্পা শুনাইয়া যাই। ও কি? টপ্পার নামে তোমার নৈতিক জ্ঞানে বিষম সংঘাত পড়িল নাকি? যখন বোকেসিওর 'ডিকামিরণ' বা বাইরণের 'ডন-যুয়ান' পড়, তখন নৈতিক জ্ঞানটা আণ্ডামানে চলিয়া যায় না কি? ভাল, টপ্পার

শেষটা না হয় শুন। তোমাদের কবি গাহিয়াছেন ;—
'নানা দেশে নানা ভাষা, বিনা স্বদেশীয় ভাষা,
মিটে কি তৃষা ?'

প্রতিদিন একবার করিয়া এই গানটী গাহিও।—ফটিক জল!

পূর্ণিমা।

(১)

অপিসে, ম্যানেজার সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পাইয়া, নবগোপাল বাবু যে আনন্দটুকু পাইয়াছিলেন, পাঁচটার পর বাড়ী ফিরিয়া, বজ্রপাত সদৃশ একটা সংবাদে তাহা বিশেষ রূপে চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার অত্যন্ত আদরের, অত্যন্ত সুরূপা একমাত্র কন্যা, পাড়ার ছেলে অখিলের সহিত কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমার পাঠকবর্গের মধ্যে কাহার কাহার মনঃক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমার গল্প অসম্পূর্ণ থাকিবার ভয়ে আমায় একটী সত্য কথা ব্যক্ত করিতে হইবে। সে কথাটী এই যে, নবগোপাল বাবুর কন্যা শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবীর বয়স ছয় বৎসরমাত্র এবং সে যাহার সহিত নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই অখিলের বয়স সাত বৎসরের বেশী নহে।

নবগোপাল বাবু, অল্পদিন পূর্ব্বেই কলিকাতায় বাসগৃহ স্থাপন করিয়া, তথায় পল্লীগ্রাম হইতে স্বামিসুখকামিনী গৃহিণীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান পূর্ণিমা আসিয়াছিল। অখিল কলিকাতার ছেলে; সে নিকটবর্ত্তী স্থলের রাস্তা সমুদয় বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। সেই দিন রাস্তার ধারে, তাহারা উভয়ে একত্রে খেলা করিতেছিল। সেইদিন নবগোপাল বাবু গৃহিণীকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেও, গৃহিণী বহির্দ্বার অর্গলবদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং বামুন ঠাকুরুণের দেশের বাড়ীতে পাঁচ গণ্ডা বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে একবার সিদ দিয়া চোর ঢুকিয়াছিল এবং কিরূপে তত বড়লোক সামান্যা ব্রাহ্মণীর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই বিষয় শুনিবার জন্য এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন যে, কন্যার নিম্নতলে আগমন এবং অখিলের সহিত তিন দিন "আড়ির" পর অত্যন্ত "ভাব" হওয়ার সংবাদ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই।

কাপড় পরিবর্ত্তন না করিয়া, মুখে জল না দিয়া, অধিক কি রোরুদ্যমানা গৃহিণীকে সান্ত্বনা পর্য্যন্ত না করিয়া, কন্যার অনুসন্ধানে নবগোপাল বাবু গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। প্রথমেই তিনি অখিলদিগের বাটীতে গেলেন। তথায়, অখিলের পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু অখিলের পিতা, পুত্রের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে এত [illegible]রূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, উদ্বিগ্ন নবগোপাল বাবু তাঁহার নিকটে আশানুরূপ সহানুভূতির আশা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিশুষ্ক মুখে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

কোথায় যাইবেন? কিরূপে কন্যার অনুসন্ধান পাইবেন? নবগোপাল বাবুর চোখে জল আসিল। একবার নিকটবর্ত্তী রাস্তা সকল পরিভ্রমণ করিলেন, আবার—"বুঝিবা

পূর্ণিমা বাটীতে এতক্ষণ ফিরিয়াছে,” ইহা ভাবিয়া বাটীতে ফিরিয়া গৃহিণীর কণ্ঠাগত প্রাণকে আরও উৎকণ্ঠিত করিয়া দিলেন।

বাটীর নিকটে একটা রাস্তায় অখিলকে দেখিয়া নবগোপাল বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অখিল! অখিল! পূর্ণিমা কোথায়?” অখিল অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিল “জানি না।”

“সেত তোমার সঙ্গেই গিয়াছিল?”

“গিয়াছিল—কিন্তু অনেকক্ষণ হ’ল সে আমাকে একলা ফেলে চলে এসেছে।”

অন্য কোনও উপায় নাই দেখিয়া নবগোপাল বাবু ভিন্ন ভিন্ন থানায় সংবাদ লইতে লাগিলেন; এবং অবশেষে অত্যন্ত অবসন্ন চিত্তে রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী ফিরিয়া দেখিলেন যে, গৃহিণী তাঁহার জন্য আহার সজ্জিত করিয়া হাস্যমুখে বসিয়া আছেন। এবং উপাধানে একটী মাথা চুলের উপর মাথা রাখিয়া এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর নব নবনীতসদৃশ দেহখানি ঢালিয়া শুইয়া আছে—পূর্ণিমা!

রাত্রি আট্‌টার সময়, কোলে করিয়া একটী বালক তাহাকে রাখিয়া গিয়াছে। বালক অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং তাহার বয়স ষোল বৎসরের বেশী হইবে না। তাহার কোথায় বাড়ী এবং কি নাম জানিয়া লওয়া হয় নাই।

(২)

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী আপিসের বড় কেরাণী বাবু অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার নবসংগৃহীত এবং এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ফল জানিবার জন্য আগত বালকগণ কর্ত্তৃক তিনি এত উৎপীড়িত হইতেছেন যে, ফুটবল খেলিয়া বাটী প্রত্যাগমনের সময় যখন যোগেশচন্দ্র আপন পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং যোগেশচন্দ্র যখন নিজের নাম বলিয়া পরীক্ষার ফল জানিতে চাহিল, তখন তিনি রুক্ষভাবে বলিলেন, “তোমার জন্য আমি আর সমস্ত কাগজ এই অবেলায় তল্লাস করিতে পারিব না; আগামী পরশ্ব যখন গেজেটে বাহির হইবে তখন জানিতে পারিবে।”

যোগেশচন্দ্র অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, “মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমি তত উদ্বিগ্ন নহি; মা আমার পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই আসিয়াছি; তিনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, নিশ্চিত তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। আপনার বেশী পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হইবে না, বোধ হয় প্রথম পাতার উপরেই আমার নাম দেখিতে পাইবেন।”

যোগেশচন্দ্র যখন কথা কহিতেছিল, তখন তাহার বলিষ্ঠ ও সুগঠিত অবয়বগুলি, কেরাণী বাবু বিস্মিতের ন্যায় লক্ষ্য করিতেছিলেন, এখন সেই মাতৃভক্ত বালকের স্থিরভাবে ব্যক্ত নিশ্চয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এবং অবিলম্বে তালিকা খুলিয়া দেখিলেন যে, প্রথম পাতার শীর্ষদেশে সেই বালকের নাম লিখিত রহিয়াছে। যোগেশচন্দ্র পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বালকের বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কেননা, রাস্তায় কতকগুলি কৌতূহলাক্রান্ত পথিকের দ্বারা বেষ্টিত ক্রমাগত ক্রন্দনের দ্বারা অবসন্ন পূর্ণিমাকে দেখিয়া, বহু অনুসন্ধানের পর তাহার বাটীর সন্ধান পাইয়া, তাহাকে বাটীতে পৌছিয়া দিতে হইয়াছিল। বাটী ফিরিয়া পুত্রের প্রত্যাগমনপথাবলোকনকারিণী জননীকে পরীক্ষার ফল জানাইয়া, পুত্রগৌরবে গৌরবান্বিতা মাতাকে সুখী করিয়া, যোগেশ বিশেষরূপে সুখী হইতে পারিয়াছিল।

(৩)

বিচিত্র বাগানের মাঝে প্রশস্ত সরোবর। সরোবরের ধারে একখণ্ড কোমল তৃণাবৃত

ভূমিতে বিদ্যালয়ের বালকেরা আসিয়া প্রত্যহ বিকালবেলা খেলা করিত।

একদিন এক যুবক তাহার দুই শিশু ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় ভ্রমণ করিতেছিল। খোলা যায়গা পাইয়া শিশু দুইটী অত্যন্ত আনন্দের সহিত দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। একটী বাতায়নে বসিয়া পূর্ণিমা তাহা দেখিতেছিল।

আমরা প্রথম দুই অধ্যায়ে যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলাম, এই পরিচ্ছেদের ঘটনাটী, তাহার দুই বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। তখন পূর্ণিমার বয়স আট বৎসর।

সে, জানালার দুইটি লৌহ-শলাকার মধ্যে মুখ রাখিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে সেই দুইটি শিশুর খেলা দেখিতেছিল; বুঝি, তাহাদের খেলায় যোগ দিবার জন্য সে ব্যাকুল হইতেছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়াছিলেন, এজন্য সে আর গৃহের বাহিরে যাইত না।

ভয়বিহ্বলা হইয়া সহসা সে জানালা ত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অত্যন্ত কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া, তাহার মাতা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই সরোবরের ভিতর সেই ক্রীড়ারত শিশু দু'টির মধ্যে একটি পড়িয়া, জলমগ্ন হইয়াছে।

মাতা জানালার নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, সরোবরের চারি দিকে বহুসংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে আর জলের মধ্যে এক স্থানে বুদ্বুদ উঠিতেছে। সেই যুবকটি অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কণ্ঠপর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ভ্রাতার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে এবং কাতর স্বরে দর্শকগণের নিকট সাহায্য চাহিতেছে। হায়! হায়! কি হইবে? মাতা অধীর হইয়া গৃহ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; নিমজ্জিত শিশুর মুখচ্ছবি যেন আপন কন্যার মুখে দেখিতে পাইলেন। যদি তাঁহার একটি বাহুর বিনিময়ে সেই শিশুর উদ্ধার সাধন সম্ভব হইত, তাহা হইলে, তিনি অক্লেশে তাহা দান করিতে পারিতেন।

পূর্ণিমা ভাবিল—কিন্তু কি ভাবিল তাহা আমরা বলিতে পারিব না—তাহার ভাবনার "কূল কিনারা" ছিল না। প্রাণ, সেত অতি সামান্য জিনিষ, প্রাণের অপেক্ষা যদি কিছু প্রিয়তর জিনিষ থাকিত, তবে তাহাও দান করিয়া সে নিমগ্ন বালকের জীবন-রক্ষা করিত।

ধীরে, অত্যন্ত ধীরে, একটি যুবক আসিয়া সরোবরের সোপানে বসিল, পদদ্বয় হইতে জুতা অপসারিত করিল, অঙ্গরাখা উন্মোচন করিয়া সোপানে রাখিল।—কি প্রশস্ত বক্ষঃ! কিবা বলবিজড়িত সুগঠিত বাহু!—প্রস্তর খোদিত করিয়া, তাহা যেন অত্যন্ত সুনিপুণ ভাস্করে গঠিয়াছিল।

পরক্ষণে, উত্তরীয়খানি হস্তে লইয়া যুবক জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল একটি যুবক সরোবরের গভীর জলে নিমগ্ন হইল। মুহূর্ত্তগুলি পঞ্জর মধ্যে মুদ্গরাঘাত করিয়া চলিয়া গেল; দর্শকগণের উৎকণ্ঠা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল; তথাপি নিমজ্জিত যুবককে সরোবরতল হইতে উঠিতে দেখা গেল না।

না, না। দেখ, দেখ, সরোবরের মধ্যদেশে কে ভাসিয়া উঠিয়াছে? কে অসীম শক্তিতে জলরাশি বিভিন্ন করিয়া সন্তরণ দিতেছে? আবার দেখ, উত্তরীয় বদ্ধ হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে কে শুইয়া রহিয়াছে। দর্শকগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমগ্ন শিশুর প্রাণরক্ষা হইল।

এ যুবক কে? পূর্ণিমার মাতা তাহাকে চিনিয়াছিলেন; দুই বৎসর পূর্ব্বে, সে, তাঁহার পূর্ণিমাকে, তাঁহার কোলে দিয়া গিয়াছিল।

জানালার নীচে কে একজন পথিক আর একজনকে বলিল "ওকে চেন না? ও প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; গত পরীক্ষায় ও একেতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল; ওর নাম যোগেশ।"

পূর্ণিমা মাতাকে বলিল, "মা, ওর নাম যোগেশ।"

(৪)

আরও দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আর, তোমরা আশ্চর্য্য হইও না—পূর্ণিমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ হইয়াছে? কাহার সহিত? বল দেখি কাহার সহিত বিবাহ হইল? তোমরা গল্প শুনিতে বসিয়া আপনাদের কথা ভুলিয়া যাও। আপনাদের বাস্তব জীবনে যেটা খুব অসম্ভব বলিয়া মনে কর, উপন্যাসে তাহাই সম্ভাবিত হইবার আশা কর। তোমরা হয় ত মনে করিবে যে, যোগেশের সহিত নিশ্চিত পূর্ণিমার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আর, তা' যদি না হইয়া থাকে—কেন না যোগেশ কি জাতি, তাহা তোমরা জান না,—তাহা হইলে, স্বজাতি অখিলের সহিত না হইয়া যায় না।

আরে না, না। ও রকম কিছুই হয় নাই। পূর্ণিমার বিবাহ হইয়াছিল, কাকডাঙ্গার স্থূলকায় জমীদারের কৃশকায় পুত্র শ্রীমান অনিল প্রকাশ চৌধুরীর সহিত। আর এ বিবাহে, মৃদুহাসিনী, কচিৎ বা কলহাস্যে কলকলায়মানা সখিগণের সঙ্গীত-সুধার পরিবর্ত্তে, কর্ণবিবরে অনবরত ধ্বনিত হইয়াছিল, অর্দ্ধ-উলঙ্গ মুচিগণের করফলক-ধৃত-বেত্র-ধ্বনিত ঢক্ক।

বিবাহের তিনমাস পরে আশ্বিন মাস আসিল এবং তাহারই সহিত হসিত এবং নববস্ত্রপরিহিত দুর্গোৎসব আসিয়া, শূন্য পল্লিগৃহগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। "ধুলা-পায়ে লগ্ন" করা ছিল, এজন্য পূর্ণিমার শ্বশুর মহাশয় অতি সহজে প্রস্তাব করিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের বাটীতে দুর্গোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী বধূমাতাকে অতি অবশ্য পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, নবগোপাল বাবু এই প্রস্তাব-অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন।

পূর্ণিমাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুর মহাশয় নবগোপালবাবুর পল্লীগ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্থূলদেহ দেখিয়া, পূর্ণিমার মাতা একটা ঢাকাই জালার মুখে একটা ছোট কলসী উপুড় করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কলসীটিতে চূণ ও কয়লা দিয়া, চুল, চোক, নাক, মুখ ইত্যাদি আঁকিয়া এবং জালাটির গলদেশে একটী কোঁচান উড়ানি ঝুলাইয়া দিয়া এবং মধ্যদেশে একখানি কোঁচান কাপড় পরাইয়া, বেয়াইএর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়াছিলেন এবং থালে নানাবিধ আহার সজ্জিত করিয়া বেহাইএর সম্মুখে যেমন, তেমনই ঐ জালার সম্মুখে রাখিয়া অন্তরালে থাকিয়া, ঝিয়ের গায়ে ধাকা দিয়া অত্যন্ত হাসিয়াছিলেন।

এই রহস্যের সময়, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, পরদিন সকাল বেলা কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়া তাঁহার কত অধিক কাঁদিতে হইবে। মাতাকে কাঁদাইয়া, পিতাকে কাঁদাইয়া, আপনি কাঁদিয়া, শ্বশুরের সহিত পূর্ণিমা নৌকা চড়িয়া বন্দর নামক গ্রামে আসিল। সেখানে ট্রেণ পাইতে হইবে।

পূর্ব্বে গাড়ি "রিজার্ভ" করা হয় নাই। খালি গাড়ি পাওয়া যাইবে কি না তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত স্থূলকায় মহাশয়ের বড়ই সন্দেহ ছিল। সঙ্গে পুত্রবধূ এবং পুত্রবধূর বাক্সপূর্ণ অলঙ্কার, এজন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু, গাড়ি আসিবামাত্র যখন দেখিতে পাইলেন, একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা সম্পূর্ণ খালি, তখন আর তাঁহার আহ্লাদের সীমা ছিল না।

তিনি তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র, ঝি-চাকর ও পুত্রবধূ লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু ও কি!! কোথা হইতে তাঁহার চোখের সম্মুখে একখানি হাত,—অতি স্পষ্ট হাত ঝুলিয়া পড়িল? তিনি ভীত হইয়া গ্যাঁ গ্যাঁ—শব্দ করিয়া, স্থূল উদর পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভীতি-জনিত শব্দ শুনিয়া, ঝি ও চাকর উভয়েই চীৎকার করিয়া উঠিল এবং পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলিল।

যিনি ব্যাঙ্কের উপর অদৃশ্য হইয়া শুইয়াছিলেন, এবং যাহার ঘুমঘোরে শিথিল হস্তখানি ব্যাঙ্ক হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, সহযাত্রিগণের চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং এইরূপ অস্বাভাবিক চীৎকারের কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য তিনি দ্রুত "ব্যাঙ্ক" হইতে নামিয়া পড়িলেন।

তিনি নামিবামাত্র, পূর্ণিমার শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল, গাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে।" পূর্ণিমা ডাকাতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—এ কে?—যোগেশ!!

(৫)

যোগেশ পূর্ণিমার শ্বশুরকে অভয় দিল। বলিল, "আমি ডাকাত নহি; যাত্রী মাত্র। আপনাদের আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি এই গাড়িতে উপরের বিছানায় শুইয়াছিলাম; আপনারা উঠিবার সময় জানিতে পারেন নাই যে, আমি এই গাড়ীতেই আছি; এজন্য হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন।" কিন্তু চোরা ত ধর্ম্মের কাহিনী শুনিল না। জমীদার মহাশয় বাক্স খুলিয়া একটি ছয়নলা পিস্তল বাহির করিলেন।

এইবার যোগেশচন্দ্র বুঝিল যে, আপনার প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ যেমন শীঘ্র চমকিত হয়, তেমনই শীঘ্র যোগেশচন্দ্র পিস্তলটি কাড়িয়া লইলেন; দেখিলেন, তাহার ছয়টি রন্ধ্রেই টোটা রহিয়াছে। পিস্তলটি শূন্য করিবার উদ্দেশ্যে যোগেশচন্দ্র হাত বাড়াইয়া গাড়ীর বাহিরে ছয়বার ছয়টি আওয়াজ করিলেন। পূর্ণিমা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল যে, সেই আওয়াজের সঙ্গে ছয়বার ছয়টি টেলিগ্রাফের তারের উপর উপবিষ্ট পক্ষী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল।

শূন্য পিস্তলটি যোগেশ ফিরাইয়া দিল এবং বলিল, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আত্মরক্ষার জন্য আমার এইরূপ অভদ্রতা করিতে হইল।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী আসিয়া একটি বড় ষ্টেশনে থামিল। সেখানে সাহেব ষ্টেশনমাষ্টার এবং সেখানে গাড়ী বিশ মিনিট কাল অবস্থিতি করিবে।

পূর্ণিমার শ্বশুর ছুটিয়া গার্ড সাহেব ও ষ্টেশনমাষ্টার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া এবং সেলামের সহিত "যথাসম্ভব কাঞ্চনমূল্য" সেলামী দিয়া, কিরূপে তাহার গাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া এবং হাতে যাহা ছিল, তাহা পকেটে রাখিয়া ষ্টেশনমাষ্টার এবং গার্ড উভয়েই তাঁহার সহিত তাঁহার গাড়ীর নিকট আসিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে 'ওই যে, যে গাড়ীর একটি কোণে বসিয়া একখানি পারসী পুস্তক পাঠ করিতেছে, ওইই ডাকাত।" সাহেবেরা কিন্তু প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই যে, ডাকাতের চেহারাটা ঐরূপ হইবে। তথাপি তাঁহাদের পকেটে যাহার ভার অনুভব করিতেছিলেন তাহার মহিমায়, যোগেশচন্দ্রকে তাঁহারা ডাকাত বলিয়াই সাব্যস্থ করিয়া লইলেন।

তাহারা যোগেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া হিন্দিভাষায় বলিলেন, "চলা আও, নিকাল শালা ডাকু।"

যোগেশচন্দ্র পারসী পুস্তকখানি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনারা কাহাকে গালি দিতেছেন।"

"তোমাকে।"

"কিন্তু আমাকে যে অকারণ গালি দেয়, তাহাকে আমি এইরূপে পুরস্কৃত করি," এই কথাগুলি বলিতে বলিতে যোগেশচন্দ্র গাড়ীর বাহিরে আসিল; এবং কথাগুলি সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহেব দু'টীর গণ্ডের সহিত তাহার মুষ্টির এরূপ সুখসংস্পর্শ ঘটিল যে, তাঁহারা তাহাতে বিভোর হইয়া প্ল্যাটফরমে ঢলিয়া পড়িলেন।

ষ্টেশনে একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। ষ্টেশনের সকল লোক মিলিয়া যোগেশচন্দ্রকে 'গ্রেপ্তার' করিল। পুলিশের লোক আসিল; তদন্তের ধুম পড়িয়া গেল। ইহার ফলে পূর্ণিমার শ্বশুরকে মালপত্র ও ঝি-চাকর লইয়া সেইখানেই নামিতে হইল; কেননা তাঁহার "জবানবন্দী" লওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহার পক্ষে এই ঝঞ্ঝাট্‌টা এত বেশী বোধ হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও ডাকাত ধরাইয়া দিবেন না, যদি দেন, তাহা হইলে তিনি—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংবাদপত্র পাঠে আমরা পরে অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, জজ সাহেব যোগেশ চন্দ্রকে মোটেই ডাকাত বিবেচনা করিতে পারেন নাই, বরং পুলিশের কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সাহেবদিগকে প্রহারের জন্য যোগেশচন্দ্রকে মোটেই বিচারাধীন হইতে হয় নাই; তাঁহারা সেই সুগৌর "কালা আদমী"র মুষ্টিযোগগুলি "বেমালুম" হজম করিয়াছিলেন।

(৬)

বিদেশের অনিয়মে পূর্ণিমার শ্বশুর বাটী আসিয়াই পীড়িত হইলেন। পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। পূজায় কিছুমাত্র ধুমধাম হইল না; নিয়ম রক্ষা মাত্র হইল। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিল। পুরোহিত আসিয়া তিন দিন স্বস্ত্যয়নের পর মস্তকে শান্তি-জল দিল। গৃহিণী কালীঘাটে জোড়া-মহিষ মানিলেন। কিন্তু কিছুতেই সেই ভীম দেহ স্কন্ধে বহনের ভীতি আত্মীয়গণের মন হইতে বিদূরিত হইল না। এবং দুইদিন পরে সত্য সত্যই তাহাদিগকে সেই ভীম দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাইতে হইল। গৃহিণী একজন আত্মীয়ার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, অত্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এমন অলক্ষণা বউ ঘরে আনিলাম যে, কর্ত্তাকে দশ দিনও বাঁচাইতে পারিলাম না।"

শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবগোপাল বাবু কাকডাঙ্গার বাটীতে আসিলেন। শ্রাদ্ধের গোলযোগ মিটিলে, তিনি, জামাতা অনিলপ্রকাশের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, পূর্ণিমা বড় বালিকা, তোমরাও শোকে কাতর, এ সময় উহাকে আমি, আমার সহিত কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাই; তুমি কি বল? অনিল বলিল, "আমার অমত নাই; কিন্তু মাতাঠাকুরাণী কিছুতেই মত করিতেছেন না।" কাজেই ক্রন্দনমানা পূর্ণিমাকে রাখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একাকীই নবগোপাল বাবুকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল।

কিন্তু গিন্নী সেই অলক্ষণা পুত্রবধূকে ঘরে রাখিয়া যে অত্যন্ত বোকার কার্য্য করিয়াছিলেন, একমাস গত হইতে না হইতে তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। একটি প্রবল জ্বর আসিয়া তাহার দুর্ব্বল পুত্রটিকে এমন জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল যে, ডাক্তারগণ

তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দিহান্ রহিলেন না। স্বামী হারাইবার এক মাসের ভিতর একমাত্র বংশের প্রদীপকে হারাইয়া গিন্নীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন যে, বৈধব্যলক্ষণযুক্তা অলক্ষ্মা পুত্র-বধূকে গৃহে আনিয়া তাঁহার এই সর্ব্বনাশ হইল। এ পাপকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেওয়াই ভাল। হায়! হতভাগিনী নারি, কাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে? এ গৃহ কার? এক মাসের ঘটনায় একটী অপরিচিতা দশমবর্ষীয়া বালিকা এই গৃহের কর্ত্রী হইয়াছে; কাকডাঙ্গার সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। যে বহু বর্ষ ধরিয়া 'ঘরকন্না' করিল, যে গৃহখানি মনোমত করিয়া সাজাইল, সে—সে গৃহের আর কেহ নহে!

দাওয়ানজী কাতর স্বরে পূর্ণিমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন।

নরগোপাল বাবু কন্যার বৈধব্যের কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহত হইলেন। তিনি যদি নীচ প্রকৃতির লোক হইতেন, তাহা হইলে কন্যার গৃহে আসিয়া, তাহার অতুল সম্পত্তিতে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন। তাহা তিনি করিলেন না। কালেক্টার সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া, কন্যার সমস্ত সম্পত্তি "কোর্ট অভ ওয়ার্ডসের" হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কন্যার ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পিতামাতাকে দেখিবার জন্য পূর্ণিমা মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিত; কিন্তু সে সাধারণতঃ শ্বশুর বাটীতেই বাস করিত।

(৭)

বি, এ, পরীক্ষার পর মাতার আদেশক্রমে যোগেশচন্দ্র ভারতবর্ষের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। প্রায় চারি মাসকাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিল। তৎপরে দেশে ফিরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এম্, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল; একুশ বৎসর বয়সে সে লাটীন ও ইংরাজী পরীক্ষায় এম্, এতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল। বাইশ বৎসর বয়সে যোগেশচন্দ্র রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তি লাভ করিল।

সংবাদ শুনিয়া যোগেশের মাতার চোখে জল আসিল। বলিলেন,—"তোমার তখন ছয় বৎসর বয়স; তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায় শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, 'আমার আর কোন দুঃখ নাই; কেবল যোগেশকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিলাম না—এই দুঃখ' ভগবান্ জানেন যে, তাঁ'র মৃত্যুকালের এই দুঃখ আমি নিবারণ করিতে পারিয়াছি কিনা। তাঁহার আর এক সাধ ছিল; জীবিতাবস্থায় তিনি আমাকে তাহা বারবার বলিতেন। বলিতেন—'যোগেশকে বিলাত পাঠাইব।' এখন তুমি পুত্র, তাঁহার এই সাধ পূর্ণ কর। আমার অলঙ্কারগুলি লও—সমস্ত বিক্রয় কর; কেবল একখানি রাখিয়া দিও; তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে দিও। তোমার বৃত্তির অর্থ, এই অলঙ্কারবিক্রয়ের অর্থ এবং আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি যে নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্তই লও। লইয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ কর; বিলাত যাও। আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যতদিন না প্রত্যাগত হও, আমি ততদিন তোমার মাতুলালয়ে বাস করিব।"

যোগেশের মাতার এই কথাগুলি শুনিয়া তোমরা হয়ত বলিবে, ইহা ত হিন্দু-নারীর কথা নহে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহা সত্যই হিন্দুনারীর কথা। আমার এই ক্ষুদ্র গল্পে যদি কোথায় এক বিন্দু সত্য কথা থাকে, তবে তাহা এই

খানে আছে। যে হিন্দুশাস্ত্র অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে 'কলিতে সমুদ্র-যাত্রা' নিষেধ করিয়াছেন; সেই হিন্দুশাস্ত্রই বজ্রনির্ঘোষে বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন, 'পতিব্রতা সতী স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইবে।' যোগেশের মাতা স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইয়া যোগেশকে সমুদ্রযাত্রায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যোগেশ মাতার ইচ্ছানুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাত্রা করিল। তথায় ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইয়া এবং তথা হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ছয় বৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইল।

ছয় বৎসর বিদেশে অবস্থিতির জন্য যোগেশের সংগৃহীত অর্থ সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাহার পর যতদিন তাহার নূতনত্ব না যায়, ততদিন ব্যারিষ্টারি হইতেও অর্থ সমাগমের কোনও সম্ভব দেখিল না। কাজেই দেশে প্রত্যাগমনের পর হইতে, তাহার বড়ই অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। এই অর্থকষ্টের সময় তাহার এক বন্ধু তাহাকে সংবাদপত্রের একটী বিজ্ঞাপন দেখাইলেন;—কাকডাঙ্গা ষ্টেটের জন্য "কোর্ট অভ ওয়ার্ডের" অধীন একজন ম্যানেজার আবশ্যক, বেতন চারি শত টাকা। বন্ধু বলিলেন, 'তুমি এই কার্য্যটী গ্রহণ কর।' যোগেশ একজন বড় ইংরাজ ব্যারিষ্টারের নিকট হইতে সুপারিশ-পত্র লইয়া,বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং অত্যন্ত সহজেই নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইল

সে স্বপ্নেও জানিত না যে,এই কাকডাঙ্গার জমীদারই একদিন তাহাকে ডাকাত বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার এখনকার নারী-জমীদারটী একদিন পথহারা হইয়া তাহারই দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

ঝি আসিয়া বলিল, "ওগো, এবার সাহেব ম্যানেজার এসেছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাহাতে আর ভয় কি? এখন ত আমি ইংরাজি শিখিয়াছি।"

বাস্তবিক চাহিয়া দেখ, পূর্ণিমা ত এখন আর সে পূর্ণিমা নাই। সেই দশ বৎসরের মেয়েটী এখন একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। আতপ তণ্ডুল, নিরামিষ আহার বা অর্দ্ধাশনে সে যৌবনের জ্যোতিকে মলিন করিতে পারে নাই। শুভ্র কর্কশ বস্ত্র সেই যৌবনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হয় নাই। অবদ্ধ কেশরাশি দিয়া, অনলঙ্কৃত বাহু দিয়া, সে যৌবনের শোভা উছলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাম্বূল নহে,—যৌবন সে অধরকে রাগরঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল।

ঝি আবার বলিল, "এ সাহেব নাকি আগে বাঙ্গালী ছিল, পরে বিলাত গিয়া সাহেব হইয়া আসিয়াছে। ওগো! কি রূপ গো!"

পূর্ণিমার এই রূপের কথাটা ভাল লাগিল না। সে বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা হৃদয়কে বিলক্ষণ শাসিত করিয়াছিল। রূপের প্রলোভনটাকে সে প্রলোভন বলিয়া বুঝিতে পারিত। প্রলোভনকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

ঝি বলিতে লাগিল, "ও আগে বামুন ছিল, এখন পৈতা ফেলে সাহেব হ'য়েছে। সেই যে গো, সেই আমাদের কাঁঠালদিঘিতে যে বাগানবাড়ী আছে, সেইখানে ওই সাহেব থাকবে।"

পূর্ণিমা। তুই এত খবর কোথায় পেলি?

ঝি। কেন? আমি পূজার বাড়ীতে যাইনি বুঝি? সেইখানে ত্রৈলক্ষ্য ঠাকুর— পোড়ারমুখো, হতভাগা মিন্‌সে—

পূর্ণিমা। ত্রৈলোক্য ঠাকুরের কাছে শুনেছিস?

ঝি। নাগো না, তা'র কাছে শুন্‌তে যা'ব কেন? লোকের সঙ্গে যে দু'টা কথা কইব, তা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিন্‌সের সইবে না; বল্‌বে 'যা, যা, তুই এখানে কেন?' হাজার হ'ক তা'দের ত জাতের ভয় আছে, তা'রা সাহেবের ভাত খা'বে কেন? তাই সাহেব তা'দের ভাত খা'বার জন্য ঠাকুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। নেত্য ঠাক্‌রুণের মুখে তাই না শুনে—

কিন্তু ঝির এই কথাগুলা শুনিতে গেলে তোমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। পূর্ণিমা বুঝিয়া লইল যে সাহেবের দুইজন হিন্দু চাকর, ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া আহার করিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সাহেবের কতক পরিচয় ঝি শুনিয়াছিল।

ঝি চলিয়া গেল। পূর্ণিমা আপন মনে বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল—সেই বাল্যের কথা ভাবিল। সমস্ত অন্ধকার; সেই অন্ধকারে দুইটী বজ্রসদৃশ বাহু, নীলাকাশে বিদ্যুতের মত তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই বাহু আশ্রয় করিয়া একদিন পূর্ণিমা মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাতায়ন পথে, খিড়কীর সরোবরে তাহার দৃষ্টি পড়িল; সন্ধ্যার বাতাসে তাহার জল কাঁপিতেছিল; পূর্ণিমা সেই কম্পিত জলে, দুইটী সঞ্চালিত বাহুর ছায়া দেখিল। আকাশের দিকে চাহিল, সেখানেও সেই বাহুর ছায়া—দৃঢ় মুষ্টিতে পিস্তল ধরিয়া লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। বাহু, বাহু, পূর্ণিমারই আলিঙ্গন-লালসায় তাহা যেন চারিদিকে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে।

(৯)

একদিন গভীর রাত্রে পূর্ব্বোক্ত ঝি পূর্ণিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিল। পূর্ণিমা বলিল, "কেন?"

ঝি। দুলেপাড়ায় দুঃখীরাম সর্দ্দারকে, আর কাঁঠালদিঘিতে ম্যানেজার সাহেবকে খবর দেবার জন্য, ত্রৈলক্ষ্য ঠাকুর এখনই গেল।

পূর্ণিমা। কেন, কি হইয়াছে?

ঝি। কি হইয়াছে কি গো? আটজন দরোয়ানকে যে একবারে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে।

পূর্ণিমা। কে বেঁধেছে?

ঝি। ত্রৈলক্ষ্য ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির ছাদ হ'তে সব দেখেছে;—ঠাকুর বাড়ির ছাদ থেকে কাছারি বাড়ির সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণিমা। ত্রৈলোক্য ঠাকুর কাছারি বাড়িতে কি দেখেছে?

ঝি। তা'রা কুড়িজন গো কুড়িজন। কোথা দিয়ে ঢুক্‌লো তা' তা'রাই জানে। এতক্ষণ হয়ত খাজানাখানা সব লুটে নিলে।

পূর্ণিমা বুঝিল, খাজানাখানা লুট করিবার জন্য, কাছারি বাড়িতে কুড়িজন ডাকাত প্রবেশ করিয়াছে। বুঝিয়া ঝিকে বলিল, "এখনই আমার ঘরের সব আলো জ্বাল্‌। তারপর তরঙ্গিণী আর তুই দু'জনে মিলে অন্দর মহলের সকলকে জাগাইয়া দে। দেহুড়ীর দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখে আয়; আর দেহুড়ীতে যে পাহারা আছে তাহাকে বল্‌ যে, সদরের ও ঠাকুর বাড়ির সমস্ত চাকরকে যেন জাগাইয়া দেয়।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্দর বাড়ি, সদর বাড়ি ও ঠাকুর বাড়ির সমস্ত লোক জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রাণভয়ে, তাহাদের মধ্যে কেহই ডাকাতদিগের সম্মুখীন হইতে পারিল না। কেবলমাত্র জাগরিত হইয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে, লোহার দরজা ও লোহার সিন্দুক ভাঙ্গার যে শব্দ হইতেছিল, তাহা শুনিতে লাগিল। এই শব্দের মধ্যে সহসা এক বন্দুকের আওয়াজ হইল। সকলে মনে করিল, "সর্ব্বনাশ! ডাকাতেরা বোধ হয় কাহাকেও

গুলি করিয়া মারিল।" এই আওয়াজের অল্প সময় পরে, ত্রৈলোক্য ঠাকুর আসিয়া ঠাকুর বাড়ির দরজায় করাঘাত করিল, এবং বারংবার আহ্বান করিল।

কাহরও এমন সাহস ছিল না যে, দরজা খুলিয়া দেয়। সকলেই দরজার ছিদ্রে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া, সত্যই ত্রৈলোক্য ঠাকুর ডাকিতেছে বা ডাকাতদের কেহ ডাকিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। ত্রৈলোক্য ঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহে; ঠাকুর বাড়ির বাহিরে কোথায় একটা মই পড়িয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তাহা লইয়া, সে উপর তলার এক জানালায় সংলগ্ন করিয়া, উপরে উঠিয়া, খড়খড়ি খুলিয়া এবং একখণ্ড সার্সী ভগ্নের পর ভিতরের অর্গল উন্মোচন করিয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সহজে নিম্নে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র, ম্যানেজার সাহেব দুঃখীরাম সর্দ্দার এবং দুঃখীরামের পুত্র বীরচাঁদ, ঠাকুর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের সহিত মুখে-কাপড়-বাঁধা তিনজন বন্দীকৃত ডাকাত। ম্যানেজার সাহেবের বাহুতলে একটি দ্বিনলা বন্দুক ডাকাতদিগের মধ্যে একজনের জানুপ্রদেশ ভগ্ন হইয়াছিল। এই তিনজন ডাকাত, ঠাকুর বাড়ির কিছু দূরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া "ঘাট" রক্ষা করিতেছিল; এবং বিনা বাক্যব্যয়ে, ম্যানেজার সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে একটী কুঠারিতে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া, দুঃখীরাম, বীরচাঁদ এবং আট দশজন বলবান্ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া, অন্ধকারে অন্ধকারে, ম্যানেজার সাহেব কাছারি বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ডাকাতেরা সিন্দুক ভঙ্গ কার্য্যে এত নিবিষ্টচিত্ত ছিল এবং সেই কার্য্যের শব্দে তাহাদের কর্ণ এমন বধির হইয়াছিল যে, গৃহের বাহিরে, দূরে যে বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল, তাহা তাহাদের শ্রবণ-পথে প্রবেশ করে নাই। তথাপি, নিয়মানুসারে দুইজন ডাকাত ঘাটি ওয়ালাদের সংবাদ লইতে চলিয়াছিল। সহসা তাহারা ম্যানেজার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল, এবং তাহারা কিছুমাত্র শব্দ করিবার পূর্ব্বেই, তাহাদের মুখ বস্ত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকেও ঠাকুরবাড়ীর একটি ভিন্ন কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এইরূপে পাঁচজনকে বন্দী করিয়া, ম্যানেজার সাহেব লোকজন লইয়া, অত্যন্ত নিঃশব্দে ঠাকুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন দ্বারবানগণ ঊর্ণনাভের ন্যায়, আপন আপন উষ্ণীষ বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ হইয়া উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে। দুইজনকে তাহাদের বন্ধনমোচনের জন্য নিযুক্ত করিয়া, তিনি ডাকাতগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অবশিষ্ট লোককে নিযুক্ত করিলেন। ডাকাতগণের নিকট বন্দুক ছিল না, তাহারা আক্রমণকারীদিগের হাতে দুইটা বন্দুক দেখিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। অধিকন্তু আক্রমণকারীদিগের সংখ্যাও বেশী ছিল; কেননা দ্বারবানগণ মুক্ত হইয়া, এই আক্রমণে বিশেষ সহায়তা করিল। বলা বাহুল্য, সহজেই ডাকাতগণ ধৃত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্দর মহলে সংবাদ গেল যে, ডাকাতগণ ধৃত হইয়া পুলিশের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

কিন্তু সে রাত্রে আর কেহ নিদ্রা গেল না। সকলে মিলিয়া, যত দেশের যত ডাকাতির গল্প জানিত, তাহা রঞ্জিত এবং অতিরঞ্জিত করিয়া বিবৃত করিতে লাগিল।

(১০)

সংবাদ পত্রে কাকডাঙ্গার কাছারি বাড়িতে ডাকাত পড়ার সংবাদ শুনিয়া, নবগোপাল বাবু কন্যার বাটীতে আসিলেন। একদিন, তিনি কন্যার কাছে ডাকাতির বিবরণ শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "যোগেশ বাবুর শরীরে অসীম বল; তিনি একা তিনজন ডাকাতের সমকক্ষ।" পূর্ণিমার বক্ষের স্পন্দন সহসা স্থগিত হইয়া গেল। একবারে আত্মহারা হইয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যোগশ? যোগেশ বাবু কে বাবা?

নবগোপাল বাবু। তো'দের ম্যানেজার যোগেশ বাবুর নাম জানিস্ না?

পূর্ণিমা। তাঁ'কে আমরা জে, সি, আচার্য্য বলিয়া জানিতাম।

নবগোপাল বাবু। তিনিই যোগেশ বাবু। উনি একজন ব্যারিষ্টার—এ দেশেও সকল পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। ইনি ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর, ইঁহার সকল সংবাদ আমি লইয়াছিলাম। এমন পরোপকারী, উন্নত-হৃদয় লোক দেখা যায় না। আজ ইঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইঁহার মাতাঠাকুরাণীও ইহাঁর সহিত কাঁঠালদিঘির কুঠিতে বাস করিতেছেন।

পূর্ণিমা। ম্যানেজের সাহেবের মাও ম্যানেজার সাহেবের সহিত আছেন? কই তিনি ত একদিনও আমাদের সহিত দেখা করিতে আসেন নাই?

নবগোপাল বাবু। তাহার কারণ আছে, মা। তাঁ'র ছেলে বিলাত গিয়াছিলেন; তাঁহার জাত গিয়াছে; তাই তিনি সাহস করিয়া হিন্দুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারেন না।

পূর্ণিমা। আচ্ছা! তাঁহাকে এখানে আনিবার জন্য আজই আমি পাল্কি পাঠাইব।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যোগেশের মাতা পূর্ণিমার নিকট আসিলেন। মাতা সে মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন;—পূর্ণিমা যেন সত্যই পূর্ণিমা! সে জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

যোগেশের মাতাকে দেখিয়া পূর্ণিমা বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত কি কথা কহিবে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিল। যোগেশের মাতাও বড় বিব্রত হইলেন। কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। অভাগিনী বিধবাকে 'চিরসুখিনী হও' বলিলেত বিদ্রূপ করা হইবে। আমাদের দেশে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এক প্রথা প্রচলিত আছে। তাঁহারা প্রণামকারীর চিবুক আপন অঙ্গুলিগুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ চুম্বন করেন। যোগেশের মাতা ইহাও করিতে পারিলেন না,—তিনি হিন্দুর দেহ কিরূপে স্পর্শ করিবেন? কেবল বলিলেন, "মা, আপনার কি প্রণাম করিতে আছে? আপনি আমাদের প্রভু; আমরা আপনারই আশ্রিতা।"

ইহার পর, পূর্ণিমা একটি দুইটি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক কথা কহিল। পরদিন আবার আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। এইরূপে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপিত হইল। এইরূপে যোগেশের মাতার সহিত পূর্ণিমা প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিত। ম্যানেজার সাহেব স্থানান্তরে যাইলে, কখন বা পূর্ণিমা আপনি কাঁঠালদীঘির বাটীতে গিয়া যোগেশের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিত।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে আমি তোমা-দিগকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলিব। তোমরা নিকটে আসিয়া কাণ পাত। কথাটা এই যে, পূর্ণিমা প্রায় প্রত্যহ ম্যানেজার

সাহেবকে কোন অদৃশ্য স্থান হইতে দেখিত। দেখিয়া, দেখিয়া—দূর কর, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী এই কলঙ্কিনীর কথা আর তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই।

(১১)

কিন্তু পূর্ণিমা শুধু কলঙ্কিনা নহে;—সে চোর!—চুরি করিয়াছিল। ছি! ছি!

একদিন কাঁঠালদিঘির বাটী হইতে পূর্ণিমা চলিয়া আসিবার পর যোগেশ পল্লীগ্রাম হইতে বাটীতে প্রত্যাগত হইল। বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, এইখানে আমার একখানি ফটোগ্রাফ ছিল, কোথায় গেল?" মা বলিলেন, "তা'ত বলিতে পারি না।" বেলা তিনটার সময় এই ঘটনাটা ঘটিয়াছিল।

বেলা পাঁচটার সময় পূর্ণিমার আহ্বানানুসারে যোগেশের মাতা তাহাদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, পূর্ণিমা গৃহমধ্যে বসিয়া রহিয়াছে,—কি যেন ভাবিতেছে,—বড় অন্যমনস্ক। তাহার কোলের উপরে—সর্ব্বনাশ!—এ যে যোগেশের সেই ফটোগ্রাফ!

যোগেশের মাতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। উঠিবামাত্র তাহার ক্রোড় হইতে ছবিখানি পড়িয়া গেল। পড়িয়া তাহার আবরণের আয়নাখানি ভগ্ন হইল। আয়না ভঙ্গের শব্দের সহিত সে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল। ত্রস্তে, যোগেশের মাতার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহারও দৃষ্টি সেই ছবির দিকে। দেখিয়া, বেপমানা ধীরে ধীরে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। বুঝি মনে ভাবিল, 'পৃথিবি! তুমি এই লজ্জিতাকে লুকাইয়া ফেল। বজ্র! তুমি আকাশ হইতে নামিয়া এই অভাগিনী পাপিনীর মস্তক চূর্ণ করিয়া দাও।'

যোগেশের মাতা হিন্দু পূর্ণিমাকে স্পর্শ করিবার এবং তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ হস্ত দ্বারা পূর্ণিমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি যোগেশকে ভালবাস? না, না, 'ভালবাসা' কথাটায় সে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ব্যক্ত হয় না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যোগেশ শুনিলেন যে, পূর্ণিমা তাঁহার ছবিখানি লইয়া গিয়াছিল। কথাটা শুনিয়া অবধি তিনি বিমর্ষ হইলেন। তাহার পর এই ঘটনার ঠিক পনের দিন পরে কাছারী বাটী হইতে বাটী প্রত্যাগমনের পথে এক দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে একটি বস্ত্রমণ্ডিত পুলিন্দা দিল। পুলিন্দার উপরিভাগে তাঁহার নাম লিখা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে কি আছে? দাসীরা পূর্ণিমাকে 'বউরাণী' বলিত। বলিল, "বউরাণী ইহা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" যোগেশের ভীম-বাহুও পুলিন্দার সামান্য ভারে কম্পিত হইয়া উঠিল।

বাটীতে আসিয়া নিভৃতে বসিয়া যোগেশ পুলিন্দাটির আবরণ মুক্ত করিল। ভিতরে তাঁহার সেই ফটোগ্রাফ। কিন্তু ফ্রেমটি নূতন;—গঠন-পারিপাট্যে বিচিত্র, বহুমূল্য এক সুবর্ণনির্ম্মিত ফ্রেমে তাহা সংবদ্ধ। এক খণ্ড কাগজে ক্ষুদ্র একখানি পত্র ছিল;—

"মহাশয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনার ছবিখানি ফেরত পাঠাইলাম। ইহার ফ্রেম ভগ্ন হইয়াছিল, এজন্য নূতন ফ্রেম দিয়াছি। ইতি। প্রণতা পূর্ণিমা।"

এ ফ্রেমের কোথায় কি প্রেম লুকান ছিল তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই; কেন না আমরা প্রেমিক নহি। কিন্তু যোগেশচন্দ্র আপন গৃহখানি পূর্ণিমা-আলোকে আলোকিত করিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িল এবং কয়েক দিন চিন্তার পর কলিকাতায় যাইয়া নবগোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি সকল কথা বলিয়া বিধবা পূর্ণিমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। * * *

সমাপ্ত।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সভা।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

১৩১৪ সাল।

সভাপতি।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, এফ, আর, এ, এস, ই।

সহকারী-সভাপতিগণ।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই, মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ, আর, এস, এল, ব্যারিষ্টার এট্-ল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিত্তারত্ন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন, এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার (বঙ্গবাসী), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

অবৈতনিক সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সাহিত্য-সংহিতা-সম্পাদকদ্বয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ,

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শাখাসমিতি সকল।

(১) প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাস সমিতি।

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত জে, এন, দাস গুপ্ত বি, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ।

(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি।

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম, এ, ডি, এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর এস, ই।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত এ. চৌধুরী এম, এ, বারিষ্টার-এট-ল, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বারিষ্টার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি, এস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহা এম, এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর, এম, এ।

(৩) পরিভাষা-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহা এম, এ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাঁহাদুর, এম, বি, এফ, সি, এস, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ।

(৪) বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে,টি, এম, এ, ডি, এল।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, এফ, আর, এ, এস, এফ,আর,এস,ই, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন, এম, ডি,

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর।

(৫) সংস্কৃতভাষা-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে,টি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম,এ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমাপতি দত্ত পাণ্ডে শাস্ত্রী, বি, এ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম,এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সাতকড়ি অধিকারী এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর।

(৭) পালী এবং তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষা-সমিতি।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন,এবং শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ।

(৭) দর্শন-সমিতি।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। সভ্যগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ, আর, এস, এল, বারিষ্টার-এট ল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বারিষ্টার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম,এ, এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর।

(৮) ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই। সভ্যগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল,

এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার এট-ল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম,এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত জে, এন্, দাস গুপ্ত, বি, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম, এ,(অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী এম, এ, ব্যারিষ্টার এট ল। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম এ, ব্যারিষ্টার এট-ল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু এম, বি রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল, এফ, আর, জি, এস। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর

(৯) পত্রিকা-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। সভ্যগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু এম, বি রায় বাহাদুর, এস, সি, এস। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এফ, আর, এস, এল, ব্যারিষ্টার এট-ল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ। সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, এবং শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

(১০) পুস্তকালয়-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কবিরাজ অঘোর নাথ শাস্ত্রী, মাননীয় বিচার-পতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশু-তোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম, এ, ডি, এল এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস ই শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার [illegible] আনন্দ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কুমার

নাথ দে, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

(১১) গ্রন্থকার-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। সভ্যগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ এফ, আর, এস, এল, ব্যারিষ্টার এট ল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিন-বিহারী ঘোষ এম, বি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু বি, সি, ই, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে উপরিলিখিত একাদশটী শাখা-সমিতিতে উক্ত সভাপতি এবং সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ উক্ত পদ গ্রহণে সভাকে উপকৃত করিবেন।—সম্পাদক।

গত সাহিত্য-সংহিতার ১৬ পৃষ্ঠায় "ভালবাসার প্রতিফল" শীর্ষক আখ্যায়িকাটী ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড নামক [illegible]

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। **সাহিত্য-চিন্তা।** দ্বিতীয় সংস্করণ, বর্দ্ধিত ও সংশুদ্ধ। এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **ফলশ্রুতি।** সাহিত্য-চিন্তার পরিশিষ্ট। আর্য্যধর্ম্মে কর্ম্মফলবাদ যেরূপ, আর্য্যসাহিত্যে ফলবাদের তদ্রূপ গৌরব এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আর্য্য-সাহিত্যে অভিশাপ আছে, বিলাতী সাহিত্যে নাই কেন, এবং নাটকাভিনয় কিরূপ হওয়া উচিত প্রভৃতি অনেক নূতন বিষয়ও এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **কাব্যচিন্তা।** রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। **কাব্যসুন্দরী** দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৫। **সমাজতত্ত্ব।** হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৬। **সমাজচিন্তা।** বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৭। **দেবসুন্দরী।** হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৮। **হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ।** প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৯। **সৃষ্টিবিজ্ঞান।** পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস
এবং
শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,

সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১। সাহিত্য-সভার চাঁদা প্রভৃতি টাকাকড়ি মণিঅর্ডার আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

২। সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশ জন্য প্রবন্ধাদি আমার নামে ১০৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে অথবা ১৫৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

৩। সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত চিঠি পত্র সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সাহিত্য-সংহিতা।

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

কবির ইতিহাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

—:*:—

সপ্তম প্রস্তাব।

(জীবনচরিত)।*

১। রাম বসু।

কবি রাম বসুর পূর্ণ নাম রামমোহন বসু। কিন্তু তিনি আপামরসাধারণের নিকট রাম বসু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। জনসমাজের হৃদয়ের উপর তিনি যে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। রাম বসু বাঙ্গালা ১১৯৩ সালে, ইংরেজি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার অপর পারে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরস্থিত শালিখা গ্রামে ভদ্রবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রবিলোচন বসু এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দাসী ছিল। রবিলোচনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামমোহন বা রাম বসু এবং কনিষ্ঠ কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন শৈশবেই পিতামাতার স্নেহ-ঋণ পরিশোধ করিয়া ইহজগতের পরপারে গমন করে। এই অকস্মাৎ বিপদ্‌পাতে রবিলোচন ও নিস্তারিণীর বক্ষপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও বালক রামমোহনের মুখ চাহিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শোকে শান্তিলাভ করেন। অতঃপর রামমোহন মাতাপিতৃস্নেহাদরের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হইলেন, তাঁহাদের পুঞ্জীভূত বাৎসল্য-রসে তাঁহার ভাগ্যজীবন গঠিত হইতে লাগিলেন।

* কবির গান ও কবিওয়ালাদের বিষয়ে আরও দুইটী প্রস্তাব লিখিয়া, তৎপরে 'জীবনচরিত' আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ এমনই দয়াপরবশ এবং স্বদেশভক্ত যে, তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা করা সত্ত্বেও লেখক সামান্যমাত্র উপকার প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্য বহুদিন 'কবির ইতিহাস' লেখা বন্ধ ছিল। ঐ দুই প্রস্তাবের আলোচ্য সমস্ত তথ্যাদি অদ্যাপি সংগৃহীত না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পরবর্ত্তী প্রস্তাব প্রকাশ করিতে হইল। এই প্রস্তাবে ৭০।৮০ জন কবিওয়ালার জীবনচরিত আলোচিত হইবে। কবিওয়ালাদিগকে, তাঁহাদের জন্মের তারিখ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করতঃ তাঁহাদের জীবনচরিত প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল, তাহাও এ ক্ষেত্রে ঘটিয়া উঠিল না। এই প্রস্তাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবদ্বয়, যাহা আপাততঃ অপ্রকাশিত রহিল, পরে তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা থাকিল।—লেখক।

দেখিতে দেখিতে রামমোহন চারি বৎসরের হইলেন। পঞ্চম বর্ষে রবিলোচন শুভদিনে পুত্রের হাতে খড়ি-মাটী দিয়া পাঠ-শালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আমাদের অনেকেরই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কবি-ওয়ালারা সকলেই সরস্বতীর বরপুত্র। কিন্তু এ ধারণা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমরা অনেকেই তলাইয়া দেখি নাই, বা দেখিবার ক্ষমতা নাই। আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকলেই কবিওয়ালার নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, যেন উঁহারা অশ্লীলতার এক একটী মূর্ত্তিমান্ সজীব চিত্র! হায় রে শ্লীলতা! বর্ত্তমান সময়ের নব্যভব্যের ন্যায় প্রাচীন কবি-ওয়ালাগণের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না ঘটিতে পারে, তাহারা তোতা পাখীর মতন পুঁথিগত কতকগুলি পাঠ মুখস্থ না করিয়া থাকিতে পারে, অধুনাতনকালের অনুরূপ তাহারা অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী-রূপে বাহাড়ম্বর প্রকাশের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে, পর-তোষা-মদ, পর-পদলেহন প্রভৃতি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ব্যবহারশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে অশিক্ষিত, অসভ্য, কুরুচির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হয়?

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ঈশ্বরপ্রদত্ত, সুতরাং তাহা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়নকালে শিশু রামমোহন যে কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ণপরিচয়ের অল্পদিন পর হইতে রাম-মোহন কলাপাতে ও তালপাতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। স্বভাবের প্রিয় শিষ্য সরলহৃদয় রামমোহন সেই সকল কবিতার কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। রামমোহন আপন উচ্ছ্বাসভরে কলার পাতে কবিতা লিখিয়া কখন ফেলিয়া দিতেন, কখনও বা সমপাঠীদিগকে শুনাইয়া তাহাদের মধ্যেই বিতরণ করিতেন। বালক জানিতেন না, কালে তাহার কবি-প্রতিভায় বঙ্গদেশ বিমুগ্ধ হইবে।

রামমোহন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মোটামুটী ভাষাজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার জন্য শালিখা-গ্রামবাসিগণ রবিলোচনকে পরামর্শ দিলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়ও বালকের কবিত্ব-উন্মেষের পরিচয় পাইয়া, তাহার ভাবী সাফল্যের কথা প্রতিবাসী ও রবিলোচনের নিকট প্রকাশ করেন। কলিকাতায় থাকিলে নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া এই বালক অধিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে এবং সৎসংসর্গে পড়িলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া রবিলোচন গ্রামবাসিগণের পরামর্শা-নুসারে অধ্যয়নার্থ পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

রাসু-নৃসিংহ, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ বাল্যকালে বিভিন্ন সংসর্গে পড়িয়া পড়াশুনার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেই সময় হইতেই গান বাজনার প্রতি অনুরক্ত হন এবং তাহার আলোচনাতেই প্রমত্ত হইয়া উঠেন। রাম বসু তাঁহাদের পথানুসরণ না করিয়া মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে থাকেন। কলিকাতার যোড়াসাঁকোর নিজ পিসা মহাশয়ের আবাসে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া-ছিলেন, ভবানী বণিক্ নামক এক কবিওয়ালা তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজ দলে গাওনা করিতেন। ভবানী একদা যোড়াসাঁকোর পথে যাইতেছিলেন, দৈবক্রমে তিনি কয়েকটী গান পথিমধ্যে কুড়াইয়া পান; গানগুলি অতিশয় শ্রুতিমধুর ও উচ্চভাবাত্মক

দেখিয়া তিনি তাহার রচয়িতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, রাম বসুই সেগুলির রচয়িতা। তৎপরে ভবানী, রাম বসুর গান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ ঐ সকল গান সংগ্রহ করা সহজ-সাধ্য হয় নাই। তিনি সর্ব্বপ্রথমে রাম বসুর সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে নানারূপ অনুনয় বিনয়ে বাধ্য করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে গান সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছুদিন এইভাবে যায়, তাহার পর ভবানীর অনুরোধে রাম বসু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে কবিতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। একদা তাঁহারই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রাম বসু কলিকাতার কোনও এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। রবিলোচন পুত্রের এবংবিধ আচরণে নিতান্ত দুঃখিত হন, এবং নানারূপ অনুযোগ সহকারে তাঁহাকে পত্র লিখেন। রাম বসু, ভবানীর অনুরোধে ও সানুনয় কাতরতায় তাঁহার দলে গাওনা করিয়াছিলেন মাত্র, তদতিরিক্ত তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তিনি যে পাঠ্যাবস্থায় কবির দলে গাওনা করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পিতার তিরস্কারে বুঝিতে পারিলেন এবং অতঃপর আর ঐ সকল লোকদিগের সংসর্গে মিশিবেন না, এই সংকল্প করিয়া প্রাণপণ যত্নে বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করায়, তাঁহার সকল কামনা সেই ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই লয় পাইল। পিতার আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল না, কাযেই পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নসংস্থানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে পড়িয়া সুকুমারমতি বালকের পাঠ্যাবস্থা শেষ হইল।

রাম বসু স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। সংসারের সর্ব্ববিধ ভার স্কন্ধে পড়িলেও তিনি উদরান্নের জন্য নিজেকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিগড়িত করিতে প্রস্তুত হইলেন না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সে পরামর্শ তাঁহার মনঃপুত হইল না। পরপদলেহন অপেক্ষা স্বাধীনতাকে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া তিনি কবি-সঙ্গীত রচনা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর উপস্থিত দায়সমূহ হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে, তিনি কিছুদিনের জন্য একটী কেরাণিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেশী দিন তাঁহাকে মাছিমারাদের দলপুষ্ট করিয়া থাকিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি দায়মুক্ত হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে সর্ব্বত্র কবি-সংগীতের আদর ছিল।* বড় বড় রাজা মহারাজগণ পূজা-পার্ব্বণে বা অন্য কোন প্রকার সামাজিক উৎসব-উপলক্ষে স্বভবনে কবির গান দিতেন। সে সময় অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাই রাম বসু এই ব্যবসায় দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবির দলে গান বাঁধিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইতে লাগিল এবং তাঁহার নামও ক্রমে ক্রমে জনসাধারণে প্রচারিত হইতে লাগিল। শেষে তিনি সাধারণে এতই পরিচিত

---

* 'কবি,' যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সেকালের প্রধান আমোদ ছিল, তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরুঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাম নৃসিংহ, রাম বসু, ভবানী বেনে, ইহাদের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল।"—রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল', ১৩ পৃষ্ঠা।

হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া রাম বসু বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভবানী বণিক্ প্রভৃতি কবিওয়ালারাও রাম বসুর রচিত গান শুনাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দেশ বিদেশে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

পিতৃ-বিয়োগের পর হইতেই রাম বসুর কবির দল করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইংরেজী-স্কুলের পড়ার গুণেই হউক্ বা আর কোনও কারণেই হউক্, আসরে নামিয়া গান গাহিতে তৎকালে তাঁহার লজ্জাবোধ হইল, তাই তিনি গান রচনা করিয়া ভবানী বণিক্, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগকে দিয়া যাহা কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহার যশঃসুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল, লোকে যখন তাঁহার গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তিনি স্বহস্তে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া এক সখের দল খাড়া করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই সখের দল পেশাদারী দলে পরিণত হয়।

আমরা এপর্য্যন্ত রাম বসুর গান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলি নাই, এক্ষণে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাম বসু যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক একখানি অত্যুজ্জ্বল হীরক-খণ্ড। বিশেষতঃ তাঁহার বিরহসঙ্গীতগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। প্রেমিক বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের পর অন্য কোনও কবির লেখনী হইতে রাম বসুর ন্যায় বিরহ-গীতি নিঃসৃত হয় নাই। তাঁহার প্রত্যেক বিরহসঙ্গীত পাঠে বোধ হয়, যেন কোনও বিরহ-বিধুরা, কান্তসন্দর্শন-বিমুখা নারী দুঃসহ বেদনায় নিপীড়িত হইয়া নয়নজলের সহিত মরমের কথাগুলি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি ক্রমে ক্রমে একথার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছি। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, আমার এ বর্ণনার এক কণাও অতিরঞ্জিত বা কল্পিত নহে।

যাহা হউক্, এক্ষণে আমরা রাম বসুর কবি-প্রতিভা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাম বসুর বিরহের ন্যায় প্রেমের নিখুঁত ছবি চণ্ডীদাসের পর আর কোন কবির বিরহে পাওয়া যায় না। ইদানীন্তন কালে রাম বসুকেই বিরহের রাজা বলিলেও চলে। এক ব্যক্তি তাঁহার বিরহ শুনিয়া এতই বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হন যে, গান শুনিতে শুনিতে তিনি বলিয়া উঠেন যে, আমার যদি টাকা থাক্‌তো, তবে আমি রাম বসুকে লাখ্ টাকা দিতাম। পাঠকগণ তাঁহার একটী বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণ করুন ;—

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ !
হলো এ পথে আগমন ;—
কও কথা,—একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।

প্রেমিকা বহুদিন প্রেমিকের দর্শন পায় নাই, দৈবযোগে একদিন উভয়ের মিলন হইল। প্রেমিক অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইল, লজ্জা আসিয়া তাহার মস্তক অবনত করিল। সে কি বলিয়া প্রেমিকাকে সম্বোধন করিবে, তাহা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রেমিকা কষ্টানুভব করিল। সে তাহার সঙ্কোচ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার আশায় বলিল ;—

প্রণয় ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, তায় লজ্জা কি ?
এমনতো প্রেমভাঙাভাঙ্গি অনেকের দেখি !
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হ'লো বিমুখ,

আমি সাগর ছেঁচেও সখা!
মাণিক পেলাম না।
দাঁড়াও—দাঁড়াও—প্রাণনাথ!
বদন ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা কেবল দেখ্‌তে চাই,
কিছু—থাকো থাকো ব'লে ধ'রে রাখ্‌বো না
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না;—
তুমি যাতে থাক ভাল, সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল;—
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি তো ভাবিনা পর,
"তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুখ দিও না।

কি নিষ্কাম ভালবাসা! ভোগ-বিলাস-লালসা হইতে বহু দূরে প্রতিষ্ঠিত কবির গানের নাম শুনিলে যাঁহারা ভাবেন, কি একটা বীভৎস কাণ্ড, তাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত গানগুলি পাঠ করিবেন।

রাম বসুর আর একটী বিরহ-সঙ্গীত এইরূপ;—

মনে রৈল সই মনের বেদনা;
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না।
সরমের মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে,
সখি, ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে;
নারী-জনম যেন আর করে না॥ (মহড়া)।
একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়ন-জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে—ছি, ছি, ছুঁওনা! (চিতেন)।
তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি॥
অনা'সে প্রবাসে চলে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হল বিপরীত,
রেখে লজ্জার সম্মান;
মদন দহিছে এখন এ অবলা-প্রাণ॥
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচানো দায়,
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমায়;—
কারে এ দুঃখ কব সই! কত আর প্রাণে সই,
হ'ল গো একি সখি! যন্ত্রণা।

এইরূপ মনোহর প্রেম-কাহিনী রাম বসুর সঙ্গীতে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইবে। রাম বসুর বিরহ-গীতি প্রেমের উচ্চ আদর্শ, তাহার নায়িকা প্রেমশালিনী। পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটী সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন;—"কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মোহন চিত্র!" প্রকৃতই কি ইহাতে বঙ্গীয় ললনার সলাজ সপ্রেম হৃদয়টী চিত্রিত হয় নাই? কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়-লালসার খর-স্রোত প্রবহমান দেখিতে পাইয়াছেন! ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সারস্বত কুঞ্জের চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রাম বসুর বিরহ-সঙ্গীতে আদর্শ প্রেমের পরিচয় কিছুমাত্র নাই। তাঁহার নায়কনায়িকার প্রেম ভোগ-বিলাসে কলুষিত, আত্মোৎসর্গে একান্ত কুণ্ঠিত, আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহার ওরূপ লেখার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমি একান্ত অক্ষম। একাল পর্য্যন্ত অনেকানেক সাহিত্য-রথী রাম বসুর 'বিরহ'কে কবিগণের মধ্যে প্রথম আসন দিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রশেখর বাবু কি দেখিয়া ও কি ভাবিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। রাম বসুর বিরহ-সঙ্গীতে প্রেমের নানা ভাব

বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে সকাম প্রেম, নিষ্কাম প্রেম, পরার্থে প্রেম, বিশ্বজনীন প্রেম—সকল রকম প্রেমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এ কি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে ?
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে !
অক্রুর সহিতে কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিল।
রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ !
কি দোষ রাধায় পাইলে ?
শ্যাম ! ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণ উদাসী ;—
নাহি অন্যভাব, শুনহে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জ্জন কুলে শীলে !
এতেই হলেম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?
শ্যাম ! যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও ;
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দু'টি
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি !
আর হেরিব না আশা করি।

কুটিলতার 'আইগ্লাস' খানা চক্ষু হইতে নামাইয়া বলুন দেখি, এ বিরহ-গীতের কোন্ স্থানটী ভোগবিলাসিতায় কলুষিত ? ইহাতে কি পতিব্রতা নারীর বিশুদ্ধ পতিপ্রেম, সরল হৃদয়ের উদারভাব পরিব্যক্ত হইতেছে না ? কিন্তু রাম বসুর গানের এই প্রচ্ছন্ন উদারভাব টুকু সহজ দৃষ্টিতে সকলের নিকট প্রতিভাত হইতে পারে না ; কারণ উহা ভাবুকের গীত। গুপ্ত কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রকের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ ; সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।" ভাবুক ও রসজ্ঞ হইতে না পারিলে রাম বসুর গীতের রস-মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য অনুভব করা যায় না।

রাম বসুর সমস্ত গীতই এইরূপে উদ্ধৃত করিয়া প্রেম-বৈচিত্র্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ স্থান ও সুযোগ আমাদের নাই। তাই আমরা সংক্ষেপে তাঁহার প্রত্যেক বিষয়ের একটী করিয়া গান তুলিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমস্ত গীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না ! কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও কবিওয়ালাদের সমস্ত কাব্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেহ এখানে ওখানে সেখানে দু'চারিটা করিয়া গান লিখিয়া রাখিয়াছেন, আবশ্যকমত সকলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতেছেন।

এইবার আমি রাম বসুর 'সপ্তমী' গান একটী উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, কবি মাতৃহৃদয়ের অনাবিল বাৎসল্য-স্নেহ কেমন সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

তবে নাকি উমার তত্ত্ব ক'রেছিলে ?
গিরিরাজ ! ওহে শুন শুন,
তোমার মেয়ে কি বলে ॥
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী ব'লে ॥
(মহড়া)।
তারা হারা হ'য়ে নয়নের, তারা হারা হ'য়ে রই।
সদা কই উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই ॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা।
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্র বদনে, ডাক্‌ছে সঘনে,
মা মা মা ব'লে।
উমা যত হেসে কথা কয়, ততো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জলে॥
(চিতেন)।
ভাল, হোক্ হোক্ ওহে গিরি!
যাই আমি নারী, তাই তুমি বচনে।
তোমার কি মনে হ'তো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥
(অন্তরা)।
আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ, রহে বল
কতদিন?
দিনের দিন তনুক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে
আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে
এলো হে হিমালয়!
মুখে করি হাহাকার, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে॥
(চিতেন)।

এই সপ্তমী রাম বসু যখন নিজের দলে গাহিতেন, তখন শ্রোতারা নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ-ভাবে জড়পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ ও অশ্রুবর্ষণ করিত। বর্ষাসমাগমে নদী যেমন কানায় কানায় ভরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সংবৎসর পরে দুহিতাকে পাইয়া মেনকারও তেমনি স্নেহাতুরা মাতৃবক্ষঃ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শাবকনাশাশঙ্কায় বিহঙ্গী যেমন ছানাকে স্বীয় চঞ্চুপুটে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, মেনকাও তেমনি উমাকে বুকে টানিয়া অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসে ডুবাইয়া ফেলি-লেন। রাম বসুর এবম্প্রকার অন্যান্য উমা বিষয়ক সঙ্গীতগুলিও মাতৃস্নেহরসে উদ্বেলিত।

রামবসু যেমন একদিকে বিরহ, সখি-সংবাদ, মান, মাথুর, সপ্তমী প্রভৃতি বিবিধ রসভক্তিবিষয়ক গানরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি শ্লেষকর সঙ্গীতে পরিপক্ক হইয়াছিলেন।

দেখ্‌বো কেমন সুন্দরী কুব্জা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে, বাঁকা কি সোজা।

এবংবিধ প্রভূত শ্লেষকর গান তাঁহার লেখনী-মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তৎকালে ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণের ভবনে উৎসবাদিতে কবির গান হইত। রাম বসু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের সহিত চতুর্দ্দিক হইতে গানের বায়না পাইতে লাগিলেন। বড় বড় রাজ-ভবনে সর্ব্বদাই তাঁহার গান হইত। একদা মহারাজ নব-কৃষ্ণের ভবনে রাম বসু, নিতাই বৈরাগী ও আরও দুই একজন কবির গান হয়। তৎ-কালে হরু ঠাকুর বৃদ্ধ হওয়ায় দল ছাড়িয়া মহারাজের সভাসদ্ হইয়াছিলেন। রাজ-বাটীতে যে সকল কবির গান হইত, তাহাদের কাহার গাওনা ভাল হইয়াছে, হরু ঠাকুর তাহা বিচার করিয়া বলিয়া দিতেন। এবার হরু ঠাকুর, রাম বসুর পরাজয় সাব্যস্ত করিয়া অপরের জয় ঘোষণা করেন। রাম বসু ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গান ধরেন;—

ঠাকুর বাঁচ্‌বেন না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্ষে ধরেছে পোকা,—
স্বর্ণরেখা অতিক্ষীণ॥

শুনিতে পাওয়া যায়, হরুঠাকুর ইহাতে অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হন এবং রামবসুকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে করিতে আসর হইতে প্রস্থান করেন।

আর একবার শোভাবাজারের রাজ-বাটীতে রাম বসু ও নীলু ঠাকুরের গান হয়। নীলু ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না। রাম-

প্রসাদ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি তাঁহার দলে 'একটিনি' করিতেন। তিনিই তখন তাঁহার দলের অধিকারী হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের গাওনা হইতেছে, এমন সময় রামপ্রসাদ অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার মানসে গান ধরিলেন ;—

নাইকো রাম বোসের এখন সেকেলে গৌরব।
এখন দল ক'রে হয়েছেন রামবোস—রাম
কামারের * * * ॥

রাম বসু হটিবার লোক নন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্টা ধরিলেন ;—

তেম্‌নি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন।
যেমন ঢাকের পীঠে বাঁয়া থাকে,
বাজেনাকো একটী দিন।
যেমন অন্ধ ভিখারীর ধামা বওয়া থাকে
একজন,
হরিনাম বলে না মুখে, পাছু থেকে চাল
কুড়ুতে মন,
কর্ম্ম অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—
(ভাই রে)
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্ম্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ, সিদ্ধিরস্তু
বস্তুহীন ॥
নীলমণি ম'লে, নীলমণির দলে,
ঢুকলো সিংভাঙ্গা এঁড়ে, বাছুরের পালে।
যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উজীরালি
আড়াই দিন।
যেমন * * * কাছে পেগের বড়াই, ঘরে
করেন জাঁক,
ছুনিয়ার কর্ম্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে—
বচনে পুড়িয়ে করেন খাক্।
তেম্‌নি শ্রীছাদ এই পেটুকো মুলুকচাঁদ,
ভরেন রামপ্রসাদ, ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ,
যেমন জন্মে কভু হাত পোড়ে না,—
দোলে লবেদার আস্তীন ॥

পর্জ্জ পাঠ প্রতিপক্ষকে এইরূপ জবাব দেওয়া কম কবিত্বশালী ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। কবির দলে এইরূপ লড়াই ছিল বলিয়াই তাহা জনসাধারণের হৃদয়ের উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে একবারে অশ্লীলতাবিবর্জ্জিত, তাহা আমি বলিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত গানটীর ছুইটী স্থানে আমি (* *) তারকা চিহ্ন দিয়া গেলাম,—ঐ ছুইটী স্থানের শব্দ সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে মুখে আনিতে সঙ্কোচ বা বাধা বাধা বোধ হয়। রাম বসু, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ অস্তগত হইলে যখন কবিওয়ালাদের অবনতি সূচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন এই কবির লড়াই সুরুচির সু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া জীবন্ত খেউড়ে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের আমি ছুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।—(১) ভদ্র সমাজের সহানুভূতির অভাব, (২) তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে সুরুচির বিপর্য্যয়। সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ লড়াইতে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি পছন্দ করিতে লাগিল, কাজেই কবিওয়ালারা পেটের দায়ে খেউড় ধরিতে বাধ্য হইলেন।

রাম বসুর সখী-সংবাদের একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। তাঁহার একটী গানের কিয়দংশ এইরূপ ;—

মান ক'রে মান রাখ্‌তে পারি নে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই—
সজল আঁখি জলধর বরণে।
অতএব অভিমান মনে করি নে ॥
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণপ্রেম ডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা।
হৃদয় মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা ছু'নয়নে ॥ ইত্যাদি।

প্রেমের কি গভীর মন্ত্র,—কি বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেমভাব।

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে হাবড়া জেলার অন্তর্গত ব্যাঁট্রা গ্রামে প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। ঠাকুরদাসের পিতা রামমোহন দত্তের সহিত রাম বসুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, উভয়ের নামে নামে মিল হওয়ায়, পরস্পরকে 'মিতা' বলিয়া ডাকিতেন। রামমোহন দত্ত তখনকার ফোর্ট উইলিয়ামে চাকুরী করিতেন, তাহাতে তিনি বেশ দু'পয়সার মানুষ হইয়াছিলেন। এই দত্ত-বংশোদ্ভব রামমোহন, বসু রাম-মোহনের কবির দলে গাওনা করিতেন। সংগীতবিদ্যায় তাঁহার একটু পারদর্শিতাও ছিল। তিনিই এক রকম রাম বসুর কবির দলের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই প্ররোচনায় বসুজ স্বয়ং কবির দল বাঁধেন এবং তাঁহারই উৎসাহে সখের দল ছাড়িয়া পেশাদারী দলের প্রবর্ত্তন করেন। রামমোহন দত্তের পরলোক গমনের পর, ঠাকুরদাস যখন নিজে পাঁচালীর দল বাঁধেন, তখন রাম বসু বন্ধুর উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তৎপুত্রের দলে মধ্যে মধ্যে গাওনা করিতেন। এইরূপে একদা ফরাস-ডাঙ্গার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে গাওনা করিবার সময় আণ্টুনি ফিরিঙ্গিকে তিনি বলিয়াছিলেন ;—

এসে এ দেশে এ বেশে,
তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই ?

তদুত্তরে আণ্টুনি গাহিলেন ;—

এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে
আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি
টুপি ছেড়েছি॥

আণ্টুনির সহিত রাম বসুর আর একবার কবির লড়াই বাধে। সেবার তিনি নিজের দলে থাকিয়াই বলেন ;—

সাহেব ! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে
দিবে চুণকালি॥

সাহেব তাহাতে উত্তর দিলেন ;—

খৃষ্ট আর কৃষ্ট কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই !
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও
কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে, ঐ
দেখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানবজনম সফল হ'বে—
যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

ফিরিঙ্গি সাহেবের হিন্দুচিত ভক্তি প্রবণ-তাও ভাবিবার বিষয়।

রাম বসু অনুপ্রাস যোজনাতেও পরিপক্ব ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গানে সুন্দর অনুপ্রাস প্রয়োগ দেখা যায়। একটী যথা ;—

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে,
শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি শ্রীরাধার
শ্রীপদে গুঞ্জে॥
ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অন্যান্য কবিওয়ালা-দের ন্যায় রাম বসু অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজির সহিত সংস্কৃতও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি নিম্নে একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, রাম বসু সংস্কৃতে অন-ভিজ্ঞ ছিলেন না এবং তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভাব আহরণ করিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিতেন।

হর নই হে, আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ?
ক'রো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হ'য়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ।
এ কি রঙ্গ হে, তোমার!
হর ভ্রমে শরাঘাত,
কেন করিতেছ বারে বার,
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কত মহেশ,
চেন না পুরুষ-প্রকৃতি॥
হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হয়ো না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে এতো জটা ভার॥
কণ্ঠে কালকূট নহে,
দেখ পোরেছি নীল-রতন,
অরুণ হ'ল নয়ন,
ক'রে পতি-বিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

জয়দেবের বিরহ-খিন্ন কৃষ্ণ বলিতেছেন;—

হৃদি বিষলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,
প্রহরণ হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমুধাবসি॥

সংস্কৃত গীতটিতে বিরহী কৃষ্ণের সহিত শঙ্করের সমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে, রাম বসুর গীতটিতে হর ও হরির সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য সেই রতি-পতি অনঙ্গ।* আমি এ কথা বলিতেছি না যে, রাম বসু জয়দেবের ঐ গানটীরই অনুবাদ বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব সংস্কৃতমূলক, ইহাই আমার বলিবার তাৎপর্য্য। জয়দেব তাঁহার আদর্শ নহে।

আমরা রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই,—সে সম্বন্ধে বেশি কিছু জানাও যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ছিল। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। কবিদিগের প্রায়ই এই দোষটী দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিপ্রভৃতি কবিকুল শিরোভূষণগণও এ কলঙ্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাম বসুর এ কলঙ্কও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। যজ্ঞেশ্বরীও সংগীত রচনা করিতেন। নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে তাহার রচিত সংগীত অতি সমাদরে গীত হইত।

রাম বসুর বৈষ্ণব পদগুলিই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী; তাহার প্রশংসা বাক্যে শেষ করা যায় না। যিনি পড়িবেন, তিনিই মজিবেন। মান, মাথুরে তিনি বঙ্গ-বধূর যে প্রেমপূর্ণ সলাজ দৃষ্টি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও কম প্রাণস্পর্শী নহে। আমরা নিম্নে আর দুইটী মাত্র পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া রাম বসুর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি;—

বসন্তেরে সুধাও সখি!
আমার নাথের মঙ্গল কি?
নিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি?
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
দিনে শতবার গণি দিন,
আসার আশায় আছি,
আশাপথ নিরখি॥ (মহড়া)
সে যদি ভুলেছে আমারে,
মনে না করে।
আমি কেমনে ভুলিব তাকে?
পতি গতি মুক্তি অবলার—
সুখ, মোক্ষ সেই গো আমার,
তাহার কুশল শুনে,
কুশলে কুল রাখি॥ (চিতেন)

অন্যটীর কিয়দংশ এই;—

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হ'বে কি?

---

* বিদ্যাপতিরও এই ভাবের একটী পদ পাওয়া যায়;—

কতি হঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হঁবর নারী॥ ইত্যাদি।

মনে মনে মনাগুণে,
আমি জলবো বই আর বলবো কি ?
অনেক দিনের আলাপ ব'লে আদরে
ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ, নিজ দুঃখ তোমায়
বলিনে।

ফলহীন বৃক্ষের কাছে,
সাধলে কাঁদলে ফলবে কি ? (মহড়া)

"যিনি এই সকল সংগীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার অসামান্ত পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সতীর কোমলতায় যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য আছে, স্নিগ্ধ ভাবে যে অপূর্ব্ব মহত্ব আছে, সর্ব্বোপরি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যে অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা আছে, তাহা কবির কল্পনা-কৌশলে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। একটী সংগীতে কোমলতাময়ী পতিব্রতার, পতিভক্তির সহিত হৃদয়ের অসাধারণ কোমলভাব পরিস্ফুট হইতেছে। অপরটীতে উন্মার্গগামী ও সুনীতিভ্রষ্ট স্বামীর জন্ত পতিপ্রাণার ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 'পতি গতি, মুক্তি অবলার' এই একটী বাক্যে কবি পতিভক্তির অতি সুন্দরভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে "প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি" কথাটীতে যে কিরূপ কবিত্ব-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। উৎপথ পতি স্বামীর প্রতি এইরূপ উক্তিতে সাধ্বী নারীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি ও পতির উচ্ছৃঙ্খল ভাবের জন্ত হৃদয়গত গভীর বেদনার অভিব্যক্তি হইতেছে। "ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাধলে কাঁদলে ফলবে কি" এই উক্তি অতি মনোহর। মহাকবি কালিদাস "প্রবর্ত্তিতোদীব ইব প্রদীপাৎ" এই কথায় উপমা-কৌশলের পরাকোষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। রাম বসুর কবিতা পাঠে ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাটী মনোমধ্যে উদিত হয়। উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় হইতে পরিগৃহীত, উভয়ই উৎকট কল্পনার বহির্ভূত এবং উভয়ই জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত। কবিত্ব-কৌশলে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উভয়েই কবির সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।"*

রাম বসু বঙ্গদেশের প্রায় সকল ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহেই কবি গাহিতে যাইতেন। ঐ সকল স্থানে গাওনা করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ পুরস্কার পাইতেন। কোন কোনও স্থানে শাল দোশালা প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্ত্র সমূহ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতেন। শৈশবাবস্থায় তিনি পিতার একমাত্র পুত্ররূপে বিশেষ আদর যত্নে লালিত পালিত হন। কেবল কিশোর বয়সে পিতৃবিয়োগে কিছু দিনের জন্ত সামান্ত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ পিতা পরলোকগমনের সময় কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎসময় হইতে পেশাদারী কবির দল করা পর্য্যন্ত ২।৩ বৎসর কাল মাত্র তিনি কিছু অভাবগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি কমলার সুনজরে পতিত হন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে যেমন তাঁহার আদর ছিল, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারের রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের ভবনেও তাঁহার তদ্রূপ আমন্ত্রণ হইত। রাম বসু তথায় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যাইয়া কবি গাহিতেন। বাঙ্গালা ১২৩৫ সালে মুর্শিদাবাদে তিনি শেষ গিয়াছিলেন। সেইবার আশ্বিন মাসে তথায় গিয়া তিনি রোগাক্রান্ত হন এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ৪২ বৎসর বয়সে অনন্তধামে গমন করেন। স্বর্গীয়

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ সাল।

প্রস্ফুনটী অকালে ঝরিয়া পড়ে। মৃত্যু সময়ে তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। কবির বংশে বাতি দিবার এখন কেহই নাই। একদিন যাহার গান শ্রবণ করিয়া বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিত, আজ সেই মহাকবিকে স্মরণ করিয়া কেহ দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করে না। আমরা এমনি গুণগ্রাহী ও স্বদেশহিতৈষী। কবিতা অমর বলিয়া আজিও তাঁহার নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

বিবাহ-সংস্কার ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

কন্যা বরয়তে রূপং।
মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং॥
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি।
মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ॥

সমাজ মধ্যে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্মভাব এবং নৈতিক জ্ঞান, চিরকাল একরূপ নিয়মে কখন আবদ্ধ থাকে না। দেশকালপাত্রানুসারে ঐ সকলের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান্ যুগে যে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কে না অবগত আছেন? বিবাহ সম্বন্ধেও একটা নূতন ভাব জাগরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সাধারণ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ কামনা করিতেন, তাহার সজীব চিত্র শীর্ষোল্লিখিত কবিতাটিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কন্যা অর্থাৎ পাত্রী, পাত্রের সৌন্দর্য্য কামনা করিতেন; তাঁহার মাতা মনে মনে অভিলাষ করিতেন, জামাতা ধনসম্পন্ন হইবেন; পিতা ইচ্ছা করিতেন, জামাতা শাস্ত্রবান্ অর্থাৎ বিশুদ্ধচরিত্র হইবেন; বন্ধুগণ মনে করিতেন, উচ্চবংশে কন্যার বিবাহ হইবে; এবং জনসাধারণ এরূপ পাত্রে বিবাহ বাসনা করিতেন, যেখানে তাঁহারা মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি বা সে মতিগতি দেখা যায় না। আজকাল অর্থ ও অলঙ্কারের উপর বিবাহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে দেনা-পাওনার স্বচ্ছলতা, এবং অলঙ্কারের চাকচিক্য, সেইখানেই বিবাহের কথা। পাত্র বা পাত্রীর আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকদিগের পরামর্শ কেহ গ্রাহ্য করে না, ভবিষ্যতের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না। পাত্রের মাতা পিতার কেবল অর্থের দিকে টান!

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে, বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহ ইহ ও পর-জীবনের যাবতীয় সুখ-সাধনের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ। এজন্য হিন্দু অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই বন্ধনের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম। হিন্দু স্ত্রীকে "ধর্ম্ম-পত্নী" বলিয়া থাকেন। "পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতির সহিত অভেদভাবে মিলাইবার, দুইটিকে একটি করিয়া তুলিবার জন্য, আর্য্য-শাস্ত্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রই করিতে পারেন নাই। 'ততোবিরাড় জায়ত,' এই বেদোক্তির ব্যাখ্যাপূর্ব্বক মনু বলিয়াছেন;—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারীতস্যাং স বিরাড়মসৃজৎ প্রভুঃ॥

প্রভু (ব্রহ্মা) আপনার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, অর্দ্ধে পুরুষ এবং অর্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি দ্বারা বিরাটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বে বিভাজিত দুইটীর পুনর্ব্বার একীকরণ হয়। যজুর্ব্বেদীয় পাণি-গ্রহণের একটি মন্ত্র এই;—আমি লক্ষ্মীহীন তুমি লক্ষ্মী, তোমা বিনা আমি শূন্য। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্‌বেদ, আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমরা দুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণ।

"এই গভীরতম ভাবের ছায়া য়িহুদিদিগের শাস্ত্রেও পড়িয়াছে এবং সেই শাস্ত্র হইতে মুসলমান এবং খৃষ্টানও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। উহারা সকলেই বলে যে, আদিম পুরুষের শরীর হইতে স্ত্রী-শরীরের উৎপত্তি। অতএব বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে যে, স্ত্রী-পুরুষের পুণরেকীকরণ হয়, এই ভাবের আভাস উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহাদের একীকরণ ব্যাপার পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তি-মূলক স্বীকার বাক্যে, সুতরাং সংস্কার-মূলক নয় বলিলেই হয়। এই জন্য উহা তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ীও হয় না। আমাদিগের বৈবাহিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার দ্বারা যে সংযোগ হয়, তাহা আর কখনই ছাড়িবার নয়, ইহজন্মেও নয়, পরজন্মেও নয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে বৈবাহিক বন্ধন এমন দৃঢ় ও পবিত্রও হয় না।*

পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে আট প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা;—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ট মোঽধমঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ প্রথার মধ্যে অষ্টমটি অতি নিকৃষ্ট। এক্ষণে হিন্দু-সমাজে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা শ্রুতশীল বতে স্বয়ং।
আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে বিবাহে কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও অলঙ্কারাদি (সাধ্যমত) দ্বারা পূজিত (ভূষিত) করিয়া, জ্ঞানসম্পন্ন এবং চরিত্রবান্ পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক, দান করা হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহে। শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ ও চরিত্রবান্ পাত্রকেই কন্যাদান করিতে উপদেশ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে লোকে শাস্ত্রের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, অর্থের সহিত কন্যার বিবাহ বন্ধন করিয়া থাকেন। অর্থই এখন সমাজ মধ্যে একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন এরূপও দেখা যায়, কন্যার পিতা ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া, ধনশালী বৃদ্ধের স্কন্ধে সরলতাময়ী বালিকাকে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ধন্য অর্থলালসা!

"দশ পুত্র সম কন্যা যদি সৎপাত্রে দীয়তে।" বাস্তবিক কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলে, বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, পাত্রের চরিত্র ও কুলশীলের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ যে কন্যার বিবাহ হইবে, তাহার স্বাস্থ্য ও কুলশীলের প্রতিও সেইরূপ বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহার মাতাপিতার স্বাস্থ্য ও চরিত্র কিরূপ, তাহাও দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, মনুষ্যজীবনের যে কতই দুর্দ্দশা অন্তর্হিত হয়, তাহা বলা যায় না। স্বাস্থ্যহীনা বালিকাকে বিবাহ করিলে, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানাদি প্রত্যেককেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, বিবাহকালে লোকে যদি অর্থবান্ লোকের কন্যাকে

---

* স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "আচার প্রবন্ধ" দেখ।

না দেখিয়া, স্বাস্থ্যবান্ পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের জীবন কত সুখে অতিবাহিত হয়। এস্থলে কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে, ধনবান্ হইলেই দোষ ঘটে, এরূপ নহে; অর্থাৎ যদি ধনশালী পরিবার স্বাস্থ্যবান্ হন, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু সচরাচর প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনী পরিবারের স্ত্রীলোক অধিক অসুস্থ। অতএব যে পরিবার কেবল ধনবান্ অথচ স্বাস্থ্যবান্ নহেন, তাহা অপেক্ষা ধনহীন সুস্থ পরিবারে বিবাহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ, এ সংসারে স্বাস্থ্য অপেক্ষা আদরের ধন আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় বংশের স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য ও মহাপাপী আর কে আছে? স্বাস্থ্যের নিকট তুচ্ছ অর্থ কোন্ ছার!

সন্তান যখন মাতাপিতার অনুরূপ হইয়া থাকে, যখন মাতাপিতা দুর্ব্বল হইলে সন্তান দুর্ব্বল হয়, যখন মাতাপিতা পীড়িত হইলে, সন্তানকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তখন যে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত, ইহা কে না বুঝিতে পারেন? নির্দ্দোষ নিরীহ সন্তানগণ যেন মাতাপিতার দোষে আজীবন কষ্টভোগ না করে এবং এক বংশ হইতে অপর বংশে যেন রোগের বীজ প্রসারিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, বিবাহ একটি দায়িত্ববিশিষ্ট কার্য্য। শাস্ত্র বলিতেছেন;—

উৎপাদনস্ত জাতস্ত পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্য ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃনামাত্মনশ্চ হ॥

মনু ৯ অঃ। ২৭।২৮।

ধর্ম্মে অর্থে চ কামে চ নাতি চরিতব্যং।

আপস্তম্ব।

সন্তান প্রজনন, তাহার প্রতিপালন, প্রতিদিন অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনকে ভোজন প্রদান, গৃহস্থালীর কার্য্যসম্পাদন, ধর্ম্ম-কার্য্য, পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ রতি, পিতৃদিগের এবং স্বীয় সন্তানাদি জন্ম দ্বারা স্বর্গ ভোগ, এই সকল গুরুতর কার্য্য, স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম্য বিষয় সম্পন্ন করিবেন।

এই সকল গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে হইলে, স্ত্রী-পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। কারণ, কীট-জর্জ্জরিত বংশ-খণ্ডের ন্যায় অকর্ম্মণ্য দেহ দ্বারা কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। এজন্য পাত্র ও পাত্রীর স্বাস্থ্য ও কুলশীল দেখিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত।

আমাদের শাস্ত্রে স্বগোত্র অথবা পিতামহ কিংবা মাতামহ বংশের তিন পুরুষের মধ্যে পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ। মনে কর, যদি একই ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর, একই শস্যের চাষ করা যায়, তবে কখনই তাহাতে সুন্দররূপ ফসল পাওয়া যায় না। সেইরূপ এক বংশে সর্ব্বদা সন্তানোৎপাদন করিলে, সেই বংশ ক্রমেই হীন হইয়া পড়ে। যে জাতির মধ্যে নিকট সম্পর্কে বিবাহ দেওয়ার রীতি আছে, সেই বংশে কাণা, খোঁড়া, বোবা প্রভৃতি বিকল অঙ্গের সন্তান যত জন্মে, আমাদের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। অতএব নিকট সম্পর্কে বিবাহ দেওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

কুলজ রোগ-গ্রস্ত পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ দেওয়া যারপরনাই অনিষ্ট-কর। মনে কর, স্ত্রী যেন একটি সন্তানোৎ-পাদনকারী বৃক্ষ। আর সন্তান সেই বৃক্ষের ফল। কিন্তু বৃক্ষ যদি ক্ষীণ হয়, তবে সে বৃক্ষের ফল কখনই পরিপুষ্ট হয় না। সেইরূপ স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, সন্তান দীর্ঘজীবী

হয় না। পরন্তু কখন কখন স্ত্রী বন্ধ্যাও হইয়া থাকে। যে সকল গাছ নিস্তেজ, সেই সকল গাছের ফল অকালে মাটিতে পড়িয়া যায়। সেইরূপ স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে। ফলতঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকা আবশ্যক। নতুবা বিবাহ দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ।

নিতান্ত বালিকা অথবা বৃদ্ধ পাত্রের বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কন্যার বয়স অপেক্ষা পাত্রের বয়স অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর অধিক হওয়া আবশ্যক। কুষ্ঠ, উন্মাদ, শূল প্রভৃতি রোগ-গ্রস্ত পাত্র-পাত্রীর বিবাহ দেওয়া কোন মতেই বৈধ নহে। কারণ ঐ সকল রোগ প্রায়ই সন্তানে আশ্রয় করিয়া থাকে।

কুলঞ্চশীলঞ্চ সনাথতাচ বিদ্যাচরিত্রঞ্চ বপুর্যশশ্চ।
এতানি সপ্তৈব গুণানিরীক্ষ্য দেয়া ততোভাগ্য
বশাত্তু কন্যা॥

শীল, প্রভুতা, বিদ্যা, সচ্চরিত্রতা, খ্যাতি এবং সুলক্ষণযুক্ত দেহ, এই সকল গুণযুক্ত পাত্রকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। চরক-সংহিতায় লিখিত আছে ;—

অতি দীর্ঘশ্চাতি হ্রস্ব শাতিলোমচা লোমা চ,
অতি কৃষ্ণশ্চাতি গৌরশ্চাতি স্থূলশ্চাতি
কৃশশ্চেতি।

তত্রাতি স্থূল কৃশয়োর্ভূয় এ বাপরে নিন্দিত বিশেষা ভবন্তি। অতি স্থূলস্য তাবদায়ুষো হ্রাসঃ জয়োপ রোধঃ কচ্ছ্রব্যবায়তা দৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধং স্বেদাবাধ ক্ষুদ্‌র্তিমাত্রং পিপাসাতি যোগশ্চেতি তবন্ত্যষ্টৌ দোষাঃ।

প্লীহা কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসোগুল্মার্শাং স্যুদরানি চ।
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমতাঃ॥
সততং ব্যাধিতা বেতাবতি স্থূল কৃশৌ নরৌ।
সততং চোপচর্য্যৌ হি কর্ষণৈ বৃংহণৌ বাপ॥
স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ
হিতৌ।
যদ্যভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্থূল মেবাতি পীড়য়েৎ॥

অত্যন্ত দীর্ঘ, অতি খর্ব্ব, সাতিশয় লোমযুক্ত একবালে লোমহীন, অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ কিংবা অত্যন্ত গৌরবর্ণ, অত্যন্ত মোটা, অত্যন্ত কৃশ এই আট প্রকার দেহের লোক অত্যন্ত নিন্দিত। ইহাদিগের মধ্যে অত্যধিক স্থূল ও কৃশ ব্যক্তি বিশেষরূপ নিন্দিত। কারণ যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত মোটা, তাহাদের পরমায়ু অল্প হয়, তাহারা অকালে বার্দ্ধক্য ভোগ করে এবং স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিয়া থাকে। আর তাহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা, দেহের দৌর্গন্ধ, স্বেদ জন্য পীড়া, অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়া থাকে। প্লীহা, কাস-ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ, উদরী ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগসমূহ প্রায়ই কৃশ ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অতি স্থূল ও অতি কৃশ ব্যক্তি ইহারা সতত রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন ;—

হীনক্রিয়ং নিষ্পৌরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয়াময়া ব্যপস্মারি শ্বিত্র কুষ্ঠ কুলানি চ॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্‌ভ্রাতা ন বা বিজ্ঞায়তে পিতা।
নোপযচ্ছেতে তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্মশঙ্কয়া॥

অত্যন্ত ধনসম্পত্তি থাকিলেও, সদাচার-ভ্রষ্ট, পুত্রসন্তান-বিহীন, মূর্খ, রোমশ, অর্শ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, মৃগী, ধবল ও কুষ্ঠ-গ্রস্ত-পুত্র কন্যা পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদের বিবাহ দিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভ্রাতৃ-হীনা ও অজ্ঞাত-কুলশীলা কন্যা কদাচ বিবাহ করিবে না। মনে কর, কোন পরিবারে কোন প্রকার একটা কঠিন রোগ আছে, আর সেই রোগে, সে বংশের পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে, এমন পরিবারের সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, অথবা কোন বংশে কন্যার সেইরূপ বংশ-গত রোগ আছে, এরূপ অবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিলে, মাতাপিতার শরীরস্থ রোগের বীজ মিলিত হইয়া, প্রবল বেগে সন্তানে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব

এরূপ বংশীয় পুত্র কন্যার সহিত বিবাহ দিলে পরিণামে যে, বিষময় ফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রোগ, শোক, অসৎ ব্যবহার জনিত মহাপাপে কত বংশ ছারখার হইতেছে! কোন কোন স্থানে দেখা যায়, মৃতবৎসাদের মধ্যে সন্তানের বিবাহ সংঘটিত হইয়া, কত বংশের বিলোপ সাধন হইয়াছে। গ্যাল্টন নামক কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ভূয়োদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন, দুই পরিবারের একমাত্র সন্তানদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ হইলে, বংশ-বৃদ্ধির আশা অতি অল্পই থাকে। কোন কোন বংশে এরূপও দেখা যায়, সেই বংশে কন্যাই জন্মিয়া থাকে, এরূপ বংশের কন্যা বিবাহ করিলে, সেই কন্যার গর্ভে প্রায় পুত্র জন্মে না; কারণ ঐ কন্যা মাতাপিতা হইতে পুত্রোৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না। মাতা-পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষ-গুণ যে সন্তানে অর্শে, তাহা কে না দেখিয়াছেন? যে বংশের পুত্র-কন্যার হাতে বা পায়ে ছয়টী আঙ্গুল, সেই বংশের সন্তানাদিরও প্রায় ছয়টী আঙ্গুল হইতে দেখা যায়। কাফ্রি জাতির ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, আর গায়ের রঙ্ অত্যন্ত কাল, এজন্য তাহাদের সন্তানগণের মধ্যেও সেইরূপ হইতে দেখা যায়। সন্তান একটি অনুকরণকারী জীব; এজন্য প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে, কোন কোন সন্তান মাতাপিতার, কোন কোন সন্তান খুড়াখুড়ীর, কোন কোন সন্তান পিতামহপিতামহীর, অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন সন্তানকে দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষদিগের দোষগুণের অনুকরণ করিতেও দেখা যায়। ফলতঃ সন্তান, পিতৃ-কুলের ও মাতৃ-কুলের ফলস্বরূপ; এজন্য এই উভয় কুল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

কণ্টকময় বনবৃক্ষ হইতে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল অন্বেষণ করা, আর অসুস্থ দুর্ব্বল বংশ হইতে সুস্থকায় দীর্ঘজীবন সন্তানের আশা করা একই কথা। ফলতঃ অসুস্থ মাতাপিতার সন্তান, নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ও রোগাক্রান্ত হইবে। অতএব প্রত্যেক নর-নারীর বিশেষ বিবেচনার সহিত বিবাহ করা কর্ত্তব্য। মাতাপিতা যত দিন না রোগমুক্ত হন, ততদিন কোনক্রমেই সন্তানোৎপাদন করা উচিত নহে। রাত্রি ও দিন পরস্পর অনুগমন করিয়া থাকে, এ কথা যেরূপ সত্য, রুগ্ন মাতাপিতা হইতে অসুস্থ সন্তান উৎপাদন হয়, ইহাও সেইরূপ সত্য। পৈত্রিক উন্মাদ প্রভৃতি রোগ, সচরাচর সন্তানে বর্ত্তিতে দেখা গিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কত শত ব্যাধি যে এক বংশ হইতে বংশান্তরে সঞ্চারিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ মাতা-পিতা যদি স্ব স্ব সন্তান সন্ততিদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

মনু।

আজকাল বিজাতীয় আচার ব্যবহার এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি যে পরিমাণে সমাজে প্রবেশলাভ করিতেছে, সেই পরিমাণে যে সমাজ-বন্ধন ও গার্হস্থ্য-জীবন শিথিল হইয়া আসিতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন। এখন সম্যগ্ প্রকারে শাস্ত্র মানিয়া প্রায়ই বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হয় না। অনেকে ইচ্ছা করিয়াই হউক, কিংবা বাধ্য হইয়াই হউক, শাস্ত্রাচারে যে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখা যায়। শাস্ত্রাচারে অনাস্থা বশতঃ শুভবিবাহ সংস্কারে নানাপ্রকার দোষ ঘটিতেছে। অকাল মৃত্যু ও অকাল বৈধব্য যে তাহার প্রত্যক্ষ ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? গৃহে শান্তি বিরাজ করিবে, এবং উপযুক্ত সময়ে

সুসন্তান লাভ করিয়া সুখী হইবেন, ইহাই ত বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায়, লোকে ধন-লোভে অন্ধ হইয়া, উপযুক্ত গণ, রাশি, বর্ণ প্রভৃতি মিল না করিয়াই, সন্তানাদির বিবাহ দিয়া থাকেন। যে কোষ্ঠী দেখাইয়া মিল স্থির করিতে হইবে, উপযুক্ত জ্যোতিষী দ্বারা তাহা প্রস্তুত না হইয়া, সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহা গণনা করান হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার ফল যে বিপরীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

উপযুক্ত মিল না থাকিলে যে দাম্পত্য প্রেমে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা স্থির-সিদ্ধান্ত। যেখানে দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, সেইখানেই অশান্তি-রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় যে এখন শিষ্ট শান্ত, বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট এবং দীর্ঘায়ুঃ সুসন্তান জন্মে না, শাস্ত্রাচারে বীত-শ্রদ্ধ যে [illegible] কারণ, ইহাই অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অভিমত। যখন জীবন-সংগ্রামে নর-নারী পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, যখন একের উত্থানে অপরের অভ্যুত্থান, যখন একের অবনতিতে অপরের অধঃপতন, তখন যদি স্বামি-স্ত্রী অব[illegible] কার্য্যসম্পন্ন, কুপ্রথার বশীভূত, অসৎপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট এবং শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে কি প্রকারে মনুষ্য-জীবনের উন্নতি সাধিত হইবে? ফলতঃ মানব-জীবনের যাবতীয় উন্নতিসাধনের মূল বিবাহ; ঋষিগণ এই মূলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বিবাহসম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রতিপালন করাই প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

মায়া।

১

আমি দাঁড়াইয়াছিলাম।

অবগুণ্ঠনবান্—অবগুণ্ঠনবতী নহে; অবগুণ্ঠনবান্,—তারকেশ্বরের ভাঁজ-করা গামছার দ্বারা অবগুণ্ঠনবান্, সদ্যোস্নাত, উপবীতধারী, বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু-শোভিত, প্রবীণ একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমার হাত ধরিলেন; বলিলেন,—"রাঁধিতে জান?"

আমি ত অবাক্। বাঁকুড়া জেলায় আমার বাড়ী হইলেও, আর রাঁধুনি বামুনের চেহারার সহিত আমার চেহারার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও, আমি রাঁধুনি বামুন নহি। আমি যাহা তাহা পরে জানাইব। আপাততঃ বলিয়া রাখি,—আমি গঙ্গাস্নানের সেই ময়লা কাপড়খানি পরিয়াছিলাম, পৈতাটী লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। পায়ে আমার জুতা ছিল না এবং আমার চেহারাটী উপন্যাসের নায়কের চেহারার সহিত একবারেই মিলিত না। আমার বর্ণ কাল, নাক মণিপুরী, দাঁতগুলি অসমান, এবং কপাল গড়ের মাঠের মত। এইরূপ কামদেব-সদৃশ রূপবান্ আমি যখন আয়নাতে মুখ দেখিতাম, তখন যে আমি কেবলমাত্র আমার নিজের উপরই চটিয়া যাইতাম এমন নহে, আমার বাপ এবং আমার বাবার ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের উপরও আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আমার মার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। কিন্তু আমার চেহারাটা ঠিক আমার বাবার মতই হইয়াছিল।

তথাপি সকল সময়ে আমার মনে থাকিত না যে, আমার রূপ দেখিলে, লোকে আমাকে রাঁধুনি বামুন ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারে না। তাই, যখন সেই ভদ্রলোকটী আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাঁধিতে পার?" তখন আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

পরক্ষণেই বুঝিলাম, ভদ্রলোকটীর কোন অপরাধ নাই, অপরাধ আমার চেহারাটার।

তাহার পর, একটা কৌতূহল, একটা বড় রকম রহস্যের লালসা আমার হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা মতলব মনে মনে আঁটিয়া ফেলিলাম এবং ভদ্রলোকটীকে উত্তর দিলাম;—"হাঁ, আমি রাঁধিতে পারি। আমি একটী চাকুরির চেষ্টায় আছি, আপনার কি রাঁধুনি বামুনের দরকার আছে?"

নাম কি, বাড়ি কোথা, কত মাহিনা ইত্যাদি গোটাকতক প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া একটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে তাঁহার রাঁধুনি বামুন নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে ঘামিয়া, কলিকাতার রাজপথ বহিয়া আমি ভদ্রলোকটীর অনুগমন করিলাম। বেলা সাড়ে নয়টার সময়, একটা গলি রাস্তার ধারে, তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

২

সেটা দোতলা বাড়ী।

কলিকাতায় একটা ভাড়াটীয়া বাড়ীতে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, তাহাতে সে সবই ছিল। সেই অন্ধকার সিঁড়ি, সেই দুর্গন্ধ, সেই জলের কল, সেই চৌবাচ্ছা, সেই সেওলা, সেই পিচ্ছিল, সেই সব। সদরের বসিবার ঘরে, তক্তাপোষে, সেই ময়লা বিছানা, জানালায় সেই ভাঙ্গা কলিকা, কোণে কুণ্ডলীকৃত সেই মাদুর, আর কৃষ্ণবর্ণ কড়িতে সেই দোদুল্যমানই ঝুল। সদর দরজার সম্মুখে সেই স্তূপীকৃত আবর্জনারাশি।

৩

বাবুটীর নাম শ্রীযুক্ত রামরতন মুখোপাধ্যায়। একটা সদাগরি আপিসে তিনি কার্য্য করেন। বড়বাবু—বেতন ২১০৲ টাকা।

রামরতন বাবু, বাটী ফিরিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহারে বসিলেন। খেঁদী আসিয়া বাপের পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—"রান্না কেমন হ'য়েছে বাবা?"

খেঁদী কিন্তু খ্যাঁদা নয়। অতি সুনিপুণ ভাস্করেও তেমন নাক গড়িতে পারিত কি না সন্দেহ। তাহার উপর, তাহার বড় বড় চোখ, এবং কোঁকড়ান কোঁকড়ান মিশ্‌মিশে কাল কেশের রাশি। তাহার রং ফরসা না হ'ক্, কিন্তু তেমন সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তার বয়স তের বৎসর। সে রামরতন বাবুর প্রথম পক্ষের কন্যা।

খেঁদীর মার মৃত্যুর পর রামরতন বাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া দ্বিতীয়পক্ষের পত্নী তৎকালে কলিকাতায়, সেই বাটীতেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছার পীড়া ছিল। ডাক্তার বলিয়া দিয়াছিলেন, আগুন-তাতে তাঁহার অসুখ বাড়িবে। তাই তিনি নিদ্রিত তিন বৎসরের পুত্রটীকে ঝির কোলে দিয়া উপরের ঘরে বসিয়া, পান ও মসলাদি পূর্ণ একটী বড় রকমের পিতলের কৌটা খুলিয়া পান সাজিতেছিলেন, এবং ঝির সঙ্গে শ্যামবাজারের অতুল ভট্‌চাযের গল্প করিতেছিলেন।

খেঁদী ভারি খুসি। আজ পনের দিন হ'ল, বামুনঠাকুর চলিয়া গিয়াছে। সেই দুবেলা রাঁধে। তার বাবা তা'কে 'অন্নপূর্ণা' বলিয়াছেন। তার মাও তাকে খুব ভালবাসেন; তবে বাবা তাকে যত ভালবাসেন, মা তত নয়। খোকা তাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে।

কত্তার প্রশ্ন শুনিয়া রামতনু বাবু বলিলেন "তুই কত রান্না রেঁধেছিস্? এটা কি? লাউ-ঘণ্ট? বাঃ, এটাত বেশ হয়েছে; আর একটু দেত।" আহ্লাদে আটখানা হইয়া, খেঁদী ছুটিয়া গিয়া তাহার কোকনদসদৃশ হস্ত পূর্ণ করিয়া, তাহার হাতের বালাতে ও চুড়িতে টুন্ টুন্ বাদ্য বাজাইয়া, বাবার পাতে আরও খানিকটা লাউঘণ্ট আনিয়া দিল।

উপরের জানালা হইতে, পান সাজিতে সাজিতে, তাহার নূতন মা দেখিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অত ভাল ভাল লাউ-ঘণ্ট খাইও না, পরশু-কার মত আবার বুক জ্বালা করিবে।" কথাটার ভিতর কি দোষ ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতেই সেই ক্ষুদ্র বালিকার উৎসাহটা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল।

আহার করিয়া পান চিবাইয়া সদু ঝিয়ের দ্বারা সজ্জিত কলিকাটীতে বারকতক ফুঁ দিয়া এবং তাহা একটী রবারের নলবিশিষ্ট গড়গড়াতে সংলগ্ন করিয়া, রামরতন বাবু কিছুক্ষণ ধূম পান করিলেন। পরে, জিনের ইজের এবং কাল আলপাকার চাপকানটী একটী ময়লা কামিজের উপর পরিধান করিলেন। তাহার পর চাদরখানি শ্রীরামচন্দ্রের নাগপাশবন্ধনের অনুকরণে বুকে-পিঠে জড়াইয়া অপিসে চলিয়া গেলেন।

৪

আমি রান্না ঘরে ঢুকিয়া, আমার নূতন কার্য্যে লাগিয়া গেলাম।

গিন্নি নীচে নামিয়া, আমাকে কি কি কাজ করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিলেন। ছয় মন কয়লাতে মাস চালাইতে হইবে; সপ্তাহে দেড় সের তেল পাইবে; হাঁড়ি ভাঙ্গিলে নিজের পয়সায় কিনিয়া দিতে হইবে; বাবুর আপিসের বাবুদের যে দিন নিমন্ত্রণ হইবে, সে দিন পোলাও রাঁধিতে হইবে, কালিয়া রাঁধিতে হইবে; কিন্তু অসুখ হইলে, তোমাকে বাটনা বাটিতে হইবে ইত্যাদি।

বাড়িতে ঝি ছিল দুটী। একটী গিন্নির সকের ঝি, সেই যা'র সঙ্গে শ্যামবাজারের অতুল ভট্‌চাযের গল্প হচ্ছিল—সে গিন্নীর বাপের বাড়ির লোক। আর একটী শ্রীমতী সৌদামিনী, ওরফে সদী, সদু ইত্যাদি।

সদু আসিয়া আমার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল। সে কেমন করিয়া ছয় বৎসর সেই এক বাড়িতে চাকরি করিতেছে, কেমন করিয়া সাত সিকা হইতে বাড়িয়া বাড়িয়া তাহার বেতন এখন আড়াই টাকা হইয়াছে, কেমন করিয়া তার সাত ভাই, তার সাতকুড়ি টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছিল এই সব বিবরণ বলিতে লাগিল। তাহার পর খেঁদী আসিল। সদু বলিল, "আমি ছেলে বেলা হ'তে খেঁদুকে মানুষ করেছি কিনা, তাই আমি ওকে খেঁদু বলি; তুমি ওকে 'দিদি' বলো।"

খেঁদী বলিল, "না, না, তুমি আমাকে দিদি ব'ল না বামুন ঠাকুর, আমার নাম 'মায়া'; আমাকে 'মায়া' ব'লে ডেকো।"

৫

আজ একমাস হইল আমি রাঁধুনি বামুন হইয়াছি। রান্না যে এত শক্ত কাজ, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এক এক বার মনে করিতাম, যথেষ্ট হইয়াছে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই। কিন্তু তা'ত করিলাম না। যাহা বহুকাল পাই নাই, কখনও পাইব বলিয়া ভরসা ছিল না, রাঁধুনি বামুন সাজিয়া রাঁধিতে আসিয়া তাহাই পাইলাম।

জানি না কেন মায়া সত্যই আমাকে স্নেহ করিত; আমাকে রান্না শিখাইয়া দিত; আমার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে, হাঁড়ি কিনিবার জন্য পয়সা দিত; তেল ফুরাইয়া গেলে, সদুকে দিয়া তেল আনাইয়া দিত। মায়াকে কি একদিন

আমি তাহার এই স্নেহের প্রতিদান দিতে পারিব ?

৬

সর্বনাশ! মায়া যে আমাকে তাহার নিজের পয়সা হইতে, তেল ও হাঁড়ি কিনিয়া দিত, তাহা গিন্নি জানিতে পারিয়াছেন। হায় বিধাতঃ! সদু ঝিকে তুমি বোবা করিয়া সৃষ্টি কর নাই কেন?

আমি অনেক লোকের চোখে জল দেখিয়াছি; কিন্তু অত বড় চোখে কখনও জল দেখি নাই। গিন্নি বকিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, 'বাবু বাড়ি ফিরিলে সকল কথা বলিয়া দিবেন।' মায়া উপরের জানালায় বসিয়া কাঁদিতেছে। আর তোমরা বিশ্বাস করিবে কিনা বলিতে পারি না, আমিও রান্নাঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমি রাঁধুনি বামুন কিনা;—আমি বড় গরিব লোক। আমার মত একজন গরিব লোকের প্রতি মায়ার দয়া হইত। তাহাদের জন্ত আমার নিজের বেতন হইতে পাছে কিছু খরচ হইয়া যায়, এজন্ত তাহার ভাবনা হইত। গরীবের প্রতি দয়া করা এবং তাহাকে দান করাত অন্তায় কাজ নহে। তবে গিন্নী মায়াকে বকিলেন কেন?

পঁচিশ বৎসরের—সে কুরূপ হউক, রাঁধুনি বামুন হউক—এক যুবার প্রতি তের বৎসরের মেয়ের দয়াটা গিন্নী সোজা চোখে দেখেন নাই। রামরতন বাবু বাড়ি ফিরিলে তাঁহার বুদ্ধির বিস্তর নিন্দা করিয়া বলিলেন "অত বড় মেয়ে আইবুড়ো রাখা ভাল হয় নাই;—তাহার বিবাহ দাও।"

খেঁদীর বিবাহ দিতে রামরতন বাবুর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু স্বঘরের সুপাত্র পাওয়া যাইতেছিল না। তাহার উপর এ সময়ে টাকারও কিছু অভাব ছিল। পোষ্ট অপিসে যে দুশ শত টাকা আছে, তাহাত গিন্নীর অঙ্গে যে রুতনচুড় ও তাবিজ গড়াইতে দিয়াছেন, তাহার দাম দিতেই ফুরাইয়া যাইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও আড়াই হাজার টাকার কম খরচে বিবাহ হইবে না। রামরতন বাবু কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়াছিলেন।

রামরতন বাবু কিন্তু খেঁদীকে কিছু বলিলেন না। কেননা, আমাকে তেল বা হাঁড়ি কিনিয়া দেওয়াতে খেঁদীর যে কোনপ্রকার অপরাধ হইয়াছে, তাহা তিনি বিবেচনা করিতে পারিলেন না। গিন্নী যথার্থই বলিয়াছিলেন, অত বুদ্ধি তাঁহার ছিল না।

তথাপি মায়া আর আমাকে রান্না শিখাইয়া দিবার জন্ত রান্নাঘরে আসিত না। আমিও মনে করিতে লাগিলাম আমার রহস্যের অবসান করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাই।

৭

রামরতন বাবু ইজের চাপকান না পরিয়া ধুতি, পিরান ও চাদর পরিয়া অপিসে গেলেন। তিনি সাহেবকে বলিয়া তখনই বাড়ি ফিরিয়া আসিবেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার ডাকিতে হইবে।

খেঁদীর জ্বরের উপর জ্বর ফুটিতেছে। সদু ঝি আসিয়া আমাকে খবর দিল যে জ্বরের জ্বালায় সে বিছানা ছাড়িয়া, মাটীতে গড়াগড়ি দিতেছে এবং আমাকে দেখিতে চাহিতেছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মহারা হইলাম;—রাঁধুনিগিরি ভুলিয়া গেলাম। অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে মায়ার শুইবার ঘরে উপস্থিত হইলাম। মায়া! মায়া! মায়া বলিল;—"তুমি আসিয়াছ? আসিও না, মা জানিতে পারিলে তোমাকে বকিবেন।" আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার মাথায় হাত দিলাম। মায়া বলিল,—"তোমার হাত কি ঠাণ্ডা!"

আমি তাহার হাত ধরিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার চিবুক ধরিয়া তাহার

দিব দেখিলাম। তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নীচে চলিয়া আসিলাম।

গিন্নী আপনার শুইবার ঘরে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রাভিভূত ছিলেন। মায়াকে যে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

নিম্নতলে আসিয়া আমি সদুকে বলিলাম, "সদু, উপরে তুমি মায়ার কাছে যাও, আমি এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া আমি ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাস। তাহাতে দুপর বেলা। তদুপরি আবার কলিকাতার রাজপথ। গরম যে কেমন ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল না; আমি সেই গরমে,—মাথায় ছাতি ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না—রাস্তা দিয়া ছুটীতে লাগিলাম। রাস্তায় বড় একটা লোক ছিল না; থাকিলে আমাকে পাগল বলিয়া ধরিত।

তোমাদের কাছে বলিয়া রাখি আমি এক জন ডাক্তার,—কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজের এক বৎসরের এম্ বি পরীক্ষায় আমি সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু, মায়াকে আজ যদি বাঁচাইতে না পারি, তবে এ জীবনে আমি আর কখনও কাহারও চিকিৎসা করিব না।

ভগবন্! ভগবন্! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি আছ। আমি নাস্তিক নহি। মায়াকে, আমার মায়াকে বাঁচাইয়া দাও, নহিলে আমি বাঁচিব না।

মাকে যখন হারাইলাম তখন বাবা ছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মার শোক কতক ভুলিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর বাবাও চলিয়া গেলেন। সংসারে আর আমার কেহ রহিল না। মনে করিয়াছিলাম, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব, কিন্তু তাহা হইল না। একটা তামাসা করিতে গিয়া, মায়াকে দেখিলাম। মায়াকে দেখিয়া সংসারের মায়া কাটাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না।

মায়া যদি চলিয়া যায়, আমি তাহলে বাঁচিব না।

৮

মায়া বাঁচিয়াছে; কিন্তু বাঁচিয়াও সে মরিয়া আছে।

মায়ার চিকিৎসার জন্ত আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহাতে রামরতন বাবুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বুঝি সত্য হইবে। পুরুষ মানুষ সকল সময় সকল রূপ বুঝিতে পারে না। তিনি মায়াকে আমার সম্মুখে বাহির হইতে বারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে একদিন আড়াল হইতে দেখাইলেন যে মায়া আমার সহিত কথা কহিতেছে।

মায়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার চলিতে লাগিল। একদিন খোকাকে কোলে করিয়া মায়া সেই অন্ধকার সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতেছিল। সিঁড়িতে একটা আমের খোসা পড়িয়া ছিল, সে দেখিতে পায় নাই। তাহার উপর পা দেওয়াতে সে পড়িয়া গেল। তাহাতে খোকার মাথায় একটু লাগিয়াছিল। সেই সূত্রে কর্ত্তা ও গিন্নী মায়াকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন। আর একদিন খোকার দুধ গরম করিয়া উপরে লইয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গিন্নী—আমার লিখিতে কষ্ট হইতেছে—মায়ার চুল ধরিয়া উপরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কর্ত্তা ঠিক করিলেন যে, আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু গিন্নী তাহাতে বাধা দিলেন। বলিলেন,—"ওকে তাড়াইয়া দিলে তোমার ভগমরী মেয়েও ওর সঙ্গে চলিয়া যাইবে, তখন তোমার মুখে চুণকালী পড়িবে।"

কর্ত্তা গিন্নীতে ভাবিতে লাগিলেন, পাগ মায়াকে লইয়া কি করিবেন। শেষকালে গিন্নী এক যুক্তি বাহির করিলেন,—"আমি শুনিয়াছি বামুন ঠাকুর আমাদের স্বঘর, তাহারই সহিত খেঁদীর বিয়ে দাও ; যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল হউক ; আর তুমিও কলঙ্কের হাত হইতে এড়াইয়া যাও।"

রামরতন বাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন ; পত্নীর উপদেশটী তাঁহার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বামুন ঠাকুরের সহিত মেয়ের বিবাহ দিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কি বলিয়া ? কিন্তু গিন্নী আবার যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, "লোকে ত কেহ বামুন ঠাকুরকে চিনে না ; তুমি বলিবে পাত্রটী মূর্খ বটে, কিন্তু বড় ভারি কুলীন, তাহাতে সকল দোষ কাটিয়া যাইবে। আর কলিকাতার বাসাতে কিংবা দেশের বাটীতে বিবাহ না দিয়া, হুগ্‌লী কিংবা বর্দ্ধমান এমনই একটা যায়গায় গিয়া বিবাহ দাও। সেখানে দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করিও, কিন্তু কলিকাতার লোক যাহারা যাইবে না বুঝিবে, তাহাদেরই নিমন্ত্রণ করিবে। দেশের লোক কিছু বামুনঠাকুরকে দেখে নাই ; তাহারা কিছুই জানিতে পারিবে না।"

উঃ গৃহিণীর কি বুদ্ধি! রামরতন বাবু গলিয়া গিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

৯

সন্ধ্যার আঁধারে মায়া একাকী গৃহ-কোণে বসিয়াছিল। আমাকে পার্শ্বে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল ; বলিল, "বামুন ঠাকুর, তুমি এখানে আসিয়াছ ; মা যদি জানিতে পারে, আমাদের দুজনকেই খুব বকিবে।"

আমি বলিলাম,—"দেখ মায়া ; আজ খুব একটা কাজের কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তুমি ছেলেমানুষ হইলেও তোমার খুব বুদ্ধি আছে ; তুমি ভেবে চিন্তে উত্তর দিও।"

আমার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মায়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি ?"

আমি। তোমার বাবা আর মা ঠিক করিয়াছেন যে, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন।

মায়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিল। আমি আবার বলিলাম ;—'দেখ, তোমার যদি একটা রাঁধুনি বামুনকে বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা না থাকে, তা, আমাকে বল, আমি তাহলে, কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হব না ; তোমার জন্ত আর একটা ভাল বর আনিয়া দিব।'

মায়া। তোমার ভাল বর আনিতে হইবে না। বাবা যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন, সেই আমার বর হ'বে। তুমি সেদিনও বিয়ের কথা বল্‌ছিলে, আজও বল্‌ছ ; এ কথা তোমার সহিত কহিতে আমার লজ্জা হয়। তোমার কি এসব কথা কহিতে একটুও লজ্জা হয় না ?"

আমি। না মায়া, আমার লজ্জা হয় না।

মায়া। দেখ বামুন ঠাকুর, তুমি কিন্তু বামুন ঠাকুর নও, আমি জান্‌তে পেরেছি।

আমি। কেমন করে ?

মায়া। তা' আমি তোমায় বল্‌বো না।

আমি। আমি কিন্তু সত্যই বামুন ঠাকুর।

মায়া। কখনও নয়। বামুনঠাকুরে কি ইংরাজি জানে ?

আমি। আমি ত ইংরাজি জানি না।

মায়া। জান। তুমি মিছে কথা বল্‌ছ। সেই সে দিনে, ডাক্তারে ওষুধ লিখে দিয়ে গেল ; তখন কেউ ছিল না ; তুমি সেটা প'ড়ে দেখ্‌লে। আমিত তখন ঘুমুইনি, আমি জেগে ছিলাম, সব শুনেছি।

আমি। তবে, আমি ইংরাজি জানি। তবে তুমি আমার বিয়ে কর্ত্তে রাজি ? কেমন ?

মায়া। তা আমি জানি না। তুমি কিন্তু ভারি বেহায়া, ছি!

১০

আমি হাসিয়া চলিয়া আসিলাম। বুঝিয়া আসিলাম, মায়া সত্যই আমাকে ভালবাসে। কি স্বার্থত্যাগ! ভালবাসে বলিয়া, যে বয়সে অন্য মেয়েরা রাজপুত্র বিয়ে কর্ত্তে চায়, সেই বয়সে একটা রাঁধুনি বামুনকে বিবাহ করিতে সে প্রস্তুত। ইহাকে লইয়া, আমি সংসারে স্বর্গ রচনা করিতে পারিব।

তোমাদের এখনও বলি নাই যে, আমার একটা নিজের বাসা ছিল, সেখানে বামুন চাকর সব ছিল। আমি রাত্রে রামরতন বাবুর বাটীতে শুইতাম না। আপনার বাসায় যাইয়া শুইতাম, আপনার বাসায়, আপনার বিছানায় শুইয়া আমি সেই স্বর্গের চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সে যে কি সুখ, তা যে না অনুভব করিয়াছে, সে বুঝিতে পারে না।

এক দিকে অর্থের চিন্তা নাই। কেননা, বাবা ওকালতি করিয়া, আমার জন্য বার্ষিক কেবল যে ৮ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী রাখিয়া গিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য বেঙ্গলব্যাঙ্কেও নগদ চারি লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যদিকে, সেই মনোমোহিনী বালিকার, সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা দেবীর, সেই মূর্ত্তিমতী শান্তির অভূতপূর্ব্ব রূপচিন্তা। মায়া যদি আমার হয়, তবে আমার এ কাল রূপ আলো হইবে। অগ্নিযুক্ত অঙ্গারের ন্যায়, এ কাল, লাল হইবে।

১১

আজ রবিবার। সকালে আসিয়া, আমি রান্না করিলাম। সকলের আহারাদি হইয়া গেল। রামরতন বাবু বলিলেন;—"বামুন ঠাকুর, তোমার সহিত একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে।" কথাটা কি আমি বুঝিলাম।

বাহিরের ঘরের সেই তক্তাপোষে কর্ত্তা বসিয়া ছিলেন। বেলা আন্দাজ একটার সময় আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, দেখ ঠাকুর, আমি শুনিয়াছি, তোমরা বড় কুলীন, আমাদের পাল্টী ঘর। আমার মেয়ে বড় হইয়াছে, পাত্র পাওয়া যাইতেছে না। তুমি দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নহ। গিন্নীর ইচ্ছা, তোমার সহিত খেঁদীর বিবাহ দেন। খেঁদীরও মত আছে। কিন্তু আপাততঃ কথাটা গোপন রাখিতে হইবে। আমি রথের ছুটীতে বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। সেখানে মিঠা পুকুরের ধারে, রাজবাটীর দেওয়ান মুকুয্যে মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বে একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিয়াছি। সেইখানে বিবাহ হইবে। তোমার মত কি?

আমার আবার মত কি? আমি হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু সেই পাষাণী স্ত্রীলোকটার উপর আর কর্ত্তার উপর আমার বড় রাগ হইল। যাহারা তের বৎসরের কন্যাকে কলঙ্কিনী ভাবিতে পারে এবং এক অজ্ঞাতকুলশীল, কুরূপ রাঁধুনি বামুনের সহিত বিবাহ দিতে পারে, তাহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া, ধরার ভার কমাইয়া দেওয়া উচিত। মানুষের ভিতর এমন পাষণ্ড কজন আছে, কে জানে?

১২

আমরা বর্দ্ধমানে আসিলাম।

রাজবাটী, দেলখোসা বাগান, একশ আট শিবমন্দির, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি বর্দ্ধমানের দর্শনীয় স্থানগুলি গিন্নী দেখিয়া লইলেন। সর্ব্বমঙ্গলার ঠাকুর বাটীতে একদিন পূজা দেওয়া হইল; এবং আমাদের—মায়ার ও আমার বিবাহ হইয়া গেল।

বউভাত কোথায় হইবে?

আমি বলিলাম, "আমাদের বাড়িতে?"

কর্ত্তা। কোথায় তোমাদের বাড়ি?

আমি। বাঁকুড়া জেলার, কোতলপুর থানার অন্তর্গত সোনপুর গ্রামে।

সদু ঝি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল;—"তোমার বাড়ি সোনপুর? এতদিন আমাকে বল নাই কেন? আমার বাড়ি শিরাস, আমি সোনপুরের সকলকেই চিনি; তুমি কা'দের ছেলে গা?"

"বাঁড়ুয্যেদের।"

"বাঁড়ুয্যেদের? তোমার নামটী কি বলুন্ ত।"

পাঠকগণ, হাসিও না। আমাদের বাঁকুড়া জেলার ইতর লোকের মধ্যে সম্মানের ভাষা ঐরূপ।

আমি বলিলাম,—"আমার নাম, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

আমি, আমার নাম, কখনই গোপন করি নাই। কর্ত্তা আমার নাম বরাবরই জানিতেন। সেই নামেই আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সদু ঝি, আমাকে বামুন ঠাকুর বলিয়াই জানিত।

আমি নিকটবর্ত্তী দশ বারখানা গ্রামের জমিদার; সে অঞ্চলে আমাকে কে না জানিত? আমার নাম শুনিয়া, সদু আমার পা ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

গিন্নী নিকটে আসিয়া বলিলেন;—"সদু, তুই অমন কচ্ছিস্ কেন? বামুন ঠাকুরের—যাঁ! জামাইএর পা ধরিয়া অমন টানাটানি করিতেছিস্ কেন?"

সদু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল;—"ওগো, ওগো, ওঁকে আর বামুন ঠাকুর বলিও না; ও তোমাদের মতন সাতজনকে রাঁধুনি রাখিতে পারেন। আগে চিনিতে পারি নাই, এখন চিনিয়াছি। আমার মাসী ওঁদের বাড়ীতে ঝি ছিল; আমি একবার মাসীর কাছে গিয়া ওঁকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। ওঁরা সোনপুরের জমীদার। ওঁদের পূজার দালানে যোলটা ঝাড় আছে।"

কর্ত্তা গিন্নি মুখ বিশুষ্ক করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর মায়া কি করিল বল দেখি?

১৩

আমার আখ্যায়িকা লেখা শেষ হইয়াছে। তোমাদের কেমন লাগিল?

সোনপুরের জমীদারের গৃহিণী হইলেও, মায়া এখনও আমায় রান্না শিখাইয়া দেয়। আমরা বাগানের গাছতলায় বসিয়া এখনও কত দিন রাঁধি। মায়া কত দিন আমাকে লাউঘণ্ট রাঁধিয়া দিয়াছিল। আমি রাশি রাশি তাহা খাইয়াছিলাম, কিন্তু কখনও আমার বুক জ্বালা করে নাই।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

জী[illegible]নচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

নকুল—চতুর্থ পাণ্ডব, সহদেবের সহোদর। অশ্বিনী[illegible] ঔরসে পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্রে মাদ্রীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী পতির সহমৃতা হইলে, ইনি বিমাতা কুন্তীর দ্বারা পালিত হন। পরে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অসিযুদ্ধ ধারণ বিষয়ে ইনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। পাঞ্চালীর গর্ভে ইঁহার শতানীক নামক এক পুত্র হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া [illegible] নিকট

কর সংগ্রহ করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে গ্রন্থিক নাম ধারণপূর্ব্বক অশ্বাধ্যক্ষরূপে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বহু কৌরবসৈন্যের নিধন সাধন করেন। ষোড়শ দিবসের যুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর নকুল ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া গর্ব্বহেতু পাপস্পর্শ হওয়ায় নকুল সশরীরে স্বর্গে যাইতে না পারিয়া সুমেরু শিখরে পতিত হন।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র। বেহুলা নাম্নী এক রূপগুণসম্পন্না কন্যার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হয়। চাঁদ সদাগর প্রথমে মনসাদেবীর বিদ্বেষ্টা ছিলেন বলিয়া, বাসর ঘরে নখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পরে পতিগতপ্রাণা বেহুলার স্তবস্তুতিতে মনসাদেবী তুষ্টা হইয়া নখিন্দরের পুনর্জ্জীবন দান করেন।

নন্দ—১। কৃষ্ণের পালক-পিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর ভার্য্যার নাম যশোদা। কৃষ্ণের জনক বসুদেবের সহিত ইহাঁর মিত্রতা ছিল। সেই জন্যই বসুদেব কৃষ্ণকে ইহাঁর আশ্রয়ে রাখেন। তাঁহারই পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ইনি তাঁহার বিরহশোকে অত্যন্ত কাতর হন, কারণ কৃষ্ণকে ইনি আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছিলেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন।

২। শূদ্রবিশেষ। ইনি নন্দবংশ নামক মগধের রাজশ্রেণীর আদি পুরুষ। মহারাজ মহানন্দের ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি যথাকালে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, বররুচি কিছুকাল ইহাঁর মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। অনুমান খৃষ্টের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইহাঁর নামানুসারে নন্দবংশ নামে খ্যাত। এই বংশীয় আট জন রাজা এক শত বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।

নন্দিনী—বশিষ্ঠের হোমধেনু। সুরভির গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মহারাজ দিলীপ ভার্য্যাসহ এই ধেনুর সেবা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন। একদা সস্ত্রীক বসুগণ বনবিহার করিতেছিলেন। দ্যু নামক বসুর বনিতা নন্দিনীর দর্শন পাইয়া ইহাঁকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পতির নিকট অনুরোধ করেন। দ্যু অন্য বসুর সাহায্যে ইহাঁকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের শাপে তাঁহাদিগকে ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই কামধেনু নন্দিনীর নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ হয়। বিশ্বামিত্র তখন রাজা। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর নন্দিনীর সহায়তায় লোকজনসহ রাজাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। তাহা দেখিয়া রাজার লোভ হইল। তিনি নন্দিনীকে লইতে চাহিলেন; বশিষ্ঠ কিন্তু ইহাঁকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বামিত্র তখন বলপ্রকাশে নন্দিনী-গ্রহণের অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিবর ধেনুর দ্বারা অসংখ্য

দেবতাদের স্তুতি করিয়া তাঁহাদের সহায়তার সহিতে বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করেন। বিশ্বামিত্র তখন বুঝিলেন, ব্রহ্মতেজের নিকট, তপঃপ্রভাবের নিকট, অন্য সকলই নগণ্য।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর, ইনি দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। ইনি একদা গুরুসহ দক্ষালয়ে গমন করেন। তথায় দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে ছাগমুণ্ড হইবার অভিশাপ প্রদান করেন।

নমুচি—দৈত্যবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইন্দ্র অন্যান্য অসুরদিগকে বধ করিয়া অবশেষে ইহার হস্তে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। পরে, রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাকে বধ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহাকে না রাত্রি না দিবা অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে বধ করেন।

নরক—দৈত্যবিশেষ। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে, তদীয় ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি শিশুকালে একদা একটি মৃত-নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ইহাঁর নাম "নরক" রক্ষিত হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজতনয়া মায়ার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইহাঁর ভগদত্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়। মাতার অনুরোধে পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রভাবে নরকাসুর অজেয় অজেয় হইয়া ক্রমে অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিল, এবং বাণ, কংস প্রভৃতি দুরাচার অসুরদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক সাধু সজ্জনদিগের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। এমন কি দেবমাতা অদিতিরও কুণ্ডল অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইল না। দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করিয়া অসুর স্বপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। অবশেষে, পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে ভূভারহারী জনার্দ্দন লোকহিতার্থে নরকাসুরের প্রাণবধ করেন।

নরনারায়ণ—বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয়। ধর্ম্মরাজ পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইহাঁদের জন্ম। কথিত আছে যে, বিষ্ণুর অংশে ইহাঁদের উদ্ভব। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরীর ভিন্ন হইলেও, অন্য সর্ব্ববিষয়ে ইহাঁরা এক ছিলেন। বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক উভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ইহাঁদের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরাসহ কামদেবকে ভ্রাতৃযুগলের তপোভঙ্গার্থে প্রেরণ করেন। দেবতার মদগর্ব্ব ও অপ্সরার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ইহাঁরা রমণীরত্ন উর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষে যথাক্রমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন।

নরসিংহ—বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এই অবতারে হিরণ্যকশিপু হত হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করে, এবং দেবগণেরও অবধ্য হওয়ায় ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া উঠে; এমন কি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণবিনাশের জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত হরিভক্তের বিনাশ কিছুতেই নাই। হিরণ্যকশিপু

প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার হরি সভাস্থ স্ফটিক-স্তম্ভে আছেন কি না? প্রহ্লাদ, আছেন বলায়, হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে যেমন স্তম্ভ ভগ্ন করিলেন, অমনই তাহার মধ্য হইতে বিষ্ণু অর্দ্ধ-সিংহ ও অর্দ্ধ-নরের মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজের প্রাণবধ করিলেন।

নল—নিষধপতি নলের বৃত্তান্ত এইরূপ;— ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা বীরসেনের পুত্র। ইনি যেমন রূপবান্ তেমনই গুণবান্ ছিলেন। সত্যপালন ইহাঁর দৃঢ়ব্রত ছিল। ইনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পুণ্যকর্ম্মের জন্য নল এত দূর প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাতে ইনি পুণ্যশ্লোক নামে অভিহিত হইয়া নরোত্তম জনার্দ্দনের সহিত তুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন;—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা
পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী
পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

বিদর্ভরাজকুমারীর অসামান্য রূপ-গুণের কথা শুনিয়া নলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একটি কামচারী মরাল ইহাঁর দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক ইহাঁর রূপ-গুণের বিষয় বিবৃত করে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। অতঃপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর ঘোষিত হইলে নল বিদর্ভে যাত্রা করিলেন। পথে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য ইহাঁকে অনুরোধ করিলেন। নল দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাভিলাষী দেবগণের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, তাঁহারা ইহাঁকে আপনাদের দূতস্বরূপ দময়ন্তীর নিকট যাইতে বলিলেন। সত্যপরায়ণ নল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বয়ং দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হইয়া আপনার অঙ্গীকার পালন জন্য দূতের বেশে বিদর্ভাভিমুখে চলিলেন, এবং দেববরে অন্তের অদৃশ্যভাবে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। নল কিন্তু আত্মসংযমন করিয়া রাজকন্যার নিকট দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সত্যপালন জন্য ইহাঁর আত্মোৎসর্গের এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া, দময়ন্তী ইহাঁর উপর অধিকতর প্রীতা হইলেন, এবং সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে যে ইহাঁকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নল দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া ইহাঁকে অভীষ্ট বর প্রদান-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। নল ভার্য্যা-সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কাল-ক্রমে ইহাঁর ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হইতে দেবগণ যৎকালে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কলি তাঁহাদের নিকট দময়ন্তীর দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরমাল্য প্রদানের কথা শ্রবণে অত্যন্ত [illegible] হইয়া নলদময়ন্তীর অনিষ্ট চেষ্টায় [illegible] হইলেন। কলি দ্বাদশ বৎসর নলের

শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া তাহা না পাইয়া একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। দৈবাৎ একদিন নল মূত্রত্যাগ করিয়া পদধৌত না করিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। সেই ছিদ্র পাইয়া কলি ইঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, কলির উত্তেজনায় নল ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরের বহির্দ্দেশে তিন অহোরাত্র বাস করিলেন। পুষ্করের শাসনে কেহ ইঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করায়, অবশেষে ইঁহারা বনে গমন করিলেন, এবং তিন দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধার তাড়নায় আহার্য্যের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটি পক্ষী দেখিয়া ধরিবার জন্য নল তাহাদের উপর আপনার পরিধেয় বস্ত্র নিক্ষেপ করায় তাহারা বস্ত্রসহ উড্ডীয়মান হইল। এইরূপে বসনহীন হইয়া ইনি ভার্য্যার বস্ত্রের একাংশ পরিধান করিলেন। দময়ন্তীকে বিদর্ভে যাইবার পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি স্বামীকে ঈদৃশ দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতা হইলেন। অনন্তর, পর্য্যটন করিতে করিতে উভয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে একান্ত অভিভূত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, এবং অবসাদ হেতু উভয়েই অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নল জাগরিত হইলেন, এবং শরীরস্থ কলির প্ররোচনায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়া আপনার পরিহিত বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া পতিপ্রাণা পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনান্তরে গমন করিলেন। অতঃপর তিনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দহ্যমান কর্কোটক নাগের কাতর ক্রন্দন শ্রবণে দ্রুতপদে তথায় যাইয়া নাগকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগবর নলের স্পর্শে নারদের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ নলকে দংশন করিলে ইনি বিবর্ণ হইয়া গেলেন। অতঃপর আর ইঁহাকে নল বলিয়া চিনিবার কাহারও উপায় রহিল না। কর্কোটক ইঁহাকে অযোধ্যায় গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে নল বাহুক নাম ধারণপূর্ব্বক অযোধ্যানাথের অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে অসূর্য্যম্পশ্যা, সাধ্বী, কোমলাঙ্গী দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গে পতিকে নিকটে না দেখিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন; তাঁহার মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। অবশেষে বহু ক্লেশভোগ করিয়া তিনি অতিকষ্টে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বামীর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বার্ত্তাসহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, নল তাহার উত্তর দিলেন। স্বামীর অযোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া দময়ন্তী আপনার মিথ্যা পুনঃ স্বয়ংবরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তীর স্বয়ংবরের নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বদিনে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নলের অশ্ববিদ্যায় অসামান্য দক্ষতার প্রভাবে একদিনে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ গমন দুরূহ হইল না। নলের অশ্ববিদ্যায় বিস্মিত হইয়া অযোধ্যাপতি আপনার অক্ষবিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নলকে বিস্মিত করিলেন। উভয়ে তখন স্ব স্ব বিদ্যার বিনিময় করিলেন। অক্ষবিদ্যা প্রাপ্ত হইলে, নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইলেন। বিদর্ভে

উপস্থিত হইয়া নল অশ্বশালায় অন্যান্য সারথিদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি দেববরে অন্যান্য অগ্নি ও জল ব্যতিরেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলে, দময়ন্তী বুঝিলেন যে, ঋতুপর্ণের সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্যান্য উপায়ে দময়ন্তী সারথির নলত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ইঁহার নিকট গমন করিলে তিন বৎসর পরে উভয়ে মিলিত হইলেন। অনন্তর কর্কোটকের নির্দ্দেশানুসারে নল আপনার স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঋতুপর্ণ রাজা নলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। কিছু দিন পরে নলও আপনার রাজ্যে যাইয়া পুষ্করকে দ্যূতে বা যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর দ্যূতে পরাজিত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে, নল দময়ন্তীকে আপনার রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নলকূবর—কুবেরের পুত্র। অপ্সরা রম্ভা একদিন বেশভূষা করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ইঁহার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে পথে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুচিত বলপ্রকাশ করেন। রাবণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রম্ভা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের দুরাচারের কথা প্রকাশ করিলে ইনি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া রাবণকে অভিসম্পাত করেন যে, অতঃপর রাবণ কোনও স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই অভিশাপপ্রযুক্তই রাবণ সীতাকে হস্তগত করিয়াও বলপ্রকাশে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সাহসী হয় নাই।

নলকূবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নগ্নবেশে রমণীগণসহ জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় নারদের যথোচিত সম্মান না করায় ঋষিবর ইঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে ইঁহারা শাপমুক্ত হন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে আর এক দিন অন্নদা ইঁহাকে এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মিনী ও চন্দ্রাকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। ইনি ভবানন্দ মজুমদার এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী নামে জন্মগ্রহণ করেন।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। নহুষ রাজার পিতার নাম আয়ু। নহুষ অশোকসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি ইঁহার ছয় পুত্র হয়। ইনি অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও পুণ্যবান্ ছিলেন। ইনি হুণ্ড নামক দৈত্যের বধসাধন করিয়া তাহার অত্যাচার হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করেন। ইঁহার শাসনে দস্যুভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। নহুষ কেবল বাহ্য শত্রুর দমন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, আপনার অন্তঃশত্রু রিপুগণকেও যত্নসহকারে শাসনে রাখিতেন। ইনি সাধনা দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণরূপে ইঁহার বশতাপন্ন ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও ইঁহার ভোগবিলাস ছিল না। একদা ইনি অজ্ঞানতা-বশতঃ গোবধ করিলে, মহর্ষিগণ ইঁহার

সেই পাপ একাধিক-শত সখ্যক পাপে পরিণত করিয়া ইহাঁকে পাপযুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবধ-পাপে লিপ্ত হইয়া আত্ম-গোপন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় রাজার অভাবে ত্রৈলোক্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ খ্যাতনামা নহুষকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দেবরাজপদের জন্য মনোনীত করেন। এতদিন পরে নহুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া ইনি ভোগ-বিলাসে রত হইলেন। ক্রমে ইহাঁর মন পাপ-পথে ধাবিত হইল, এবং পূর্ব্বে ধর্ম্ম-মার্গে যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাপ-পথেও তদনুরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রাণী শচীদেবীকেও ভার্য্যা-ভাবে পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। শচী বৃহস্পতির পরামর্শে ভাবিয়া দেখিবার জন্য কিছুদিন অবকাশ লইলেন। ইতো মধ্যে নহুষের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ইনি মুনি ঋষিদিগের দ্বারা আপনার শিবিকা বহাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন অগস্ত্য ঋষি ইহাঁর শিবিকা বহন করিতে যাইয়া পদস্পৃষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানে ইহাঁকে সর্পরূপে পরিণত করিলেন। নহুষ তখন বৃহৎ অজগরের রূপ ধারণ করিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘ-কাল পাপের ফল ভোগ করা হইলে পর পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীম ইহাঁর নিকট গমন করিলে ইনি ভীমকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তখন যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত আলাপে নহুষ পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব পুণ্যবলে পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

নাণক—ধর্ম্মপ্রচারকবিশেষ, আধুনিক শিখ-ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। লাহোর নগরের পাঁচক্রোশ দক্ষিণে তাবন্তী (বর্ত্তমান নাণকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালু বেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারির কার্য্য করিতেন। নাণক বাল্যকালে অতি শান্তস্বভাব ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত, পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতেই ইহাঁর মন ধর্ম্মপথের পথিক হইতে আরম্ভ করে। সন্ন্যাসী, ফকির দেখিলেই নাণক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অতঃপর নাণক একটী দোকানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। একদা দোকানের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ইনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথে কয়েক-জন সন্ন্যাসী দেখিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। সাধুপুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নাণক আপনার দোকানপাট ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ইহাঁর এমন ভক্তি হইয়া উঠিল যে, সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তদ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ন্যাসী-দিগকে প্রদান করিলেন, এবং অবশেষে শূন্যহস্তে প্রতিগমন করিলেন। এই ব্যাপারে নাণকের পিতা অতিশয় দুঃখিত

ও কুপিত হইলেন, এবং অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারী না হইলে পুত্রকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। অগত্যা নাণক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে ভগিনী নাণকীর গৃহে গমন করিলেন, এবং তথায় ভগিনী ও ভগিনীপতির প্ররোচনায় এক খানি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এই সময়ে নাণকীর প্রযত্নে সুলক্ষণা নাম্নী এক রমণীর সহিত নাণ-কের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর ইনি সুলতানপুরে পৃথক্ গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে ইহাঁর দুইটি পুত্র হইল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নাণকের চিরপোষিত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। সংসারের মায়া আর সে প্রবল বন্যাস্রোতের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া মমতা কাটাইয়া নাণক সপ্তবিংশতিবৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। সেই বেশে ইনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত আন্তরিকতা না পাইয়া ইহাঁর মন অতি-শয় ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা নগরী পর্য্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে যে, তথায় ইনি একদিন মসজিদের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অনেক মোল্লা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ়বাক্যে ইহাঁকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, ইনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মোল্লা সাহেব! রাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পরমেশ্বর নাই, দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুইখানি সরাইয়া দিন।" মোল্লা সাহেব নির্ব্বাক্ হইলেন। এইরূপে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কোথাও মনের শান্তি না পাইয়া, নাণক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হইলেন।

অতঃপর, ধর্ম্মার্থ দেশভ্রমণের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, পরিজনবর্গের পরিত্যাগে সংসারমায়া হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভা-বনা নাই দেখিয়া, এবং গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নাণক পুনরায় গৃহী হইতে অভিলাষী হইলেন, এবং গুরুদাসপুর জেলার অধীন ইরাবতী তীরস্থ করতালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় পুত্রকলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসারী হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ইনি একমাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পবিত্র চরিত্র, সরল, অমায়িক ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশে অনেকে মোহিত হইয়া ইহাঁর শিষ্য হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসাধনা করিতে ইনি সকলকে উপদেশ দিতেন, এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন। ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ইনি হিন্দু, মুসলমান সকলেরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

নারদ—দেবর্ষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ব্রহ্মা ইহাঁকে সৃজনকার্য্যভার গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ঈশ্বরসাধনা ও ভগবৎ প্রাপ্তির বিঘ্নাশঙ্কায় ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, বিরিঞ্চির

অভিশাপে ইহাঁকে গন্ধর্ব্ব ও মানব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন, এবং তন্ময়চিত্তে তপোরত হইয়া, হরিসাধনা করিতে ভালবাসিতেন। ইনি কামচর ছিলেন, এবং সর্ব্বত্র ইহাঁর গতিবিধি ছিল। আবশ্যকমত ইনি সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেন। ইনি ঘটক হইয়া হরপার্ব্বতীর বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। ধ্রুব ইহাঁর নিকট হরি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে ইনি দ্বারকায় সংবাদ প্রদান করিয়া দৈত্যবিনাশের সহায়তা করেন। ইহাঁর চেষ্টায় অনেক অসুরের জীবনান্ত হয়। পাণ্ডবগণ ইন্দ্র-প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে, দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে দ্রৌপদীর জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে উপদেশ দেন। ফলতঃ সকল ঘটেই নারদকে উপস্থিত দেখা যায়। ইনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। পরে উলুকেশ্বরের নিকট বহুবর্ষ গান্ধর্ব্ববিদ্যার আলোচনা করিয়া কতক পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহাঁর মনে সঙ্গীত বিষয়ে গর্ব্বভাবের উদয় হয়, কিন্তু দর্পহারী অচিরে ইহাঁর দর্প চূর্ণ করেন [গঙ্গা দেখ]। পরিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণা-বতারে তাঁহার নিকট গানযোগ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে কৃতার্থ হন। বীণা-যন্ত্র ইহাঁরই সৃষ্ট। ইনি নারদ-সংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। নারদপ্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। ইহাঁর রচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত।

নিকুম্ভ—১। রাক্ষসবিশেষ। রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তৎপত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। লঙ্কাসমরে এই রাক্ষস নিহত হয়।

২। দৈত্যবিশেষ, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা। প্রদ্যুম্নের হস্তে বজ্রনাভ নিধন প্রাপ্ত হইলে, নিকুম্ভ যাদবদিগের ছিদ্রা-ন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণপ্রমুখ প্রধান প্রধান যাদববীরগণ প্রভাসে জলবিহারে রত হইলে, সেই অবকাশে নিকুম্ভ দ্বার-কায় গমন করিয়া ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সহ দানবের অনুসরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দৈত্যের গদাঘাতে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাহীন হন। স্বয়ং কৃষ্ণও ইহার গদাপ্রহারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি চক্রাঘাতে অসুরের প্রাণবধ করেন।

৩। অসুরবিশেষ, ত্রিপুরের ভ্রাতা। ত্রিপুর নিহত হইলে, নিকুম্ভ তয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভে দেবগণের অবধ্য হয়। বরদৃপ্ত হইয়া অসুর সাতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠে। বসুদেব-সখা ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুম্ভ তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ ইহার যথার্থ যাজ্ঞা করেন। স্বর্গ হইতে জয়ন্ত ও প্রবর কৃষ্ণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অসুরের জীবনান্ত করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

আত্মারহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আত্মার নিরঞ্জনত্ব

সম্ভবতঃ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মা নিত্য বলিয়া আপনা আপনি তাঁহার নাশের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, নাশজনক অন্য কোন পদার্থের সংযোগ জন্য বিকারপ্রাপ্তি হইয়াও ত তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে, সুতরাং আত্মা নির্গুণ হইলেও সদোষ নিশ্চিতই। অমূলক এ আশঙ্কা নিরসনার্থ ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন বিকারী পদার্থের সংযোগনিবন্ধন বিকার অবস্থা সংঘটিত হইলে, আত্মার বিনাশ অবস্থাও যে তাহাতে অবশ্যম্ভাবী, এবংবিধ আশঙ্কার কোন হেতুই নাই; কারণ আত্মার তাদৃশ বিকার অবস্থা অসম্ভব। যে হেতু তিনি নিরঞ্জন—অর্থাৎ অঞ্জনাদি প্রলেপ সংলিপ্ত হইয়া চক্ষু প্রভৃতি যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, আত্মা কদাচ সেরূপ হয় না। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কোন বিকারী পদার্থই আত্মায় লিপ্ত হইতে সমর্থ নহে, তাই তিনি নিত্যনিরঞ্জন ও অবিনশ্বর।

৫। আত্মার গমনাগমন ক্রিয়া নাই।

গমনাগমনাদি ক্রিয়ারহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা গমনাগমনাদি ক্রিয়াপরিশূন্য। শ্রুতি বলেন;—আত্মা নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তাঁহার গমনাগমনাদি ক্রিয়া আদৌ সম্ভবপর নহে। ইতঃপূর্ব্বে আত্মার ব্যাপকত্ব ও নিরবয়বত্বাদি সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার একাংশাবচ্ছেদে গমন অথবা সর্ব্বাংশাবচ্ছেদে গমন এই উভয় আশঙ্কারই সম্যক্ নিরসন হইতে পারে। এই গমনাগমনাদি দ্বারা আত্মার জন্মমরণাদি ব্যাপার অথবা গতিরূপ ব্যাপার এই উভয়ই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৬। আত্মার অহঙ্কারাদি ভাব নাই।

অহঙ্কার মমকারেচ্ছা দ্বেষপ্রযত্নরহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা, দ্বেষ-প্রযত্ন-পরিশূন্য। শ্রুতি বলেন;—আত্মা অস্থূল, অনণু; সুতরাং তাঁহাতে অহঙ্কারাদি ভাবের বিদ্যমানতা মোটেই নাই। আত্মার যখন সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্য স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত হইয়া গিয়াছে, তখন কি লইয়া তাঁহার আবার অহঙ্কারাদি ভাবের সঞ্চার হইতে পারে? অতএব আমি স্থূল, আমি কৃশ, আত্মার ইত্যাদিরূপ অহঙ্কারাদি প্রকাশ করিবার কোন বিষয়ই নাই।

৭। আত্মা স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বভাব।

স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বভাবোঽগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবৎ।

অর্থাৎ—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় আত্মা স্বয়ংই জ্যোতিঃস্বভাব। কেহ কেহ বলেন;—আত্মা জড়পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যেমন—উষ্ণস্পর্শ অগ্নির স্বভাব এবং প্রকাশ—সূর্য্যের স্বভাব, আত্মারও সেইরূপ জ্যোতিঃ-স্বভাব; অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ চেতনপদার্থ—জড় নহেন। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ।

৮। আত্মা পঞ্চভূতাত্মক নহে।

আকাশাদি ভূতরহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম

এই পঞ্চভূতাত্মক নহেন। পৃথিবীময়ত্বাদি শ্রুতি থাকায় পাছে আত্মার ভূতময়ত্ব শঙ্কা উপস্থিত হয়, শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন ;— আত্মা আকাশ নহেন, তিনি ভূতময়ও নহেন। আত্মার উপাধিই পৃথিবীময়, ইহা বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। উভয় শ্রুতিই সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

৯। আত্মা—বুদ্ধি প্রভৃতি করণ রহিত।

বুদ্ধ্যাদি করণরহিতঃ।

অর্থাৎ—"আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি করণরহিত। আত্মা বাক্‌রহিত, মনোরহিত ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পরিশূন্য" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আত্মার ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-সংশয়ও নিরাকৃত হইতেছে।

১০। আত্মা গুণরহিত।

সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণরহিত। শ্রুতিই বলেন, আত্মার উল্লিখিত কোন গুণেরই বিদ্যমানতা নাই।

১১। আত্মা প্রাণাদি বায়ুরহিত।

প্রাণাদি বায়ুভেদরহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা প্রাণাদি বায়ুভেদরহিত। শ্রুতিই বলেন, আত্মার প্রাণ নাই, মন নাই।

১২। প্রাণাদি ভেদে আত্মার কোন ধর্ম্মই নাই।

অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণপ্রাণবুদ্ধি শরীরধর্ম্মরহিতঃ।

অর্থাৎ—আত্মা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ এবং জরা মরণ রূপ প্রাণ ধর্ম্ম, বুদ্ধিধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম বর্জ্জিত। "ক্ষুধা প্রভৃতির বিদ্যমানতায় আত্মার প্রাণাদি সম্বন্ধ না থাকা অসম্ভব" পাছে কাহারও এইরূপ আশঙ্কা জন্মে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। ক্ষুৎপিপাসা, শোক, মোহ এবং জরা মৃত্যু যথাক্রমে প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহেরই ধর্ম্ম।

১৩। আত্মা কে ?

যঃ সর্ব্বপ্রাণি হৃদিস্থিতঃ, সর্ব্ববুদ্ধের্দ্রষ্টা স আত্মেতি।

অর্থাৎ—যিনি নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত এবং সকল বুদ্ধিরই দ্রষ্টা, তিনিই আত্মা। পূর্ব্বোক্ত আত্মাই বুদ্ধিস্বরূপে সন্নিহিত—অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপস্থিত হইয়াই তিনি সন্নিহিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। সন্নিহিত সেই আত্মার কথাই এস্থলে কথিত হইল। শ্রুতি অনুসারে এই আত্মাই দ্রষ্টৃরূপে সকল হৃদয়েই বিরাজমান রহিয়াছেন।

১৪। আত্মাকে সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ বলা হয় কেন ?

সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ ইত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ—আত্মা সর্ব্ববুদ্ধি বিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হন বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ নামে অভিহিত করা যায়। বুদ্ধিমাত্রেরই সাক্ষিস্বরূপে স্ফুরিত হন বলিয়াই আত্মাকে বুদ্ধিস্থ বা হৃদিস্থ বলা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা কেবল ঔপচারিক মাত্র।

১৫। বুদ্ধি আত্মার আধার নহে।

ন পুনঃ সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্যাত্মনঃ বুদ্ধিধারত্বং সম্ভবতি।

অর্থাৎ—বুদ্ধি সর্ব্বগত নিরবয়ব আত্মার যে আধার ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। মুখ্যভাবে আধেয় ভাবে আত্মার হৃদয়ে অবস্থান ব্যাপার সর্ব্বথা যুক্তিহীন, তাহা হইলে আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠত্ব ভাবের সহিত শ্রুতির

অর্থাৎ—যেরূপ অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা এবং প্রযত্ন রহিত সূর্য্যের স্বভাব অবিকৃত থাকিয়াই প্রকাশময় নিজ স্বরূপের সান্নিধ্য মাত্রেই পদার্থ প্রকাশত্ব দেখায়, অন্য প্রকার কোন প্রকাশত্ব দেখা যায় না। সূর্য্য অর্থাৎ তদীয় কিরণ সমীপস্থ হইলেই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়, প্রকাশ বিষয়ে কিরণ কোন করণের সাহায্য গ্রহণ করে না; কোন বস্তুর উদ্দেশে কোন প্রযত্নও করে না বা সংস্পর্শ জনিত কোন বিকার প্রাপ্তও হয় না—অথচ সূর্য্যকিরণকে সবিতা বা প্রকাশয়িতা বলা যায়, সুতরাং আত্মারও ঐরূপ প্রকাশত্ব অসম্ভব নহে।

৩১। প্রকাশত্বের আরোপ সূর্য্যে হইতে পারে না। যথা;—

তদ্বৈবং প্রকাশস্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ বর্ত্তমানস্যাদিত্যস্য প্রকাশকত্বমধ্যারোপ্যতে অজ্ঞৈঃ প্র[illegible]পেক্ষয়া।

অর্থাৎ—এইরূপে অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্যের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রে প্রকাশ্য পদার্থকে প্রকাশিত হইতে দর্শন করিয়া সূর্য্যেই তৎপ্রকাশত্বের আরোপ করে।

কিন্তু সূর্য্যকিরণ স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ, প্রকাশ্যপদার্থের সান্নিধ্যমাত্রেই উহা কেবল অবস্থিত প্রতীয়মান হয়। মূঢ়বুদ্ধি লোকেরা তাহাতেই প্রকাশ্য পদার্থের প্রকাশ দর্শন করিয়া অনুমান করে যে, সূর্য্যই প্রযত্নপূর্ব্বক তত্তৎ পদার্থ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যে যে প্রকাশকত্ব, তাহা মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত নহে, গৌণ অর্থে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

৩২। আত্মার মুখ্য দ্রষ্টৃত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে। যথা;—

এবমেব সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনো দৃগ্রূপসচৈতন্যস্বরূপেণাব্যতিরিক্তেণ সর্ব্বপ্রত্যয় সাক্ষিণা দৃক্সন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বমুপচর্য্যতে বুদ্ধ্যাদি দৃশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ॥

অর্থাৎ—এইরূপেই সর্ব্ববিকার রহিত দ্রষ্টা স্বরূপ সর্ব্বপ্রত্যয় সাক্ষী আত্মার—নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রেই বুদ্ধ্যাদি দৃশ্যপদার্থ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব উপচরিত হইতেছে নতুবা আত্মার মুখ্য দ্রষ্টৃত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে।

প্রকাশস্বরূপ আত্মার সাক্ষিত্বমাত্রই দ্রষ্টৃত্ব, নতুবা দর্শনক্রিয়ায় তাঁহার বাস্তবিকই কোন চেষ্টা নাই। চেষ্টাবিহীন আত্মার এই সাক্ষিত্ব লইয়াই তাঁহার নিত্য দ্রষ্টৃত্ব।

৩৩। আত্মা যদি সর্ব্ববিকার রহিত, তবে তাঁহার অন্যানপেক্ষকর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবে? যথা;—

তস্য কথং সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমিতি।

অর্থাৎ—এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সর্ব্ববিকার রহিত হইয়াও আত্মার কি প্রকারে অন্যানপেক্ষকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে? শাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মাই পরিদৃশ্যমান এই বিশাল জগজ্জালের একমাত্র পরিচালক। সকল ক্রিয়া রহিত হইলে কূটস্থ দ্রষ্টৃত্ব যদিও কোনরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু চালকস্বরূপ কর্ত্তৃত্ব কিরূপে প্রতিপাদিত হইবে, এইরূপ একটী আপত্তি উত্থাপনের হয় ত সম্ভাবনা। তাহার খণ্ডনও অবশ্য আছে।

৩৪। চুম্বক যেমন লৌহের স্পন্দন প্রেরণার কারণ, আত্মার চালকস্বরূপ কর্ত্তৃত্বও সেইরূপ।

যথা চুম্বকো ভ্রামকঃ স্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ লৌহস্য প্রেরকো ভবতি।

অর্থাৎ—যেমন, কেবল সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াই ভ্রামক চুম্বক লৌহের প্রেরক হয়, আত্মার উল্লিখিত চালকস্বরূপ কর্তৃত্বও সেইরূপ। চুম্বকের সমীপস্থ হইলেই লৌহ যে পরিচালিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। নিজ চুম্বকের কোন ক্রিয়া বা বিকারই এস্থলে অনুভূত হয় না, সুতরাং স্বভাবসম্ভূত ইন্দ্রিয়াতীত অত্যাশ্চর্য্য শক্তিবলে যখন সামান্য চুম্বক দ্বারাও বিনা যত্নে জড়ত্বধর্ম্মী বস্তুবিশেষ ও সুস্পষ্টরূপে পরিচালিত হইতেছে, তখন সর্ব্বশক্তির মূলীভূত পরমাশ্চর্য্য ও মহীয়ান অপ্রতিহত শক্তি আত্মারূপ পদার্থ দ্বারা বিনা আয়াসেই যে এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বমণ্ডল তৃণের ন্যায় পরিচালিত হইবে, ইহা আর বিস্ময়ের বিষয় কি? অতএব অহঙ্কার বা বুদ্ধিতেই যে মুখ্য কর্তৃত্ব প্রধানরূপে প্রকটিত হয়, আত্মার তাহাই উপচরিত হয় মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

যৌবন-চিন্তা।

ভাদ্রের গঙ্গা কূলে কূলে পূর্ণ, সম্পূর্ণ যৌবনোচ্ছ্বাসে তরঙ্গিণী তর্‌তর্ বেগে বহিয়া যাইতেছে, তরঙ্গিণীর প্রত্যেক অঙ্গে নবীন যৌবনের 'বাণ' ডাকিয়াছে, নিদাঘের দীনতা ক্ষীণতা ও শ্রীহীনতা আর নাই; অনাবিল সলিলরাশি, তরঙ্গিণীর সকল শরীর পূর্ণ করিয়া আনন্দে তাহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনের শক্তি অসীম, তাই বুঝি আজি এ মধুর পূর্ণিমা রজনীর রজতশুভ্র গগনপ্রাঙ্গণের অযুতনক্ষত্রমালা-পরিবেষ্টিত পূর্ণশশধর তাহার নিখিল ব্যোমরাজ্যের সহিত ঐ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর যৌবনোচ্ছ্বসিত উদার হৃদয়ে অতিথি; ক্ষুদ্র ও আজি বুঝিবা যৌবনের অমোঘ মহিমায় ও অপরিসীম শক্তিতেই ঐ সুমহান্ সচন্দ্র-তারক আকাশটাকে নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। যৌবনের পূর্ণবিকাশে চন্দ্রমণ্ডলও আজি বিশেষ সৌন্দর্য্য ও মহিমামণ্ডিত। চন্দ্রমার যৌবনের ভুবনবিকাশিনী শ্রীর কণামাত্র লইয়া, পৃথিবী মধুময়ী সৌন্দর্য্যশালিনী ও শ্রীমতী, স্রোতস্বতী চঞ্চলা হাস্যময়ী ও সুন্দরী, সমুদ্র প্রেমানন্দে পৃথিবী প্লাবনের জন্য স্ফীত, মাতোয়ারা ও প্রস্তুত। কি জানি কেন গঙ্গাতীরে নিবিড়লতাপল্লবাচ্ছাদিততরুতলে শ্যামস্নিগ্ধদূর্ব্বাদলের আসনে বসিয়া অনন্যমনে আকাশের চন্দ্রমা ও ধরণীর পূতসলিলা দেবী জাহ্নবীর এ যৌবনলীলা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতেছিলাম। মুগ্ধনয়নে দেখিতেছিলাম;—

বিশাল আকাশরাজ্যের সঙ্গে জাহ্নবীর পবিত্র অঙ্গের সুন্দর সৌসাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, আকাশের তারাশ্রেণী গঙ্গার শুভ্রবক্ষে প্রতিবিম্বিত, চন্দ্রমা প্রতিবিম্বিত, বায়ুতরঙ্গে চঞ্চল মেঘমালা প্রতিবিম্বিত,—অনন্ত তরঙ্গশ্রেণী এক একটী প্রতিবিম্বকে লইয়া যেন 'কাড়াকাড়ি' করিতেছে, অনন্ত তরঙ্গে অনন্ত তারকা অনন্ত চন্দ্রমা ক্রীড়া করিতেছে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—সে এক অনুপম সৌন্দর্য্যবিকাশ।—উভয়েই উদারবিস্তৃত ও যৌবনমদগর্ব্বিত! আর ভাবিতেছিলাম, রূপের জন্য যদি জড় প্রকৃতিকে প্রশংসা করিতে হয়, তবে তখনকার জাহ্নবী ও বিশ্বোজ্জ্বল

শারদাকাশ উভয়েরই বিশেষ প্রশংসা করি, আর প্রশংসা করি—এই সমস্ত বিশাল সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে স্বপ্নশ্রুতবংশীধ্বনির ন্যায় সহসা যাঁহাকে অনুভব করিয়া প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দৃষ্টাদৃষ্ট অপরিসীম আনন্দরাশিতে প্রাণ ভরিয়া যায়, সেই সকল—শক্তিময় পরমেশ্বরকে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্য অন্য কাহাকেও প্রশংসা করিবার অবসর অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমি যখন সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাই, যখন রূপ আমাকে তাহার বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির আয়ত্তে আনিয়া অভিভূত করিতে থাকে, তখন আমি শুধু সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাই, কেবল রূপেরই অসীম তেজোরাশি আমার চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, আমি প্রাণ ভরিয়া কেবল রূপই দেখি,—রূপ আমাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া দেয়, আমি কেবল তাহাকেই প্রশংসা করিতে পারি, জড়প্রকৃতি বা চৈতন্য তখন সৌন্দর্য্যের প্রচুরতা ও মাহাত্ম্যে ডুবিয়া যায়। যদি বল সংসারের জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই চৈতন্যশক্তি বা সর্ব্বভূতাধিবাস ভগবানের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে হে সৌন্দর্য্য! তুমি তোমার মোহসমুদ্রে সংসারকে ডুবাইয়া রাখ, চিরদিন এ দীনহীন মনুষ্য সমাজকে তোমার মোহের জালে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ,—আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইব। ভাবিতেছিলাম প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যের ভিত্তি কোথায়? কে তাহাকে শিশিরান্তে বসন্তের মত বিকসিত করিয়া তুলে? আবার কেনই বা তাহার কমনীয় শোভা নিদাঘতপ্ত কুসুমস্তবকের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে? প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য-দায়িনী শক্তি সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করি, ততই মূল প্রকৃতি ভগবতী আত্মাশক্তির নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি—ততই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলাবিকাশ দর্শনে বিস্মিত হই। তাঁহার সংহারিণী শক্তির কথা আজি বড় একটা মনে আসে না। এ রজনী বড় সুন্দর—প্রকৃতি আজি মধুময়ী ও পূর্ণাঙ্গী, তাই কেবলি মনে হয় এ সৌন্দর্য্যের মূলে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, বোধ হয় তাহারও একটা কিছু নিয়ম আছে মানিতে হইবে, আমার মনে হয় সেই নিয়মই প্রকৃতির যৌবন। যেহেতু প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য—যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার যৌবনকালেই ফুটিয়া উঠে, যৌবনই তাহাকে সংসারের চক্ষে মধুময় করিয়া তুলে, আবার যৌবনের অভাবেই কিছুকাল পরে সে হতশ্রী হইয়া যায়, সুতরাং যৌবনকে ছাড়িয়া দিয়া সংসারের কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা অনুভব করিতে পারি না, তাই আজি থাকিয়া থাকিয়া কেবল যৌবনেরই কথা মনে পড়িতেছে, এবং ইচ্ছা হইতেছে প্রাণ ভরিয়া যৌবনকেই প্রশংসা করি, কিন্তু এযাবৎ তাহা পারিয়া উঠিলাম না, বড় দুঃখ রহিল! শুধু রূপ নহে, সৌন্দর্য্যমাত্রই যৌবনের ইঙ্গিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে শুধু রূপ লইয়া কাহারও দিন চলে নাই, চলিবেও না, কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া এক দিনের জন্যও জগৎ স্বস্থানে তিষ্ঠিতে পারিবে না। এতকাল সৃষ্টিধারা চলিয়া আসিতেছে, সৌন্দর্য্যের দ্বারে প্রাণিগণ বন্দিভাবে দণ্ডায়মান; আমরা উষালোকবিভাসিত, কুসুমগন্ধসেবিত পৃথিবীর কোমল-শ্যামল-দূর্ব্বাঙ্কুরাবৃতবক্ষে যখন সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গগণের সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিয়া পদার্পণ করি এবং অরুণালোকভূষিত প্রাচী গগনপ্রান্তে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া বিভোরচিত্তে সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া যাই, তখন আপনা আপনিই যেন প্রাণের গভীর প্রদেশ হইতে সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাহির হইতে থাকে—আমরা সহজকণ্ঠে সৌন্দর্য্যের স্তুতিগানে ধরণী ও আকাশ

মণ্ডলের নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দেই। আমরা চিরজীবন কেবল সৌন্দর্য্যেরই সন্ধানে ঘুরি, এবং প্রাণ মনে কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকি। আমাদের এমন আত্মীয় সৌন্দর্য্যের মূল কারণ প্রকৃতির যৌবন, তাই যৌবনকে বড় ভালবাসিতে সাধ হয়। রূপ শরীরের ধর্ম্ম, রূপকেও যৌবনেই ফুটাইয়া দেয়; তা ছাড়া, যাহা শরীরের ধর্ম্ম নহে, আত্মার ধর্ম্ম, গুণাদি, তাহাদের মধ্যেও অনন্ত সৌন্দর্য্য বিদ্যমান, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যকে রূপ বলিতে পারি না, তাহা রূপের অতিরিক্ত। রূপে মানুষ উন্মাদ, কিন্তু সৌন্দর্য্যে বিশ্বমোহিত। পৃথিবীর সকল প্রাণীরই জীবনে যেমন এক একটা যৌবনের নির্দ্দিষ্টকাল আছে, সেইরূপ জড়জগতেও যৌবনের শক্তি অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অচেতন জড়জগতের গঙ্গা ও আকাশের চন্দ্রমার এ উদ্দাম তরঙ্গলীলা ও পূর্ণসৌন্দর্য্য তাহাদের যৌবনের ফল বলিয়া আমার মনে হয়, যৌবনের যদি একটা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, অবয়ব বা শক্তির পূর্ণতাসম্পাদক কোন নির্দ্দিষ্ট কাল বা বস্তুর প্রভাবই বস্তুবিশেষের যৌবন। যদি তাহাই হয়, তবে চন্দ্রমার যৌবন পূর্ণিমার প্রভাব, সমুদ্রের যৌবন চন্দ্রমার প্রভাব, নদীর যৌবন বর্ষা বা সমুদ্রের প্রভাব, পুষ্পাবলীর যৌবন বসন্তপবনের প্রভাব, এবং মানুষের যৌবনও নির্দ্দিষ্টকালের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর যে কোন জড় বা চেতন, সর্ব্বশক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছে, যে কোনও ব্যক্তি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আপনার যশোমান ক্ষমতা ও কীর্ত্তিরাশি বিস্তৃত করিতে পারিয়াছেন, যে কোন জাতি নিজের শক্তি ও সম্পদের অতুল বিক্রমে গর্ব্বে ও বীরত্বে জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন, সকলেরই তাদৃশ শক্তি ও সম্পদের পূর্ণতাসম্পাদক বিধাতার সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদস্বরূপ যৌবন। সাধারণ ব্যক্তির যেমন যৌবনপ্রভাবে শারীর ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরিপূর্ত্তি সাধিত হইয়া থাকে, জাতিরও এমন এক একটা সময় উপস্থিত হয়, যাহাতে সেই জাতিরও সমুদায় শক্তিগুলি বসন্ত-পবনে কুসুমকলিকার ন্যায় সহসা এক সঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠে, সেই বিকাশের অমোঘ ফলস্বরূপ জাতীয় জীবন গঠিত হয়, এবং জাতীয় জীবনের ফলস্বরূপ জগতের স্পৃহনীয় স্বাধীনতা-সুখ-সমৃদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এরূপ জাতিগত যৌবন পৃথিবীর সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন ভারতের আর্য্যজাতির যৌবনদৃপ্ততেজে পৃথিবী বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিল, রোমের জাতীয় যৌবনে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ফরাসীর যৌবনোদ্দামতাণ্ডবে বসুমতী টলটলায়মানা হইয়াছিল, আর আজি ক্ষুদ্র নগণ্য জাপানের জাতীয় যৌবন-সূর্য্যকিরণে ইউরোপের প্রবলপরাক্রান্ত রুষরাজ্য দিবা-প্রদীপের ন্যায় নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ! এইরূপ ধর্ম্ম-জগতেও যৌবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যখন এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আর্য্য-ধর্ম্মের পূর্ণ-যৌবন বিদ্যমান ছিল, তখন ধর্ম্মের জন্য লোকসকল ইহকালের সমস্ত সম্পদ্ ধন জন সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত হাস্যমুখে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। এই ভারতের আর্য্যজাতিসকলের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের এমন প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পৃথিবীর অন্য প্রদেশে তাহার এক চতুর্থাংশও এ যাবৎ পরিলক্ষিত হয় নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানেরও একটা যৌবনের বাতাস এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। তাহারই ফলে অনন্তজ্ঞানপ্রবৃত্তি ভারত-

তুমি পৃথিবীর উপদেশদাত্রীরূপে আজিও নরতা।

যৌবনের সম্বন্ধে যত ভাবি, ততই দেখিতে পাই, বিধাতার নির্ম্মিত পৃথিবীতে এমন জিনিষ আর নাই। মানুষের যৌবন তাহাকে শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমুদয়ের বিকাশ দ্বারা কেমন পূর্ণ ও প্রভাবশালী করিয়া তুলে। জীবনের শৈশব ও কৈশোর ভাগটাকে অস্ফুট কলিকা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না, দূর হইতে তেমন দেখা যায় না, বা তাহার গন্ধে কেহ পরিতৃপ্তও হয় না, তবে কাছে আসিয়া সোহাগ করিলে যাহারা নিতান্ত আত্মীয় তাহাদের আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তেমন নহে, শুধু অন্ধ স্নেহের পরিতৃপ্তি মাত্র!—আর মানুষ যখন কৈশোর ও শৈশবের জড়তা-শিশিরমুক্ত হইয়া যৌবনের বাসন্তী উষার প্রথম পবনের মৃদুমন্দ আন্দোলনে—গন্ধে পৃথিবী মুগ্ধ করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার তখনকার সেই পূর্ণভাব, সেই পূর্ণ-সৌন্দর্য্যও সেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের অপূর্ব্ব বিকাশে প্রতিভাপ্রদীপ্ত জীবন পৃথিবীর হৃদয়ে কত আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়! বলিতে পার—

"আমরা যৌবনকে বড় ভালবাসি, তাই অনেক সময়ে যৌবনের দোষগুলি দেখিতে পাই না, যৌবন মানুষকে যেমন স্বর্গ-পথে লইয়া যায়, তেমনি নরকের ভীষণ গহ্বরের পথেও টানিয়া নেয়। 'হেলেনা'র ভুবনবিখ্যাত যৌবন-সমুজ্জ্বল রূপের আগুনে 'ট্রয়নগরী' ভস্ম হইয়া গেল, সুন্দরী 'ক্লিয়োপেট্রার' যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্য ও বিলাসচাতুর্য্যে কত কত মহাবীরের অধঃপতন হইয়া গেল,—যৌবনের দর্পে কত কত লোক অকালে ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়াছে হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে,—যৌবনের খরস্রোতে ভাসমান মানব-জাতি পরিশেষে কত পাপ-সমুদ্রের ভীম আবর্ত্তে তলাইয়া যাইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে?"—কিন্তু আমার মনে হয়, এজন্য যৌবনকে দোষ দেওয়া চলে না, সূক্ষ্মভাবে মনস্তত্ব আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, মানুষের অসংযত চিত্তবৃত্তিই যৌবনকে কুপথে চালিত করে,—যৌবন মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া দেয়, বর্দ্ধিত সতেজ ও পরিপূর্ণ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিয়া মানুষের কাছে ধরে, মানুষ যদি পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির অভাবে সেই সমুদয় শক্তি কুপথে পরিচালনা করে, বা সেগুলিকে ইচ্ছা করিয়া তাড়াইয়া দেয়, ইচ্ছা করিয়া রোগ শোক বিপদকে ডাকিয়া আনে, তবে যৌবনের তাহাতে এমন কি অপরাধ আছে? যৌবন নিজের শক্তিবলে দেহ ও মনের এঞ্জিনখানা প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। আমরা যদি তাহাকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করিতে পারি, তবেই আমাদের গন্তব্য স্থান নিকটে আসে, আর যদি অনিয়মে তাহাকে পথচ্যুত করিয়া বসি, তবে পরিণামে ব্যসনের একশেষ হইয়া যায়। যৌবন, মানবের দেহ ও মনকে নানাবিধ সাজে ও বর্ণে চিত্রিত সজ্জিত করিয়া প্রতিমার মত গড়িয়া তুলে, কিন্তু সেই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের হাতে, আমরা যদি তাহা না করিলাম, তবে যৌবনকে দোষ দিলে চলিবে কেন?

তরঙ্গিনীর লোললহরীর মত আমার হৃদয়ের নদীতেও চিন্তার চঞ্চল তরঙ্গ বহিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—এইত যৌবনকাল—মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবন-নদীতে একবার বই দুইবার যৌবনের জোয়ার আসে না। এইত জীবনের শুক্লপক্ষ—পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের—পূর্ণ বিকাশ—ইহার পর কৃষ্ণপক্ষ আসিবে, মৃত্যুর অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে জীবন

অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আবার এ জীবনে কখনও শুক্লপক্ষ ফিরিয়া আসিবে না। এ ফুল একবারই ফুটে, গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলে, কিন্তু অচিরেই ঝরিয়া যায়। এ বৃক্ষে আর ফুল ফুটে না!—হায়রে! এ হেন যৌবন যদি পাইলাম, তবে এমনি করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিলাম কেন? দেখিতে দেখিতে আমার মনোরাজ্যের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। আকাশমণ্ডল বা লোলতরঙ্গা জাহ্নবীর প্রতি আর তেমন করিয়া চাহিতে পারিলাম না, আমার দৃষ্টি তখন কেবলই আত্মমুখীন হইতেছিল—সংসার আমার চক্ষে একটা স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রতিভাত হইতেছিল, আমি তাহারই মধ্য দিয়া আমার কোটি কোটি জন্মের ক্ষীণ-রশ্মি-বিভাত জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ ও যৌবন-জরার ছবিগুলি দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইলাম, কত কোটি কোটি বার এই পৃথিবীর অঙ্গে সলিল-তরঙ্গের মত ফুটিয়া উঠিয়াছি, যৌবনের চন্দ্র-কিরণে উচ্ছ্বসিত হইয়াছি—আপনাকে জোর করিয়া পরের জন্য তটভূমির চরণতলে চূর্ণিত করিয়া দিয়াছি, সে আত্মত্যাগে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি!—দেখিতে দেখিতে আবার জলের সঙ্গেই মিশাইয়া গিয়াছি। এবার বৃক্ষলতা ফল ফুল তৃণ গুল্ম, যত কিছু হইয়াছি,—যৌবনের তেজে প্রাণ দিয়া ধরণীর সেবা করিবার শক্তি পাইয়া আজীবন তাহাই করিয়াছি। যে আমায় তীক্ষ্ণ কুঠারে ছেদন করিয়াছে, প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত নিজের শাখা-প্রশাখায় তাহাকে ছায়া দান করিয়াছি। যে আমাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছিল, তাহাকেও গন্ধদান করিতে করিতে শুকাইয়া গিয়াছি। যখন শস্য-জীবনে যৌবনের বলে সারা মাঠ আলো করিয়া সকল দেশের জন্য শস্যরাশি বুকে ধরিয়া আসন্ন মৃত্যু আনিতে পারিয়াও হাসির ছটাতে বিশ্ব মোহিত করিতাম, আহা হা!—কি সে মধুময় জীবন! কি সে অপার আত্ম-ত্যাগ! এমন কি নিকৃষ্ট পশু-জীবন পাইয়াও যে কত আনন্দভোগ করিয়াছি, তাহা যেন সমস্তই দেখিতে পাইলাম। এখনও সে দৃশ্য দেখিয়া অশ্রু আসে। সেই তৃণজীবনের কথা—বৈশাখের মধুবৃষ্টির কণা মাত্র পাইয়া নবীন যৌবন লাভ করিয়া, পৃথিবীর তাপদগ্ধ বক্ষ শীতল রাখিবার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, যখন প্রাণপণে জননী জন্মভূমির সকল শরীর জড়াইয়া ধরিতাম—আমাদের জননীর বুকে বাজিবে বলিয়া যখন পৃথিবীর সকল প্রাণীর পদভার নিজের বুক পাতিয়া লইতাম—যৌবনের প্রসাদে সে কি অপূর্ব্ব দিন চলিয়া গিয়াছে! আজি মানুষ হইয়াছি, বিধাতার কৃপায় যৌবনও পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে সকল মধুর ভাব ও কঠোর আত্মত্যাগ কেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া পাইলাম না? একটা সামান্য নদীর বক্ষে আজি আকাশ মণ্ডল প্রতিবিম্বিত; আমি মানুষ, কিন্তু আমার বক্ষে মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবীর ছায়া পড়ে না! আমি সেই দেশে জন্মিলাম—যে দেশের চৈতন্য, নবীনজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিশ্ববাসীকে প্রাণের ভিতরে টানিয়া আনিয়াছিলেন, যে দেশের বুদ্ধ, যৌবনের অপরিতৃপ্ত কামনাগুলিকে পদদলিত করিয়া পৃথিবীর জন্য নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন! আমার সেই 'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমিতে জন্ম, যে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, যৌবনের শক্তিতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জননীর দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনকল্পে আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন;—যে দেশের সীতারাম, যে দেশের সিরাজ, যে দেশের মীরকাসিম, পরের দুঃখ মোচন করিবার জন্য—দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নিরাশ্রয় ভীত প্রপীড়িত প্রজা রক্ষার উদ্দেশে কিরীটোজ্জ্বল মস্তকধারা বঙ্গভূমির পদে অঞ্জলি দিয়াছিলেন—রাণা-প্রতাপ শিবজী

এই ভারতবর্ষেরই সন্তান ছিলেন, তাঁহাদের যৌবন তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু আমার যৌবন এমন দীন হীন কাঙ্গাল হইল কেন? আমার যৌবন আমাকে বাঁচাইতে পারে না, উৎফুল্ল করিতে পারে না, শক্তিশালী করিতে পারে না কেন? আমার জীবন কতদিন থাকিবে? কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী যৌবন, সেত গেল বলিয়া, কিন্তু করিলাম কি?—আর করিবই বা কি?—পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সামান্য বৃক্ষলতাগুলি সে সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মদান করে। ভগবন্! তুমি আমায় মানুষ করিলে ত মানুষের জীবনের সার ধন যৌবন দীন করিলে ত যৌবনকে সৎপথে চালাইবার শক্তি দিলে না কেন? আমি আমার যৌবনের শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুচ্ছ করিয়া তৃণরাশির মত জননী জন্মভূমির অঙ্গ জড়াইয়া ধরিতে পারি না কেন? পৃথিবীকে আত্ম-শরীরে টানিয়া আনিতে পারি না কেন? 'কেন' তাহা কে বলিবে?—কিন্তু মুগ্ধশ্রবণে যেন শুনিতে পাইলাম—তটিনীর প্রত্যেক তরঙ্গ, নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, "সাধনা কর, সিদ্ধি আপনি আসিবে।"

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব শর্ম্মা।

বরিশালের গ্রাম্যভাষা।

বেদ ও সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া বা তাহার অপভ্রংশ করিয়া যে ভাষা আমরা পাইয়াছি, তাহা বাঙ্গালা ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি হইতেছে। গ্রাম্যভাষা আগে যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল, এখনও প্রায় তেমনই আছে, তবে ভদ্রসমাজে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালায় গ্রাম্য-ভাষা এক নহে—বহু। এক জেলাতেও একটী গ্রাম্য ভাষা নহে—একাধিক। পর্ব্বত, নদী ইত্যাদি সীমা ধরিয়া গ্রাম্য ভাষা স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করে। অনেক স্থলে শব্দ ও ভাষা এক থাকিলেও তাহার উচ্চারণ-বিভিন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বরিশাল অনেকেরই নিকট নানা কারণে অপরিচিত নহে। তৎস্থলের গ্রাম্য ভাষা অনেকের নিকটই অপরিচিত হইতে পারে। বরিশালের ভাষা কোমল নহে—কর্কশ। আবার দক্ষিণ বরিশালের ভাষা আরও কর্কশ ও দুর্ব্বোধ্য। তাহার উপর আবার হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান হয়। সেই সকল শব্দের উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন কার্য্য, শুনিবামাত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বরিশালের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা উগ্র ও অসাধুপ্রকৃতির লোক; তাহাদের ভাষা ও উচ্চারণও তদ্রূপ কর্কশ। ভদ্রসমাজের ভাষা ও উচ্চারণ স্থানে স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বরিশালের কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

সন্দুক—সিন্দুক।

পুক্কত্তি, পুথইর, পুহইর—পুষ্করিণী।

চন্নন, চেন্দন—চন্দন।

হেবা—সেবা।

ওক্কা, উক্কা—হুঁকা।

চেলহক—চেলকা মুণ্ড।

ডোয়া—ঘরের ভিত।
দশী—দীপ জ্বালাইবার তৈলশোষক বস্ত্রখণ্ড, পলিতা।
আউক—ইক্ষু।
আছার—আচমন-স্থান।
মোচ্‌রা—থোড়।
ডেম—ছোট কলাগাছ।
থোর—কলাগাছের মধ্যস্থ নরম পদার্থ।
চার—শাঁকো।
জুমরা—বাঁশের এক প্রকার ছাতা।
তেনা—ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড।
বের—পগার।
পেরী, কাদা—পাঁক।
শিব্‌টী—বোতলাদির মুখের ছিপি।
আতুর ঘর—সূতিকা-গৃহ।
ছোরাণী, ছুরাণী—চাবী।
সরতা—(সুপারি কাটা) জাঁতি।
জান্‌—পুষ্করিণীর মোহানা।
বররা—গৃহপ্রস্তুতের শলা।
চেরা—গৃহপ্রস্তুতের অন্য এক প্রকার শলা।
টুনী—বাঁশের কঞ্চি।
দাউর—শকৃড়ি, উচ্ছিষ্ট।
ডিঙ্গি, ডোঙ্গা—ক্ষুদ্র নৌকা।
পাটা পুতা—শিল নোড়া।
ছাওয়ালপার্ন—ছেলেপিলে।
মডুক—বিবাহে বরের মুকুট, টোপর।
টুপী মডুক—ঐ কনের মুকুট।
হালা—শালা।

দক্ষিণ বরিশাল।

ঘোপা—মশারি।
দচ্‌মনা—চিমটা।
ছিপইৎ—চুণ।
ঘ্রেত—ঘৃত।
আখাল, আহাল—চুলা, চুল্লী।
খারৈ—মৎস্য রাখিবার বাঁশের ডোলা।
হেইজ—বিছানা।
আইতনা, হাতিনা, আতিনা—বারান্দা।
পিছা—সম্মার্জ্জনী।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ।

আইছিল, আইছেলে—আস্‌ছিল।
দিছিলো, দেল্‌হে—দিয়াছিল।
আমু—আসিব।
যামু—যাইব।
খামু—খাইব।
আখুন—আসুন।
যাখুন—যান।
খাখুন—খান।
রেইখনা—রাখিও না।
চাইয়া—চাহিয়া।
রইছে—রহিয়াছে।
দেখ্যা—দেখিয়া। ইত্যাদি।

যশোহর ও খুলনা হইতে উঠিয়া আসিয়া অনেকে বরিশালে বাস করিতেছেন। উভয় জেলার ভাষার মিশ্রণে তাহাদের ভাষা কতকটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাহাদের ভাষা অপরাপর ব্রাহ্মণের ভাষা ও উচ্চারণ হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অপর জেলা হইতে আসিয়াছেন। হিন্দুদের সহিত মুসলমান-দের ভাষা ও উচ্চারণের কিছু প্রভেদ আছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় অনেক সময় মুসলমানেরা হিন্দি, উর্দ্দু ও পার্শীর অপভ্রংশ শব্দাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনেক স্থলেই ইহারা ট ও ঠ স্থানে ড এবং শ স্থানে হ ব্যবহার করে, যেমন-পাঠা স্থলে পাডা, কাটা স্থলে কাডা। শালা স্থলে হালা, বাড় স্থলে হাড়, সেলাম স্থলে হেলাম ইত্যাদি।

ক ও খ শব্দের শেষে থাকিলে, তাহারা প্রায়ই "হ" উচ্চারণ করে, যেমন ডাকে স্থলে ডাহে, দেখ স্থলে দেহ ইত্যাদি।

কোন এক ব্যক্তির পক্ষে অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গালার প্রদেশ বা জেলা সমূহের গ্রাম্য ভাষা ও তদুচ্চারণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা বড় দুরূহ বা অসম্ভব। তৎপ্রদেশস্থ সাহিত্য ও ভাষা-তত্ত্বানুরাগী মহাশয়গণ যদি আমাকে এ বিষয়ে বিশেষরূপ সহায়তা না করেন, তবে এ কার্য্যে সফলকাম হইয়াছি মনে করিতে পারিব না। আমি ভারতের বহু প্রদেশে বিশেষতঃ বঙ্গের নানা সহর ও গ্রামাদিতে স্বেচ্ছায় ও কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়াই বঙ্গদেশের গ্রাম্য-ভাষা-সংগ্রহের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। ক্রমশঃ অপরাপর গ্রাম্য ভাষাও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। এ কার্য্য সাধারণের—সুতরাং ভরসা করি, অনুরাগী মহাশয়গণ যিনি যেমন পারেন, বঙ্গের নানা-স্থানের গ্রাম্য ভাষা, গ্রাম্য-গীতি, গ্রাম্য-ছড়া ইত্যাদি দ্বারা আমাকে সহায়তা করিবেন। কোন প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রামের বা জনপদের ও প্রসিদ্ধ বংশের বা ব্যক্তির ঐতিহাসিক তত্ত্ব যাহা থাকে, তদ্দ্বারা আমাকে সহায়তা করিতে পারিলে উপকার মনে করিব। আমি ঐ সকল সংগ্রহ যাহা করিতে পারিয়াছি, তাহাও ক্রমশঃ সাধারণের গোচরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সকল জেলাতেই মুসলমান জনতা অত্যন্ত অধিক। আদমসুমারী দৃষ্টে দেখা যায়, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেক বেশী। তন্মধ্যে ভদ্র মুসলমানের সংখ্যা অতি-কম। মুসলমানাধিক্য হেতু গ্রাম্য ভাষায় প্রায় সর্ব্বত্রই অনেকগুলি মুসলমানী শব্দ জোর করিয়া দখল লইয়াছে। মুসলমানেরা বহুকাল বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালা ভাষাতেও উর্দ্দু, পার্শী বা হিন্দি শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আর এক্ষণে সহরের ভাষাতে বর্ত্তমান রাজ-ভাষার ইংরাজী শব্দসমূহ প্রবেশ করিতেছে। বাঙ্গলা ভাষার শব্দসমূহ ক্রমে সরিয়া পড়িতেছে—অবাধে তাহাদের জন্য স্থান করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা পর-প্রবেশ-বিরোধী নহে

ময়মনসিংহের গ্রাম্য-গীতি।

গ্রাম্য ভাষার শব্দ ও উচ্চারণাদি লইয়াই গ্রাম্য-গীতির সৃষ্টি। বিশুদ্ধ বৈয়াকরণিক ভাষা হইতে গ্রাম্যভাষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সেই বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়াই বাঙ্গালার প্রদেশান্তরের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র রকমে সুবিধা বুঝিয়া গ্রাম্য ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে। সুধু বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষা বলিলে কিছুই বুঝিবে না। সমগ্র বাঙ্গালায় একটী গ্রাম্য ভাষা নহে—বহু। প্রদেশ, জেলা, পরগণা, জনপদাদি ভেদে ভাষাও স্বতন্ত্র। প্রদেশান্তর ভেদে এ ভাষা কে সৃষ্টি করিল কখন সৃষ্টি হইল, ইহার নির্ণয় করা অসম্ভব। সেইরূপ ভাষা লইয়া প্রদেশ বা জনপদ বিভাগে গ্রাম্যগীতি সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রাম্যগীতির এক একটীর পরমায়ু বড় বেশী দিন হয় না। এক একটি প্রস্তুত হয়, আবার সে হুজুগ বা আবেগ থামিয়া গেলে অথবা নূতন আবেগে নববেশে অন্যটী আসিয়া তাহার স্থান দখল করিলে, তাহাই গীত হইতে থাকে। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ ও পশ্চিম-ময়মনসিংহে ভাষার স্বাতন্ত্র্য আছে। আবার জেলার সীমান্ত প্রদেশেও ভাষার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

গ্রাম্য ভাষার সজ্জিত উপকরণাদি লইয়া

ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণ লোক যে গ্রাম্য-গীতি গাহিয়া থাকে, তন্মধ্যে পদ্মা-পুরাণ, গাজিকীর্ত্তন, খেয়াল, কবি, জারি হোরি (হোলী) ভাসান, ঘাটু, সারি, রয়ানী, গোপিনী কীর্ত্তনাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য মুসলমানকবিগণও হিন্দুর কৃষ্ণপ্রেমাদি বিষয়ক গান প্রস্তুত করিয়া গাহিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে পদ্মাপুরাণ আরম্ভ হয় এবং সমস্ত শ্রাবণ মাসে গীত হইয়া থাকে। আষাঢ়ের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণের সংক্রান্তিতে গান শেষ হয়। বিশেষ আমোদের সহিত ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিদিনই ঐ সময় গান গীত হইয়া থাকে। এখনও সর্ব্বত্রই হয়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। অসাধারণ কবিত্ব পরিপূর্ণ পদ্মাপুরাণ হিন্দু, মুসলমান সকলেই আদরের সহিত গাহিয়া থাকে। শ্রাবণমাস ব্যতীত অপরাপর মাসেও মধ্যে মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলের কৃষককুল ও সাধারণ শ্রেণী অতি-বর্ষা-নিবন্ধন ক্ষেত্রাদিতে কার্য্য করিতে অসমর্থ হয়, তজ্জন্য এই অবসর সময়টা ইহারা গীতাদি দ্বারা নানাপ্রকার আমোদে সময় কর্ত্তন করিয়া থাকে। খুব উচ্চৈঃস্বরে রাগিণী ধরিয়া এই সকল গীতাদি হইয়া থাকে।

পদ্মাপুরাণ, জারি, সারি, ভাসান ও ঘাটু এই সময় অধিক গীত হইয়া থাকে। এই সকল গান অন্য সময়েও অল্পাধিক পরিমাণে গীত হইয়া থাকে। যখন বেশী জল হয়, অতি বর্ষার সময় নৌকায় চড়িয়া এই সকল গান গীত হয়।

"নাওদৌড়" নামে পূর্ব্বাঞ্চলে আর একটী খেয়াল আছে। জলপ্লাবিত বৃহৎ মাঠে অনেক নৌকা সারি বাঁধিয়া চালিত করা হইয়া থাকে। ইহাতে যে গীত হইয়া থাকে, তাহার নাম "সারি"। স্থলে যেমন ঘোড়দৌড়, জলে এই "নাওদৌড়"। এই "নাওদৌড়ে" অতি কঠোর ব্যায়াম হইয়া থাকে। এই সকল নৌকা স্বতন্ত্র রকমের। এই লম্বা নৌকাগুলিতে দুই সারি বাঁধিয়া অনেকগুলি দাঁড় বহিয়া থাকে। এইরূপভাবে নৌকা চালান বড় আনন্দপ্রদ, ষ্টীমার অপেক্ষা ইহাদের গতি অনেক বেশী। যাহার নৌকাখানি আগে গেল, সেই জিতিল। ইহাদের পরস্পর বড় জেদ পড়িয়া যায়। এই দৌড়ের সময় নৌকায় যে গান হইয়া থাকে, তাহার নাম সারি বা সাইর। প্রায় প্রত্যেক গানেই নিম্নশ্রেণীর আমোদ ও ব্যায়াম হইয়া থাকে।

রামায়ণ, দুর্গাপুরাণ প্রভৃতি কবিত্বশক্তি বিশিষ্ট আরও কতকগুলি পালায় গ্রাম্য গীত আছে। আধুনিক সভ্যতা বিস্তার হেতু অনেক গ্রাম্য গীতই ভদ্রসমাজ হইতে ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃ গ্রাম্য গীত হইতে গ্রাম্য-ভাষা-বোধক ও ভাবব্যঞ্জক বঙ্গের নানা জেলার পালা ও গান সকল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

ইতোমধ্যে আমি বঙ্গের নানা জেলার গ্রাম্য-ভাষা ও গ্রাম্য-গীতিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছি। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভারতের বহু প্রদেশ ও জনপদ—বিশেষতঃ বঙ্গের নানা জেলা ও গ্রামাদিতে ভ্রমণ করা হেতু বাঙ্গালার নানা স্থানের গ্রাম্য-ভাষা ও গ্রাম্য-গীতাদি সংগ্রহের সুবিধা আমার হইয়াছে। মৎসংগৃহীত গ্রাম্য-ভাষা যতদূর সম্ভব শুদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তত্তৎপ্রদেশের সাহিত্য ও গীতানুরাগী মহাশয়গণ যদি এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, তবে সফলকাম হইব, সন্দেহ নাই। আশা করি, সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই আমাকে এই বিষয়ে যথোচিত সহায়তা করিবেন। ভাষাতত্ত্বানুরাগী অনুসন্ধিৎসু ব্[illegible] এ সকল বিশেষ প্রয়োজনে লাগিতে পারে।

এ সকল শব্দ কিরূপে কোথা হইতে আসিল, সময় ও সুবিধামত তাহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব, এমত ইচ্ছা রহিল।

"হোড়ি" বা "হোলি" নামক গ্রাম্য-গীত দোল-পূর্ণিমার সময় হইয়া থাকে। দোলের মাসাধিক পূর্ব্ব হইতেই ইহা আরম্ভ হয় এবং দোলের কিঞ্চিৎ পর পর্য্যন্ত গীত হইয়া থাকে। ইহাতে দুই পক্ষ বা দুই দল হইয়া গীত হয়। গানেই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। ইহা সাধারণতঃ কৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক গান এবং যখন তখন প্রস্তুত হইয়া গীত হয়। এক এক দলে দশাধিক লোক থাকে। এই সকল গানে বেশ রচনানৈপুণ্য আছে। ইহাতে অনেকে মাতিয়া যায়। গ্রাম্য-কবিগণ ইহার রচয়িতা।

"ঘাটু" গান গ্রাম্য-গীতের আর একটী। একটী বালক লইয়া তাহাকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া, তৎকর্ত্তৃক ও অপরাপর গায়ক দ্বারা সংগীত করান হইয়া থাকে। ইহাও একটী আমোদপ্রদ গান। অনেকে ইহাতে মাতিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার বেশ প্রভাব ছিল, এখনও অনেক স্থানে আছে, তবে ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

আরও নানাপ্রকার গান গীত হইয়া থাকে। ঐ সকল গান আমি বারান্তরে প্রকাশ করিব। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম ও কালী বিষয়ক গান বাউল এবং রামপ্রসাদী সুরে গীত হইয়া থাকে। সময়ান্তরে অর্থ সংবলিত ঐ সকল গীতাদি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। ঐ সকল গ্রাম্য-গীত বড় উপদেশপ্রদ ও ভাবব্যঞ্জক।

"বারমাসী" বলিয়া একটা গ্রাম্য-গীতি অনেকের মুখে মুখেই গাহিতে শুনা গিয়া থাকে। ইহার একটী উপাখ্যান আছে; সেই উপাখ্যান লক্ষ্য করিয়াই এই গান। গ্রাম্য ভাষায় গানের ভিতর দিয়া বার মাসের বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই উপাখ্যানটী এই;—

একদা কোন এক মুসলমান সমৃদ্ধিশালী পরিবারের একটী যুবক, তাহার প্রতিবাসিনী এক বিবাহিতা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যুবতীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা প্রদর্শন করে। পিতা এই যুবকের বিবাহ দিতে চাহিলেন। যুবক সেই যুবতী ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না এইরূপ বলায়, পিতা, যুবতীর স্বামীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে বলেন। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ ত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। এই অসঙ্গত প্রস্তাবে যুবতীর স্বামী রাগে ও ঘৃণায় ঐ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে সেই সাধ্বী রমণীকে চক্রান্ত দ্বারা স্বামীর নিকট নানা অসৎ ও কৃত্রিম উপায়ে কুলটা প্রমাণ করিলে, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ-পত্র লিখিয়া দেয়। এই ইস্তফা হইলেই ধনী যুবকটী যুবতীকে বিবাহ করিতে পারে। তৎপরে যুবতী দুঃখ ও খেদে এই গান করিতেছে। এই গানটী গ্রাম্য মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত। আমি এইখানে এই গীতটী প্রকাশিত করিলাম। ইহা উচ্চৈঃস্বরে গীত হইয়া থাকে, সুর লিখিয়া দিতে পারিলাম না। ইহা দুঃখ-মিশ্রিত বার মাসের বর্ণনা। স্বামী ইস্তফা দিয়াছেন, এখন স্ত্রী দুঃখ করিয়া বার মাসের কাহিনী কহিতেছে, আর কলিমা পড়িয়া অর্থাৎ পুনরায় বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহে রাখিতে কহিতেছে।

ময়মনসিংহের গ্রাম্যগীত।

বারমাসী।

১

শুন শুন শুন প্রভু শুন অন্ত বাণী;
বারমাসের বার কথা আমি সব জানি।
বারমাসের বার কথা, আমি যাই কইয়া
আল্লার দিয়া পুনঃ মোরে কলিমা পড়িয়া।

২

আইজ অতি জান্‌লাম, সুসোয়ামী কেমন ধন,
আশ্‌মানের চন্দ্র দিয়ে, ভজিছে নিরঞ্জন।

৩

সুবর্ণ বস্ত্র আমার তাতে দিলা কালি,
সর্ব্ব অঙ্গ জুড়িয়া (গো) অগ্নি দিলা ঢালি।

৪

পহেলা কার্ত্তিক মাসে গাছে শুয়া বাত্তি,
ছাড়িয়া বুঝি গেলা গো পরাণের নিজ পতি।

৫

আঘন মাসেতে প্রভু নিত্যি আমন ধান,
কেহই খায় ঘির্ত্ত মধু, কেহই পরদান।

৬

নারী রান্ধে সাইলের ভাত সুস্বামী বইসে খায়,
হাতখানি ধলাইতে বিবি আপনি জুগায়।

৭

হাতখানি ধলাইতে বিবি, উড়ে পড়ে হাস,
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে ছাড়ুইন গৃহবাস।

৮

পৌষ মাসেতে প্রভু পুষ্‌ব অন্ধকার,
পুরুষ ছাড়া বঞ্চে নারী, কিবা গতি তার।

৯

উড়ে পড়ে ভমরা যে, ফুলের মধু খায়,
এইরূপ যৈবন আমার অকারণে যায়।

১০

মাগ মাসেতে প্রভু দুর্গুণ বয় শীত,
তুলার উরণ তুলার পইরণ শিয়রের বালিশ।

১১

ফাল্গুন মাসেতে প্রভু ভইসের সিঙ্গা লরে,
চলিতে না পারে বিবি যৈবনের ভারে।

১২

এইরূপ যৈবন আমার হৈল পরাণের বৈরী,
যারে ডাকি বাপ ভাই সেই.করে চুরি।

১৩

কেওই চায় আরে আরে কেওই চায় রইয়া,
কত কাল রাখিব যৈবন, লোকের বৈরী হৈয়া।

১৪

চৈত্রিক মাসেতে প্রভু বসন্তের বাহার,
কাগ কোকিলা পঙ্খী মিলিয়া করে রাও।

১৫

ডাউক ডুমুরা পঙ্খী ওরা ডাকে রইয়া,
নব রঙ্গ কোকিলার রবে পাঞ্জর পড়ে খইয়া।

১৬

বৈশাগ মাসেতে প্রভু বার রবির জ্বালা,
উত্তম সিঙ্গাসনে সুস্বামী শুইছেন ভালা।

১৭

সিঙ্গাসন পালঙ্গে পতি শুইয়া নিদ্রা যায়,
ভাজন তিরীটী হইলে পাঙ্খাটী হিলায়।

১৮

পাঙ্খাটী হিলাইতে প্রভু শীতল হয় গাও ;
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে মোরে ছাড়িয়া যাও।

১৯

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে প্রভু গাছে পাকা আম,
দারুণ নিদ্রার চাপে চুয়াইয়া পড়ে ঘাম।

২০

আম খাইতে কাডল খাইতে অধিক লাগে মিডা,
তাহাতে অধিক মিডা কুলে যার বেডা।

২১

নাই আমরার বেডা পুত্র এইরূপ যৈবন ;
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে হৈলা নিদারণ।

২২

আষাঢ় মাসেতে প্রভু গাঙ্গে নয়া পানি
কত কত সাধু যায় উজান ভাটিয়ানি।

২৩

কেহ যায় ভাটিয়ান বাইয়া কেহ যায় উজান,
এরে দেক্কিয়া যৈবত নারী বিদুরে পরাণ।

২৪

শ্রাবণ মাসেতে প্রভু হিণ্ডি বয় ধারে
চলিতে না পারে বিবি যৈবনের ভারে।

২৫

নিত্যি হইল ভার প্রভু নিত্যি হইল ভার,
দিবারাত্র মাগইন প্রভু, সুস্বামীর বিধার।

পুত্র—পুত্র।
নিদারণ—নিদারুণ, নির্দ্দয়।
গাঙ্গে—নদীতে।
পানি—জল।
সাধু—মহাজন।
উজান—স্রোতের বিপরীত।
ভাটিয়ান—স্রোতের অনুকূল।
বাইয়া—সহিয়া।
এরে—ইহারে।
দেকিয়া—দেখিয়া।
যৈবত—যুবতী।
বিদ্রে—বিদরে, বিদীর্ণ হয়।
হিঙ্গি—বৃষ্টি।

মাগইন—মাগেন।
দ্বিধার—দুই কূল।
বচ্ছর—বৎসর।
আশিন—আশ্বিন।
গড়ি—গড়াগড়ি।
জুড়িলাইন—আরম্ভ করিলেন।
কান্দন—ক্রন্দন।

স্বামী শব্দ অনেক স্থলেই "সোয়ামী" বলিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষা কর্কশ নহে, কোমল; সুতরাং ঐ জেলার গ্রাম্য-গীতি ও তাহার উচ্চারণ সম্ভবমত কোমল বটে।

রাজসাহীর গ্রাম্য-গীতি।

রাজসাহী ও পাবনা জেলার গ্রাম্য লোকেরা তদ্দেশীয় গ্রাম্য ভাষায় যে সকল গীত গাহিয়া থাকে, তন্মধ্যে খেয়াল, কবি, জারি, বয়ানী, ভাসান, পদ্মাপুরাণ, গাজি কীর্ত্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজসাহীর মুসলমানেরা হিন্দুর পদ্মাপুরাণ লক্ষ্য করিয়া, চান্দ সওদাগর, বেহুলা, নখিন্দর প্রভৃতির গান ও কৃষ্ণচরিত্র লক্ষ্য করিয়া কবিগান করিয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুদিগকে গাজি কীর্ত্তন গাহিতে শুনা যায় না। হিন্দুদিগের বাড়ীতে গাজি কীর্ত্তন মুসলমান কর্ত্তৃক গীত হইতে প্রায়ই দেখা যায়। আমি অল্প কয়েকটী সংগৃহীত গ্রাম্য-গীত প্রেরণ করিতেছি। তাহাদের শব্দের উচ্চারণ ঠিক ঠিক মতে লিখিলাম, তজ্জন্য কেহ বর্ণাশুদ্ধি মনে করিবেন না। এই সকল উচ্চারণ শুনিলে বুঝা যায়, কিন্তু লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন। এই সকল গানের সুর লিখিয়া বুঝানও কঠিন। সাধারণ কয়েকটী গ্রাম্য-গীত দিলাম, বারান্তরে ভাবব্যঞ্জক গ্রাম্য-গীতসমূহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১ম গ্রাম্য গীত।

চাইল অ দিলাম ডাইল অ দিলাম
না দিলাম হাড়ি
গাছতলাতে রাইন্ধে খায়লে
মনে রোকো বাড়ী
ননদ শোব কার কাছে।
বইল্‌তে আমার বলদ বয়
দুইক্কের গলায় রে দড়ি।
এক কুলকি আগুনের জন্যে
ফির্‌ছে বাড়ী বাড়ী
ননদ শোব কার কাছে।
শ্বশুড় খায়লো ভাসুর খায়লো
সুবনের থালে
তোর ভাই আগাবি বইল্‌দে
খায়লো আকর কলার পাতে।
শ্বশুড় শোয়ল ভাসুর শোয়ল
শোয়ল পালং পরে
তোর ভাই আগাবি বইল্‌দে
শোয়ল গুরুল পালান বুকে দিয়ে।

২৬

ভাদ্র মাসেতে প্রভু পাকিয়া পড়ে তাল,

আট বার বচ্ছর যৈবন, না পড়িছে কাল।

২৭

আশিন মাসেতে প্রভু গাঙ্গে বালু চর,

নারীকে ছাড়িয়া করিলেন গমন,

ধুলায় গড়ি দিয়া বিবি, জুড়িলাইল কান্দন।

এইরূপ "বারমাসী" ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতা বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিয়া গাহিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের সুর প্রায় সবটীরই এক রকম।

"বারমাসীর" শব্দার্থ।

কইয়া—কহিয়া।

আন্দর—ভিতর বাটী।

কলিমা—মুসলমানী-ধর্ম্মের মন্ত্র।

আইজ—আজ।

অতি—হইতে।

জান্‌লাম—জানিলাম।

সুসোয়ামী—উত্তম স্বামী।

আশমানের—আকাশের।

জুড়িয়া—লইয়া।

গুয়া—সুপারি।

বাত্তি—পক।

আঘন মাস—অগ্রহায়ণ মাস।

নিত্যি—নিত্য, প্রত্যহ।

ঘির্ত্ত—ঘৃত।

পরদান—ভিক্ষা।

সাইলের ভাত—এক প্রকার চাউলের ভাত।

বইসে—বসিয়া।

ধলাইতে—ধৌত করিতে।

জুগার—জোগাড় দেয়।

বুইজ্জে—বুজিতে।

উড়ে পড়ে—উঠে পড়ে।

ছাড়ইন—ছাড়েন।

পুষ্‌র—পুষ্প।

বক্কে—ভুজে।

ভমরা—ভ্রমর।

যৈবন—যৌবন।

মাগ—মাঘ।

দুগুর্ণ—দ্বিগুণ।

উরণ—গাত্র-বস্ত্র।

পইরণ—পরিধেয় বস্ত্র।

ভইশের—মহিষের।

সিঙ্গা—সিং।

লরে—নড়া চড়া করে।

বৈরী—শত্রু।

কেওই—কেহই।

আরে আরে—ঠারে ঠুরে।

রইয়া—রহিয়া।

হৈয়া—হইয়া।

চৈত্রিক—চৈত্র।

কাগ—কাক।

পঙ্খী—পক্ষী।

রাও—শব্দ।

ডাউক—এক প্রকার বন্য পাখী।

ডুম্বুরা—ঐ।

পাঞ্জর—পঞ্জর।

খইয়া—খসিয়া।

বৈশাগ—বৈশাখ।

বার রবির—দ্বাদশ সূর্য্যের।

সিঙ্গাসনে—সিংহাসনে।

শুইছেন—শয়ন করিয়াছেন।

ভালা—ভাল।

পালঙ্কে—খট্টাতে।

ভাজন—ভক্তিমান্।

তিরিটী—স্ত্রীটী।

হিলায়—ব্যজন করে।

গাও—শরীর।

কাডল—কাঁঠাল।

মিডা—মিঠা।

কুলে—ক্রোড়ে।

বেড়া—বেটা, পুত্র।

বইলতে আমার বলদ
বয়রে বোঝায় কয়ে খাওন।
(আর) দুপুর রাইতের কালে
মনে উঠে আগুন।

২য় গীত।

শুন শুন দীন মুছলমান
মুছলমানের এই দীনের কাম
নবির দিন কেনে ভুল।
রোমজানের চান্ রেখো রোজা
নামাজ যেনে হয় না কাঁজা
সে নামাজ কাজা হোলে
আল্লা তারে সাজা দেবে
দোজক ঘরে।

৩য় গীত

শোঁঠের প্রোণয় করা
আর ভাল লাগেনা সই।
শোঁঠের সনে প্রোণয় করা
হাটু জলে ডুইবে মরা
হাবু ডুবু কইরে মরি
হা ধইরে তুলেনা প্রাণ।

১ম গীতের শব্দার্থ।

চাইল অ দিলাম ডাইল অ দিলাম—চাউলও দিলাম, দাইলও দিলাম।
রাইন্ধে খায়লে—রান্ধিয়া খাইলে।
রোকো—রাখিও।
শোব—শুইব, শয়ন করিব।
বইল্তে—বলিতে।
বলদ বয়—বলদের মত খাটনী।
হুইকের—হুঁকার।
এক ফুলকি—এক টুকু।
খায়লো—খাইল।
সুবনের—সুবর্ণের, সোনার।
আকর কলা—খারাপ কলা।
বইলদে—বলদব্যবসায়ী অর্থাৎ গাড়োয়ান
শোয়ল—শুইল, শয়ন করিল।
পালং পরে—খাটের উপরে।
গরুর পালান—গো গ্রাস।
বাগুন—বেগুন।
দুপর রাইতের—দুই প্রহর রাত্রের।

২য় গীতের শব্দার্থ

ইহার মুসলমানী শব্দগুলি দুর্বোধ।

কেনে—কেন।
রোমজানের—রমজানের
নামাজ—নমাজ।
যেনে—যেন।
কাজা—নষ্ট।
দোজক—নরক

৩য় গীতের শব্দার্থ।

শোঁঠের—শঠের।
প্রোণয়—প্রণয়।
ডুইবে—ডুবিয়া।
কইরে—করিয়া।
হা ধইরে—হাত ধরে।

এই সকল গ্রাম্য-গীত শুনিয়া ভাষার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শুদ্ধ ভাষার সঙ্গে অনেক স্থলেই আকার, ইকার প্রভৃতি শব্দের যোগ বা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আর কোন কোন স্থলে "ই" বা 'ইৎ' বাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন স্থলে অনর্থক একার বা ইকার যোগ করিয়া শব্দ সম্পন্ন করা হইয়াছে। যেখানে যেমন সুবিধা, শব্দ ও ভাষার উচ্চারণ তদনুরূপ হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইয়াছে

গ্রাম্য গীত।

পদ্মাপুরাণ।

(রাজসাহীর)

বেহুলার প্রতি বেহুলার শ্বাশুড়ীর উক্তি,

ওট বালি কার রাও,
ডাক দে জননী মাও ;
মায় পুতে হোক দেখা শুনা,
বিষের জ্বালায় শরীল গেলো
হলো কালো, বিষের জ্বালা।
তোর বাপ মাও ছিল ভাগ্যিমান,
শুয়ে থাকৃতে পালং দান,
তার মইদ্দে ছিল পদ্দার রাগ।
বিষের জ্বালায় শরীল হইলো কালো।
যখন বালির বাপ মাওর তুইলনা দিল,
বালির নিন্‌রা ছুইরে গেলো ;
বালি চখে চেতন পেইলো।

বেহুলার উক্তি—
ওরে এত সাজন ধোন থাইক্‌তে,
আমার মাথার সেঁদুর গেলোরে চোরে,
সোণারে নিশির স্বপনে।

শ্বাশুড়ীর উক্তি—
ওমা কাইল বিয়ানে বাইনে ডাকি,
সেঁদুর রেবো কিইনে।

বেহুলার উক্তি—
(ওরে) বেশর গেলোরে চোরে।

শ্বাশুড়ীর উক্তি—
(ওমা) কাইল বিয়ানে গড়নি ডাকি,
বেশর দেবো গইড়ে।

বেহুলার উক্তি—
ওমা সকল ধোন থাইক্‌তে আমার
সোয়ামী গেলরে চোরে।

শ্বাশুড়ীর উক্তি—
বেইলী বালি চিড়ল দাতি,
চিড়ল চিড়ল দাত ;
বাসর ঘরে খায়লো সোয়ামীরে,
না পোয়ালো রাত,
সোণারে নিশির স্বপনে।

বেহুলার উক্তি—
গাইল দিওনা গাইল দিওনা
কু বচন বইলে,
তোমার বেটা যদি মইর্‌যা থাকে
দেবো জিলায়া।
শুন শুন শ্বশুড় ঠাকুর করি নিবাদন
একান কদলী ভুইরী বেন্দে আমায় দেও।

বেহুলার প্রতি গোদার উক্তি—
শোন শোন রূপবতি,
মেয়তা লয় যাবে কতি,
আইস তুমি আমার মোন্দিরে।
(ও) পতি লয়ে কান্দে বালি
(ও) কে দেলে ছুকের ডালি।

বেহুলার উক্তি ;—
ওট প্রবু লকিন্দার ধনুক শর হাতে লেও
বদ বাটুল দেদারে পাটাও।
(ও পতি লয়ে কান্দে বালি)
শোন শোন বীর গোদা তোরে দিলাম বর
তাল বিরিক্ষ হয়া থাক এই মাটীর পর।
সতী নারীর কথা বেথা নারে যায়।
তাল বিরিক্ষ হয়া থাক এই মাটীর পর।
লেকান ধুপান কাপুড় কাঁচে,
খাড়ে আর থইলে ;
বেইলী বালি কাপুড় কাঁচে,
সুধা গঙ্গার জলে।
ওমা তুমি না ডোমের ঝি,
তোমাকে আমি চিনেছি।
তুমি আমার বালার বধুরে,
কোন্ গঙ্গায় ভাসালে লখিন্দরে॥

এই পদ্মাপুরাণ গীতের কতক অংশ মাত্র লিখিলাম। এই গীতটী কোন মুসলমান কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং মুসলমান কর্তৃকই গীত হইতে শুনিয়াছি। ইহাতে কিছুমাত্র সরসত্ব না থাকিলেও

গ্রাম্যভাষার বিশেষত্ব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গ্রাম্য ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন বা অসম্ভব। গ্রাম্য গীতের সুর লিখিয়া দেওয়াও তদ্রূপ কঠিন। উজান, ভাটিয়ান, রাগিণীগুলি শুনিয়া উচ্চারণ বুঝা যায়, লিখিয়া বুঝান কঠিন।

পদ্মাপুরাণের শব্দার্থ।

ওট—উঠ।
বালি—বেহুলা।
কার—কর।
রাও—শব্দ।
জননী মাও—মা জননী।
মায় পুতে—মাতাপুত্রে।
জালায়—জ্বালায়।
শরীল—শরীর।
বাপ মাও—পিতামাতা।
ভাগ্যিমান—ভাগ্যবান্।
পালংদান—খাট।
মইদ্দে—মধ্যে।
পদ্দার রাগ—পদ্মার অঙ্গরাগ।
তুইল্না—তুলনা।
নিন্‌রা—নিদ্রা।
দুইরে—দূরে।
চখে—চক্ষে।
পেইলো—পাইল।
সাজন—সজ্জা।
ধোন—ধন।
থাইক্‌তে—থাকিতে।
সৈন্দুর—সিন্দুর।
কাইন—কন্যা।
বিয়ানে—প্রভাতে।
বাইনে—বেণে।
কিইনে—কিনিয়া।
বেশর—নথ, এক প্রকার নাসিকার অলঙ্কার।
গড়নি—অলঙ্কার-প্রস্তুতকারী।
ডাকি—ডাকিয়া।
গইড়ে—গড়িয়া।
সোয়ামী—স্বামী।
বেহুলী বালি—বেহুলা।
চিড়ল দাতি—লম্বা দাঁতবিশিষ্ট।
পোয়ালো—পোহাইল।
গাইল—গালি।
বইলে—বলিয়া।
বেটা—পুত্র।
মইর্‌য়া—মরিয়া।
দেবো—দিব।
জিলায়া—জিয়াইয়া, জীবন দিয়া।
নিবাদন—নিবেদন।
এক্কান—একখান।
ভুইরী—ভেউড়া।
বেন্দে—বান্ধিয়া, বেঁধে।
দেও—দাও।
মেরতা—মৃত মড়া।
কতি—কোথায়।
মোন্দিরে—মন্দিরে।
দেলে—দিল।
দুক্কের—দুঃখের।
প্রবু—প্রভু।
লকিন্দার—লখিন্দর।
লেও—লও।
বদ বাটুল—বজ্র বাটুল, এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র।
দেদারে—বহুতর।
পাটাও—পাঠাও।
বিরিক্ষ—বৃক্ষ।
বেঁথা—ব্যথা।
লেকান ধুপান—লেকান নামক ধুপী।
কাপুড়—কাপড়।
খাড়—কাপড় ধলাইর জন্ত তন্ন হালি।
সুধা—সুধু।

জারি।

(রাজসাহীর)

তোম্‌রা সবে লস্কর যাও, দামাস্কা সহরে ;
আর আমি একা যাবু জয়নালের তালাসে।
সাঁজ সাঁজ বইলে হানিপ,
সাজনে দিল সারা,
আসি গুণ্ডা ঢোল বাজে,
বিয়াল্লিস গুণ্ডা কারা।
তোম্‌রা সবে লস্কর,
পথে আছ বইসে ;
আইজ কার্‌বা সঙ্গে বিবাদ তোমার,
কার্‌বা সঙ্গে লড়।
আজি জয়নালের লস্কর,
পথে আছ বইসে,
কার্‌বা সঙ্গে লড়,
বিবাদ কার সাতে।
লাল সা, বলেন ত সায়েব,
শোন সমাচার ;
কবল আছে আলখানা,
তাও রাখছি ঘিরি।
(আজ) বাদসার সঙ্গে দেখা করার
যদি থাকে মোন্‌।
যায়গা আয়গা দেখি দামাস্কা সহর।
পালংপরে চান্দর উড়ে,
এ জিদার নামদার ;
(আর) হুকুমে তার লস্কর চলে,
দশ বিষ হাজার।
মাসে পাবি মাস্‌ কাবার,
আর পাবি জমি ;
মাস্‌ কাবারে হাজার টাকা,
পারা থাকি আমি।
কুদিতে কুপিত মর্দ্দ
হাত্তের কাংগন আটে,
ছাগলের পালে যেমন
বাঘডা যেমন পড়ে।
এমন মুতন পইলো হানিপ,
এ জিদার লস্করে।
লস্কর বেড়িয়া হানিপ দিছে
বেড়া পাক,
(আর) হানিপারে ঘোরা কোরে
কুইমারের চাক।

"জারী" নানা প্রকার। অনেক লোক একত্র নাচিয়া নাচিয়া এই গান করিয়া থাকে। ইহাতে বেশ এক রকম ব্যায়াম হইয়া থাকে। কৃষকগণ একত্র মিলিয়া কার্য্য করিবার সময় ক্ষেত্রে বসিয়াও এই গান করিয়া থাকে। সাইর বা সারি নামে এই শ্রেণীর অপর প্রকার গ্রাম্য গীত আছে, তাহাও অনেকে মিলিয়া গান করে। নিম্নশ্রেণীরা এই সকল গানে একটা বিশেষ আমোদ পায়। এই সকল গানে একাধারে আমোদ ও ব্যায়াম দুইই আছে। আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়া অনেক স্থলে ভদ্রশ্রেণী হইতে এই সকল গান অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

জারির শব্দার্থ।

লস্কর—সৈন্যসমূহ।
দামাস্কা সহর—ডামাস্কাস্‌ নামক সহর।
যাবু—যাইব।
জয়নাল—একজনের নাম।
সাজনে—সজ্জায়।
গুণ্ডা—গণ্ডা।
কারা—ঢোলের মত বাদ্য যন্ত্র।
বইসে—বসিয়া।
আইজ—আজ।
কার্‌বা—কাহারও বা।
লড়—লড়াই কর।
সাতে—সঙ্গে।
লাল সা—এক জনের নাম।
সায়েব—সাহেব।
কবল—কেবল।

আলখানা—বাড়ী।

ঘিরি—ঘেরাও করিয়া।

বাদসার—বাদসাহের।

মোন—মন।

যায়গা আয়গা দেখি—নিয়ে এসে দেখ।

চান্দর—চাদর।

উড়ে—পরিধান করে।

এজিদা—একজনের নাম।

নামদার—নামধারী, নাম লইয়া।

মাস্ কাবার—মাহিয়ানা।

পায়া—পাইয়া।

কুদিতে—বিক্রম প্রকাশ করিতে।

কুপিত—ক্রুদ্ধ।

মর্দ্দ—জোয়ান, বলিষ্ঠ পুরুষ।

কাংগন—কঙ্কন।

বাঘডা—ব্যাঘ্রটা।

মুতন—মতন।

পইলো—পড়িল।

হানিপ—একজনের নাম।

বেড়িয়া—ঘেরিয়া।

বেডা পাক—ঘোর পাক।

ঘোরা কোরে—ঘেরাও করে।

কুইমারের—কুমারের।

চাক—চক্র।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শর্ম্মা।

কুহু!

'কুহু!'—এ স্বর ত তোমাদের চির-পরিচিত—উর্দ্ধতন অগণিত পুরুষ হইতে পরিচিত। আমাকে চিনিলে কি?—না, সেই ক্ষুদে পাখী চাতকের মত গায়ে পড়িয়া আত্ম-পরিচয় দিতে হইবে? আমি যে আজি তোমার ঐ দেওয়ানি খাসের পাশে সৌরভ-ভরা আকুল-করা মুকুল-শোভিত বকুল শাখায় বসিয়া ডাকিতেছি—'কুহু!' কেন বল দেখি? গায়ের জ্বালায়। বলি, সেই নগণ্য অযত্ন ক্ষুদে পাখীটা তোমার মুক্ত বাতায়নে বসিয়া যখন দুদশ কথা শুনাইয়া দিল, তখন তোমার ঐ টেবিলের উপর যে কাগজ-চাপা পাষাণখণ্ড রহিয়াছে, ঐটা ছুঁড়িয়া তার ক্ষুদে মুণ্ডটা উড়াইয়া দিলে না কেন? চঞ্চু উপড়ে তুলিয়া জিহ্বা কাটিলে যে? কি বলিলে? 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম?' সত্য না কি? তবে তোমাদের মধ্যে অনেক 'শিক্ষিত' স্পেন্সের রেস্টুরান্টে—হোটেল ডি প্যারিতে (বন্ধনীর মধ্যে বলিয়া যাই, তোমরা যতই কেন শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব কর না, এখনও অনেক শিখিতে বাকি আছে। তোমরা প্রায় সকলেই—এমন কি সবজান্তা সংবাদ-পত্র সম্পাদকেরাও পারি নগরীকে 'পারিস' বলিয়া লেখেন, এটা ভুল) শেষে অর্থাভাবে তারকেশ্বরের দাড়ীওয়ালা বামুন গলিমুল্লা চাচার খোলার ঘরের বংশ-মঞ্চের উপর সানকি পাতিয়া, ছাগ-মুরগী-বংশ ধ্বংস কর—গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা পার কর, তখন 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' কোথায় লুকায়? কি বলিলে? চাতকের উপর আমার এত গায়ের জ্বালা কেন? কিছু কারণ আছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিলনে—ইংরাজের আগমনে—শাসনে—ইংরাজি শিক্ষার গুণে এখন একটা বিলাতী কথার আমদানি হই-

ছিলই না, এমন কি অনন্ত শব্দরত্নের ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষাতেও নাই। এই যে একটা 'ব্যক্তিগত স্বত্ব-অধিকার-সম্পর্ক' আর 'জাতিগত স্বত্ব' লইয়া, তোমরা মহারোল গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া, সোনার বাঙ্গালার প্রত্যেকের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছ, এ শব্দটা কি কেবল তোমাদের পক্ষেই খাটে? (বন্ধনীর মধ্যে বলিয়া যাই, 'জাতিগত স্বত্ব' শব্দটা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছ বটে, কিন্তু এখনও সম্যক্ অর্থ বুঝ নাই। কিন্তু যেটা আগে শেখা উচিত, সেই 'জাতিগত দায়িত্ব' শব্দটার অর্থ বুঝা দূরে থাক, উচ্চারণ করিতেই চেষ্টা করিতেছ না কেন?)

আমরা সোনার বাঙ্গালার পাখী, আমরাই বা কেন সেই 'স্বত্ব' লইয়া টানাটানি না করি? ক্ষুদে পাখী চাতক, বিমানে বিহার করে। যখন মেঘের কোলে দামিনী দোলে, হাসির ছটায় জগৎ মাতায়, তখন সেই চাতক, সেই হাসি দেখে হাসে, সুখ-সাগরে ভাসে, প্রাণ ভরিয়া ভাষে—ফটীক জল! সে যত পারে, পেট ভরিয়া, জল খাইয়া খল খল করিয়া হাসুক, চাই কি তাহাকে জলসই করিয়া দাও, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সে কেন আমাদিগের 'স্বত্বাধিকার-সম্পর্কে' আঘাত দিতে আসে? তাহার সহিত মানব-সমাজের কি সম্বন্ধ? আমাদিগের স্বত্বে সে কেন ভাগ বসাইতে চাহে?

তোমাদের সহিত আমাদের—কতকগুলি পাখীর স্মরণাতীত কাল হইতে দৃঢ় সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, চাতকের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? ঐ দেখ, এই বিষম বাদলায় পাকশালায় গৃহিণী, ভিজা কাঠ জ্বালাইয়া রন্ধনে বসিয়াছেন, ধূমে ধূমাকার চৌদিক আঁধার—হায়! গৃহিণীর পদ্মপলাশ-লোচনযুগল হইতে অবিরল জলধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। তিনি মনে মনে বলিতেছেন, 'চখ গেল!' আর ঐ যে পাখীটি দেখিয়া দেখিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে,—'চখ গেল!' ডাকের চোটে পাড়া মাতিয়া উঠিল। পাখীর সহানুভূতিতে গৃহিণী চক্ষের জল চক্ষে ধরিয়া, পাখীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। আর ঐ দেখ, ও বাড়ীর পাচক লম্বোদর ঠাকুর, জগদম্বা দাসীর তিন বেক চাউলের ভাতের সম্বল অম্বলের মাছ দুইখানা (যে কোন কারণেই হউক) দয়া পরবশ হইয়া, তাহার ভাতের ভিতর ঢুকাইয়া দিতেছে, আর দন্তহীনা বামা ঝি, দূর হইতে গোপনে তাহা দেখিয়া, গায়ের জ্বালায় গৃহিণীর কাছে গিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, অঙ্গভঙ্গীর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে লম্বোদর-জগদম্বার গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে, আর নবীনা জগদম্বা, তাহা দূর হইতে শুনিয়া, মাছ দুখানা সরাইয়া ভাতের থালা হাতে লইয়া, সেই মেয়ে দরবারে হাজির হইয়া, ভাত ছড়াইয়া দেখাইয়া দিল যে, বামা গায়ের জ্বালায় তাহার বৃথা কুৎসা করিতেছে। আর পার্শ্বের ঐ পাখীটা অমনি বামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'ময়না!'

আর ঐ নবীন বর্ষার অমানিশার ঘনকৃষ্ণ-জলদরূপিণী মন্দোদরী ঝি, তোমাদের খুকুমনির পানাবশিষ্ট দুধের বাটী (বলা বাহুল্য যে খুকুমনি দুধের বাটীটা কেবল মুখে ঠেকাইয়াছিলেন মাত্র) ঐ চোরা সিঁড়ির নীচে এক কোণে লুকাইয়া (অবশ্য খুকুমনির জন্য নহে, নিজের জন্যও নহে) রাখিয়াছিল। শ্রীমান্ গোবরা ওরফে গোবর্দ্ধন মাইতি ভারি মহাশয়, তাহার সন্ধান পাইয়া যেমন গোপনে এক চুমুকে পান করিল, অমনি মন্দোদরীর নজরে পড়িয়া গেল। সরভরা দুধে গোবরার গোঁফ জোড়াটী কেশে ফুলের মত সাদা হইয়া গেল। মন্দোদরী, সহ্য করিতে না পারিয়া, গোবরার কেশাগাছ ধরিয়া সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে দুগ্ধপানের

হৃদিকা দিতে দিতে গালি পাড়িতে লাগিল—'ছেলের মাথা খা—খা—খা।' আর ঐ দেখ, কাকাতুয়া পাখীটি, সেই ঐকতানে যোগ দিয়া গাহিতেছে—'কা—কা—খা—খা।'

আর ঐ দেখ, তোমার ননীর পুতুল খোকা বাবু, গোসাঁই বাড়ী হইতে প্রেরিত 'রাধা-সরোবর-রস-মাধুরী' হাতে লইয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া, গোবরার পৃষ্ঠমার্জ্জন দেখিতেছেন, আর ঐ দেখ দেখ—একচোখো কাকটা আসিয়া খোকা বাবুর কোমল করপল্লব হইতে খাস্তটী ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। হতাশাস আর পাঁচটা কাক ডাকিয়া উঠিল—'কা কা কা' খোকাবাবু কান্না জুড়িয়া দিলেন।

আর ঐ দেখ, ঠাকুর ঘরে দেবতার নৈবেদ্য প্রস্তুত; ক্ষুদে চড়াই কেমন বড়াই করিয়া, দেবতার ভোগের আগে কেমন আতপ তণ্ডুল প্রসাদী করিয়া দিতেছে।

আর তন্তুক্ষীণ-দন্তহীন-উপস্থিত-শেষ দি—বুড়াবুড়ী—কর্ত্তা-গৃহিণী, বৈকালে ছুখা আসনে বসিয়া, মালা জপিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সংসারের প্র—পরা—অপ-পৌত্র প্রপৌত্রাদি এবং নিঃ-দুঃ-বিঃ-দৌহিত্র-প্রদৌহিত্রাদির মঙ্গলামঙ্গলের কথা কহিতে ছেন। আর ঐ দেখ, টিয়া, চন্দনা, সেই কথা বাধা দিয়া বলিতেছে,—'রাধা, কৃষ্ণ রাধা, কৃ কৃষ্ণ রাম রাম।' তখন কর্ত্তা গৃহিণীর চৈতন্য হইতেছে, সংসারের কথা ছাড়িয়া, আবা মালা জপিতেছেন।

আর ঐ দেখ, 'শিক্ষিত' যুবক, রঙ্গমঞ্চে 'মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি' অপেরা অভিনয় দেখিয়া, 'বিউটিফুল, এক্সেলেন্ট ব্রেভো, এনকোর' প্রভৃতি রবে গলা ভাঙ্গিয়া নিশি শেষে বাড়ী ফিরিতেছেন। পথে যাইতে যাইতে অপেরার একটা গান মনে পড়িতেছে;—

'নিশি শেষে কাল শশি!
কোথা হতে উদয় হ'লে?
অরুণ নয়ন দুটি,
চলে যেতে পড় ঢ'লে।'

যুবকের মনে বড় ভয়, বাড়ীতে পাছে মানভঞ্জনের অভিনয় করিতে হয়। তাই নিঃশব্দপদসঞ্চারে চোরের মত ঘরে ঢুকিতেছেন। দেখিলেন কি?

'মানিনী ডুবেছে মান-সাগর মাঝে।'

বাবু ভাবিয়াছিলেন—শ্রীবিষ্ণু! এখন যে বাবুর স্থানে 'যুত' বসিতেছে? (বৈয়াকরণিকেরা বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইবেন।) যাউক সে কথা—নবীন যুবক ভাবিয়াছিলেন, নীরবে শয্যার অঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া, ষাঁড়ের মত নাক ডাকাইয়া এমনই ঘুমাইবেন যে, গৃহিণী সেই নাকের ডাকে উঠিয়া ভাবিবেন যে, তিনি বুঝি অনেক পূর্ব্বে আসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। যুবকের পদার্পণেই যুবতী বিষাদমথিত—প্রণয়-কোপ-বিস্ফারিত ছল ছল নয়নযুগল হইতে তীব্র কটাক্ষবাণ যুবকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মানুষ প্রস্তাব করে, ঈশ্বর পূর্ণ করেন। যুবকের আন্তরিক প্রস্তাবটী ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তিনি মানভঞ্জনে লিপ্ত হইলেন—শ্রীবৃন্দাবনে চন্দ্রাবলীর নিকুঞ্জ হইতে নিশি শেষে কাল শশী, রাধার কুঞ্জে আসিয়া যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই অভিনয়ে লিপ্ত হইলেন। কম্পিতকরে সেই আলতাপরা পাদুখানি ধরিলেন। শেষে গাহিলেন;—

'স্মর-গরল-খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারং।'

মান ভাঙ্গিল না। আর ঐ দেখ, খুব জোয়ান মনভোলান তোয়াই ভৈরবী রাগিণীতে বাজাইল—শ্রীর্বধু নব-কিশলয়-শোভিত

শাখায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া, পাখীটী গাহিল—'বৌ! কথা কও।' মানভঞ্জনের পালা সমাপ্ত হইল।

আরও কতকগুলি পাখীর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ-সুবাদ আছে। 'সম্বন্ধ-সুবাদ' শব্দে স্তম্ভিত হইলে যে? এক সময়ে তোমরা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ হইয়াও যে, পাখী হইতে চেষ্টা করিয়াছিলে? হাসিলে যে? তোমাদের মধ্যে যদি কলিকাতাবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ কেহ থাকেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, জানিতে পারিবে যে, ঐ বাগবাজারে কেমন মানুষ-পাখীর দল ছিল। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে ৺দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই সেই মানুষ-পাখীর দলের প্রধান আড্ডা ছিল। সেই বাটী এখনও বিদ্যমান। সেই বাটীর পূর্ব্বাংশে এখনও সেই উদ্যান বর্ত্তমান, কিন্তু সেই পাখীদিগের আখড়া ঘরটী নাই। পাখীগুলি চিরদিনের মত উড়িয়া গিয়াছে, আর কালের করাল দন্ত, সেই ঘরটী চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ঘরে মানুষ-পাখীগুলি সমবেত হইতেন। এক একটী পাখীর এক একটী নাম ছিল। নেশায় ভোঁ হইয়া, পাখীরা বুলি ছাড়িতেন। পাড়ার লোকেরা—পথিকেরা সেই বুলি শুনিয়া ভাবিত যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিড়িয়াখানায় বাস্তবিকই সকল জাতীয় পক্ষী আপন আপন ডাক ডাকিতেছে। সেই মানুষ-পাখীর দল এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এক রাত্রিতে সভাবাজার-রাজবাটীতে তাহাদিগের আখড়াই বসে। এক এক গো-যানের উপর বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার মধ্যে এক এক জাতীয় মানুষ-পাখী রাজবাটীতে আসিতে থাকেন। রাজবাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ পূর্ব্বেই লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকার পর হ্যাতারে হইতে আরম্ভ করিয়া কাক, চড়াই, সালিক, বুলবুল, শ্যামা, টীয়া, পাপিয়া, দয়েল প্রভৃতি বহুল মানুষ-পাখী এমনই হুবহু বুলি ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন যে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ যেন বাস্তবিকই চিড়িয়াখানায় পরিণত হইয়া গেল। অবিকল স্বর শুনিয়া রাজবাটীর পোষা পাখীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অগণ্য শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তোমরা জীবশ্রেষ্ঠ মানব, তোমাদের অসাধ্য কিছু নাই, ক্ষুদে চাতক কি তাহা জানে?

কিন্তু সে একদিন গিয়াছে—তখন তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল, দুঃখের বিষয় এখন তাহা নাই। এখন সেক্সপিয়র-মিলটন, ড্রাইডেন-বায়রণ ব্রাউনিং-টেনিসন প্রভৃতি বিজাতীয় কবিদিগের কাব্যরূপ খড় কুটা গুলা তোমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া, তোমাদিগকে যেন অন্যজাতীয় মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস প্রভৃতির সে কাব্যামৃত পান করিতে এখন যেন তোমাদের রুচিবিকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা এখন অম্লানবদনে সভাসমক্ষে চসমা-চক্ষে ঘড়িবক্ষে লম্বা দাড়ী নাড়িয়া, বিলাতী কবিদিগের রসপূর্ণ প্রেম-গাথা কপচাইতে পার, কিন্তু নবযৌবনা শকুন্তলার কুচযুগলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষের বল্কল ফাটিয়া উঠিতেছে, কালিদাসের এই কথাগুলি আওড়াইতে যাইলে, তোমাদের জিহ্বা যেন খসিয়া পড়ে। সেই জন্যই তোমরা স্বদেশীয় পাখীগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া, বিদেশীয় ক্ষুদে ক্ষুদে কেনেরিগুলিকে খাঁচায় পুরিয়া, বৈঠকখানার শোভা বাড়াইতেছ। তোমাদের ইচ্ছা যে, বিলাতী 'নাইটিংগেল' গুলিকে ধরিয়া আনিয়া দেওয়ানি খাসে রাখিয়া প্রাণ আরাম কর। কর, দুঃখ নাই, কিন্তু পারিবে না।

কেবল স্বদেশীয় পাখীদের কেন?—এখন তোমরা শিক্ষিত হইয়া, স্বদেশীয় অনেককেও

যে নির্বাসিত করিয়া পাশ্চাত্য ক্ষুদ্র অন্ধ বালক মদনকে আমদানি করিয়াছ। এখন আর সে ফুলময়তনু—ফলময়ধনু মদনের সম্মোহন প্রভৃতি কুসুমশরে তোমাদের শানে না। ফুলশর, এখন তোমাদের পর, কাজেই তাঁহার সখা বসন্তও একান্ত ক্লান্ত হইয়া ভারতে স্বীয় শাসনের অন্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে এখনও সোনার বাঙ্গালায় অনেক স্বদেশী, বসন্ত-নিশ্বাস-প্রয়াসী আছেন বলিয়া, বসন্ত, বৎসরের মধ্যে দুই একদিন দায়ে পড়া মত দেখা দিয়া থাকেন। সে বসন্ত-নিশ্বাস—মলয়-বাতাসে এখন শিক্ষিত বিরহী 'বাবু বাব্বী' দিগের মনপ্রাণ হাহুতাশ করে না। কিন্তু স্বদেশী মদনকে দ্বীপান্তরিত করিয়া যে বিলাতী অন্ধ বালক-মদনকে আমদানি করিয়াছ, এই বালক যে কি কারদানি দেখাইতেছে, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্য ফল বুঝিতে পারিতেছ না। বালকের সঙ্গেই বালকের অধিক ভাব। তাই এখন পঞ্চদশবর্ষীয় বাঙ্গালী বালক, বালক-মদনের সাহায্যে পিতৃ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছেন। এম, এ, পাশ [illegible] করিতে করিতে কন্যাদায়গ্রস্ত হইতেছেন। সামলা মাথায় দিয়া কাছারীর পার্শ্বে গাছতলায় বসিয়া উকীল বেশে মোয়াকেল ধরিতে না ধরিতে 'মাতামহ' উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। ফলটা ভাবিতেছ কি? স্বদেশী ফুলবাণে প্রাণ আনচান করিত বটে, কিন্তু বালক-বালিকাদিগের নহে। তখন তাই সবল সুস্থকায় বাঙ্গালী প্রতি ঘ'রে ঘ'র শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত দেখা যাইত। এখন বালিকারা কুড়িতে বুড়ী, বালকেরা তিরিশে অথর্ব্ব—অক্ষম—প্রপিতামহ!

তোমরা বসন্তকে চিরবিদায়ই দাও, আর মদনকে নির্ব্বাসিতই কর, আমাদের কিন্তু তাড়াইতে পারিবে না। আর যদি চেষ্টা কর, আমরা কিন্তু ছাড়িব না। তোমাদের ঐ পিঞ্জরের মধ্যে ঢুকিয়া দুধ কলা খাইব, আর ডাকিব—কুহু! ঐ দেখ বিরহ-বিধুরা পাগলপারা আপনহারা বিরহিণী। এই দেখ ডাকিলাম 'কুহু!'—উনি বলিলেন, 'উহু!'

৺পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

দেশের বড় দুর্ভাগ্য। খাঁটী মানুষ বেশী দিন বাঁচিতেছে না। হিতবাদীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ খাঁটী মানুষ ছিলেন। তিনি অকালে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আত্ম-বিসর্জ্জনই বল, বা ইচ্ছা-মৃত্যুই বল, কাব্যবিশারদের তাহাই হইয়াছে। খাঁটী 'স্বদেশী'র জন্য এই আত্ম-বিসর্জ্জন বা ইচ্ছা-মৃত্যু। অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। স্বদেশী সঙ্কল্প কি বিফল হইবে, অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'স্বদেশী'র জন্য অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন।

যে দিন হইতে বঙ্গদেশে 'স্বদেশী' আন্দোলনের সূত্রপাত, সেইদিন হইতেই কাব্য-বিশারদের শরীরে কাল ব্যাধির সঞ্চার। কাব্যবিশারদ তাহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খাঁটী মানুষ,—স্বদেশ সেবাকে তিনি জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, স্বদেশের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই ব্যাধির প্রকোপেও তিনি বিচলিত হন নাই।

ভীম-হিমগিরি-সম-অটল-অচল-বিরাট-কর্ম্মবীর কর্ত্তব্য-সাধনার মহাযোগে নিমগ্ন ছিলেন। ধীরে ধীরে তিলে তিলে তাল পরিমাণে ব্যাধি বাড়িতে লাগিল। অকপট মাতৃ-সেবক কিন্তু তাহাতেও টলিলেন না।

কালীপ্রসন্ন বুঝিয়াছিলেন, আমি এই রোগেই মরিব, তাই প্রাণের অন্তরতম অন্তর হইতে গোমুখী ধারার উচ্ছ্বাসে বিশ্ববিমোহন সঙ্গীত-ঝঙ্কার উঠিয়াছিল ;—

"যায় যাবে জীবন চলে।
তোমার কাজে, দেশের মাঝে,
বন্দে মাতরম্ বলে।"

কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, কিন্তু দেশের কাজে তাঁহার ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পরিচয় পাই। ভারতের এ দুর্দ্দিনে কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় কুরুপাণ্ডবগুরু মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ছিলেন। অবশ্য তিনি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের রণরঙ্গে কোদণ্ড টঙ্কারে পৃথিবী প্রকম্পিত করেন নাই, অথবা শাণিত অসি-সঞ্চালনে নর-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত করেন নাই, তবে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় দেশের কাজে ব্রাহ্মণের তপোবলে ও ক্ষাত্রের তেজো-রাগে গৌরবান্বিত ছিলেন। ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে কেবল ব্রাহ্মণের কণ্ঠে দীপক রাগে অমন গান উঠিত না। সাধনায় কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ, নির্ভীকতায় কালীপ্রসন্ন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রাজ পৃথ্বিরাজের গুণগাথায় একদিন চাঁদ কবির বীণার ঝঙ্কারে যে গান শুনিয়াছিলাম, কালীপ্রসন্নের কণ্ঠে সেই গানই শুনিয়াছি।

কাব্যবিশারদ নিশ্চিতই মনে করিতেন, দেশের কাজে আত্মবলি দিতে না পারিলে দেশের কার্য্য সিদ্ধি হয় না। তাই কাব্যবিশারদ বিষম ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও দেশের কাজে বিরত হন নাই। আজ যাঁহাকে দেখিয়াছি শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি-রহিত, কাল আবার তাঁহাকেই দেখিয়াছি দেশের কাজে বিরাট সভায় বলদায়ে গিরিগজবৎ প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে হুঙ্কার বহ্নিরাগে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন ; স্বদেশানুরাগিতার সজীব প্রভায় দেশের নির্জীব, নির্বীর্য্য, উদাসীন অলস ভ্রাতৃবৃন্দকে উন্মত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পুত্রকলত্রের নিষেধ শুনেন নাই, সুহৃদ্ সুচিকিৎসকের মানা মানেন নাই, মাতৃভক্ত কাব্যবিশারদ সত্য সত্যই মায়ের সেবায়, দেশের পরিচর্য্যায়, কর্ত্তব্য সাধনায়, আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন।

হায়! আজ বঙ্গের এই বিরাট কর্ম্মবীর কোথায়! আজ তিনি অনন্ত জলধিগর্ভে জানি না আবার কাহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। দুই বৎসরকাল তিনি প্রস্রাবের পীড়া (Bright's disease) ভুগিতে-ছিলেন। যখন ক্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, যখন রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল, তখন কাব্যবিশারদ চিকিৎসকের উপদেশে এবং পুত্র-কলত্রের অনুরোধে জাপান যাত্রা করিয়াছিলেন। জাপানে তিনি বার দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া গৃহমুখে ফিরিতেছিলেন। পথে সমুদ্রের মধ্যে ষ্টিমারের উপর তাঁহার জ্বরাতিসার পীড়া উপস্থিত হয়। একটী সুহৃদ্ বাঙ্গালী চিকিৎসক ভিন্ন সঙ্গে আত্মীয় অন্য কেহ ছিল না। জ্বরাতিসারেই তাঁহার কাল হইল। ৫ই জুলাই তারিখে হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থলে জলধিবক্ষে ষ্টিমার-কক্ষে সেই কর্ম্মবীর কাব্যবিশারদের মহাপ্রাণ নিঃসৃত হইল। জন্মের মত সব ফুরাইল! ষ্টিমারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কাব্যবিশারদের শব-দেহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরে তাঁহারা প্রভাতের অনিল-প্রকম্পিত অরুণ-কিরণ-উদ্ভাসিত প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে বিশারদের শব-দেহ কাষ্ঠ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া দিলেন। জানি না, প্রশান্ত মহাসাগর কোটী

উর্ম্মি-কর বিস্তারিয়া এই মহাপ্রাণের পবিত্র দেহ কোথায় লইয়া চলিয়া গেল!

কাব্যবিশারদ নাই! তাঁহার কীর্ত্তি রহিল;—নাম রহিল। বলিয়াছি ত কাব্যবিশারদ খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ কে? যিনি একটা কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লন, আর অবিচলিতচিত্তে বাতবজ্র-বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিরোধীর নিষেধ না মানিয়া, আততায়ীর ভীষণ ভয়াল ভ্রূকুটী-ভঙ্গী গ্রাহ্য না করিয়া, সেই কর্ত্তব্যসাধনার পথে চলিয়া যান, তিনিই খাঁটি মানুষ। যিনি ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া, দেশের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি ভাবিয়া, সিদ্ধি কোথায় না জানিয়া, কেবল সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই খাঁটি মানুষ। এ খাঁটি মানুষ হইতে হইলে কি চাই? সাধনা চাই। সাধনায় কি চাই? চাই,—একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, নির্ভীকতা, উদারতা মহানুভবতা। আর কি চাই? আর চাই;—আত্মত্যাগ। কাব্যবিশারদের এই কয়টাই ছিল। এই কয়টাই ছিল বলিয়া কাব্যবিশারদ জীর্ণশীর্ণ অবসন্ন মৃতকল্প হিতবাদীর দেহে জীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। কেবল কি জীবনসঞ্চার? কাব্যবিশারদের অপূর্ব্ব কর্ম্মণ্যতায় এই হিতবাদী বিরাট বপু ধারণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত-উদ্ভাসী আত্ম-মহিমার গরিমা-রাগে এই বিপুল বঙ্গকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। লেখায়, কথায়, ভাষায় ও কার্য্যতৎপরতায় কাব্যবিশারদ অকপট ছিলেন বলিয়াই হিতবাদীকে জনসাধারণের হিতবর্ত্ম করিয়াছিলেন। রাজা প্রজার কার্য্য-সমালোচনায় তিনি চির-সমদর্শী ছিলেন। অধুনা সংবাদপত্রে এমন নির্ভীকতার পরিচয় আর কেহই দিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষদিগ্ধ শলো বিদ্ধ হইয়া কুলকলঙ্কী, সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী লোকেরা প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। কালীপ্রসন্ন শত্রুকে কশাঘাত করিতেন, কিন্তু শত্রুকে বিপন্ন হইতে দেখিলে তিনি তাহাকে কোল দিতেন। মিত্রের অকার্য্যে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না, পরন্তু আবশ্যক হইলে ক্ষুরধার বল্লম সঞ্চালনে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই হিতবাদী আজ সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কাব্যবিশারদের যে গুণে হিতবাদীর চরম সাফল্য, সেই গুণেই তাঁহার সকল সাহিত্য-সম্ভার সমস্ত বঙ্গ ব্যাপিয়া সমাদৃত। কাব্যবিশারদ কবি ও দার্শনিক; শ্লেষে তাঁহার অসাধারণ শক্তি, রসভাষে তিনি রসরাজ, গুরুগাম্ভীর্য্যে তিনি গৌরবান্বিত। তাঁহার হিতবাদী, তাঁহার মিঠেকড়া, তাঁহার বিদ্যাপতি প্রভৃতি সাহিত্যসৌন্দর্য্যে এই সব গুণ পদে পদে প্রতিভাত। আজ এ শোকের দিনে তাঁহার সাহিত্যের কোন সমালোচনা করিব না, তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, তাঁহার সাহিত্য তাঁহার অতুল কীর্ত্তি;—তাঁহার অক্ষয় স্মৃতি।

কাব্যবিশারদের গুণের কথা আমরা আর কত বলিব? আজ তাঁহাকে যতই মনে পড়িতেছে, ততই শোকাশ্রু উথলিয়া উঠিতেছে। কাব্যবিশারদের বিয়োগে এই সাহিত্য-সংহিতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। সংহিতার শোক অসহনীয়। সাহিত্যসভাই বল, আর সাহিত্য-সংহিতাই বল, কাব্যবিশারদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কাব্যবিশারদ নাই; কিন্তু সাহিত্য-সভায় ও সাহিত্য-সংহিতায় এখনও সেই শান্তসৌম্য অকপট কর্ম্মবীর সুহৃদ্ কাব্যবিশারদের কীর্ত্তিনিদর্শন প্রস্ফুটিত চিত্ররাগে সমুজ্জ্বল। কাব্যবিশারদ দেশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-সংহিতার কথা পলকে পলকে ধ্যানধারণায় রাখিয়া ইহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেন। একদিন সম্পাদকরূপে তিনি এই সংহিতার কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, সর্ব্বলোকে কিরূপে সমুজ্জ্বল

করিয়া তুলিয়াছিলেন. তাহা সংহিতার পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কাব্যবিশারদের বিয়োগে সংহিতা ও সভা প্রকৃতই একজন সুহৃদ্ হারাইল।

যে যায়, সে আর আসে না, ইহাই প্রকৃতির লীলা। কাব্যবিশারদ গিয়াছেন, আর তাঁহাকে পাইব না। তেমন উদার, মহানুভব, তেমন অকপট কর্ম্মী আর কি পাইব? আর শোক করিয়া লাভ নাই। শোক করিলে ত আর পাইব না! তবে আমরা যদি সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণ কর্ম্মবীরের প্রদর্শিত পথে চলিয়া, তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করা অসম্ভব হইলেও, যদি কতকটা দেশের কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ অনন্ত আকাশে অনন্ত স্বর্গে মণিমাণিক্য-বিজড়িত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সেই কর্ম্মবীরের আত্মার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিব।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পরিবারবর্গকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব জানি না, তবে তাঁহারা চক্ষের সম্মুখে তাঁহারই অতুল কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া, তাঁহাকে চির-অমর ভাবিয়া শোক সংবরণ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাই আমাদের আশা।

সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা

সপ্তম খণ্ড।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা,

১২ নং শিমলা ষ্ট্রীট, ‘কাব্যপ্রকাশ-যন্ত্রে’

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩ সাল।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস

এবং

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

HIS HONOUR SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.—
Lieutenant-Governor, Bengal.

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE SIR HERBART RISELEY, KT., C. I. E.—
Secy. Government of India.

A. EARLE, ESQ. I. C. S.—*Director of Public Instruction, Bengal.*

PRESIDENT :

THE HON'BLE MR. JUSTICE ASUTOSH MUKHERJEE,
SARASWATI, M. A., D. L., F. R. A. S., F. R. S. E

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১। সাহিত্য-সভার চাঁদা প্রভৃতি টাকাকড়ি মণিঅর্ডারে আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

২। সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশ জন্য প্রবন্ধাদি আমার নামে ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে অথবা ১৫৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

৩। সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত চিঠি পত্র সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য-সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা

অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠী।

যদি আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যত্র পরিচিত নহেন, তাহা হইলে আমাদের যে কতদূর মনোবেদনা হয়, তাহা এস্থলে লিখিয়া জানাইতে পারিলাম না। কি? যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা আট্লাণ্টিক মহাসাগর বলিয়া জানি, তাহা কি লালদীঘীতে পরিণত হইল? তাহা কখনই হইতে পারে না। তিনি যে আট্লাণ্টিক তাহাই আছেন, ও যতদিন ধরিত্রীর অবস্থিতি, ততদিন থাকিবেন। তবে যাঁহারা তাঁহাকে লালদীঘী দেখেন, তাঁহারা সেই দেখাতে আপনাদিগের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেন। সিংহলের বেদিয়া সকল মনে করে যে, পৃথিবীতে কেবল তাহারই আছে ও তাহাদের তুল্য জগতের আর কোনও স্থানে কেহ নাই। তাহারা স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে পরম সুখী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সুসভ্য জগৎ জানেন যে, মানব জাতিরমধ্যে তাহারা নিম্নতম স্থান ও পশুগণের মধ্যে এক ডিগ্রী উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহাদিগের অবস্থা এত অধম, যে তাহারা পণ্ডিতদিগের বিশেষ আলোচনার বস্তু। সেরূপ গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠীকে না জানা নিজের ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক। আমি এস্থলে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতেছি না। আশা করি, নিম্নলিখিত বিবরণাবলী তাঁহার জীবনচরিত প্রকটনের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপনার সহায়তা করিবে।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত "বোম্বাই-চিত্র" নামক পুস্তক পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যে কতিপয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, নাগর ব্রাহ্মণ তাহাদিগের অন্যতম। সত্যেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগের পৃথক্ কৌলিক পুণ্ড্রের চিত্রও উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অতি প্রাচীন সময় হইতে বম্বে প্রদেশে এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে বড় বড় বিবেকী, মানসতত্ত্ববিৎ, কবি এবং রাজনীতিজ্ঞ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন ত্রিপাঠী নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর ত্রিপাঠী উপাধি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যে বংশধর, সেই বংশে বা সেই বংশের কোনও পূর্ব্বপুরুষের সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, সেইজন্য বোধ হয় বংশের উপাধি ত্রিপাঠী হইয়াছে। গোবর্দ্ধনরামের পিতা এক সময়ে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। ইংরাজি ১৮৬৫ সালে তিনি যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। সুতরাং পিতার নিকট হইতে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ব্যতিরেকে তিনি অন্য কিছু প্রাপ্ত হন নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তাঁহাকে বহু ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কোনও মতে

অনোৎসাহ না হইয়া তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে স্বনাম-ধন্য পুরুষ বলা যায়। যদি তাঁহার লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহতভাবে তাঁহাদিগের বংশের প্রতি প্রসন্না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমাদৃত জীবনের কিয়দংশ ক্ষেপণ করিতেন কি না সন্দেহ। গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইলেই, তিনি বিদ্যাচর্চ্চায়, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানানুশীলনে কাল ক্ষেপণ করিতে থাকেন। অর্থকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি এইরূপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠী "সন্ন্যাস ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পান যে, জগতে যাহা কিছু স্বার্থ বলিয়া অভিহিত, তাহার বর্জ্জন ও সমাজের মঙ্গলার্থে আত্ম-সমর্পণই প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। ত্রিপাঠী মহোদয় যাহা বলিতেন, তাহা নিজে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি বাক্যসার ছিলেন না। যিনি এক সময়ে বোম্বাই মহানগরীর সুদক্ষ উকীল ছিলেন, তিনি অচিরে সুপণ্ডিত সাধু হইয়া সার্ব্বজনীন্ প্রেমে ও ঈশ্বর-সেবায় নদিয়াদ গ্রামে অবস্থিতি করিয়া কাল কাটা-ইতে লাগিলেন। এই পরিবর্ত্তন অনেকের আলোচ্য বিষয়, সন্দেহ নাই।

বিষয়ে যখন তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন, তখনও তাঁহার জাতীয় সংস্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহার পরিচয় "সরস্বতী চন্দ্র" নামে পুস্তক রচনা ও তিন খণ্ডে প্রকাশ। ইহা তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ। কাল কখনও ইহার অক্ষয় খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। এই পুস্তকের শেষ খণ্ড তখনও প্রকা-শিত হয় নাই। নদিয়াদের নির্জ্জনাশ্রমে ধ্যানাবলম্বিতাবস্থায় ইহা লিখিত হয়। পুণ্য জীবন কি ? তিনি নিজে এ সম্বন্ধে লিখিয়া-ছেন যে "ঈশ্বরেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ"—জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ—প্রকৃতি প্রেমে জগদাত্মার মাহাত্ম্য বিকাশকরণ, দুইএর সমাবেশে জীবাত্মার পোষণ।" তাঁহার দেশ-হিতৈষণা ভাবে বা ব্যবসায়ে বা বাণিজ্যে পরিণত হইত না। ইহাতে মনস্বিতার, নৈতিকতার ও কার্য্যকারিতার সমপাত ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি এ বিষয় না, ও বিষয় বা কোনও এক বিশেষ বিষয়ের পক্ষ-পাতী নহি। কিন্তু উচ্চতর ও বলিষ্ঠতর জাতি দেখিতে চাই, যাহারা আমার বর্ত্তমান শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্বদেশীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে। সে জাতি যে কিরূপে গঠিত হইবে ও সে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যে কিরূপে প্রজ্বলিত হইবে, তাহাই আমার এখন বিশেষ আলোচ্য।" কিন্তু তাঁহার জীবনের একটি সত্য অতি শিক্ষাপ্রদ। তাহা এই ;—যে উন্নতি ও স্বাধীনতা তাঁহার মনে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার লেখায় প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতাজাত শাসন-প্রণালী-অনুমোদিত।

সুন্দররূপে প্রাচ্যের ভাগ্যরচনায় প্রতীচ্য যাহা করিতেছেন, ত্রিপাঠী তাহা মনশ্চক্ষুতে সুন্দররূপ দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা যাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা তিনি প্রাপ্ত হউন, এই ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার অন্তরে বলবতী ছিল। সংসারে মানবের পদবিক্ষেপ পরি-চালনার জন্য যে উজ্জ্বল দীপ-শিখা পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়গণ জ্বালিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি স্বরচিত "সরস্বতী চন্দ্রে" তাঁহার স্বদেশীয় নরনারীর সন্নিধানে ধরিয়াছেন। ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শিক্ষাই প্রতিফলিত হইয়াছে ; ইহা পুরাকাল ও বর্ত্তমানকালের সন্ধিস্থল। বৈদিক আর্য্যদিগের পুরাতন স্বর্গ

ঐ পুরাতন পৃথিবী ... তদুপরি ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া ... দিগের নিমিত্ত এক অতি ... এক অভিনব পৃথিবীর সৃজন করিতে ... রন। ভারতের অতীত সভ্যতার ... পের অনুবর্তী হইয়া, তিনি প্রাচ্যকে ... চ্যের সকাশে অবনতমস্তক করাইতে চাহিতে ।

তাঁহার শিক্ষার ফল গুজরাটী সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। প্রেমানন্দ যেরূপ গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই গোবর্দ্ধনরাম গদ্য-লেখক, প্রেমানন্দ পদ্য-লেখক ছিলেন। গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের আদর বেশী, পদ্যের অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান বা তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আদর বেশী। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাহা হইলে সমাজে কাহার আদর বেশী হইতে পারে, তাহা আর এস্থলে অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝাইবার প্রয়োজন দেখি না।

বোম্বাই এর এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ কলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তথাকার অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের নিকট সুপরিচিত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম বুধজনের সহিত তাঁহার সুপরিচয় হয়। ইঁহার নাম মন সুখরাম সূর্য্যরাম ত্রিপাঠী। ইনি একজন বৈদান্তিক সাহিত্য-সেবক—সাহিত্য-জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। গোবর্দ্ধনরাম ইংরাজ অধ্যাপকের নিকট হইতে পাশ্চাত্য এবং শেষোক্ত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হইতে প্রাচ্য শাস্ত্র বিজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। দুই শিক্ষার ফল তাঁহাতে দৃষ্ট হয় এবং দুইএর মিলনের ছায়া "[illegible]" গিয়া পড়ে। এ ...হে ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে "মহা-ভারতের" রাজনীতি এবং পুরাণ ও বেদান্ত শাস্ত্রের নীতিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা নাটক নয়, উপন্যাস-গ্রন্থও নয়। যে শক্তি মূলে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া হিন্দুজাতির পারিবারিক জীবন গঠন করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার বলে তজ্জীবনে যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তদ্বিষয় ইহাতে যেভাবে লিখিত আছে, তাহাতে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, হৃদয়-বত্তা ও চিন্তাশীলতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মিত্ররাজ্যগুলির সহিত ইংরাজ রাজের যে সম্বন্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এসিয়া মহাদেশের উপর তাহার যে ফল দর্শিবে, তাহাও ইহাতে সুন্দররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শত শত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী স্বতন্ত্র। ভারতবাসীর প্রয়োজনোপযোগী ভিত্তিতে ইহা সংস্থাপিত। যাহা কিছু তাহার পক্ষে বিজাতীয়, তাহাতে তিনি আস্থা রাখিতেন না।

এখন দেখা যাউক, ভারত-মহিলাকে তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি সমাজের উন্নতি চাও, তাহা হইলে নারীর কার্য্যক্ষেত্র আরও প্রসারণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নচেৎ উন্নতির আশা আকাশ-কুসুম মাত্র। তিনি বলেন যে, "নারী ব্যতীত গৃহ, সমাজ ও দেশ কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? যে স্থানে স্ত্রীজাতির অবস্থোন্নতি নাই, সে স্থানে বিচ্ছেদ ও চিন্তা ঊর্ণনাভসদৃশ জাল বিস্তার করিয়া গৃহীকে নাগপাশ বন্ধনে নির্য্যাতন করে।" অতএব যাহাতে ভারত-মহিলা উন্নীতা হইবে, তাহারই তিনি অনুমোদন করিতেন ও তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহাকে শিক্ষিতা সুন্দরী, বলিষ্ঠা ও রোগশূন্যা করিতে হইবে। যদি পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল কামনা কর, তাঁহাকে সুভার্য্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা ... হইবে। ...পুরোহিতানুযায়ী তাঁহাকে

স্বাধীনতা দিতে হইবে। পারিবারিক মঙ্গল হেতু তাঁহাকে প্রদত্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে দিতে আমরা প্রস্তুত থাকিব। দুর্ব্বল চিত্তজাত ক্ষীণা কামনার প্রশ্রয়ছল তাঁহাকে করিলে চলিবে না। নারী দুর্ব্বলের বল, তরুণবয়স্কের বন্ধু ও বৃদ্ধের আধ্যাত্মিক সহায় হইবে। উপরের কতিপয় পংক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তিনি একদেশদর্শী সামান্য হিন্দু ছিলেন না। "কুমুদ," "কুসুম" ও "চন্দ্রাবলী" নামে গ্রন্থত্রয়ে তিনি আদর্শ রমণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আশা করি, বর্ত্তমান ভারত-মহিলাগণ তাঁহার সেই ঈপ্সিত আদর্শ-রমণী হউন।

গুজরাটী সাহিত্য-মহাসভার অধিবেশনে গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠী সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন। অবশেষে তিনি উহা গ্রহণ ... এ সে বক্তৃতা করেন, তাহা ... সাহিত্য-নির্ম্মাতা—মস্না- পোচ ... অনুমিত হয়। কবিতার নিি ... এক স্বতঃসিদ্ধ আন্তরিক অনু ... । গুজরাট্ প্রদেশের কবিকুল সম্বা... তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে কর্ি ... ও কবিতার কর্ত্তব্যের বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁহার রচিত "সেহমুদ্রা" নামে কবিতা-গ্রন্থ পাঠে উক্ত সত্যটি আরও ভাল রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

উপসংহারকালে আমি বলি যে, গোবর্দ্ধন-রাম ত্রিপাঠী মানবলীলা সংবরণ করেন নাই; তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি শুধু পুরাতন জীর্ণবাসের ন্যায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষিত মহিলা।

অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে আর্য্য-মহিলারা কীদৃক্ সুশিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ কাব্য নাটকাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। যাঁহারা একদেশদর্শী ও সম্যক্ শাস্ত্র-চর্চ্চা-বিহীন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিলেই বিধবা হয়।" তাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন; কারণ, তাঁহাদের হৃদয়-কন্দর কুসংস্কারান্ধকার-জালে সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানসূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ না হইলে সে অন্ধকার-জাল ছিন্ন হইবে না। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোক যতদিন সধবা থাকিবেন, ততদিন তাঁহার নাম "শ্রীমতী অমুকী দেবী" বা "শ্রীমতী অমুকী দাসী" লেখা উচিত, আর বিধবা হইলে, "শ্রীমত্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ" বা "শ্রীমত্যাঃ অমুকী দাস্যাঃ" লিখিতে হয়। বিজ্ঞগণ বুঝিয়া দেখুন ঐরূপ শাস্ত্রকারগণের কিরূপ "টন্‌টনে জ্ঞান।" যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর, কলম চালাইতে পারেন, বিজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিতে কিরূপে সাহসী হইতে পারেন? বিজ্ঞগণ হয়তো প্রতিবাদ-চ্ছলে বলিবেন, সেকি? দেব্যা শব্দের অর্থ দেবীর, আর দেবী শব্দের অর্থ দেবী। যদি একখানি পত্র লিখিবার সময় প্রথমেই "সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদম্" এইরূপ লিখিতে হয়, তাহা হইলে পত্রের সর্ব্বশেষে নাম দস্তখৎ করিবার সময় শ্রীমত্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ এইরূপ লিখিতে হয়। কারণ, উপরে

যে "সবিনয় নমস্কার[illegible]" লেখা হই-য়াছে, সেই সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনটি কাহার? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নীচে লিখিতে হয় শ্রীমত্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ অর্থাৎ শ্রীমতী অমুকী দেবীর। আর যে স্থলে "সবিনয় নিবেদনমিদম্" প্রভৃতি পাঠ না লিখিয়া একেবারে "দিদি তুমি কেমন আছ?" ইত্যাদি রূপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করা হয়, সেই পত্রের নিম্নে শুদ্ধ নামটি মাত্র লিখিতে হয়, যথা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী অর্থাৎ সৌদামিনী কর্ত্তৃপদ, শ্রীমতী বিশেষণ পদ। সৌদামিনীর বিশেষণ। লিখিতে-ছেন বা বলিতেছেন উহ্য ক্রিয়াপদ। এই ত ব্যাপার। ইহাতে বিধবা সধবার কথা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা সরস্বতীর সমগ্র ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এইরূপ "শর্ম্মণঃ" ও "শর্ম্মা" এই দুইটি পদও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যেও বোধ হয় উক্ত বিধিশাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র বাহির করিয়া থাকেন যে, বিপত্নীক হইলে পুরুষ "শর্ম্মণঃ" লিখিবে, আর সপত্নীক হইলে "শর্ম্মা" লেখা উচিত। ধন্য তাঁহাদের শাস্ত্র রচনা-নৈপুণ্য! প্রাচীন, সুশিক্ষার আকর, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, এবংবিধ শাস্ত্র রচনাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহারা সনাতন বেদোক্ত ধর্ম্মের বিরোধী। তাঁহারা আর্য্যসন্তান বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্যদিগের কার্য্য কলাপের অনুসরণে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের দেশের বেদে কি লেখা আছে না আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধিৎসাবর্জ্জিত। যে দেশে বেদের পঠন-পাঠন-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে, সে দেশের লোকেরা বেদজ্ঞান-বিহীন হইয়া যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা ত স্বাভা-বিক। দেশ মধ্যে বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন-প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে যে ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সংযোগে বেদাধ্যয়ন রীতি এ দেশে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও যেন তেন প্রকারেণ আবৃত্তি ও অর্থ-জ্ঞানমাত্র সম্পাদন করিবার জন্যও যদি দেশের লোকের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলেও দেশের ঈদৃশ অনিষ্টাপাত হইত না, তাহা হইলেও স্বদেশীয় লোক, জালবদ্ধ মীনের ন্যায় কুসংস্কার-জালে আবৃত হইত না। পরি-বর্ত্তনশীল কালের কুটিল চক্রে লোক যে কিরূপ ঘূর্ণ্যমান হইতেছে, তাহা দেখিয়া বিজ্ঞগণ সময়ে সময়ে অশ্রু সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই ভূমণ্ডলে কাল-মাহাত্ম্যে অত্যুচ্চ অভ্যুন্নতি শৈল-শিখরে সমারূঢ় জাতি অতল পাতাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যায় ও আম-মাংসভোজী, তরুত্বক্‌পরি-ধানকারী ভীষণ-শ্বাপদসঙ্কুল-গিরিকন্দরনিবাসী ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন বর্ব্বর অসভ্য জাতিও সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, ঐতিহাসিক-গণের গভীর গবেষণা প্রসূত তথ্য-সংবাদে আমরা ইহা দেখিয়া থাকি। সুতরাং কবি-কুলচূড়ামণি মহাকবি পূজ্যপাদ কালিদাস স্বীয় অমূল্য রত্ন অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

> "যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
> আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
> তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাম্
> লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥"

অর্থাৎ যে ওষধি সেবন করিয়া লোক ব্যাধি মুক্ত হয়, যমের হস্ত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই ওষধি সমূহের অধিপতি, তমো-নাশক, জগৎপ্রকাশক সুশীতলকিরণবর্ষী চন্দ্র-দেবতাও অস্তমিত হইয়া যান। তিনি [illegible]চূড়া অবলম্বন করিলে পর সমগ্র

জগৎপ্রকাশক প্রখর-কিরণশালী মহাপ্রভাব সূর্য্য-দেবতা অত্যুচ্চ আকাশমার্গে উদিত হন। কিন্তু সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঈদৃশ প্রভাবশালী প্রভাকরও অস্তমিত হইয়া যান। এবংবিধ চন্দ্রসূর্য্যের উত্থান পতন ঘটাইয়া ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদিন এই শিক্ষা দিতেছেন যে, জগতে সকল জাতিরই উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বোপরিস্থ চন্দ্র-সূর্য্যেরও যখন এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তখন মনুষ্যজাতির উত্থান পতনে বিস্মিত হওয়া বৃথা কষ্ট পাওয়া মাত্র। একদা যে দেশে স্ত্রীলোক বেদের সূক্ত সংকলন পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, যে বেদ-সূক্ত পাঠ করিয়া কত শত শত ঋষির পুরুষত্ব লাভ হইয়াছিল, জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল, পুণ্যরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, আজ সেই দেশের স্ত্রীলোক বিধবা হইলে যেন "দেব্যা" এইরূপ লেখেন ও সধবাবস্থায় যেন "দেবী" এইরূপ লেখেন ইত্যাদি আইন্ কানুন্ যে দেশে রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দেশে এই সময় যদি ভগবান্ পাণিনি ঋষি বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও এই নবীন ব্যাকরণ-সূত্র শুনিয়া "হতভম্ব" হইয়া পড়িতেন! আমি তো কোথায় আছি। আমি তো আমি। যিনি যাহাই বলুন আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র মহাপ্রামাণিক, হেমাদ্রি কিন্তু বলিতেছেন যে বাপু! ভারতীয় আর্য্য মহিলারা সধবা বা বিধবা হইবার পূর্ব্বেই কুমারী অবস্থায় অন্ততঃ শিক্ষালাভ করিবে।—

কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌনিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যাবিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততোবরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
এষ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

কুমারীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত। কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন;—ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদান করা উচিত। স্বর্গীয় গল্প, শূকরের উপাখ্যান, বিদ্যাসুন্দরের রসাল টপ্পা, প্রেমোপাখ্যানাদি না শিখাইয়া স্ত্রী ধর্ম্ম-জীবন সংগঠিত করিবার জন্য কুমারীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবে। কুরুচিকর নাটক নভেল আদি না পড়াইয়া সুনীতিশিক্ষা প্রদান করিবে। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী লোপামুদ্রা অরুন্ধতী প্রভৃতি পবিত্র-চরিত্রা আর্য্যমহিলা দেবীদিগের দৃষ্টান্তসমূহ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদান করিলে পিতামাতা শ্বশুর শ্বশ্রূ স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি স্ত্রীজাতির কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা কুমারীগণ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কল্যাণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে। "দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যাবিদ্যামধিগচ্ছতি।" যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারীই উভয় কুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে। শুদ্ধ কেবল মাত্র ধোপার খাতা লিখিবার জন্য কিংবা প্রোষিত স্বামি-সকাশে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য কুমারীগণকে বিদ্যা শিখাইতে শাস্ত্র কখনও অনুমোদন করেন না। তারপর যখন ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে কুমারী সুশিক্ষিতা হইবে, তখন তাহাকে একটি বিদ্বান্ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে। ধর্ম্মনীতিশিক্ষিতা কুমারীকে মূর্খ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাবিহীন একটি আধুনিক কুলীনকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া পিতা, কন্যার জীবনের সর্ব্বনাশ সংসাধন করিবে না, ইহাই শ্লোকার্থ।

ইহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তক বক্তৃতা-

বাগীশদিগের কথা মত [illegible] ঋষিভিঃ পরিগীয়তে। ইহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের নিরুক্ত পথ। প্রাচীন ঋষিগণ এই পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্ত পথের গৌরব, উচ্চরবে প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক দুন্দুভিনাদে বিঘোষিত হইয়াছে। যে কুমারী পতি-মর্য্যাদা শিক্ষালাভ করে নাই, যে কুমারী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করে নাই, পতি সেবা কিরূপে করিতে হয় তাহা জানে না, ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ শাসন-বাক্য সকল লিখিত আছে, যে কুমারী তাহা জানে না, যে কুমারী ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে অশিক্ষিতা, তাদৃশী কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কখনই উচিত কার্য্য নয়। সীতা, অত্যুচ্চ রাজ-শ্বশুরকুলের অত্যুচ্চ প্রাসাদ-কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, উত্তমোত্তম চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য, অসংখ্য দাসদাসী, ও অন্যান্য পরিজন, স্বর্ণরত্নাদি-মণ্ডিত শিবিকা, দোলা, হস্তিরথাদি যান-বাহন ও অন্যান্য সুখোপভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পতি-দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভীষণ বন্যজন্তুসমাকীর্ণ, কণ্টকাচ্ছন্ন, খাদ্যপেয়াদিবর্জ্জিত মহারণ্য মধ্যে গমন করিয়া পতিসেবা করিয়াছিলেন। পতি-বিহীন শ্বশুরকুলে তাঁহার অনাদর ঘটিবার সম্ভাবনা হইলেও, তিনি পিতৃদেব মহারাজ জনকের মিথিলা রাজধানীস্থ উচ্চ প্রাসাদে অনায়াসেই যাইতে পারিতেন। সেখানে তাঁহার আদরের সীমা থাকিত না। মহারাজ জনক অতি যত্নসহকারে মহাসমাদরের সহিত কন্যা সীতাদেবীকে প্রতিপালন করিতে পারিতেন। এই মহাসুখকর উভয় রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে, দুঃখিনী হইবার জন্য পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। পতি-নির্দ্দিষ্ট সহগামিনী মধ্যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া [illegible] আবার [illegible] পূর্ব্বের মত শান্তিসুখ অনুভব করিতেন, সীতাদেবীও তখন পতির সহিত অতুল শান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। এই সকল পতি-পত্নী-চরিত্র-সংবলিত পুণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষাদান না করিয়া পিতা, কুমারী কন্যার বিবাহ যেন না দেন, ধর্ম্মশাস্ত্রকার এই কথা অতি স্পষ্ট উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। আবার মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রও বলিতেছেন :—

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।

কন্যাকে যেমন লালন পালন করিবে, তদ্রূপ অতি যত্নসহকারে তাহাকে শিক্ষা দান করিবে। অনন্তর এক বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে। পাত্রী যদি বিদুষী হয়, আর পাত্র যদি বিদ্বান্ না হয়, তাহা হইলে উভয়ের পরস্পর মনের মিল হয় না, স সারে শান্তিরসের অনুভব হয় না। সুতরাং বিদুষী পাত্রীকে বিদ্বান্ বরের করে সমর্পণ করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ভারতীয় আর্য্য মহিলারা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষি-লিখিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন এবং ঐ সকল শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতী-মাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে কামন্দকী বলিতেছেন,—ইতরেতরানুরাগোহি দার-কর্ম্মণিপরার্দ্ধ্যং মঙ্গলং গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা, যস্যাং বাঙ্মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধস্তস্যাং সমৃদ্ধিরিতি। যে নারী বাক্য মন ও চক্ষু দ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি অতি সৌভাগ্যবতী নারী। কামন্দকী প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্য মহিলারা আধুনিক অনেক পণ্ডিতের ন্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যাদি-সংকলিত সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ সমাপ্তি করিতেন না, কিন্তু "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞ-

যত্নোশনোদিয়াঃ” প্রভৃতি মহর্ষিদিগের মূল গ্রন্থও যথাবিধি পাঠ করিতেন, আলোচনা করিতেন, স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন, প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ মহর্ষি-বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। সুলভা নাম্নী এক নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা একদা মহারাজ জনকের পণ্ডিতমণ্ডলীসমলঙ্কৃত রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তিনি উত্তর করিলেন—সাহং তস্মিন কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে। বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্। আমি সেই উচ্চ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিসমাপ্তির পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি মেধাদি সদ্গুণ-সম্পন্ন পতি না পাওয়াতে আমি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক কৈবল্য প্রাপ্ত ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনিধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অহো! ধন্য ধন্য সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ! যেখানে মহর্ষি ব্যাস পুত্র আজন্ম তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা শ্রীশুকদেবেরও গুরু মহারাজ জনককেও একটি ভারতীয় মহিলার নিকট ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ধন্য সেই প্রাচীন ভারতের আর্য্য-মহিলা জাতি!! এই আর্য্য ললনাললামভূতা সুলভা মহারাজ জনককে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বিনী সুলভা নির্ব্বাণ মোক্ষতত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। মহারাজ জনক স্বয়ং একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সভা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহা মহা জ্ঞানী মহর্ষিগণ কর্তৃক সর্ব্বদাই সমলঙ্কৃত থাকিত। সেখানে সাধারণ পল্লবগ্রাহী ব্যক্তি পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিত না। কোন এক শাস্ত্রে অনন্যসাধারণ বিদ্বত্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই রাজসমীপে আসনই পাইতেন না, তাদৃক্ সভায় তাদৃশ মহারাজের সহিত উক্তরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই সকল ঐতিহাসিক-তত্ত্বের দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য মহিলাগণ শিক্ষায় দীক্ষায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার মহিলারা কৌমার্য্য সাধব্য বৈধব্য এই তিন অবস্থাতেই ছিলেন দেবী, ও নামের অন্তেও লিখিতেন দেবী, আর আজকালকার শিক্ষাতঙ্ক-রোগগ্রস্তা বুদ্ধিমতী নবীন ব্যাকরণপ্রণেত্রী মহিলারা সধবাবস্থায় হন শ্রীমতী দেবী, আর বিধবাবস্থায় হন শ্রীমত্যা দেব্যাঃ। ধন্য ভারত! আবার তোমায় ধন্যবাদ! তোমার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

একদা রাজা দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা-বিয়োগে অধীর হইয়া সীতান্বেষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে শবরী নাম্নী এক বিদুষী সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভট্টিকাব্যের ষষ্ঠ সর্গে লিখিত আছে :—

শুভ্রতারামিব খ্যাতাং শবরীমাপতুর্বনে॥
বসানাং বল্কলে শুদ্ধে বিপুলৈঃ কৃতমেখলাম্।
কামামগ্রন্থিপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাম্বরাম্॥
প্রগৃহ্য পদবৎ সাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্।
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাৎ দেবগৃহ্যামনিন্দিতাম্॥
ধর্ম্মকৃত্যরতাং নিত্যম্ অবৃষ্যফলভোজনাম্।
দৃষ্ট্বাতামমুচদ্রামো যুগ্যাযাতইবশ্রমম্॥
সভাবূচেহথ কচ্চিৎত্বম্ অমাবাস্যা সমূহসে।
পিতৄণাং কুরুষে কার্য্যম্ অবাচ্যোঃ স্বাহৃতিঃ কলেঃ॥
অবক্ত পাচ্যাং পবসে কচ্চিৎত্বং দেবকাক্ হবিঃ।
আনায্যমগ্নয়ে গোমং বিধৈঃ কচ্চিন্নবাঘসি॥

আচেরুঃ সংহতঃ কচ্চিৎ [illegible] [illegible]।
কচ্চিন্নির্বিঘ্নমাসীনাং কচ্চিৎ [illegible]বিধিম্।
স্মৃতপাপাবতাং কচ্চিৎ অগ্নিবিত্তাবতাং তথা ॥
রূপাতীরবনে নিত্যম্ উপজাপ্যবতাং ততে ॥
নাথাতসি তপস্বী ত্রয়ম্ সন্নিপত্যৎসুবঃ।
যমাদ্রোদবিজিষ্ঠাস্বং নিজায় তপসেহভুবঃ ॥

সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধিকরী পুষ্পানামী জগদ্বিখ্যাতা তারার [illegible] সর্ব্বসিদ্ধিসম্পাদিনী, শুদ্ধা, পুণ্যবতী, বল্কলপরিধারিনী, মুঞ্জমেখলাশালিনী, যোগাভ্যাস-ক্ষীণকলেবরা-পলাশদণ্ডবতী, মৃগচর্ম্মোপবিষ্টা নির্ব্বিকারা, সাধ্বী, কৌটিল্য-খলতাদি-দোষবর্জ্জিতা অমায়িকস্বভাবা, ইন্দ্রিয়-ভোগবিলাস-পারতন্ত্র্যবর্জ্জিতা, দেবপক্ষপাতিনী, অনিন্দিতা, সদা ধর্ম্মকর্ম্মব্যাপৃতা, ইন্দ্রিয়বিকারশূন্যা ফলমূলাহারিণী শবরী নাম্নী আর্য্য ঋষিকার আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা উপস্থিত হইয়া নিবিড় বন ভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন। সেই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ঋষিকা শবরীকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন দিব্য মুড়ী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। অরণ্যবিচরণজনিত সমস্ত ক্লেশ তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আপনি অমাবস্যা তিথিতে পিতৃলোকপ্রীত্যর্থে উত্তমোত্তম সুস্বাদু ফলাদি দ্রব্য দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকেন তো? ইন্দ্রাদি দেবতার প্রীত্যর্থে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন তো? ব্রাহ্মণদিগের সহিত যজ্ঞে সোমলতাকে নমস্কার করিয়া থাকেন তো? প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা কালে আচমনাদি ক্রিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় তো? দক্ষিণাগ্নি অর্চনার ন্যায় যথাকালে অতিথি সেবা করেন তো? হে কল্যাণি! যজ্ঞ-বিশেষাঙ্গ অগ্নিবিশেষ-চয়নকারী ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক ত্ব্য বশ্য [illegible] প্রা, আলাপে সর্ব্বদা রত থাকেন তো? তদুপকরণে আয়াস বোধ করেন না তো? আপনার শিক্ষা-দীক্ষার আচার্য্য গুরুদিগকে সম্যগ্‌রূপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন তো? যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তো? নিজের তপস্যার সন্তুষ্টি বোধ করিয়াছেন তো? শিষ্টাচারপরম্পরা-প্রচলিত লৌকিক সম্ভাষণ নিয়মানুসারে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনমাত্র। নতুবা শবরী ঐ সকল কার্য্য করেন কি না করেন অর্থাৎ যদি শবরী ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট "হাঁ" এই উত্তর পাইবার জন্য কিংবা যদি না করেন তাহা হইলে "না" এই উত্তর পাইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র উহাঁকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ ভট্টিকাব্যের টীকাকার জয়মঙ্গল ও ভরত মল্লিক "যমাদ্রোদ বিজিষ্ঠাস্বম্" যম হইতে ভয় পান না তো? যম ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তো? এই শ্লোকার্থের ভাবার্থ ব্যাখ্যানাবসরে লিখিয়াছেন, "পুণ্যকৃতাং নো মৃত্যুভয়মিত্যর্থঃ" "পুণ্যকৃতাং মৃত্যুভয়ং নাস্তীতিভাবঃ।" পুণ্য-কর্ম্মকারীদিগের মৃত্যুভয় থাকে না। এই কথার এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিখ্যাতা তপস্বিনী শবরী যেরূপ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা ছিলেন, তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামচন্দ্রের মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শবরীকে যেরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইনি জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়েরই অনুষ্ঠান করেন ও ইনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তপোবনে তপস্বি-জনোচিত জিজ্ঞাসা ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা শবরীকে আপ্যায়িত করাই শ্রীরামচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ ঐ সমস্ত জিজ্ঞাসার পর শবরী উত্তর প্রদান করিলেন

যে, সকল বিষয়েই কুশল জানিবেন। ভক্তি-কাব্যের এই শ্লোকগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোক বেলা দশটার মধ্যে রন্ধন-ভোজনাদি সমাপনান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ পূর্ব্বক তাস ও দশ পঁচিশ ক্রীড়া, প্রতি-বেশিনী মহিলাদিগের চরিত্র-সমালোচনা কুৎসা ও নিন্দার আনন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই কেবল ইহজগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু আত্মার উৎকর্ষ সাধন করাও, তাহাদের জন্মপরিগ্রহের অন্যতম কারণ হইতে পারে। এই শ্লোক সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও যোগাভ্যাস করিবার অধিকার আছে। যোগীর ন্যায় বল্কল পরি-ধান, মুঞ্জমেখলা-ধারণ, মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশন, পলাশ দণ্ড ধারণ, পুণ্য তিথিতে শ্রাদ্ধ তর্পণ, দেব-তুষ্টি সাধনার্থ ঘৃতাহুতি প্রদান, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদিগের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথায় আলোচনা, ও আচার্য্য গুরুদিগের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যার্জ্জন করিবার অধিকার আছে; পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান-বলে নিতান্ত দুর্দ্দান্ত কৃতান্তের আত্যন্তিক ভয় পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য পদবীতেও আরূঢ় হইবার অধিকার আছে এবং স্ত্রীজাতিও পরমেশ্বরের অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ও অন্বেষণীয়া আদরণীয়া ও পূজ্যা হইতে পারেন। পৌরা-ণিক যুগে লোপামুদ্রা অরুন্ধতী প্রভৃতি এমন অনেক ভারতীয় আর্য্য-মহিলার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি ও পরমাত্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। * ক্রমশঃ।

শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী।

কবির ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

([illegible] ।)

২। হরু ঠাকুর।

হরু ঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, সাধারণতঃ হরু ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। বাঙ্গালা ১১৫৪ সালে, ইংরেজি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অগ্র-হায়ণ মাসে কলিকাতার সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী ছিল। (*) কল্যাণচন্দ্রের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না, তজ্জন্য তিনি পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই; যে টুকু করিয়াছিলেন, তাহাও পুত্রের নিতান্ত অনাশক্তি বশতঃ বিফল হইয়াছিল।

(*) বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় "হরু ঠাকুর" প্রসঙ্গে এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, হরু ঠাকুরের পিতার নাম—কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী ছিল। কিন্তু এ উক্তির প্রতি বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের আস্থা নাই। কারণ লেখক নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে,—কল্যাণচন্দ্রই হরু ঠাকুরের পিতার নাম ছিল। লেখক।

সিমুলিয়ার তৎকালে ভৈরবচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তির একটী পাঠশালা ছিল। হরেকৃষ্ণ সেইখানেই অধ্যয়নার্থ নবম বর্ষ বয়সে প্রেরিত হন। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার মনোযোগ না থাকায় বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না। তথাপি হরেকৃষ্ণের কবিত্ব-শক্তির প্রথম উন্মেষ এই পাঠশালাতেই পরিদৃষ্ট হয়।

পাঠশালায় প্রবেশের দুই বৎসরের মধ্যে কল্যাণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই ঘটনার পর হইতে হরেকৃষ্ণের স্বভাব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। পিতার জীবদ্দশায় যে একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, এখন তাহাও লোপ পাইল। তিনি দিনরাত সঙ্গীদের সহিত আমোদ প্রমোদে আত্মহারা হইলেন। জননী, পুত্রকে সৎপথে আনিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু উ[illegible]গামী পুত্র কিছুতেই সৎপথে ফিরিল না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, মাতা পুত্রকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুত্র তাহাতেও মনোযোগ দিল না।

এইভাবে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া গেল। হরেকৃষ্ণের বয়স এখন পনর ষোল। পিতার সঞ্চিত যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাদ্দ্বারা জননী এতদিন আপনাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না, মাতা দিবারাত্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই হরুকে তিরস্কার করিল, কাযেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। কিন্তু তাঁহার যে বিদ্যা, তাহাতে ভাল চাকুরী মিলিবে কেন? বাল্যকাল হইতেই গান বাজনার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঝোঁক্ ছিল, সুতরাং গানই তাঁহার যৌবনকালে একমাত্র সম্বল হইল। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি গান রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। ভগবান্ সকলেরই একটা উপায় করিয়া দেন। কথায় বলে, "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি," তাই ভগবান্ সুনীতিপ্রিয়, [illegible] এই বালকের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে [illegible] আধার করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছিলেন। নানারূপ চিন্তা করিয়া হরু ঠাকুর অবশেষে এক সখের দল খাড়া করিলেন। তিনি তন্তুবায়জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক এক কবিওয়ালার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তাহার দ্বারা স্বরচিত সংগীত সংশোধন করাইয়া লইয়া, নিজের দলে গাওনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি জনসমাজে পরিচিত হইতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু সংসারের অভাব পূর্ণ হইল না। একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে এক কবির দলের গাওনা হইতেছিল, হরু ঠাকুর সখ করিয়া সেই দলে আসরে দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই যুবকের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত-নৈপুণ্য শ্রবণে একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর বিশেষ প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেশাদারী কবির দল বাঁধিতে পরামর্শ দিলেন। হরু ঠাকুরের এখন বড়ই অভাব, যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে। কাযেই রাজা বাহাদুরের পরামর্শ তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হইল। এইরূপে হরু ঠাকুরের কবি-যশের সূত্রপাত হয়।

হরু ঠাকুর পেশাদারী দল লইয়া বাহির হইলেন। তিনি প্রথমেই রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে গাওনা করেন। রাজা তাঁহার গাওনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দেন। এইরূপে তাঁহার সুযশ প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তাঁহার সংগীত শ্রবণ করিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক্ষণে বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি রাজবাটী হইতে বায়না আসিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই তিনি সুনামের সহিত

অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভাব প্রভূতপরিমাণে দূরীকৃত হইল। স্নেহশীলা জননীর চক্ষের জল এতদিনে শুষ্ক হইল। কিন্তু বেশীদিন পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দেহ পুষ্ট করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না, তাই পুত্র মাথা তুলিতেই জননীর মৃত্যু হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরু ঠাকুর স্বরচিত সংগীত রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধন করিয়া লই-তেন। ক্রমে ক্রমে শিষ্যের প্রতিভা ও ক্ষমতা গুরুকে অতিক্রম করিল। শিষ্যের অমানুষিক প্রতিভা ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার মধ্যে গুরুর গৌরব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তত্রাচ শিষ্য একদিনের জন্যও গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, আজীবন গুরুর নিকট মস্তক অবনত করিয়া ছিলেন। যে সকল সংগীত গুরুর দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন, হরু ঠাকুর সে সকলের ভণিতা গুরুর নামেই দিতেন। অদ্যাপি হরুর অনেকানেক সংগীত রঘুনাথের নামে চলিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্ন-সৌরকরের ন্যায় যশঃসম্মান যখন মধ্যপথবর্ত্তী, সেই মহা গৌরবের দিনেও তিনি গুরুর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনার্থ আত্মগোপন করিয়া নিজের যশঃমাল্য গুরুর গলায় তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে বালক বাল্যকালে সুনীতিভ্রষ্ট, কুপথগামী ছিল, যে বালকের পেটে "কালজল" একবারে পড়ে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এক কথায় যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহার তাদৃশ গুরুভক্তি প্রকৃতই কি ভাবিবার বিষয় নহে? কে বলে কবির দল কুরুচির প্রতিমূর্ত্তি? এই অশিক্ষিত বাঙ্গালী কবিওয়ালার এই একটীমাত্র কার্য্যে আমরা যে শিক্ষালাভ করিতে পারি, কবির এই একটী কার্য্যে হৃদয়ের যে মহত্ত্ব প্রকটিত হইতেছে, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কয়জনের নিকট আশা করিতে পারা যায়?

হরু ঠাকুর স্বভাব-কবি ছিলেন; ভারতী দেবী যেন সর্ব্বদাই তাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিতেন। তিনি মুখে মুখেই সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। উপস্থিত রচনা তাঁহার একটী প্রধান ক্ষমতা ছিল, এই অংশে তিনি রাম বসুকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কেহ কোন পদ-পূরণ বা সমস্যা-পূরণ করিতে দিলে, হরু ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে পারি-তেন। এস্থলে দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

একজন তাঁহাকে এই পদটী পূরণ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন;—

"তোমার আশাতে এ চারিজন।"

হরু ঠাকুর একটু চিন্তা করিয়া পূরণ করিলেন,—

তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন
আছে অভিভূত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
দরশ, পরশ, শুনিতে সুভাষ,
করিতেছে আরাধন॥ (মহড়া)
অন্য রূপো আঁখি না হেরে আর,
শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার,
শয়নে স্বপনে, মনোভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন॥ (চিতেন)।
প্রাণ, ইহার কি বল উপায়?
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায়। (অন্তরা)
ইত্যাদি।

একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছে। মহারাজ উপ-স্থিত সভ্যমণ্ডলীকে বলিলেন যে, "আমার এই সমস্যাটী আপনারা পূরণ করিয়া দিন;—"বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।" পণ্ডিতমণ্ডলী বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। হরু ঠাকুর, মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। অবশেষে তাঁহার তলব হইল। হরু তৎকালে স্নানার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে সংবাদ পাইয়া তদবস্থা-

তেই রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে ঐ সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। যেমন আদেশ, অমনি হরু ঠাকুর পূরণ করিলেন ;—

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে ॥

উত্তর শুনিয়া মহারাজ মহা সন্তুষ্ট হইয়া হরুকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় দেন।

অপর এক দিন হরু,—"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।" পদ পূরণ করিতে অনুরুদ্ধ হন। হরু ঠাকুর উত্তর দেন ;—

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে ॥
শুনেছো কখনো জলন্ত আগুন,
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে? (মহড়া)
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে ॥ (চিতেন)

এইরূপে প্রত্যহ তিনি বহুতর পদ ও সমস্যা পূরণ করিতেন। উপরোক্ত গান কয়টী ভাবসম্ভারে কেমন আমোদিত! শেষোক্ত গীতটির সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, গুপ্ত কবি বিশেষ চেষ্টাতেও বিফলমনোরথ হন। তাই তিনি "প্রভাকরে" লিখেন,—"এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই। যিনি ইহার সম্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা-মূল্যে ক্রয় করিবেন। 'তৃতীয়ের চাঁদ জগত দেখে'—এ কথার মূল্য নাই, অতি অমূল্য ধন।"

সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে কবির সম্পূর্ণ কাব্যের সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। আমি বর্ত্তমানে কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, রাম বসু বিরহের রাজা—সে কথা খাঁটি সত্য। কিন্তু হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদ, রাম বসুর সখী-সংবাদ হইতে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। হরুর সখী-সংবাদ এক সময় বঙ্গ-দেশে কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ত্তমান কালে ধারণাতেই আইসে না। একদা মহা-রাজ নবকৃষ্ণ তাঁহার সখী-সংবাদ শ্রবণে এতই বিমুগ্ধ হন যে, নিজের গাত্র হইতে একজোড়া বহুমূল্য শাল উন্মোচন করিয়া হরুর গায়ে জড়াইয়া দেন। হরু ইহাতে অপমান বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার দলের ঢুলীর মাথায় ফেলিয়া দেন। এইরূপ আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আজ কাল কয়জনের আছে?

হরু ঠাকুরের একটী সখী-সংবাদ ;—

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও,
হেরি চিকণ কাল বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও,
এ অধিনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে।
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশিটী বাজাও ॥
নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ!
ও বংশীরো কত গুণ, বিশেষে শুনাও ॥
শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উন্মাদিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥

এ সংগীতে কি ভোগবিলাসিতার আবি-লতাময় খরস্রোত প্রবহমান আছে? এ যে নিঃস্বার্থ প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি। হরু ঠাকুরের এই সকল সখী-সংবাদ এককালে সমগ্র দেশের মন বিচঞ্চল করিয়াছিল। রাম বসুর বিরহের ন্যায় হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদ

এক সময় দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। হরুর অনেক গান বিভিন্ন কবিওয়ালার নামে চলিয়া গিয়াছে, এতকাল পরে তাহা বাছিয়া বাহির করা বিশেষ আয়াসসাধ্য—দুঃসাধ্য বলিলেও হয়।

হরু ঠাকুরের প্রেম-সংগীতগুলি কম প্রশংসনীয় নহে;—

তোমার ভাব দেখে করি অনুভব,
ভাব বুঝি ফুরাল,
দিন দিন রসহীন হ'লে প্রাণ।
তুমি আছ সেই—তোমার প্রেম লুকাল॥
একি ভাব! গেছে পূর্ব্বের সে ভাব,
অভাব ভাব মিশাল॥
তোমার লোকে কয় রসময়—মিথ্যা নয়,
সে রস পরের কাছে,
ঘরে এলে, মুখ যেন সে মুখ নয়।
তোমার আমার আছে ভ্রান্তি—
হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শাস্তি-শতকেতে পাঠ এগুলো।
সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়,
নূতন নয় পরিচয়,
তবে প্রাণ হ'লে রসের অনুষ্ঠান॥
বিরস বদন কেন হয়,
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে,
তোমার অযাচক ভিক্ষে,
চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে।
তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা,
সে সব শশিমুখের হাসি কম্‌নে গেল।
যেমনে ভুলালে এ মন,
তোমার কোথা সে মন,
কেমন কেমন দেখ্‌তে পাই।
বলনা কোন্‌খানে মন হারালে রে প্রাণ!
না হয় আমিও সেই পথে যাই॥
নাই এখন তোমার সে সুদৃশ্য সুহাস্য সুবচন,—
কোথা হয় কেন কে কারে কয়,
এমনি অন্য মন,
তুমি রসিক নও—তা নয় প্রাণ!
রাখ হানবিশেষে মান,
কোন্ রাজ্যে বাস, কোন রাজ্যে ধাম?
আমি হাজা প্রজা বলে জলে প্রাণ,
আমার সুখের সময় তোমার রস শুকালো॥

বিরহ-খিন্ন নায়িকার এ কাতর উক্তিতে প্রাণ কি আর্দ্র হয় না? এমন কোন্ পাষণ্ড নায়ক ধরাধামে বিদ্যমান আছে যে, শোক দুঃখে মুহ্যমানা বিরহিণীর এ কাতরতা উপেক্ষা করিয়া চরণে দলিয়া যাইতে পারে? ইহাতে হা হুতাশের কি একটা নির্লজ্জভাব আছে? এতো মুক্তপ্রাণের সরল অভিব্যক্তি!

হরু ঠাকুর এক দিকে যেমন প্রেম-চিত্র অঙ্কনে সুদক্ষ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভক্তি রসাশ্রিত করুণ সংগীত গাহিয়া শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত কীর্ত্তন-সংগীতগুলিতে যে প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবানে অটল বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবুকের ভাবিবার বিষয়, লেখকের লেখনীর অনুপযুক্ত। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ ঐ সকল সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, প্রশংসা কিছুই হইল না—ভাষা যে অক্ষম হইল! স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণের নগর-সংকীর্ত্তনের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সকল সংকীর্ত্তনে হরু ঠাকুরের রচিত সংগীত কীর্ত্তিত হইত।

নাম প্রেম তার, সাকার নহে সে নিরাকার।
জীবন, যৌবন, ধন কিংবা মন,
প্রাণ বশীভূত তার॥
মুখে লোক বলেরে পীরিতি সুখের সার।
প্রাণের বাহির হয় সে যখন,
জীবনে যেন মরে রই॥

এই কয় পংক্তিতে কি কোনও গভীর তত্ত্ব-কথা নিহিত নাই? রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কি চমৎকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা [illegible] উপযুক্ত। কোল্‌রিজ এক স্থানে বলিয়াছেন;—

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of love,
And feed the sacred flame."

হরুঠাকুরের কবিতাটী ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না।"

"হরিনাম লইতে অলস ক'রোনা রসনা,
যা হ'বার তাই হ'বে।
ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে কি,
ঢেউ দেখে তরী ডুবাবে॥"

এই গানটী সম্বন্ধে স্বর্গীয় গুপ্তকবি লিখিয়াছেন,—"কি মনোহর! কি মনোহর! কি মনোহর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন বা রোমাঞ্চ হইতে হয়! অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদায় মোহ-বিকার হরণপূর্ব্বক ভাবভক্তি-জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে প্রকাশ করিতে অশক্ত হইলাম।"

হরুঠাকুর বিদ্যালয়ে বেশী দিন অধ্যয়ন না করিলেও, পূর্ণ বয়সে ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার গীতেই বিদ্যমান আছে। 'তোমার ভাব দেখে করি অনুভব'—বলিয়া যে গানটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শিহলন মিশ্রের রচিত শান্তিশতক উল্লেখ আছে। শান্তিশতক চারি সর্গে বিভক্ত বৈরাগ্য-ভাবোদ্দীপক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ। মায়ামোহাভিভূত জীবগণ ক্ষণিক সুখের বাঞ্ছা করিয়া নানা প্রকার অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জীব, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য, কোন্ কার্য্য পরকালে সুখাবহ, কোন্ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য পরিত্যাজ্য ইত্যাদি বিষয় একবারও চিন্তা করে না। এইরূপ কদাচারের ফলস্বরূপ জীব পরিণামে যুগ যুগান্তর ধরিয়া উৎকট ক্লেশ সহ্য করে। শিহলন মিশ্র তাহাই জীবগণকে বুঝাইয়া পরকালের কার্য্য কি, শান্তিশতকে সুন্দর সংস্কৃতে তাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরুঠাকুরের হরি-সংকীর্ত্তনগুলি পাঠ করিলে, তিনি যে প্রগাঢ় তত্ত্বদর্শী ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি নারী-চরিত্র সুন্দর অনুধাবন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গীতটিতে তিনি স্ত্রী-চরিত্রের একটী উজ্জ্বল আলোক-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম-ভয়।
নারী নিতে যেমন, ভুলতে তেমন,
দুইদিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে, চায়না ফিরে, আপনি হয় অন্তর,
উত্তমেরে ত্যজ্য করে, অধমে যতন।
নারী বারি দু'জনারি নীচপথে গমন॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ—নলিনী তপনে ত্যজিয়ে।
বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ—তারে মধু বিতরণ॥

কবির উপমা-কৌশলটী ব্যর্থ হইলেও তিনি নারী-চরিত্রের যে ভাব অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ধ্রুব সত্য।

হরুঠাকুর প্রসার প্রতিপত্তি লাভের পর হইতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের ভবনে

গান গাহিতে যাইতেন। বয়স বেশী হইলে তিনি নিজে দলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের পারিষদ্-শ্রেণীভুক্ত হন। এই সময়ে রাজভবনে যে সকল কবির গাওনা হইত, হরুঠাকুর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতেন এবং তদনুসারে মহারাজ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইতেন। মরণ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। বাঙ্গালা ১২১৯ সাল, ইংরেজি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অমর আত্মা অমরপুরে প্রস্থান করে। কবির বংশ বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহা আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই।*

৩। সাতু রায়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বৈঁচিগ্রামে, অনুমান বঙ্গাব্দ ১২০৯ সালে, ব্রাহ্মণবংশে সাতু রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার আসল নাম সাতকড়ি রায়, লোকে সংক্ষেপে সাতু রায় বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। সাতু রায় ব্যবসায়ী কবিওয়ালা ছিলেন না, তাঁহার পেশা ছিল—চাকুরি; অবসর সময় কাব্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। সে সময় কবিওয়ালাদের নামে সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত, সামান্য গৃহস্থের কুটীর হইতে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর সৌধ অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ-উপনয়ন প্রভৃতি উৎসবে [illegible] তাঁহাদের সাদর আমন্ত্রণ হইত। রথযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, কুস্তিখেলা, পুতুল-নাচ, নৌকা-বাইচ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি তৎকালের সাধারণ আমোদ প্রমোদ ছিল। ধনী নির্ধন, সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ব জাতিই তাহাতে যোগদান করিতে পারিত।* কাযেই ব্যবসায়ী ভিন্ন অপর সাধারণেও—যাহাদের সামান্য মাত্র কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ দেখা যাইত, তাহারাও অবসরমত দুই চারিটা কবিগান রচনা করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত আনন্দানুভব করিত। এইভাবে কতজন যে কত কবিগান রচনা করিয়াছেন, কতজনের অলৌকিক যত্ন-প্রসূত সংগীত-রত্নরাজিতে যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রদীপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ইয়ত্তা করিবার উপায় নাই। আমরা সামান্য যে কয়েকজনের বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা অনাবিষ্কৃত কবিদের তুলনায় সাগরে বারিবিন্দু-নিক্ষেপের ন্যায় নগণ্য ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

সাতু রায় বাল্যকালে কিছুদিন স্বগ্রামের পাঠশালায় ও তৎপর কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে

* হরুঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কলিকাতা, আহিরীটোলা, শঙ্কর হালদারের লেনের ৺ বাবু রাজনারায়ণ হালদারের বিবাহ হয়। হালদার মহাশয় সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর দুই পুত্র, রাখালচন্দ্র এবং কৈলাসচন্দ্র, মাতামহ হরুঠাকুরের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যাটীরও ঐ স্থানের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, হরুঠাকুরের পুত্র ছিল না।

লেখক।

* "কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদে পূজার দিনে রামযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, কুস্তিখেলা, পুতুলনাচ, নৌকা-বাইচ, ঘোড়দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান রাখিত।"—সঙ্গীত রত্নাকর। এই সকল স্বদেশী আমোদ-প্রমোদ কোম্পানী বাহাদুরের আমলের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে আরম্ভ হয়, এবং কোম্পানীর অবসানের পরও বহুদিন ছিল। বর্ত্তমানকালেও সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই।—লেখক।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শান্তিপুরের গোস্বামী ও অপর জমীদারদিগের ভবনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও এই জমীদারদিগের তরফে কার্য্য করিতেন। এই জমীদারী কার্য্যে লিপ্ত হইবার পর হইতে সাতু রায়ের কাব্য-জীবনের সূচনারম্ভ হয়। তিনি প্রথমতঃ স্বরচিত সংগীত বিনামূল্যে কবিওয়ালা ভোলা ময়রাকে গাওনা করিতে দিতেন। শান্তিপুরেই ভোলার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। ভোলা শান্তিপুরের জমীদার-ভবনে গাওনা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে শিবচন্দ্র সরকারের সখের কবির দল জাগিয়া উঠে। কলিকাতার গরাণহাটায় সরকার মহাশয়ের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; সংগীত-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। সাতু রায়, সরকার মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার দলে অবৈতনিক বাঁধনদারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তিনি সরকারের দলে অবস্থান করিতেন না, শান্তিপুর হইতেই গান রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। সরকারের দলে গীত "কলঙ্কভঞ্জন" পালায় সাতু রায়ের রচিত একটী গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই?
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।
হাঁ গো বৃন্দে! শ্রীগোবিন্দের পায়,
করে প্রাণ সমর্পণ,
হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল,
অনুকূল কেবল শ্যামধন;
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন।
সই, চারিদিকে গঞ্জনা,
পাপ লোকে তা বুঝে না,
কৃষ্ণ ধন কি ধন!
আমার মিথ্যা বাদ-অপবাদ
দেয় কালার পরিবাদ,
আমি কিরূপে গৃহ মাঝে তিষ্ঠে রই?
অপরূপ একি রূপ,
কৃষ্ণের রূপ লিখেছ গো রাই!
যে চরণ দেবের পূজ্যধন,
গতি নাই সে চরণ বই,
সে চরণ কই গো কই, রাই রাই গো!
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই;
কি ভাব সুধাংশুমুখী তাই সুধাই।
বল কি ভ.বে এ ভাবের হ'ল উদয়॥
ইত্যাদি।

এইরূপে কবিওয়ালা-সমাজে প্রসিদ্ধি-লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাতু রায় অন্যান্য কবিওয়ালাদের দলেও বাঁধনদারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিতেন,—"বাপু, আমার তো কবিগাওয়া ব্যবসায় নয়, আমি চাকুরী-ব্যবসায়ী। তবে কেন আমায় বিদ্যা বেচিতে অনুরোধ কর? আমা হ'তে তা হ'বে না,—আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করবো না।" সাতু রায় নিজের রচনাকে ঠিক সরস্বতীদেবীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। মূল্য লইয়া সংগীত দেওয়াকে তিনি সেইজন্য সরস্বতী (বিদ্যা) বিক্রয় করা বলিতেন ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি নিজে কখনও কবির দল সংগঠন করেন নাই বা পেশাদারী কোন দলে গাওনা বা চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি আজীবন জমীদারের সেরেস্তায় হিসাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে নদীয়ার রাণাঘাটের পাল চৌধুরী জমীদারদিগের পক্ষের বারাসত মহকুমার মোক্তারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহাই তাঁহার শেষ চাকুরী; আমরাও তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই জানি। এক্ষণে তাঁহার সখী-সংবাদের একটী গান রসজ্ঞ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি;

বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে?
একবার এসে অক্রূর মুনি, কল্লে কৃষ্ণ-
কাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্তমণি,
হরে ল'য়ে গিয়েছে।
উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে,
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথ মধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব! কও কি জন্ম আগমন?
আশা সুলক্ষণ কিহে বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে গোকুলে আসি কল্লে পদার্পণ?
দেখে মথুরানিবাসীর ভয় হয়;
একজন এসে ছদ্মবেশে, প্রেম ভেঙ্গে
বাদ সেধেছে,
সাধু হও যদ্যপি তথাপি সন্দ হতেছে!
যেমন সেই অক্রূর দেখতে সুধার্ম্মিক;—
তোমায় ততোধিক দেখছি শতাধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্ত্বিক।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয়,
ধর্ম্ম-রহিত তাদের চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে॥

সখী গোপীগণের হৃদয়-নিহিত আশঙ্কা ও উদ্বেগ কেমন সাধারণভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে ও তৎসঙ্গে অপরিচিত আগন্তুকের প্রতি তাহাদের দ্বেষ ও শ্লেষ কেমন স্বাভাবিক ও সরল। সাতু রায়ের অধিকাংশ সঙ্গীতই পৌরাণিক ছায়াবলম্বনে এইরূপ সরল ও স্বাভাবিকভাবে রচিত।

বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে—১২৭৩ সালের সাতু রায়ের নশ্বর জীবনের লীলাখেলা পরিসমাপ্ত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার অপর দুইটী সহোদর ছিল এবং তাঁহাদের বংশ এখনও বিদ্যমান আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

আমাদের বেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"বর্ব্বরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত" এই স্থলে প্রাবাহনি শব্দের অর্থ প্রবহনের অপত্য নহে। প্রশব্দের অর্থ প্রকর্ষ, বহ ধাতুর অর্থ প্রাপন এবং ইকারের অর্থ ক্রিয়ার কর্ত্তা; যিনি প্রকৃষ্টরূপে বহন করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম প্রাবাহনি। বর্ব্বর এই শব্দের দ্বারা বায়ুর শব্দের অনুকরণ করা হইয়াছে; নিরুক্তি এবং অনুকরণ দ্বারা বর্ব্বর প্রাবাহনি এই শব্দদ্বয় বায়ুতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য অর্থে হয় নাই। অপিচ বেদবাক্য উন্মত্ত প্রলাপ-তুল্য বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন। কারণ বেদে উক্ত হইয়াছে—"বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত সর্পাঃ সত্রমাসত" অর্থাৎ বৃক্ষগণ এবং সর্পগণ যজ্ঞ করিয়াছিল। স্থাবর বৃক্ষ কর্ত্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠান কখন উন্মত্ত-বাক্যবই আর কি হইতে পারে? এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর করিয়াছেন যে,—"বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" এই বাক্য দ্বারা সত্রের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বাক্যের স্বার্থেতে কোন তাৎপর্য্য নাই, ইহা স্তুত্যর্থবাদ মাত্র, যেমন লোকে বলিয়া থাকে, "সন্ধ্যা সময়ে মৃগেরাও বিচরণ করে না, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের আর কথা কি?" সেইরূপ অচেতন বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিয়াছিল, বিদ্বদ্গণের কর্ত্তব্য বিষয়ে আর কথা কি? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আখ্যায়িকাসুখাববোধার্থা" অর্থাৎ বৈদিক যে সমস্ত আখ্যায়িকা বা গল্প আছে, তাহা কেবল সুখে

বুঝাইবার জন্য, বাস্তবিক তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় নাই, এবং তত্তন্নামক কোন ব্যক্তিও ছিল না। সুতরাং বেদে ব্যক্তি বিশেষের নাম মাত্র দেখিয়া, বেদ তত্তদ্ব্যক্তি কৃত বলিয়া স্বীকার করা ভারতীয় সিদ্ধান্ত নহে। বেদের অর্থ বড়ই গভীর, তাৎপর্য্য অতীব রহস্যপূর্ণ, কেবলমাত্র অক্ষরার্থ দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায় না। সেইজন্য বেদ বুঝিতে হইলে, ব্যাকরণ-জ্ঞানের আবশ্যক, এবং ছন্দোজ্ঞানের আবশ্যক, এই বেদ বুঝাইবার জন্যই নিরুক্ত এবং এই বেদের অর্থ এবং তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্যই মীমাংসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি। অধিকন্তু আর্য্যজাতির হৃদয়-সর্ব্বস্ব বেদ বুঝিবার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন। একটী আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের অর্থ বুঝিবার জন্যই যদি মীমাংসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে এই মীমাংসা-প্রণয়নের পূর্ব্বে বেদের তাৎপর্য্য মনুষ্যগণ কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিত? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জৈমিনি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই মীমাংসার আরম্ভ নহে, তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বহুতর মীমাংসক বর্ত্তমান ছিলেন। সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণ গুরুপরম্পরায় যে মত প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মীমাংসকদ্বয় আবশ্যক বোধে সেই মতগুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদিগের গ্রন্থে অন্যান্য আচার্য্যগণের নাম দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। জৈমিনি পূর্ব্ব-মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহাতে বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাসদেবের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বাদরায়ণের এই মত। ব্যাসদেবও স্থানে স্থানে জৈমিনির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এতাবতা বুঝা যায় যে উভয় গ্রন্থকার সমসাময়িক।

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ" রাজতরঙ্গিণী—।১।৫১।

কলিযুগের ৬৫৩ ছয়শত তিপান্ন বৎসর গত হইলে, কুরুগণ এবং পাণ্ডবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ পৃথ্বীং শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।" বৃহৎ সংহিতা, ১৩।৩। রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজ করিতেন। শকাব্দের ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল। যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ প্রভৃতি বিবরণ অবলম্বন করিয়াই মহাভারত গ্রন্থ রচিত হয়। এই মহাভারতের রচয়িতা ভগবান্ বেদব্যাস এবং ইনিই বেদান্ত দর্শনেরও রচয়িতা। যুধিষ্ঠিরের পৌত্রপর্য্যায় জনমেজয় মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ সংহিতা এবং রাজতরঙ্গিণীর উক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা চারি হাজার বৎসরেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালে মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছিল। কারণ ভগবান্ বেদব্যাসই যুধিষ্ঠিরাদির পিতামহ, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদির কালদ্বারাই তৎপিতামহের কাল নির্ণীত হইতে পারে। অপিচ মহাভারত পরবর্ত্তী কালে রচিত হইলে, জনমেজয় কর্ত্তৃক মহাভারত শ্রবণ সম্ভবপর হইতে পারে না। এই বেদব্যাস এবং জৈমিনি সমসাময়িক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অতএব বেদের মীমাংসা গ্রন্থদ্বয় চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ একটী কথা বলা হইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্যও বেদ-মীমাংসার সময়েই স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব-মীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের নাম স্মৃতিপাদ;

এই পাদে স্মৃতির প্রামাণ্য বিচারিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে কপিলাদি-কৃত স্মৃতির এবং মন্বাদি-স্মৃতির সাবকাশত্ব এবং নিরবকাশত্ব বিষয়ক বিচার উক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত দর্শনের অনেক স্থলে স্মৃতির উল্লেখ এবং প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রকে যাঁহারা আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মূল শরীরের বল ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্মৃতির অপর নাম ধর্ম্ম-সংহিতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। এই সংহিতা-প্রণেতা ঋষি অনেক। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকে সংহিতাকারক মনু প্রভৃতি বিংশতিজন মুনির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিংশতিজন মাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা নহেন। এই স্থলে কেবল এই কয়জনের নাম মাত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বৌধায়ন, নারদ প্রভৃতি আরও বহুতর সংহিতাকারক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। এই সমস্ত সংহিতা কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পরাশর-সংহিতা কলিযুগের প্রারম্ভেই প্রণীত হইয়াছে, তাহা উক্ত সংহিতার উপক্রম দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। যথা দেবদারু-বন-সমাকীর্ণ হিমালয় শৈলোপরি সমুপবিষ্ট মহর্ষি ব্যাসকে ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষানাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত!।"

।প।স।১।২।

হে সত্যবতীতনয়! আপনি সম্প্রতি কলিযুগে কর্ত্তব্য, মানবগণের হিতকর ধর্ম্ম এবং শৌচাচার নির্দ্দেশ করুন। তৎ শ্রবণে মহর্ষি ব্যাস বলিলেন, "নবাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং অস্মাৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতিব্যাসঃসুতোহবদৎ" ।১।৪। আমি সমস্ত তত্ত্ব অবগত নহি, সুতরাং কি প্রকারে ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া বলিব? আমার পিতাকেই ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্যাসের সহিত সমস্ত ঋষিগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, স্তুতি, প্রদক্ষিণ এবং অভিবাদনের পর বেদব্যাস, মহর্ষি পরাশরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন।

"যদিজানাসি মেভক্তিং স্নেহাদ্বাভক্তবৎসল!
ধর্ম্মং কথয় মে তাত! অনুগ্রাহ্যোহ্যহংতব।
শ্রুতামে মানবাধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ।
অত্রে র্বিষ্ণোশ্চসাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্য—কৃতাশ্চযে।
আপস্তম্বকৃতাধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তেন বিস্মৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বেনষ্টাঃ কলৌযুগে
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ?।

১।১২।১৭।

হে পিতঃ! আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি আছে, যদি তাহা জানেন অথবা আমার প্রতি স্নেহবশতঃ কলিযুগের ধর্ম্ম বলুন। যেহেতু আমি আপনার অনুগ্রাহ্য। মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতা, আপস্তম্ব, শঙ্খ, এবং লিখিত এই সমস্ত মহর্ষি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র আমি শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহা বিস্মৃতও হই নাই। সমস্ত ধর্ম্মই সত্যযুগে প্রচারিত হইয়াছিল, কলিযুগে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কলিযুগে চাতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য সাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ করুন। পরাশর-সংহিতার এই উপক্রমাংশ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ধর্ম্মগ্রন্থ কলিযুগের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে মানব ধর্ম্মগ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কারণ অন্যান্য

সংহিতাকারগণ মনুর উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলাবাসী, তাহা তৎকৃত-সংহিতার দ্বিতীয় শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে।

"মিথিলাস্থঃ সযোগীন্দ্রঃ ক্ষণংধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।"

মিথিলাস্থিত যোগীশ্বর ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা মুনিগণকে বলিয়াছিলেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনকের সমসাময়িক তাহা পুরাণাদি পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

এইরূপ দক্ষ প্রভৃতি সংহিতাকারগণের প্রাচীনতত্ব অন্যান্য শাস্ত্র-সংবাদ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। স্মৃতির সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না; বেদের অনুযায়ী স্মৃতি, সুতরাং বেদের কথা বলিতে যাইয়া স্মৃতির সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ কথিত হইল। অঙ্গীর সম্বন্ধে বলিতে হইলে, অঙ্গের কথাও বলা আবশ্যক, কারণ অঙ্গব্যতীত অঙ্গীর অবস্থান অসম্ভব, সুতরাং বেদের অঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে হইবে। শিক্ষাপত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"ছন্দঃপাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোথকথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে
শিক্ষা ঘ্রানন্তু বেদস্য মুখংব্যাকরণংস্মৃতম্।"

ছন্দঃশাস্ত্র বেদের পাদদ্বয়, কল্পগ্রন্থ হস্ত, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং ব্যাকরণ মুখ। ছন্দঃ শাস্ত্রে অনুষ্টুভ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। কল্পগ্রন্থে নানা শাখাগত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিঃ শাস্ত্রে যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযোগী কাল, অর্থাৎ তিথি মাস ঋতু অয়ন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

নিত্যানন্দ—খ্যাতনামা হরিভক্ত সাধু-পুরুষবিশেষ। রাঢ় দেশস্থ একচাকা গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তশীল ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়া মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি নামক এক সাধুপুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের হরিধ্বনি নিতাইএর শ্রুতিগোচর হইল। হরিনামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইনি নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি ইনি চৈতন্যের সহচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইহাঁর প্রেমভক্তিতে সকলে মোহিত হইল। হরিনাম প্রচারে নিতাইএর বড়ই প্রীতি ছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুইজন ঘোর পাষণ্ড ছিল। তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পথে

পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ণবদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা ইহাঁর উপদেশ শুনিয়া উপহাস করিত, এমন কি ধরিয়া মারিবার জন্ত অনুসরণও করিত। একদা নিতাই হরিনাম প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাষণ্ডদ্বয় ইহাঁকে পথে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। মাধাই ক্রোধে ইহাঁর মস্তকে কলসীর কানা ফেলিয়া মারিল। দরদরধারে রক্তস্রোত ছুটিল। চৈতন্তদেব সংবাদ পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতাই-চৈতন্তের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয়ের বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। অতঃপর তাহারা পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুশীল ভক্ত বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইল।

চৈতন্ত নীলাচলে গমন করিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে নিত্যানন্দ দেশে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উভয় তটস্থ বহু গ্রামের সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্‌গণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। ক্রমে সমস্ত বণিক্‌সমাজ তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। বঙ্গদেশে হরিনামের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কথিত আছে যে, গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নিতাই সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ও গৃহীর বেশ ধারণ করেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকাতুরা চৈতন্তজননী শচীদেবীর গৃহে পুত্রবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহাঁর আগমনে নবদ্বীপে পুনরায় হরিনামের মহা রোল উঠিল। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নিতাইএর সহিত যোগ দিলেন। ইহার পর নির্লিপ্ত সংসারী বৈষ্ণবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাসের বসু ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্তার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইল। অতঃপর নিত্যানন্দ শচীদেবীর গৃহে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্তা জন্মগ্রহণ করে। চৈতন্তদেবের লীলা সংবরণের পর, নিত্যানন্দের দেহত্যাগ হয়।

নিধিরাম গুপ্ত—খ্যাতনামা বাঙ্গালা গীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধু বাবু নামে পরিচিত। ইহাঁর রচিত গীতাবলী নিধু বাবুর (বা নিধুর) টপ্পা নামে খ্যাত। এই সকল গীত-রচনায় ইহাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৬৬৩ শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত চাঁপতা গ্রামে নিধিরামের জন্ম হয়। কর্ম্মোপলক্ষে ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কুমারটুলিতে বাস করিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ কর্ম্ম করিতেন। ১৭৫৬ শকে ত্রিনবতি বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

নিমি—সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ, খ্যাতনামা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। একদা নিমিরাজ যজ্ঞসম্পাদনের অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠকে তাহাতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ পূর্ব্ব

হইতেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেই যজ্ঞ সমাধা করিয়া পরে নিমিরাজের যজ্ঞে ব্রতী হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। স্বর্গে দেবরাজের যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে বশিষ্ঠের বহুবর্ষ অতীত হইয়া গেল। নিমিরাজ তাঁহার প্রত্যাগমনের কাল নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, এবং বৃথা সময়ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মুনি ঋষিদিগকে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া নিমিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহাতেই নিমির পতন হয়।

নিবাতকবচ—মহাবলপরাক্রান্ত তিনকোটি অসুর। ইহারা হিরণ্যকশিপুতনয় সংহ্লাদের পুত্র। ইহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। বরলাভে দেবগণের অবধ্য হইয়া ইহারা দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। অর্জ্জুন সুরলোকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মাতলির সহিত অসুরপুরীতে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

নিশুম্ভ—দৈত্যবিশেষ, দৈত্যরাজ শুম্ভের কনিষ্ঠ। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দৈত্য অতিশয় বলবীর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধা ছিল। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, নিশুম্ভ সমরে গমন করে, এবং দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

নূরজহাঁ—ভারতের মোগল সম্রাট্ জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি বাল্যকালে মেহেরুন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। একটী দরিদ্র পারসীকের গৃহে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। যৌবনাগমে সেই রূপরাশি উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া নব্যযুবকদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিতে লাগিল। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সলিম (পরে জহাঙ্গীর) মেহেরুন্নিসার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন। বৃদ্ধ আকবর জানিতে পারিয়া শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত ইহাঁর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া ইহাঁর স্বামীকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে ইনিও সলিমের নিকট হইতে অপসৃতা হইলেন। আকবরের জীবদ্দশায় তিনি আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর সলিম, জহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মেহেরুন্নিসার রূপ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। রাজা হইয়াই তিনি শের আফগানকে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তালাক দিতে বলিলেন। বীর যুবক এরূপ জঘন্য প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু জহাঙ্গীরের চেষ্টায় অত্যল্প কালমধ্যে শের আফগান নিহত হইলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের সমীপে নীত হইলে কিছু দিন পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার ন্যায় বিরলে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে জহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া 'নূরজহাঁ' (অর্থাৎ ভুবনালোক) নাম প্রাপ্ত হইলেন (১৬১১ খৃঃ)।

অল্প দিনের মধ্যেই ইনি সম্রাটের উপর একাধিপত্য আধিপত্য স্থাপন করিয়া

ফেলিলেন যে, সম্রাটের নামের সহিত ইঁহার নামও মুদ্রাসমূহে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ইহাঁর পিতা, ভ্রাতা, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রাজসভায় সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সম্রাটের পুত্র ও সেনানিগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের আর একটি গুরুতর কারণও ঘটিয়াছিল। শের আফগানের ঔরসে নূরজহাঁর এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যার সহিত জহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শেহ্‌রিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহাতে শেহ্‌রিয়ার সিংহাসনের অধিকারী হন, এই উদ্দেশ্যে নূরজহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে জহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম (পরে শাহজহাঁ) বাঙ্গালার বিদ্রোহী হন। খুরম যোধপুররাজ মল্লদেবের পৌত্রী যোধাবাইএর গর্ভজাত; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। আবার তিনি নূরজহাঁর ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মুমতাজমহালের পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া আসফ খাঁও জামাতার পক্ষাবলম্বন করিলেন। সুচতুরা নূরজহাঁ তাঁহাকে কতকগুলি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন। এদিকে মহাবত খাঁ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতি নূরজহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং জহাঙ্গীর ও নূরজহাঁকে ছয়মাস আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন (১৬২৬ খৃঃ); নূরজহাঁর অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে সম্রাট্ মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসর খুরম ও মহাবত খাঁ পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইল (১৬২৭ খৃঃ), এবং সঙ্গে সঙ্গে নূরজহাঁর ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। নূরজহাঁ অতি বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনিই গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। জহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ইনি হিন্দুবিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। বাঙ্গালা ইতিহাসে ইহাঁর নাম নুরজাহান লিখিত হইয়াছে।

পতঞ্জলি—পাণিনি ভাষ্যকার যোগশাস্ত্রসূত্রকার মুনিবিশেষ। ইহাঁর প্রণীত যোগশাস্ত্রের নাম "পাতঞ্জল দর্শন।" কাহারও কাহারও মতে পাণিনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রসূত্রকার পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নহেন। অনুমান খৃষ্টের জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

পদ্মিনী—সুপ্রসিদ্ধা রাজপুত-মহিলা, চিতোরপতি হামির শঙ্খের দুহিতা, চিতোররাজের পিতৃব্য বীরবর ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী। ইনি রূপেগুণে অতুলনীয়া ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় রূপবতী রমণী সে সময়ে ভারতে আর ছিল না। এই রূপরাশিই ইহাঁর নিজের এবং তৎসহ চিতোররাজ্যের কালস্বরূপ হইল।

পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতিগোচর হইলে, ভোগাসক্ত, বিলাসপ্রিয়, সদা-রমণাভিলাষী, কামুক যবনপতির মন বিচলিত হইয়া উঠিল। কুললক্ষ্মী পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার আশয়ে তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। ভারতের অনেক প্রদেশ জয় করিয়া আলার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, সামান্য চিতোর দুর্গ অতি সহজই অধিকার করিতে

পারিবেন। কিন্তু রাজপুত যোদ্ধৃগণের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যে তাঁহার সে আকাশকুসুম আকাশেই বিলীন হইল। অবশেষে দুর্বৃত্ত আলা যবনের চিরচরিত চাতুরিজাল বিস্তার করিয়া অভীষ্ট সাধনের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া যাইব।" সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণ-কামনায় এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আলা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর মুকুরে অসূর্য্যম্পশ্যা পদ্মিনীর ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া কামান্ধ একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনন্তর, ভীমসিংহ সম্রাটের প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনার্থে আলার সহিত দুর্গের বহির্দ্দেশে গমন করিলে, যবন-সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিল।

এই অতর্কিত দুর্ঘটনায় সমস্ত চিতোর ম্রিয়মাণ হইল। কিন্তু রাজপুত বীরপুরুষ বা বীররমণীরা কখনও বিপদে অধীর বা আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পতিপ্রাণা পদ্মিনী পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি পরিচারিকাবর্গসমভিব্যাহারে যবন-রাজশিবিরে উপস্থিত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাতশত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলে, একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলেন। ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ করিলে, শিবিকা দ্রুতবেগে চিতোর দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সাক্ষাতে বহুবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আলা সন্দিহান চিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবিকারোহী রাজপুতবীরগণ তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় যবন সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অতঃপর বিপক্ষদমনে ও পদ্মিনীলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়া আলা ক্ষুণ্নমনে দিল্লী প্রতিগমন করিলেন।

ইহাতে কিন্তু আলার দুরাশার নিবৃত্তি হয় নাই। সামান্য চিতোরের নিকট পরাস্ত ও অবমানিত হওয়ায় তাঁহার প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তিনি বহু সৈন্যসহ পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজপুতবীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাগরসম অসংখ্য যবনসেনার নিকট মুষ্টিমেয় হিন্দু-সৈন্য কতদিন যুঝিতে পারে? যুদ্ধে রাজপুতগণের ক্রমেই সংখ্যা হ্রাস হইয়া বলক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে চিতোর রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া রাজপুতগণ তাঁহাদের শেষ পথ অবলম্বন করাই স্থির করিলেন। রাজপুতকুলললনাগণ যবনের কর-স্পর্শ অপেক্ষা অনল-স্পর্শই অধিকতর সুখকর জ্ঞান করিয়া চিরাচরিত "জহর-ব্রত" অবলম্বনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পদ্মিনী-প্রমুখ সাধ্বী রমণীগণ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া মাঙ্গল্যগীত গান

করিতে করিতে চিতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রজ্বলিত চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলে একযোগে সমস্বরে চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রমণীর উজ্জ্বলতম রত্ন অমূল্য সতীত্বনিধি রক্ষার্থে সকলে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূতা হইলেন। এক হিন্দু ভিন্ন অন্য কোনও জাতি কি সতীত্বের এই অপার মহিমা ধারণ করিতে পারে?

স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, প্রীতিময়ী নন্দিনী প্রভৃতি পরমাত্মীয়াগণের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে উন্মত্ত ও উত্তেজিত হইয়া রাজপুতবীরগণ দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে যবন সেনাসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন, এবং এক এক জন শত শত পাঠানের জীবনান্ত ও শত্রুশোণিতে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া একে একে সমর-শয্যাশায়ী হইয়া অমর পথের পথিক হইলেন। অবশেষে দুর্বৃত্ত আলা জনশূন্য চিতোর নগরের ধ্বংস সাধন করিয়া মনের খেদ মিটাইলেন। পদ্মিনীর অনুপম রূপলাবণ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার চিতাভস্ম পাইয়া দুরাচার যবনরাজকে সন্তুষ্ট হইতে হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

বর্ণাশ্রমাচারবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ।*

শাস্ত্রে আত্মার যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ। জ্ঞান-প্রভাবে মনুষ্যগণ পশুপক্ষ্যাদি সকল জীবের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং জ্ঞানোপার্জ্জনই মানব-জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে;—"আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশু-পক্ষ্যাদির যদ্রূপ, মনুষ্যদিগেরও প্রায় তদ্রূপ; পরন্তু পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যাদির মধ্যে ইহাই বিশেষ যে, মনুষ্যগণ জ্ঞানালোক দ্বারা সমুদ্ভাসিত, পশুপক্ষ্যাদি ও অন্যান্য জীব অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য জ্ঞান-প্রভাবিহীন, তাহারা পশুদিগের তুল্য। যৎকালে মহর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎকালে এই ভারতভূমি মহর্ষিগণের জ্ঞান-প্রভাবেই অন্যান্য সকল ভূমির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই ভারতভূমিতে জ্ঞান-ভাস্কর উদিত হইয়া যে কিরণরাশি বিস্তৃত করিয়াছিল, সেই কিরণরাশির প্রতিবিম্ব দ্বারাই অন্যান্য স্থান সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। মহর্ষিগণের শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রানুমোদিত সদাচারই এই জ্ঞানোন্নতির একমাত্র

* সাহিত্য-সভার অষ্টম বার্ষিক ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কর্তৃক পঠিত।

মূল। এক্ষণে এই সকল মহর্ষি-সন্তানের শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রানুমোদিত সদাচারের হ্রাস হওয়াতে এই ভারতভূমি হইতে জ্ঞান-ভাস্কর অস্তমিত হইয়াছে। সূর্য্যের অস্ত গমনের পরই ঘোরান্ধকার যামিনীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই ভারতভূমিতেও জ্ঞান-ভাস্করের অস্তগমনের পর মোহান্ধকারময়ী কুহূযামিনীর আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং মানবের অন্তর্দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় ভারতবাসী মানবগণ উন্নতি-সোপানে সমারূঢ় হইতে অসমর্থ হইয়াছেন। কালের নিয়মই এইরূপ;—কোন সময়ে কোন স্থান উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; আবার কোন সময়ে কোন স্থান অবনতির চরম সীমাতে উপনীত হয়। জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক; চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই বেদে অনেক প্রকার যজ্ঞের বিধান আছে। বেদাঙ্গ, কল্পসূত্র পর্য্যালোচনা করিলে, অনেক যজ্ঞের নাম অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল যজ্ঞ অধুনা কোন স্থানে কোন আর্য্যসন্তান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। বেদে যখন ঐ সকল যজ্ঞের বিধান আছে, তখন পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ যে ঐ সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, এই বিষয়ে আর বলিবার অপেক্ষা কি? শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ও ছন্দঃ—এই ছয়টী বেদাঙ্গ। এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পরূপ বেদাঙ্গ কর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ক। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মভেদে কল্পসূত্র ত্রিধা বিভক্ত। সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি বিষয়ক সূত্রগুলি শ্রৌতসূত্রপদের প্রতিপাদ্য; গৃহস্থকার্য্য নির্ব্বাহার্থে পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নি দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদিবিষয়ক সূত্র সমূহ গৃহ্যসূত্রপদে অভিহিত। অপরাপর পারমার্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য-বিষয়ক সূত্রগুলি ধর্ম্মসূত্রপদে অভিহিত। শ্রৌতসূত্রে বিবৃত প্রাচীন যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান এক্ষণে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সূত্রে চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রৌতযজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে অগ্ন্যাধান, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এই সাতটী সোমযজ্ঞ। সোমরসের প্রাধান্য নিবন্ধন এই সকল যজ্ঞের সাধারণ নাম সোমযজ্ঞ। গৃহ্যসূত্রে বিবৃত গৃহস্থদিগের সম্পাদনীয় যজ্ঞ সকল নিত্য কর্ম্ম—অর্থাৎ, ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। অতএব শ্রৌতযজ্ঞ অপেক্ষাও গৃহ্যযজ্ঞ সকল অবশ্যানুষ্ঠেয়। ঐ সকল যজ্ঞের সাধারণ নাম পাকযজ্ঞ। এই পাকযজ্ঞ এক্ষণে যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও রূপান্তরিত হইয়া আর্য্যসন্তান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সূত্রকারগণ সপ্তবিধ পাকযজ্ঞের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রথম পাকযজ্ঞ; ইহার দ্বারা সাধারণে এইটী স্থির করিয়া রাখিবেন যে, ইহলোকে পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ডদান একটী যজ্ঞবিশেষ; এই যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠাতা পবিত্র হয়; এই জন্যই এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্র আর্য্যসন্তান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধ দ্বিতীয় পাকযজ্ঞ, এবং মাংস দ্বারা সম্পাদনীয় অষ্টকাশ্রাদ্ধ তৃতীয় পাকযজ্ঞ; এই দুইটী যজ্ঞ এক্ষণে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত না হইলেও অনেক হিন্দু-সন্তানের গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে কর্ত্তব্য যে শ্রাবণী যজ্ঞ, ইহা চতুর্থ পাকযজ্ঞ, এক্ষণে বৈদিক সমাজে ইহার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠেয় যে আশ্বিনী যজ্ঞ, ইহা পঞ্চম পাকযজ্ঞ; এক্ষণে যে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হিন্দুসন্তানের গৃহে নির্ব্বাহিত হয়, এই পূজাই ঐ যজ্ঞের রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে

অনুষ্ঠেয় যে আগ্রহায়ণী যজ্ঞ, ইহা ষষ্ঠ পাকযজ্ঞ; এক্ষণে হিন্দুসন্তানের গৃহে যে নবান্ন-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, উহাই এই যজ্ঞের অনুকল্প বলিয়া বোধ হয়। চৈত্রমাসে অনুষ্ঠেয় যে চৈত্রীযজ্ঞ, ইহা সপ্তম পাকযজ্ঞ; এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান এক্ষণে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সূত্রকারগণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রৌত ও সপ্ত প্রকার পাকযজ্ঞ ভিন্ন পাঁচটী মহাযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও মনুষ্যযজ্ঞ। এই পাঁচটী যজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্যানুষ্ঠেয় বলিয়া মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ ভিন্ন ষোড়শ প্রকার সংস্কারযজ্ঞও সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, মহাব্রত, উপনৈষদব্রত, গোদানব্রত, সমাবর্ত্তন, সমাবর্ত্তনের উত্তরকালে কর্ত্তব্য স্নানবিশেষ, বিবাহ, এবং মৃত শরীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রাগুক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রৌতযজ্ঞ, সপ্তপ্রকার পাকযজ্ঞ, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ, ও ষোড়শবিধ সংস্কারযজ্ঞ এই দ্বিচত্বারিংশৎ প্রকার সংস্কার আর্য্যসন্তানের অবশ্যানুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ ঐ সমস্ত সংস্কারের অনুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমনে সমর্থ হইতেন। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" ইত্যাদি গীতা-বাক্য দ্বারা ইহাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। যথা কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নাই, স্বর্গাদি ফললাভের জন্য যাহারা কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত, তুমি তদ্রূপ হইও না; কর্ম্মফল বন্ধনের কারণ। এই ভয়ে কর্ম্মের অকরণেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। আমিই কর্ত্তা—এইরূপ বৃথাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর; কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদর্শী হও; কারণ ঐ সমতা-বুদ্ধিকেই সাধুগণ যোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট; নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানার্থী ব্যক্তিরা সুকৃত, দুষ্কৃত উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে সচেষ্ট হও। যেহেতু বন্ধন সাধনীভূত কর্ম্মের পরমেশ্বরের আরাধন দ্বারা নির্ব্বাণপরত্ব-সম্পাদক চাতুর্য্যই প্রকৃতাভ্যাস অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা জীবকে সংসার-বন্ধন ভোগ করিতে হয়, সেই কর্ম্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি নির্ব্বাণ-পদলাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তির চাতুর্য্য প্রকৃত চাতুর্য্য; প্রকৃত কথা, কর্ম্ম ভিন্ন জীবের গতি নাই। কর্ম্মফলানুসন্ধানে রহিত হইয়া ভগবদারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণ জ্ঞানলাভ দ্বারা জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অনাময় বিষ্ণু-পদলাভে সমর্থ হন পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা তাঁহার কৃপায় যখন তোমার বুদ্ধি আত্মাভিমানরূপ মোহময় গহন কানন হইতে বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন সকল বিষয়েই তোমার বৈরাগ্য জন্মিবে। এইরূপ অশেষ প্রকার লৌকিকার্থ ও বৈদিকার্থ শ্রবণে বিরক্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চলভাবে সমাধিস্থ হইবে, সেই সময়ে তুমি যোগ-ফললাভে সমর্থ হইবে। এইরূপে অর্জ্জুন ভগবৎ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণাদি কি প্রকার? তৎপরে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ যে, যে মহাত্মা আপনার পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া, মনোগত কামনা-সকলকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন,

এবং যাঁহার মন দুঃখ পাইলেও উদ্বিগ্ন হয় না, এবং সুখেতে বিগতস্পৃহ, যিনি শত্রুমিত্রে সমদর্শী, অনুকূল বিষয় লাভেও যিনি আনন্দ অনুভব করেন না, এবং প্রতিকূল বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ-বুদ্ধি নাই, তিনিই সমাধিস্থ অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞপদের বাচ্য, তাঁহাকেই মহাত্মারা মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয় সকলের সংযমন পূর্ব্বক ঈশ্বর-পরায়ণ ও সকল ইন্দ্রিয়ই যাঁহার বশীভূত, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা। যে ব্যক্তি নিয়ত বিষয় চিন্তা করে, তাহার বিষয়ে আসক্তি হয়, ঐ আসক্তিমূলক কামনা জন্মে, কামনার বিষয় সিদ্ধ না হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধমূলক মোহ, অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-রাহিত্য হয়, তন্নিবন্ধন স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট অর্থস্মৃতির ভ্রংশ হয়; তদ্দ্বারা চেতনা নষ্ট হয়, পরে সেই ব্যক্তি মৃততুল্য হইয়া অবস্থান করে। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া আত্মাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হন, আত্মা প্রসন্ন হইলে সকল দুঃখ নষ্ট হয়, এবং শীঘ্রই বুদ্ধি স্বভাবে অবস্থান করে, কিন্তু যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত না হয়, তাঁহাদের উপযুক্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। অতএব তাঁহারা আত্মার ধ্যানে অনধিকারী; সুতরাং তাঁহাদের শান্তিই বা কোথায়? অশান্ত ব্যক্তির সুখই বা কোথায়? রোগী মনে করেন যে অরোগী সুখী, দরিদ্র মনে করেন ধনবান্ সুখী, ধনবানের মধ্যে শতাধীশ মনে করেন সহস্রাধীশ সুখী, সহস্রাধীশের নিকট লক্ষাধীশ সুখী, লক্ষাধীশের সন্নিধানে ক্ষিতীশ্বর সুখী, ক্ষিতীশ্বর মনে করেন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সুখী, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইন্দ্রপদ-প্রার্থী, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ-প্রার্থী, ব্রহ্মা হরিপদাভিলাষী, হরি মহেশ্বর-পদ কামনা করেন,—কোন ব্যক্তিই আশার চরম সীমাতে পদার্পণ করিতে পারেন না, ইহাই মহাত্মারা বলিয়া থাকেন; যথা—নিঃস্বো ব্যষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং বাঞ্ছতি। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং আশাবধিং কো গতঃ॥ ফল কথা, উহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই সুখী নহে, কিন্তু যাঁহার আত্মা প্রসন্ন হইয়াছে, যাঁহার মনে শান্তি-রসের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি আশার চরমসীমাতে পদার্পণ করিয়াছেন, দরিদ্রই হউন, বা ধনবান্ই হউন, তিনিই প্রকৃত সুখী; মহাত্মারা ইহাই বলিয়া থাকেন যে,—"আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আরও মহাত্মারা বলেন যে, "আশায়াঃ খলু দাসা যে তে দাসা জগতামপি। আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ।" যাহারা আশার দাস, তাহারা জগতেরই দাস, কিন্তু যাঁহারা আশাকে দাসী করিয়াছেন, জগৎ তাঁহাদের দাস। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।" যাঁহারা প্রাপ্ত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হন, তাঁহারাই শান্তি প্রাপ্ত হন, ও উত্তরকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হন। "শান্তিশতকে"ও ইহা উক্ত আছে; যথা,—"আত্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ। ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি ন বা প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়ো বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি বয়ং ত্যক্তুং ন তানি ক্ষমাঃ॥" যে সকল মহাত্মা অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও বিবিধ উপভোগের কারণ অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিয়া শান্তি-

নিকেতনে গমন করেন, তাঁহাদের দুষ্কর কার্য্য কিছুই নাই; কিন্তু যে সকল অদূরদর্শী ব্যক্তি পূর্ব্বেও ধন প্রাপ্ত হয় না, বর্ত্তমান সময়েও ধন পাইতেছে না, ভবিষ্যতেও যে ধন পাইবে, তাহারও কোন দৃঢ় প্রত্যয় নাই, তথাপি ধন-লালসামাত্র পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। এই চিত্তের প্রসন্নতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ নহে, সৎকর্ম্ম দ্বারাই নির্ব্বৃত্ত, অতএব পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা চিত্তকে প্রসন্ন করিতেন; এবং পূর্ব্বতন ধনী মহাত্মগণও অবশ্য-পোষ্য পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণোপযোগী ধন ব্যতিরিক্ত ধন সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেন, এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়া, বানপ্রস্থাবলম্বনানন্তর যোগমার্গ দ্বারা তনুত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি প্রাপ্ত হইতেন। ইহার প্রমাণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে না। মহাকবি কালিদাস এই ভাবেই সূর্য্যবংশের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং। বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্। রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।" বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মারা যে যোগ দ্বারা অনাময় পদলাভে সমর্থ হন, সেই যোগ দুই প্রকার—কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ। অধিকারিভেদে এই দ্বিবিধ যোগের শাস্ত্রে বিধান আছে। জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় যে সকল যোগী, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মযোগ অবশ্যানুষ্ঠেয়। শুদ্ধান্তঃকরণ ও জ্ঞানভূমিতে সমারূঢ় যে সকল যোগী, তাঁহাদের জ্ঞানযোগ অবশ্যানুষ্ঠেয়, অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত যাহাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মতৎপর হয়, সেইরূপ ধ্যানাদি নিরত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কর্ম্মযোগের প্রশংসা ও নিন্দা এই উভয়েরই উল্লেখ আছে; তদ্দর্শনে আপাততঃ অস্মদাদির ন্যায় অর্ব্বাগ্দর্শীদিগের চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয় বা অননুষ্ঠেয়, পরন্তু গীতাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে সে সংশয় চিত্তে স্থান পাইতে পারে না; যেহেতু গীতাদি শাস্ত্রে ভগবান্ স্বয়ং অধিকারিভেদে ঐ স্তুতি নিন্দার উপপত্তি করিয়াছেন; অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের নিকট কর্ম্মযোগ নিন্দনীয়, আর অবিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের নিকট কর্ম্মযোগ প্রশংসনীয়। যাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার আছে, তাঁহারা যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হন; নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া, কেবল সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, সকলেই ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; সকলেই রাগ-দ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে অজ্ঞ ব্যক্তি হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনঃ দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থান করে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি কপটাচারপদে অভিহিত হয়। সান্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম জীবের অবশ্যানুষ্ঠেয়। সকল কর্ম্মের অকরণ অপেক্ষা কর্ম্মকরণ প্রশস্ততম, সকল কর্ম্মশূন্য জীবের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহেরও কোন সম্ভাবনা নাই। ভগবদারাধনোপযোগী কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম দ্বারাই লোকসকল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে; অতএব নিষ্কামভাবে ভগবদারাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসার-বন্ধনের কোন সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর, দেবগণও যথাকালে বৃষ্টি প্রদান করিয়া অন্নোৎপাদন দ্বারা

তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া অবস্থান করিলে সকলেই অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে। যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যজ্ঞ দ্বারা পরিতৃপ্ত দেবগণ যজ্ঞকর্ত্তৃদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব দেবগণ প্রদত্ত অন্নাদি দেবগণকে অর্পণ না করিয়া যাহারা ভক্ষণ করে, তাহারা চৌরদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও যজ্ঞাদি কার্য্য জীবের অবশ্যানুষ্ঠেয়, যেহেতু ভক্ষিত অন্ন শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া প্রাণিগণকে উৎপন্ন করে; সেই অন্ন মেঘ হইতে উৎপন্ন হয়; সেই মেঘ যজ্ঞাদি-সম্ভূত; সেই যজ্ঞাদি অস্মদাদির ক্রিয়া দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" এই শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের বাক্যভূত বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি; তন্মূলক কর্ম্মনিষ্পত্তি, তাহা হইতে মেঘের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্ন, ও অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি। পুনর্ব্বার ঐ প্রাণিগণের পূর্ব্ববৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এইরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুষ্ঠান যে মানব না করে, তাহার জীবনই বৃথা। কিন্তু যে ব্যক্তির আত্মাতেই প্রীতি, যিনি আত্মাতেই পরিতৃপ্ত, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য নাই। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন পুণ্য নাই, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও কোন প্রত্যবায় নাই। যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, মুক্তিতে দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা, অতএব সেই বিঘ্নপরিহারার্থ জ্ঞানীরও কর্ম্ম দ্বারা দেবগণ অবশ্য সেব্য; কিন্তু এই আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ শ্রুতিতে ইহা উক্ত আছে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা; জ্ঞানোৎপত্তির পর সে সম্ভাবনা নাই; দেবগণও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হন না। শ্রুতি এই, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতীতি ॥" জ্ঞানী ব্যক্তিরও যদ্যপি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, তথাপি লোকসংগ্রহের জন্যও কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা অনুষ্ঠান করেন, প্রাকৃত লোক তাহাই করিয়া থাকেন; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, সামান্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ইহাই বলিয়াছেন যে, যদ্যপি আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; যেহেতু ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্য বস্তু কিছুই নাই; তথাপি লোকসংগ্রহের জন্য আমিও কর্ম্ম করিয়া থাকি। যদি আমি আলস্যরহিত হইয়া কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে লোক সকল আমার পথের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মাকরণ-নিবন্ধন ধর্ম্মলোপ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। শ্রদ্ধাবান্ মানব সকল আমার মতের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার মতের অনুসরণ না করিবে, তাহারা আচন্দ্রার্কসমকাল ভববন্ধনে বদ্ধ হইয়া নরক ভোগ দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবে। ইহার পর, জ্ঞানযোগের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। পরমেশ্বরারাধনরূপ কর্ম্মকে জ্ঞানহেতুত্বনিবন্ধন বন্ধকত্ব না থাকায় যিনি কর্ম্ম নয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অকরণকে প্রত্যবায় জনকত্ব নিবন্ধন বন্ধহেতুত্ব থাকায় যিনি কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ জ্ঞানযোগী; তাঁহার ভগবদারাধনরূপ কর্ম্মে সকল কর্ম্মফল

অন্তর্ভূত হওয়ায়, সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও তাঁহাকে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ফল-কামনারহিত হইয়া কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পণ্ডিত; যেহেতু, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কর্ম্ম সকল ভস্মীভূত হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনর্ব্বার সংসারে আবদ্ধ হইতে হয় না; যাহাদের ঐহিক ভোগে বা পারত্রিক স্বর্গাদি-ভোগে বাসনা আছে, তাহাদের কোন কালেই শান্তির সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে,—"ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ঘৃতাহুতিযোগে যেরূপ অগ্নি-শিখা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উপভোগ দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। উল্লিখিত জ্ঞানযোগ দ্বারা জ্ঞান-লাভই আশ্রমচতুষ্টয়ের চরম ফল। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পরে গার্হস্থ্যাশ্রম, অনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পারিব্রাজ্যাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচারী ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বা তদর্দ্ধ অষ্টাদশ বৎসর অথবা তদর্দ্ধ নয় বৎসর উপযুক্ত গুরুর নিকট ঋক্‌, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের যথাবিধি অধ্যয়ন করিবেন, অথবা প্রত্যেক বেদশাখার অধ্যয়নে যতকাল অপেক্ষণীয়, ততকালই গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবেন। যাহাতে স্ব-ধর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, এইরূপ নিয়মে যথা-ক্রমে স্নাতক-ব্রহ্মচারী নিজ বেদাতিরিক্ত বেদশাখাত্রয় বা বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র বেদশাখার অধ্যয়ন করিয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সমাবর্ত্তনান্তে অর্থাৎ ব্রতান্তস্নান-ক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবেন। পরে গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম সকলের যথাবিধি নির্ব্বাহানন্তর যে সময়ে দেহের শৈথিল্য ও পৌত্র-মুখ সন্দর্শন করিবেন, সেই সময়ে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সমুদায় গ্রাম্য অন্নাদি আহার ও গ্রাম্য পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপযুক্ত পুত্রে নিজ পত্নীর ভরণ-পোষণ-ভার ন্যস্ত করিয়া, অথবা নিজ পত্নীর সহিতই বনে গমন করিবেন। শ্রৌত অগ্নি আর সভ্য অগ্নি ও স্রুক্‌স্রুবাদি সমস্ত অগ্নির উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া, তথায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিবেন। মুনিদিগের ভক্ষণীয় পবিত্র নীবারাদি অন্ন দ্বারা বা শাকমূল-ফল দ্বারা যথাবিধি পঞ্চমহাযজ্ঞ ও মৃগচর্ম্ম বা চীরবস্ত্র পরিধান এবং প্রাতঃ, সায়ংকালে স্নান ও সর্ব্বদা শ্মশ্রুলোমনখজটাধারণ এবং ভোজ-নীয় বস্তু হইতে যথাশক্তি বৈশ্বদেববলি ও আশ্রমে সমাগত অতিথিগণের সৎকার বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মাদিগের অবশ্যানুষ্ঠেয়। ঐ আশ্রমিগণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের সংযমন, সকল জীবে দয়া প্রকাশ ও সকলের প্রতি মিত্রভাবাবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মন অর্পণ করিবেন। ঐ মহাত্মাদিগের কেবল দানে অধিকার আছে, প্রতিগ্রহে নাই। দর্শযাগ, পৌর্ণমাস যাগ, নবশস্যযাগ, চাতুর্ম্মাস্যযাগ, উত্তরায়ণযাগ, দক্ষিণায়নযাগ ইহাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বসন্তে ও শরৎকালে উৎপন্ন পবিত্র নীবারাদি অন্ন স্বয়ং আহরণানন্তর চরু প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পুরোডাশযাগাদি অবশ্য সম্পাদনীয়। স্বচ্ছন্দবনজাত নীবারাদি দ্বারা প্রস্তুত চরু দেবতাদিগকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের আচার মনুসংহিতায় "এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ। বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥" এই শ্লোক হইতে দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর, পারিব্রজ্যাশ্রমীদিগের আচার সংক্ষেপে এই

প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমে, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক যথাশক্তি তত্তদাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া এবং তত্তদাশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া ও যথাবিধি বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণ ধর্ম্মানুসারে সৎপুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষলাভের জন্য প্রব্রজ্যাশ্রমে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া ও বৃদ্ধ মাতাপিতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান ও অবশ্য পোষ্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিলে এবং পিতা, মাতা প্রভৃতির সন্তোষোৎপাদন না করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করিলে, উত্তরকাল নরকে বাস হয়। বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়াবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, বার্দ্ধক্যাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনীয়। যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সকল কাম্য কর্ম্ম হইতে চিত্ত বিরত হইবে, সেই সময়ই সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বনের কাল। যেহেতু পুরুষ অনুভব করিয়াই বিষয়ের তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ দুঃখহেতুতার অনুভব করিতে সমর্থ হন; সেই হেতু যে সময়ে বিষয়কে দুঃখহেতু বলিয়া মনে হইবে, সেই সময়েই বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। নচেৎ পরের বাক্যে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বৈরাগ্যাবলম্বন কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীকে অভয়দান করিয়া এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনিই উত্তরকালে তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন। যে দ্বিজ হইতে কোন প্রাণীর কখনও অণুমাত্র ভয় উৎপন্ন না হয়, বর্ত্তমান দেহনাশের পর সেই দ্বিজেরও কোন প্রাণী হইতে অণুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কোনও মহাত্মা উত্তম ভোগ্য বস্তু সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া পবিত্র দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি উপকরণ সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনীয়। উক্ত আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তি সর্ব্বদা নিঃসঙ্গভাবে অসহায় হইয়া নির্ব্বাণের নিমিত্ত একাকী বিচরণ করিবেন; যেহেতু যিনি নিরন্তর একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও নিমিত্ত দুঃখভোগী হন না; এবং তাঁহার দুঃখেও কাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না। সুতরাং তিনি সর্ব্বদা মমতাশূন্য হইয়া অনায়াসে শান্তিসোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। মোক্ষসুখার্থী ব্যক্তি দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি সামগ্রীর নিরপেক্ষ ও সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ এবং যোগাসনে সমাসীন হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিয়া এই সংসারে কেবল দেহমাত্রকে সহায় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সন্ন্যাসী ব্যক্তি কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত দিবসের শেষভাগে একবারমাত্র ভিক্ষা করিবেন; অধিক ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু ভিক্ষার আধিক্যে আহারাধিক্যের সম্ভাবনা। আহারাধিক্যে প্রধান ধাতু বৃদ্ধির সম্ভাবনা; প্রধান ধাতু বৃদ্ধি হইলে যতির স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়াসক্তির সম্ভাবনা। কোন ব্যক্তির নিকট মিষ্টান্ন প্রার্থনা করা ও কোন ব্যক্তির উপরি ক্রোধ করা বা কোন ব্যক্তির নিকট ধন প্রার্থনা করা সন্ন্যাসীর নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী এক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বদা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিবেন। শীতে, গ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন ও লোভমোহবিবর্জ্জিত হইয়া এক গৃহস্থের ভবনে একরাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে অন্য স্থানে গমন সন্ন্যাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্ন্যাসী ক্ষুধিত হইয়া

সায়ংকালে গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন; গৃহস্থপ্রদত্ত সদন্নই হউক, আর কদন্নই হউক, তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। যে সন্ন্যাসী যানারোহণ পূর্ব্বক গমন বা কোন কোন ধনীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ অথবা গৃহস্থের ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে কাল-যাপন করেন, সে সন্ন্যাসী সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা ও সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে বাস এই চতুর্বিধ কর্ম্ম সন্ন্যাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাদের পঞ্চম ধর্ম্ম নাই। ধ্যানযোগে বিচক্ষণ যোগী যে দেশে অবস্থান করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়। তাঁহার বান্ধবগণ যে বিশেষ পবিত্রতা লাভ করেন, সেই বিষয়ে আর বলিবার অপেক্ষা কি? প্রকৃত সন্ন্যাসী যে গৃহস্থের আশ্রমে মুহূর্ত্ত-কাল বিশ্রাম করেন, সেই গৃহস্থ কৃত-কৃত্যতা লাভ করেন। তাঁহার অন্য ধর্ম্ম কার্য্যের প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে গৃহস্থের গৃহে সন্ন্যাসী একবারও বাস করেন, তাঁহার এক বৎসরে সঞ্চিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ধ্যানযোগে পরিশ্রান্ত যতিকে যিনি একবার মাত্র ভোজন করান, তাঁহার অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে ভোজন করাইবার ফললাভ হয়। যতিগণ অজ্ঞানতা বশতঃ যে পাপ সঞ্চিত করেন, সেই পাপ তাঁহাদের প্রাণায়াম দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যেরূপ সুবর্ণরজতাদি ধাতুর মালিন্য অগ্নি দ্বারা দূরীকৃত হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের দোষ নষ্ট হয়। যতির প্রাণায়াম দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি দোষ সকল বিদূরিত হয়; পরব্রহ্মে ঐকান্তিক মনঃ-সমাধানরূপ ধারণ দ্বারা পাপসকল নষ্ট হয়। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সংযমন দ্বারা ক্রোধ লোভাদি নিবৃত্ত হয়। এইরূপ নিয়মানুসারে যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকের সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কদাচ দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিবে, অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বর্ণিত সদাচারাংশ ব্যতিরিক্ত অংশগুলি এই প্রবন্ধে বর্ণিত হই-য়াছে এবং সঙ্গতিক্রমে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতি-রিক্ত কিছু কিছু বিষয়ও এই প্রবন্ধে উল্লি-খিত হইয়াছে। সদাচারের মধ্যে দুইটী শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, একটী "সৎ" শব্দ, আর অপরটী আচার শব্দ। সৎশব্দের অর্থ সাধু, কোনরূপ দোষ যাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, তাঁহারাই সাধুপদের বাচ্য, তাঁহা-দের যে আচার, উহাই সদাচারপদে অভি-হিত। বিষ্ণুপুরাণে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধু-বাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥" এই সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, অর্থ অর্থাৎ ধন, শাখা, কাম অর্থাৎ অভিলাষ, পুষ্প, ফল মোক্ষ। যে মহাত্মা এই সদাচাররূপ বৃক্ষের সেবা করেন, তিনি উত্তরকালে মোক্ষফল লাভে সমর্থ হন। বামনপুরাণে ইহাই উক্ত হইয়াছে, যথা,—"ধর্ম্মোঽস্য মূলং, ধনমেব শাখা, পুষ্পঞ্চ কামঃ, ফলমস্য মোক্ষঃ। অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশে সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥" শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত আচারই পরমধর্ম্ম, সেই হেতু দ্বিজাতিগণ তদনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্ হই-বেন; দ্বিজাতিগণ সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে বেদাধ্যয়নের ফললাভে সমর্থ হন না; কিন্তু সদাচারসম্পন্ন হইলে বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ ফললাভে সমর্থ হইতে পারেন। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, অভিলষিতপ্রজা ও অক্ষয় ধনলাভে সমর্থ হন, এবং তাঁহার শরীরে অশুভসূচক কোন চিহ্ন থাকিলেও [illegible]

থাকে না। মনুসংহিতাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা,—"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ। আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে। আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥ আচারাৎ লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥" সদাচারসম্পন্ন মানবগণ সদাচার দ্বারা দীর্ঘায়ু, ধনবান্, এবং ইহলোকে ও পরলোকে যশস্বী হইতে সমর্থ হন। দুরাচার ব্যক্তিরা কদাচ দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। নিজের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে হইলে সদাচারাবলম্বন অবশ্য বিধেয়। পাপাত্মা ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন হইলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যদি অসদাচরণ সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার পুণ্য সকল বিনষ্ট হয়। সদাচারই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ, সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাঁহাকে দর্শন না করিয়াও তাঁহার নামমাত্র শ্রবণেই তাঁহার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রশাসনপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু ও পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। সুলক্ষণবিহীন মনুষ্যও যদি সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান্, ঈর্ষ্যাশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধহীন ও সরলস্বভাব হয়, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া, অনেকে সাধুদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়াই ঐ সূক্ষ্মধর্ম্মের নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়াই সমুদায় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ধর্ম্মের পীড়াকর যে অর্থ ও কাম, উহা অবশ্য পরিত্যজনীয় এবং যে ধর্ম্ম উত্তরকালে অশুভফলপ্রদ ও লোকবিদ্বিষ্ট অর্থাৎ সমাজবিরুদ্ধ, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রে ইহাই উক্ত আছে, যথা,—দেশাচারস্তবদাদৌ বিচিন্ত্যো দেশে দেশে যা স্থিতিঃ সৈব পূজ্যা। লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতা বর্জ্জয়ন্তি শাস্ত্রজ্ঞোঽতো লোকমার্গেণ যায়াৎ॥" প্রথম দেশাচার চিন্তা করিবে, কারণ দেশাচারই সর্ব্বাগ্রে আদরণীয়; পণ্ডিতগণও লোকবিদ্বিষ্ট আচার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব পূর্ব্বতন লোকের অনুশীলিত পথই অবশ্য আশ্রয়ণীয়। প্রমাণান্তর দ্বারাও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতি॥" পিতৃপিতামহের অনুশীলিত পথই সাধুদিগের অবশ্যসেব্য। কারণ সেই পথে গমন করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে; ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের অর্থাৎ অতিরিক্ত ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইলে সকল অর্থই ব্যয়িত হইয়া যায়; অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের পীড়া হয়, অর্থাৎ অর্থের আধিক্য হইলে ইহ লোকের অসদাচারের প্রবৃত্তি হয়; তদ্দ্বারা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়। কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়েরই ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রীতিকাম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য অর্থেরও ক্ষয় হয় এবং অসৎ কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সম্পাদিত হইলে, ধর্ম্মেরও ক্ষয় হয়। প্রাকৃত লোক ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি মনে করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত লোক

কামের ফল জীবনধারণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক ত্রিবর্গের সেবা করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য; ফলতঃ মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের উপরি পৃথক্‌ভাবে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল অর্থপর, অথবা কেবল কামপর না হইয়া, সতত সমভাবে ত্রিবর্গানুশীলন করিলে ত্রিবর্গের মধ্যে কোন বর্গেরই পীড়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই ধার্ম্মিকের অবশ্য কর্ত্তব্য, পরধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সুখেতেই সকল ব্যক্তির অভিলাষ, সেই সুখ ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সকল বর্ণেরই ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্যকর্ত্তব্য; শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন;—"সুখং হি রজ্যতে সর্ব্বং তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং। তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥" কিন্তু সেই ধর্ম্ম স্বজাতীয় আশ্রমধর্ম্ম, পরধর্ম্ম নহে; কারণ যে ব্যক্তি স্বজাতীয় আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সূর্য্যদেব তাহার উপরি ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে বংশ বিনষ্ট হয়, এবং নিজের দেহ উৎকট রোগে অভিভূত হয়। বায়ুপুরাণে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে;—"যো হাপয়তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ। কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবৃদ্ধয়ে॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও উক্ত আছে যে—"সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ স্বধর্ম্মশ্চ যশঃ পরং। স্বধর্ম্মহীনা নরকে পতন্তি মূঢ়চেতসঃ॥" স্বধর্ম্ম পরিপালন ও যশোলাভ এই উভয়ই সকল আশ্রমের সার, যে মূঢ়ধী স্বধর্ম্ম পরিপালন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই উত্তরকালে নরকে পতিত হইতে হয়। ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে যথাকথঞ্চিৎ অঙ্গহীন অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর অর্থাৎ উত্তরকালে স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ, পরধর্ম্ম অতি ভয়াবহ, অর্থাৎ উত্তরকালে নরক প্রাপ্তির কারণ। নিকৃষ্ট জাতিও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গবাস করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতিও স্বধর্ম্ম হইতে অত্যুৎকৃষ্ট পরধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গবাস করিতে সমর্থ হন না। অতএব স্বদার হইতে পরদার যদি অত্যন্ত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও যেরূপ পরদার লোকের অবশ্যত্যাজ্য, সেইরূপ স্বধর্ম্ম হইতে পরধর্ম্ম অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও তাহা জীবের অবশ্য ত্যাজ্য, ইহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে। পরধর্ম্মো ভবেৎ ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, যথা,—"স্বধর্ম্মে রক্ষিতে তাত শশ্বৎ সর্ব্বত্র মঙ্গলং। যশশ্চ সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতাপঃ পূজনং পরং॥" স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মনুষ্য সর্ব্বত্র মঙ্গল, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সর্ব্বত্র প্রতাপবান্ ও সকলের পূজনীয় হয়। অতএব আশীর্ব্বাদার্হ পাত্রদিগকে সাদর সম্ভাষণের সহিত এবং সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, সকলেই স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হউন ও পরধর্ম্ম ও পরকীয় আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট মনে হইলেও মন হইতে তাহা অন্তরিত করুন; এবং বৈদিক রীতি নীতির অবলম্বন পূর্ব্বক পরকীয় রীতি নীতির অনুকরণ পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে সকলেরই ইহলোকে ও পরলোকে অভ্যুদয় লাভে সামর্থ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই নশ্বর দেহ এক কালে অবশ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, এবং এইরূপ কোন সন্দেহই নাই

যে যাহার কোন সময়েই নশ্বরত্ব নাই, অতএব মৃত্যুকে সন্নিহিত মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সকলেরই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উত্তরকালে কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বহুতর অর্থব্যয় করিলে যে ধর্ম্ম হয়, এইরূপ নহে, শ্রদ্ধা সহকারেই ধর্ম্ম অবিচলিত ভাবে নির্ব্বাহিত হয়। অতএব দরিদ্র মুনিগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই পারলৌকিক সুখভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন। অশ্রদ্ধায় দানাদি কার্য্য সমস্তই বিফল হয়। ধর্ম্মই জীবের একমাত্র বন্ধু ও পরলোকে একমাত্র সহায়; জীব যে সময়ে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়ে পুত্রাদি বন্ধুগণ মৃত দেহকে ভস্মীভূত করিয়া হা হতোস্মি এইরূপে মুহূর্ত্তকাল রোদন করতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু জীব মৃত হইলেও ধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, পরলোকেও তাহার অনুগমন করেন। "একমাত্রঃ সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।" এই উপদেশ বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি সম্মুখে মৃত্যুকে দর্শন করতঃ ধর্ম্মাচরণ না করে, অজাগলদেশস্থিত স্তনের ন্যায় তাহার জন্মই বিফল। "পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যো ধর্ম্মং নাচরেৎ নরঃ। অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং॥" যে স্থানে ধর্ম্ম থাকেন সেই স্থানেই কান্তি, লজ্জা, লক্ষ্মী, বুদ্ধি অবস্থান করে এবং সেই স্থানে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, ভগবানের অবতীর্ণতা নিবন্ধন সেই স্থানস্থিত লোক সর্ব্বত্র জয়লাভে সমর্থ হয়, শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে, যথা—"যত্র ধর্ম্মো দ্যুতিঃ কান্তির্যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথা মতিঃ। যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥" ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

রাজতরঙ্গিণী।*

ভারতীয় ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট কহ্লন-প্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী'র পরিচয় দান এক্ষণে অনাবশ্যক। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতভাষায় অদ্যাবধি যে সমস্ত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিকেই প্রকৃতপক্ষে 'ইতিহাস' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ পুরাণনিচয়, কিন্তু সেগুলি এতাধিকপরিমাণে গল্প, দেবতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদিতে মিশ্রিত যে, রাজনৈতিক ইতিহাসহিসাবে সেগুলির মূল্য নিতান্ত অল্প। এই সকল পুরাণের মধ্যে সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এরূপভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট আছে যে, ইতিহাস-পাঠকগণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরূপ অসম্ভব। অন্যপক্ষে রাজতরঙ্গিণীতে অনৈতিহাসিক প্রসঙ্গ অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান। কহ্লন নিজেই বলিয়াছেন, আধুনিক লেখকগণ, অতীত ঘটনাবলীর

* সাহিত্য-সভার ৮ম বার্ষিক ৩য় মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

প্রত্যক্ষদর্শিগণ কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণের বিকৃতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অতীতকালের কোন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, সতর্কতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সত্য ঘটনা বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য।' কিন্তু এই ইতিহাস গ্রন্থখানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে, ইহার মধ্যে শক এবং কলির অব্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-সূত্রে বর্ষ গণনা এবং সময় সম্বন্ধে শোচনীয় ভ্রম ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই ভ্রান্তি এতাধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে যে, এই সূত্রে কোন কোন রাজবংশের শাসন-সময়-তালিকা আমূল ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অনেক নরপতির শাসনকাল-পরিমাণ অবিশ্বাস্যরূপে সুদীর্ঘ করা হইয়াছে। ফারগুসন সাহেব বলেন, 'রাজতরঙ্গিণী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস-গ্রন্থ-হিসাবে ইহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। যে সকল অতীত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি জ্ঞাতব্য এবং প্রয়োজনীয়; কিন্তু লেখক, ইচ্ছাপূর্ব্বক ধারাবাহিকরূপে ঐ সকল ঘটনার যে কাল অপ্রকৃতভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সেগুলির মূল্য বহুলপরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে।' যে সকল ঘটনা শক অব্দ মধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে, ঐ সকলের সংঘটনকাল পর্য্যালোচনা করা এবং উহার ভ্রান্তিপূর্ণ সময়-তালিকা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় কিনা তাহা দেখা, আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য।

কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী সাতটী ভাগে বিভক্ত এবং পাণ্ডব যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধের সমসাময়িক ১ম গোনন্দের শাসনকাল হইতে ১১০১ খৃষ্টাব্দে মৃত রাজা হর্ষের শাসন সময় পর্য্যন্ত হিমালয়রাজ্য কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করাই ইহার উদ্দেশ্য। উক্ত ৭টী ভাগে বিভক্ত গ্রন্থে বিবৃত রাজগণের সংখ্যা এবং তাঁহাদিগের শাসনকালের সময়ের তালিকা উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রকটিত হইল,—

১ম অংশ (ক) ৫২ জন রাজার শাসনকাল		১২৬৬ বর্ষ।
(খ) ২১ বা ৭৮ জন	„	১০১৫ বর্ষ ৮ মাস।
২য় অংশ—৬ জন	„	১৯২ বর্ষ।
৩য় অংশ—১০ জন	„	৫৭২ বর্ষ ৬ মাস।
৪র্থ অংশ—১৭ জন	„	২৫১ বর্ষ ৬ মাস।
৫ম অংশ—৮ জন	„	৮৩ বর্ষ ৪ মাস।
৬ষ্ঠ অংশ—১০ জন	„	৬৪ বর্ষ ১ মাস।
৭ম অংশ—৬ জন	„	৯৮ বর্ষ।

[রাজতরঙ্গিণীর ৪র্থ খণ্ডের শেষে কহ্লন বলেন, 'কর্কোট বংশের ১৭ জন রাজা, ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২৮ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।' এই রাজবংশের শেষ দুইটী নৃপতি কত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কহ্লন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু আমরা যদি সেই দুই জন রাজার শাসনকাল গণনা করি, তাহা হইলে ১৭ জন নৃপতির শাসনকাল যোগ করিলে, ২৫১ বর্ষ ৫ মাস ২৮ দিন বা মোটামুটি ২৫১ বর্ষ ৬ মাস দেখিতে পাই। চিপ্পতজয়াপীড় ৮৯ লৌকিক অব্দে প্রাণত্যাগ করেন, এবং তাহার পর অজিতাপীড় ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করেন, সুতরাং শেষোক্ত রাজার ২৫ লৌকিক অব্দে মৃত্যু ঘটে। তৎপরে প্রকাশ যে এই বংশের শেষ রাজা উৎপলাপীড় ৩১ লৌকিক অব্দে সিংহাসনচ্যুত হয়েন। অতএব শেষ দুইটী নরপতির মোট রাজত্বকাল অবশ্যই ৬ বর্ষ মাত্র হয়; কিন্তু যদি এই বংশের সমগ্র নরপতির শাসনকাল ২৬০ বর্ষ ৬ মাস ধরা যায়, তাহা হইলে, ইহাঁদিগের শাসনকাল ১৫ বর্ষ ধরিতে হয়। সুতরাং কহ্লনের সময় গণনা [illegible]

নতুবা তিনি যে, লৌকিক অব্দ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন, তৎসমস্তই ভ্রান্তি পূর্ণ হইয়া যায়।]

গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে উল্লিখিত ললিতাদিত্যের শাসনকাল হইতে কহ্লনের গণনা অভ্রান্ত, কারণ এই নৃপতির শাসনকাল হইতে পরবর্ত্তী রাজগণের শাসনকাল তিনি স্থানীয় প্রচলিত লৌকিক অব্দ অনুসারে গণনা করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে যে প্রথম লৌকিক অব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ৮৯ অব্দ—এই ৮৯ অব্দে চিপ্পতজয়পীড় পরলোক গমন করেন। ললিতাদিত্য হইতে চিপ্পতজয়পীড় পর্য্যন্ত ৯ জন রাজা ১১০ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন। সেই সময়ের মধ্যে একা ললিতাদিত্য ৩৬ বর্ষ ৭ মাস রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ৮ জন ৭৪ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কহ্লন পণ্ডিত কর্ত্তৃক উল্লিখিত লৌকিক অব্দের প্রথম তারিখ যে শতাব্দীতে পড়ে, সেই শতাব্দী ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে আরম্ভ হয়। লৌকিক অব্দের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতাব্দী ধরা হয় না; এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই পুনরায় এক হইতে গণনা আরম্ভ হয়। যদিই এই লৌকিক অব্দ এই মহান্ নৃপতির শাসনকালে সর্ব্বপ্রথম কাশ্মীরে সাধারণ্যে প্রচলিত না হইয়া থাকে, উহা অন্ততঃ তথাকার রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিবৃত করিবার জন্য তাঁহার শাসনকালেই সর্ব্বপ্রথম তথায় ব্যবহার হয়। বাস্তবিক এই ভূপতি এবং তাঁহার দুইটী ভ্রাতার শাসনকাল হইতেই রাজতরঙ্গিণীতে যে শাসন-সময়-কারিকা দেওয়া আছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য। তাঁহাদিগের শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কহ্লন-প্রদত্ত সময়-কারিকা আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে।

কহ্লন যে সকল তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত এবং যুক্তি যথা.—

গোনন্দ এবং অন্যান্য রাজগণ কলিযুগে ২২৬৮ বর্ষকাল কাশ্মীর শাসন করেন।

ভারত-যুদ্ধ দ্বাপরযুগের শেষে সংঘটিত হইয়াছিল, এই ভ্রমপূর্ণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ গণনাকে অবিশুদ্ধ বলেন।

যত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা এবং তাঁহাদিগের মোট শাসনকালের পরিমাণ ধরিয়া কলিযুগের যত অব্দ অতীত হইয়াছে, তাহা হইতে উহা বাদ দিলে, অবশিষ্টের সহিত (যাহা অবশিষ্ট থাকা উচিত তাহার সহিত) মিলে না।

উক্ত গণনা পরিহার করিলে, কলিযুগের ৬৫৩ বর্ষ অতীত হইলে কুরু এবং পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বর্ষ (কাশ্মীরের শতাব্দী) বর্ত্তমান অব্দের ২৪ বা ১০৭০ শকাব্দ হইতেছে।

৩য় গোনন্দ হইতে ২৩৩০ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

৫২ জন নৃপতির শাসনকাল মোট ১২৬৬ বর্ষ হইয়াছিল।

সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতিশত বর্ষে একটী নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে গমন করে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই গতির যে গণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উক্ত গণনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

যে সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিল, সে সময়ে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল, এবং যুধিষ্ঠির ২৫২৬ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'অধ্যাপক উইলসন-কৃত অনুবাদ।'

এস্থলে আমরা একটিমাত্র নিশ্চিত সময়ের নির্দ্দেশ পাইতেছি, তাহা ১০৭০ শক বা ২৪ লৌকিক অব্দ। ইহা কহ্লনের জীবিত কালের অন্তর্গত। এবং এই সময় লইয়াই কহ্লন তাঁহার প্রথম মহাভ্রমে পতিত হন। তিনি অনুমান করেন যে, বিখ্যাত নৃপতি বিক্রমাদিত্য, যিনি মাতৃগুপ্তের সমসাময়িক এবং পরিপোষক ছিলেন (মাতৃগুপ্তের শাসন-

বিবরণী রাজতরঙ্গিণীর ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে) তিনিই প্রথম শক অব্দ প্রচলিত করেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় কহ্লনকে তাঁহার সময় এবং বিক্রমাদিত্যের সময় এই উভয়ের মধ্যে ১০৭০ বর্ষের ব্যবধান করিতে হইয়াছে। তিনি কিরূপে ইহা করিয়াছেন, একবার তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নরপতি হর্ষ, যাঁহার শাসন-বিবরণী গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বশেষ বিবৃত হইয়াছে, ৭৭ লৌকিক অব্দে কলেবর ত্যাগ করেন এবং কহ্লন লৌকিক অব্দের পরবর্ত্তী শতাব্দীর চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। সুতরাং উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যে ৪৭ বর্ষ অতীত হয়। ১০৭০ বর্ষ হইতে ৪৭ বর্ষ বাদ দিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, হর্ষ ১০২৩ শক অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ললিতাদিত্য এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের শাসনকাল হইতে হর্ষের শাসনকাল পর্য্যন্ত (উভয় সমেত) ৩৭ জন নৃপতির শাসনকাল ৪১১ বর্ষ ৬ মাস বা মোটামুটি ৪১১ বর্ষ, ইহা সঠিক জানা আছে। ১০২৩ হইতে ৪১১ বর্ষ বাদ দিলে, ৬১২ বর্ষ অবশিষ্ট থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়টী কহ্লন, বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক নরপতি হইতে ললিতাদিত্যের পিতা প্রতাপাদিত্যের শাসনকাল পর্য্যন্ত ১১টী রাজার রাজ্য-শাসনকাল মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এবং এইজন্যই তিনি রণাদিত্যের শাসনকাল ৩০০ বর্ষ ধরিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ রঘুবংশীয় রাজবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, রণাদিত্য সেই রূপ গোনন্দবংশের রাজগণ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রণাদিত্যের ললাটে শঙ্খচিহ্ন ছিল। দেবী ভ্রমরবাসিনী, সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, কাশ্মীররাজ রণাদিত্যের মহিষী হয়েন। রণাদিত্য পীড়িতদিগের জন্য চিকিৎসালয়, সৈন্যদিগের জন্য বাসস্থান, এবং দেবদেবীগণের জন্য মন্দির সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রণাদিত্য, দেবী ভ্রমরবাসিনীর নিকট হইতে পাতাল-তলে গমনের উপায় শিক্ষা করিয়া, বাস্তবিক পাতালে গমন পূর্ব্বক দৈত্যবালাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কাজেই কহ্লন এরূপ শক্তিসম্পন্ন রাজার শাসনকাল ৩০০ বর্ষের কম বলিয়া ধরিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

নাচিছে বরষাবালা।

(১)

নাচিছে বরষাবালা ;
কাঁপিছে কম্পিত বুকে দামিনীর মালা
চঞ্চল চরণ তলে,
শ্যাম ঘন শষ্পদলে,
সৌরভ-আকুল শত শেফালিকা ঢালা ;
—ধরার বরণ ডালা॥

(২)

সুগভীর গরজনে
বাজাইছে মৃদঙ্গ কে সুদূর গগনে।
প্রাবৃট-প্রখরা নদী,
কলনাদে নিরবধি,
রজত নূপুর সম লুটিছে চরণে,
—নৃত্য চঞ্চল গমনে॥

(৩)

নীল-আকাশেতে ভাসে
নীরদ অঞ্চল খানি চঞ্চল বাতাসে।
টুপ্‌টাপ্ বিন্দু ঢালি,
তালে তালে দিয়া তালি,
কাঁপিতেছে পত্রাবলি যৌবন বিলাসে,
—সুখ উল্লাস উচ্ছ্বাসে॥

(৪)

গাহি গাহি অবিরাম
ভগ্ন-স্বর পিককুল লভিছে বিরাম।
হেরি বরষার সাজ,
লুকা'তে মনের লাজ,
ঢেকেছে জীবন মাঝে বদন সুঠাম,
—কোমল কমল-দাম॥

(৫)

সহস্র মাণিক জ্বালা
মুকুট পরিয়া শিরে, কাননে নিরালা,
তরল মুকুতা দিয়া
সাজাইয়া শ্যাম হিয়া,
হেরিছে নর্ত্তনলীলা স্তব্ধ গাছপালা।
—নাচিছে বরষাবালা॥

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পুরুষবিশেষ ঈশ্বর-রহস্য।

১। পুরুষবিশেষ ঈশ্বরকে মূলে রাখিয়া আবহমান কাল হইতেই ধার্ম্মিক-জগতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। এই সংঘর্ষের আবির্ভাবে একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিই সঙ্কুচিত হয় নাই, জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য সমবেদনার গতিও রুদ্ধ হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন 'মিসরী' ও 'বাবিল' জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিতে পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ যুগে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক গবেষণার বাহুল্যে তদীয় প্রভুত্বের মাত্রা কমিতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনা করিতে পারিলেও তিনি যে স্নেহের জগৎ ছাড়িয়া একবারে অন্তর্ধান করিবেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অধিকন্তু তাঁহার আধিপত্য অপ্রতিহত থাকিলে মানবমণ্ডলী যে, সাম্য-সুধাপানে অধিকার পাইবেন, এইরূপ আশা কখনও মনীষি-মনে আসিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তিনি স্বকীয় শক্তির মহিমায় নিরাকার-সাকার ভেদে বহুবিধ ভক্ত-মনোমোহন স্বরূপ ধারণ করিয়া লইয়াছেন, এবং এক স্বরূপের উপাসকদিগকে অন্য স্বরূপ ও তদুপাসকদিগের ভক্তি বা প্রীতি করার ত কোন কথাই নাই, তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেও আজ্ঞা দিতেছেন না। এইরূপ প্রণালীতে নিখিল স্বরূপের ভক্তদিগের মধ্যে সঙ্কীর্ণ নীতি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রত্যেক স্বরূপের ভক্তদিগকেই গোঁড়ামীর ক্রীড়ণক করিয়া তুলিয়াছেন। তাহারা স্বকীয় প্রভু ও তদীয় ভক্ত ব্যতিরেকে অপর সকলকেই পাপী, অস্পৃশ্য ও অদর্শনীয় মনে করিতেছে। ইহার

ফলে মাত্র অহি-নকুল-নীতির আস্ফালন আরম্ভ হইয়াছে। আর ইহাই মানবীয় সাম্যভাবের প্রবল পরিপন্থী। পক্ষান্তরে এই ঈশ্বরোপাসনার অনেক গুণ থাকিলেও পরস্পর সংঘর্ষরূপ এক মহান্ দোষই ঐ গুলিকে পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং অন্যান্য দোষ লইয়া চর্চ্চা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা, এই প্রকার বিসংবাদ হৃদয়ে অনুভব করিয়া সাম্যভাবের পক্ষপাতী বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মন প্রস্তাবিত ঈশ্বরের রহস্যতত্ত্ব মীমাংসায় আকৃষ্ট করিবার মানসে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। ইহা দ্বারা যদি কোন পাঠকেরও কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তবে স্বকীয় পরিশ্রম সফল মনে করিব।

২। আর্য্যদিগের আদি গ্রন্থ বেদে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতা উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু সর্ব্বাত্মক হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষকেই উহাদের সর্ব্বপ্রধান অধিস্বামি-পদে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে। সমষ্টি হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা পুরুষবিশেষকে এই পদে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত ঋগ্বেদ-মন্ত্র এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ যস্য ছায়া মৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেমঃ।" যিনি ভক্তদিগকে আত্মদান করেন অর্থাৎ তাহাদের বশীভূত হয়েন, নিখিল জগৎ যাঁহার উপাসনা করিতেছে, যাঁহা দ্বারা দেবতাসকল শাসিত হইতেছেন, অমৃতস্বরূপ মোক্ষ যাঁহার আশ্রয়-স্থল এবং তাহাই যাঁহার মৃত্যু, সেই হিরণ্য-গর্ভ দেবকে আমরা হবিঃ দ্বারা আপ্যায়িত করি। এইস্থলে ইহা বিবেচ্য যে, পরান্ত-কালে সগুণ ব্রহ্মের তিরোভাবকে তাঁহার এবং তদুপাসক নিখিল জীবের মুক্তি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বেদ-মন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইল যে, হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর দেবতাদিগের শাসন করিয়া থাকেন এবং হিরণ্যগর্ভ যে সর্ব্বাত্মক বিরাট পুরুষ, এই মন্ত্রের পূর্ব্ব মন্ত্র তাহা জ্ঞাপন করিয়া দেয়। ঐ মন্ত্র এই—"যস্যেমে হিমবন্তোমহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ।" হিমালয় পর্ব্বত, সরিৎ, সমুদ্র যাঁহার মহিমা অর্থাৎ স্বরূপ, দিক্ সকল যাঁহার বাহু, সেই হিরণ্যগর্ভ দেবকে আমরা হবিঃ দ্বারা আপ্যায়িত করি।

৩। এইস্থলে যদি জগৎ হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বলা যায়, তবে হিমালয় প্রভৃতিকে তাঁহার স্বরূপ ও দিক্ সকলকে তাঁহার বাহু বলা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ফলতঃ বেদের ঈশ্বর যে সর্ব্বাত্মক পুরুষ, এই বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য বেদাধ্যায়ী কোন আপত্তি করিবেন না; কিন্তু সুযোগ্য নৈয়ায়িক 'ন্যায় সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' প্রণেতা যে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর স্থাপন করিতে যাইয়া "দ্যাবা ভূমী জনয়ন দেব একঃ" বেদ-মন্ত্রের একপাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও ইহা দ্বারা কেবল তাঁহার লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা বা স্বমতাগ্রহই প্রকাশ পায়; কেননা ঐ মন্ত্রের পূর্ব্ব দুই পাদ সুস্পষ্ট ভাষায় সর্ব্বস্বরূপ বিরাট পুরুষকে জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে—"বিশ্বত-শ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ-র্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।" অদ্বিতীয় বিরাট পুরুষ অন্তরীক্ষ পৃথিবী উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় বাহু, বল ও উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সমস্ত জীবের চক্ষু তাঁহারই চক্ষু, সমস্ত জীবের মুখ তাঁহারই মুখ, সমস্ত জীবের বাহু তাঁহারই বাহু এবং সমস্ত জীবের চরণ তাঁহারই চরণ। এই বেদ-মন্ত্রের

বিশ্বতশ্চক্ষু প্রভৃতি বিশেষণগুলির একমাত্র সর্ব্বাত্মক বিরাট পরমেশ্বরেই সমন্বয় হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরে নহে, কেননা তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিবিশেষত্বই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। এই গেল বেদ-মন্ত্রের কথা, আবার তিনি "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" যে উপনিষদের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও প্রভুর লোক ভুলাইবার চাতুর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে—যথা "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভুব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ।" দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি নিখিল জগতের অধি-স্বামী ও পালয়িতা ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সকল বিদ্যার আদি জননী ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। এই উপনিষদে বিশ্বের কর্ত্তা ও পালয়িতা ব্রহ্মা যে আদি জীব, তাহা "অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ" অংশ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। "যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং" ইত্যাদি উপনিষদ্ও এই বিষয়ের প্রমাণ করিয়া দেয়।

৪। বেদের ঈশ্বর সর্ব্বাত্মক পুরুষ বলিয়াই বৈদিক ঋষিবৃন্দ অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়বস্তুকে তাঁহার প্রতিক স্বরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। ঐ ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, সর্ব্বস্বরূপ বিরাট পুরুষের সমস্ত অংশ মানব-মন ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং কোন অংশকেই তাঁহার স্বরূপ জানিয়া উপাসনা করা উচিত। ঐ প্রতিকে আবার ঈশ্বরের গুণাদিও আরোপিত হইত। বৈদিক যুগে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় প্রতিমা পূজার প্রথা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঐ যুগের ঋষিবৃন্দ প্রাকৃতিক বস্তুকে বড় ভালবাসিতেন; জলের বিলোল-লীলা, সমীরণের মৃদুগতি বা নবপল্লব বিকম্পন, পয়োরাশির চপল তরঙ্গ ও প্রশান্তভাবে অবস্থিতি ইত্যাদি ঘটনা তাঁহাদিগের মন আকৃষ্ট করিয়া লইত, এই জন্য ঐ সকল জিনিষকে তাঁহারা শ্রীভগবদুপাসনার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অধিকন্তু ঐরূপ আলম্বন তাঁহাদের আহার্য্যজ্ঞানপ্রসূত হইলেও উহার পরিণাম অমৃতময় হইত; কেননা উহা দ্বারা ক্রমনীতিতে তাঁহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মভাবে উপনীত হইতেন। বর্ত্তমান গোঁড়া উপাসকদিগের ন্যায় এক প্রতিকের প্রতি ভক্তি করা এবং পাপ জানিয়া অপরাপর প্রতিকের দর্শন হইতেও বিরত হওয়া ইত্যাদি কূপমণ্ডুক ভাবকে কদাপি তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বৈদিক ঋষিরা সরস্বতী-তীরের ব্রততী-কুঞ্জে বসিয়া গান করিতে থাকিতেন—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং উতামৃত ত্বেশানঃ যদন্নেনাতি রোহতি"—'ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরই বটেন,-একমাত্র এই জগতেই তাঁহার পর্য্যবসান হইতেছে না; কিন্তু অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত যে মানবমণ্ডলী তাহাদেরও মুক্তিপদের অধিস্বামিরূপে তিনিই বিরাজমান রহিয়াছেন।'

৫। পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মভাব বিচারচক্ষে দেখিয়াও সম্যগ্রূপে ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহারা প্রতিক উপাসনায় মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। বিশেষ এই যে, তাঁহারা ত প্রতিককে পরমেশ্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান উপাসক মহোদয়েরা পরমেশ্বরকেই প্রতিক করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের "ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং" প্রভৃতি ধ্যানপ্রণালীই এই বিষয়ের প্রমাণ করিয়া দিতেছে। প্রতিক উপাসনার এই বৈপরীত্য যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল, ইহা যে উপাসককে গণ্ডীর বাহিরে

যাইতে দেয় না, বিবেক-চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই মনীষিবৃন্দ তাহা বুঝিতে পারিবেন। অনাদি কাল হইতে মানব যে সঙ্কীর্ণ ভাবের ক্রীড়া-পুতুল হইয়া আসিতেছে, যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল পরিপন্থী, তাহাকে অতলস্পর্শী অভাব-হ্রদে নিক্ষেপ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রচলিত প্রতিক উপাসনার সৃষ্টি বৌদ্ধ-যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে কেবল বেদের ঈশ্বর, নিত্য আত্মা, যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বেদ নিরাকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পুরাণের প্রতিক উপাসনা নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের মধ্যে দার্শনিক চর্চ্চার সঙ্কোচ হওয়ায় তাহারা মহাপুরুষ বিগ্রহ-পূজার আবিষ্কার করিয়া লয়েন। অনন্তর আর্য্যেরাও বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কল্পনাপ্রভাবে শত শত দেব দেবীর আবির্ভাব করিয়া, তাঁহাদের বিগ্রহ পূজনে প্রবৃত্ত হয়েন। আবার বৌদ্ধেরাও আর্য্যদিগের নিকট বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের আবিষ্কৃত তারাদেবী ও নিজাবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির প্রতিমা পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা ও আদানপ্রদানে ভারতভূমিতে বিগ্রহপূজার মহান্ সমারম্ভ হইল।

৬। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বে পুরুষবিশেষ ঈশ্বরবাদের সৃষ্টি হইলেও তাহা আর্য্যভূমিতে বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই; ইহার সপক্ষে যুক্তি এই যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে পূর্ব্বমীমাংসার মতানুযায়ী যাগাদি ক্রিয়ারই বহুল প্রচার ছিল। আর পূর্ব্বমীমাংসার মতে মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা ও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর অসম্ভাবনার গুপ্ত প্রকোষ্ঠেই লুক্কায়িত রহিয়াছেন। যখন আর্য্যভূমিতে ইহাঁর প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন হইতেই পরাধীনতা-তিমির আসিয়া ক্রমনীতিতে আর্য্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহারা বিজাতীয় ভূস্বামীর যেরূপ শাসনে চালিত হইতে লাগিলেন; সেইরূপ শাসনের ভাব স্বকীয় আরাধ্য দেবে আরোপ করিতেও ভটস্থ হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপাস্য দেবকে আপন আপন রুচির অনুপাতে উগ্রপ্রকৃতি, শান্তপ্রকৃতি বা শান্তাশান্ত প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব সম্রাট্ মনে করিতে লাগিলেন। যেরূপ পৃথিবীর সম্রাট্ নিজ প্রাসাদে বিরাজমান থাকিয়া সমস্ত রাজ্যের শাসন করেন, সেইরূপভাব অন্তরীক্ষের সম্রাটেও কল্পিত হইতে লাগিল। এইরূপ কল্পনার পণ্যবীথিকায় কেবল ভারতবাসীর হৃদয়রথ্যাই সুশোভিত নহে; পরন্তু পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই এই ঘটনা ঘটিতেছে, বরং অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আর্য্যভূমির পণ্ডিত-সমাজে এই শ্রেণীর কল্পনা কমই আসন জমাইতে পারিয়াছে; কেননা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত-বিচারে তৎপর থাকেন বলিয়া, তদীয় স্বাধীন মনের উপর উক্ত সম্রাটের প্রভাব প্রতিভাসিত হয় না। কেবল দর্শনানভিজ্ঞ লোককেই তিনি অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিশেষ প্রভাব, বৃন্দাবনী ভাবের নবরসিকদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাই নয়ন-জলে বদন ভাসাইয়া গাত্র ধূলিলুণ্ঠিত করেন, আর তৎকালেই চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রেমালিঙ্গনের ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়। এই অলোকসামান্য প্রেমালিঙ্গন-সুখে কিবা যুবক, কিবা যুবতী, কিবা কুমার, কিবা কুমারী, সকলেই উদারভাবে যথাযোগ্য অধিকার পাইয়া থাকেন। ফলতঃ এই প্রকার উদারভাবটুকু আছে বলিয়া নবরসিকদিগের ধর্ম্ম, বিজ্ঞানালোকিতবিংশশতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ কলেবরে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

৭। পাঠক, এইত শুনিলেন ভারতীয় ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী; এক্ষণে সংক্ষেপ পূর্ব্বক প্রাচীন 'মিসরী' 'বাবিল' ও 'যাহুদী' জাতির ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সংক্রান্ত কথা শুনুন। আদিম 'মিসরী' দিগের উপর 'শিবু' দেব ও 'নুই' দেবী, স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে ছিলেন; কিন্তু বিধাতার এইরূপ নিয়ম নহে যে, চিরদিনই কাহারও প্রভাব অপ্রতিহত থাকে। অকস্মাৎ 'শু' আসিয়া বলপূর্ব্বক 'নুই' কে উড়াইয়া দিলেন, আর 'নুই' অনন্তগতি হইয়া কলেবর পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি আপন অঙ্গকে আকাশে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার করযুগল ও চরণযুগল আকাশের চারি স্তম্ভ হইল। পক্ষান্তরে 'শিবু' পৃথিবী হইয়া গেলেন। 'নুই'র পুত্র 'আসিরিস্' ও কন্যা 'ইসিস্' মিসরের প্রধান দেব দেবীর আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ ঐ দেব দেবীর পুত্ররূপে 'হোরস' আসিলেন, তিনিও নিজগুণে সকলের উপাস্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে পিতা, মাতা ও পুত্র একসঙ্গেই জনসাধারণের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একসঙ্গের পূজাতে 'ইসিসের' পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি ভগবতী গাভীর রূপ ধারণ করিয়া, আবার পৃথক্‌ভাবে লোকের অর্চ্চনায় স্বকীয় তৃপ্তি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'মিসরী'দিগের বিশ্বাস ছিল যে, আকাশেও নীলনদ আছে, পৃথিবীর নীলনদ উহার অংশ মাত্র। তাঁহাদের মতে সূর্য্যদেব নৌকাযোগে অবনীমণ্ডল পরিক্রম করেন। কখন কখন 'অহি' নামা ভুজঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে; ইহাকে তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণ মনে করিতেন। 'মিসরী'দিগের দেবতাগুলি অদ্ভুত আকারের ছিলেন—কেহ শৃগালমুখ, কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ

৮। 'মিসরী'দিগের ন্যায় 'বাবিল'দিগের 'বাল' 'মোলখ' 'ইস্তারত' ও 'দমুজি' প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। ঐগুলির কাহিনী অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না। দমুজির কালক্রমে আর দুইটী নাম হইয়াছিল, একটী 'আদুনোই', অপরটী 'আদুনিস'। ঐ দেবতাগুলির পূজা সংক্রান্ত অনেক প্রকার জঘন্য প্রথা ছিল, তন্মধ্যে 'মোলখ' ও 'বালে'র নিকট জীবিত পুত্র-কন্যাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইত এবং 'ইস্তারতের' মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যভিচার হইত।

৯। 'যাহুদী'দিগের ইতিহাস 'মিসরী' ও 'বাবিল' জাতির ইতিহাস হইতে অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদিগের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ শতাব্দী হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও কুৎসিতভাবে দেবতা-পূজার প্রথা ছিল। 'যাভে' বা 'আদুনোই' যাহুদীদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেন। যখন 'যাহুদী' জাতি, 'ইস্রেল' ও 'ইফ্রেম' দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন 'জেরুসালম্' দেশে 'ইস্রেল' দিগের প্রতিষ্ঠিত এক মন্দির ছিল; উহাতে 'যাভে' দেবতার, সংযুক্ত নরনারী-মূর্ত্তি সিন্ধুকের অভ্যন্তরে রক্ষিত থাকিত। ঐ মন্দিরের দ্বারদেশে পুংচিহ্নযুক্ত এক স্তম্ভ দর্শকবৃন্দের হাস্যরসোৎপাদন করিত। 'ইস্রেল' শাখার ন্যায় 'ইফ্রেম'-শাখার লোকেরাও সুবর্ণাবৃত বৃষভ মূর্ত্তিতে 'যাভে' দেবতার পূজা করিতেন। উভয় শাখার লোকেরাই স্বকীয় দেবমন্দিরে দেবতার সম্মুখে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বৈশ্বানরের আহুতি দিতেন। আবার উভয় সম্প্রদায়ের দেব-মন্দিরেই এক এক দল রমণী বাস করিত; তাহাদের বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হইত, তাহা মন্দিরের সমস্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইত। কালক্রমে 'যাহুদী'দিগের মধ্যে 'নবী' বা 'ভাববাদি' নামে এক সম্প্রদায়

আবির্ভূত হইল; এই সম্প্রদায়ের লোক গুলি নৃত্যগীত করিতে করিতে আপনাদিগের ভিতরে দেবতার আবেশ করিয়া লইত। ইহারা 'পারসী'দিগের সংসর্গে পুত্রবলি, মূর্ত্তিপূজা ও বেশ্যাবৃত্তির বিপক্ষে দাঁড়াইল, ইহার ফলে ক্রমশঃ বলির স্থানে সুন্নৎ প্রবর্ত্তিত হইল, আর বেশ্যাবৃত্তি ও মূর্ত্তিপূজা উঠিয়া গেল। অনন্তর কালক্রমে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে খ্রীশ্চিয়ান ধর্ম্মের জন্ম হইল; এবংবিধ প্রণালীতে না হউক, কিন্তু অন্যবিধ প্রণালীতে যে, 'খ্রীশ্চিয়ান্' ও 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মাবলম্বীরা ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে মূলে রাখিয়া জনসাধারণের মহান্ অনর্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইতিহাসাভিজ্ঞ ও বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে কোন সন্দেহ আসিবার নহে।

১০। যে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ আবহমান কাল হইতে জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যাহার উপাসকদিগের হুঙ্কারে এক সময়ে আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা বিকম্পিত হইয়াছিল, তাহার মূলে একমাত্র অন্ধ বিশ্বাসকে দেখিয়া অনেক সহৃদয় মনীষীই দুঃখিত আছেন। তাঁহারা বহু অনুসন্ধানেও অদ্যাপি ইহার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; যুক্তি, জগৎ কারণকে জগতের বাহিরে অনুসন্ধান করিতে বলে না।—"অকেক্ চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।" 'গৃহের কোণেই যদি মধু পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য পর্ব্বতে যাইবে কেন?' জাগতিক ঘটনা দেখিয়া তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অপর কোন ঘটনাকেই যুক্তি তদীয় কারণত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ঐ ঘটনার কারণও তদন্য কোন ঘটনাকে বুঝাইয়া দেয়। এই প্রকার নিয়মে এক ঘটনার কারণ অন্য ঘটনাকে বুঝাইতে বুঝাইতে পরিশেষে যাইয়া ঘটনার সমষ্টিতে উপনীত হয়। এই পর্য্যন্ত যাইয়া যুক্তি এমন ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, আর অগ্রে এক পদ যাইতে পারে না। যখন কারণ জিজ্ঞাসা ব্যাপারে যুক্তি, সমষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না, তখন সেই স্থলেই মেধাবী জিজ্ঞাসুর কারণ-জিজ্ঞাসার উপসংহার করা উচিত। এইরূপ কারণ-জিজ্ঞাসা-সমস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া যিনি সমষ্টিকে উপেক্ষা পূর্ব্বক জগতের বহিঃস্থ কোন ব্যক্তিবিশেষকেই অন্তিম কারণ মানিয়া লয়েন, তিনি দৃষ্ট পরিহার ও অদৃষ্ট গ্রহণরূপ দোষ-কালিমায় আপনাকে সমাচ্ছন্ন করেন বলিয়া দূরদর্শি-সমাজের অভিনন্দনীয় হইতে পারেন কৈ? তাঁহার ভাগ্যে কেবল অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা মহিলামণ্ডলীর নিকট সিদ্ধ সাজিয়া তাহাদের করতল স্পর্শে শ্রীচরণের গৌরব বর্দ্ধন, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও রজত-খণ্ডের উপহারই বিধাতা লিখিয়াছেন; পরন্তু ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে, কেননা এই মরজগতে অজ্ঞ হউক, আর অভিজ্ঞ হউক, কাহারও নিকট পূজা লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, দূরদর্শীদিগকে গণনার মধ্যে না আনিয়াও ঐ শ্রেণীর লোকেরা সিদ্ধমন্য, ভক্তম্মন্য বা বিপুলাঙ্গ প্রভৃতিরই পূজা করিতে থাকেন। এই প্রকার পূজার মহিমাই অন্ধপরম্পরানীতি-প্রবর্ত্তিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকিত জগতেও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের আসন অটল রাখিয়াছে।

১১। সমষ্টি জগৎকে ব্যষ্টি জগতের কারণ না মানিয়া অন্য কোন বস্তুকে তাহার কারণ স্বীকার করিলে যেরূপ দৃষ্ট ত্যাগ ও অদৃষ্ট গ্রহণরূপ দোষ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া পদার্পণ করে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে গৌরব দোষও আসিয়া আসন জমাইয়া থাকে। অর্থাৎ যাঁহারা জগতের জগৎ ছাড়া একটা

কিম্ভুতকিমাকার কারণ মানিয়া লয়েন; তাহা-দিগকেও বাধ্য হইয়া সমষ্টি স্বীকার করিতে হয়; কেননা সমষ্টি ব্যতীত ব্যষ্টিই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যখন সমষ্টিকারণবাদী ও তদতিরিক্ত কারণবাদী উভয়েরই সমষ্টি মানা আবশ্যক হইতেছে, তখন যে পক্ষ সমষ্টি মানিয়াও তদন্য বস্তুকে কারণ সামগ্রীর মধ্যে আনিতেছে, সেই পক্ষের যে গৌরব-দ্বেষ হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না। স্থূলবুদ্ধি ও বিধাতা যাহাদিগের বুদ্ধিকে বীজ অবস্থা বা অঙ্কুর অবস্থাতে রাখিয়াছেন, বৃক্ষরূপে পরিণত হইবার ত কোন কথাই নাই, কিন্তু পল্লবিতও হইতে পারিতেছে না, তাহারাও বক্ষঃ-স্ফীত করিয়া বলিয়া উঠে—'আমাদের প্রভু লোকান্তরে থাকিয়াও সম্রাটের ন্যায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি করিতেছেন।' এইরূপ উক্তির কোন মূল্য না থাকিলেও অবিবেকি-সমাজে ইহার প্রভাব এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিকের সূক্ষ্ম যুক্তিও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিতেছে না। প্রকৃত পক্ষে নিখিল অজ্ঞ-সমাজের হৃদয় হইতে যে, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর একবারে অন্তর্দ্ধান করিবেন, এইরূপ আশা করিতে না পারিলেও জ্ঞানচর্চ্চার বাহুল্যে যে তাঁহাকে শিক্ষিত-সমাজ হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, এই প্রকার আশাকে দুরাশা বলিয়া উড়াইতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক দার্শ-নিক ও বৈজ্ঞানিক ইহাকে 'বয়কট' করিয়াছেন; তাঁহাদের ভাব ক্রমনীতিতে শিক্ষিত-সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে; অধিকন্তু ইহা দ্বারা যেরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ সঙ্কুচিত হইতেছে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" ইত্যাদি চার্ব্বাক-মত তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করি-তেছে। তাঁহারা পার্থিব সুখের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, আধ্যাত্মিক সুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ইহার পরিণাম যে বিষময় বা বিসদৃশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বর্ত্তমান যুগে যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মেরই প্রচার করিতে হইবে। যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও কুসংস্কারপ্রসূত তাহাকে চাবি লাগাইয়া সিন্ধুকের অভ্যন্তরে রাখিয়া দেও; অথবা তাহাকে জীবন্ত সমাধি লইতে প্রেরণ কর। এক্ষণে আর 'আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বেলতলায় বসিয়া সিদ্ধ হইয়া-ছিলেন,' 'আমার গৃহে তালপত্রের পুঁথিতে অমুক মন্ত্র লিখিত আছে,' 'হজরত মুসা সদলে পদব্রজে লোহিত সাগর পার হইয়া গিয়া-ছিলেন,' 'হজরত ইসা ঈশ্বরের ঔরসে উৎপন্ন হইলেন,' 'হজরত মহম্মদের নিকট খোদা কোরাণ সরীফ আকাশ হইতে পাঠাইয়া-ছিলেন' এবং 'গৌর আমার রাই সাজিয়া রজস্বলা হইল রে' ইত্যাদি কথা শিক্ষিত-সমাজে চলিবে না; তাহার সম্ভাবনা অতী-তের অতল জলধিতে ডুবিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া সংসারের অভ্যুদয় সাধন করে, ধর্ম্মের এই মূল সূত্র ভুলিয়া গেলে, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দ্বারা সমাজোপযোগী ধর্ম্মের প্রচার হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তাই আর্য্যভূমির অবতারবৃন্দ নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। অব-তারের অর্থ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আধিকারিক পুরুষ। যখন যুগে যুগে সময়োপযোগী নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, তখন এই জ্ঞান-বিজ্ঞানালোচিত যুগে অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ-পরম্পরা যাহার মূলভিত্তি, সেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ প্রচার করিলে যে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে, তাহা অবশ্যই বিচারশীল ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে।

১২। ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক সাকার, অপর নিরাকার। নিরাকারবাদ অপেক্ষা সাকারবাদ জগতের হিতকারী; ইহার কারণ এই যে, নিরাকার ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তিনি কল্পনা শুদ্ধান্তেই বিহার করেন; কখনও ভক্ত-চক্ষু তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে পরিপূর্ণা ভক্তি প্রত্যক্ষমূলিকা; সুতরাং অপ্রত্যক্ষ নিরাকার বস্তু আলম্বন করিয়া তাহার আবির্ভাব অত্যন্ত সুকঠিন বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যখন ভক্ত প্রভুর দর্শন করিয়া এবং তদীয় ভক্তিসুধা পানে বিভোর হইয়া মানবজন্ম সফল করিতে পারে না, তখন তাঁহাকে ভক্তপ্রাণ বা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কিরূপে বলা যাইতে পারে? যাঁহার দৃদৃক্ষা ভক্তকে নিশিদিন ব্যাকুল করিতে থাকে, তিনি যদি দর্শন দানে অসমর্থ হয়েন, তবে তাঁহার শরণ লইয়া ভক্ত কি করিবে, এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তের শান্তি সুখ কিরূপে হইবে? কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার ও চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া সতী বা কুমারীর পবিত্র মুখ দেখিলেই কি কৃতার্থ হইতে পারা যায়, না ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হইয়া নিজের বা জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে? ক্রমশঃ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

বর্ষার নদী।

ঢেউ তুলি তালে তালে, আবিল বরষা-জল;
সাগর-সঙ্গমে ধায়, ভরা গাঙ্গে অবিরল।
আকাশ জলদে ঢাকা, নদীতে এসেছে 'ধল,';
ধীবর ঘিরিছে জালে, চলন্ত শেয়ালাদল।
নলবনে বেনা ঝোপে, বরষা এসেছে থলে,—
লুকায়ে মাছের লোভে, ধীবর ভিজিছে জলে।
ঝাঁকে ঝাঁকে নদী-বুকে, গাঙ-চিল উড়ে কত;
ডাহুক ডাহুকী স্রোতে, ভাসে না'ক অবিরত।
উর্ম্মির আঘাতে ভাঙ্গে, দুধারে তটিনী কূল;
আকণ্ঠ ডুবায়ে হাসে, ভাঙা তটে উলু ফুল।
পিচ্ছিল নদীর পাড়,—কলসী নিতম্ব পরে,—
অঙ্গনা নামিছে ঘাটে, হাতে হাত ধরে ধরে।
কল কল চল চল, ঘোলা জল বয়ে যায়;—
রাখাল উজুই মারে, বসি নদী কিনারায়।
ভাঙ্গা নায় উঠি জেলে, হাতে তুলি ভাজা বটে,
গোণে মাছ পড়ে বড়—শুনে তাড়াতাড়ি ছোটে।
কোথাও তরঙ্গ দেখি, কাঁদে ভাড়াটিয়াগণে;
তরণী ভিড়িতে মাঝি ঝিঁকা মারে প্রাণপণে।
আজি বুঝি রথযাত্রা, কদম্বের ফুল হাতে—
পাড়াগেঁয়ে ছেলে যায়, দিদিমার সাথে সাথে।
রথ রচি কোথা কেহ, ফুটন্ত কদম্ব ফুলে,—
নদীতে দিয়াছে ছাড়ি, ভাসিতেছে কূলে কূলে।
এপার ভাঙন ধরা, ভাঙিতেছে ঢেউ লেগে;
ওপারে নাবাল চরে, পাটগাছ আছে জেগে।
আজি বুঝি তটিনীর যৌবন এসেছে ফিরে;
বাঁশ গাছ ঘনঝাউ চুমিতেছে ধীরে ধীরে!
ভীম তরু চল দলে, সুখে করি প্রেম দান,
খরস্রোতে সেবি পদ অকালে দিতেছে টান।
ইছামতি! এ মিনতি, দূরে ফেলি প্রেম-ছল,
রসাতলে দিও নাক, বনজ এ তরুদল।
সাগর-সঙ্গিনী তুমি, সাগরে মেশগে ধীরে,
প্রেমলুব্ধ তরুপানে ফিরিয়া চেওনা তীরে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

REG. No. C. 280.

বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কি না ?

(১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে কিনা ?

(২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাসূত্র বিচলিত হয় কিনা ?

(৩) সর্ব্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা ?

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না—এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা ?

(৫) সর্ব্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতাবোধ ও জ্বালা করে কিনা ?

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা ?

(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের সূত্রপাত হইয়াছে কিনা ?

(৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও রাত্রে আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিনা ?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের মহা সুগন্ধি "কেশরঞ্জন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দুরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ।/• আনা। তিন শিশির মূল্য ২॥• আড়াই টাকা। মাশুলাদি ।৶• আনা।

অর্শোহর বটিকা।

অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শোহর বটিকা সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সুনিয়মের সহিত ব্যবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য-সভা।

PATRON : ‍পসর্গ

HIS HONOUR SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.—
Lieutenant-Governor, Bengal.

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE SIR HARBERT RISELEY, KT., C. I. E.—
Secy. Government of India.

A. EARLE, ESQ. I. C. S.—*Divisional Commissioner.*

PRESIDENT :

THE HON'BLE MR. JUSTICE SARADA CHARAN MITRA M. A., B. L.

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

১। সাহিত্য-সভার চাঁদা প্রভৃতি টাকাকড়ি মণিঅর্ডার আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

২। সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশ জন্য প্রবন্ধাদি আমার নামে ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে অথবা ১৫৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট নিউ বেঙ্গল প্রেসে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

৩। সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত চিঠি পত্র সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য-সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

[নব পর্য্যায়]

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

৮ম খণ্ড] ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন [৪র্থ-৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।

"কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ।

কলিকাতা।

১০৬।১ নং, গ্রে-ষ্ট্রীট, সাহিত্য সভা হইতে

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৬ সালের

শ্রাবণ হইতে আশ্বিন সংখ্যা "সাহিত্য-সংহিতার"

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজী প্রভৃতি দেশীয় নব্য- প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এব তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাবসমূহের লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্য প্রদান।

৫। উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্তৎ-উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

শ্রীচুণীলাল বসু।

সাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা পুস্তকালয়।—

প্রাতে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এখানে বসিয়া পাঠ করিবার জন্য ভাল চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি অনেকগুলি নূতন উপন্যাস ক্রয় করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পুস্তক ও উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাহিত্য সভার সভ্যগণকে এবং সর্ব্বসাধারণকে পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য—সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।—

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

লাইব্রেরীয়ান।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড। } ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন { ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃত-সংলাপ কাব্যম্।

প্রস্তাবঃ। (যতঃ সংলাপ কাব্যস্তোদয়ঃ)

১। অথৈকদা স উপাধ্যায়ঃ (যন্নাম স্থূলতং মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিতেষু তেষু তেষু গ্রন্থেষু, পরিচিতশ্চ য ইতঃপূর্ব্ব মনুকাব্যাদৌ,) গতে নক্তং (গতায়াং রাত্রৌ) স্বকীয় কর্ত্তব্য বিষয়া বধারণার্থং নিযুক্তায়াং নিরন্তর সহচর্য্যাং চিন্তা দেব্যাং স্বকার্য্যং সমাধায় প্রস্থিত বত্যামেব প্রসহ্য সমাক্রান্তঃ সুনিদ্রা দেব্যা, সুখ মতি পাতিত—নিশাবশেষঃ, সমাপিত-প্রাতঃ-কৃত্যঃ, শিরোমণি মঠা-পর নামধেয়াং স্বকীয়া রণ্য চতুষ্পাঠী মন্তরা নিজ নির্দ্দিষ্ট গৃহাভ্যন্তরা-বস্থিত সুনির্দ্দিষ্টাসন উপবিষ্টোঽস্তি। বৃত্তি-সংগ্রহার্থং া—ধ্যাপিতা—ন্তেবাসি সমুদায়ঃ। অস্মিন্ সময়ে সৈব সহচরী পুনরুপস্থিতা। স্বস্মিন্ সমর্পিত নির্ব্বাহ ভারস্থ কার্য্যস্যা নিরবশেষতয়া। মন্থরা (মন্দ মন্দ গমনা), ছলছলায়মান মুখ নয়না, শিথিলী ভূত-সর্ব্বাবয়বা।

তাং তথা ভূতাং বিলোক্য, দত্তা-সনঃ সমুচিত স্থল্যাং, প্রষ্টু মারব্ধবান্ স উপাধ্যায়ঃ।

অনুবাদ।

সংলাপ কাব্যের প্রস্তাব। যে প্রস্তাবে সংলাপ কাব্যের উদয় হইয়াছে।

১। অনন্তর একদিন সেই উপাধ্যায় (যাঁহার

নাম মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত গ্রন্থ মাত্রেই নিরন্তর সুখে গাভ করা যায়, যিনি ইহার পূর্ব্বে অণুকাব্য প্রভৃতিতে পরিচিত আছেন) বিগত নিশায় আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ? এই বিষয়ের অবধারণের জন্য তাঁহার নিয়ত সহচরী চিন্তাদেবীকে নিযুক্ত করেন। চিন্তা-দেবী তাঁহার সেই কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে না যাইতেই, তিনি সুনিদ্রা দেবী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হয়েন। সেই অবস্থাতেই সুখে নিশার অবশিষ্ট ভাগ অতিপাতিত হইল। পর দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া নামান্তরে শিরোমণি টোল আপন আরণ্য চতুষ্পাঠীর মধ্যে তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহের অভ্যন্তরে তাঁহার উপবেশনের নিমিত্ত যে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই আসনে তিনি উপবিষ্ট আছেন। ছাত্রেরা অধ্যয়ন কার্য্য সমাধা করিয়া বৃত্তি সংগ্রহের জন্য প্রস্থিত হইল। এই সময় তাঁহার সেই সহচরী (চিন্তাদেবী) পুনর্ব্বার তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। যে হেতুক পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তাঁহার উপর যে কার্য্যটির নির্ব্বাহ করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, সেই কার্য্যটি তিনি পূর্ব্বদিন রাত্রিতে শেষ করিতে পারেন নাই। চিন্তাদেবী মন্দ-মন্দ গমনে আসিতেছেন, তাঁহার মুখ চোখ ছল-ছল করিতেছে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই উপাধ্যায় তাঁহার বসিবার জন্য সমুচিত স্থানে আসন প্রদান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

(সংস্কৃতম্)

২। উপাধ্যায়ঃ—দেবি, কি মিতি ক্লান্তেব, সংলক্ষ্যতে তাবদদ্য ভবতী।

চিন্তাদেবী—নহি ক্লান্তেব, বস্তুতঃ ক্লান্তৈবাস্মি। তৎসমস্তং পশ্চাদভি ধীয়তে। তদভিধানাৎ পূর্ব্ব মন্যৎ কিঞ্চিদাবেদ্যতে। ভবতা য দেতর্হি অণুঃ মুতিঃ, নীতিঃ নির্ণীতিঃ,প্রমুতিঃ বিমুতিঃ, সূক্তিঃ ব্যক্তি শ্চেতি কাব্যাষ্টকং বিনির্ম্মিতং, সমর্পিতঞ্চ মে হস্তে। তৎ সর্ব্বংময়া সুষ্ঠু বিলোকিতং, বিচারিতঞ্চ যথা শক্তি। যদ্ বিচারিতং, তৎ সংক্ষেপেণ কিঞ্চিদ্ ভবতে নিবেদয়িতুমিষ্যতে, সমীচীনোঽসমীচীনো বাঽভূৎ মৎ-কৃতঃ স বিচার ইত্যবধারয়িতুম্। যদ্ ভবানেবাত্র প্রমাণম্। নহ্যা কালিক-স-বাতধারা সম্পাত ইব বিরক্তি মুৎমুদয়িষ্যামি। তেষাং প্রত্যেকং অভিধেয় মাত্রং বর্ণয়িষ্যতে। তৎপ্রতিপাদনার্থঞ্চ অণুকাব্যস্য প্রতিকাণ্ডং (তস্য সুবিস্তৃতত্বাৎ) অন্যেষাঞ্চ প্রত্যেক মেকৈকং শ্লোক মুদাহরিষ্যামীতি।

অনুবাদ।

২। উপাধ্যায় বলিতেছেন। দেবি, আপনাকে আজ এরূপ ক্লান্তার ন্যায় দেখিতেছি কেন ?

চিন্তা দেবী উত্তর দিতেছেন। ক্লান্তার ন্যায় নহে। আজ আমি বস্তুতঃই ক্লান্তা হইয়া পড়িয়াছি। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটা কথা নিবেদন করিতেছি। আপনি যে সম্প্রতি, অণু, মুতি, নীতি নির্ণীতি, প্রমুতি বিমুতি, সূক্তি ও ব্যক্তি এই আট-খানি কাব্য রচনা করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সে সবগুলিই আমি খুব ভালরূপে দেখিয়াছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার যেরূপ শক্তি সেরূপ বিচারও করিয়াছি। যেরূপ বিচার করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আপনার কাছে কিছু

নিবেদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কাব্য কয়েক-খানি সম্বন্ধে আমার কৃত সমালোচনাটা কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত হইল, ইহার একতরের সুনিশ্চয়ের জন্য, যে হেতুক এ বিষয়ে (সঙ্গত বা অসঙ্গত এই দুইএর একতর নিশ্চয়ে) আপনিই একমাত্র প্রমাণ। (আপনি চিন্তিত হইবেন না) আমি অসময়ের (পৌষ মাঘ মাসের) ঝড় বাদলের মত আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিব না। কেবল এই কাব্য কয়েকখানি প্রত্যেকে কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাই মাত্র বর্ণন করিব। আর আমার বর্ণিত বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার জন্য অণু কাব্যখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া তাহার প্রত্যেক কাণ্ডের এবং অন্যান্য কাব্যগুলির প্রত্যেকের এক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

সংস্কৃতম্।

৩। এতদভিদধানৈব চিন্তাদেবী উপাধ্যায়ং সম্বোধ্যেদং জিজ্ঞাসিতবতী।

চিন্তাদেবী—অচ্ছম্। মনীষিন্, ভবতো যদেতদণু-কাব্যম্। ইদন্ত্বেকং বিশালং কাব্যম্। পঞ্চকাণ্ডী। ত্রিংশদধ্যায়ী। এক মেবেদং ত্রিংশৎ খণ্ড কাব্যানি। কিন্তু নামকৃত মস্যাণু কাব্যমিতি।

কিমেতৎ—যাদৃক্ সময় উপাগা
দণুরপি গিরি রিত্যুদীর্য্যতে লোকৈঃ!
ভবতা কিংনাম, কিমুত
গিরিরয় মাখ্যায়তেঽণুরিতি॥

নহি বস্তনুরূপ মেত ন্নামধেয়ম্। পর পীযূষ সিন্ধু বিশুদ্ধ হেম-গিরি, মহামণি-খণীত্যাদি রূপং কিমপি নামধেয় মস্য ভবিতুংযুক্ত মাসীদিত্যেব মহংমন্যে।

অনুবাদ।

৩।. এই কথা বলিতে বলিতেই চিন্তাদেবী উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া এই (নিম্নলিখিত) কথাটি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

চিন্তাদেবী—আচ্ছা বেশ। মহাশয়, আপনার যে এই অণু কাব্যখানি। এখানি তো দেখ্‌ছি একখানি বিশাল কাব্য। পাঁচ কাণ্ড। ত্রিশ অধ্যায়। এই একখানি কাব্যই তো ত্রিশখানি খণ্ড কাব্য। কিন্তু এর নাম রাখিয়াছেন কি? না, অণুকাব্য। এ কি রকম। যেরূপ কাল এসেছে, বস্তুতঃ যে অণু, তাকেই লোকে বল্‌ছে পাহাড়। আর আপনি কি না, এই পাহাড়টাকে বল্‌ছেন অণু। এ কি। এ নামটা আপনার বস্তুর অনুরূপ হয় নাই। পরম অমৃতের মহাসাগর, বিশুদ্ধ সুবর্ণের পর্ব্বত, মহামণির আকর। এইরূপ গোছের কোন একটা নাম রাখা এর উচিত ছিল। এমনি আমার মনে হয়।

সংস্কৃতম্।

৪। উপাধ্যায়ঃ—দেবি, অস্মিন্ মে প্রথমং বচএতৎ। অপরা পরাণাং মহাত্মনাং যাদৃশ্যঃ কৃতয়, স্তাভিঃ সমং তারতম্যে বিবেচয়িতব্যে অণুরেবায়ং মদীয়া কৃতি, স্তদযুক্ত মে বাস্য (কাব্যস্য) নামধেয় মণুরিতি। দ্বিতীয়ং বচঃ—পাঠ সৌকর্য্যায় পাঠকানাম্, অস্যাধ্যায়া আপেক্ষিকাঃ ক্ষুদ্রা ইতি নামাস্য কৃত মণু রিতি। তৃতীয়ং বচঃ—ময়া যৌবনে (যস্মিন্নহং নামোপরি বিশিষ্ট দৃষ্টি রাসং তস্মিন্) একং কাব্যং রচয়িতু মারব্ধম্। নাম চ দত্ত মস্য যথেষ্ট লম্বমান পরিণদ্ধম্। সর্ব্বার্থ-সংগ্রাহকং মহাকাব্যং কল্প বিটপীতি।

যোবদেব যাচিষ্যতে তম্। স তদেব প্রাপ্স্যতি (লপ্স্যতে) তস্মাদিতি তাদৃশ সংজ্ঞায়া স্তাৎপর্য্যম্। এবম্বিধার্থ স্তদ্বচঃ। (অধিকাংশ) সর্ব্ব মেব জ্ঞেয়ং বস্তু তত্রাংশতঃ স্থাস্যতীতি। (ততঃ কিমভূৎ) প্ররূঢ় বানসৌ (কল্প বিটপী) স্থৌল্যেন। (তদা ময়া কিংকৃতম্) বিরচিত-তলঃ সময়া দ্বিসহস্র সংখ্যক শ্লোক রূপৈ-রুর্ব্বর-মৃৎখণ্ডৈঃ। (ততঃ) অহহ প্ররূঢ়বানপি কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধকাৎ (মদীয় দুর্ভাগ্যবশাদ্, দারিদ্র্য নিবন্ধন-পরিপীড়িত পরিবারবর্গ পরিপোষণার্থ তাদৃশ ভীষণ চিন্তা বশাৎ, তাদৃশ শক্তে রভাবাদ্বা) পুনর্ন প্রাপ্ত-বৃদ্ধিঃ। দেবি, কি মন্যদধিকং বাচ্যম্। স্বইহ তদবস্থএব বিশুষ্কতাং গতঃ স মে কল্প বিটপীতি খিন্ন-মনসা অণুরিত্যা খ্যাপিত মেতন্মেহণু কাব্যম্। শেষং বচো ভবতীদম্। নাম যাবৎ ক্ষুদ্রং ভবেৎ, তাবদেব সাধু। নাম্নঃ ক্ষুদ্রত্ব মেব প্রার্থনীয়ম্।

বিদ্যা বিন্দু-বিহীনস্য, বিদ্যা-সিন্ধু রিতিশ্রুতি, রিত্যেতৎ কিং পুনঃ সুযুক্ত মিতি। যা ইমা স্মৃতি নীতি নির্ণীতি প্রভৃতয়ঃ। সন্ত্যপ্যাসাং প্রত্যেকং প্রতিপাদ্য বিষয়া বগতয়ে একৈকস্মিন্নসাধারণে নামনি এতাসা মপি সাধারণং নাম কণ ইতি। অত আরভ্য (ইতঃ প্রভৃতিঃ) এতা অপি প্রথম কণঃ, দ্বিতীয় কণ ইত্যেবং রীত্যা ত্বয়া ভিধেয়া ইতি।

অনুবাদ।

৪। উপাধ্যায় বলিলেন। দেবি, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা হচ্চে এই। অপর অপর মহাত্মা দিগের যেরূপ কৃতি সকল দেখা যায়, সেই সকল কৃতির (কার্য্যের) সহিত আমার এই কৃতির যদি তারতম্য বিবেচনা করিতে হয়, অর্থাৎ তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার এই কৃতি (কৃতবস্তু) বস্তুতঃই অণু। সুতরাং ইহার যে নাম রাখা হইয়াছে "অণু"। তাহা ঠিকই হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা। পাঠকদিগের পরিবার সুবিধার জন্য ইহার অধ্যায় গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করা হইয়াছে, ইহার "অণু" নাম রাখিবার এ, ও একটি অন্যতম কারণ। তৃতীয় কথা। আমি যৌবনকালে (যে সময় আমার নামের উপর খুব দৃষ্টি ছিল, সেই সময়ে) একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলাম, এবং কাব্য খানির নামও রাখিয়াছিলাম খুব লম্বা চওড়া। সর্ব্বার্থ সংগ্রাহক (সংগৃহীত-সর্ব্বার্থ), মহাকাব্য, কল্প-বিটপী। "কল্পবিটপী" এইরূপ নাম দিবার তাৎপর্য্য হচ্চে এই। এই কাব্যখানির নিকট যে, যে বস্তু চাহিবে, সে সেই বস্তুই ইহার নিকট হইতে পাইবে। এ কথার অর্থ হচ্চে এই। সর্ব্বপ্রকার (অধিকাংশ) জ্ঞাতব্য বস্তুই ইহাতে কিছু কিছু থাকিবে এই। (বেশ, তারপরে কি হ'লো) আমার ঐ কল্পবিটপী খুব স্থূলতার সহিত (মন লইয়া) প্ররূঢ় (উর্দ্ধ ভেদ করিয়া উত্থিত) হইল। (আমি তখন কি করিলাম,) আমি তখন তাহাকে দৃঢ়মূল করিবার আশয়ে দুই হাজার শ্লোক রূপ সর্ব্ববিধ শস্যোপযোগী মৃৎখণ্ড দ্বারা তাহার তলা নির্ম্মাণ করিয়া দিলাম। (তারপর) আহা, আমার সেই কল্পবিটপী প্ররূঢ় হইয়াও, কি, জানি, কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ (আমার দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক, আর দারিদ্র্য পরিপীড়িত পরিবার বর্গের পরিপোষণ নিমিত্ত সেই ভীষণ চিন্তা বশতঃই হউক, আর, সেইরূপ সামর্থ্যের অভাব বশতঃই

হউক্) আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না (বাড়িল না)। দেবি, আর, অধিক কি বলিব, আহা সেই অবস্থাতেই আমার সেই কল্পবিটপী শুকাইয়া গেল। সেই মনের আক্ষেপে আমার এই গ্রন্থের নাম রাখিয়াছি "অণু। শেষ কথাটা হচ্চে এই। নামটা যত ক্ষুদ্র হয়। ততই ভাল। নামের ক্ষুদ্রত্বই হচ্চে প্রার্থনীয়।

পেটে নেই বিদ্যের বিন্দু।
(আর) নাম হ'লো বিদ্যে সিন্ধু॥

এটা কি, আর বড় ভাল। আমার এই যে, স্মৃতি নীতি নির্ণীতি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি, ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবগতির জন্য প্রত্যেকের এক একটি (স্মৃতি নীতি ইত্যাদি অসাধারণ নাম থাকিলেও, ইহাদেরও সাধারণ নাম "কণ"। আজ হইতে এইগুলিকেও আপনি প্রথম কণ, দ্বিতীয় কণ তৃতীয় কণ ইত্যাদি রূপ নামে ব্যবহার করিবেন।

সংস্কৃতম্।

৫। চিন্তাদেবী—যুক্তভাষিন্, শেষংবচ ইদং, যদ্ভিহিতংভবতা, "নাম্নঃক্ষুদ্রত্বমেব প্রার্থনীয় মিতি।" তদ্ যদতি সত্যং, তৎ সহস্র কৃত্বঃ স্বীক্রিয়তে ময়া। কিন্তু (তস্য সত্যত্বে) সতি ভবেৎকিম্।

বস্তুনো গুণ দোষাভ্যাং, কত্যেবং জ্ঞাতু মীশতে।
ইদংরম্য মরম্যং বা নাম্নৈব জ্ঞায়তেঽখিলৈ॥

ব্রিতাতোঽভিহিতংময়া। নামাপ্য কিঞ্চিন্মহদ্ ভবিতুংযুক্তমাসী দিতি। অস্তম্। যচ্ছোভনতয়া মন্যতেভবতা, ত দেবা স্থিতি নিগদ্যৈব পুনরাহ।

অনুবাদ।

৫। চিন্তাদেবী বলিতেছেন। প্রকৃত বাদিন্, এই যে শেষ কথাটা, যা আপনি বলিলেন। যে নামের ক্ষুদ্রত্বই বাঞ্ছনীয়। এ কথাটা যে অতি সত্য তা আমি হাজার বার স্বীকার করি। কিন্তু তা হ'লে হবে কি। বস্তুর দোষ গুণ দেখে, এটা ভাল, এটা মন্দ, ইহা স্থির করিতে পারে, এরূপ লোক পৃথিবীতে ক'টা আছে। এটা ভাল, এটা মন্দ প্রায় নাম দেখেই সবাই ঠিক করে। তাই বল্‌তেছিলেম, নামটা একটু এর বড় রকমের হ'লে ভাল হইত। আচ্ছা। আপনি যাহা ভাল ব'লে বিবেচনা করেন্। তাই থাকুক্। এই বলিয়াই পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।

সংস্কৃতম্।

৬। চিন্তাদেবী—অহ মিদানীং প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্তা স্মি। অর্থাদ্ যৎপ্রস্তাবিতংময়া ভবৎ-সন্নিধৌ মদ্ধস্তে নিক্ষিপ্ত মণু প্রভৃতিকং কাব্যাষ্টকংময়া সংক্ষেপেণ সমালোচয়িতব্য মিতি তত্রৈব প্রবৃত্তা স্মীতি। অন্যমনা মাভূৎ। কিঞ্চিন্মনোযোগেন সহ শ্রাব্য মিদং মদ্ বাক্যবৃন্দম্। ভবাদৃশানেব শ্রাবয়িতুং জাতৈতাব দৌৎসুক্যাহং, নহি হা কৃষকান্। যতঃ—

প্রশংসিতা অপি পরৈ, র্ব্যর্থ-জন্মান এবতে।
মণয়ো রমণীভিশ্চেৎ, কণ্ঠে ন বিধৃতা স্তু যেতি॥

অনুবাদ।

চিন্তাদেবী বলিতেছেন। আমি এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্তা হইতেছি। অর্থাৎ আমি আপনার নিকট 'যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে, অণু প্রভৃতি এই যে কয়েকখানি কাব্য আমার হাতে ফেলাইয়া দিয়াছেন, আমি সংক্ষেপে সেইগুলির সমালোচনা

়রিব। সেই বিষয়েই প্রবৃত্তা হইলাম। আপনি অন্তমনস্ক হইবেন না। একটুকু মনোযোগের সহিত আমার কথা ক'টা শুনিবেন। আপনাদের মত লোককেই শুনাইবার জন্ম আমার এতখানি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। হাটের চাষা দিগকে শুনাইবার জন্ম নয়। অজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেও সেই সকল বাণির জন্ম বৃথা। যদি সুন্দরী সমূহ যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ না করেন্।

সংস্কৃতম্।

৭। চিন্তাদেবী—যৎ কাব্যাষ্টকং মহ্য মর্পিতম্। তত্রাসৌ বিহঙ্গমাদি (বিহঙ্গমান্তে-বাসি-মহীপতি-সামাজিক) কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলেন বহবো জ্ঞাতব্য বিষয়া বর্ণিতাঃ। তত্রাপি প্রথম কাণ্ডে বিহঙ্গমীয়ে (অষ্টভিরধ্যায়ৈঃ পরিসমাপ্তে) বিহঙ্গম কৃত রব নিবহং প্রশ্নত্বেন পরিকল্প্য তৎ প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলেন বহুশঃ সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়া মীমাংসিতাঃ।

যথা—বিহঙ্গমৈঃ কৃতং, কোরুক্, কোরুক্, কোরু
গিত্যাকারক শব্দং, কোঽরুক্, কো রোগ
বিহীন ইত্যেতাদৃশার্থ পরিকল্পনয়া
প্রশ্নত্বেন পরিকল্প, যুক্তিবলং শাস্ত্র
বলঞ্চাশ্রিত্য ত মুত্তরয়তি মহর্ষিরাত্রেয়ঃ।

"গীতি চ্ছন্দঃ।"

অবহুল সুদীর্ঘ চিন্তঃ,
পরিচাল্যান্তে যথাবদঙ্গাণি।
যথা ন দুঃখং ভুঙ্ক্তে,
খগেশ হে, সোঽরুক্, সোঽরুক্, সোঽরু
গিত্যাদয়ঃ॥

অনেন শ্লোকেন—অযথা বন্মস্তিষ্ক পরিচালনশ্চ, অযথা বদিন্দ্রিয় পরিচালনশ্চ, অযথা বদ্ ভোজনঞ্চ বা যথাযথং প্রায়শঃ সর্ব্বেষা মেব রোগাণাং হেতুভূতয়া, তদ্রহিতো যঃ স সর্ব্ববিধ রোগ বিহীন ইত্যুত্তর প্রদানচ্ছলেন। উক্ত মেতৎত্রয়ং ত্যাজ্যং সর্ব্বৈ নৈর্ুক্‌জ্য কামিভি রিতুপদিষ্টম্॥

অনুবাদ।

৭। চিন্তাদেবী বলিতেছেন—যে কাব্য কয়েক-খানি আমাকে দিয়াছেন, তাহার মধ্যে অণু নামে যে কাব্য খানি, তাহাতে বিহঙ্গমাদি (বিহঙ্গম, অন্তেবাসী, মহীপতি ও সামাজিক দিগের) কৃত প্রশ্ন সমূহের প্রত্যুত্তর প্রদানছলে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে! প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান ছল মাত্র। জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের বর্ণন করাই উদ্দেশ্য। তাহার মধ্যেও আবার তাহার যে প্রথম কাণ্ড, তাহার নাম বিহঙ্গমীয় কাণ্ড। আট অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। তাহাতে বিহঙ্গমগণকৃত রবগুলিকে প্রশ্নরূপে কল্পনা করত, তাহাদের (সেই প্রশ্নগুলির) প্রত্যুত্তর প্রদান ছলে অনেক অনেক সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের মীমাংসা করা হইয়াছে।

যেমন। কতকগুলি বিহঙ্গম (পক্ষী) "কোরুক্, কোরুক্ কোরুক্" এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহা-দের ঐ শব্দ গুলির অর্থ—কোঽরুক্, অর্থাৎ রোগ বিহীনকে, এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া, পক্ষিগণ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—যে, হে আয়ুর্ব্বেদা-ভিজ্ঞ মহর্ষিগণ পৃথিবীতে রোগ বিহীন হইতে পারে কে? ঐ শব্দ গুলিকে এইরূপ প্রশ্ন রূপে কল্পনা করিয়া—যুক্তিবল ও শাস্ত্রবল অবলম্বন করিয়া

মহর্ষি আত্রেয় (চরক সংহিতার আদি বক্তা) উত্তর দিতেছেন।

শ্লোক। এই শ্লোকটি গীতিছন্দে (আর্য্যাবিশেষ) বিরচিত। অ—বহুল সুদীর্ঘ-চিন্ত ইত্যাদি। উল্লিখিত।

ব্যাখ্যা। সমস্ত রোগই প্রায় ত্রিবিধ কারণে জন্মিয়া থাকে। কতকগুলি রোগ (শিরঃপীড়াদি) অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনে, কতক গুলি রোগ (নেত্র রোগাদি) চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অযথাবৎ নিয়োগে, কতগুলি বা (উদরাময়াদি বা সর্ব্ববিধ রোগ) আহারের দোষে জন্মিয়া থাকে। তাই মহর্ষি আত্রেয় উত্তর দিতেছেন। হে পক্ষিরাজ, যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ চিন্তা বহু পরিমাণে না করে, এবং আপন ইন্দ্রিয় সকলকে যে রূপ ভাবে পরিচালিত করা উচিত, সেইরূপে পরিচালিত করে, এবং এইরূপ ভোজন করে, যাহাতে কোন রূপ দুঃখ বোধ না হয়। হে হে পক্ষিরাজ, সেই ব্যক্তিই যাবজ্জীবন নীরোগ হইতে পারে। যাহা বলিলাম। তাহা স্থির। সে নীরোগ। নীরোগ। নীরোগ।

ইন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি (হাত) পাদ, পায়ু (মল দার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

অযথাবৎ নিয়োগ—যথাবিধি নিয়োগের অভাব। অতিযোগ, অযোগ, ও মিথ্যা যোগ এই তিন প্রকারে তাহা ঘটিয়া থাকে।

আহারের দোষ বহুপ্রকারে হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভোজন, অভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, গুরুতর ভোজন, লঘুতর ভোজন অজীর্ণে—ভোজন ইত্যাদি।

শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুকাব্যের প্রথম কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি দ্বারা—অযথাবৎ মস্তিষ্ক পরিচালন অযথাবৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন, অথবা অযথা বদ্ ভোজন, যেখানে যেমন, এই তিন টি প্রায় সকল প্রকার রোগের হেতু। অর্থাৎ শিরোরোগে—অযথাবৎ মস্তিষ্ক পরিচালন, ইন্দ্রিয় গত রোগে—অযথাবৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন, উদরাময়াদি অথবা সর্ব্ববিধ রোগে অযথাবৎ ভোজন। এই হেতুক যে ব্যক্তি এই ত্রিবিধ কারণ বিহীন হইতে পারে সেই ব্যক্তিই রোগ বিহীন হইতে পারে, এইরূপ উত্তর প্রদান চ্ছলে. যাঁহারা নৈরুজ্য কামী। অর্থাৎ যাঁহারা আপনাকে নীরোগ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বর্ণিত, রোগের এই তিনটি নিদান (আদিকারণ) কে, যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

সাধারণের প্রতি এইরূপ উপদেশে দেওয়া হইয়াছে। ইতি—

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য-
শিরোমণি
(নবদ্বীপ)

ক্রমশঃ

মহাভারতীয়

সারল

বিরাট পর্ব্ব।

শ্লোক।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী সরস্বতীং ব্যাস ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

অস্যার্থ।

নারায়ন নরোত্তম নর ভারতীকে।
ব্যাসদেবে প্রণমিয়া জয় কীর্ত্তনীবে॥

পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা।

পয়ার।

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে প্রপিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহি লুকাইয়া।
এক সম্বৎসর বঞ্চে কেমন করিয়া॥
কিরূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন।
কোন নামে কোনরূপে রহে কোন জন॥
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার।
দুর্য্যোধন দুষ্টমতি বড় দুরাচার॥
মুণি বলে জন্মেজয় শুন সাবধানে।
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ ভাই আছেন কাননে॥
অনেক ব্রাহ্মণ আছে করিয়া বেষ্টিত।
আপনি আছেন মুণি ধৌম্য পুরোহিত॥
এ সকলে লৈয়া রাজা অরণ্য ভিতর।
বলেন হইল অন্ত দ্বাদশ বৎসর॥
অজ্ঞাত বঞ্চিব যাহা পূর্ব্বের উত্তর।
জ্ঞাত হৈলে পুনঃ যাব অরণ্য ভিতর॥
দ্বাদশ বৎসর মোরা রহিব বিপিনে।
একবর্ষ অজ্ঞাতে বঞ্চিব ছয়জনে॥
অজ্ঞাত বৎসর যদি বিদিত হইব।
দ্বাদশ বৎসর পুনঃ অরণ্যে যাইব॥
হেন সত্য করিয়াছি সভার সাক্ষাতে।
বনবাস পূর্ণ কালি হইবে প্রভাতে॥
দ্বাদশ বৎসর কালি গত সে হইবে।
ইহার উপায় চিন্ত কোথায় রহিবে॥
একদেশে একত্রে বঞ্চিব ছয় জনে।
পাণ্ডব বলিয়া যেন কেহ নাহি জানে॥
ইহার বিধান সবে করহ ত্বরিত।
সর্ব্বনাশ হইবেক হইলে বিদিত॥
এত বলি মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িল ভূতলে।
ভ্রাতৃগণ তুলিয়া প্রবোধ বাক্য বলে॥
ধৈর্য্য হও নরপতি না কর চিন্তন।
সুখ দুঃখ সংসারেতে ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র উপায়ে পাইল নিজরাজ্য।
তেমতি পাইবে তুমি মনে হও ধৈর্য্য॥

এতবলি শান্তাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে।
আশীষ করিয়া মুনিগণ গেলা ঘরে॥
যত মুনিগণ সব হইলে বিদায়।
ভ্রাতৃগণ সহিত বসিয়া ধর্ম্মরায়॥
কহ ভাই অজ্ঞাত বঞ্চিব কোন দেশে।
কেমনে বঞ্চিব কাল গোঙাইব কিসে॥
শুনিয়া রাজার বাক্য কহে বৃকোদর।
তোমার অপেক্ষা রাজা আর গাণ্ডীবীর॥
নকুল ও সহদেবে শিশু মতি দেখি।
দোঁহাকার মুখ দেখি সদা ঝুরে আঁখি॥
আমার বিক্রম রাজা খ্যাত চরাচর।
কোনজন যুঝিবেক সঙ্গেতে মোহর॥
সিংহের সদৃশ হয়ে বিক্রমে বিশাল।
তোমা হৈতে সিংহ হৈয়া হৈয়াছি শৃগাল॥
কিন্তু তব আদেশ পালিব দুঃখে সুখে।
ইহার উচিত শাস্তি দিব যে কুরুকে॥
তের বর্ষ গতে হবে যাহা আছে মনে।
সম্প্রতি অজ্ঞাত বর্ষ বঞ্চি কোন গ্রামে॥
কোথায় রহিব সবে কহ এই বেলা।
সহিতে না হয় যেন উদরের জ্বালা॥
গুপ্ত বেশে থাকি যেন ভরয়ে উদর।
কালক্ষেপ করি রাজা অজ্ঞাত বৎসর॥
এত শুনি কহে পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
শুন রাজা একে একে দেশ নাম বলি॥
যত দেশ নাম বলি দেখেছি শুনেছি।
তার মধ্যে যেই দেশে হয় তব রুচি॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ আদি করি।
শূরসেন সিন্ধুদেশ আর চেদীপুরী॥
মগধ বিদর্ভ আর পাঞ্চাল নগর।
অবন্তী দ্বারকা পুরী আর কাশীপুর॥
কর্ণ ভোজপুরী আর অযোধ্যা কোশল
শ্রেণীবন্ত দেশ আর রোহিত মণ্ডল॥
সুদেব রাজার রাজ্য অতি মনোরম।
নররাষ্ট্র পট্টজ্বর নগর দশার্ণ॥
আর মৎস্য দেশ তথা বিরাট নৃপতি।
তথায় রহিব যদি লয় তব মতি॥
এ সকল মনোরম রাজ্য নরনাথ।
আজ্ঞা কর কোন দেশে বঞ্চিব অজ্ঞাত॥
যে দেশে রুচিবে মন বঞ্চিব সে দেশে।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির কহে মৃদুভাষে॥
একে একে শুনিলাম নৃপগণ ধাম।
কিন্তু সে বিরাট রাজা বড় দয়াবান॥
পরম ধার্ম্মিক হয় মৎস্য অধিপতি।
নিশ্চয় অজ্ঞাত কাল বঞ্চি মোর মতি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শাস্ত্র জ্ঞান আছে।
ধর্ম্মবন্ত জ্ঞানবন্ত রব তার কাছে॥
তথায় আমার মন রহিতে রুচিল।
কোন বৃত্তি কিরূপে বঞ্চিবে তথা বল॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ধর্ম্ম নরশনি।
করিবে কিরূপ কর্ম্ম তার রাজ্য তুমি॥
কোন কর্ম্মে স্বচ্ছন্দে বিরাট নগরেতে।
বিহরণ করিতে পারিবে নরপতে॥
কারণ আপনি মৃদুস্বভাব বদান্য।
লজ্জাশীল সত্যবাদী ধার্ম্মিক প্রধান॥
এক্ষণে বিপদে পড়ি কি করিবে কি কর্ম্ম।
সাগর অম্বরাধরাপতি তুমি ধর্ম্ম॥

সামান্য জনের ন্যায় কষ্ট দুঃখ করা।
তোমার অভ্যাস নাহি আমি জানি পারা॥
রাজা বলে শুন আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট সভাতে॥
কঙ্ক নাম বলাইব পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্ব নীত॥
মণি রত্নগণের জানিয়ে আমি মূল্য।
আমি হই যুধিষ্ঠির-সখা প্রাণতুল্য॥
শাস্ত্র কথা কহিব তুষিব নরবরে।
এরূপে বঞ্চিব আমি বিরাট নগরে॥
ভীমে চাহি কহিতে লাগিল নরনাথ।
কহ ভাই কোনরূপে বঞ্চিবে অজ্ঞাত॥
পদ্ম পুষ্প হেতু গন্ধ মাদন পর্ব্বতে।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মৈল যাহার ক্রোধেতে॥
হিড়িম্বকবক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
মারি নিষ্কণ্টক কৈলে সাগর অবধি॥
কিরূপে বঞ্চিবে তুমি বিরাট নগরে।
এতশুনি ভীমসেন কহে যোড় করে॥
বল্লব নামেতে আমি হব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার॥
বিশেষে আমার তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে॥
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ আর মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ছিলাম সূপকার।
এতবলি পরিচয় দিব আপনার॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহে ওরে বৃকোদর।
কি কর্ম্ম করিবে এই পার্থ মহাবীর॥

খাণ্ডব গহন দহনের অভিলাষে।
সর্ব্বভুক হুতাশন আসি বিপ্রবেশে॥
মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু আর
কৃষ্ণ সখা নরবর কুরু নন্দনের॥
সাহায্য প্রার্থনা ভাই করিয়াছিলেন।
সে সর্ব্ববিজয়ী পার্থ করিবে কি কর্ম্ম॥
খাণ্ডববনের যেই হৈয়া সন্নিহিত।
একমাত্র রথ আরোহনেতে পন্নগ॥
রাক্ষস নিকরে আরো নিপাতিত করে।
দাবপাবকের তৃপ্তি সংসাধন করে॥
নাগরাজ অনন্তের কন্যা হরে যেই।
প্রতি যোদ্ধাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় যেই॥
কি কর্ম্ম করিবে সেই পাণ্ডব অর্জ্জুন।
যেমন প্রতাপশালী মধ্যে বিকর্ত্তন॥
সর্পমধ্যে আশী বিষ নরমধ্যে দ্বিজ।
তেজস্বি মধ্যেতে অগ্নি আয়ুধেতে বজ্র॥
গোমধ্যে বৃষও হ্রদ মধ্যেতে সমুদ্র।
মেঘমধ্যে পর্জ্জন্য নাগেতে ধৃতরাষ্ট্র॥
হস্তি মধ্যে ঐরাবৎ প্রিয়মধ্যে পুত্র।
সুহৃদেতে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমা যেইমত॥
সেইরূপ যাবতীয় ধনুর্দ্ধারী মধ্যে।
যুবাচূড়ামকেশ শ্রেষ্ঠ ভারত মধ্যেতে॥
যেই বীর বাসব ও বাসুদেব সম।
শ্বেতাশ্ব গাণ্ডিব ধন্বা করিবে কি কর্ম্ম॥
ইন্দ্রপুরে যেই পঞ্চবর্ষ বাস ক'রে।
উদ্ভাসমান সেই দেবরূপ ধরে॥
নিজ বীর্য্যবলে সেই নরের অসাধ্য।
অস্ত্র যোগ শিক্ষাকরে লভে দিব্য অস্ত্র॥

আমি সে পার্থকে রুদ্র মধ্যেতে দ্বাদশ।
বসুমধ্যে নবম আদিতে এয়োদশ॥
গ্রহমধ্যে দশম বলিয়া করি বোধ।
দীর্ঘবাহু যুগল যাহার তুল্য রূপ॥
কার্য্যকারী হও যায় জ্যাঘাতে নিয়ত।
দৃঢ় চর্ম্ম হইয়াছে বৃষস্কন্ধবৎ॥
শৈলমধ্যে হিমালয় ন্যায় যেই বীর।
জলাশয় মধ্যে সেই সমুদ্র সোসর॥
দেবমধ্যে বজ্রপানী পুরন্দর সম।
বসুগণ মধ্যে হব্যবাহের সমান॥
মৃগযূথ মধ্যে সেই সমান পঞ্চাস্য।
বিহঙ্গ বর্গের মধ্যে গরুড় সদৃশ॥
যিনি যত যোদ্ধাবর্গ মধ্যেতে প্রধান।
সেই মহাবীর পার্থ করিবে কি কর্ম্ম॥
কহ ভাই ধনঞ্জয় আমার সমীপে।
অজ্ঞাত বঞ্চিবে তুমি বল কোনরূপে॥
পরাক্রমে অপ্রমিত কৃষ্ণের সমান।
কৃষ্ণসখা বলি কৃষ্ণসম রূপ-গুণ॥
দুই হাতে ধনুর্জ্যা ঘর্ষণ চিহ্ন আছে।
কিরূপে লুকাবে ভাই বিদিত হয় পাছে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন কহে করি পুটপানি।
মোর অর্থে কিছু না ভাবিহ নরমণি॥
যেরূপে অজ্ঞাত বঞ্চি শুন নররায়।
নপুংসক বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়॥
দুই বাহু লুকাইব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
স্ত্রীর বেশে কুণ্ডল পরিব দুই কাণে॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে এই দিব পরিচয়।
এতদিন ছিনু আমি পাণ্ডব আলয়॥
তার ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর বালা।
এই বৃত্তিজীবি আমি জানি নানা কলা॥
নৃত্য গীত তাল বাদ্য আমি জানি ভাল।
উত্তরাদি কন্যা তার আছে মহীপাল॥
বিরাট-প্রধানা কন্যা উত্তরা সুন্দরী।
নৃত্য গীত তাল বিদ্যা শিখাব সত্বরি॥
বৃহন্নলা নাম ধরি ক্লীবত্ব হইব।
এইরূপে অজ্ঞাতবৎসর গোঙাইব॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসে অর্জ্জুনে।
হেন দেহ ক্লীবরূপ হইবে কেমনে॥
পার্থ কহে উর্ব্বসীর শাপ আছে মোরে।
নপুংসক হব আমি অজ্ঞাত বৎসরে।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র আনন্দ অন্তরে।
নকুলে ডাকিয়া রাজা কন মৃদুস্বরে॥
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় সদা পালিত আমার॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর।
ভ্রাতৃগণ প্রাণ তুল্য গুনের সাগর॥
নকুল বলেন রাজা কর অবধান।
বিরাট রাজার বহু আছে অশ্বগণ॥
এই পরিচয় দিব নৃপতির স্থান।
অশ্ব-বৈদ্য হই আমি দাসগ্রন্থী নাম॥
অশ্ব চিকিৎসক নাহি আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা আমি জানি অনুপাম॥
কড়িয়ালী যেই অশ্ব মুখে দিয়ে দানে।
দুষ্টভাব রোগ শোক অশ্ব নাহিজানে॥

অশ্ব বৈদ্য হইয়া বঞ্চিব কিছুকাল।
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল ভূপাল॥
কহ ভাই সহদেব মন্ত্রী চূড়ামনী।
বুদ্ধে বিজ্ঞ বৃহস্পতি তুল্য তোমাগনি॥
পারহ গনিতে তুমি ভূত ভবিষ্যত।
জননী কুন্তীর তুমি প্রিয়তম পুত্র॥
বুদ্ধির সাগর তুমি মহাজ্ঞানবান।
কোন বেশে লুকাবে বলাবে কোন নাম॥
মাদ্রীসুত সহদেব কহে মৃদুস্বরে।
শুন রাজা যেরূপে বঞ্চিব মৎস্যপুরে।
লোকমুখে এই কথা করেছি শ্রবণ।
বিরাট রাজার আছে অনেক গোধন॥
সম্বৎসর গোঙাইব হইয়া গোয়াল।
রাজারে বলিব মোর নাম তন্ত্রিপাল॥
আমার পালনে গাভী বহুবৃদ্ধি হয়।
শুনিয়া নৃপতি মোরে রাখিবে নিশ্চয়॥
এইরূপে অজ্ঞাত বঞ্চিব নরপতি।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হৈল হৃষ্টমতি॥
তবে রাজা দ্রৌপদীকে বলে ডাক দিয়া।
গদ গদ স্বরে কন কাতর হইয়া॥
কিরূপে কৃষ্ণা তুমি বঞ্চিবে অজ্ঞাত।
হায় হায় কি দশা করিল জগন্নাথ॥
রাজার নন্দিনী কৃষ্ণা রাজার মহিষী।
চরণ সেবিত কত শত রাজ-দাসী॥
স্বনির পুত্তলী অঙ্গ সুবর্ণ কমল।
পুষ্প মাল্য আভরণ গায়ে না সহল॥
স্ত্রীলোকের কর্ম্ম কৃষ্ণা কিছু নাহি জান।
কেমনে বঞ্চিবে তুমি হৈয়া পরাধীন॥

এতবলি যুধিষ্ঠির কান্দে শোকাকুলে।
কৃতাঞ্জলী হৈয়া কৃষ্ণা রাজা প্রতি বলে॥
না কর ভাবনা রাজা আমার লাগিয়া।
যেরূপে বঞ্চিব আমি শুন মন দিয়া॥
বিরাট রাজার যেই আছে পাটেশ্বরী।
সুদেষ্ণা তাহার নাম পরমা সুন্দরী॥
তার কাছে ছদ্মরূপে করিব বঞ্চন।
পুষ্পমাল্য গাঁথিব ঘষিব চন্দন॥
সৈরিন্ধ্রী বলিব নাম হব বেশকারী।
শুনিয়া রাখিবে মোরে বিরাটের নারী॥
এতেক বচন শুনি দ্রৌপদীর মুখে।
আনন্দিত হৈল বড় যুধিষ্ঠির ভূপে॥
দাস দাসী দ্রৌপদীর যতেক আছিল।
পঞ্চালে যাইতে যুধিষ্ঠির আজ্ঞা দিল॥
ইন্দ্রসেন সারথীকে বলিলা বারতা।
পথে কেহ জিজ্ঞাসিলে কহিবে একথা॥
নাজানি পাণ্ডবগণ গেল কোথাকারে।
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কান্তারে॥
সম্প্রতি হে ইন্দ্রসেন শুনহ ভারতী।
রথ লৈয়া দ্বারকায় যাহ শীঘ্রগতি॥
ধৌম্য পুরোহিতে চাহি কহিলে বচন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য তবে কৈল সমাপন॥
যাহ দেব কিছু দিন ছাড়িয়া মোসবে।
এক সম্বৎসর যদি বাঁচি কোন রূপে॥
প্রাণে যদি বেঁচে থাকি হবে দরশন।
নতুবা বিদাই হই মোরা ছয় জন॥
এতেক বলিলে নৃপ গদগদ স্বরে।
মধুর বচনে ধৌম্য কহে নৃপবরে॥

না কর বিষাদ রাজা স্থীর কর মন।
দুখে সুখে কর রাজা কালের হরণ॥
সকলের দুখ সুখ আছে নরপতি।
আমি কি বুঝাব তোমা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পৃথিবীতে অগ্নিসম তোমা পঞ্চজন।
সকলে তোমার শত্রু জানহ রাজন॥
সাবধানে তোমরা বঞ্চিবে কিছুকাল।
মিষ্টবাক্য বলিয়া তুষিবে মীহপাল॥
রাজাকে বিশ্বাস না করিবে কদাচন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন॥
সর্ব্বদা রাজার মন জোগাবে নৃমনি।
রাজা যাহা বলিবেন করিবে তখনি॥
সম্মুখে না দাণ্ডাইবে না রবে পশ্চাতে।
দুইপাশে দক্ষিনে কি রহিবে বামেতে॥
ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত।
নৃপতি করেন কর্ম্ম নিজ মনোমত॥
নৃপতির আজ্ঞাকারী হইবে সদাই।
ক্ষমাবন্ত হৈয়া রবে উগ্র হবে নাই॥
দেহে ক্লেশ সহি রবে না করিবে ক্রোধ।
ভ্রাতৃগণে নিবারিবে বলিয়া প্রবোধ॥
এইরূপে কাল কাটী এসহ কুশলে।
অবিলম্বে পাবে রাজ্য সম্বৎসর গেলে॥
এইরূপে বুঝাইয়া হিত উপদেশ।
পশ্চাতে গেলেন মুনি অতি হীন বেশ॥
এতশুনি উঠিলা পাণ্ডব পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন॥
অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যবন তেয়াগিয়া চলিলা ত্বরিত॥

যমুনা হইল পার অতি দুঃখ চিত্তে।
দশার্ণ রাজার দেশ রহিল বামেতে॥
দ্রুপদ রাজার রাজ্য রহিল দক্ষিণে।
শূর সেন দেশ দিয়া চলে ছয়জনে॥
পদব্রজে চলি যান হইয়া দুঃখিত।
মৎস্য দেশে যাইয়া হইল উপনীত॥
শ্রমযুক্তা যাজ্ঞসেনী না পারে চলিতে।
স্বামীগণ মুখ চাহি কহে যোড়হাতে॥
শুন ধর্ম্মনরপতি নিবেদন করি।
আজি নিশি বঞ্চ হেথা চলিতে না পারি॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোর আকুল জীবন।
বড়ই পীড়িত হৈনু না চলে চরন॥
নিকট হইল বিরাটের পুরীখান।
কালি প্রাতে যাব রাজা করহ বিশ্রাম॥
এতবলি দ্রৌপদী বসিল বৃক্ষতলে।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র অর্জ্জুনেরে বলে॥
ওরে ভাই ধনঞ্জয় কি বা দেখ আর।
অজ্ঞাত হইব কালি জান সমাচার॥
বিদিত হইলে ভাই সর্ব্বনাস হব।
জ্ঞাত হৈলে দ্বাদশ বৎসর বনে যাব॥
সে কারণে কহি ভাই তব বরাবরি।
মোর বাক্যে দ্রৌপদী-লহ স্কন্ধে করি॥
রাজার আদেশ মাত্র পার্থধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীকে তুলি নিল স্কন্ধের উপর॥
ঐরাবত স্কন্ধে যেন চাপিল ইন্দ্রাণী।
সেইরূপ পার্থ স্কন্ধে শোভে যাজ্ঞসেনী॥
দ্রৌপদীকে স্কন্ধে করি ধনঞ্জয় নিল।
কত দূর নগর নিকটে নামাইল॥

কত দূর যাইয়া বসিল ছইজনে।
ভ্রাতৃগণে চাহি কহে ধর্ম্মের নন্দনে॥
শুন ভাই ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত আর।
সশস্ত্র নগরে গেলে হবে একে আর॥
দৃষ্টিমাত্রে চিনিবেক যত লোক সব।
বলি বৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনুখ্যাত॥
অস্ত্রধনু বিখ্যাত চিনিবে সর্ব্বজনে।
ধনুর্ব্বান নিভৃত্যে রাখহ কোন স্থানে॥
হেন স্থানে রাখ ভাই একত্রিত ক'রে।
নির্ণয় করিতে যেন কেহ নাহি পারে॥
এত শুনি অর্জ্জুন রাজার প্রতি কয়।
নিকটেতে শমীদ্রুম হের মহাশয়॥
ভয়ঙ্কর শাখাসব পরশে অম্বর।
আজ্ঞা কৈলে রাখি এতে আয়ুধ নিকর॥
এতশুনি আজ্ঞা দিল রাজা যুধিষ্ঠির।
একত্র করিল সব বীর বৃকোদর॥
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি শমীবৃক্ষে।
অস্ত্রসহ লম্ফ দিয়া উঠে গিয়া বৃক্ষে॥
মৌর্ব্বীহীন করিয়া সকল শরাসন।
গদাখড়্গ আদি যত অস্ত্র পূর্ন তুণ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিল।
বৃক্ষের যে সব শাখা সুদৃঢ় দেখিল॥
যার বহির্ভাগে হয় বারি বরিষণ।
তথা দৃঢ়পাশ দিয়া করিলা বন্ধন॥
বৃক্ষ ডালে অস্ত্র শস্ত্র করিয়া বর্দ্ধন।
নামি প্রনমিয়া ভীম বলিলা বচন॥
ওহে বৃক্ষ নিবেদন করি তুয়া পায়।
যদি কেহ আরোহিতে আইসে তোমায়॥

আকাশ পাতাল তুমি বহিবে পবন।
আরোহিতে নাহি যেন পারে কোনজন॥
আর এক মোর বাক্য পালিবে গোসাঞি
শবের দুর্গন্ধবায়ু বহিবে সদাই॥
এতবলি শমীবৃক্ষে করিয়া প্রনাম।
দ্রৌপদীরে লইয়া পাণ্ডব চলি যান॥
হেনকালে গোপগণ আসিল সেখানে।
জিজ্ঞাসিল রাখিলে কি করিয়া বন্ধনে॥
চাতুরি করিয়া ভীম কহিতে লাগিল।
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল॥
আচম্বিতে বৃদ্ধা মাতা মরিল আমার।
কুলক্রমে আমাদের আছে এ আচার॥
অগ্নি সংস্কার যদি করিতে না পারে।
বন্ধন করিয়া রাখে বৃক্ষের উপরে॥
এত যদি গোপগণে বলিলা পাণ্ডব।
শুনিয়া হইল স্তব্ধ গোপগণ সব॥
পরস্পর গোপগণে বলিল সকলে।
কেহ নাহি যাব মোরা শমী-বৃক্ষতলে॥
শব বাঁধি রাখি গেল গাছের উপর।
এতবলি মহাভয় হৈল সবাকার॥
তবে পঞ্চ-পাণ্ডব পাঞ্চালি সঙ্গে করি।
চলি যায় ছয়জন ছদ্মরূপ ধরি॥
চিনিতে না পারে কেহ পাণ্ডব বলিয়া।
এখন দ্রৌপদী বলে যোড়হাত হৈয়া॥
গোঙাইতে হইবেক এক সম্বৎসর।
কি জানি কখন মোর পড়য়ে দুষ্কর॥
কি বলিয়া তোমাদিকে করিব স্মরণ।
কেমনে বিপদে পার হইব তখন॥

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি পঞ্চ সহোদর।
গুপ্ত পঞ্চ নাম তবে নিরূপণ করে॥
উজয় বিজয় ওজয়ন্ত জয়সেন।
জয় দ্রোণ গুরু নাম করে নিরূপন॥
শুন যাজ্ঞসেণী যবে বিপদে পড়িবে।
এই পঞ্চ গুপ্তনাম ধরিয়া ডাকিবে॥

পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক দুর্গার স্তব ও দেবীর দর্শনপ্রাপ্তি।

বৈশম্পায়ন কৈলা শুন কুরুবর।
এই মতে সেই ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠির॥
বিরাট নগর মধ্যে করিয়া গমন।
ভগবতী শ্রীদুর্গার করেন স্তবন॥
যশোদা নন্দিনী নারায়ণ প্রণয়িনী।
কংসধ্বংসকারিনীও কুল বিবর্দ্ধিনী॥
ব্রহ্মশর্য্য স্বরূপিনী বাসুদেব ভগ্না।
অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত সেই কংস দৈত্যমণী॥
বল ক'রে তোমাকে মা আকর্ষন ক'রে।
নিক্ষেপিতে উদ্যত হইল শিলাপরে॥
অনায়াসে তুমি মা তাহার হস্ত হ'তে।
গমন করিয়া ছিলা আকাশ মার্গেতে॥
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী তুমি জগন্মাতঃ।
হয়েছেন দিব্যবস্ত্র মাল্যে বিভুষিত॥
সুতীক্ষ্ণ খড়্গ আর খেটক মুদ্গর।
শোভা পাইতেছে করতলেতে তোমার॥
যাহারা ভুভার অবতারণ কারণ।
কায় মনোবাক্য করে তোমাকে স্মরণ॥
দুস্তর পাপ পঙ্ক হইতে তাহাদিকে।
উদ্ধার করহ তুমি নিজ অনুগ্রহে॥
অনন্তর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ।
করিবার মানসেতে দেবিরে দর্শন॥
পুনঃ বহুবিধ স্তব লাগিল করিতে।
হে বালার্কসমা চতুর্ভুজে চতুর্বক্তে॥
শিখা পুচ্ছবলয় পীবর পয়োধরো।
কেয়ুরধারিণী পৃথু নিতম্বিনী তারা॥
শোভা পাইতেছ তুমি লক্ষীর সমান।
সুধাংশু মণ্ডল সম তোমার আনন॥
কর্ণযুগে সুবর্ণ কুণ্ডল বিভুষিত।
কেশপাশ রম্য অতি মুকুট বিচিত্র॥
নানাস্ত্রধারিণী তুমি হর মনোরমা।
তব দীর্ঘ বাহুযুগ শক্রধ্বজ সমা॥
সর্পাভোগ রূপকাঞ্চী দাম বিভূষিত॥
মন্দরাদ্রি শ্রী ধরেছ সর্প পরিবৃত॥
শিখিপুচ্ছ বিনির্ম্মিতোন্নত ধ্বজ দণ্ডে।
হইয়াছে তোমার কি শোভা অলৌকিকে॥
ধরিয়া কৌমার ব্রত হে ত্রিদশেশ্বরী।
পবিত্র করিয়াছিলা বলে সুরপুরী॥
ত্রিদশেরা সদা তব স্তব পূজা করে।
আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার তরে॥
মহাসুর মৈষাসুরে করেছ নিধন।
বিজয়া বরদা জয়াজয় প্রদায়ন॥
এক্ষনে আমার প্রতি হউন প্রসন্ন।
কৃপাকরি আমারে বিজয় কর দান॥
শীধুমাংস পশুপ্রিয়ে হে কামচারিনী।
নিত্যবাস স্থান তব বিন্ধ্য গিরিমধ্যে॥

তুমি যাত্রা কৈলে ভূতগণ সঙ্গে যায়।
হে কালি হে মহাকালি পাষাণ তনয় ॥
যারা ভারাবতারণ মানসে প্রভাতে।
স্মরণ ও প্রণিপাত করে মা তোমাকে ॥
ধন পুত্র লাভ তার হয়নি দুর্লভে।
দুর্গ হৈতে উদ্ধারহ বলিয়া হে দুর্গে ॥
লোকে আপনাকে দুর্গে বলে অনুক্ষন।
সিন্ধুজল নিমগ্ন কাণ্ডারে অবসন্ন ॥
দস্যু হস্তে নিপতিত প্রাণি সমূহের।
তুমি দুর্গা এক মাত্র গতি নিরন্তর ॥
জল স্রোতে রণে বনে হইয়া বিপন্ন।
ভক্তি ক'রে আপনাকে করিলে স্মরণ ॥
হে দেবি হয়নি হ'তে অবসন্ন কর।
তুমি সুরেশ্বরী কীর্ত্তি লক্ষীধৃতি আর ॥
সিদ্ধি লজ্জা বিদ্যা ব্যাপ্তি বুদ্ধি আর সান্ধ্যা।
রাত্রি প্রভা জ্যোৎস্না কান্তি ক্ষমা জয়ানিদ্রা ॥
নরের বন্ধন মুক্তি পুত্রনাশ আর।
ধনক্ষয় ব্যাধি মৃত্যু জরা ভয় তার ॥
কিছুই থাকে না পূজা তোমার করিলে।
শরণ্য পালিকে দুর্গে হে ভক্তবৎসলে ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি আমি মাতঃ এবে।
তোমার শরণাপন্ন প্রণমি তোমাকে ॥
রক্ষ রক্ষ জগন্মাত! মোসবে এখন।
এই রূপে যুধিষ্ঠির করিলে স্তবন ॥
অন্তর্যামি দাক্ষায়নি কৈলাসেতে থাকি।
হৃদয়ে জানিয়া মাতা তুষ্ট হয়ে অতি ॥
শান্তময়ী শান্তমূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
পতিতপাবনী চলে বিপদ খণ্ডন ॥

চতুর্ভুজা চারুনেত্রা চঞ্চল ত্রিআখি।
তাপিতে তারণ হেতু চলে চন্দ্রমুখি ॥
ষোড়শ বয়সী বামা দ্রুতগতি নড়ে।
উপনীত উমেশানী হইল মৎস্যপুরে ॥
ভীমার্জ্জুন সহ যথা ধর্ম্ম নরপতি।
মৎস্যদেশ প্রান্তভাগে সচঞ্চল মতি ॥
যামিনী অন্তেতে যথা ব্রহ্মমূর্ত্তি জ্যোতি।
অভয় প্রদানে ভক্ত অগ্রে হৈমবতী ॥
ব্রহ্মময়ী রূপরাশী নিন্দে পূর্ণশশী।
তপ্তস্বর্ণ অঙ্গছটা ষোড়শী সুকেশী ॥
ত্রিলোচনা ত্রিপুরা তাপিত নিস্তারিণী।
অভয় দায়িকাভবে বৈভব দায়িনী ॥
হাসিতে অম্বুজ ওষ্ঠে খেলয়ে তড়িত।
দূর হৈতে দেখি রাজা হৈল আহ্লাদিত ॥
শঙ্কর মোহিনী শিবা উদয় হেথায়।
বেদে কয় ভক্তাধীনা তাহা সত্য হয় ॥
দিব্যচক্ষে ত্রিপুরারে চিনিয়া নৃপাতি।
অষ্টাঙ্গ লুঠিয়া ভূমে পড়িল ভূপতি ॥
অম্বিকার চরণে পড়িয়া পাণ্ডুপতি।
পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল স্তব-স্তুতি ॥
বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বপতি তুমি পরাৎপরা।
বিপ্রকন্যা বেদমাতা ব্রহ্মময়ী তারা ॥
কলির কলুষহরা কৃতান্তবাদিনী।
অভয়া অসুরধ্বংসী সরিষ্ঠ নাশিনী ॥

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" সমালোচনা।

(সাহিত্য সভার বিংশ বার্ষিক ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে আধুনিক হিসাবে এক জন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন এ বিষয়ে কেহই বোধ হয় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার "আমার দেশ" ইত্যাদি গান প্রকৃতই স্বদেশানুরাগের উদ্দীপক—আমরা তাঁহার নিকটে এ নিমিত্তে কৃতজ্ঞ। তাঁহার "হাসির গান" ইত্যাদি দ্বারা তিনি সমাজকে আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—এজন্যও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। নাট্যকার ভাবেও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যে এক প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। তাই ইদানীং তাঁহার জীবন চরিত দুইখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন সম্বন্ধে বা তাঁহার অন্যান্য লেখার বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার লেখনীতে পুরাণের চিত্র কিরূপ ফুটিয়াছে, তদ্বিষয়েই দুচারি কথা তদীয় নাটক 'সীতা'র সমালোচনা উপলক্ষে প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"সীতা" সম্বন্ধে তদীয় জীবন চরিত লেখক ও পরম সুহৃৎ কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন "সীতা নাট্যকাব্যখানি বস্তুতঃই বঙ্গসাহিত্যের একখানা অমূল্য রত্ন স্বরূপ।" * পূর্ব্বে একবার সীতা পড়িয়াছিলাম। এই সার্টিফিকেট্‌খানি পাঠ করিয়া পুনশ্চ ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি—তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকখানির সমালোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিলাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকখানির একটা ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল—ইহা পত্রিকা বিশেষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—তখনই এই নাট্য-কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। তাই এই ভূমিকায় তিনি তাদৃশ সমালোচনার একটা কৈফিয়তও দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন সত্ত্বেও অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, তিনি যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে পৌরাণিক বিষয়ে হাত না দিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক অথবা কোনও অভিনব কল্পিত বিষয়ে প্রতিভা প্রয়োগ করাই সমীচীন ছিল। আর্য্যশাস্ত্রে তাঁহার তেমন বিশ্বাস ছিল না—রামায়ণ মহাভারতের গ্রন্থকার সমাজের শিক্ষার্থে যে আদর্শ-চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—তৎপ্রতি তাঁহার যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। অথচ পৌরাণিক বিষয়ে কাব্য নাটক লিখিবার নিমিত্তে যতটা সাধনা আবশ্যক—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপপুরাণ সংস্কৃত কাব্য নাটক ইত্যাদির সম্যক্ অধ্যয়ন—ততটা তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ পুরাণ মূলক কাব্যের বা নাটকের নায়ক নায়িকা ইত্যাদি বর্ণনীয় পাত্র পাত্রীর যথাযথ ভাব ব্যক্তির নিমিত্তে

---

* দ্বিজেন্দ্রলাল ৭৫০ পৃষ্ঠা।

যতটা সহৃদয় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহারও অভাবই যেন আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। ফলতঃ বিদেশে বাস, বিজাতীয় শিক্ষা, সমাজের প্রতি বিদ্বেষ, সতত বিজাতীয় সাহিত্যের চর্চা, মদ্য মাংস ভূয়িষ্ঠ আহার, সমান ধর্ম্মা ব্যক্তিগণের বেষ্ঠনী মধ্যে অবস্থান ইত্যাদি নানা কারণে তাঁহাকে পৌরাণিক বিষয়ে যথোচিত ভারতী প্রয়োগে উক্তরূপ অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অমায়িক প্রকৃতি, দেলখোলা সরলতা, নির্ভীক তেজস্বিতা ও সর্ব্বোপরি দেশের জন্য একটা প্রবল 'টান' এই সকল দ্বারা তিনি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইলেও তাঁহার ঐ অনধিকার চর্চ্চার জন্য আমরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি না। এবং তাঁহার মধ্যে মহত্ত্বের ভাব সমধিক থাকায় এইরূপ ক্রটি অধিকতর অমার্জ্জনীয় কেন না তৎপ্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়া অপরে তাঁহার এই দোষের ও সমর্থন বা অনুকরণ করিতে পারে।

আমরা সমালোচনা-স্থলে তাঁহার ভূমিকায় প্রদত্ত কৈফিয়তগুলির বিচারই সর্ব্বপ্রথম করিব। 'রামের চরিত্র মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন,—এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান্ রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র শুদ্ধবংশ মর্য্যাদার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতিও এ দুইটী একটী স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস আখ্যান সম্বন্ধে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্মীকির চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।

ইহার প্রথম উত্তর এই যে ভবভূতি সীতার বনবাসে ঠিক বাল্মীকির পদানুসরণই করিয়াছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল ভবভূতির উত্তর চরিত প্রণিধান সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

এই দেখুন ভবভূতি লিখিয়াছেন—

যৎ সাবিত্রৈ দীপিতং ভূমিপালৈ
লোক শ্রেষ্ঠৈঃ সাধু শুদ্ধং চরিত্রম্।
মৎসম্বন্ধাৎ কশ্মলা কিংবদন্তী—
স্যাদেতস্মিন হন্ত ধিং মামধন্যম্।
(উত্তর ১ম অঙ্ক)

৮ বিদ্যাসাগর মহাশয় টীকায় 'চরিত্রম্' অর্থ করিয়াছেন 'কুলম্' তবে 'লোকারাধন' নিমিত্তে যে সীতাবর্জ্জন করিতে হইবে ইহার পৃথক উল্লেখ ভবভূতির উত্তর চরিতে ভূয়োভূয়ঃ আছে, বাল্মীকি রামায়ণে এই শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ না দেখিয়া যদি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রম হইয়া থাকে তবে বলিব তিনি বাল্মীকির লেখা তলাইয়া দেখিতে পারেন নাই অর্থাৎ বাল্মীকির কি "স্পিরিট" তাহা বুঝেন নাই। সীতা নিষ্পাপা রাম তাহা জানেন—ভ্রাতৃবর্গকেও বলিয়াছেন তবে কলঙ্ক আসিল কোথা হইতে? প্রজাবর্গ সীতার অপবাদ ঘোষণা করিতেছে * তাহাদের কথা

* সেই অপবাদ কি প্রকার তাহার প্রতিও এস্থলে দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

ফেলিতে পারা যায় না উঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তন করিতেই হইবে—নচেৎ কলঙ্ক স্পর্শিবে—বংশের সুনামের হানি হইবে, তাই সীতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। জন মতের প্রতি এই যে রামের মর্য্যাদাভাব ইহাতেই রামকে আদর্শ ভূপতিরূপে জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে আজও 'রামরাজত্ব' প্রবচন রূপে সমাদৃত রহিয়াছে।

তার পর তপোবন দর্শন ছলে নির্ব্বাসনার্থ প্রেরণ ভবভূতি ও লিখিয়াছেন। উত্তর চরিতের প্রথম অংশের শেষাংশে আছে।

প্রবিশ্য দুর্ম্মুখঃ। দেবি কুমার লক্ষ্মণেন নিবেদয়তি সজ্জোরথঃ আরোহতু দেবী।"

সীতা। ইয়ম্ আরোহামি।

তার পর তপোবন, রঘুকুল দেবতা প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া সীতা রথারোহনার্থ গমন করিলেন।

ইহাতে কি বুঝায়? সীতা যে নির্ব্বাসিতা হইয়া চলিলেন এ কথা আছে কি? ফলতঃ এ কথাটা গোপন করাই আছে। বাল্মীকির রামায়ণেও তাই আছে। লক্ষ্মণ এ কথাটা গোপন রাখিয়াছিলেন।

মনে রাখা উচিত যে উত্তর চরিতে, তথা রামায়ণে, ইতঃপূর্ব্বে রামের সঙ্গে কথা ছিল, সীতা গঙ্গাতীরে তপোবন দর্শনে যাইবেন। বাল্মীকির আশ্রম ও গঙ্গাতীরে গঙ্গা তমসার সঙ্গমস্থলে। তাই সেখানে প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতেই ছিল, তবে নির্ব্বাসনের কথাটা অযোধ্যায় না বলিয়া তপোবনে বলাই রামের ঈপ্সিত ছিল। ইহাতে এমন কি 'নিষ্ঠুর ছলন' হইল বুঝিতে পারিলাম না।

অযোধ্যায় নির্ব্বাসন আজ্ঞা সীতার কাছ হইতে 'গোপন' রাখাটা অতীব সঙ্গত কাজই হইয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেটা না করায় কৌশল্যা আসিয়া রামকে এক প্রকার 'মাথার কীরা' দিতে লাগিলেন যাহাতে রামের সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়; পরিশেষে রামচন্দ্র মাতৃনির্দ্দেশে সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপার ক্ষান্ত রাখিতে বাধ্য হন। ইহা হইলে রামরাজত্বে কলঙ্কই আসিত ফলকথা কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রগুপ্তি রাখাতে রামের কোন পাপ হয় নাই—বরং এতদ্বারা তিনি নানারূপ বিঘ্ন বাধার হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন।

রামের চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের পুস্তকে অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। বাল্মীকি নানাস্থানে দেখাইয়াছেন সীতার প্রতি রামের কি প্রগাঢ় প্রেম। ভবভূতি উত্তর চরিতে রামকে একটু দুর্ব্বলচিত্ত করিয়া থাকিলেও সেই প্রেম যে কত গভীর তাহা দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি সীতাহরণের পরে রামকে সীতার জন্য সুবহু বিলাপ করাইয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাই উত্তর কাণ্ডে সীতা বর্জ্জনের পর তাহা আর নূতন করিয়া দেখান নাই—তথাপি এমন যে

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্।
লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোক বণিকাং গতাম্।
রাক্ষসাং বশমায়াং তাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তদনুবর্ত্ততে॥

উত্তর কাণ্ড ৩য় সর্গ

ইহা হইতেও সীতা পরিত্যাগের কারণ বোঝা যায়। এতদবস্থায় সীতাবর্জ্জন ভিন্ন আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের আর উপায়ান্তর ছিল না।

র্ত্ব্যপরায়ন ভূপতি তিনিও চারি দিন শোকে
গার কার্য্য করিতে পারেন নাই এই মাত্র জানাই-
ই রামচন্দ্রের হৃদয় বেদনার পরিমাণ বুঝাইয়াছেন।
ময়ী সীতা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দ্বারাও রামচন্দ্রের অত্যদ্ভুত
ীপ্রেম সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ প্রেমাস্পদকে
পনা হইতে বিসর্জ্জন করা যে রামের কতটা স্বার্থ-
াগ তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিতে পারেন নাই, ইহা
র্ভাগ্যের বিষয়। গুরু বশিষ্ঠের সনির্ব্বন্ধ আদেশে
তাকে রাম বনে দিয়াছিলেন—বরং সীতার হইয়া
শষ্ঠের সঙ্গে তর্ক পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন এই টুকু
খাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রামের মাহাত্ম্য যথেষ্ট থর্ব্ব
রিয়াছেন। "আজ্ঞাগুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" এইরূপ
রু ভক্তির বশীভূত হইয়াও যে রাম বলিয়াছেন,
হাও বলিতে পারি না। কৌশল্যার অনুরোধে
তার নির্ব্বাসন আজ্ঞা তিনি রদ করিয়া গুরুর
দেশ লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার
রু যখন দার পরিগ্রহ করিতে বলিলেন তখন কঠোর
বে তিনি গুরুর আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়া আপন
দ বজায় রাখিয়াছেন। গুরুভক্ত রামের বিড়ম্বনা
ই খানে শেষ হয় নাই। গুরু যখন সীতাকে গ্রহণ
রিতে আদেশ করিলেন তখন প্রজারঞ্জন রাম
াদের অস্তিত্বই ভুলিয়া গেলেন—প্রজাদের মন
তে সীতা বিষয়ক অপবাদ দূর করিবার জন্য বশিষ্ঠ
বাল্মীকিকে একটুকু ও অনুরোধ করার প্রয়োজ-
য়তা রামের অন্তঃকরণে উদিত হইল না। তখনই
ল্মীকির আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন—অশ্ব-
ধের কথা আর শুনাও গেলনা। তারপর সেখানে
া লবকুশের সন্ধান করিলেন—কুশ আসিয়া যথা-
রীতি প্রণাম করিল; লব কিছুতেই ঘাড় নুয়াইবে না
গুরু বাল্মীকির কথাতেও না—প্রত্যুত এক লেক্‌চার্
ঝাড়িয়া বলিল—

'পিতা রামচন্দ্র পৃথিবীর পতি তুমি নরোত্তম
তুমি বীর তুমি? ধর্ম্ম পরায়ণ? নিষ্ঠুর নির্ম্মম।
ধিক কাপুরুষ। ধিক্ তোমার পাপের নাই সীমা
ইত্যাদি ১২০ পৃঃ।

এমন সুমিষ্ট উত্তরে রাম কি কহিলেন—

'পুত্রযুগ্ম মধ্যে তুই শ্রেষ্ঠতর লব' ১২০ পৃঃ।

অহো, বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? রাম! রাম!! ইহাই দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত রাম চিত্র! যে মহাপুরুষের মূর্ত্তি দর্শন ও শব্দ শ্রবণ মাত্রে যুধ্যমান লব—ভবভূতির লব—উৎকট বীর রসাভিনয় হইতে শান্তি রসে আপ্লুত হইয়া নম্র হইয়া গেল—সেই লব দ্বিজেন্দ্রলালের লব—রামচন্দ্রকে অপমান করিতে আর কসুর করিল না। দু এক ঘা যে বসায় নাই সে বোধ হয় কেবল পিতা দশরথের পুণ্যফলে! হরি হরি!! রামের আকৃতিটাও কি দ্বিজেন্দ্রলাল 'ইম্পোজিং' করিতে পারিলেন না।

শূদ্র তপস্বীর প্রাণ দণ্ড একটী গর্হিত কার্য্য বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা—গর্হিতত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। নাটকের প্রতি পাদ্য বিষয় সীতার করুণ অন্ত্যজীবন—শূদ্রবধ কার্য্যটার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াসে ইহা ছাড়িয়া দিয়া রামের হীনতার মাত্রাটা একটু কমাইতে পারিতেন। তা তো করেনই নাই অধিকন্তু বিষয়টাকে অধিকতর বীভৎস কবিবার জন্য রামায়ণ বিরোধী দু একটা ব্যাপার ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া-

ছেন। শূদ্রকে 'শূদ্রকরাজ' করিয়া তাহাকে সৌম্যাকৃতি, পক্ককেশ, শাশ্রুজ্জ সস্ত্রীক বানপ্রস্থাবলম্বী সাজাইয়াছেন। রামায়ণে আছে শূদ্রকে কৃচ্ছ্র-তপোনিরত দেখিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্তি মাত্র বধ করিয়া রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ শিশুকে জীবিত ও দেবতা-গণকে সন্তুষ্ট করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ সৌম্যাকৃতি শুভ্রকেশ শূদ্রক রাজার প্রাণনাশের পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে রামের এক বিষম তর্ক বাঁধাইয়া দিয়াছেন—আবার শূদ্রক রাজের পত্নীদ্বারা পতির প্রাণ রক্ষণে বহু 'কাকুতি মিনতি' করাইয়াছেন। ইহাতে রাম চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা আরো প্রগাঢ় করিয়া দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তো এই করিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দুই মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি ঐ বিষয়টাই কি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের ১৫শ সর্গে ও উত্তর চরিতের ২য় অঙ্কে কালিদাস ও ভবভূতি দেখাইয়াছেন যে অবিধি পূর্ব্বক কৃস্থ তপস্যার দ্বারা যাহা না হইত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় শূদ্রের সেই সদ্গতি লাভ হইল।

রামকে বাল্মীকি গম্ভীর সত্ত্ব সর্ব্বগুণাধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চর আসিয়া যখন সীতা সম্বন্ধীয় অপবাদ কাহিনী বর্ণনা করিল রাম স্থির হইয়া বর্ণনা শুনিলেন—অতঃপর দুঃখিত চিত্তে সভাস্থ বয়স্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কথ মেতদ্ ব্রুবন্তু মাম্।

উঁহারাও যখন 'একমতন্নসং শয়ঃ' বলিলেন, তখন সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে দিয়া বলাইতেছেন—

'কি কহিলি দুর্ম্মুখ, আস্পর্দ্ধা তোর অতি
জানিস্ না কে সে আর কে তুই দুর্ম্মতি
পথের কুক্কুর হেয়'। ২২ পৃষ্ঠা।

এই কি রামের ভাষা? এই যে একবার ব
নহে। এই বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া পুনশ্চ—

দুর্ম্মুখ এখনও পাপ দাঁড়াইয়া—হ দূর
দূর হ প্রভুর অন্নে বর্দ্ধিত কুক্কুর
কৃতঘ্ন! ২৩ পৃষ্ঠা।

রাম রাম! এই কি প্রশান্ত গম্ভীর রামের যো উক্তি! কেবল রামের চরিত্রই যে এমন মসীলি হইয়াছে, তাহা নহে, আরো অনেক চরিত্রই এইরূপ অল্প বিস্তর হীনতর ভাবে চিত্রিত হইয়া তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। ভূমিকার তারপ আছে—

'মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে কিন্তু তাঁহার পরে পৃথিবীর সমাজ আরও অগ্র হইয়াছে। পূর্ব্বে সব দেশেই স্ত্রী জাতির অবস্থা পদবীহীন ছিল।

ভারতবর্ষে তাঁহার মর্য্যাদা সমধিক সংরক্ষি হইলেও সে দেশ তখনও স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমা উচ্চ অবস্থায় উপনীত হয় নাই। স্ত্রী সহধর্ম্মিনী হইলেও সম্পত্তি মাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই যুধিষ্ঠি দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় বাজী রাখেন। শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ সীতার নির্ব্বাসনে নয় সীতার উদ্ধার সাধ করিয়াই সীতাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা প্রসং চ্ছলেও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণা উচ্চতর কিন বাল্মীকির আদর্শ বর্ত্তমান কালের অপেক্ষা লঘুতর কিনা সেই তর্কে প্রবেশ করিব না—কেননা সে

: বিশাল ব্যাপার। এইমাত্র বলিতে পারি যে
াদের ধারণা অন্য রকম—সমাজোদ্যানের বেল
মল্লিকা মালতী উপড়াইয়া ফেলিয়া আমরা পাতা
ার গাছ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি—যাহা দেব-
ায় লাগিত তৎপরিবর্ত্তে টেবিল সাজাইবার
নস তৈয়ার করিতেছি। যাউক্ সে সব
া।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মহাভারতও যে অভিনিবেশ
কারে পাঠ করেন নাই—তাহার পরিচয় এ স্থলে
ান করিয়াছেন। সভা পর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়ে আছে
ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির আগে রাজ্যধনাদি সমস্ত হারাইয়া-
লেন, পরে একে একে বৈমাত্রেয় ও সহোদর
ই দিগকে বাজি রাখিয়া হারাইলেন। তৎপর
কেও পণ রাখিয়া যখন পরাস্ত হইয়া ক্রীড়ার
সংহার করিতে উদ্যত হইলেন তখন শকুনি
কারী দিয়া বলিল—'ওহে আর একটা জিনিস তো
মার রহিয়া গেল—তাহাকে বাজি না রাখিয়া
জেকে পণ করা ত দ্যূত শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই
লয়া দ্রৌপদীর কথা পাড়িল। তখন বাধ্য হইয়া
ষ্ঠির তাহা পণ করিলেন। এখন দেখুন ভ্রাতা ও
র দেহ পণ রাখিবার পর দ্রৌপদী আসিলেন—ইহা
রা কি দ্রৌপদী 'সম্পত্তি মাত্র' হইলেন? ফল কথা
জেন্দ্রলাল হিন্দু পত্নীর অবস্থা ও পদবী কিরূপ ছিল
এখনও কোন আদর্শ সমাজে চলিতেছে তাহা
রতে পারেন নাই। বিবাহে স্ত্রীটি স্বামীর আপন
হের—আত্মার সামিল হইয়া গেল—তার আর
ত্র 'পদবী'ই বা কি 'অবস্থা'ই বা কি? স্বামী-
াত্রে তাহার গোত্র, স্বামীর সম্পত্তি তাহার সম্পত্তি

স্বামীর পুণ্যের সে অর্দ্ধেক দাবীদার। এ সম্বন্ধ জীবনে
মরণে, তালাক ডাইভোর্স নাই বিধবা বিবাহের
অবকাশ ইহাতে নাই নাই। পূর্ব্বে যে নিয়োগ
বিধিতে সন্তান হইত, তাহা স্বামীর সন্তানই হইত।

রামচন্দ্র সীতার পরীক্ষা নিলেন, অথবা তাঁহাকে
নির্ব্বাসিত করিলেন—এটা যে নিজেরই পরীক্ষা—
নিজেরই নির্ব্বাসন। আশ্চর্য্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই
ব্যাপারে রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পাইলেন—
কিন্তু তাঁহার যে কি বিষম আত্মসংযম অবিচলিত
ধৈর্য্য—অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ইহাতে সূচিত হইয়াছে
তাহা দেখিতেছেন না।

অগ্নি পরীক্ষার সময় রামের উক্তি—যাহা উচ্চারণ
করিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের কষ্ট বোধ হয়—তদ্বিষয়ে
কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাইবে। রাম প্রাণে প্রাণে
জানিতেন যে সীতা নিষ্পাপা। তথাপি যে সকল
লোক সীতার উদ্ধার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে যে
সুগ্রীব রাজ্যভোগ ছাড়িয়া আসিয়াছেন—যে বিভীষণ
ভাইকে পরিতাগ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের সাহায্য
করিয়াছেন—ইঁহাদের সমক্ষে দেখাইতে হইবে যে
সীতা কি পদার্থ, যার জন্য তিনি ও লক্ষ্মণ এত কষ্ট
একটি বৎসর সহ্য করিয়াছেন। যে লঙ্কায় কত শত
সহস্র রমণীর সতীত্ব নাশ দুষ্ট দশানন কর্ত্তৃক হইয়া-
ছিল—সেই স্থলেই দেখাইতে হইবে সতীর কত
তেজ কিরূপ মাহাত্ম্য। তাই রাম কটু কঠোর
বাক্যে সীতার অভিমান উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন
যাহাতে সীতার অগ্নি প্রবেশার্থ সংকল্প দৃঢ় হয়।
ফলে তাই হইল লক্ষ্মণকে সীতা আদেশ করিলেন—
চিতা প্রস্তুত কর। তারপর যাহা হইল—এক অতি

বিশিষ্ট লেখকের গ্রন্থ বিশেষের * বিজ্ঞাপকাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—'জানকীর অগ্নি সংক্রান্ত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জলতম পরিচ্ছেদ। এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী বাল্মীকির পৃথ্বীবিখ্যাত রামায়ণ ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কবিদিগের পুরাণেও কাব্যোপাখ্যানে যে ভাবে আলিখিত হইয়াছে উহা ভক্তির বিলাস ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবে।" ইত্যাদি।

তারপর ভূমিকায় শূদ্র তপস্বিবধের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন...'আমি স্বীকার করি যে রাম কর্ত্তৃক শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয় * * * * আমার মতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেলট্‌গণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত আমাদের দেশে শূদ্রগণ প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদির বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রক রাজার প্রতি রামের ব্যবহার ইহার অন্যতম নিদর্শন।'

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'সীতা' নাট্যকাব্যে শূদ্র কাহিনীর কোনও প্রয়োজনই ছিলনা। এবং ইহা রামায়ণে যেরূপ আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল বীভৎস ভাবের বৃদ্ধিকল্পে তাহা হইতে অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রীসে হেলট্‌গণ দাসের ন্যায় স্পার্টানদের কাজ করিত অথচ রাজ্যের উপর সমস্ত অধিকার স্পার্টানগণই উপভোগ করিত। ব্রাহ্মণগণের রাজ্যাধিকার ও ছিলনা—শূদ্রগণের সেবা গ্রহণ ও তাঁহারা করিতেন না। কোন ও মহর্ষির আশ্রমের বর্ণনায় শূদ্রস্ত্রী বা পুরুষের তথায় অবস্থানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি? ব্রাহ্মণেরা 'স্বাধীনতা' উপভোগ করিতেন বটে কিন্তু ক্ষমতা প্রয়াসী হইয়া অপরের উপর হুকুম চালাইয়া সম্পদের ভোক্তা হইতে চান নাই। সেইটা ক্ষত্রিয়ের ছিল—বরং ব্রাহ্মণগণ দেখিতেন ক্ষত্রিয়েরা নিজক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে কিনা। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এক অদ্ভুত জিনিস যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল—কিন্তু অন্য দেশের দার্শনিকগণের তাহা সাধনার স্বপ্ন; প্লেটো, কোম্‌ত, টলষ্টয় প্রভৃতি এবং সোসিয়ালিষ্ট গণের ইহাই যেন লক্ষ্য স্বরূপ। শ্রীভগবানের খাস তালুক এই ভারতভূমিতে তাঁহার স্বহস্ত রোপিত বড় সাধের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রম † সংরক্ষণ করা মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত তাই রাজার অত্যুচ্চ প্রশংসা ছিল বর্ণাশ্রম—সংরক্ষক; ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির এই পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল—আজ রক্ষকের অভাবে সেই সমাজ ওলট্‌ পালট্‌ হইয়া ধ্বংশের পথে যাইতেছে। যাউক সে সব কথা। এখন রামচন্দ্রের নিকট অভিযোগ আসিল—একটা 'অকাল মৃত্যু'। তাহার রাজ্যে হইয়া গেল—ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে। সমাগত ঋষিগণের মধ্যে নারদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উপসংহারে বলিলেন, 'তোমার অধিকারের কোনও শূদ্র তপশ্চরণ করিতেছে তাই এই বালকের

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা" এই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

† চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩

ৃত্যু—কেননা প্রজার অকার্যের অংশ রাজাতে সংক্রমিত হয়—রাজার পাপেই ইহা ঘটিয়াছে।" রামচন্দ্র পুষ্পরথ আরোহণ করিয়া দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে গিয়া শূদ্র তপস্বীর দেখা পাইয়া পরিচয় গ্রহণান্তে তাহার শিরশ্ছেদন দণ্ড প্রদান করিলেন। এদিকে মৃত শিশু বাঁচিয়া উঠিল—দেবতারা আসিয়া রামকে অভিনন্দিত করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু দেখাইয়াছেন কারণ অনুসন্ধানের সূত্রে শূদ্র তপস্বীর বধ কার্য্য ও বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু ইহার ফলে শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভ দেখান নাই—কেননা তাহা হইলে কাজটার গর্হিতত্ব যে লোপ হইয়া যায়। একটা কাজের 'ভাল মন্দ' ফল দ্বারাই প্রমাণিত হয়। অলৌকিক' বলিয়া যদি শেষাংশ পরিত্যাগ করিতে হয় তবে সমস্ত টাই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল বিশেষতঃ ইহাতে যখন "সীতা"র প্লটের কোনও হানি হইত না।

মন্বাদি শাস্ত্রে তিনি শূদ্রের পীড়ন দেখিতে পাইয়াছেন তা' কতকগুলি কাজে অনধিকার কেবল শূদ্রের কেন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যেরও ছিল। আবার মনুর বিধি বিধানে ব্রাহ্মনের জন্য যতটা কঠোরতা ছিল—অপরের জন্য ততটা ছিল না—কথায় কথায় শূদ্রত্ব চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি ছিল। আবার অসুবিধাই বা কত। দীন দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে—ভোগ লিপ্সা পার্থিব ক্ষমতা বর্জ্জন করিতে হইবে। লাভজনক ব্যবসা অন্যের হাতে তাহাদের দানের উপর জীবিকা—সে দান ও সকলের কাছ হইতে সব জিনিস নেওয়া যায় না। শূদ্রের ঐ সকল বালাই ছিল না—অথচ যদি উহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিত তবে 'মন্ত্র' উচ্চারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে পারিত।*

বর্ণভেদের সঙ্গে আর একটি বিষয় জড়িত রহিয়াছে যে জন্য ব্রাহ্মণ হইলেই নিশ্চিন্ত হইতনা—শূদ্র হইলেও কেহ 'হা হতোঽস্মি' করিত না। সেটা 'জন্মান্তর বাদ'। ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচিত কর্ত্তব্য পালন না করিলে পরজন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে—শূদ্রের স্বকর্ত্তব্য সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইলে উন্নতি অনিবার্য্য। অতএব কেহই ইহকাল সর্ব্বস্ব হইয়া অপরকে হিংসা বা উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইত না। এই হিসাবে বিচার করিলেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আপাত-দৃষ্ট কঠোরতা অনেকটা কমিয়া যায়।

এখন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কৈফিয়ৎ দেখা যাউক। কোনও সমালোচক তাঁহাকে উপদেশ স্থলে বলিয়াছিলেন, "বিলেত ফের্ত্তার পৌরাণিক আখ্যান লইয়া কাব্য বা নাটক লেখার চেষ্টা বিড়ম্বনা। তদুত্তরে তিনি মাত্র এই বলিয়াছেন যে "বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৌরাণিক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন [একজন বিলেতফের্ত্তা] মাইকেল মধুসূদন দত্ত।" ইহা সম্যক্ উত্তর হইল না। মাইকেল মধুসূদন যদি 'মেঘনাদবধকাব্য' না লিখিয়া কোন ঐতিহাসিক বীরবধকাব্য লিখিতেন অর্থাৎ অপৌরাণিক বিষয়ে ভারতী-প্রয়োগ

---

* ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্।
ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ।
মনু ১০।১২৬।১২৭

করিতেন তবে তাঁহার কাব্য আরো উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত—মেঘনাদবধ কাব্যে যে যে 'দোষ' পরিদৃষ্ট হয়—তন্মধ্যে পৌরাণিক চিত্র বিকৃতি ও একটি প্রকৃষ্ট রকমের দোষ। কাব্যে 'উপদেশ' কিরূপ পাওয়া যায়, কাব্যপ্রকাশে উদাহরণ স্থলে 'রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' বলা হইয়াছে। আর মধুসূদন শিক্ষার দোষে রামকে যতটা পারেন হেয় ও রাবণকে মহান্ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান্ দোষ উপলক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় উক্ত সমালোচক ঐরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাট্য কাব্যেও দেখাইয়াছি—রামের চরিত্র তাঁহার হাতে পড়িয়া কিরূপ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা—বিষ্ণুর অবতার—অন্তিমকালে তাঁহার নাম "তারক-ব্রহ্ম" বলিয়া সমাদৃত—এই রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করা অত্যন্ত গর্হিত। রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করিয়া 'আনন্দ বিদায়' লিখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এক সুহৃত্তম বন্ধু হইতে ভৎর্সনা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই বন্ধুটি রাম চরিত্রের এই বিকৃতি দেখিয়াও এই নাটক খানিকে "বঙ্গ সাহিত্যের একখণ্ড অমূল্যরত্ন স্বরূপ" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল রাম চরিত্র নহে অপর অনেক চরিত্রও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে অল্পাধিক বিকৃত হইয়াছে। রঘুবংশের চিরশুভানুধ্যায়ী গুরু বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে যিনি অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন—জিতেন্দ্রিয়তায় যিনি অদ্বিতীয় ছিলেন—বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শতপুত্র বধ সত্ত্বেও যিনি বিচলিত হন নাই—এমন বরেণ্য ঋষিকে দ্বিজেন্দ্রলাল কি মলিন ভাবে দেখাইয়াছেন। রামচন্দ্রের চরিত্রে যাহা কিছু কলঙ্ক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন—তাহার সবটাই বশিষ্ঠের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। অথচ রামায়ণে বশিষ্ঠ এ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন রামকে বশিষ্ঠ কিরূপ তৈয়ার করিয়াছিলেন—গুরুদেব ইহাও জানিতেন, তাঁহার শিষ্যটিকে এবং কেন ধরাধামে অবতীর্ণ রামচন্দ্রের উপর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু চাপাইবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। রামচন্দ্রকে যজ্ঞ করিবার উপদেশও তিনি (রামায়ণ মতে) দেন নাই—আর তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির রামের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবার জন্ত জেদ করাও অসম্ভব। বাল্মীকির নিমন্ত্রণ বন্ধ করা অথবা তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া অবশেষে হারমানা একেবারেই উন্মত্ত প্রলাপবৎ। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ বাল্মীকির বংশের আদি পুরুষ প্রচেতার ভ্রাতা—এই হিসাবেও বশিষ্ঠের সঙ্গে বাল্মীকির কোন তর্কই চলে না—ঋষিরা এত 'জ্যাঠা' ছিলেন না।

তারপর বাল্মীকি—তিনিও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়িয়া হীনপ্রভ হইয়াছেন। যাঁহারা 'স্বাধীন কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ তাঁদেরই একজনকে—মহর্ষি বাল্মীকিকে জরাবিকৃত রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে—যেন একজন কঞ্চুকী; বার্দ্ধক্য হেতু বহুভাষী ও শিথিল স্মৃতি আবার কি বেশেই তিনি রঙ্গ ভূমিতে আবির্ভূত—বগলে লাঠি হাতে লোটা (কমণ্ডলু) পিঠে বোচকা (অজিন); মাথায় পাগড়ী পায়ে নাগরা জুতা ও পরিধেয় মালকোচা মারা কিনা বলা

য়ে নাই! ব্রহ্মা যাঁহার আর্য প্রতিভ চক্ষুঃ অব্যাহত জ্যোতিঃ বলিয়া গিয়াছেন—তিনি যজ্ঞের সংবাদটা কথমপি পাইয়াছেন কিন্তু রামের সহধর্ম্মিনীকে তাহা জানিবার জন্য এই অতি বৃদ্ধ বয়সে রবাহূত ভাবে সুদূর অযোধ্যায় পাড়ি দিতেছেন। বাসন্তীর ঐ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া স্বগত বলিতেছেন "মূর্খ আমি! এ কথাও পূর্ব্বে ভাবি নাই এই কি মহর্ষি বাল্মীকির চিত্র? ৭৯ পৃষ্ঠা। তার পর রামচন্দ্রের সভায় গিয়া যে বশিষ্ঠ সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বলিয়া রাজর্ষি জনক (উত্তর চরিতে) বলিয়াছিলেন—

পূর্ব্বেষা মপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ॥ ৪র্থ অঙ্ক।

তাঁহাকে বলিতেছেন 'তুমি ঋষি বশিষ্ঠ কি নও? ১০১ পৃঃ।

রামচন্দ্র বিনীত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

আজি এতদূর পদব্রজে মহর্ষির গতি! ১০১ পৃঃ।

তাঁহার উত্তরে বাল্মীকি (বিদূষকের ন্যায়) জবাব দিলেন—

"তপোবলে দূরত্ব ত অতিক্রম হয় না ভূপতি, কাজেই এ পদব্রজে।" ১০১ পৃঃ।

নিতান্ত ফলারে বামুনের ন্যায় নিমন্ত্রন না হওয়ায় বাল্মীকি চটিয়াও গিয়াছেন—তাই বলিতেছেন—

"বিপ্রজাতি ভিক্ষাকরে খাই
নিমন্ত্রণ হলে ভাল, তা বিনা নিমন্ত্রণেও যাই।
ইত্যাদি ১০১ পৃঃ।

নাটকে অষ্টাবক্রও উপস্থাপিত হইয়াছেন। বড় লোকের প্রসাদার্থী খোসামোদে ব্রাহ্মণের মত দু'চারটা কথা তাঁহার দ্বারা বলাইয়াছেন। অষ্টাবক্রকে বৃথা এ বিড়ম্বনা দেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? নামটি এবং তার অক্ষর গত অর্থবোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তাঁহার প্রতি এই লঘুভাবের উদ্রেক করিয়াছে। তাঁহার জীবনের ইতিহাস * জানিলে তিনি বোধ হয় এরূপ উপহাস করিতেন না।

এই গেল মহর্ষিদের দুরবস্থা। অতঃপর অন্যান্য পাত্র পাত্রী।

কৌশল্যা রামকে গুরুবাক্য লঙ্ঘনের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন এটা আজকালকার দিনে অবশ্যই সম্ভবিত—তখনকার যুগে অসম্ভব।

শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সহধর্ম্মিণী হইয়াও অরণ্যে বাসকরার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদে অবস্থান করাটাই যে বাঞ্ছনীয়, তাহাই বলিতেছেন—

এ প্রাসাদ এ উচ্চ প্রাচীর
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া উচ্চ সৌধ শির।
দাস দাসী সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে
বলিস্ কি সীতা, তোর ভাল নাহি লাগে?
১১ পৃঃ

শান্তা যেন আজকালকার ধনীর কন্যা হীনাবস্থ কুলীনে বিবাহিতা আজন্ম সুখে পালিত হওয়ায় পতি গৃহে অবস্থান অপেক্ষা পিত্রালয়ের প্রাসাদেই জীবন যাপন করিতেছেন।

মাণ্ডবী, উর্ম্মিলাও শ্রুতকীর্ত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে কোনও স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই স্বামীর অস্তিত্বে ইঁহারা অস্তিত্ব মিশাইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইঁহাদের এক একটি চিত্র দিয়াছেন, তা বেশ।

* মহাভারত বনপর্ব্ব ১৩২—১৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তবে মাণ্ডবীর চিত্রটি সরস হইলেও রামায়ণ বিরোধী। রসিকা মাণ্ডবী আজকালকার অন্তঃপুর গুলজার কারিণী গল্প প্রিয়া যুবতীরূপে চিত্রিত। তা বরং সহনীয়। কিন্তু সৌভ্রাত্রের আদর্শ ভরত রামচন্দ্রের বিদ্রোহী হইলেও যখন রামের একান্ত অনুরোধে অযোধ্যায় ফিরিতে চাহিলেন তখন তাঁহাকে আসিতে না দেওয়াটা একান্তই অমার্জ্জনীয়। মাণ্ডবী ভাসুর রামচন্দ্রকে পত্নীঘাতী বিশেষণে ভূষিত করিয়া যেরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন তাহা এই যুগেই সম্ভবে। অথচ সীতা যে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বনে গেলেন। তাহা পশ্চাৎ দেখা যাইবে। সীতার জন্য এত দরদ —কিন্তু সীতা কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে খবরও তিনি রাখেন নাই—রাখিলে পত্নীঘাতী বলিতেন কি? আর ভরত? ইনি দশরথের স্ত্রৈণ ভাবের* একমাত্র উত্তরাধিকারী—সেটাও আবার 'ডাইলুইশন হইয়া এমন ষ্ট্রং হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সেই ভক্তি, অনুরক্তি সমস্তই চাপা পড়িয়া গেল!

সীতার চিত্রটি সমুজ্জল করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্যই যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অচ্ছিদ্র হয় নাই। রামচন্দ্র ভরতের ভর্ৎসনায় শান্তার বক্তৃতায় এবং কৌশল্যার অনুরোধে সীতার নির্ব্বাসন সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য ভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যখন দেবতার নিকটে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সীতা আসি[য়া] বলিলেন—

'পিতৃ সত্য তুমি রেখে ছিলে
আমিও রাখিব পতি সত্য
+ + +
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে
তুমি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। + +
+ + সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের—চিন্তা কর দূর।
ইত্যাদি ৪৮ পৃঃ

রাম সীতার বক্তৃতায় স্পষ্ট সায় দিলেন না ব[টে] হা হতোঽস্মি করিলেন। তার পর ভরতের কথায় জানা যায়, বনবাসে যাইবার সময়ে

মুখে দিব্য কান্তি জানকীর সমুন্নত শির
শান্ত সৌম্য গর্ব্বে স্ফীত বক্ষঃস্থল
আত্মোৎসর্গ সুখে।" ৫৭ পৃঃ

সীতার এই চিত্রটি দেখাইবার প্রলোভনে বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাসের কথা অযোধ্যায় সীতার গোচরীভূত করিয়াছেন এইরূপই যদি সীত[ার] চিত্তের দৃঢ়তা প্রদর্শিত হইল তবে শেষটায় লবকুশ[ের] পঞ্চদশ (?) বর্ষ পরে কেন সীতা বলিলেন—

"আর আমি অভাগিনী পতি নির্ব্বাসিতা।" ৭৬ পৃ

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে সীতার চরিত্র এম[ন] ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে ইহাতে ছিদ্র বাহির ক[রা] অসম্ভব*। দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাসটা সীতা দ্বার[া]

* দশরথ কৈকেয়ীর বশীভূত ছিলেন বটে কিন্তু (দ্বিজেন্দ্রলালের) কৈকেয়ী নন্দনের ন্যায় 'তুমি যা বল' গোচের ছিলেন না।

* মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনা[থ] বসু মায়ামৃগের ব্যাপারে সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের ভর্ৎসনায় দো[ষ]

াইয়া লইয়া বোধ হয় মনে করিয়াছেন সীতার ইমময় চরিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। আপাত ইতে তাহা দেখায় বেশ। কিন্তু তুমি পিতৃসত্য লিতে বনে গিয়াছিলে আমিও পতি সত্য পালিতে ন যাইব! এই যে একটু টক্কর দিয়া কথা এটা দর্শ সতী সীতার যোগ্য হয় নাই। 'গর্ব্বোন্নত র গর্ব্বে স্ফীত বক্ষঃস্থল এটাও সীতার চিত্র হয় ই। পরমারাধ্য স্বামী শ্বশ্রূ, স্নেহশীল দেবর ননান্দৃ ভূতিকে ছাড়িয়া যাইতে কোমল হৃদয়া ও স্বভাব লীনা সীতার কি এইরূপ গর্ব্বিতভাব শোভা পায়?

যাউক। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির চিত্র দেখুন। লক্ষ্মণ বনবাসাজ্ঞা জানাইলে মন্যুপীড়িতা হইয়া তা মূর্চ্ছিতা হইলেন তৎপর বিলাপ করিয়া লক্ষ্মণকে হা বলিলেন তাহা কি করুণ অথচ সংযত কি তি ভক্তির দ্যোতক, অথচ কীদৃশ আত্মত্যাগসূচক। চ্ছা হয় সমস্তটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাই, কিন্তু স্থানাবে; তথাপি রামকে কি কথা জানাইতে হইবে াহা কি ভাবে বলিতেছেন দেখুন।

বক্তব্যাশ্চাপি নৃপতি র্ধর্ম্মেষু সুখমাহিতঃ।
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘবঃ।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তা যাহিতা ত নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যা দপবদঃ সমুত্থিত॥
ময়া হি পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতি র্ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথা স্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেব ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তি রনুত্তমা॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥
যথাপবাদ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥*
× × × রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫৮ সর্গ।

মহা কবি কালিদাস পর্য্যন্ত ইহার একটু এ দিক্ সেদিক্ করিতে গিয়া সীতার চরিত্র একটু ম্লান করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি
যৎ রক্ষম্ মাং লোকবাদ শ্রবণা দ হাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য॥ রঘু ১৪।৬১

ইহাতে রামের উপর আক্রোশ প্রকাশ পায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া নিলেন †

খাইয়াছেন এবং মাইকেল মেঘনাদবধে তাহার উন্নতি সাধন রিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। মধুসূদন যে ভর্ৎসনাটুকু তার মুখে দিয়াছেন তাহা অতি কোমল ধীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ক্ষ্মণ ইহাতে টলিবার পাত্র ছিলেন না। বাল্মীকি সীতার খ এমন কটু কর্কশ ভাষা দিয়াছেন যে তাহাতে লক্ষ্মণ চলিত না হইয়াই পারেন না। সীতার এ'টুকু কুবুদ্ধি না লে পাপীর স্পর্শ ঘটিত কি?

* বাল্মীকি ও যে প্রজারঞ্জনার্থই রাম কর্ত্তৃক সীতাকে নির্ব্বাসিত করাইয়াছিলেন। ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ ভবভূতিও বাল্মীকিরই অনুসরন করিয়া (বশিষ্ঠ দ্বারা) বলাইয়াছেন—

যুক্তঃ প্রজানা মনুরঞ্জনে স্যা, স্তস্মাদ্ যশো যৎ পরমং ধনং বঃ। উত্তর ১ অঙ্ক।

† একালমাদ্ধি পঙ্কস্য দূরা দস্পর্শনং বরম্—এই নীতি অবলম্বন করিয়া কালিদাস উপরের শ্লোকটি না লিখিলেই যেন

কল্যাণবুদ্ধে রথবা তবায়ং নকামচারো ময়িশঙ্কনীয়ম্।
মনৈব জন্মান্তর পাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জ্জথুলির
প্রসহ্যঃ। রঘু ১৪।৬২

তৎপর সীতার ক্রন্দনের সংবাদ পাইয়া বাল্মীকি আসিয়া তাঁহাকে নিয়া আশ্রমে গেলেন—তারপর সীতার সংযম গুনেই হউক অথবা বাল্মীকির তপোবন প্রভাবেই হউক রঘুবংশে—তথা রামায়ণে সীতার কোনও একটা বিলাপের কথাই পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকি যুগ্মজাত লবকুশকে এক আকৃতি-ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং উভয়ই রামের সদৃশাকার করিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতি এবং কালিদাসও তাহাই দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র লবকে রামের ন্যায় ধীরত্ব ব্যঞ্জন ভাব যুক্ত দেখাইয়াছেন *। কিন্তু আকৃতি যে উভয়ের পরস্পর সমান ও রামেরই সদৃশ এ কথা বলেন নাই। আর্য প্রতিভা সম্পন্ন বাল্মীকি এই সাদৃশ্য দ্বারা প্রকারান্তরে সীতার কায়-মনোবাক্যে সতীত্বের সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আকৃতিগত সাদৃশ্য না দেখাইয়া কুশকে ভীরু ও মাতার প্রতি বিরক্ত এবং লবকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশের অবাধ্য † তথা রামের প্রতি ঘৃণাশীল দেখাইয়া তাহাদের যুগ্ম জাতত্বের এবং জনক জননী প্রভৃতি

ভাল হইত। পুণ্যশ্লোকা বৈদেহীর পবিত্র অন্তঃকরণে রাম-নিন্দার এই ক্ষণিক ছায়া পাত ও যে অসম্ভাব্য।

* সীতা (স্বগত) সেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ় কথা। সেই দর্প। সে ভঙ্গিমা গর্ব্ব বিস্ফারিত সেই নাসা। সেই দৃঢ় সৌর্য্য প্রসারিত রামবক্ষ। চক্ষে জ্যোতিঃ অটল ও স্থির, সে আত্ম নির্ভর সুখে। ৮৮ পৃষ্ঠা।

† কুশ। তুমি কথা শুনিবে না বহু দিন জানি ৮২ পৃষ্ঠা।

গুরুজন সেবী বীর শ্রেষ্ঠ রাম এবং সতী শিরোমণি সীতার অপত্যত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করেন নাই ফলতঃ এস্থলে দ্বিজেন্দ্রলালের সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিতা[ন্ত] অভাব বলিতে হইতেছে এবং লবকুশ চরিত্র উভয়টি একপ্রকার মাটি হইয়া গিয়াছে। নাটকের শে[ষ] দৃশ্যটিও নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। বাল্মীকির ব[হু] চেষ্টার পরে সীতা সপুত্রা রাম কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতে চলিয়াছেন। এরূপ শুভ সংযোগ স্থলে ভূমিক[ম্প] এই অশুভ সংঘটন কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্ণিমি[ত্ত] যে মানেননা এমনতো নয়; কেননা যখন বশিষ্ঠে[র] সঙ্গে রামের সীতা নির্ব্বাসন সম্বন্ধে কথা স্থির হইতে ছিল, অযোধ্যায় তখন বিনা মেঘে বজ্রধ্বনি হইয়াছিল

সীতা। একি
কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি
সীতা। নির্ম্মল আকাশে?
কৌশল্যা। (স্বগত) সত্য, কই মেঘ নাই
(২৮ পৃষ্ঠা)

অতএব এই দুর্ণিমিত্ত ভূকম্প হইল কেন দ্বিজেন্দ্রলাল অলৌকিক ঘটনা পরিহার করিয়াছে[ন] তাই বোধ হয় সীতার অদর্শন হওয়ার সময়েও তি[নি] যে শপথ বাক্য দ্বারা আপনার সতীত্বের পরী[ক্ষা] দিয়াছিলেন, তাহার অবতারণা করেন নাই বাল্মীকির লেক্‌চার এবং বশিষ্ঠের ত্রুটি স্বীকার সেই পন্থা অনাবশ্যক বলিয়া রুদ্ধ করিয়াছেন। তা[ই] এটা কি কম অলৌকিক হইল যে ভূকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল কেবল একটিমাত্র স্থলে এবং তাহাতে একটিমাত্র প্রাণীরই হানি হইল—সেই স্থল সীতা[র] পদতল এবং সেই প্রাণী 'সীতা'। এখন, তৎকা[লে]

ল্মীকির আশ্রমে অযোধ্যার কোনও মাতব্বর জা যদি উপস্থিত থাকিত, এবং টিটকারী দিয়া লিয়া উঠিত, "হে রঘুবর, আমরা তো সীতার অপ-দ বিশ্বাসই করিতাম, তুমি আমাদের অপবাদ াশঙ্কা দূর না করিয়া যে ঐ বুড়া বামুণের কথায় বং আমাদের গুরু ঠাকুর বশিষ্ঠদেব—যিনি পূর্ব্বে ক্ বিচারই করিয়াছিলেন—তাঁহারও অবশেষে তিভ্রমে সীতাকে নিতে আসিয়াছিলে—দেখ দেবতা বিচার করিয়াছেন—সীতার ভূগর্ভে জীবন্ত সমাধি ইল! দেখ আমাদের আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক!" াহা হইল রামচন্দ্রের অথবা বাল্মীকির উত্তর দিবার ঃ ছিল?

আমার বোধ হয় সমগ্র রামায়ণের মধ্যে এই তার শপথ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ দৃশ্যটির ন্যায় রূপ অদ্ভুত অথচ করুণ দৃশ্য আর একটি আছে ামা সন্দেহ। পুনঃ পরীক্ষার্থ আনীতা মা জানকীর কাভে ও অভিমানে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল—থচ গুরুজন সকলেই চরিত্র শুদ্ধের প্রমাণ দিতে লতেছেন—পতিব্রতা একই কথায় সমস্তই প্রকাশ রিলেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে তথামে ধবি দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। মনসা কর্ম্মণা বাচা। রামং সমর্চ্চয়ে তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতু তি। যথৈতৎ সত্য যুক্তংমে বেদ্মিরামাৎপরং নচ ামে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১১০।১৪-১৬

তখন ভূমধ্য হইতে নাগগণ বাহিত এক দিব্য ংহাসন উত্থিত হইল—

"তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতে নাভিনন্দ্যৈনা মাসনে চোপবেশয়ৎ॥

উ কা ১১০।১৯

এইরূপে সীতা রসাতলে অন্তর্হিতা হইলেন—সমগ্র দর্শক মণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দৃশ্যটির সংক্ষিপ্ত এবং মনোহারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ভবভূতি, নাটক বিয়োগান্ত হইতে পারেনা, তাই সীতার সম্মেলন দেখাইয়াছেন—তথাপি পৌরজনপদগণের সাক্ষাৎ সীতার পবিত্র চারিত্র্য স্বয়ং ভাগীরথী এবং গুরুপত্নী অরুন্ধতী দ্বারা প্রসংসিত করাইয়াছেন প্রজারা নতশিরে সীতার উদ্দেশে অভিবাদন করিল—দেবতারাও পুষ্পবর্ষণ করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। ফলতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুই পথের কোনটি গ্রহণ না করিয়া অতি অশোভন ভাবে নাটকখানির উপসংহার করিয়াছেন। সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি ভূমিকার আর একটি বাক্যের আলোচনা স্থলে দুচারিটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন "পরিশেষে আমি সুধীবৃন্দকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন এই নাটক খানিকে কাব্য কলা হিসাবে মাত্র দেখেন ইতিহাস বা ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন।" নাটককে সুধী কেন কোন অল্পধীও ধর্ম্মগ্রন্থ ভাবিবেনা ইতিহাস ও মনে করিবে না। তবে কাব্য কলা হিসাবে দেখিবার অনুরোধ কেন বুঝিলাম না। কোন্ কাব্যকলা বলিয়া দিবে যে পৌরাণিক চিত্রগুলিকে মলিন করিতে হইবে? পৌরাণিক ঔপন্যাসিক বা ঐতিহাসিক

কোনও সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা নিয়াই নাটক লিখিতে হইবে, ইহা ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের অভিপ্রায়—নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ"—কেননা ইহাতে প্লট্ বুঝিতে তেমন বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু নাটককারের ঈদৃশী কল্পনা শক্তি থাকা চাই যে তিনি পুরাণের বা ইতিহাসের অথবা উপাখ্যানের নায়ক নায়িকাদের চরিত্রের গূঢ় ভাব যথাযথ ভাবে প্রদর্শিত করিতে পারেন। যেন মূলের সঙ্গে তুলনায় তাহার নাটক বস্তু হীনতর না হয়। যদি হয় নাটককারকে অপ্রশংসা ভাজন হইতে হইবে। পৌরাণিক বিষয়ে আবার আর একটি বিপদ্—ঋষি বা দেবতা অথবা মহাপুরুষাদি সম্বন্ধে দেখিতে হইবে যেন তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস পরায়ণ জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত না লাগে। তাদৃশ বিষয়ে নাটক লেখকের যে যে গুণ থাকা চাই দ্বিজেন্দ্রলালের যে ইহা নাই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল ছিল।

এই নাটকে এ ছাড়াও ত্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও কয়েকটি মাত্র না দেখাইলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বাল্মীকির আশ্রমটি দ্বিজেন্দ্রলাল দণ্ডকারণ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন। বাল্মীকি আশ্রম সম্বন্ধে এমন কোনও মতভেদ নাই যে তিনি এ বিষয়ে স্বাধীন মত পোষণ করিবেন। গঙ্গা পার হইয়াই তাহার আশ্রম—তমসা নদীর তীরে—অতএব যে খানে তমসা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থলেই বাল্মীকির তপোবন—ইহা দণ্ডকারণ্যে নহে।

রামের অশ্বমেধ সীতা নির্ব্বাসনের কত পরে হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ভবভূতির উত্তর চরিতের ২য় ও ৩য় অঙ্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—দ্বাদশ বৎসর। রামায়ণেও তাহাই যেন বোধ হয়, কেননা শত্রুঘ্ন সীতা নির্ব্বাসনের সময়ই প্রায় লবণবধের জন্য মথুরা যান সেখানে দ্বাদশ বর্ষ কাটাইয়া (উত্তর কাণ্ড ৮৪ ও ৮৫ সর্গ) অযোধ্যায় রামকে একবার দেখিতে আসিয়া + পুনরায় যান, তাহারই অব্যবহিত পরে এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র লালের নাটকখানি পড়িয়া ঐ ব্যাপার সীতা নির্ব্বাসনের ১০ বৎসর কি ১৫ বৎসর কি ১৭ বৎসর কি ১৮ বৎসর কত বৎসর পরে হইয়াছিল—কিছুই বুঝা যায় না। পরন্তু একবার ১২ বৎসর ও আছে। নিম্নে সমস্তই প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) রাম—* * * জান না তো তুমি কি যে অহর্নিশ নিত্য এই দশবর্ষ। ৪র্থ অঙ্ক। ২য় দৃশ্য ৭৪ পৃঃ।

(২) আবার, সেই পৃষ্ঠেরই সেই বক্তৃতারই পরে আছে—

চলিয়া গিয়াছে এ দ্বাদশ বর্ষ, শান্তিহীন সুপ্তিহীন।

(৩) বাসন্তী * * শুন নাই রঘুবীর অনন্য পত্নীক পঞ্চদশ বর্ষ ধরি। ৪র্থ অঙ্ক। ৫ম দৃশ্য ৭৭ পৃঃ।

(৪) রাম। * * * এই ঘোরতর অন্তর্দাহি এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি দগ্ধ হইয়াছি। ৪র্থ অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য ৯৪ পৃঃ।

(৫) বাল্মীকি। * * শিশু সপ্তদশ বর্ষীয়? ৫ অঙ্ক ২য় দৃশ্য ১০৩ পৃঃ।

বাল্মীকি। কেঁদেছিলি সপ্তদশ বর্ষ ধরি নিত্য যার জন্ম ১৫৯ পৃঃ।

রাম। * * দীর্ঘ সপ্তদশ। বর্ষ পরে দেখা হবে। ৫ম অঙ্ক ৫দৃ ১২১ পৃঃ।

রাম। সপ্তদশ বর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে পত্নী পুত্রে। ১২৫ পৃঃ।

জানিনা দ্বিজেন্দ্র লালের ১৭ বৎসরই অভিপ্রেত ছিল কি না। বলা আবশ্যক যে অশ্বমেধের সংকল্পের (৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্যের) সময় হইতে অশ্বমেধের শেষ (পঞ্চম অঙ্কের ২য় দৃশ্য) পর্য্যন্ত ৫।৭ বৎসর লাগিবার কোন কথা নাই। অথচ একই অঙ্কে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ষসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এর অর্থ কি? এত ছাপার ভুল হইতেই পারে না। বিশেষতঃ ইহা যখন পত্রিকা বিশেষ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শব্দ প্রয়োগেও দু এক স্থানে অসাবধানতা দেখা যায়। একটি বড়ই চমৎকার। সেনাগণ অর্থে সেনানী, লেখা হইয়াছে—

কুশ। + + + শুনিয়াছি কোলাহল সেনানীর—৮১ পৃঃ অরণ্যানী (পানিনি বার্ত্তিক ৪।১।৪৯) শব্দের দেখাদেখি বনানী বঙ্গ ভাষায় খুব চলিয়াছে; ক্ষতি নাই কেননা বনানী শব্দটা নূতন। কিন্তু সেনানী শব্দের অর্থ রূঢ় হইয়া আছে, তাহা এ ভাবে পরিবর্ত্তিত তো হইতে পারে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাট্যকাব্য খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহাকবিগণ অমিত্রাক্ষরে নাটক লিখিয়াছিলেন – তৎপর কবি ড্রাইডেন প্রভৃতি মিত্রাক্ষরে ও নাটক লেখেন। কিন্তু নাটকের বক্তৃতার চরণে চরণে মিল। তেমন ভাল শুনায় না ছড়াকাটার মত শুনায়। নাট্যাচার্য্য ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ও অমিত্রাক্ষরই চালাইয়া ছিলেন; পরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষরের নিগড় পরাইয়াও কবিতাকে চালাইয়াছেন মন্দ নয়। হ্রস্বতর চরণ গুলিতে 'মিল বেশ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আঠার অক্ষরের চরণের মিল তেমন লক্ষ্য হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এই মিল ও সুষ্ঠু হয় নাই যথা।

মরণের চিন্তা; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম; উৎসব মন্দিরে আর্ত্ত ধ্বনি; ১৩ পৃঃ।

অপিচ মিলের জন্য কখন কখন নিরর্থক শব্দের ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যথা—

সেদিন বৈদেহী—সঙ্গে ম্লান মৌন
সৌমিত্রি আযোধ্যা ছাড়ি অতি গৌন
নিঃশব্দ সশঙ্কগতি পুষ্পরথে
চড়ি চলিলেন বনে ৫৬ পৃষ্ঠা।

গৌণ শব্দটীর সার্থকতা কি?

ক্বচিৎ এই পদ্যময় কাব্যের পংক্তি গদ্যের মতন ও শুনায় যথা দুর্ভিক্ষও অনাবৃষ্টি দেশ হ'তে চির নির্বাসিত হোক। ১৩ পৃঃ।

আর না। যথেষ্ট হইয়াছে। আমরা এক প্রকার ইচ্ছা করিয়াই মাত্র দোষগুলি প্রদর্শন করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল এখন পরলোক গত—সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। তাই তিনি স্তুতি নিন্দার অতীত। প্রশংসা পাইলেও উৎসাহ হইবে না অপ্রসংসায় ও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। তবে দোষ প্রদর্শনের সার্থকতা এই যে তাঁহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ

করিবেন—তাহারা যেন সাবধান হন। বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকিলে পৌরানিক চিত্রে হস্তক্ষেপ যেন কেহ না করেন। ধরুণ এই 'সীতা ; ইহার পাত্র পাত্রী যদি অযোধ্যার রাম সীতা ও মহর্ষি বশিষ্ঠ-বাল্মীকি ইত্যাদি না হইয়া কুসুমনগরের বীরেন্দ্র কমলা নামক কল্পিত রাজরাণী এবং আধুনিক পণ্ডিত হরি-শাস্ত্রী রামনিধি ইত্যাদি হইতেন—তবে আমাদের সমালোচনা নিশ্চয়ই কঠোর হইত না। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নানা প্রকার চরিত্র সৃষ্টির রসভাব সমুজ্জ্বল তর্ক যুক্তি প্রয়োগ বহুল রচনার শতমুখে প্রশংসা করিতাম। এই নাটকেও লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে—রামায়ণের ভাব (স্পিরিট্) ব্যাহত হয় নাই। ফলতঃ নাটক কারের প্রধান কর্ত্তব্যই কল্পনা বলে নিজকে বর্ণয়িতব্য দেশ কাল ও পাত্রের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট করা। উত্তর চরিতে সূত্রধার যেমন বলিয়াছেন—

'এ তোৎস্মি কার্য্য বশাৎ আযোধ্যিক স্তদানীন্তনশ্চ।'

সমস্ত নাটককারেরই রামায়ণ ঘটিত বিষয় বর্ণনার তাই সাজিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা পারেন নাই খুটি নাটিতে ও তাঁহার অত্যাধুনিকত্ব ধরা পড়িয়াছে—তাই ভরত রামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'প্রিয়বর' (২ পৃঃ) লক্ষ্মণও বলিয়াছেন 'ভাই' (১১৭ পৃষ্ঠা)।

এখন মধুরেণ সমাপয়েৎ। দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রাণ ছিলেন তাহা না হইলে তাঁহার স্বদেশ প্রেমের গীত গুলি এমন প্রাণস্পর্শী হইত না—তাঁহার প্রাণের প্রার্থনা "এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে মরি।" কেবল তাই নয়, মহাত্মা গোকৃলে যেমন মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—যেন আবার ভারতবর্ষে জন্মি', দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত পুস্তক হইতেও জানিলাম, তিনিও আবার আসিব বলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার 'মন্ত্র' ডাকটিরও অর্থ ইহাই বটে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন।

'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ৮।৬

তাই তাহাকে ঐ 'মন্ত্রর' শব্দেই আবার পাইব হে দ্বিজেন্দ্রলাল, তুমি আসিবে—আইস, আবার বঙ্গ-দেশকে দেশপ্রীতির করুণ মধুর হৃদয়োন্মাদক স্বদেশ সঙ্গীত শুনাইও এবং তোমার অচির ভূতজন্মার্জ্জিত অনার্য বিদেশী ভাব যেন পরজন্মে তোমার নির্ম্মল প্রতিভাকে আর ম্লান না করে তদর্থে আমরা ভগবৎ সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
বিদ্যাবিনোদ এম্, এ।

ধর্ম্ম ও সমাজ।

(সাহিত্য সভার বিংশ বার্ষিক চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

একদিন ভারতবর্ষ যে আর্য্য গৌরবে গৌরবান্বিত িল, শৌর্য্য-বীর্য্য, তেজস্বিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, াত্মতুষ্টি, পরোপকার প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণে ভূষিত ছিল, এখন তাহা হ্রাস হইয়া ক্ষীণ হইতে ীণতর হইবার কারণ কি? ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি াত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজ শত শত বর্ষ যাবত ভারতবাসী পরপদ লিত, এবং নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া নিজেদের াধীন চিন্তা একেবারে হারাইয়াছে। এখন কেবল াদেশীয় চিন্তা স্রোতে পড়িয়া ঘূর্ণিত জল নিপতিত ণখণ্ডের ন্যায় এদিক ওদিক ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে।

যাহারা নানারূপ বাগজাল বিস্তার করিয়া নজেদের বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব ঘোষণা করিতেছেন াহারা পাশ্চাত্য চিন্তার কণামাত্র লাভ করিয়াই নজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। আর যাহারা ৷ চিন্তা স্রোতের একটু বাহিরে আছেন, তাহারা ন্ধ মূকবৎ নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক হইয়া তাহা শ্রবণ রিতেছেন। এবং নিজেকে ও পূর্ব্বপুরুষদিগকে শত শত ধিক্কার দিতেছেন, এ হেন দুর্দ্দিনে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য ধর্ম্মের ক্ষীণালোক একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই, বহু ঝঞ্ঝাবাত ইহার উপর বহিয়া গিয়াছে। এই শত শত বৎসরের ভিতর—কত ধর্ম্মের লয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আজও সেই লুপ্তপ্রায় প্রাচীনতম আর্য্য ধর্ম্ম নিজের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই আর্য্য ধর্ম্মের ভিত্তি যে, কত দৃঢ় তাহা আমরা ইহা দ্বারা অনুমান করিতে পারি। আমাদের স্বাস্থ্য, আচার, নীতি সকলই ধর্ম্মের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত, ধর্ম্মপালন করিলে যেন আমাদের সকলই হইয়া যায়। গৃহীর ধর্ম্ম পালন করিলে গৃহস্থের দৈহিক মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার শান্তি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠ নহি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তি মবা প্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥

শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে মানব ইহলোকে যশলাভ করে। এবং দেহান্তে পরম সুখ লাভ করে।

মরণের পরে সুখ হয় কিনা? সে বিষয়ে বিবাদ থাকিলেও ইহলোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও বিবাদ নাই। ইহলোকে যাহা কিছু সৎ তাহাই আমাদের ধর্ম্ম, কাজেই সদাচরণ করিলে ধর্ম্ম কার্য্য করা হয়, ধর্ম্ম কার্য্য করিলে যশস্বী হইবে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মনু বলিয়াছেন—

"শ্রুতিঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয় মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষনং॥"

শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, এবং সাধুদিগের প্রিয় কার্য্য এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।

অতএব দেখাযায় সদ্ব্যবহার আমাদের ধর্ম্ম সদ্ব্যবহারে লোক প্রশংসিত হয়, ইহা বর্ত্তমান জগতেও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই জন্যই বোধ হয় ভগবান্ মনু বলিয়াছেন।

"ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি...ইত্যাদি।

পার লৌকিক পরোক্ষ বিষয়ে লোকের আস্থা না থাকিলেও ইহলোকে সুখ ও যশাদির আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই আছে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলেও আমাদের ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ অসৎ কার্য্য অসদ্ব্যবহার দ্বারা প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইলেও যশোভাগ্য তাহার ঘটিয়া উঠে না। কেহ গুপ্ত অসৎকার্য্য দ্বারা যশোলাভ করিলেও কালে সে কার্য্য প্রকাশ হইলেই নানারূপ অবমানিত লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। কাজেই সৎকার্য্য, সদ্ব্যবহার ভিন্ন যশস্বী হওয়া যায় না, ইহা ধ্রুব সত্য, এই জন্য সদাচার প্রতিপালন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই সদাচার ও সদ্ব্যবহার নীতি শাস্ত্রের কথা কিন্তু এই নীতি শাস্ত্রের কথাটীকে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া কিরূপ সুন্দরভাবে সমাজে প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে প্রাচীন শাস্ত্রকার গণের যশঃ কীর্ত্তন না করিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। তাহারা যেন দুর্দ্দশাগ্রস্থ পরাজিত আর্য্য সন্তান গণের ভবিষ্যৎ অবস্থা অবলোকন করিয়াই নীতি শাস্ত্রের ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয় গুলি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাজে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজও এই জাতি সেইগুলিকে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, ভারতবর্ষের ভূমি ধর্ম্ম ভূমি, এই স্থানে স্বভাবতঃই ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয়, যেমন কর্ষকদিগের অনিচ্ছা সত্বেও ক্ষেত্রে নানারূপ পরগাছা উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার এই ভারতভূমিতে অনিচ্ছা সত্বেও বিনা চেষ্টায় ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয়, কাজেই এই দুরবস্থায় নানারূপ বিপ্লবের মধ্যেও এজাতির অধর্ম্ম ভীতি কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়।

নীতি না থাকিলে স্বাস্থ্য থাকে না, স্বাস্থ্য না থাকিলে দেহ থাকে না, দেহ না থাকিলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এই ধর্ম্ম-ভূমিতে উৎপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ জাতি সকল ভুলিলেও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্মটীকে ভুলিতে পারিবে না। তাই স্বাস্থ্য ও নীতি ধর্ম্মের সহিত গ্রথিত করিয়া, শাস্ত্রকারগণ এ জাতির সমূলে বিলোপের সম্ভাবনা নিরাশ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন— "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" আদ্য ধর্ম্ম সাধনং শরীরং শরীরই ধর্ম্মের প্রধান সাধনা অতএব শরীর রক্ষা না করিলে তোমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্মসাধন কি করিয়া করিবে?

সুতরাং যিনি ধার্ম্মিক হইবেন তাহাকে নীতি প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে, অন্যথায় ধর্ম্ম প্রতিপালন তিনি কিছুতেই করিতে পারিবেন না, আমরা বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র জীবনের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বহুছাত্রই অধ্যয়নের জন্য বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে, সেই পরিশ্রমের

ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য অকালে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পিতা পুত্রকে অধ্যয়নের জন্ত স্কুল বা কলেজে প্রবেশ করাইয়া বার্ষিক পরীক্ষায় তাহার উচ্চতর সংখ্যার প্রাপ্তি দেখিলেই নিজের কার্য্যের কিছু মাত্র ক্রটী হয় নাই ইহা মনে করিয়া থাকেন।

তাহার পর ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসে, তখন তাহার মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি মনে করেন আমার মত কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতা কয়জন! নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া পুত্রকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছি; তাহা কয়জনে পারিয়া থাকেন। এখন আমার পুত্র ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আমার নানারূপ সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিবে। আমার মত ভাগ্যবান্ কয়জন! এই সকল ভাবিয়া নিজের আনন্দে নিজেই সর্ব্বদা বিভোর থাকেন।

কিন্তু তিনি ভ্রমেও জানিতে পারেন না যে, তাহার পুত্রের স্নায়ু মণ্ডলী ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম প্রতিপালনের অভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাহার পুত্রের জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তাহার পর যখন দুর্দ্দমনীয় রোগে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে তখন হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতে থাকেন।

দেশীয় বিদেশীয় নানা চিকিৎসক ডাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করেন, তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রের শুশ্রূষা করিতে থাকেন চিকিৎসকের বাক্যানুসারে যাহাতে সকল ব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। চিকিৎসা বিষয়ে কোনরূপ ক্রটী না হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান্ থাকেন, কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও তাহার রোগ প্রতিকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই আহার বিহারাদির অনিয়মেও গুরুতর মানসিক পরিশ্রমে তাহার দৈহিক শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে স্নায়ু মণ্ডলী দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। পাকস্থলীর ক্রিয়া আর ভালরূপ হয় না। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। কাজেই ঔষধাদি পাকস্থলীতে যাইয়া রসরক্তাদি রূপে পরিণত হইয়া শরীরের পোষকতা করিতে পারে না।

পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান গৃহে ষোড়শ বর্ষীয়া পত্নী বিদ্যমানা, এই অবস্থায় পিতার একমাত্র পুত্র মৃত্যু শয্যায় শায়িত, সকলেই হাহাকার করিতেছেন। সকলেই রোদন করিতেছেন, চিকিৎসক বলিলেন আর বিলম্ব নাই এখনই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে। এই ভাবে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম একমাত্র পুত্র, মাতা পিতা ভ্রাতা বনিতা প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইহ লোক ছাড়িয়া যাইতেছে। যাহার উপার্জ্জিত যশ এবং অর্থ দ্বারা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হইবেন ভাবিয়া ছিলেন, এবং যে আশার মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাঠ্যাবস্থায়—অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সেই আশার কুহক আজ— ভাঙ্গিয়া গেল। সেই পুত্র তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এ দুঃখ এ অনুতাপ রাখিবার

স্থান কোথায়। সভ্য মহোদয়গণ! এইরূপ ঘটনা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহার মূল অনুসন্ধান পূর্ব্বক এখনও প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে এজাতির ভবিষ্যতে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই নীতিও স্বাস্থ্য প্রতিপালনে লোক সকল পরাঙ্মুখ হইতেছে, সমাজ বন্ধন শিথিল হইতেছে, সামাজিকগণের শাসন আর কেহই মানিতে চাহেনা। সকলেই স্বেচ্ছা চারী। স্বেচ্ছা চারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে জাতির সর্ব্বনাশের মূল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সমাজের ভিতরে যদি ধর্ম্মের বন্ধন না থাকে যাহার যাহা ইচ্ছা সে যদি তাহাই করিতে পারে, তাহা হইলে ইতর জীব সমাজ হইতে মানব সমাজের কিছুই বিশেষত্ব থাকেনা এবং ভগবান্ মানব কে ইতর জীব অপেক্ষা যে বিশেষ শক্তি দিয়াছেন তাহার অপব্যবহারই করা হয়, সুতরাং মানব সমাজে ধর্ম্ম ভিত্তির স্থাপন ঋষিগণ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় আজ যদি সেই ধর্ম্মের ভিত্তি অটুট অবস্থায় থাকিত,—তাহা হইলে এখন নব্য যুবকদিগকে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিতে হইত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋষিগণ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নীতি ও স্বাস্থ্য সমাজের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকের আর সেই ধর্ম্মভাব নাই, এই কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হইবে এই ভীতি আর বিশেষ নাই।

দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক পুষ্টিসাধনের পূর্ব্ব হইতেই যদি শারীরিক বল ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে দেহের উন্নতির মূল পূর্ব্বেই উচ্ছেদ হইয়া যায়, ইহা বোধ হয় আপনারা সকলেই বুঝিতে পারেন।

আমাদের শাস্ত্র মতে চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন সম্যকরূপে হয় না, সে ক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্ব হইতেই গুরুতর পরিশ্রমেই হোক অথবা অন্য কোন অবৈধরূপেই হোক—শারীরিক বল ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে, তাহার ভবিষ্যতে অকালেই দেহের অবনতি অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বে পুত্রকে অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কারণ তখন ছাত্রগণ গুরুর নিকটেই বাস করিত গুরুর নিকটে বাস না করিলে অধ্যয়নই করা যাইত না এক গুরুর নিকটে বহুবিদ্যার্থি বাস করিত, প্রত্যেকেই মিতাচারী মিতাহারী ও মিতভাষী হইয়া নিয়ম পালন করিতে হইত, প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন্ন করিতে হইত, কেহ কোন অসদাচরণ করিত কি না সেদিকে গুরুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অধ্যয়ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি অধিক পরিমানে লক্ষিত হইত।

এইরূপে ত্রিকালজ্ঞ পরহিত কারী ঋষিদিগের পরিচালিত পাঠশালায়, যিনি অধ্যয়নার্থী তাহাকেই যাইতে হইত। তিনি ধনী হউন দরিদ্র হউন এমন কি রাজ রাজেশ্বরের পর্য্যন্তও অধ্যয়ন করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন পূর্ব্বক ঐ সকল কষ্ট সহ্য করিয়া, ঋষিদের নিকটে বাস না করিলে বিদ্যা শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

ঋষিগণ কেবল বিদ্যা দান করিয়াই নিশ্চিন্ত

থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিদ্যার্থীর আচার ব্যবহার, বাক্যালাপ, প্রভৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে কালের বিচিত্র লীলায় আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে সে সুখ সে শান্তি, সেই মানসিকভাব সে শিক্ষাপদ্ধতি অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে, যে আর্য্য গৌরব ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিল, যে অতীত কাহিনীর স্মৃতিটুকু মাত্র নিয়া আজও ভারত বাসী পূর্ব্ব গৌরবের ঘোষণা করিতেছে। তাহা এই হতভাগ্য ভারত ভূমি হইতে, অনেক দিন সরিয়া পড়িয়াছে। আজ ভারতবাসী জ্ঞানের ভিখারী, ধনের ভিখারী, শৌর্য্য বীর্য্য মনুষ্যত্বের পর্য্যন্ত ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে যে শিক্ষালব্ধ নিয়মানুসারে, —যে শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত, তাহাতে অধ্যাপকের আর ছাত্রগণের চরিত্র বা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিবার—কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহারা মনে করেন না,। এ দিকে মাতা পিতাও পুত্রকে তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া পুত্রের স্বাস্থ্যও চরিত্রের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। বাল্যকাল হইতে খেক্‌শিয়াল ও কুকুরের গল্প অধ্যয়ন করায় পিতা মাতা এবং অধ্যাপক কাহারও সেই দিকে দৃষ্টি না থাকায়, বালকের হৃদয়ে কোনরূপ ধর্ম্ম বীজ উপ্ত না হওয়ায় চরিত্রগঠনের প্রত্যাশা প্রায়শঃ লুপ্ত হইয়া যায়।'

যতদিন বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগ, ছাত্রগণের স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না করিবেন, যতদিন সেইরূপ ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্ অধ্যাপক নিয়োগ করতঃ ছাত্রগণের সহিত একত্র বাসের ব্যবস্থা না করিবেন, ততদিন যদি ছাত্রগণের অভিভাবকগণও এ বিষয়ে এইরূপ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ অকাল মৃত্যু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া দেশকে শ্মশানে পরিণত করিবে। ইহা ধ্রুব বিশ্বাস।

অতএব শিক্ষা বিভাগের যতই উন্নতি হউক না কেন, কর্ত্তৃপক্ষ মনিস্বী ব্যক্তিগণ যতদিন এই সকল বিষয়ের ভাবনা না করিবেন ততদিন শিক্ষা বিভাগের সংস্কার এবং উন্নতিকে আমরা অবনতিরই মূল বলিয়া জানিব। শিক্ষাই জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মে মূল, শিক্ষাই জগতের হিতাহিত বিধান্ করে। শিক্ষাই সমাজ গঠিত করে। কিন্তু স্বাস্থ্যহীন, চরিত্রহীন এবং ধর্ম্মহীন শিক্ষা দ্বারা জগতের কোনরূপ মঙ্গল কর কার্য্য কখনও হইতে পারে না, ইহা বর্ত্তমান সভ্য সমাজেও অস্বীকৃত নহে। অতএব চরিত্র শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা এবং নীতি শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে করা উচিৎ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন।

"বেদানধীত্য বেদৌবা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥"

সমগ্র বেদ অথবা বেদের দুই শাখা অথবা এক শাখা মাত্র; মন্ত্র ব্রাহ্মণের ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, অধ্যয়ন শেষ হইলে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গৃহেফিরিয়া দার পরিগ্রহ করিবে।

মনু বলিয়াছেন :—

"গুরুনানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধিঃ।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণা লক্ষনান্বিতাং॥"

গুরুর অনুমতি নিয়া যথা বিধি ব্রত, স্নান,

সমাবর্ত্তনের পর সুলক্ষনা সবর্ণাস্ত্রীকে বিবাহ করিবেন।

বিবাহ হইল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূল সূত্র। তাই শা—কারগণ বিবাহ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত ধর্ম্ম মূলকতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য জাতির বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে। ঐহিক নানাবিধ সুখের জন্য নহে। ইহ লোকে সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবার জন্য, কঠোরতা অভ্যাস করিবার জন্য, এবং পারলৌকিক সদগতির জন্য বিহিত হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে অবশ্য মনে করা যায় যে, বিবাহ কেবলই ইহলোকের সুখ সম্ভোগের জন্য। বিচার পূর্ব্বক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের আর্য্য শাস্ত্র সম্মত বিবাহ যে সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীতে যত জাতীয় যত দেশীয় বিবাহ আছে বোধ হয় এইরূপ ধর্ম্মমূলক বিবাহ কোথাও নাই। এমন কি ভিন্ন দেশীয় লোকেরা এই ধর্ম্মমূলক সুচিন্তিত আর্য্য বিবাহ ধারণা পর্য্যন্তও করিতে অক্ষম।

দাতা এই প্রকার অস্খলিত ব্রহ্মচারীকে কন্যা—প্রদান করিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং নিজেরও পূর্ব্বপুরুষগণের পারলৌকিক সদগতির ব্যবস্থা করিলেন। ইহলোকেও যশস্বী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেন। গ্রহীতা ঐ কন্যাটীকে ধর্ম্ম কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সহায় কারিণী গ্রহন করিলেন, ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তা করিবেন বলিয়াই তাহার নাম সহধর্ম্মিণী। তখন ঘরে ঘরে অগ্নি হোত্র হইত। সপত্নিক হইয়া অগ্নি হোত্র করিতে হয় ইহা শাস্ত্রের বিধান। বিবাহের পরে পত্নীকে গৃহে আনিয়া তিনি সেই অগ্নি হোত্র কার্য্যের অধিকারী হইলেন।

পঞ্চস্থনাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য। বেদের অধ্যাপনা, তর্পণ প্রাত্যহিক হোম, এবং পশু পক্ষী প্রভৃতিকে অন্নদান অতিথি সৎকার ইহাই পঞ্চমহা যজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একাকী করা সম্ভব নহে। অগ্নি হোত্র প্রভৃতি হোমের অগ্নিরক্ষা করা, কাহারও সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নহে। সুতরাং সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। যে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া এই সকল পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেনা, নিশ্বাস প্রশ্বাস থাকিলেও শাস্ত্রকারগণ নির্জ্জিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন গৃহস্থ দম্পতি অগ্নি হোত্র পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, এমন কি দাস দাসীদিগকেও ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবেন। মনু বলিয়াছেন ভুক্তবৎস্বথবিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহী। ভুঞ্জীয়াতাম্ ততঃ পশ্চাদবশিষ্টস্তু-দম্পতি॥ দেবান্ ঋষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ। পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ গৃহস্থ শেষ ভুগ্ ভবেৎ॥" অর্থাৎ গৃহস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে ও ভৃত্যাদিগকে পর্য্যন্ত ভোজন করাইয়া, দেবতা, ঋষি, অতিথি, পিতৃলোক এবং গৃহ দেবতার পূজা করিয়া অবশেষে দম্পতি ভোজন করিবেন।

এই আহার্য্য যাহাতে কোনরূপ অমেধ্য না হয় ও অপরিমিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হিতকর পবিত্র আহার্য্য পরিমিত রূপ ভোজন করাই শ্রেয়ঃ অন্যথা সেই আহার্য্য তাহার শরীরের কোনরূপ পুষ্টিসাধনই করিতে পারিবে না।

এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ আমাদের দেশে আহার্য্য সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ দেশের অবস্থা অবলোকন করিয়া যাহা হিতকর মনে করিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় লোকের আহার্য্য স্থির করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের স্বার্থের বশীভূত হইয়া কোন উপদেশ দিয়া যান নাই যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় মানসিক বল বৃদ্ধি হয় ধর্ম্মে মতি হয় এইরূপ আহার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্বার্থপরতা, জাতি বিদ্বেষ প্রভৃতি নানারূপ কলঙ্ক ঘোষনা করিয়া, আর্য্য শাস্ত্র নিষিদ্ধ রুচিকর নানারূপ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে নিজের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে আবার পঞ্চমবর্ষীয় বালক, যাহার কোনই হিতাহিত বোধ হয় নাই তাহাকেও ঐ সকল নিষিদ্ধ আহার্য্য ভোজন করিতে শিখাইতেছি। ইহা অনুমানের কথা নহে সমাজের ভিতর গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। হইতে পারে তিনি জানিয়াছেন, রাসায়ণিক প্রক্রিয়ানুসারে ঐ সকল খাদ্যে কোনরূপ দোষনীয় পদার্থ নাই। হইতে পারে এইরূপ আহার্য্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু সেই বিজ্ঞান সেই রসায়ন শাস্ত্র ইহলোকের হিতাহিত নির্দ্ধারণ করিতেই সমর্থ। ইহলোকের বাহিরে হিতকর হবে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় শয্যাগ্রহন পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাত্যহিককার্য্য তাহার কোনটীকেই কেবল ইহলোকের হিতসাধন উদ্দেশে বিহিত করেন নাই। আমাদের আহার্য্য কেবল স্থূল শরীর পোষক নহে, সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া পারলৌকিক হিতাহিতেরও বিধান করে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্নময়োহি সৌম্য মনঃ" অন্নের বিকারই হইল মন অর্থাৎ অন্নের সূক্ষ্মাংশরস রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া মনকে পুষ্টকরে। এক কথায় বলিতে গেলে অন্নের স্থূল পরিনতিই দেহ, সূক্ষ্ম পরিণতিই মন। এই দেহের কার্য্য যতটুকু তাহা ইহলোকেই শেষ হইয়া যায়। তাই মৃত্যুর পরে এই দেহ পূতি গন্ধময় হইয়া উঠে বলিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে সূক্ষ্ম দেহের কায কেবল ইহলোকে শেষ হয় না।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার দশইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ এই অষ্টাদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এই সূক্ষ্ম দেহ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কাররূপে লোকান্তরে বহন করিয়া বেড়ায়। জন্মজন্মান্তরে স্থূল শরীরের যতই বিভিন্নতা হউক না কেন ঐ সূক্ষ্ম দেহের কোনই বিভিন্নতা হয় না। অমেধ্য পানাহারের দ্বারা দেহ যেমন নানারূপ রোগাক্রান্ত হইয়া বিকৃত হইবার সম্ভাবনা সূক্ষ্ম দেহেরও সেই সম্ভাবনা আছে। সূক্ষ্ম দেহ বিকৃত হইলে পারলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মবিকৃত হইয়া পড়িবে। এই কারণেই আমাদের পানাহারে কোনরূপ অমেধ্যতা না আসে কোনরূপে দেশ কাল পাত্র বিরুদ্ধ না হয়, সমাজের ভিতর কোনরূপ বিরুদ্ধ আহার না আসে সে দিকে আর্য্য শাস্ত্র কারগণের বিশেষ দৃষ্টিছিল। তাঁহারা আর্য্য সমাজে যে যে আহার্য্যের বিধান করিয়াছিলেন তাহা সকলই স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহের পরিপোষক। বর্ত্তমান সময় ঋষিদিগের বাক্যে প্রায় কাহারও বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম

শাস্ত্রের কথা আর কেহ শুনিতে চাহে না। সমাজে ঘরে ঘরে আর অগ্নি হোত্র হয় না। পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, আহারের নিয়ম বিশেষ কেহ মানিতে চাহে না। সকলেই বিদেশীয় ভাবে মগ্ন, বিদেশীয় শিক্ষা বিদেশীয় নীতি, বিদেশীয় হাবভাব যেন দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। একবার আমরা ভাবিয়া দেখি না যে বিদেশীয় আহার ব্যবহার আমাদের উপযুক্ত কি না আমাদের এ স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা বিদেশীয় ভাবের অনুকূল কি না? আমরা দিন দিন কোথায় আসিয়া পড়িতেছি, একি আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি না অবনতির চরম সীমায় পৌছিবার পথ উন্মুক্ত করিতেছি, ইহা চিন্তা করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না।

মৃত্যুর পর নিজেরও পিতৃলোকের পারলৌকিক সদ্‌গতি বিধানের জন্য ইহলোকে অগ্নি হোত্র ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য দম্পতি সৎপুত্রের প্রার্থনা করিতেন, একটী সৎপুত্রের জন্য পিতা মাতা কত কঠোরতাই অবলম্বন করিতেন, তাহার ফলে একটী সৎপুত্র জন্মিলে তাহাদ্বারা ঐহিক পারলৌকিক সুখের বিধান হইত।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সচ্চরিত্র বিদ্বান্ পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐরূপ পুত্র পাইতে হইলে কত কঠোরতাও কত তপস্যা করিতে হয় এবং পিতামাতাকে যে কত সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখি না। নিজে নানারূপ অসৎকার্য্য করিব অনিয়ম অত্যাচার যতদূর সম্ভব তাহা করিব মিথ্যা কথা, মদ্যপান, পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি যত অসৎকর্ম্ম আছে তাহা সকলই করিব কিন্তু আমার পুত্রটী সাধু, সচ্চরিত্র, বিনয়ী শিষ্টাচারী বিদ্বান্, ধার্ম্মিক হো'ক এই ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, ইহা কি কখনও হইয়া থাকে যাহার কারণ যেরূপ কার্য্যও তদনুরূপ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা দ্বারা কখনও স্বর্ণ পাত্র নির্ম্মিত হয় না, মৃৎপাত্রই হইয়া থাকে, শৃগালের ঔরসে কখনও সিংহ হয় না শৃগালই হইয়া থাকে। যদিও কার্য্য কারণের এই নিয়ম পূর্ব্বাপর সর্ব্ববাদী সম্মত, তথাপি একটী সৎপুত্র উৎপাদন করিবার জন্য যে সংযম ও সদ্‌গুণ অবলম্বন করিবার আদেশ শাস্ত্রকারগণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে সমাজে সে আদেশ প্রতিপালিত হইত বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণ সৎলোকের সংখ্যা অধিক পরিমানে দৃষ্ট হইত। প্রায়শঃই লোক ধার্ম্মিক হইত, এইরূপ বিবাহ সংস্কারের ভিতর দিয়া সমাজের ভিতরে ধর্ম্ম ভাবের প্রেরণা আর্য্য ঋষি করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারাতেই আজ কাল নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রোক্ত অগ্নি হোত্রাদি কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্ব সমাজেই ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিবাহাদি সংস্কারের ভিতর যে ধর্ম্ম মূলকতা আছে তাহা সমাজের প্রায় অনেকেই জানেন না, আমাদের সামাজিক প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া আর্য্য জাতির শিরায় শিরায় যে ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর স্মৃতি পথে জাগরিত হয় না, এখন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রভাবে কাল প্রভাবে সাহজিক সরল প্রত্যেক

দৃষ্ট বিষয়েই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। অদৃষ্ট, অলৌকিক বিষয়ে প্রায়শঃ, কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বহু শত বৎসরের পরাধীনতার ফলে আর্য্যজাতি স্বাধীন চিন্তা করিতে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে, এখন যাহারা আমাদের চালক, তাহারা যে পথে চালাইতেছেন, যে চিন্তা স্রোতে ভাষাইতেছেন, যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করাইতেছেন তাহাই আমরা বিশ্বাস করি। তাহারা এমন সুকৌশলে এই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে জাগাইয়া দিয়াছেন যে, কোনরূপেই তাহাদের ভ্রম প্রমাদাদি আমরা বুঝিতে পারি না। তাহারা যাহা বলেন ও যাহা করেন তাহাই আমরা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্তিও হয় না। কিন্তু প্রাচীনতম ঋষি-দিগের বাক্য ভ্রান্ত এবং প্রলাপ বচণ মনে করিয়া উপহাস করিয়া থাকি। এই উপহাসও নিজের শক্তিতে নিজের বুদ্ধি বলে করি না, আমাদের চালকগণ সেই সকল ঋষি বাক্যে যে সকল কারণ দেখাইয়া উপহাস করিয়া থাকেন আমরা কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহাই অনুবাদ করি।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান শিক্ষিতাভিমানী সমাজে এই অধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি হয়। তাহার পর এই অধর্ম্ম ভাবের প্রভাব শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজেই বিস্তৃতি লাভ করে। শিক্ষিত সমাজের উচ্চস্তরে যে ঘণ্টা ঘোষিত হয় তাহার শব্দ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে অশিক্ষিত সমাজের নিম্নস্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে।

এইরূপে অধর্ম্ম ভাব বিস্তারের ফলেই আজ আমরা সমাজের ভিতর নানারূপ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করিতেছি। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের জাতিগণ অনেকেই উচ্চপদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্র বিগর্হিত অধর্ম্ম কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছেনা।

নাপিত জাতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে। সুবর্ণবণিক ও গোপজাতি বৈশ্যত্বের দাবী করিতেছে। এমন কি নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল জাতি, ব্রাহ্মণত্বের দাবী করতঃ পাক শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

নিম্নস্তরের হিন্দুগণ উচ্চস্তরের হিন্দুদিগকে যে প্রকার সম্মানের চক্ষে দেখিত, এখন আর সেই রূপ দেখেনা পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরও একটী দেশীয় ভৃত্য পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেহই যেন আর নীচু থাকিতে চাহেনা। সকলেরই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। এই সকল আন্তর্জাতিক বিপ্লবে সমাজ শরীর একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে পূজ্য, পূজাক্রম না থাকিলে, মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা না করিলে, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পরে। সমাজের শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা সমাজের উপকার বা অপকার সাধিত হইয়া থাকে। সৎপথে পরিচালিত হইয়া, সৎকার্য্য করিলেই সমাজের উন্নতি হয়, অসৎ কার্য্য দ্বারা সমাজ বিকলাঙ্গ হইয়া উঠে। তাহার ফলে অধঃ-পতন অবশ্যম্ভাবী।

যখনই সমাজ এইরূপ অধঃপতনের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই এক একজন মহাপুরুষ

আবির্ভূত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন সমাজ পুনরায় গ্রথিত করিয়া যে বর্ণের যে কার্য্য তাহার বিধান করতঃ সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানবজাতির রক্ষা বিধান করেন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের যেরূপ বিশৃঙ্খল ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ভগবান ঐরূপ কোন মহাপুরুষের দ্বারা স্বীয় শক্তির চালনা না করিলে এই সনাতন ধর্ম্মও সমাজ রক্ষা হইবার আর কোন উপায় নাই।

ভগবান বলিয়াছেন

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

তাঁহার এই বাক্যানুসারে এইরূপ ধর্ম্ম গ্লানি সময় তাঁহার পুনরায় আবির্ভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ পতাকা উড্ডিন করতঃ হিন্দু জাতির রক্ষা বিধান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী—
সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-মীমাংসা তীর্থ

সুন্দরানন্দ পাট।

এই কি দ্বাদশ পাটে পাট অন্যতম।
হেথা কি সুন্দরানন্দ বৈষ্ণব প্রধান—
বিলায়ে এ বিশ্ব মাঝে ধর্ম্ম অনুপম;
চৈতন্যের সার তথ্য লভেছে নির্ব্বাণ।
মুরছি' সুন্দর ধ্বনি কেঁপেছিল তট—
এই কি মহেশপুর এই কি সে পাট॥
হৃদয় মদন শঙ্কা কোথা হরিধ্বনি,
কই সে নিষ্কাম প্রেম; গাহে না তো কেহ
হরি হরি হরি রবে; শুধু অরণ্যানি
রয়েছে ব্যাপিয়া যেন দিয়া মাতৃস্নেহ।
বিরাজিত মধ্যস্থলে পূতপীঠ তার
স্মৃতিটুকু দিয়া ঘেরা প্রণম্য সবার॥

বল—বল অরণ্যানি? কই সে সাধক,
যাহার সাধনা বলে মেতেছিল ধরা।
আরবিত প্রতিধ্বনি কোথা সে গায়ক,
আজো যার গীতি-স্মৃতি গায় সপ্ত স্বরা।
কই দিলে না উত্তর, শব্দ নাই—হায়।
নির্ব্বানে নিস্তব্ধ বুঝি সকলি হেথায়॥
যদিও জাগাতে আজো তব পুণ্যস্মৃতি
প্রতি বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় আকিঞ্চন,
জ্বলে দীপমালা, গাহে মাঙ্গলিক গীতি;
মধুর সে স্মৃতি কিন্তু আনে না কখন।
মন্দিরে আলোক মালা জ্বলে অনিবার—
বন মাঝে পুণ্য পীঠ থাকে অন্ধকার॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

মণিভদ্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তৃতীয় দৃশ্য

জেতবন।

মণিভদ্র।

গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুণীগণের প্রবেশ।

গীত।

ঐ সান্ধ্য গগনে রক্তিমরবি ধীরে ডুবিয়া যায়।
দিবসের আলো মিশালো নীরবে সাঁঝের বিষাদ ছায়॥
আবরে ধরণী তিমির বসনে,
আসে নিশীথিনী জড়িত চরণে,
রুকের কুচি গুটি গুটি ফুটি মিটি মিটি তারা চায়।
পাখী ডেকে বলে দূর তরু শিরে,
চকিত হরিণী চায় ফিরে ফিরে,
জলে ওঠে কুটীরে কুটীরে ঝিমিকি থমকি গায়॥
(সকলের প্রস্থান।)

কি সুন্দর নির্ম্মল জীবন
মন যেন এ মর্ত্ত্যের নয়;
সুখ দুখ নাই, আনন্দ সদাই
তাই গায়, যায় হেসে খেলে
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে
ভগবান জানে শুধু।
কবে হবে দিন, পাব এ স্বাধীন গতি?
বন বিহঙ্গ যেমতি
আত্মরতি ঘুরিব ফিরিব
ভাসিব এ শান্তি সুখে।
হায় প্রভু প্রেমময়, কি হেতু আমায়
পবিত্র এ ভিক্ষু সংঘে না দিলা আশ্রয়?—

রত্নমালার প্রবেশ।

রত্ন। ধন্য তুমি সাধু সদাশয়
নেহারি তোমায়
ধন্য হয় দেহ মন।
ধন্য সার্থক জনম
নিমন্ত্রণ দেছ ভগবানে
শ্রীচরণে লভেছ আশ্রয়
জরামৃত্যু ভয় করিয়াছ অতিক্রম
পেয়েছ পরম ধন নির্ব্বাণ রতন।
কত দিনে কবে যে না জানি
তোমার সরণি ধ'রে ধন্য হব আমি।

মণি। দেবী তুমি অমৃত ভাষিণী
শুনি বাণী মধুরে মরম ভাসে;
আসে জেগে ওঠে প্রাণ
অবসান অবসাদ;
বড় সাধ এ সংঘ সংহতি

কিন্তু নাহি অনুমতি
বিরোধী কি জানি কেন প্রভু ?
রত্ন। খেদ নাহি কর সাধুত্তম
প্রয়োজন অবশ্য গভীর
জেনো স্থির কৃপা দৃষ্টি তাঁর
সংসার মুক্তির হেতু।
মন আশ অবশ্য পূরিবে
লভিবে আনন্দ স্থান।
কর্ম্মক্ষয় নাহি হয় যদবধি
এ উত্তমগতি প্রতিরোধ।
তুমি সুগতের সাধক সেবক
আলোক উজ্জ্বল হবে ভূমণ্ডল তব ভাবে
দেব নরে গাবে যশোগাথা।
নহে মিথ্যা কথা
ইচ্ছা শক্তি বিশ্বাস আমার
বারবার আঘাতে হৃদয় দ্বার।
মণি। দিব্য চক্ষু আছে কি তোমার বালা ?
ভবিষ্যৎ সত্য কি নয়নে ভাসে ?
আশ্বাসে সঞ্জীব যেন ক্লান্ত মন।
যেই দিন প্রথম দর্শন
আবরণ উন্মোচন যেন ;
আচম্বিতে সম্বিৎ বিকাশ
প্রসন্ন আকাশ দিক সুপ্রকাশ
সুবাস ভরিল বিশ্ব।
প্রীতি স্নিগ্ধ আঁখি তোমার নিরখি
কি দেখি কি দেখি যেন।
কি গরিমা মাধুরিমা সনে
তোমার বদনে
জাগে মনে প্রসাদ গম্ভীর নম্র।
চমৎকার দেখিনু আবার
লয়ে পুষ্পভার দেবতার পূজা কি সুন্দর!
মর্ত্ত্যে স্বর্গ উঠিল ফুটিয়া
নয়ন মুদিয়া আরাধিলে ভগবানে যবে,
কি অদ্ভুত ভাবে
পরিপূর্ণ হ'ল ধরা ;
আত্মহারা উপাসিকা পদতলে
বেদীমূলে ভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী ;
স্থির ধীর দেবতা অচল
পূজ্য পূজকের কিবা মিলন নির্ম্মল।
স্তব্ধ মুগ্ধ ক্ষণে চরাচর
স্বর্গীয় সঙ্গীতে পূর্ণ সাগর অম্বর!!

অনাথ পিণ্ডিকের প্রবেশ।

অনাথ। কুমারি, যানবাহনাদি প্রস্তুত পরিজনব নিশাসমাগমে প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত, আর বিলম্ব ক উচিত নয়,আশা করি যে কয় দিন ভগবান বুদ্ধ এস্থা অবস্থান ক'রবেন, প্রত্যহ তাঁর পূজায় এবং আমাদে প্রীতি সম্ভাবনায় উৎসাহ বর্দ্ধনে পরাঙ্মুখ হবেন না।

রত্ন। নমস্কার করি মহাভাগ ;
উদার কুমার,
মগ্ন আছ নিজ ধ্যানে
আন্তর সহানুভূতি বুঝ প্রাণে প্রাণে।

(প্রস্থান।

মণি। মহাশয়, আমি ত পিতার ত্যাজ্যপু তবে কেন ভগবান হতভাগাকে এ পবিত্র পথ দীক্ষিত কচ্ছেন না ?

অনাথ। বৎস, বালক বা সংসারীর পক্ষে এ মার্গ হুঃসাধ্য নয়; ভগবানে যদি মতি থাকে তাঁর পদেশবাণী যদি মর্ম্মে লেগে থাকে, নিশ্চয়ই শান্তি াবে, নিশ্চয়ই শুক্লমুক্ত নির্ম্মলস্বভাব বুদ্ধের বিমল ভাবে পরমনিবৃত্তি লাভ ক'রবে, সকল সময় সকল বস্থায় মনে রাখতে হবে ভগবানের সেই এক কথা র্ব্বংক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং ক্ষণিকং সুখং শূন্যং ন্যমিতি"।

মণি। আহা কি প্রাণস্পর্শী গভীর উপদেশ বাণী, শান্তিপূর্ণ বিসম্বাদশূন্য নির্ম্মল মুখ কান্তি, কি সেই ান দীপ্ত উজ্জল ভাস্বর দৃষ্টির স্নিগ্ধতা; প্রসন্নতার নে সেই মূর্ত্তিখানি একটী মাত্র করুণ চাহনিতে গতের সকল দুঃখরাশি প্রভাত রশ্মিতে তামসীনিশির য় কোথায় দূর ক'রে দেয়। কাল যখন শ্রীমুখ-ঃসৃত উচ্চ তত্ত্ব শুনছিলেম, কোথায় ছিলেম কিছুই ন ছিল না, একদিন আমার সকল দুঃখের অবসান য়া গিয়েছে নূতন জীবন পেয়েছি মাকে পর্য্যন্ত যেন ল যাচ্ছি। যখন পেয়েছি, আর ছাড়তে পারি না। মি তাঁর পায়ে ধরে কাঁদব, আর ছাড়তে পারবেন তিনি দয়ার সাগর কখনই আমাকে সঙ্গবিচ্যুত ত্তে পারবেন না।

অনাথ। স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমানে পিতা বর্ত্তমানে তাদের অকপট সহানুভূতিপূর্ণ অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুবক বা বালককে তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন না। প্রভুর অভিপ্রায় অবিরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠান। ভগবানের এক মহান উপদেশ।

'মধ্যমা প্রতিপত্তিঃ।'

মণি। বুঝেছি; পরের দুঃখ পরের দৈন্য দূর করা যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এইরূপ নিয়মই তার নির্দ্দিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আমি পিতার কাছে যাব, আজই যাব অনুমতি চাব, নিশ্চয়ই তাঁর অনুমতি পাব, কারণ আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। ভগবানের চরণবন্দনা ক'রে যাত্রা ক'রব, কখনই ব্যর্থ মনোরথ হব না। এ ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ ব্যতীত আর কিছুতেই আমি শান্তি পাব না।

(প্রস্থান)।

অনাথ। বালক উচ্চলক্ষ্য; মহৎ ভদ্র! তুমি এর পিতা, এ ধর্ম্মবিরোধিতা কিছুতেই তোমাতে থাক্‌বে না, থাকতে পারে না।

(প্রস্থান)।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামচন্দ্র কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ।

শৈবলিনী

ভারতের মধ্যযুগ যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, বিশাল যবন সাম্রাজ্য যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত হইবার উপক্রম করিতেছিল সেই সময়ে শৈবলিনীর আবির্ভাব। কলনাদিনী জাহ্নবীর তীরে জনজলপূর্ণ কোন পল্লীগ্রামে শৈবলিনীর জন্ম। যে রত্ন কুবেরের ভাণ্ডারে থাকিলে মানাইত, তাহা দরিদ্রের গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে স্থান পাইল। যে কুসুম ধনীর প্রমোদ কাননে ফুটিলে সার্থক হইত, তাহা পল্লীর ঘনান্ধকার তলে ফুটিয়া উঠিল। বিলাসীর কণ্ঠহার, প্রেমিকের আশা, যৌবনের পুষ্পিতা লতা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিল। শৈবলিনী জন্ম-দুঃখিনী। শৈশবেই নিরাশ্রয়া। সংসারে বিধবা মাতা ব্যতীত আপনার বলিতে তার কেহই ছিলনা। দরিদ্রের আত্মীয় থাকিয়াও নাই। শৈবলিনী রূপ সম্পদে রাজ্ঞীর মত সৌভাগ্যশালিনী, কিন্তু বড় দরিদ্র বড় দুঃখিনী বলিয়া আত্মীয় স্বজনের পরিচয় সে কখন পায় নাই।

শৈবলিনীর নামটি ঠিক তাহার প্রকৃতিরই উপ-যোগিনী ছিল। শৈবলিনীর অর্থ নদী। প্রথমে শৈশবে আপনার মনে কুলুকুলুস্বরে নদী বহিয়া যায়। শৈবলিনীর শৈশব ও আমোদে চঞ্চল হইয়া বড় সুখে কাটিয়াছিল। ক্রমে নদী শৈশব ছাড়িয়া কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে তরঙ্গশালিনী বেগবতী কথঞ্চিৎ আবিলা চঞ্চল স্বভাবা হইয়া দেখা দিল। শৈবলিনীও প্রথম যৌবনে নদীর মতই বাড়িয়া উঠিল; রূপতরঙ্গ তাহার দেহের দুইকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৈবলিনীর গতি নদীর গতির মত আপনার ভাবে বিভোরা স্বভাবতঃ বক্রা হইল; তাহার মনের বেগ নদীর স্রোতের মত প্রখর ভাব ধারণ করিল। শৈবলিনী নদীর মতই রহস্যময়ী, কখন কোন পথে কোন ভাবে বহিবে আপনই জানে না। আপনিই বোঝে না তাহার দুর্দমনীয় বাসনা প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে। স্রোতের টানেই সে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

শৈবলিনীর নামটির অর্থ ছিল। গোলাপকে যে নামেই ডাক না, তাহাতে ক্ষতি নাই আমরা তাহা বলি না; গোলাপের নাম অঘোর ঝিন্টিকা মানাইত না। যে দেশে মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষীকৃত, জপের ফল অবশ্যম্ভাবী—সে দেশে নাম নিরর্থক নহে। শব্দের শক্তি আছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হউক নামের একটি অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। অক্ষর বিন্যাসের হেতু আছে।

শৈবলিনীকে যেই দেখিত সেই শতমুখে তাহার সুখ্যাতি করিত। সে পল্লীর ছায়া স্নিগ্ধ-পথে শৈশবে ছুটাছুটি করিত; পথিকেরা সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত বিদ্যুৎশিখা মূর্তি ধরিয়া ধরায় নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া

বৃদ্ধেরা তাহাকে উপহাস করিত। সে যখন সদ্যস্নাতা হইয়া নদীতীরে দাঁড়াইত; লোকে ভাবিত গৌরী যেন বালিকা মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শৈবলিনী একজনের সহিত খেলিত বেড়াইত, নদীতীরে লহরীমালা লক্ষ্য করিত। তাহারই নাম প্রতাপ। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত যেন দুই জনে ফুটিয়াছিল। দুজনের বড়ই ভাব জন্মিল। বালকের বয়স ১৫।১৬। বালিকার বয়স ৭।৮। মানাইত কি না জানিনা, লোকে কিছু বলিত কিনা সে খবর আমরা পাই নাই। বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে সুকুমার বনকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিত, ভাবের লোকটির গলায় কখন কখন পরাইয়া দিয়া আমোদ পাইত। নবদূর্ব্বাদল শয্যায় অর্দ্ধশায়িত কদাচিৎ উপবিষ্ট হইয়া দুইজনে ভাগীরথীর সান্ধ্য কল্লোল শ্রবণ করিত, সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা গুণিয়া সময় কাটাইত। কখন নির্ব্বাক কখন বা ক্রমশূন্য আলাপের মধ্য দিয়া সন্ধ্যা নীরবে চলিয়া যাইত। দুইজনের কেহই তাহা জানিতে পারিত না।

শৈবলিনী লেখাপড়া জানিত না। তখনকার পল্লীতে বালিকাদের লেখাপড়ার রেওয়াজই ছিলনা। আর দরিদ্র কন্যাকে কে লেখাপড়া শিখাইবে, সে সুবিধাই বা কোথায়?

শৈবলিনীর যে প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহাকে "শৈবলিনী" করিয়াছিল, বাল্যেই তাহা ফুটিতে দেখা যায়, সে বিশিষ্টতায় কতকটা স্বার্থপরতা কতকটা জেদ কতকটা বা গর্ব্ব মিশ্রিত ছিল। নৌকা গুনিতে পারুক বা নাই পারুক তবু গণনার ভুল স্বীকার করিবেনা। ইহাও বলিতে ছাড়িবে না যে, প্রতাপের অপেক্ষাও সে একখানি বেশী নৌকা গুনিয়াছে। শৈবলিনী সহজে হটিত না হার মানিতে চাহিত না।

শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি কন্যা জ্ঞাতির সহিত জ্ঞাতির বিবাহ হিন্দুধর্ম্মের রীতি নহে। প্রতাপ জানিত যে শৈবলিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে না। তবু সে জানিয়া শুনিয়াও কতকটা বালকত্ব কতকটা অপরিনাম দর্শিতা, কতকটা বা দুর্দ্দমনীয় ভালবাসার আকর্ষণ হেতু শৈবলিনীর সহিত মিশিত। শৈবলিনী ছেলে মানুষ, অত শত সে বুঝিত না। উভয়ের জীবনতরী যে প্রতিকূল বাতাসেই বহিয়া যাইবে, তাহার সূচনা এখন হইতে দেখা দিল।

শৈবলিনী কৈশোরে পদার্পণ করিল। দেহের পুষ্টিও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রতাপের উপর ভালবাসাও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারুণ্যের খরস্রোতের বেগে শৈবলিনীর উদ্দাম বাসনা ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিতে লাগিল। তখন সেই রকম অবস্থায় একদিন সে শুনিল যে, প্রতাপের সহিত তার বিবাহ হইবে না, তখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল, প্রতাপ ব্যতীত তার সুখ নাই। এ জন্মে প্রতাপকে সে পাইবে না। যুবতীর বুভুক্ষিত কোমল বক্ষ সেই আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। সচন্দ্রা রজনী মুহূর্ত্তে আঁধারময়ী হইয়া দেখা দিল।

তখন দুইজনে গোপনে অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ আটিল। কেহ জানিল না। তখন দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। প্রতাপ ২০ বৎসরের শৈবলিনী ১৫ কি ১৬ বৎসরের। এই বয়সে গোপনে অনেকদিন ধরিয়া পরামর্শ যেন কেমন কেমন। তখনকার

দিনে পল্লীতে, অতীতের সেই হিন্দু সমাজে দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে যুবতী কন্যার সহিত যুবকের গোপনে অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ আমাদের নিকট যেন নূতন, অসম্ভব অতিরঞ্জিত। তার পর সহস্র নর-নারীর সম্মুখে সাঁতার দেওয়া যাক—

তখন দুইজনে গভীর জলে সাঁতার দিতে লাগিল। ভাগীরথীর উচ্ছল জলরাশির সহিত নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া দুইজনে অনেকদূর চলিয়া গেল। তীরের লোকেরা দেখিল দুইটি ফুল স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে।

প্রতাপ বলিল "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে"

শৈবলিনী বলিল "আর কেন,—এই খানেই ?"

দুইজনে হতাশ হৃদয়ের গোপন ব্যাথার এই ঔষধ সেবনই ঠিক করিয়াছিল, তারপর প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল "কেন মরিব ? প্রতাপ আমার কে ? আমার ভয় করে আমি মরিতে পারি না।" শৈবলিনী ডুবিল না, ফিরিল।"

প্রতাপ ও শৈবলিনী দুজনে দুজনকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু উভয়ের ভালবাসার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা ছিল। যে বিশিষ্টতার জন্য প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না। প্রতাপের ভালবাসা আত্মবিসর্জ্জনে আকাঙ্ক্ষা, শৈবলিনীর ভালবাসা আত্ম তৃপ্তিতে ইচ্ছা। প্রতাপের প্রেম নিঃস্বার্থ, শৈবলিনীর প্রেম স্বার্থপরতা দুষ্ট। প্রতাপের আকর্ষণ প্রেমের, শৈবলিনীর আকর্ষণ কাম মিশ্র প্রেমের, প্রতাপের চিত্তবল অধিক, শৈবলিনীর চিত্তবল অত্যল্প। তাই প্রতাপ চিত্তকে বশে রাখিয়া চলিতে পারিল। শৈবলিনীকে চিত্তের বশে স্রোতোচালিত তৃণের মত ভাসিয়া চলিতে হইল। প্রতাপের প্রেম মর্ত্ত্যে অমৃত, আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহা পরিণামে তাহাকে স্বর্গের অধিকারী করিল। শৈবলিনীর প্রেম স্বার্থপতার মোহের ও কামের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহ জীবনেই তাহাকে নরক ভোগ করাইল।

প্রতাপ মৃত্যু পর্য্যন্ত কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা উদ্দাম ভালবাসার অগ্নি আবৃত রাখিয়াছিল সত্য, কিন্তু আজীবন সেই বহ্নির জ্বালায় তাহার মর্ম্মস্থল অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়িতেছিল। পরিশেষে সেই হৃদয় মধ্যস্থ ভালবাসার হোমাগ্নি তেজে আপনাকে আহুতি দিল। আর শৈবলিনী আকাঙ্ক্ষার প্রবল তাড়নে, মদনের সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া গৃহত্যাগ করিল। পরিশেষে স্থুল দেহেই নরক ভোগে তাহাকে বাধ্য হইতে হইল। প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবন-নদীতে যে ভীষণ ঝটিকা উঠিবে, তাহার সূচনা হইল। জীবন তরুতে অমৃত কি বিষফল ফলিবে, তাহারও বীজ দেখা গেল।

প্রতাপ অর্থে বীরত্ব, বল। বাস্তবিক প্রতাপের মত বীর কে ? প্রতাপের মত বল কাহার ? অন্তঃশত্রুর মত বড় শত্রু আর নাই—সেই শত্রুকে যে জয় করিতে পারে সেই যথার্থ বীর ; বীরত্ব তাহারই সার্থক ! চিত্তবলের মত বল নাই। সেই চিত্তবলে বলী প্রতাপের সহিত অন্য বলীর তুলনাই হয় না।

প্রতাপ সংযমে দেবতা, ধৈর্য্যে হিমালয় ছিল। তথাপি ইহাও সত্য যে, মনের মত, অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্যশালিনী প্রেমময়ী পত্নী পাইলেও প্রতাপ ভালবাসার দৃঢ়বদ্ধমূল উৎপাটিত করিতে পারিত না।

রূপসী প্রতাপের পত্নী—অসামান্ত রূপবতী অসাধারণ গুণবতী ও অতীব প্রেমময়ী পত্নী ছিল কি না! প্রতাপ তাহা দেখে নাই। প্রতাপ শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল। প্রতাপ শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে পত্নীর সহিত সংসার করিত—সে বিবাহ করিয়াছে শুনিলে শৈবলিনী যদি তাহাকে ভুলে আপনিও যদি ভুলিতে পারে—আর গুরু আজ্ঞা এড়াইতে না পারিয়া প্রতাপ সংসারী হইল। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র রূপসী সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন তথ্যই দেন নাই। প্রতাপের নিকট রূপসী যখন বিবাহিতা পত্নী মাত্র; তাহার বিশেষত্ব কিছু নাই—তখন রূপসী চরিত্রের অবতারণা মাত্র করিয়াই চরিত্র সৃষ্টিবিৎ অমর কবি ক্ষান্ত হইলেন। রূপসী এই হিসাবে যে ঠিক উপেক্ষিতা, অবশ্য তাহা নহে, "দিদি তুমি বড় কুঁদুলে" এইটুকু বাক্যটিতে রূপসী সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। রূপসী সাদাসিদা ধরণের, সাদাসিদে বুদ্ধির রমণিমাত্র ছিল। হৃদয়ের সূক্ষ্ম রহস্য বড় বুঝিত না, বুঝিতে চাহিত না। এই-রূপ পত্নীই প্রতাপের আবশ্যক ছিল। প্রতাপের হৃদয়ের গুপ্তস্থান লক্ষ্য করিতে পারে—এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালিনী পত্নীর সহিত প্রতাপের ঘর করা চলিত না।

শৈবলিনী সংযমে আদৌ অভ্যস্তা ছিল না। তাহার হৃদয় প্রেমে, উচ্ছ্বাসে, কামে, মোহে, ভোগ লালসায় পরিপূর্ণ ছিল। মনের মত প্রণয়ী রূপবান্ প্রেমময় যুবক স্বামী পাইলে সে প্রতাপকে ভুলিতেও পারিত। শৈবলিনীর ভালবাসা খুব সুগভীর ছিল না, কিন্তু বিস্তারিত ছিল, আর কূলে কূলে পূর্ণ ছিল। উদ্দাম বেগবান কল কল ছল ছল রবে তাহা সদাই মুখর ছিল। প্রতাপের প্রেম সুগভীর কিন্তু উপরে তাহার তরঙ্গ উঠিত না। শৈবলিনীর প্রেমে মোহের ভাগ অধিক ছিল। তারপর শৈবলিনী দরিদ্র মধ্যবয়স্ক শাস্ত্রপাঠ নিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহিণী হইল। চন্দ্রশেখরের পত্নী—এ বিসদৃশ মিলন বলিয়া শৈবলিনীর আদৌ ভাল লাগিল না। এ বিবাহে তার কোন আশা ভোগের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হইল না। একে যুবতীর হৃদয় প্রতাপের ভাবেই বিভোর; তাহার উপর চন্দ্রশেখরের উদাসীনতা। শৈবলিনীর হৃদয়ের আগুন ত নিভিল না; বরং আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই অভাগিণী অন্তরের মধ্যে নরক পুষিয়া উপরে গৃহের লক্ষ্মী হইল। যন্ত্রের মত সে সংসার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল, সজীব পুত্তলির মত সাজিয়া গুজিয়া দিনগুলি তার একরূপে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ বিবাহে যুবতীর প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না, যৌবনের মুকুলিত অনুরাগ নিরাশার অনলে ছাই হইয়া পুড়িয়া গেল। বিবাহের সজীব যন্ত্র অন্যাসক্তা শৈবলিনীর কর্ণে ভাল পৌঁছিল না।

তার পর শৈবলিনী বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের সহিত স্বামীর ঘর করিতে গেল। শৈবলিনী সেখানে শুধু গিয়া সুখী হইল না। অবশেষে সে কুলত্যাগিনী হইল। পিশাচী রাক্ষসী পাপীয়সী হইল। যে সংযমে আদৌ অনভ্যস্তা, অত বড় দুঃসাহসিক পাপ কার্য্যে যে দৃঢ় সংকল্পা, সে পাপিষ্ঠা বৈ আর কি? তবু সত্য বলিতে কি, তার জন্য দুঃখ হয়, সহানুভূতি হয়, তার ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মার জন্য প্রাণ ও বুঝি কাঁদে। দৈনন্দিন মান অভিমানে সোহাগে আদরে যার

দিনগুলি কাটিবার কথা, তাহা হইল না। অলক্ত-রঞ্জিত চরণের নূপুর শব্দে গৃহপ্রাঙ্গণ স্পন্দিত হইল না, তাম্বূল-রঞ্জিত মুখের অরুণাভায়, নবোদ্ভিন্ন যৌবনশ্রীর তরলপ্রভায় তাহার কপোলখানি রাঙাইয়া উঠিল না। দাম্পত্যের হাওয়ায় তার বিকসিত হৃদয় কুসুম একদণ্ড নাচিয়া নাচিয়া দুলিতে পাইল না—এ কি কম দুঃখের? কার জন্য এমন হইল? অদৃষ্টের জন্য, প্রতাপের জন্য, ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য, না—চন্দ্রশেখরের জন্য? ধর্ম্ম, সমাজ, বিবেকের প্রেরণায় প্রাণের ভাষা সকল সময়ে সুখ থাকে না। দুঃখ, সহানুভূতি, ভালবাসা কখন ভাবিয়া চিন্তিয়া পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া জন্মে না।

শৈবলিনী যাঁর হাতে গড়া জিনিষ—তিনি হত-ভাগিনী বলিয়া ইহাকে ভালবাসিতেন। পাপিষ্ঠা বলিয়া ভালবাসার জিনিষকে সকলে ত্যাগ করিতে পারে না। যেখানে ভালবাসা, সেখানে অভিমানও যেমন বেশী, ক্ষমাও তেমনি বেশী। এই ভালবাসা ছিল, তাই পাপের কঠোর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ইহ-লোকেই নরক ভোগ করাইয়া আবার গৃহে স্থান দিলেন। কৃত কর্ম্মফল নরক ভোগান্তে জন্মান্তরে ব্যাধিরূপে দেখা দেয়। শৈবলিনীর তাই পাপের অবশেষ স্বরূপ উন্মাদ রোগ হইল। ভালবাসার সামগ্রী অবস্থাবৈগুণ্যে অন্যায় করিয়াছে বলিয়া কি তাহার জীবন নষ্ট করিতে হইবে? ক্ষমারূপ সোহাগে কি স্বর্ণকে গালাইয়া লইবে না? আহা জন্মদুঃখিনী, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিড়ম্বিতা, উৎকট যন্ত্রণায় অহর্নিশি উৎপীড়িতা শৈবলিনী কি দয়ার অযোগ্যা? অভাগিনীর ক্ষুব্ধ মর্ম্ম-বীণার কারুণ্যের যে সুর বাজিত, কবির হৃদয়ে কি তাহার ঝঙ্কারটুকু উত্থিত হইত না? কবিকে কঠোর ন্যায়বান্ বিচারকের মতই নরক ভোগরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কি তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথা পায় নাই?

আমরা অন্যায় কার্য্যমাত্রের নিন্দা করি। কিন্তু কি ঘটনাচক্রে পড়িয়া কি সঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হইয়া সেই অন্যায় কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয়-তাহা দেখি না। যে সূক্ষ্ম বিচার করা আমরা আবশ্যক মনে করি না।

জ্ঞানহীনা শৈবলিনী যখন প্রতাপকে পাইল না তখনই ত তার যুবতী-হৃদয় নিরাশায় দমিয়া প্রেম আমোদ, চঞ্চল হাসি জন্মের মত মুখ হইতে মুছিয়া গেল। কেহই সে দুঃখে সান্ত্বনা দিল না, তাহার চিত্তজয়ের কোন ব্যবস্থাই কেহ করিল না। যন্ত্রণা যখন অভাগিনী শয্যায় শুইয়া বিনিদ্র রজনী অতি বাহিত করিত, তখন আহা বলিবার তার কেহ ছিল না। সৎপথে ফিরিবার মত সাধনার কোন অনুকূল ক্ষেত্র তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। মাধবী কঙ্কণের হেমলতা প্রেমময় স্বামী পাইয়াছিল। শৈল বালার মত সহানুভূতি সম্পন্না শিক্ষয়িত্রী ননদী সাহায্য লাভ করিয়াছিল। তাই তাহার আদর্শে শিক্ষায় ও উপদেশে হেমলতার জীবন ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল, ক্রমে ক্রমে সে আপনাকে পতন হইতে সামলাইয়া লইল। তাই শেষে সে সংযমবলে দেবীর মত পবিত্রা হইয়া উঠিল শৈবলিনীর স্বামী তাহার চক্ষে প্রেমময় দূরে থাক উদাসীন শাস্ত্রাধ্যয়ন রত অর্দ্ধ সন্ন্যাসী প্রতীত হইল গৃহেও শৈলবালার মত শিক্ষয়িত্রী সহানুভূতি সম্পন্ন

কাহাকে পাইল না। কাজেই শৈবলিনীর চিত্ত আর স্ববশ হইল না। চন্দ্রশেখর এত উচ্চে, নিম্নে থাকিয়া শৈবলিনী তাহার নাগালই পাইত না। গ্রন্থই তাঁর প্রিয়, গ্রন্থই তাঁর সর্ব্বস্ব; শৈবলিনীর স্থান সে হৃদয়ে কোথায়—ইহাই শৈবলিনীর বিশ্বাস জন্মিল। যুবতী যাহা চায়, তাহা পাইল না, যৌবনের কোন সাধই চন্দ্রশেখরের দ্বারা পূরণ হয় নাই।

চন্দ্রশেখর জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। ভালবাসা তাঁহার চিত্তে ফল্গুর মত অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিত, তাহার বাহ্য বিকাশ ছিল না, উপরে কোন তরঙ্গ উঠিত না, বুদ্বুদ পর্য্যন্ত ফুটিতে পাইত না। শৈবলিনীর তৃষ্ণাতুর অধর পিপাসায় শুষ্ক, একবিন্দু জলাশায় ব্যাকুল ছিল, আর চন্দ্রশেখর অগাধ জল রাশি লইয়া নির্ম্মম উদাসীন ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান। এক ফোঁটা জলবিন্দু পিপাসিতার অধরে ঢালিয়া দিলেন না। জ্ঞানী হইয়াও এরূপ নির্ম্মম কঠোর আচরণ করিলেন। অজ্ঞান দুর্দ্দমনীয় চিত্তা হত-ভাগিনী শৈবলিনী করিবে কি?

শৈবলিনীর সাময়িক সহচরী "সুন্দরী" ছিল সত্য। কিন্তু সে শৈলবালার মত ছিল না, আর শৈবলিনীর [মনের] কথাও সে জানিত না। কি কাল সাপ তার [বু]কে জোড়া ছিল, তাহা জানিবার সম্ভাবনাই ঘটে [ন]াই। শৈবলিনীর গৃহ ত্যাগের পর সুন্দরীকে যেমন [ভ]াবে উপকারিণী দেখি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে [প]ারি, সুন্দরী যদি গোড়া হইতে শৈবলিনীর রোগের [চি]কিৎসা ভার লইত, তবে হয় ত এমটি নাও [ঘ]টিতে পারিত।

যুবতী শৈবলিনী ভাদ্রের দুকুলভরা গঙ্গার আকুল তরঙ্গোচ্ছাস বুকে করিয়া কেন সরসীর মত স্থির থাকে নাই? আকুল আকাঙ্ক্ষাভরা দুঃখতাপজীর্ণ হৃদয় তন্ত্রীতে কেন সুখ শান্তিময় সঙ্গীত বাজিয়া উঠে নাই? অগ্নিদগ্ধ জীবন মরুর রুক্ষদিগদাহী প্রান্তরে বাসন্তী শোভার কমনীয় বিকাশ বা স্বপ্নালস সমীরণের মৃদুল ক্রীড়া কেন দেখা যায় নাই? ইহার উত্তর কি দিব? স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে ছায়াপথের মত জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মুমূর্ষুর মত শৈবলিনী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার গৃহ ত্যাগ ধর্ম্ম সমাজ হৃদয় সকল দিক দিয়াই হেয়। দুর্ব্বল প্রকৃতি নারীর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় আত্ম হত্যার মত বড় দুঃখের। দুদণ্ডের মেঘে ঢাকা প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের শোভা উপেক্ষা করিয়া শৈবলিনী মূঢ় পথিকের মত আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিল। তার পর দুর্গন্ধ জলাভূমির ধারে আসিয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল।

অন্ধ সূর্য্যের মহিমা বুঝিতে পারে না। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের যথার্থ পরিচয় পাইল না। এ পরিচয় কেহ তাহাকে বলে নাই। এ দিকে ফষ্টর সাহেব লোকজন ও শিবিকা পাঠাইয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেল। "প্রভাত বাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণি উত্তরাভিমুখে চলিল। এইখানে প্রভাত বায়ুর বর্ণনা বড় মধুর এবং প্রস্তুতোপযোগী। প্রতাপের উপর শৈবলিনীর প্রেম প্রথম প্রভাত বায়ুর মতই মধুর ছিল। তখন বাল্য হৃদয়ে সে প্রেম একটি কোমল গন্ধ মৃদুল-স্পন্দন, ঝঙ্কারময়ী কবিতার সৃষ্টি করিল। ক্রমে তাহা জোর বাতাস হইয়া দেখা দিল। কৈশোর হৃদয় তাহাতে আন্দোলিত হইতে

লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহা ঝটিকা আকার ধারণ করিল; তখন তার কি গর্জ্জন! সে গর্জ্জনের সহিত হৃদয় নদীও গর্জ্জিয়া উঠিল। তরঙ্গ শ্রেণি ফুলিয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ধৈর্য্য তরণি আর রক্ষা হয় না।

সুন্দরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য নৌকায় তার সহিত সাক্ষাত করিল। কালামুখী শৈবলিনী গৃহে ফিরিতে চাহিল না। গৃহে সুখ নাই, তবে কলঙ্কের পশরা মাথায় করিয়া কোন মুখে সে ফিরিবে। কাশী গিয়া বাস করিবে, রাজধানীতে মুঙ্গেরে গিয়া ভিক্ষা করিবে। আর না হয় জলে ডুবিয়া মরিবে।

শৈবলিনীর মিথ্যা কথা। সে মরিতে চাহে না, আর পারিবেও না। তার যে উচ্চাশা পাপময়ী বাসনা হৃদয়পটে নিরুদ্ধ ছিল আজ তাহা নগ্ন হইয়া দেখা দিল। আত্মদমনে অনভ্যস্তা শৈবলিনীর পাপ হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় সুখের কল্পনায় তখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে ছিল, সে কি ফিরিতে পারে, না—মরিতে পারে।

ফষ্টরের কবল হইতে প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল। ভৃত্য রামচরণ প্রতাপের গৃহেই তার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিল, প্রতাপ তাহা জানিত না। হঠাৎ সেই ঘরে যাইয়া "প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন, যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে স্থির শ্বেত বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্ম. রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতেই পারিল না। + + + অনে দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃ সাগর মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহ হইতে লাগিল।

"এ কি এ" বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছি হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন সংজ্ঞা ফিরি তখন শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চি হইতে ছিল।

পাঠক দেখুন শৈবলিনীর হৃদয়ের অবস্থা তথ কিরূপ হইল। তার পর প্রতাপ যখন "তোম মত পাপিয়সীর মুখ দর্শন করিতে নাই" বলিয়া গা দিলেন, তখন শৈবলিনীর গর্ব্বিত নারী হৃদয় ক খানি দমিয়া গেল, পাঠক তাহাও বুঝুন। তথ সেই তেজস্বিনী গর্ব্বিতা নারী প্রায় বাষ্পগদ্গদ হই বলিলেন "আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে কেন?"

উত্তরে "তোমার মরণই ভাল" শৈবলিনী ইহ শুনিল, সে আঘাত সহ্য করার মত শক্তি তথ তাহার আর ছিল না। "সে কাঁদিয়া ফেলিল" বলি "কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপ সুপথ জ্ঞান শূন্য হইয়াছি! তোমার জন্য। কাহা জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য! কাহার জ আমি গৃহ ধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমা জন্য! তুমি আমাকে গালি দিও না।"

প্রতাপ তবু অটল। কি সংযম! এতব সংযমের পার্শ্বে শৈবলিনীর অসংযম বড় বে ফুটিয়াছে। শৈবলিনী এতদিন যে আগুনে অহর্নি

ড়িতেছে, আজ তাহার শাস্তি করিবে। না হয় ত, দয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক। লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়া য়াছে। অন্তরের রুদ্ধ বেগ আজ খর বেগে টিয়াছে।

প্রতাপকে শেষ জানাইল যে, "তাহার সহিত বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি তাহাকে পাইতে পারে—ই আশায় সে গৃহ ত্যাগিনী হইয়াছে। নহিলে ষ্টর তাহার কে ?"

প্রতাপ সর্প ভয়ে ভীত ব্যক্তির মত পলাইয়া গল। শৈবলিনীর এত দিনের সঞ্চিত আশার মধনু আজ চিরদিনের মত হৃদয়াকাশ হইতে লাইয়া গেল। এত দিনের পোষিত কামনার াজ উচ্ছেদ হইল। এইবার শৈবলিনীর মরিবার চ্ছা জন্মিল। তখন তার মনে পড়িল, সেই বেদ াম, পতিগৃহ, তথায় সেই স্বহস্ত রোপিত করবী ক্ষ, সেই পরিষ্কৃত তুলসী মঞ্চ। প্রতাপের চক্ষেও । পাপিষ্ঠা—শৈবলিনীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল নীরবে । অনেক কান্না কাঁদিল। তাহার হৃদয় নদীতে খন দুর্দ্দম উন্মত্ত বিকারের বন্যাস্রোত সরিয়া গিয়াছে -কতকগুলি অনুশোচনার প্রস্তর খণ্ড মাত্র তথায় ড়িয়া আছে।

এইবার শৈবলিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল। াহার চলিয়া আসায় তাহার স্বামী কত মর্ম্ম বেদনা াইয়াছেন ? না—না—গ্রন্থই তাঁহার সব। তিনি :খ পাইবেন কেন ?

প্রত্যাখ্যাতা নারী পদাহতা সর্পীর মত ণয়াস্পদকে দংশন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। াবলিনীর কৈ তেমন রাগত হইল না। শৈবলিনী অত নীচ হৃদয়া ছিলেন না। তার পর প্রতাপ তাহার উদ্ধারের জন্যই ইংরাজ হস্তে বন্দী। সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। শৈবলিনী ঘটনাচক্রে কর্ম্মচারীদের ভুলে নবাব মীর কাসেমের মুঙ্গেরের কেল্লায় আনীতা হইল। প্রতাপের প্রত্যাখ্যানে শৈবলিনীর মনোভাব তখনও সম্যক পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় না। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য নবাবের নিকট সাহায্য যাজ্ঞা করিল। সাহায্যও পাইল। শৈবলিনী এখানে নবাবের নিকট প্রতাপের স্ত্রী রূপসী নামেই আপনাকে পরিচিত করিল। এতদিন যে আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছিল। তাহা পূরণ হইল না। তবু সে মনে মনে প্রতাপের প্রণয়িনী প্রতাপের স্ত্রী ভাবিতে বিরত হইত না প্রতাপের স্ত্রী পরিচয় দিয়া তবু তার বাসনার অগ্নি যেন একটু শান্তি লাভ করিল।

শৈবলিনী যে প্রকৃত প্রণয়ের মূল স্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রতাপের উদ্ধারে ব্রতী হইল, তাহা নহে। সে কেন গেল সেই জানে না। তার চক্ষে সে পাপিষ্ঠা —যে তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া সে আগুন নিভাইবার যত্ন পাইল না—তার জন্য শৈবলিনী এই অসম সাহসিক কার্য্যে কৃত সংকল্প কেন ? প্রচ্ছন্ন আশার মোহে মুগ্ধ হইয়া সে কি এই কার্য্য করিতেছে না—কেবল প্রণয়াস্পদকে বাঁচাইবার জন্য এই যত্ন পাইতেছে ? কিম্বা সে জানে না কেন এই কার্য্য সে করিতেছে ?

তারপর বুদ্ধিমতি শৈবলিনীর কৌশলে প্রতাপ উদ্ধার পাইল। দুইজনে তখন ভাগীরথী বক্ষে সাতার দিয়া, ইংরাজের নৌকা ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া

গেল। প্রতাপ যে দুরন্ত কাল সমুদ্রে সাতার দিতেছিল—তাহার কাছে ক্ষুদ্র নদীতে এ সাতার তুচ্ছ! শৈবলিনী ভাবিল—অতল জলে সে ভাসিতেছে, এ নদীর তো তল নাই।

প্রতাপ শৈবলিনীর বিবাহের পর হইতে তাহার চিন্তা পাপ বলিয়াই ভাবিত। তাহার অন্তরের বালুস্তুপের মধ্যে অতলস্পর্শ যে প্রেম ফল্গুর মত নীরবে বহিয়া যাইত, তাহা সে কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। শৈবলিনীকে সে যে ঘৃণাই করে এইরূপই সে দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ কি ভাবিয়া প্রতাপ শৈবলিনীকে কতদিন পরে শৈবলিনী বলিয়া ডাকিল।

"সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল। প্রতাপ ডাকিল "শৈবলিনী সৈ।"

শৈবলিনীর হৃদয় চমকিয়া উঠিল। * * * শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী মানিল।"

শৈবলিনীর তখন আত্ম বিস্মৃতির অবস্থা। তাহা জাগরণ কি স্বপ্ন, সে উদ্বোধই তখন নাই। এ সুখ স্রোতে সে ভাসিয়া যাইতে চাহে। এ প্রেমের স্বপ্ন এ আবেশের ঘুম ঘোর পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই শৈবলিনী চক্ষু চাহিল না। বহু দিনের স্মৃতি সাগর মথিত করিয়া আরাধনার ধন অমৃত মিলিবার উপক্রম হইয়াছে, শৈবলিনী চক্ষু চাহিবে কি?

সে চক্ষু বুজিয়া কহিল "এ মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন?" শৈবলিনীর দগ্ধ হৃদয় মরুভূমে উৎস ফুটিয়া উঠিল। গঙ্গার জলে তখন ষোলকলা চাঁদ হাসিতেছিল, শৈবলিনীর বোধ হইল, চির নিরাশার আঁধার মগ্ন প্রাণে অতীত সুখস্মৃতির বিজলীর ছটা খেলিয়া গেল।

"চাঁদের না সূর্য্যের" প্রতাপ কহিল।" শৈবলিনী যাহা চন্দ্রকরের মত শীতল ভাবিল, প্রতাপ দেখিল তাহা নিদাঘ সূর্য্য রশ্মির মত তীব্র। চাঁদের কিরণ তাহার জলে ছড়াইয়া আছে, প্রতাপের নিকট তাহা আর চাঁদের কিরণ নহে, প্রতাপ আজ যে কঠোর সংকল্প স্থির করিয়াছে, তাহা ঐ সূর্য্যের আলোকের মত ভাস্বর, সেই আলোই আজ নূতন জীবন আনয়ন করিবে, যত কিছু পাপপুঞ্জ আঁধার রাশির মত দূর করিয়া দিবে। দুঃখ যাতনাময়ী নিশি শেষ হইবে।

তারপর প্রতাপ তাহার মরণ বাঁচন শুভাশুভের জন্য শৈবলিনীকে দায়ী করিয়া অতি ভয়ানক শপথের কথা উল্লেখ করিল। সে শপথ শৈবলিনীর নিকট অতি ভয়ানক। এ শপথ না করিলে প্রতাপ ডুবিবে। প্রতাপকে সে ভাল রূপই জানে। শৈবলিনীর "জীবন নদীতে এই প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।" শৈবলিনী ভাবিল "আমি মরি ক্ষতি নাই, তাহার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?

শৈবলিনী আজ প্রতাপকে ভুলিবার প্রতিজ্ঞা করিল। প্রতাপের চিন্তা পর্য্যন্ত সে করিবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিল। শৈবলিনী সকল সুখ আজ হইতে বিসর্জ্জন দিল। শৈবলিনী আজ হইতে মরিয়া গেল।

শৈবলিনী দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীবের মত প্রতাপের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইল। এই যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সে রণে ভঙ্গ দিল। ক্ষত বিক্ষত চরণে শোণিতাক্ত কলেবরে ক্ষুধার্ত্তা পিপাসা পীড়িতা শৈবলিনী উপলব্যলিত পদক্ষেপে পর্ব্বত পথে চলিতে লাগিল। লতা-

র শিলারাশির মধ্য দিয়া গভীর অন্ধকারময়ী নীতে একাকিনী রমণী অনিশ্চিত লক্ষ্যে কোথায় লয়াছে, জানে না। শৈবলিনীর মনের বেগ বরাবরই মনই দুর্দ্দম, এমনই প্রখর। চিত্তদমনে সে কেবারেই অভ্যস্তা নহে। এক এক জাতীয় কৃতি আছে নামিবার সময়েও যেমন খরগতি, ঠিবার সময়েও তেমনই ক্ষিপ্রগতি। শৈবলিনীর াকৃতিও তদ্রূপ ছিল।

তারপর শৈবলিনীর নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা ারম্ভ হইল। পুরাতন জীবন জীর্ণ পরিচ্ছদের মত সিয়া পড়িতে লাগিল। পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ারা পাপক্ষয় হইলে পুণ্যশ্রী ফুটিয়া উঠে। শৈবলিনীর ায়শ্চিত্তের সূচনা হইল।

শৈবলিনীর এই জীবনেই নরক ভোগ হইতে াগিল। অবশ্য এ ভোগ মানসিক। আমাদের াস্ত্রে বলে, স্বর্গনরক সংকল্প মূলক, অপার্থিব মানস খ দুঃখ ভোগ মাত্র। মানস ব্যভিচারিণী শৈবলিনী ত্তে অল্পে অল্পে বিপরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। াপিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে দেবীত্বপদে আরোহণ করিতে াগিল। প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সাধনা ামানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশ মত শৈবলিনী করিয়া াইতে লাগিল। গুরুর কৃপায় সাধনার বলে শবলিনীর অন্তরে দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে াবিল—

"* * * এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত সুভুজ বিশিষ্ট সুন্দর গঠন, বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট—প্রশান্ত চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তা রেখা বিশিষ্ট এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন, ইহার কাছে প্রতাপ? ছিঃ! ছিঃ! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা।"

তারপর শৈবলিনী নিজের সহিত তুলনা করিতে লাগিল "সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, মৃণালে কণ্টক সুখে বিঘ্ন আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পরনে ধূলি অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?" শৈবলিনীর চিত্তে প্রতাপের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া চন্দ্রশেখরের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

"জানে যে, এই মন্ত্রে চির প্রবাহিতা নদী অন্য খাদে চালান যায়—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চির প্রবাহিতা নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল! শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

কঠোর প্রায়শ্চিত্তে, সাধনার বলে গুরুর কৃপায় ও যোগশক্তির মাহাত্ম্যে অসাধ্য সাধন হইয়া গেল। আমাদের শাস্ত্রে বলে জীবের নরক ভোগের পর জন্মান্তরীণ পাপাবশেষের ফল স্বরূপ পরজন্মে কুষ্ঠাদি রোগ ভোগ করিতে হয়। এক্ষেত্রে শৈবলিনীর যখন এই জীবনে নরক যন্ত্রণা ভোগ হইয়া গেল, তখন সেই শেষ পাপের ফল স্বরূপ এই জীবনেই উন্মাদ রোগ দেখা দিল। যোগ বলে সে উন্মাদ রোগ দূরীভূত হইল শৈবলিনীর অন্তর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইয়া খাদশূন্য স্বর্ণের মত বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল।

যোগ প্রক্রিয়ার গুণে শৈবলিনীর মুখ দিয়া অতীত ভবিষ্যতের সত্য প্রকাশিত হইল।

তারপর প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাৎ শৈবলিনী প্রতাপকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল "যতক্ষণ তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সহিত আর সাক্ষাত করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিও না।

খটকা থাকিয়া গেল—"এ জন্মে সাক্ষাত করিও না।" তবে কি পর জন্মে শৈবলিনী প্রতাপের আশা রাখে। না, তাহা নহে। শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রতাপ মূর্ত্তির বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লবঙ্গতার মত সে পরজন্মে অন্তের আশা হৃদয়ে বলবতী রাখে নাই। শৈবলিনীর বিশেষত্ব ছিল—তাই এই চিত্রের অবতারণা—ইহা অমর কবি একস্থানে প্রকাশই করিয়াছেন। পাপ পুণ্যের সংসর্গে পুণ্যময়ী হইয়া উঠে—তাহা আমরা জানিনা। পাপ চিরদিনই পাপ; তবে পাপ পুণ্যময়ী মানব প্রকৃতি পুণ্যবানের সংসর্গে পুণ্যের মাহাত্ম্যে পুণ্যময়ী হইয়া থাকে। পাপ আর ফুটিতে পারে না, তখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়।

প্রতাপ আপনার অন্তর্নিরুদ্ধ ভালবাসার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। মৃত্যুকালে রামানন্দ স্বামীর নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া আপনার হৃদয় হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর অমর ধামে সেই মহাবীর সংযমের সেই দেবতা চলিয়া গেল। পাছে শৈবলিনীর ক্ষীণ আশা প্রতাপ পোষণ করিয়া রাখে, পাছে সে লালসার সূক্ষ্মাংশ সংস্কাররূপে প্রতাপের চিত্তে সংলগ্ন থাকে, তাই গুরু জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন "শত শৈবলিনী সেখানে তোমার পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিবে।"

এদিকে শৈবলিনী নরক ভোগে পাপাবশেষ ফল স্বরূপ উন্মাদ রোগের অবসানে যোগশক্তির বলে, পুণ্যের সংসর্গে নিষ্পাপা ও বিশুদ্ধচিত্তা হইয়া উঠিল। তখন চন্দ্রশেখরের সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সতী জীবন যাপন করিতে লাগিল।

শৈবলিনী দোষে গুণে এইরূপই ছিল। শৈবলিনী সাধারণের মত ছিল না। পাপের বেগ যেমন প্রবল পুণ্যের বেগ তেমনই প্রবল। এক এক জাতীয় মানব আছে, তাহারা যখন পাপের পিচ্ছিল পথে নামে, হু হু করিয়া নামে, আবার যখন উর্দ্ধ দিকে উঠে, তরতর ভাবেই উঠে। শৈবলিনী এইরূপই ছিল।

শৈবলিনী চরিত্র ভাল মন্দে মিলনে একটি নূতন রকমের চিত্র। সাহিত্যের পটে এরূপ ছবি বড় দেখি নাই। ইহাতে কিছু আছে যাহা খুব ভাল, খুব শিক্ষনীয়, তাই শৈবলিনী চরিত্র বিশ্লেষণ করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী—কাব্যতীর্থ

কি হব ?

(Parody ৺গোবিন্দচন্দ্র রায়) ।

আমি কবি হ'ব—

নিশিতে সকলে যবে
সুখে নিদ্রিত হ'বে
জেগে সারা বিভাবরী
পরভাব চুরি করি'
আমি—কবিতা লিখিব,
সারা নিশি অবিরত
লিখিব কবিতা কত ?
দিনমানে অবশেষে
ক্লান্তি ধরিলে এসে
আমি—বিছানাত' ল'ব ।
আমি কবি হ'ব ॥

আমি সাধু হ'ব—

সান্ধ্য তিমিরে যবে
ধরণী ডুবিয়া রবে
কিংবা—
যখন উঠিবে রবি
ডুবিয়ে তমঃচ্ছবি
আমি—সাধনা করিব ।
অথবা ডমরু ল'য়ে
শিঙার মধুর লয়ে
পড়িয়া বাঘের জিন
তালেতে তা ধিন্ ধিন্
আমি—তাণ্ডবে র'ব,
আমি সাধু হ'ব ॥

আমি বাবু হ'ব—

নারিব করিতে শ্রম
দেখাব পরাক্রম
তাড়াতাড়ি গৃহে আসি
রন্ধন গৃহে বসি'
আমি—শূরতা দেখাব
ফুল-সৌরভ লব
নিজ গৌরব গাব
দিবানিশি যথা তথা
আপন গুণের কথা
আমি—ডেকে ডেকে ক'ব ।
আমি বাবু হ'ব ॥

আমি ভাবুক হ'ব

সর্ব্বদা মাথা ধরে
ভাবিব অন্ধকারে
চক্ষু মুদিয়া ধীরে
সচালে নদীর তীরে
আমি—ঘেঁড়িয়ে বেড়াব ।
কহিব না উঁচু কথা
করে রব উচু মাথা
কাননে ভ্রমিতে গিয়ে
আস্তে আঙ্গুল দিয়ে
আমি—ফুল শুঁখে লব—
আমি—ভাবুক্ হ'য়ে রব ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণ তীর্থ

বারোটার গাড়ী।

(গল্প)

আমি ছিলাম পূর্ব্বস্থলীতে—শ্বশুর আলয়ে। সময় কাট্‌ত—একদম নিরবচ্ছিন্ন এয়ারকিতে। মোট কথা জলের মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিতাম—হেসে—গান শুনে—আর আড্ডা দিয়ে।

পূর্ব্বস্থলী যদিও পাড়াগাঁ; তখন প্রায় স্কুল কলেজের সব ছুটি হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই ছেলের দল যারা বিদেশে থাক্‌ত, তারা তখন দেশে এসে দিব্যি সুখে হল্লা করে বেড়াচ্ছে। এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সেখানে মনটাকে বেশ তাজা রেখেছিলাম।

কিন্তু একটা জিনিষ প্রাণের তারে বড়ই বেসুরো ঠেক্‌ত'। যখন আমার বস্‌বার ঘরে দশ বন্ধুতে মিলে খোস গল্প চল্‌ছে—যখন 'হারমোনিয়মে'র—মিষ্টিসুরের হাওয়া ঘরটার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যখন গানের তান কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে প্রাণ মন আকুল করে তুল্‌ছে—তখন একটা কান্নার করুন আওয়াজ এসে সব গোলমাল করে দ্যায়। কিছুতেই আর গানে মন বসে না—'হারমোনিয়মের' ভরাট সুর মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন কাটাকাটা লাগে—পাঁচজনের পরিহাস যেন কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে থাকে।

ওই কান্নাটা রোজই আরম্ভ হয় বারোটার গাড়ী চলে যাবার পর। তার পর যতক্ষণ না সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ আর সে কান্নার বিরাম হয় না। এই যেয়ে করুণ আমাদের স্ফূর্ত্তিটাকে জল করে দিত।

সে দিন আমি কোনও কবি বন্ধুর বাড়ী হ'তে ফিরে এলাম—ওই বারোটার গাড়ীতে। গাড়ীখানা যেমন চলে গেল—আমিও শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার জন্য 'রেল-লাইনে' পা দিলাম—আর অমনি কানে গেল সেই কান্নার করুণ আওয়াজ। মনটা বাস্তবিক একেবারে দমে গেল। বাড়ী এসে খেতে বসেছি—এমন সময় একজন বন্ধু এসে হাজির।

যদিও আমি আহারে বসে ছিলাম—কিন্তু তখনও আমার কান বাঁধা ছিল—সেই ব্যথিতের বেদনার সুরে। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—"খেতে খেতে কি ভাব্‌ছ? বাড়ীর কথা মনে পড়েছে?

আমি উত্তর কর্‌লাম—"বাড়ীর কথা যে মনে আসেনি—সে কথা বড় করে বল্‌তে পার্‌লাম না। তবে এখন কিন্তু মনে বড় ব্যথা দিচ্ছে—ওই কান্নার করুণ আওয়াজটা।"

বন্ধু একটু' ছোটখাটো "হুঁ" করলেন মাত্র। কোনও কথা ক'লেন না। আমি খানিকটে সময় তাঁহার কাছ থেকে কিছু শোন্‌বার আশায় উৎকর্ণ হয়ে র'লাম—কিন্তু কোনও কথা নেই। তখন আমি আর নিজের উৎকণ্ঠাকে চেপে রাখ্‌তে

পারলাম না। অধীর হয়ে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা! বলতে পারো—রোজ বারোটার গাড়ী যাওয়ার পর লোকটী অমন করে ফুকরে কেঁদে উঠে কেন?"

বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন—পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"আজ বলব না কাল সকালে বলব।"

পরদিন প্রাতে বন্ধু আপনিই এসে বললেন সেই কান্নার গল্পটী শুনবে?" আমি বললাম "নিশ্চয়ই।" বন্ধু বলতে সুরু করলেন—"আচ্ছা, শোন; আমাদের পাপের কাহিনী আমার মুখ হ'তেই শোন। কাঁদছে কে জানো—একটী বুড়ী মা; যার ওই একমাত্র ছেলে ছিল। তার মাতৃ-হৃদয় স্নেহের সকল আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখত'। তার ছেলের নাম ছিল—বিরু। সে যেমন জোয়ান ছিল—তেমনি বিশ্বাসী ছিল। সে আমাদের প্রধান লেঠেল। আমি কত দিন নিজের কানে শুনেছি—তার মা তাকে বারণ করছে—লেঠেল হয়ে দাঙ্গা করতে যেতে—আর অনুরোধ করছে—এই লেঠেল গিরি চাকিরি ছেড়ে দিতে। কিন্তু সে আমাদের মায়ায় আবদ্ধ ছিল—কাজেই আমাদের কাজ ছেড়ে দিতে পারল না।

সেবার পলকের জমিদারদের সঙ্গে চকদেভোগ নিয়ে আমাদের গোলমাল চলছিল। তারা জোর করে আমাদের সমস্ত চকটা দখল করবে। আমরাও দেব না। এই ভাবে প্রায় মাস তিন ধরে দুইপক্ষে ঠেলাঠেলি—হুড়োহুড়ি চলতে লাগল।

একদিন আমরা খবর পেলাম—বিপক্ষেরা চকটা দখল করতে খুব বেশী রকম সেজে আসছে। আমরাও তখনি সাজতে সুরু করলাম। আমাদের দলের বিরু হ'ল—সর্দার লেঠেল। বিরুর মা বলল—"বাবা বিরু, ও ছড় হাঙ্গামার মধ্যে যাস নি' বাবা! কখন কি হ'বে দাঙ্গা ফাস্যাদে বলা ত' যায় না। যে কয় দিন আমি আছি বাপ, সে কয়দিন ঠাণ্ডা হয়ে থাক্।"

বিরু উত্তর দিল—তা' হয় না মা! জমিদারের খেয়ে এত বড় হয়েছি। জমিদারের জন্মে জান কবুল করতে হবে। এ রকম মরায় মৃত্যুরও সার্থকতা আছে মা? আমাকে যেতেই হবে।"

বিরুর মাথার মধ্যে তখন লাঠির ঝম্‌ঝমানি যেন নৃত্য করছিল। সে আর মোটেই স্থির থাকতে পারল না। ছুটে এসে দলের নেতা হ'য়ে চক মুখে চলে গেল। আমি যদিও সব শুনেছিলাম—তবু তাকে যেতে বারণ করতে পারলাম না। কেন না—সেই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। পরার্থের কাছে স্বার্থকে বলি দিতে মন সরল না।

কিছু পরে খবর পেলাম—সে দাঙ্গায় আমরাই জয়ী হয়েছি। কিন্তু বড় উচ্চ মূল্যে। যে হেতু শত্রুপক্ষের কএকটা খুন হয়ে গিয়েছে। আর সেই খুনের দায়ে—বিরু ও আর দুই একজনকে আমাদের তরফ হতে গ্রেপ্তার করে পুলিশে নিয়ে গিয়েছে। এই বারোটার গাড়ীতে চালান দেবে। আমি তখনই ষ্টেশনে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বেশ ভদ্রলোক আমায় বললেন—"আমি একদম ছেড়ে বা এখন আর জামিনে খালাস দিতে পারব না—তবে আপনি মকদ্দমার তদ্বির করতে পারবেন।"

যথা সময়ে মকদ্দমা আদালতে উঠল। কত

উকিল—কত মোক্তার বিরুকে কত কথা কত রকম করে বুঝাতে লাগ্‌ল। কেউ বল্‌ল—"সমস্ত দোষ জমিদারের ঘাড়ে চাপিয়ে দে—খালাস পাবি।"

কিন্তু বিরু কা'রও কথা শুন্‌লে না। সব দোষ সে নিজের ঘাড়ে নিলে। মকদ্দমায় তার ফাসির হুকুম হয়ে গেল। মানুষের কি মজাদার আইন—জানের বদলে জানের প্রয়োজন।

আমি বিরুর সঙ্গে দেখা করে বল্‌লাম—সে তার মার সঙ্গে দেখা কর্‌বে কিনা?

সে বল্‌ল—কোন দরকার নেই বাবু, কেবল আপনি আমার বুড়ী মাকে দেখ্‌বেন।

সেই যে বারোটার গাড়ীতে বিরুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—সেই অবধি রোজ বারোটার গাড়ী গেলেই বুড়ী কাঁদতে থাকে। এ কান্না বুড়ীর মৃত্যু না হ'লে আর শেষ হবে না, বুড়ী যতদিন থাক্‌বে—এ জ্বালা কেঁদে কেঁদে কিছু কমাতে চেষ্টা কর্‌বে।"

বন্ধু চুপ কর্‌লেন। আমি চেয়ে দেখি—বন্ধুর দুই চোখ জলে ডব ডব হ'য়ে উঠেছে।

এমন সময় 'ভস্‌-ভস্‌' কর্‌তে কর্‌তে বারোটার গাড়ী বেরিয়ে গেল—অমনি বুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে সুরু করে দিল!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরিশিষ্ট)

সাহিত্য-সম্রাট, কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার অনুগামী লোকেরা বিবেচনা করেন যে "সর্ব্ব সাধারণ লোকের প্রচলিত কথাই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিৎ।" কিন্তু সেই "সর্ব্ব সাধারণের প্রচলিত ভাষা কি, তদ্‌বিষয়ে তাঁহাদের পরিজ্ঞানের নিতান্ত অভাব দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প। তাঁহাদের বিলাতী শিক্ষা প্রসূত সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই এদেশে পক্ষে অপ্রযুজ্য। আমি ইতিহাস সংগ্রহ উদ্দিশে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলা এবং তদন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তমরূপে জানিয়াছি যে বাঙ্গালা দেশের স্থান ভেদে কথিত ভাষা বিভিন্ন। সুতরাং সমস্ত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত কথিত এমন কোন ভাষা নাই যাহা সর্ব্ব সাধারণ

লোকের বোধগম্য হইতে পারে। সুতরাং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর তর্কের মূলেই ভুল।

এক্ষণে যে বিস্তৃত ভূভাগকে বাঙ্গালা দেশ বলে পূর্ব্বে তাহা একটি মাত্র দেশ রূপে গণ্য ছিল না। তাহাতে কয়েকটি বিভিন্ন রাজ্য ছিল। সেইগুলি পৃথক পৃথক দেশ বলিয়া গণ্য ছিল এবং তাহাদের প্রচলিত ভাষা ও বিভিন্ন ছিল। সেই সকল ভাষা মধ্যে যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা পারসী মূলক তাহা প্রায়শঃ তুল্য ছিল। কিন্তু যাহা স্থানীয় শব্দ তাহা প্রত্যেক রাজ্যে বিভিন্ন ছিল। সেই সমস্ত বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তির বহুকাল পরে ঐ সকল রাজ্য প্রথমে বৈদ্যরাজাদের অধীনে একরাজ্য ভুক্ত হইয়া ছিল। পরে ক্রমশঃ পাঠান মোগল এবং ইংরাজের আমলে একই শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া একদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে বটে কিন্তু স্থানীয় ভাষা সমূহ একীকৃত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে বৈদ্য রাজাদের আমলে সংস্কৃত রাজভাষা ছিল, পাঠান মোগল রাজত্বে পারসী রাজভাষা ছিল এবং ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী রাজভাষা হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার বিভিন্ন ভাষাগুলির একীকরণ জন্য কখন কোন রাজা চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে লোক গিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বসবাস করিত। সেই জন্য ঐ স্থানে বাঙ্গালার নানা স্থানের ভাষা সংমিশ্রিত হইয়াছিল। খৃঃ ১৮৩৫ সালে বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেব আদালতে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিয়াছিলেন। তখন অবধি বাঙ্গালা দেশে স্থানীয় ভাষার চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তখনও প্রত্যেক জেলাতে তথাকার চলিত ভাষাই ব্যবহৃত হইত এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পারসী মিশ্রিত ছিল। অথচ বৈষ্ণব সাহিত্যে কাব্যে যাত্রাগানে কথকতায় পারসী শব্দের সংস্রব ছিল না।

ইংরেজী ১৮৫৮ সালে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করিলেন। তদ্দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির প্রকৃষ্ট সদুপায় হইয়াছে। যদিও সহস্র বৎসর পূর্ব্বাবধি বাঙ্গলা ভাষায় বহু সংখ্যক পদ্য গ্রন্থ রচিত হইতেছিল তথাপি গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। গ্রামে গ্রামে বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে পাঠ্য পুস্তক আবশ্যক হইল। যে সকল কাব্য গ্রন্থ ছিল তাহাতে আদিরসের বাহুল্য প্রযুক্ত বালকদের পাঠ্য বলিয়া মনোনীত হইল না। সেই সময়ে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্কুলের পাঠ্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নদীয়া শান্তিপুরের কথ্যভাষা অল্প কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতেই গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। চলিত ক্রিয়া পদে যেখানে যফলাতে আকার যোগ হইত উক্ত পণ্ডিতেরা স্থানে ইয়া লিখিলেন যেমন কর‍্যা, ভুগ্যা, ভজ্যা স্থানে করিয়া, ভুগিয়া, ভজিয়া ইত্যাদি। ক্রিয়ার অন্তে ব্রজভাষায় যেখানে "বা" লিখিত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সেই স্থানে "ওা" লিখিত হইত উক্ত পণ্ডিতেরা সেই স্থানে "ওয়া" লিখিলেন যথা ব্রজ ভাষায় হবা, যাবা, খাবা স্থানে প্রাচীন বাঙ্গালায় হওা, যাওা খাওা লেখা হইত, উক্ত পণ্ডিতেরা সেই স্থলে হওয়া, যাওয়া, খাওয়া লিখিলেন। তাঁহারা ব কার এবং ব কার তুল্যাকৃতি করিয়া ব কার রূপে লিখিলেন।

ঋ কার স্থানে ঘ কার লিখিলেন দেবনাগরী প কার স্থানে প কার লিখিলেন। দীর্ঘ উকারের পরিবর্ত্তে উ কার করিলেন। বানানে ্ এবং ্ স্থানে মধ্যে মধ্যে নাগরী ৩ এবং 7 চিহ্ন দিলেন। শূ স্থানে শু লিখিলেন হৃ কার স্থানে হু কার করিলেন। সংখ্যার পূরণ বোধক কশি স্থানে ইংরেজীর অনুকরণে সংখ্যার শেষ অক্ষর যোগ করিলেন যেমন ১´ চৈত্র ৫´ চৈত্র ২০´ চৈত্র ৪´ শ্রেণী স্থলে ১ লা চৈত্র ৫ই চৈত্র, ২০শে চৈত্র ৪র্থ শ্রেণী ইত্যাদি। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের নিজের রচনা শক্তি ছিল না। তাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থই ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে অনূদিত। তাঁহারা কেহই পারসী জানিতেন না। এজন্য যথাসাধ্য পারসী শব্দ বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যে ভাষা তৈয়ারী হইল তাহারই নাম বাঙ্গালা সাধুভাষা।

সেই সাধু ভাষায় লিখিত পুস্তক সমূহ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল। অন্যান্য পুস্তকও সেই সাধু ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। সংবাদ পত্র সমূহে সেই ভাষা এবং সমস্ত কার্য্যেই তাহাই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই সময়ে প্যারীচাদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) কলিকাতার গ্রাম্য ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" এবং স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় "হুতুম পেঁচার নক্সা" প্রভৃতি পুথি লিখিয়াছিলেন। তাহাদের আভ্যন্তরিক গুণ সত্বে ও তাহা আদৃত হয় নাই। বরং হতুমী ভাষা বলিয়া তাৎকালিন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উপহাসাস্পদ হইয়াছে। সেই সাধুভাষার বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, এবং ক্রিয়ার বিভক্তিগুলি মাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে বিভিন্ন অন্য সমুস্তই ঠিক সংস্কৃতের অনুরূপ। সুতরাং অতি সহজেই তাহার ব্যাকরণ, অভিধান, ধাতুবিবেক ও অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণীত হইয়া সেই ভাষা সমৃদ্ধ ও সমাদৃত হইয়াছে। সেইরূপ সাধুভাষা যদি ও কোন স্থানেরই কথ্য ভাষা নহে তথাপি তাহা সমস্ত বাঙ্গালী লোকের বোধগম্য। এমন কি আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরার লোকেরাও বুঝিতে পারে সুতরাং সেই সাধুভাষার পরিবর্ত্তে এমন হতুমী ভাষা চালাইতে চেষ্টা করা যেমন যুক্তি বিরুদ্ধ তেমনি ব্যর্থ।

সমস্ত বাঙ্গালা দেশের কথ্য ভাষা যে এক নহে বরং এমন অনেক শব্দ আছে—যাহা প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এক প্রদেশের গ্রাম্য ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিলে তাহা সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বোধগম্য হইবে না। তজ্জন্য এক বাঙ্গালা দেশে চারি পাঁচটি পৃথক ভাষা প্রসার হইবে। এ বিষয়ে শ্রীযুত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন, এম, এ মহাশয় বিস্তর লিখিয়াছেন, আমিও লিখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু সেই দোষ খণ্ডনার্থ কোন যুক্তি দেন না। তিনি কেবল সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য ভাষা চালাইতে চান। তাঁহার সেই যুক্তি মতেও গ্রাম্য ভাষা যথাসাধ্য বর্জ্জনীয়। কেননা তাঁহার গ্রাম্য ভাষা বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকের বোধ গম্য নহে।

গ্রাম্য ভাষায় তেজস্বিতা নাই। কাব্যের ওজোগুণ একটি প্রধান গুণ। ওজোগুণ না থাকিলে বীররস ও রৌদ্র রস বর্ণিত হয় না। রবীন্দ্রবাবুর প্রণীত অনেক গ্রন্থেই ওজস্বিতা গুণ বিশেষ দৃষ্ট হয়

না। রবীন্দ্র বাবু কখন বীর রসের বা রৌদ্র রসের কবিতা বোধ হয় লেখেন নাই। কাজেই তাঁহার সরল ভাষার তরল রচনা করা গ্রাম্য ভাষাতেই চলিতে পারে। ইংরেজীতে ও বলে যে "Big thoughts require big words." উচ্চ বিষয়ক রচনাতে, উচ্চ শ্রেণীর শব্দ আবশ্যক। সম্রাট অশোক সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া পাটলি পুত্র নগরের গ্রাম্য ভাষা (পালি ভাষা) বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মভাষা এবং রাজভাষা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে গ্রাম্য ভাষায় উচ্চ বিষয় লেখা যায় না। তখন বহু সংস্কৃত শব্দ পালি ভাষায় লইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। অতএব বাঙ্গালা উত্তম সাহিত্যে গ্রাম্য ভাষা যথাসাধ্য পরিহার্য্য। গ্রাম্য ভাষার কোন ব্যাকরণ নাই এবং হইতে পারে না। ব্যাকরণ শূন্য ভাষা পশু পক্ষীর ভাষার তুল্য। সুতরাং হুতুমী ভাষা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। তথাপি অপ্রয়োজনীয় অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। মৈমানসিংহ জেলার সেরপুরের এক জন জমিদার মহাকবি শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় "দশানন বধ" নামে একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি নিজ বিদ্যা দেখাইবার জন্য অত্যধিক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুসঙ্গের সুপণ্ডিত স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, বাহাদুর এবং স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, পি, আর, এস, বিদ্যাসাগর, বাহাদুর ঐ কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বাস্তবিকও ঐ কাব্যখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তিনি ঐ পুস্তকে এত অধিক পরিমাণে সংস্কৃত ঢালিয়াছেন যে অভিধানের সাহায্য ব্যতীত এক পৃষ্ঠাও বোধ গম্য হয় না। তজ্জন্য ঐ পুস্তক আদৃত হইতে পারে না।

মুসলমানের কথায় কতক পারসী শব্দ যাহা জন সমাজে প্রচলিত তাহা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অপ্রচলিত পারসী, সংস্কৃত বা ইংরেজী শব্দ দিয়া গ্রন্থ দুর্ব্বোধ করা দূষ্য।

নাটকগুলি দৃশ্য কাব্য; তাহাতে গ্রাম্য ভাষাই শোভনীয়। এ বিষয়ে সুনিয়ম এই যে গ্রন্থকার যেরূপ গ্রাম্য ভাষা ভাল জানেন নাটক সেই ভাষাতে লিখিবেন। অভিনেতাগণ যখন যেখানে অভিনয় করিবেন সেই স্থানের সুবোধ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন। ইতি

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ সান্ন্যাল জলপাইগুড়ী।

Printed by Hem Chandra Ray.
At the BEAUTY PRESS,
242/1 Upper Circular Road.

[নব পর্য্যায়]

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

৮ম খণ্ড]। ১৩২৬ সাল, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ [৭ম-৯ম সংখ্যা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।

"কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ।

কলিকাতা।

১০৬।১ নং, গ্রে-ষ্ট্রীট, সাহিত্য সভা হইতে

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৬ সালের

কার্ত্তিক হইতে পৌষ সংখ্যা "সাহিত্য-সংহিতার"

সূচীপত্র।

Printed by H. C. Roy at the BEAUTY PRESS,
242-1 Upper Circular Road, Calcutta.

সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১লা চৈত্র, ১৩২৬।

সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্য-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, পি, আর, এস্. মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ গত ১৯শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল, "সাহিত্য-সভায়" তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি জাগরূক রাখা বিধেয় বলিয়া একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী স্মৃতি-রক্ষা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভার সভ্য বৃন্দ এবং হিতৈষীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তদনুসারে আপনার নিকট সাহিত্য-সভা সাহায্য প্রার্থী হইতেছেন। আশা করি, আপনি যথোচিত সাহায্য-দানে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা বিষয়ে সাহিত্য-সভাকে সহায়তা করিবেন। যে পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদনুসারে স্মৃতি-চিহ্ন অনুষ্ঠিত হইবে।

বশংবদ

শ্রীচুণীলাল বসু।

সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায় ৮ম খণ্ড। } ১৩২৬ সাল, কার্ত্তিক—পৌষ। { ৭ম, ৮ম, ৯ম

সংস্কৃত-সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

৮। দ্বিতীয়ে দ্ব্যর্থ কাণ্ডে অধ্যায়ত্রর সম্পূর্ণে মিথো বিবদমানানাং তত্ত্ব বুভুৎসূনাং বা বহু বিষয়া ধ্যায়িনাং বহু বিত্মার্থিনাং বহুবিধ প্রশ্ন সমূহস্য একবিধ বাক্যেন উত্তর প্রদান ছলেন বহবো জিজ্ঞাস্য বিষয়াঃ সুমীমাংসিতাঃ।

যথা, শ্যাম-নাম জপ্যং, শ্যামা নাম বা,
শ্যামএবোপাস্যঃ, শ্যামৈব বেত্যেবম্বিধয়োঃ
প্রশ্নয়ো, রুত্তরম্।

গীতিছন্দঃ।

সম-বর্ণ-নিচয় সেব্যং,
সম-সংস্থানং, সমার্থকঞ্চাপি।
শ্যামঃ শ্যামে ত্যু ভয়ং
বাহ্যা কারাৎ প্রতীয়তে ভিন্ন মিত্যাদ্যাঃ॥

শ্লোকোঽয়ং দ্ব্যর্থঃ। শব্দমাশ্রিত্য, শব্দার্থমাশ্রিত্য চ।

অনেন শ্লোকেন—শ্যাম শ্যাময়ো রিত্যুভয়োর্ন্নাম্নোঃ—সমান সংখ্যকাক্ষর গঠিতত্ব সম বর্ণ বিন্যাস সমানার্থকত্বা দিভিধর্শ্মৈ রভিন্নত্ব মভিধায়, অভিধায় তয়ো র্ভিন্নতয়া প্রতীতেঃ কারণম্। এবং শ্যামপ বাচ্য শ্যামাপদ বাচ্যয়োশ্চ-সমান রূপত্ব সমান সংখ্যক-ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণ সমূহো পাস্যত্ব সমানাধিকারত্ব-সমানাভিলষিতার্থ-প্রদত্বা দিনা অভেদং, ভেদ বুদ্ধে নিমিত্তঞ্চ নিরুচ্য, ভক্তানাং রুচ্যনুসারেণ তয়োর্ন্নাম্নো স্তয়ো র্বা একতরায় জপে উপাসনায়াঞ্চ

পদেশঃ প্রদত্তঃ। উপাসতাং তে তথৈব, যে যথা-চয়ো জনা ইতি॥

অনুবাদ।

৮। অনুকাব্যের দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম দ্ব্যর্থ কাণ্ড। ইহা তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই কাণ্ডে কান একটি চতুষ্পাঠীর বহুবিষয়াধ্যায়ী বিদ্যার্থিগণ, পরস্পর বিবাদ করিয়া, কখনও বা তত্ত্ববুভুৎসু হইয়া, গুরুর (উপাধ্যায়ের) নিকট বহু বিধ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, এবং গুরু (উপাধ্যায়) অনেক বিষয় অধ্যাপনা করিতে হয় বলিয়া সময়ের অল্পতাবশতঃ পৃথগ্‌ভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অবসর না পাওয়ায় দুইটী তিনটী করিয়া প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে উত্তর দিয়া থাকেন যাহাতে তৎকালে যে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সকল গুলিরই উত্তর হইয়া যায়। এইরূপ ছল করিয়া অনেক সু জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সু মীমাংসা করা হইয়াছে।

যথা। কেহ বলিতেছে শ্যামই (শ্রীকৃষ্ণই) উপাস্যদেবতা। উপাসক মাত্রের উচিত শ্যামেরই ধ্যান ধারনাদি। এবং শ্যাম নাম জপ করা। অপর কেহ বলিতেছে না, না, শ্যামাই উপাস্য দেবতা। সকলের ই উচিত শ্যামা, মার উপাসনা। এবং শ্যামা নাম জপ। এইরূপ পরস্পর বিবাদ করিয়া ছাত্র গণ গুরুর নিকট গিয়া প্রশ্ন উপস্থিত করিল শ্যাম উপাস্য কি শ্যামা উপাস্যা।

জপ করিতে হইলে কোন নাম জপ করিতে হইবে।

শ্যাম নাম না শ্যামানাম।

এইরূপ প্রশ্নে তাহাদের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত সকল শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববিদ্ গুরু উত্তর দিতেছেন।

গীতিছন্দে বিরচিত শ্লোক।

সমবর্ণ নিচয় সেব্য মিত্যাদি। উপরিলিখিত।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি দ্ব্যর্থ। এক প্রকার শব্দ পক্ষে। অপর প্রকার শব্দার্থ পক্ষে। প্রথমতঃ —শব্দ পক্ষে। শ্যাম আর শ্যামা এই যে দুইটি নাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দুইটি নাম ই এক, পৃথক্ নহে। কেন না। শ্যাম এই নামটি যত গুলি অক্ষরে গঠিত হইয়াছে, শ্যামা এই নামটি ও ঠিক তত গুলি অক্ষরেই গঠিত হইয়াছে। শুধুই যে, সমান অক্ষরে গঠিত হইয়াছে এরূপ নহে। দুই টি নামে অক্ষর সকলের বিন্যাস ও সমান। শ্যাম এই নাম টি লিখিতে হইলে যে অক্ষরের পর যে অক্ষর লিখিতে হইবে, শ্যামা এই নামটি লিখিতে হইলেও ঠিক সেইরূপই লিখিতে হইবে। কেবল যে দুইটি নামের শব্দ গত সমতা তাহা নহে। নাম দুইটির অর্থ ও সমান। শ্যাম শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম। শ্যামা-শব্দের অর্থও সেই ব্রহ্ম। যখন শব্দ গত বা অর্থগত ভেদ কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতেই হইবে, শ্যাম ও শ্যামা, উভয় নামই এক। উভয় নামের কোনও রূপ পার্থক্য নাই। তবে যে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় হয়, সে কেবল বহিঃস্থিত অর্থাৎ নাম দ্বয়ের অন্তস্থিত, অকার ও আকারের কিঞ্চিদ্ বৈলক্ষণ্য থাকা হেতুক। সকল বিষয়ের ঐক্য হইলে কেবলমাত্র একটি স্বরবর্ণের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা রূপ একটুকু উচ্চারণের ভেদ লইয়া নাম দ্বয়ের ভেদ স্বীকার করা কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। তাহা

হইলে, হ্রস্ব এবং প্লুত উচ্চারণ লইয়া কেবল শ্যাম নামের মধ্যে, এবং দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণ লইয়া কেবল শ্যামা নামের মধ্যে ও ভেদ স্বীকার করিতে হয়।

ইহা দ্বারা এই উত্তর দেওয়া হইল। যে, যখন যুক্তি দ্বারা উভয়ের নামের ঐক্য স্থিরীকৃত হইতেছে। তখন যাহার যে নামের অভিরুচি, সে সেই নামেই জপ করিতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। শব্দার্থ পক্ষে। যাঁহার নাম শ্যাম তাঁহারই নাম শ্যামা। শ্যাম ও শ্যামা এই উভয়ই এক বস্তু। কেন না, উভয়ের ভেদক কিছুই নাই। এক আকারের দুইটি বস্তুর রূপের বৈলক্ষণ্য দ্বারা বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হয়। যেমন এক গাছের সমান আকারের দুইটি আম। একটির রঙ্ ধরেছে। একটির রঙ্ ধরে নাই। এখানে রূপের বৈলক্ষণ্য দ্বারা দুইটি আমের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্যাম ও শ্যামা এই উভয়ের সে ভেদক নাই। উভয়েই এক রঙ। যে কোনও খানে উপাসকের ভেদেও উপাস্যের ভেদ লক্ষিত হয়। যেমন দুইটি সমান আকারের সমান রঙের পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। একটিতে ভ্রমর বসিয়াছে। একটিতে বৈসে নাই। অথবা দ্বিতীয়টিতে মধু মক্ষিকা বসিয়াছে। তখন ঐ ভ্রমররূপ উপাসক দ্বারা দুইটি পদ্মের পরস্পর পার্থক্য অনুভূত হয়। এখানে সে ভেদক ও নাই। কেননা। শ্যামও সকলের উপাস্য। শ্যামাও সকলের উপাস্যা। উপাসক মাত্রেরই প্রথমতঃ পঞ্চ দেবতার উপাসনা কর্ত্তব্য। পঞ্চদেবতার মধ্যে শ্যাম ও (বিষ্ণু) আছেন। শ্যামা ও (দুর্গা) আছেন। অথবা "সম বর্ণনিচয় সেব্যম্" এই সমুদয়টি একপদ। তাহা দ্বারা এই অর্থলাভ হইল। শ্যাম ও শ্যামা উভয়েই সম সংখ্যক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সমূহের উপাস্য। যত সংখ্যক উপাসব শ্যামকে ব্রহ্ম পদার্থ স্থির করিয়া শ্যামের উপাসনা করিতেছেন। আবার, তত সংখ্যক উপাসকা শ্যামাকে ব্রহ্ম পদার্থ স্থির করিয়া শ্যামার উপাসনা করিতেছেন। ইহা দ্বারা দুই পক্ষই সমান বলশালী ইহা সিদ্ধ হইল। এবং উভয় পক্ষেই বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি বিশিষ্ট মহাত্মবর্গের সমাবেশ হেতুব কোনও পক্ষকেই ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে শ্যাম ও শ্যামার কোনও রূপ পার্থক্য না থাকিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। দুগ্ধ একই জিনিষ। রুচি ভেদে, কেহ কাঁচা খান, কেহ ব জ্বাল দিয়া খান। কেহ বা দুগ্ধকে ক্ষীর রূপে পছন্দ করেন, কেহ বা দধিরূপে, কেহ বা ছানা রূপে কেহ বা অন্যান্য রূপে পছন্দ করেন। শ্যাম ও শ্যামার পছন্দ ও অপছন্দও ঠিক সেইরূপ।

আচ্ছা বেশ। দুই পক্ষেরই বল যখন তুল্য। তখন কোনও পক্ষেরই সিদ্ধান্ত ঠিক না হউক; যেমন কতকগুলি ধাতু পরীক্ষক বলিতেছে—"এটুকু রাঙ্"। অপর কতকগুলি তাহাদের তুল্য পরীক্ষক বলিতেছে—"না, এটুকু রূপা"। এস্থলে কি, হইয়া থাকে। কতকগুলি দার্শনিক বলেন—উভয় পক্ষেরই বল যদি সমান থাকে, তবে উভয় পক্ষেরই সাধনীয় বস্তুর নিশ্চয় হয়। কিন্তু ঐ নিশ্চয় কোনও কার্য্যকর নহে। তাহাতে মধ্যস্থের সংশয় নিরাস হয় না। যথা, "সমান বল বোধিত সাধ্য বিপর্য্যয়ক লিঙ্গত্বং সৎপ্রতি পক্ষত্বম্"।

অপর কতকগুলি দর্শন শাস্ত্র বিদ্ বলিয়া থাকেন -যে, না ঐরূপ স্থলে কোনও পক্ষেরই সাধ্য বস্তুর ।শ্চয় হয় না। যথা, "সাধ্য বিরোধ্যুপ স্থাপন র্থ সমান বলোপস্থিত্যা প্রতিরুদ্ধ কার্য্যক লিঙ্গত্ব াতি।"

আবার, অন্য কতকগুলি দর্শন শাস্ত্র বেত্তারা লিতেছেন। যে ঐরূপ স্থলে সাধ্যের নিশ্চয় হয় । বটে। কিন্তু একেবারে যে কিছুই হয় না, তাহা হে। ঐরূপ স্থলে যে বস্তু সাধিত হইতেছে তাহার শয় হয়। যথা "সৎ প্রতি পক্ষাভ্যাং প্রত্যেকং স্ব াধ্যানু মিতিঃ সংশয় রূপা ভবতি। বিরুদ্ধো ভয় ান সামগ্র্যাঃ সংশয় জনকত্বাদিতি।" শ্যাম ও ্যামার ব্রহ্মত্ব নিরূপন স্থলেও তাহাই হউক। হয়, উভয়ের অকিঞ্চিৎকর (সংশয়া নিরাসক) ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হোক, অথবা উভয়ের ব্রহ্মত্ব নির্ণয় না হউক। কিংবা, উভয়েরই ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে সংশয় হউক। উত্তর। যে স্থলে উভয় পক্ষের বিরোধ ভাঙ্গাইবার কোন উপায় নাই। সেই স্থলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শনা-চার্য্যগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। রঙ্গ ও রজত স্থলে বিরোধ ভাঙ্গাই-বার কোন উপায় নাই। কেন না। যে রঙ্গ, সে কখনও রূপা হইতে পারে না। যে রূপা, সে কখনও রঙ্গ হইতে পারে না, ইহা স্থির। যে হেতুক রঙ্গ ও রৌপ্যের পরস্পর পার্থক্য বহু প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সে স্থলে যখন উভয় পক্ষেরই বল সমান। তখন বাধ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের এক প্রকার স্বীকার করিতেই হইবে। আর যে স্থলে বিরোধ ভাঙ্গাইবার উপায় আছে সে স্থলে উভয় পক্ষকেই অভ্রান্ত স্বীকার করা উচিত। যিনি শ্যামকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন তিনিও ঠিক বলিয়াছেন। যিনি শ্যামাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন তিনিও ঠিক বলিয়াছেন, কেন না। শ্যামপদ বাচ্য হইতে শ্যামাপদ বাচ্য বস্তুর কোনও ভেদ নাই। যিনি শ্যাম তিনিই শ্যামা। উভয় পক্ষের বিরোধ ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গ ও রজতের ন্যায় শ্যাম ও শ্যামার পার্থক্যের বলবৎ প্রমাণ কিছুই নাই। বরং উভয়ের অভেদ সম্বন্ধেই প্রমান যথেষ্ট। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব কখনও এক ছাড়া দুই এ স্বীকার করা যায় যায় না। যখন শ্যাম ও শ্যামা উভয়েতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তখন উভয়ের ঐক্য স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

এক্ষণে আবার প্রকৃত কথা। উভয় বস্তুর ভেদ আর কি সে হয়। অবস্থানের ভেদে। যথা, মানুষ আর বন মানুষ এক জাতীয় নহে। কেন না। মানুষ থাকে নগরে। আর বনমানুষ থাকে বনে। শ্যাম ও শ্যামার অবস্থান গত ভেদও নাই। উভয়েরই সংস্থিতি তুল্য। ইনিও জগদ্ ব্যাপক। উনিও জগদ ব্যাপিকা। ঘ। গুণের তারতম্য থাকিলেও পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য সিদ্ধ হয়। যেমন আম, আর, বিলাতী আম্রা। শ্যাম ও শ্যামার গুণের তারতম্যও নাই। শ্যামের উপাসনা করিলেও যে ফল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। শ্যামার উপাসনাতেও সেই ফল, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। যখন শ্যাম ও শ্যামার পার্থক্য নিশ্চায়ক কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। তখন শ্যাম ও শ্যামার অভেদ স্বীকার করাই মনীষি গণের কর্ত্তব্য। তবে উভয়ের পার্থক্য প্রতীতি হয় কেন,

উভয়ের পার্থক্য প্রতীতির একমাত্র কারণ এই। উভয়ের বাহ্য আকার অর্থাৎ উপাসকগণের সন্তোষ মাত্র সাধনার্থ অপ্রকৃত আকৃতি, ভিন্ন। শ্যাম রমণ আকৃতি। শ্যামা রমণী আকৃতি। কিন্তু, অন্তরাকৃতি এক। উভয়েই ব্রহ্মাকৃতি। সমস্ত বিষয়ের ঐক্য থাকিলে কেবলমাত্র অপ্রকৃত আকৃতির ভেদ দ্বারা বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয় না। বহুরূপধারী বহুরূপী কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি। কখনও সন্ন্যাসী, কখনও রাজা, কখনও ইংরাজ, কখনও বৈষ্ণবী, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিলেও কৃষ্ণদাস ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নহে। ইহা সুনিশ্চিত।

ইহা দ্বারা গুরুর ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দেওয়া হইল। যে, যখন শ্যাম ও শ্যামা এই উভয়েরই ঈশ্বরতা উপাস্যতা সম্বন্ধে বেদ ও বেদানুবাদ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্ররূপ বলবৎপ্রমাণ বিদ্যমান। তখন শ্যামই উপাস্য। ইঁহার কেমন পোষাক পরিচ্ছদ। হাতে মোহন বাঁশী। ও বেটী নেংটা। পরিবার কাপড় জোটে না, ও বেটী উপাস্যা নহে। অথবা বৈপরীত্যে। আমার শ্যামা মাই উপাস্যা। গলায় কেমন মুণ্ডমালা। ও বেটা গোয়ালার ছেলে। মেয়েগুলোর কাপড় চুরী করে। ও বেটা কখনও উপাস্য হইতে পারে না এইরূপ বৃথা ঝগড়া গণ্ডগোল না করিয়া রুচি ও কুলপ্রথা অনুসারে অন্যতর রূপের উপাসনা করিলেই আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে।

শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অণু কাব্যের দ্বিতীয় কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই একটি শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা অপর অপর দ্ব্যর্থ শ্লোক গুলি যে কিরূপ তাহার একটু আভাস দেও হইল।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি দ্ব্যর্থ। এ প্রকার অর্থ, শব্দকে আশ্রয় করিয়া। অপর প্রক অর্থ, শব্দার্থকে অবলম্বন করিয়া।

এই শ্লোকটি দ্বারা—উভয় নামগত অক্ষরে অক্ষর বিন্যাসের, এবং অর্থের তুল্যতা দ্বারা শ্যাম শ্যামা এই দুই নামের ঐক্য প্রতিপাদন, এবং দুই নামের পরস্পর পার্থক্য বুদ্ধির কারণ কি, তা বর্ণন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারে, শ্যাম শ্যামা উভয়ের শরীর গত বর্ণের, উপাস্যতা, অধিকা এবং উপাসকের অভিলষিত অর্থ প্রদান সামর্থে তুল্যতা বর্ণন দ্বারা শ্যাম ও শ্যামা এই উভয়ের ঐ প্রতিপাদন পূর্ব্বক, উভয়ের পার্থক্য বুদ্ধির কা বর্ণন করা হইয়াছে। এই দুই প্রকার অর্থ প্রকা দ্বারা ভক্তগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ দেও হইয়াছে। যে, আপন আপন রুচি ও কুলপ্র অনুসারে ভক্তগণ শ্যাম ও শ্যামা এই দুইটি নামে মধ্যে যে কোনও একটি নামের জপ। এবং ঐ দু মূর্ত্তির মধ্যে যে কোনও মূর্ত্তির উপাসনা করিলে পূর্ণ মনস্কাম হইতে পারিবেন।

সংস্কৃতম্।

৯। তৃতীয়েঽস্মেবাসি কাণ্ডে সপ্তাধ্যায়ী ঃ শোভিতে, বহুনা মন্ত্রেবাসিনা মন্ত্রেষাং চ স্ব স্বেচ্ছা সারেণ কৃত প্রশ্ন সমূহ স্যোত্তর প্রদানচ্ছলেন প্রধা তোঽস্মেবাসি জ্ঞাতব্যা বহবো বিষয়াঃ সুনিরূপিতাঃ।

যথা, বিদ্যার্থিভিঃ কীদৃশৈ র্ভাব্যমিতি জিজ্ঞাস র শ্চাত্র ইতি প্রশ্নে—উত্তরম্।

গীতিছন্দঃ।

শুভ-ধীঃ, পিপঠিষু, রত্যা

স্থ মুগঃ, প্রিয় সত্য-বচাঃ, প্রিয়কৃচ্ছ।

কথ মপ্য নবজ্ঞারী,

যাবজ্জীবং স্তোতা, স ছাত্র

ইত্যাদিমাঃ॥

অনেন শ্লোকেন—বিদ্যা ধারণায়, বিদ্যা প্রাপ্তয়ে,* গ্য ব্যবসায় স্থৈর্য্যায় চ যে গুণা আবশ্যকাঃ, যুক্ত্যা সর্ব্বং সুনিশ্চিত্য ছাত্রাণাং লক্ষণ কথন ব্যাজেন গার্থিন স্তথাবিধ ভাবায়োপদিষ্টাঃ। র্ব্বৈ রেবম্বিধৈ র্ভাব্যং বিদ্যাধন মভীপ্সু ভি রিতি॥

অনুবাদ।

অণু কাব্যের তৃতীয় কাণ্ডটির নাম অন্তেবাসি গু। এই কাণ্ডটি সাত অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ত্রগণ ও অন্যান্য লোক আপন আপন ইচ্ছানুসারে শ্ন করিতেছেন। উপাধ্যায় ঐ সকল প্রশ্নের ত্তর দিতেছেন। এইকাণ্ডে এইরূপ ছল করিয়া সকল বস্তু প্রধানতঃ ছাত্রগণের জ্ঞাতব্য, সেইরূপ নেক বস্তুর সুনিরূপণ করা হইয়াছে। যথা, গার্থিগণের কিরূপ হওয়া উচিত। এইরূপ জ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে একজন ছাত্র প্রশ্ন রল।

ছাত্র কে, অর্থাৎ কাহাকে ছাত্র বলা যায়।

গুরু উত্তর দিতেছেন।

শ্লোক। গীতিছন্দঃ।

অণু কাব্যের শ্লোক মাত্রেই প্রায় গীতিছন্দ।

শুভ-ধীঃ পিপঠিষু রিত্যাদি। উল্লিখিত।

ব্যাখ্যা। (১) যাহার বুদ্ধি ভাল [যাহার বুদ্ধি নাই, সে পড়াশুনা করিবে কিরূপে। (২) [শুধু বুদ্ধি থাকিলেই হয় না। পড়িবার ইচ্ছা থাকা চাই। তাই বলা হইয়াছে] যাহার পড়িবার ইচ্ছা আছে। (৩) [আবার, কেবল পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। বা পড়িলেই হয় না। পঠিত বিষয়গুলি অভ্যাস করা চাই। সেই হেতুক উক্ত হইয়াছে]। যে পড়াগুলি ভালরূপে অভ্যাস করে। (৪) [কেবল এই সকল গুণ থাকিলেই হয় না, গুরুর অনুগামী হওয়া আবশ্যক। গুরুর অনুগামী না হইলে গুরুর অন্তরের কথা কিরূপে পাওয়া যাইবে] যে ছায়ার মত গুরুর অনুগামী হইয়া চলে। অর্থাৎ গুরুর মতানুযায়ী হয়। (৫) [অনুগামী হইয়াও যদি গুরুর নিকট কোনওরূপ অপ্রিয়বাক্য বা মিথ্যাকথা বলে তবে তাহার উপর গুরু বিরক্ত হন। বিরক্ত হইলে কি হয়। হয় তাড়াইয়া দেন, নয় তো ভাল করিয়া শিক্ষা দেন না। এই জন্য উক্ত হইয়াছে] যে গুরুর নিকট তাঁহার যাহা প্রিয় অথচ সত্য, তাহাই বলিয়া থাকে। (৬) [মনের মত কার্য্য না করিলে মনের কথা লওয়া যায় না এইজন্য] যে নিরন্তর গুরুর প্রিয় কার্য্য অর্থাৎ প্রণতি, সেবা, অভিপ্রেত বস্তুর আচরণ, অনভিপ্রেত বস্তুর নিরাস ইত্যাদি, করে। (৭) সেইরূপ গুণশালী হইয়াও যদি কোনও সময় কোনও রূপে গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহা হইলেও শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। পাঠ্যাবস্থায় হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে নিজের শিক্ষা ভাল হয় না। পাঠ সমাপনান্তে হইলে বাটীস্থ অপরের অনুজ বা পুত্র পৌত্রাদির শিক্ষা ভালরূপে

হয় না। তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া তাহাদের উপর অধ্যাপক জাতীয়ের অশ্রদ্ধা হয়। দাতাকে অবজ্ঞা করিলে দত্ত বস্তুতে প্রতি গ্রহীতার ভালরূপ ভোগ হয় না। দুরদৃষ্ট সঞ্চার হয়, অদৃষ্ট বাদীদিগের এ সকল যুক্তি তো আছেই, এই জন্য] যে ব্যক্তি কখনও কোনও রূপে অর্থাৎ গুরুর বাক্যে অবহেলা প্রকাশাদি দ্বারা গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করে। (৮) এবং যাবজ্জীবন (যতকাল বাঁচে) ততকাল যে গুরুর দোষ সকল আচ্ছাদন করিয়া স্তুতি অর্থাৎ গুণ সমুদয়েরই বর্ণন করে। তাহারই নাম ছাত্র। [ছাত্র শব্দের অর্থও তাই। গুণগণ বর্ণনেন গুরূণাং দোষান ছাদয়তীতি ছাত্রঃ। গুরুর গুণ বর্ণন ও দোষাচ্ছাদনে কি, ফল হয়। ছাত্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এবং তাহাকে দৃষ্টান্ত স্থল রূপে গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক জাতী: ছাত্র জাতীয়ের উপর পরম অণুকম্পা হয়। তাহা সমস্ত জগতের শিক্ষা কার্য্য সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হ:

শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অণু কাব্যের তৃত কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি দ্বারা—বি ধারণ, বিদ্যা প্রাপ্তি, এবং বিদ্যা ব্যবসায়ের স্থিরত নিমিত্ত যে সকল গুণের আবশ্যক, যুক্তি দ্বারা সকল গুণগুলি নিশ্চয় করিয়া ছাত্রের লক্ষণ ব ছলে ছাত্রদিগের সেইরূপ হইবার জন্য উপদে দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা বিদ্যাধন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া উচিত। ইতি—

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য।

প্রাচীন নবদ্বীপে ছাত্রজীবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গদাধর নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে বসিয়া ছাত্র-শূন্য হইলেন। কাহাকে পড়াইবেন, পরন্তু তিনি স্থির করিলেন, আমার অধ্যাপনা শক্তি পণ্ডিত ও ছাত্রগণ যতদিন না বুঝিবে তাবৎকাল আমার নিকট কেহ পড়িবে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গঙ্গার ঘাটে যাইবার পথের ধারে গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া একাকী তথায় বা: করিতেন। ঐ সময় তিনি দীধিতির টীকা আরম্ভ করেন, ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের স্নান গমন বা পুষ্প চয়ন কালে তিনি বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। অনেকে গদাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া টোলে যাইয়া গদাধরের প্রশংসা করিতেন

ক্রমে গদাধরের ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণের কর্ণগোচর হওয়ায় গদাধরের আদর বৃদ্ধি হইল, গদাধরের গোষ্ঠাধিকার পড়া ছিল না, এজন্য তিনি পুস্তকের লিখিত "সিব্যন্তে" এই শব্দটীকে "শিচ্যন্তে" বলিয়া লিখিয়াছিলেন, ইহা অপর ছাত্রগণ জানিতে পারিয়া পরিহাস করিয়া ছিল, তৎপর গদাধর ঐ "শিচ্যন্তে পাঠ ঠিক রাখিয়া যে ব্যাখ্যা করেন তাহা দেখিয়া জগদীশ বলিয়াছিলেন—এখন গদাধরের ব্যাখ্যা দেখিয়া কোন পাঠ ঠিক তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, এই কথা প্রকাশ হওয়ায় গদাধরের নিকট সকলে আগ্রহ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, উক্ত গদাধরের বংশেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাম শিরোমণি তৎপুত্র মোহন চূড়ামণি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করেন, এখনও উক্ত বংশে পণ্ডিতদ্বয় বর্ত্তমান আছেন। গদাধরের পরে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশীয় গোবিন্দ ন্যায় বাগীশ নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, উক্ত গোবিন্দ ন্যায় বাগীশের সময় ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র মহারাজ রাঘব রায় কৃষ্ণনগর রাজধানী নির্ম্মাণ করেন ও ঐ সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের রাজগণের সহিত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সম্বন্ধ জন্মে। মহারাজ রাঘব উক্ত গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারকে টোল নির্ব্বাহের জন্য হাজার বিঘা জমি ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। মহারাজ রাঘব দিগ্‌নগর গ্রামে সুবৃহৎ জলাশয় খনন পূর্ব্বক রাঘবেশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ শিব মন্দিরে একটী শ্লোক আছে।

শাকে যোমনবেষুচন্দ্র গণিতে পুষ্যৈক রত্নাকরো।
ধীর শ্রীযুত রাঘবো দ্বিজমণি ভূমিভুজামগ্রণীঃ॥

ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা জানা যাইতেছে রাঘব রায় ১৫৯১ শকে ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন; সুতরাং মহারাজ রাঘব ও গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার ঐ সময়ের লোক বুঝিতে হইবে। গোবিন্দ ন্যায় বাগীশের পর, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, ঐ সময়ে মহারাজ রাঘবের পুত্র রুদ্ররাম রায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে টোল নির্ব্বাহের জন্য অনেক ভূমিদান ও অর্থ সাহায্য করেন। তৎপরে জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন ও জয়রাম তর্কালঙ্কার, তৎপর ভাষা পরিচ্ছেদ মুক্তাবলী গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন, তৎপর রুদ্রনাথ ন্যায় বাচস্পতি, তৎপর শিবরাম বাচস্পতি, নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, জয়রামের সময় মহারাজ রামজীবন কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন, তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা সদালাপ করিতেন এবং পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা পণ্ডিতগণকে বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতগণের ছাত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কষ্টকর মনে করিয়াই ছাত্রগণের জন্য একটী সম্পত্তি রাখিয়া যান, সেই সম্পত্তির আয়ের টাকা হইতে নবদ্বীপের ছাত্রগণ মাসিক বৃত্তি পাইয়া তাহার দ্বারা ভোজন নির্ব্বাহ করিত। এই সময় হইতে অধ্যাপকের ছাত্রগণের আহার দিতে হইত না, সেই সম্পত্তিই পরবর্ত্তী কোন রাজা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন, তদবধি গবর্ণমেণ্ট হইতে নবদ্বীপের ছাত্রগণ মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে, পূর্ব্বে ১০০৲ শত টাকা গবর্ণমেণ্ট নবদ্বীপের ন্যায়ও স্মৃতির ছাত্রগণকে মাসিক বৃত্তি দিতেন, তৎপর, ক্রমেদ্রব্য সামগ্রীর মূল্যাধিক্য হওয়ায় মাসিক বৃত্তির সংখ্যাও অধিক হইতে থাকে,

সম্প্রতি দয়ালু গবর্ণমেন্ট পাঁচশত টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি দিতেছেন।

শিবরাম বাচস্পতির সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার সময় হইতে সময় সময় রাজ বাটীতে পণ্ডিত সভা হইত, মহারাজের শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণে বিশেষ সুশ্রূষা ছিল, সুতরাং পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের বিচার করিতেন। মহারাজ, সর্ব্বতোভাবে পণ্ডিতগণের শাস্ত্র চিন্তার ব্যাঘাত না হয় এ জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেন। এই সময় হইতে নবদ্বীপের উপাধি প্রাপ্তির নিয়ম পরিবর্ত্তন হয়। কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে, তিনি রাজ সভায় আত্ম পরিচয় দিতে উপস্থিত হইতেন, ও পণ্ডিতগণ উপযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করিলে মহারাজ উপাধি দিবার অনুমতি করিতেন তদনুসারে পণ্ডিতগণ উপাধি প্রদান করিতেন, এই সময় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কৃষ্ণনগরের মহারাজকে "নবদ্বীপাধিপতি" উপাধি প্রদান করেন, ঐ উপাধিই রাজ বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এবং কৃষ্ণনগরের রাজবর্গ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচারপূর্ব্বক এক একজনকে ন্যায়ের প্রাধান্য ও স্মৃতির প্রধান্য দিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বদেশে ও অগ্রেনি মন্ত্রিত হইতেন, ও সর্ব্বদেশের পণ্ডিতগণ অপেক্ষা প্রধান বিদায় পাইতেন এই নিয়ম অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

এই সময় নবদ্বীপে আর একটী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামক একজন পণ্ডিত ধন সম্পত্তিতে অতি নিস্পৃহ থাকিয়া সর্ব্বদাই বনের মধ্যে এক কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শাস্ত্র চিন্তা করিতেন, রামনাথকে এজন্য সকলে "বুনো রামনাথ" বলিত, রামনাথের পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন এজন্য রামনাথ স্ত্রীকে ভোজনাচ্ছাদন দিতে সক্ষম হইবেন না মনে করিয়া বিবাহ করিতে বিরত থাকেন, পরে অধ্যাপকের অনুরোধে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু কোন বড়লোকের নিকট গমন বা অর্থোপায়ের চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অতি দুঃখে শাকান্নভোজনে জীবন ধারণ করিতেন, রামনাথ যে ন্যায়শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ইহা অনেক পণ্ডিতেই অবগত ছিলেন না, রাজবাটীতেও রামনাথ পরিচিত নয়, পরন্তু ছাত্র মধ্যে কেহ কেহ রামনাথের নিকট কঠিন বিষয় বুঝিতে যাইত, ও তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া এরূপ বুঝিল যে রামনাথের ন্যায় পণ্ডিত নবদ্বীপে আর নাই, ক্রমে রামনাথের নিকট বহু ছাত্র অধ্যয়ন জন্য উপস্থিত হয়, রামনাথ ছাত্রের আহার্য্য দিতে অসমর্থ বলিয়া ছাত্র রাখিতে অসম্মত হন, পরে ছাত্রেরা অধ্যাপকের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন আরম্ভ করিল, রামনাথ সর্ব্বদাই ছাত্র লইয়া শাস্ত্র চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, রামনাথের স্ত্রী "ঘরে পাক করিবার কিছু নাই" একথা বলিলে রামনাথ নিকটস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিতেন, ব্রাহ্মণী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তেতুলের পাতার ঝোল ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিতেন, রামনাথ তাহার দ্বারা অমৃত তুল্য মধুর জ্ঞানে ভোজন সম্পন্ন করিয়া শাস্ত্র কার্য্য করিতেন। একদিন মহারাজ শিবচন্দ্র গঙ্গার ঘাটে নৌকায় অবস্থান

করিতেছেন, এই সময় রামনাথের স্ত্রী গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গমন করেন, কতিপয় সুবর্ণালঙ্কৃতা কাংসবণিক কন্যা গঙ্গাতে স্নান করিতেছিল, দৈবাৎ রামনাথের স্ত্রীর হাতের জল তাহাদের গাত্রে যায়, তাহারা দরিদ্রা রমণী মনে করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে বলিয়াছিল আপনার শাখা ধোয়া জল আমাদের গাত্রে দিবেন না, তাহাতে রামনাথ পত্নী উত্তর করিলেন, আমার শাখাকে অবজ্ঞা করিতেছ, "এই শাখা যত দিন, নবদ্বীপের শোভা তত দিন ইহা নিশ্চয় জানিবা" নিকটস্থ মহারাজের কর্ণকুহরে ঐ শব্দ প্রবেশ করায় তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া জানিলেন, ইনি বুনো রামনাথের স্ত্রী, তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, কিন্তু অতি দরিদ্র, এই কথা শ্রবণে মহারাজ শিবচন্দ্র রামনাথ গৃহে গমন করেন। দেখিলেন তিনি শাস্ত্র চর্চ্চায় মগ্ন আছেন, মহারাজকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, আপনার অনুপপত্তি কিছু আছে, রামনাথ উত্তর করিলেন, চারিখণ্ড চিন্তামণির মধ্যে দুই একটী অনুপপত্তি যাহা ছিল, ছাত্র পড়াইতে তাহার উপপত্তি হইয়াছে। মহারাজ বলিলেন, আপনার শাস্ত্রের অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, সংসারে ভোজন নির্ব্বাহের উপযোগি কোন্ বস্তুর অভাব আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি রামনাথ উত্তর করিলেন, এই তিন্তিড়ী বৃক্ষের পত্র আছে ইহাতেই ভোজন নির্ব্বাহ হয়, অভাব কিছুই দেখিনা। পরে মহারাজ তাঁহার পত্নীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আপনার অভাব কি আছে? রামনাথ পত্নী হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সধবার চিহ্ন শাঁখা দেখাইয়া জানাইলেন যে, আমার হস্তে শাঁখা থাকিবার কাল পর্য্যন্ত কোন অভাব নাই, মহারাজ শিবচন্দ্র রামনাথ পত্নীর এইরূপ পতিভক্তি ও নিষ্কামভাব দেখিয়া মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, পরিশেষে রামনাথকে কিছু অর্থ দিতে প্রস্তুত হইলে রামনাথ শাস্ত্রচিন্তায় বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না। বুনো রামনাথের পর, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, শঙ্কর তর্কবাগীশ, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, শ্রীরাম শিরোমণি, মাধবতর্ক সিদ্ধান্ত গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, হরমোহন চূড়ামণি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত অনেক টীকা করিয়া গিয়েছেন, শঙ্কর তর্কবাগীশেরও অনেক পত্রিকা আছে, গোলোকনাথ অনেক গ্রন্থের বিচার প্রণালী নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া গিয়েছেন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় মুক্তিবাদ ও শক্তিবাদের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপর ন্যায় সূত্রের প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া ন্যায় সূত্রের সরলাটীকা ও বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থশেষ করিতে পারেন না, একখণ্ড লেখার পর তিনি স্বর্গারোহণ করেন, তৎপর তাহার উপযুক্ত পুত্র সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ও আমি উভয়ে ঐ পুস্তক শেষ করিয়াছি, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও একজন স্মৃতি শাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পূর্ব্বে এদেশে মেধাতিথি, কুল্লুক ভট্ট, বিজ্ঞানেশ্বর, প্রভৃতি মীমাংসকের মতে ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থকারের অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য না থাকায় ধর্ম্ম কার্য্যের কর্ত্তব্যতা সন্দেহ হইত। এ জন্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঋষিদের বচনের বিরোধ পরীহার পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, প্রথম ঐ গ্রন্থ স্থানে স্থানে প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হয় না, ক্রমে বহু বিচারান্তে রঘুনন্দনের মত পণ্ডিত সমাজে আদৃত হয়, ও সকল বঙ্গদেশ হইতে রঘুনন্দনের গ্রন্থ পড়িবার জন্য নবদ্বীপে ছাত্রগণ আগমন করে, ঐ সময় হইতে নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্রের টোলের ন্যায় স্মৃতি শাস্ত্রেরও অনেক টোল স্থাপন হইতে থাকে, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের ন্যায় জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত টীকা ও শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকা ছাত্রগণ আদর সহকারে পড়িতে থাকে, ক্রমে উত্তরোত্তর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাতে অন্য শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের বিশেষ উপকার হয়।

পূর্ব্বে পড়িবার নিয়ম ছিল, প্রথম ব্যাকরণ, পণ, অমর কোষাভিধান, কণ্ঠস্থ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিত, তৎপর কাব্যশাস্ত্র যথা সম্ভব অধ্যয়ন পূর্ব্বক ন্যায় বা স্মৃতি শাস্ত্র পড়িতে প্রবৃত্ত হইত, অনেক স্মৃতি গ্রন্থে ন্যায়ঘটিত কথা আছে, ন্যায় শাস্ত্র কিছু না পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য অনেকে স্মৃতি পড়িবার পূর্ব্বে ন্যায় কিছু পরিতেন। কেহ কেহ সম্পূর্ণ ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়াও সম্পূর্ণ স্মৃতি শাস্ত্র পড়িয়া ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতের ব্যবস্থা দিবা উদ্দেশ্য থাকিলে স্মৃতিশাস্ত্রও পড়িতে হয়, নবদ্বী ভিন্ন বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ মাত্রেরই সমস্ত বিষয়ের মীমাং করার নিয়ম আছে। পণ্ডিত হইলেই স্মৃতির ব্যবস্থ দিতে হইবে, জ্যোতিষের দিন দেখিতে হইবে, চণ্ডী প্রভৃতি পুরাণ পাঠ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপ করাইতে হইবে, ইহার কোন একটা না জানিলে সমাজে প্রতিষ্ঠা হইত না। এজন্য পণ্ডিত মাত্রেরই এক শাস্ত্র প্রধান রাখিয়া অন্যান্য শাস্ত্র ও কিছু কিছু জানিতে হইত, নবদ্বীপে ঐ নিয়ম নাই, একজনের সকল বিষয় পড়িতে হইত না, নৈয়ায়িকগণ ন্যায়ের চর্চ্চাই করিতেন। স্মার্ত্তে ব্যবস্থা দিতেন, জ্যোতিষের দিন দেখিতে হইলে আচার্য্য পাড়া যাইতে হইত, চণ্ডী বিরাট পড়াইবার আবশ্যক হইলে পুরোহিতের নিকট যাইতে হইত, নবদ্বীপে সকল শাস্ত্রের পণ্ডিতই ছিলেন। সুতরাং ঐ নিয়মে সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ের পণ্ডিত পাওয়া যাইত না, সুতরাং এক পণ্ডিতের সকল বিষয় শিখিতে হইত।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের ছাত্রগণ বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, সুতরাং সেই সময়ের নৈয়ায়িকগণ ন্যায় শাস্ত্র ব্যতীত ক্রিয়াকর্ম্ম নির্ব্বাহের উপযোগী স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ চণ্ডী বিরাট প্রভৃতি বিষয়েও অভিজ্ঞ হইতেন। ইদানীন্তন ছাত্রগণ প্রায়ই অল্পদিনে পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করেন অথচ কোন কষ্ট স্বীকার করিতে অসমর্থ, ব্যসনাদি কার্য্যেও নির্লিপ্ত নহে। সুতরাং বহু শাস্ত্রের জ্ঞান

র থাকুক, এক শাস্ত্রেও ভালরূপ অভিজ্ঞতা লাভ রিতে পারেন না। আমি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ ধ্যয়ন করিয়াছি, আমার পিতা ও আমার নব্য ন্যায় ড়বার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বদেশ বিখ্যাত, াড়কদী গ্রামবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ অধ্যয়ন করিয়াছেন। হাদের অধ্যয়ন বৃত্তান্ত শুনিয়াছি। তাঁহারা নবদ্বীপ াসিয়া দেশ হইতে যে টাকা আনিতেন, তাহা াদ্দারের (দোকানদারের) নিকট জমা রাখিতেন জারের সময় পেটেলণ্ডী (টোলের চাকরাণী) গণ জারে যাইয়া আবশ্যকীয় তেল তরকারী প্রভৃতির ন্য ঐ পোদ্দারের নিকট হইতে লইয়া বাজার রিত, পোদ্দার ঐ দৈনিক খরচের হিসাব রাখিত। সময় ১, ১।০ চাউলের মণ বিক্রয় হইত, ৮০ ৮৶০ না ডাইলের মণ, ৶০ ৶১০ পয়সা তৈলের সের; ইরূপ সকল জিনিষ সুলভ ছিল, কড়ির দ্বারা ধারণ বস্তু ক্রয় চলিত, এক পয়সার কড়ি লইয়া াহার দ্বারা তৈল, লবণ, তরকারী মশল্যা, সমস্ত র্ব্বাহ হইত, একজনের দুইবেলা আহার করিতে ০ /৫ পয়সার অধিক ব্যয় হইত না। তাহারা াজে পাক করিতেন, এক বেলা ডাইল বা তরকারী াক হইত। বিকালে প্রায়ই কাঁচকলা ভাতে াহার করিতেন, সমস্ত সময়েই শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন, ধ্যাপকের অনুপস্থিতি কালে বা অষ্টমী ত্রয়োদশী ভৃতি অনধ্যায় দিনে অধীত গ্রন্থের আলোচনা রিতেন, ন্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের কট স্মৃতি পড়িতেন, ত্রয়োদশী ও সপ্তমীর প্রদোষ ালে, পড়া নিষেধ, সুতরাং পুস্তক লিখিতেন, বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট হইত না। আমি ১০ বৎসর দেশে থাকিয়া ন্যায় পড়িয়াছি, ঐ সময় আষাঢ় মাস হইতে ন্যায় পড়া হইত না ঐ সময় স্মৃতির টোলে যাইয়া ৩।৪ মাস বৎসর বৎসর স্মৃতি পড়িয়াছি, যে সময় মূলাজোর কলেজে পড়িয়াছি। পালা অনুসারে, কয়লার জালে ৭।৮ জনের পাক করিয়া, ২।৩টী পাঠ পড়িয়াছি, নিজের একপাঠ চলিত, সহাধ্যায়ী দ্বয় অপঠিত গ্রন্থদ্বয় পড়িতেন, তাহাও শুনিতাম, সুতরাং এক সময়ে তখন গ্রন্থ পড়া হইত। নবদ্বীপ পড়িবার সময়, যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, আমার ছাত্রগণ তাহার একদিনের কষ্ট সহ্য করিতেও সক্ষম নহে। সকাল হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর পাঠ শুনিয়া গঙ্গা স্নানে যাই, আসিবার সময় উত্তপ্ত বালুকাতে চরণদ্বয় দগ্ধ হইত, টোলে আসিয়া বাঁসের কুঞ্চি ধরাইয়া আখাতে আগুন দিতে ধূম হইত, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন কালে শরীরে ঘর্ম্ম থাকিত, ঐ ধূমের দ্বারা চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিত, ঐ সময় কাচা বাঁসের নির্ম্মিত চাল হইতে ঘুণের গুড়া শরীরে পতিত হওয়ায় ঘর্ম্মের সহ মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমাকার হইত, চক্ষু জুড়াইবার জন্য বাহিরে দৃষ্টি করিলে বাতাসে উড্ডীয়মান বালুকা চক্ষে যাইত, এইভাবে যুগপৎ পাকও সন্ধ্যা পূজা শেষ করিয়া আহার করিতে প্রায় দুইটা বাজিত, আহারান্তেই বিদেশীয় কঠিন পাঠের ছাত্রগণকে পাঠ বুঝাইতাম, অধ্যাপক আগমন করিলেই পাঠ স্থানে যাইয়া নিজের পাঠ পড়িয়া অন্য পাঠ শুনিতে সন্ধ্যা হইত, সন্ধ্যান্তে নিজ পাঠ দেখিয়া অন্য পাঠ বুঝাইতে রাত্রি ১১টা ১২টা হইত, তৎপরে পাক ভোজন করিতে রাত্রি ১টা দেড়টা হইত। সে সময়

ঘড়ি ছিল না, রাত্রি বুঝিতে না পাড়ায় কোন দিন মৈথিলগণের পাক শেষ হইতে রাত্রি শেষ হইত, ভোজন আর ঘটিত না। নবদ্বীপে টোলস্থ ছাত্রগণের এইরূপ কষ্ট চির দিনই ছিল।

পূর্ব্বে সম্প্রদায় বিশেষের নূতন বাসস্থানকে "টোলা" বলিত, যেমন "বাঙ্গালি টোলা" "বেণেটোলা" ইত্যাদি ঐ টোলা শব্দ হইতেই টোল শব্দটি প্রচলিত হইয়াছে আমার বিশ্বাস, যেরূপেই হউক বিদেশীয় ছাত্রগণের বাসস্থানকেই টোল বলিয়া ব্যবহার করা হইতেছে, পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই বাঁস ও খড় দ্বারা অল্পমূল্যে টোল গৃহ নির্ম্মিত হইত, সুতরাং লোকের বাসগৃহের ন্যায় টোল গৃহ সুদৃশ্য হইতনা। এজন্য কোন কোন আধুনিক লোকের ধারণা যে, বংশতৃণ নির্ম্মিত নিকৃষ্ট ছাত্রাবাসের নাম টোল। ঐধারণায় বশবর্ত্তী কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, অন্যূন ২০টী টোল সত্বেও সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "সমস্ত নবদ্বীপ ঘুরিলাম, কোন স্থানে একটী টোলও দেখিলাম না।" ফলতঃ আমরা ছাত্রগণের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপনা স্থানকেই টোল বলিয়া থাকি। পূর্ব্বে নবদ্বীপে ঐ টোল গৃহ নানা খণ্ডে বিভক্ত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইত, ও উহার প্রত্যেক খণ্ডের এক অংশে শয়ন উপবেশন স্থান, অপর অংশে পাকস্থান থাকিত, তাহাতে ছাত্রগণের পাক সময়েও পুস্তক দৃষ্টি নির্ব্বাহ হইত ও পাকের উপকরণ সমস্তই একস্থানে রাখিতে পারিত, তাহাতে পাকের জন্য অধিক সময় নষ্ট হইত না। নবদ্বীপে যে সময় পশ্চিম দেশীয় বা দক্ষিণ দেশীয় নিরামিষভোজী ছাত্রগণ আসিতে আরম্ভ করে ঐ সময়, মৎস্য মাংসভোজী বাঙ্গালী ও মৈথিল ছাত্রগণের সহিত এক ঘরে ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ও বিদেশী ছাত্রগণের স্থিতি সম্ভব হইত না। এজন্য অধ্যাপ[ক] উহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করিতেন এজন্য অধ্যাপকের কষ্ট দেখিয়া, কোন রাজপুত[না] দেশীয় ছাত্র তাহার শিষ্য ধনী বাবুলাল আগ[র] ওয়ালাকে নবদ্বীপে একটী টোলগৃহ নির্ম্মানের অ[নু]রোধ করেন। প্রায় ১০ বৎসর গত হইল, বাবুলা[ল] আগরওয়ালা মহাপ্রভুর জন্ম স্থান ও সরস্বতী দেবী লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপ সমাগত হইয়া, আত্মাকে ধন্য বো[ধ] পূর্ব্বক একটী সুবৃহৎ ইষ্টকময় টোলগৃহ নির্ম্মাণ করে[ন] পাকা টোল বাড়ী নির্ম্মাণ হইল এজন্য ঐ টোল পা[কা] টোল নামে বিখ্যাত হইল। নবদ্বীপের পশ্চিম প্রা[ন্তে] সাধারণ জনগণের অগম্যস্থানে স্বর্গীয় বুন রামনা[থের] টোল ছিল, সেইস্থানটীই নির্জ্জন প্রদেশ বলিয়[া] বাবুলাল পণ্ডিতগণের সহিত মনোনীত পূর্ব্বক তথ[ায়] উক্ত পাকটোল নির্ম্মাণ করেন। ঐ টোল বাড়ী চতুর্দ্দিকেই কোন গৃহস্থের বসতি নাই এবং দক্ষি[ণ] দিকে গমনাগমনের পথ, অপর তিন দিকে জঙ্গ[ল] ঐ টোল বাড়ী বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে চতুঃশা[লা] পরিপূর্ণ হওয়ায় ও দক্ষিণদ্বারী পাঠগৃহ সুবৃহৎ হওয়া[য়] বহুতর ছাত্রের আবাসস্থান হইল, প্রত্যেক গৃহে[র] একাংশে শয়নের জন্য উচ্চ বেদী ও অপরাংশে পা[ক] ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকায় ছাত্রগণের সুখক[র] হইল, গ্রামে সহস্র আমোদ প্রমোদ বা বাদ্য কোলাহ[ল] উপস্থিত হইলে, সেই শব্দ ছাত্রগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হই[ত] না, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারী গৃহের জানালা বাহিরে[র] দিকে ছিল না, সুতরাং নিরুপদ্রবে কেবল মা[ত্র] পুস্তকে চক্ষুঃ সংযোগ করিয়াই ছাত্রগণ কার্য্য করি[ত]

ালের বাহিরের বস্তুতে চক্ষুঃ সংযোগের কারণ ছিল , বাবুলাল অন্যূন ৫০ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এই পাকা াল নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন ন্দেহ নাই।

বাবুলালের উক্ত পাকাটোল নির্ম্মাণকালে নবদ্বীপে ;গোলকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবিত ছিলেন, তাঁহার কট পাঞ্জাব রাজপুতনা বোম্বাই মাদ্রাজ নিজাম পাল মিথিলা প্রভৃতি ভারতের নানা দেশীয় ছাত্র ্যয়ন করিত। গোলকনাথ অতিশয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান য়ায়িক ছিলেন, তাহার দ্বারা নব্যন্যায়ের অনেক ন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি সামান্য নিরুক্তি াচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি সামান্য লক্ষণা প্রভৃতি গ্রন্থের ত্রিকা (বিচারগ্রন্থ) রচনা করেন ও কঠিন কঠিন ানের পরিষ্কৃত ব্যখ্যা প্রকারমুদ্রায় অনুগম, প্রভৃতি খিয়া যান, সেই সকল পত্রিকা "গোলোকনাথী" ায়া প্রসিদ্ধ আছে ৺শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় সর্ব্ব- ণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রসিদ্ধির কারণ নটী ছাত্র আলোক গোলোক রুদ্রমঙ্গল। রুদ্রমঙ্গল ্রের নিবাসী আলোক বাকলা নিবাসী, গোলোক ীপনিবাসী। কথিত আছে মুর্শিদাবাদের কোন ায় তত্রত্য পণ্ডিতগণ শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়কে স্ত করিবার উদ্দেশে একটী নিরুত্তর ফকিককা ান, অর্থাৎ তৎকালে পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান রতেন কোন পণ্ডিতের কোন গ্রন্থ উপস্থিত নাই, ার যে গ্রন্থ উপস্থিত কম বুঝিতেন, তাঁহার নিকট গ্রন্থের ফকিককা করা হইত, উক্ত নিয়মে মুর্শি- াদের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক কৃষ্ণনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ত্তি পণ্ডিতগণ বিচারপূর্ব্বক শিরোমণি মহাশয়ের নিকট শব্দখণ্ডের পূর্ব্বপক্ষ করেন। গোলকনাথ তৎকালে অধ্যাপক নহে, ছাত্র। তিনি অধ্যাপকের পরাজয়ের আশঙ্কায়, নিজেই ঐ অপঠিত গ্রন্থের বুদ্ধি পূর্ব্বক উত্তর করেন, ঐ উত্তর বাদী ও মধ্যস্থের সমাদৃত হওয়ায় সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এ বালব কে ? এই প্রশ্ন করেন তদুত্তরে শিরোমণি মহাশয়, "এটী আমার ছাত্র" এইরূপ সদর্প উত্তর করেন, তাহাতে কৃষ্ণনাথ বলেন এটী তোমার ছাত্র নহে, তোমার পূর্ব্বপুরুষ গদাধর, এ অপঠিত গ্রন্থের উত্তর করিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিল এ সামান্য ব্যক্তি নহে।

উক্ত গোলকনাথের অধ্যাপনার জন্যই বাবুলাল টোল নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু টোল নির্ম্মাণ শেষ হইতে গোলোকনাথ ইহধাম ত্যাগ পূর্ব্বক গোলোক ধামে গমন করেন, সুতরাং তৎকালিক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় উক্ত টোলে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। বাবুলাল কেবল টোল নির্ম্মাণ জন্যই ধন্যবাদার্হ নহেন, তিনি ছাত্রগণের বৃত্তি ব্যবস্থাও করেন, তদ্দেশীয় ছাত্রগণ একবেলা নিরামিষ আতপান্ন ভোজন করিত, এজন্য তিনি প্রত্যেক ছাত্রের দৈনিক ৴৷৷০ সের আতপ চাউল ও ৴৴ পোয়া আইরের ডাইল, ও নগদ ৵১০ পয়সা বৃত্তি ব্যবস্থা করেন, তৎকালে এক টাকার কাঠ রাখিলে চারিমাস এক জনের একবেলা পাক চলিত, সুতরাং ঐ ৷৷৴০ আনা মাসিক বৃত্তির ।০ আনার কাঠ অবশিষ্ট ৷৷৴০ আনায় ৴০ আনায় তৈল, ও ৫ পয়সায় ২০ গণ্ডার কড়ি হইত উহার মধ্যে লবণ তরকারী হরিদ্রা জিরা মরিচ প্রভৃতি খরিদ নির্ব্বাহ হইত, ঐ সময় গবর্ণমেণ্টের

বৃত্তি ৸৹ ৸৴৹ যাহা পাইত, তদ্দ্বারা রাত্রির জল খাওয়া পড়ার তৈল কাগজ প্রভৃতি খরিদ নির্ব্বাহ হইত।

বাবুলাল জীবনকাল পর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে স্বদেশীয় বিদেশীয় বা বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বৃত্তিপ্রদান করিয়াছেন, ও পূজার বন্দে ছাত্রগণ কলিকাতায় তাহার কুঠী বাড়ীতে গমন করিলে প্রত্যেককে বস্ত্র ও শীত কালে লেপ প্রদান করিতেন। বাবুলালের মৃত্যুর পর তাহার অধিকারীগণ ঐ টোল রক্ষা করিবেন কিনা এ সন্দেহে তিনি ট্রষ্টি নিযুক্ত পূর্ব্বক নবদ্বীপের টোল খরচ বাদ উইলে ৫০৲ টাকা মাসিক খরচ ও টোল মেরামতের টাকা দিবার অভিমত প্রকাশ করিয়া যান। চিরদিন ঐ টোল চলিবার কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু স্বার্থপরতাই সাধারণ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে অনেক স্থলে পণ্ডিতগণকেও স্বার্থপরতায় আক্রমণ করে টোলের অধ্যাপক সরলমতি ধার্ম্মিক বাবুলালকে বলিলেন এই টোলে আমার পুত্র পৌত্রগণ পরাইতে পারে এ ভাবে আমায় স্বত্ত করিয়া দেও, বাবুলাল পণ্ডিতের বাক্য শুনিয়াই গুণদোষ বিচার না করিয়া উক্ত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নামে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অধ্যাপনা পূর্ব্বক ভোগ দখল করিতে পারিবেন এই মর্ম্মে দানপত্র লিখিয়া দিলেন, কালে তর্করত্ন মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তাহার মূর্খ পুত্রাদিগণ টোলের স্বত্ব দাবী করেন, ও সেই সূত্রে যদুনাথ সার্ব্বভৌমকে টোলের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, তাহাতে উভয় পক্ষে বিবাদান্তে মীমাংসা হইয়া হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, দুর্গা প্রসাদ তর্কালঙ্কার রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন এই পণ্ডিতত্রয় ক্রমে অধ্যাপনা করেন, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রাচীন অবস্থায় বহু ছাত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে অশক্ত হইলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পরামর্শপূর্ব্বক আমাকে ঐ অধ্যাপনা কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, আমার অধ্যাপনার সময় আমার চেষ্টায় বাবুলালের ষ্টেট হইতে ঐ টোল মেরামত হইয়াছিল, কিন্তু কতিপয় লোকের পরামর্শে উক্ত তর্করত্নের স্বজনগণ মেরামত কার্য্যের ব্যাঘাত পূর্ব্বক ঐ টোলের অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দেন, পরে বাবুলালের পক্ষ হইতে স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্রগণই ঐ টোলের স্বত্ববান হওয়ায় সেই পাকা টোলবাড়ী ভূমিসাত হইতেছে, ও শৃগাল সর্পাদির আবাস রূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বাবুলালের দেশীয় বাগলা ভগবানদাস নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক বাবুলালের টোল পরিদর্শন করিয়া উৎসাহিত চিত্তে ঐরূপ আর একটী টোল ও ছাত্রের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং পাকা টোল করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আপাততঃ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কয়েকখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া বাবুলালের টোলের রীত্যনুসারে ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, বাবুলালের সময় অধ্যাপকগণ মাসিক বৃত্তি বা বেতন গ্রহণ করিতেন না, এজন্য উভয় টোলেরই অধ্যাপকের বৃত্তির ব্যবস্থা নাই, ঐ সময় ভগবান দাসের কাঁচা টোল বলিয়া উহার নাম কাঁচা টোল, হইল, ঐ সময় মদীয় অধ্যাপক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঐ উভয় টোলেরই অধ্যাপক ছিলেন, ও আমি ক্রমে ঐ উভয় টোলের ছাত্র ছিলাম, আমার অধ্যাপনার সময়,

ভগবান দাস জীবিত না থাকায় তাহার কাচা টোল
েহ নষ্ট হইয়া যায় ও দুই টোলের ছাত্র পাকা টোলে
থাকিয়াই আমার নিকট অধ্যয়ন করে, পরে আমি
ভগবান দাসের স্ত্রীর নিকট পণ্ডিত গণের প্রার্থনা
জানাইয়া তাঁহাদের পাকা টোল নির্ম্মাণের প্রস্তাব
করি, ভগবান দাসের পত্নীও ১০।১২ জন ছাত্র থাকি-
বার উপযুক্ত পাকা টোলবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন,
আমি ১৩১২ সাল হইতে ঐ উভয় টোলের অধ্যাপনা
করিতেছিলাম, পাকা টোলের ধ্বংশের পরও ঐ
টোলের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক স্থানান্তরে পড়াইতে
ছিলাম। সম্প্রতি সরস্বতীর কৃপার অভাবে ঐ টোল
দুইটীর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ডিরেকটর সাহেব বাহাদুরের
আদেশে আমায় ঐ দুইটোলের অধ্যাপনা ত্যাগ
করিতে হইয়াছে। ঐ দুইটী টোল পূর্ব্বে নবদ্বীপের
কীর্ত্তি স্বরূপ ছিল, বহু ছাত্রের আবাস ছিল, নবদ্বীপের
পণ্ডিত গণের আদরের বস্তু ছিল, এখন ঐ দুইটী
টোল উঠিয়া যাওয়ায় অনেক পণ্ডিত ব্যথিত হৃদয়
হইতেছেন। ঈর্ষাপরতন্ত্র পণ্ডিতগণ মাড়োয়ারী
দিগকে লিখিতেছেন যে, তোমাদের নবদ্বীপে টোল
রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা দ্বারাতেই
বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মনোবৃত্তি বুঝিতে পারেন।

পূর্ব্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ প্রাচীন পণ্ডিতগণের
মত গ্রহণ পূর্ব্বকই সমস্ত কার্য্য করিতেন, প্রাচীনগণও
ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বেই সমাজ চলিয়াছে,
ছাত্রগণও সকলে স্ব স্ব স্বাধীন ছিলেন না, নবীন
ছাত্রগণ প্রাচীন ছাত্রের অধীন ছিলেন, নবীন ছাত্রগণ
সমস্ত বিষয় অধ্যাপকের নিকট বুঝিতেন না।
অধিক পাঠী ছাত্রের নিকট অনেক কথা বুঝিতে
হইত, এজন্য তাঁহারাও অধ্যাপকের ন্যায় মাননীয়
ছিলেন, সুতরাং তাহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে
হইত, ছাত্রগণের মধ্যে তিনটী দল ছিল, পশ্চিম
দেশীয় দল মৈথিলী দল, বাঙ্গালী দল, ঐ সকল দলের
মধ্যে যিনি শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হইতেন তিনিই দলপতি
ছিলেন, কোন ছাত্রের আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ দেখিলে
দলপতি তাহাকে শাসন করিতেন, নবদ্বীপে প্রাচীন
কাল হইতে কালিকা দেবীর ঘট স্থাপনা আছে, ঐ
স্থানে পূর্ব্বে কালিকা মূর্ত্তি ছিল, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ
হওয়ায় দেবীর নাম "পোড়া মা" হইয়াছে, ঐ পোড়া
মার ইতিহাস অনেকরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এ
প্রবন্ধে তাহা লিখিতে বিরত থাকিলাম, সকল ছাত্রই
ঐ পোড়ামাতাকে সন্ধ্যার সময় মাল্য ও ধূপ প্রদান
করিতেন ও পাঠান্তে সাধ্যানুরূপ বিভবের দ্বারা
ঐ পোড়ামার পূজা করিয়া পাঠ শেষ করিতেন,
এবং নবদ্বীপে প্রাচীন সময় হইতে তিনটী প্রসিদ্ধ
শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাদের নাম বালনাথ, যুবনাথ
ও বুড়োশিব। সকল ছাত্রই প্রথম নবদ্বীপে উপস্থিত
হইয়া ঐ বুড়োশিবের অর্চ্চনা করিতেন, শাস্ত্র আছে
"জ্ঞানঞ্চ শঙ্করা দিচ্ছেৎ" জ্ঞানার্থী ব্যক্তি শঙ্করের
উপাসনা করিবে, এই শাস্ত্র পূর্ব্বে সকলেই মানিতেন।
ঐ বুড়ো শিবের পূজার সঙ্গে নিয়ম ছিল নবদ্বীপে
নূতন ন্যায় বা স্মৃতির ছাত্র আসিলে সমস্ত অধ্যাপক ও
ছাত্রের নিকট তাহার বিদ্যার পরিচয় দিতে হইত এজন্য
সকল টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া
সন্দেশ বিতরণ করিতে হইত, বুড়োশিবের নিবেদিত
সন্দেশ্র অধ্যাপকগণকে ৮টী ছাত্রগণকে ৪টী ও
চাকরাণীর নাম "পেটেলনী" ছিল তাহাদিগকে ২টী

করিয়া সন্দেশ দিতে হইত। এবং নবাগত ছাত্র, ভিন্ন টোলের ছাত্রগণের নিকট পূর্ব্বপক্ষ করিতেন ঐ পূর্ব্বপক্ষ লইয়া উভয় টোলের ছাত্রগণের তুমুল বিচার হইত, ঐ বিচারের ফল সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলিত হইত। ছাত্রগণের মধ্যে কোন বিরোধের কারণ উপস্থিত হইলে প্রাচীন ছাত্রগণ তাহার মীমাংসা করিতেন। ছাত্রগণের এরূপ একতা ছিল কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকে কথা বলিলে, সকল ছাত্র একমত হইয়া কার্য্য করিত। একবার নবদ্বীপের শিক্ষিত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় হনুমানের উপদ্রবে হনুমানগণকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ঐ সময় হনুমভক্ত ছাত্রগণ ঐ কার্য্যের বিরোধিতা করিবার জন্য সকল দেশীয় ছাত্রের সহিত একযোগে যষ্টি হস্তে বাহির হয় সুতরাং তারিণী বাবু বিফল মনোরথ হইলেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপে সেরূপ রীতি নীতি কিছুই নাই এখনকার ছাত্র অধ্যাপকগণ বিচার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের উপাধির সম্মান নষ্ট হইবে এ ভয়েই অনেক বিচারে অগ্রসর হন না, সন্ধ্যাকালে পোড়ামাতাকে মাল্য দিতে ৫ পয়সা ব্যয়ে কেহ কুণ্ঠিত না হইলেও কোট্ ষ্টকিং খুলিতে হইবে এজন্যও অনেকের মাল্য দান ঘটে না, এখন কয়েকটী বিদেশীয় পণ্ডিতকে গবর্ণমেণ্ট নবদ্বীপে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দ্বারাতেই নবদ্বীপের স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িকের সখ্যা বুঝিতে পারেন, পূর্ব্বে ব্যাকরণ ও কাব্যের অধ্যাপনা স্থানকে "টোল" বলিত না "আখড়া" বলিত সেই সকল "আখড়া"ই এখন টোল রূপে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে স্মৃতি শাস্ত্রের বিচারের একটী সিদ্ধান্ত ছিলনা, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও রামনাথ সিদ্ধান্ত ইহারা উভয়ে সকল ব্যবস্থায় একমত হইতে পারিতেন না, এজন্য উঁহাদের ছাত্র পরম্পরায় ব্যবস্থায় মতভেদ ছিল, এখন আর সে মতভেদ নাই, এখন ব্যবস্থা গৃহীতায় মতভেদই ব্যবস্থায় ভেদ হইতেছে।

দরিদ্র-পণ্ডিতগণও অনেক স্থলে ধর্ম্ম ভয়ে অধিক অর্থ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ধনবান্ পণ্ডিতে তাহা পারেন না।

মহোদয়গণ!

নবদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলাম, কিন্তু যাহার জন্ম গ্রহণে নবদ্বীপ পবিত্র, যে জন্য অন্য নবদ্বীপ সম্প্রদায় বিশেষের নিকট বৃন্দাবন অপেক্ষাও পুণ্যতম, যাহার লীলা খেলা শিক্ষা দীক্ষার জন্য অন্য ভারতীয় ধনী দরিদ্র প্রায় সকলেই গৃহ ত্যাগী হইয়া কৌপীন ধারী ঊর্দ্ধ বাহু রূপে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য দেবের কথা কিছুই লিখিলাম না, ইহার কারণ আর কিছুই নয় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন চরিত, চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত, বিশেষ ছাত্রজীবন প্রবন্ধের উপযোগিতা বিশেষ নাই এজন্য সেই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই, পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ছাত্রাবস্থায় দুই একটী বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথের সহিত একত্র অধ্যয়ন করেন, রঘুনাথ এক ক্রমে ২।৩ দিবস চিন্তা করিয়া যে সকল সন্দেহ দূর করেন, রঘুনাথের প্রশ্ন মাত্র শ্রীচৈতন্যদেব সেই সকল বিষয়ের উত্তর বলিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপকের নিকট পড়িতেন অথচ নিজে কোন সময়

পুস্তক দেখিতেন না, এবং প্রশ্ন করা মাত্র উত্তর করিতেন, ইহাতে সাধারণের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি দেবত্ব সন্দেহ হয়, কোন দিন গঙ্গার ঘাটে অধ্যাপক স্নান তর্পণ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে কোশাখানি তাহার হস্তে দিতে দিতে বলেন, এরূপ কিম্বদন্তী আছে, শ্রীচৈতন্যদেব অধ্যাপকের হস্তে কোশা দিতে অগ্রসর হইয়া গঙ্গায় পদক্ষেপ করেন ঐ সময় কেহ কেহ দেখিলেন তাহার পদতলে এক একটী পদ্ম উঠিতে লাগিল, তিনি ঐ পদ্মের উপর পদ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিলেন, এইরূপ বহুতর অমানুষিক ভাব দর্শনে লোকের সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়, সে সময় রাজবাটীতে হস্ত চালাইবার ব্যবস্থা ছিল, কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে কোন অনক্ষর জ্ঞান ব্যক্তির হস্তে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রক্রিয়া করিলে উহার হস্তের দ্বারা উত্তর লেখা হইত, এই নিয়ম অবগত হইয়া কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার বিদেশগত পুত্রের সম্বাদাভাবে রাজবাড়ীতে প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর হয়, পনাসী গ্রাম নিকটে তনায়াজ পঞ্চদস্যুবঃ। ততো দুর্গেতি দুর্গেতি বিললাপসঃ পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করেন আমার পুত্র দুর্গানাম করিয়াছে, তবে তাহার বিপদ হইল কেন? তাহার উত্তর হয়, (তবকালে মৃণাংমৈবলক্ষীবৃদ্দিপ্রদাগৃহে, সৈবাভাবে ভথালক্ষীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে। ঐরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর হয়, "গৌরাঙ্গোভগবত্তক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ" এই উত্তরানুসারে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে চিরকাল ঐরূপ ধারণাই ছিল, পরে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ বলিবার জন্য ঐ বচনের অর্থ করেন, গৌরাঙ্গো ভগবত্তক্তো নচ, অংশকো নচ, পূর্ণঃ, এইরূপ অর্থ পণ্ডিত সমাজে গৃহীত না হওয়ায় তিনি একাকী সভা স্থাপন পূর্ব্বক পুরাণোক্ত বচন প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন, ঐ সময় বিরোধী পণ্ডিতগণ বিচার পূর্ব্বক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সুতরাং পণ্ডিতগণের এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত হইলেও গোস্বামী সম্প্রদায় বা বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব শিষ্য সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব ধারণা দৃঢ় হইয়াছে, সম্প্রতি বহু সম্প্রদায়ই ঐ মতের অনুবর্ত্তী হইতেছেন। ফলতঃ তিনি যেরূপেই অবতীর্ণ হউন জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি হরিনাম উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার একটী বিচারের কথা উল্লেখ আছে, ঐ বিচারের ঘটনা বিশেষ জ্ঞাতব্য এজন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের ব্যাকরণ পাঠ কালে, কোন বিদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপ জয় করিবার উদ্দেশে আগমন করেন। ঐ পণ্ডিত মহাশয় দেবী সরস্বতীর প্রসাদে সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিবার শক্তিশালি ছিলেন। ঐ পণ্ডিত মহাশয় তাৎকালিক নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক সায়ংকালে গঙ্গার ঘাটে গমন করিয়া দেখিলেন, গৌরাঙ্গদেব কয়েকটী ছাত্রের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, ক্রমে ঐ পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হয়, পণ্ডিত মহাশয় গৌরাঙ্গ দেবের অধ্যাপক প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাভব করিয়াছেন,

গৌরাঙ্গের নিকট এরূপ সদর্প উক্তি করেন, গৌরাঙ্গ দেব তাহাতে মনে মনে বিরক্ত হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলিলেন আপনি বড়লোক আপনার সহিত বিচারের ক্ষমতা আমার নাই, আপনি কোন একটী বিষয়ের কবিতা দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন, পরে গঙ্গার নিকট গঙ্গার বর্ণনা করাই কর্ত্তব্য বিবেচনায় পণ্ডিতবর অতি দ্রুত শতশ্লোক দ্বারা গঙ্গার স্তব করেন, চৈতন্য দেব বলিলেন, আপনার রচিত ষষ্ঠ শ্লোকটী পুনরাবৃত্তি করুন, পণ্ডিত বলেন ঝঞ্ঝাবায়ুর ন্যায় পঠিত শত শ্লোকের মধ্যের শ্লোক কি মনে আছে, চৈতন্য বলিলেন, আমার মনে আছে আমি পড়িতেছি, আপনি ঐ শ্লোকের গুণ ও দোষ ব্যাখ্যা করুন, এই কথা বলিয়া চৈতন্য দেব শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
য দেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ বামনোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈ বর্চ্চ্য চরণা
ভবানী ভর্ত্তু র্যা শিরসি বিভ বত্যদ্ভুত গুণা।৬।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন আমি অতিক্রত শতশ্লোক একবার পড়িয়াছি তাহাতে তুমি কিরূপে অভ্যাস করিলে, চৈতন্য বলিলেন আপনি যেমন সরস্বতীর বরে কবি আমিও দেবতার প্রসাদে শ্রুতিধর। পণ্ডিত বলিলেন আমার শ্লোকে দোষ নাই—উপমা অনুপ্রাস গুণ আছে, চৈতন্য বলিলেন, আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে দোষ আছে, পণ্ডিত রুষ্টভাবে বলিলেন, আমার কাব্য বেদ বাক্য উহাতে দোষ নাই, তুমি ব্যাকারণি অলঙ্কার দোষ গুণ কি বুঝিবা, চৈতন্য বলিলেন, আমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ি নাই সত্য কিন্তু পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে আপনার শ্লোকে পাঁচটী দোষ ও পাঁচটি অলঙ্কার আছে, কিন্তু দোষ থাকায় অলঙ্কারের গুণ নষ্ট করিয়াছে, যেমন শ্বেত কুষ্ঠীর গাত্রে অলঙ্কার শোভা পায় না তদ্রূপ। পরে পণ্ডিত মহাশয় দোষ দেখাইতে বলায় গৌরাঙ্গ দেব দোষ দেখাইলেন প্রথম চরণে মহত্ত্ব বিধেয় ইদং উদ্দেশ্য কিন্তু ইদং শব্দটী পরে থাকায় "অবিস্পৃষ্ট বিধেয়" দোষ হইয়াছে, তৃতীয় চরণে দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়, শ্রীলক্ষ্মী অনুবাদ্য "অনুবাদ্য মনুক্তাত্বৈ ন বিধেয় মুদীরয়েৎ" এই নিয়মের ব্যত্যয় হওয়ায় এখানেও অবিস্পৃষ্ট বিধেয় দোষ হইয়াছে। চতুর্থ চরণে "ভবানীভর্ত্তু" শব্দটী প্রয়োগ করায় ভবের স্ত্রীর ভর্ত্তা বুঝিতে হইলে ভবভিন্ন ভর্ত্তাকে বুঝায় এজন্য "বিরুদ্ধমতি কারিতা" দোষ হইয়াছে। ও ঐ চরণে বিভবতি ক্রিয়ার দ্বারায় বাক্যার্থ শেষ হইয়া পুনরায় অদ্ভুত গুণা এই বিশেষণের অন্বয়ে "সমাপ্ত পুনরাত্ততা" দোষ ঘটিয়াছে। এবং প্রথম চরণে অকারের অনুপ্রাস, তৃতীয় চরণে রকারের অনুপ্রাস, চতুর্থ চরণে ভকারের অনুপ্রাস থাকায় দ্বিতীয় চরণে অনুপ্রাস না থাকায়, "ভগ্ন প্রক্রমজ" দোষ ঘটিয়াছে।

এই পাঁচটী দোষ থাকায় সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে পাঁচটী অলঙ্কার আছে, একটী "শ্রীলক্ষ্মী" এ স্থলে "পুনরুক্ত বদাভাস" চরণকমল হইতে গঙ্গার উৎপত্তিবলায় বিরোধালঙ্কার হইয়াছে, এবং শ্রীলক্ষ্মীরিব এস্থলে "উপমালঙ্কার" আছে এবং বিষ্ণু পাদোদ্ভবত্বাদি হেতুক গঙ্গাতে মহত্ত্ব অনুমেয় এজন্য এ শ্লোকে অনুমান অলঙ্কার আছে, শব্দালঙ্কার

নুপ্রাস ও পুনরুক্ত বদাভাস, অর্থালঙ্কার উপমা, বিরোধ, অনুমান এই পাঁচটী গুণ থাকিতেও পঞ্চ দোষে দুষ্ট হইয়াছে এইরূপ দোষোদ্ভাবনে দিকবিজয়ী পরাভূত হইলেন, চৈতন্য বলিলেন, আপনি আমার অধ্যাপককে পরাভূত করিয়াছেন, এই অভিমান বাক্যের জন্যই আপনার শ্লোকে দোষোদ্ভাবন করিলাম। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে দিকবিজয়ী পণ্ডিত ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ রাত্রিতে সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহাতে সরস্বতী দেবী আদেশ করেন, গৌরাঙ্গ ভগবান তাঁহার সহিত বিচারে তোমাকে জয়ী করিবার ক্ষমতা আমার নাই তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন কর, পরে ঐ পণ্ডিত গৌরাঙ্গ দেবের স্তব পূর্ব্বক তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

শ্রোতৃ মহোদয়গণ! পূর্ব্বে ব্যাকরণ অধ্যয়নের সময়ও অলঙ্কার জ্ঞান হইত এখন গবর্ণমেণ্টের উপাধি কাব্যতীর্থ ন্যায়তীর্থ তর্কতীর্থ স্মৃতিতীর্থের ন্যায় নবদ্বীপের বঙ্গ বিবুধ জননী সভার কাব্যরত্ন স্মৃতিরত্ন তর্করত্ন ন্যায়রত্ন উপাধিও সহজ লভ্য হইয়াছে, কাব্যতীর্থের উক্ত অলঙ্কারাদির লক্ষণ, তর্কতীর্থের তর্কের লক্ষণ, ন্যায়তীর্থের ন্যায় লক্ষণ, স্মৃতিতীর্থের স্মৃতির লক্ষণ গ্রন্থ দেখিয়াও বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, সাঙ্খ্য বেদান্তাদি বুঝাইতে হয় না, কণ্ঠস্থ করিয়াই পরীক্ষায় পাশ করা যায়, ইহা কেবল ছাত্রের দোষ নয় অধ্যাপকগণ ছাত্র পাস করাইয়া যশস্বী হইতে চান, সুতরাং অনেক স্থলে ন্যায় পথে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এবং পরীক্ষায় ব্যবস্থাপকগণও সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না কিম্বা ভ্রমে পতিত হইয়া কার্য্য করেন, এই সকল কারণেই বিদ্যা লোপ হইতেছে।

অদ্য এই পর্য্যন্ত এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ।

কেন দাঁড়ালে এসে।

আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে?
গাঁর দরিয়ায় জীবন আমার চলেছে ভেসে।
একটানা অতি সহজ ভাবে
চলেছিলে মোর সময় সবে
তাহার ভিতর কেন গো তবে
আসিলে হেসে?

আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে?
জীবন ছিল গদ্যে ভরা ক্ষতি কি তাই?
পদ্যে সরস জীবন আমি কভু না চাই!
কেন প্রকাশিলে আসিয়া তবে?
কি ভাবিয়া মনে ফুটিলে কবে?
ভাবিলে বা বুঝি সহজ হবে চলিতে ক্লেশে,

আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে ?
এলে যদি অমন করে চলিলে কেন ?
বাঙ্গালীর ঐ পল্লী গৃহে অতিথি যেন।
দিলে শেষ করে সকল আশা
ফুরায়ে দিলে গো আমার ভাষা
সংসারে যেন মিথ্যা আসা
স্বপ্ন-আবেশে

আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে।
শূন্য করে সকল স্নেহ রিক্ত হৃদয়ে
কি দাগ টেনে চলে গেলে পুণ্য-আলয়ে।
যাও তবে আর ডাক্‌ব নাক'
রুদ্ধ ব্যথায় কাঁদ্‌ব নাক'
স্মৃতিই কেবল ভুল্‌ব নাক'
দিনেরি শেষে।

আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে ?
শান্তি টুকু হরে নিলে সুখ প্রভাতে ;
দুঃখ দিয়ে সাজালে বুক নিজেরি হাতে।
তোমার দেওয়া নিধির মতন
তুলে নিলাম যেমন রতন
বক্ষে শেষে করে যতন
ধরিব হেসে।
আমার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

১

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাসন্তীর বিলাস গৃহ।

বাসন্তী ও চমকচাঁদ।

বাসন্তী। অমন মুখ গুমড়ে রইলে কেন ?

চমক। যাও যাও চটে গেছি।

বাসন্তী। রঙ্গ আর কি ?

চমক। দেখ বেশী বকনা, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা আমার ভাব খানা কি ?

বাসন্তী। হয়েছে কি ?

চমক। আর কি ? তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, দেখে শুনে ক্ষান্ত দিয়েছি ; সন্নিসির কাছ পর্য্যন্ত দৌড়বার মৎলব ক'চ্ছ মাণিক, বলিহারী যাই ধনি তোমাদের আতকে !—

বাসন্তী। (হাসিয়া) তুমি জেনেছ, টের পেয়েছ ?—

চমক। তা যাচ্ছ, যাও; আমায় কেন আর চেপে চেপে ধর? কেবল তোমার আমি? ঘরের াাগ ত আর নও যেমন খুসী ভেসে যাবে। চোখের নুশা যতদিন ছিল, ছিল; গেল তা কি হ'ল? াক ছটাক কটা রূপ;—তা অমন ঢের পাওয়া যাবে; চহারাখানা যদি বজায় থাকে, যেখানে যাব লুপে নবে নামেই মেরে দেব, বাঃ চমকচাঁদ, যেন আকা-শর চাঁদধরা ক'াদরে!—

মাধবী ও জটেশ্বরের প্রবেশ।

মাধবী। দেখ গো, সেই ঠাকুরটী এসেছে!

জটে। বন্ধু, আমি আপনিই এসেছি!—

চমক। কৃতার্থ ক'রেছ আর কি? বলুম একটু াড়ালে থাকতে, তা না দুলাল নিজে এসেই াজির; বামুন পণ্ডিত আর বলে কাকে! আমার মম জমে এসেছিল, মাঝখানে ক'রে দিলে রসভঙ্গ!

জটে। হে হে বন্ধু বড় রসিক হে!

বাসন্তী। প্রণাম ঠাকুর, যা মাধবি, শিগগির কখানা আসন নিয়ে আয়।

জটে। এঃ হেঃ গোড়াতেই ছুঁয়ে ফেল্লে।

(মাধবীর প্রস্থান।)

বাসন্তী। ঠাকুর, আজ আমার কি ভাগ্যি ঘরে সে পায়ের ধুলো পেলেম।

আসন লইয়া মাধবীর পুনঃ প্রবেশ।

মাধবী। এই নিন, প্রভু বসুন।

জটে। না না আমি ত এখানে বসব না; হাঁ হাঁ ামি কুশাসন ভিন্ন বসিনা।

বাসন্তী। কুশাসন ত আমরা দেবতা রাখিনা

মাধবী। তা যখন ছুয়ে পায়ের ধুলো নেয়া হ'য়েছে, তখন সব ছোয়াই হয়েছে ছলবেন না আর বসুন দয়াময়।

জটে। তা তা, দেখ, ওটা আমার ঠিক মনোগত ভাব ছিল না। তারপর "যস্মিন দেশে যদাচারঃ" ব'সব বই কি, তোমাদের এখানে ব'সতেই ত আসা।

চমক। দয়া ক'রে অনুমতি হ'ক তবে প্রভু, এ দেশের আর যা যা আচার সবই আনাই।

জটে। কি জানহে সবই চলে, তবে ওই জলটা বাদ সাদ দিয়ে।

চমক। আর সেটা যদি একটু রঙ্গিন হয়, আর পাত্র বিশেষে রাখা যায়।

জটে। তাও তাও শাস্ত্রে আছে হে "আপো নারায়ণঃ স্বয়ং"।

চমক। কি গো একটু দেবে না কি?

বাসন্তী। পাগল!—প্রভু অনুমতি করুণ দাসীকে কি ক'ত্তে হবে?

জটে। না না কিছু ক'ত্তে হবে না, তুমি বেশ বেশ, ওই যে কি বলে জলদাজী—

চমক। ঠাকুরের ভঙ্গী যে বড় বেতর দেখছি ক্রমশ:—

জটে। হা হা কি জান? মতীনাঞ্চ মুণিভ্রমঃ" কিছু মনে করনা হে।

চমক। শুনছো গো, কত বড় পণ্ডিত এসেছে নাও নাও পাদোক জল খাও।

বাসন্তী। আজ আমাদের কত পুণ্যি!—

জটে। আহা সুন্দরী, তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে, না? আজকাল উষ্ণ রশ্মিটা বড়ই প্রখর।

(উত্তরীয় দ্বারা ললাট মুছিয়া বায়ু সেবন।)

বাসন্তী। দেও পাখাখানা একটু বাতাস করি।

জটে। উঁ হুঁ হুঁ আমি কিছু শীতাক্ত।

চমক। দেবতার মস্তিষ্কটা কিছু বেপক্ক হ'য়ে গিয়েছে; হবে না? কেমন জায়গা?—

মাধবী। বামুন পণ্ডিত উনি, এসেছেন এই কত ভাগ্যি।

চমক। কিন্তু ঝক্কি সামলাতে পার্চ্ছেন না, কেমন লাগছে দেবতা? ঘাবড়ে গেলে যে বেজায়, ভাবছ কি?

জটে। ছি ছি, তোমার বেশ রসবোধ হে!—

চমক। দেখেছ, ঠিক মানুষ চেনাটা আছে। (বাসন্তীকে দেখাইয়া)

চমক। তা এখন কোনটাকে চাই বলুন দেখি।

জটে। অ্যাঃ!—তুমিও বেশ, তুমিও বেশ।

চমক। অমন ক'ল্লে শেষ সবই খোয়াবে, একটা ধর।

মাধবী। বামুন বাঁশ বনে ডোম কানা।

জটে। তোমার কোনটী হে?

চমক। বাঃ, বুদ্ধি আছে, সেইটী বাদ দিয়ে বুঝি!—

বাসন্তী। তুমি কি বল দেখি, উনি কি সেই মানুষ? এসেছেন একটা কাযে—

চমক। থাম না তুমি, তোমার সঙ্কেত চটাচটি হ'য়ে গিয়েছে। দেখ দেবতা, দুটীই আমি দিতে পারি, কিন্তু আমায় কি দেবে ঠিক ক'চ্ছ?

জটে। তুমি অতি উদার, তা আমার আছেই বা কি, এই টিকি কোশাকুশী আর কুশোর গোছা; তবে কি জান, আমাদের আশীর্ব্বাদটা অমোঘ।

চমক। আশীর্ব্বাদ ত শিরোচ্ছেদ তার আগে এই শিখাচ্ছেদটা হ'য়ে গেলেই ভাল না?

(শিখা ধারণ।)

জটে। তুমি ত ভারী বেল্লিক দেখছি হে!

চমক। দেখ ঠাকুর চটো না, এখনি পাঁচ জন ডাকুব দেখিয়ে দেব তোমার কীর্ত্তি।

জটে। না না ওইটী ক'র না দোহাই বাবা; আমি কি সত্যই রাগ ক'চ্ছি ও একটু পরিহাস কচ্ছি।

চমক। এস, পথে এস, দাও ত গা কাঁচিখানা, থাক এই ভোঁতা ছুরীতেই জমবে ভাল।

জটে। শিখাটা নেবেই তবে?

চমক। এই রকম ত বাসনা।

জটে। লোকের কাছে কি ব'লব বলত?

চমক। সোজা জবাব নাপিতে কেটে দিয়েছে।

বাসন্তী। কেন বামুনকে জব্দ কর।

জটে। উ হু হু, অত টান কেন লাগে যে—

চমক। (শিখা কাটিয়া) এই যে হয়ে গেছে কেমন মানাচ্ছে এইবার দেখত। (মাধবীর প্রতি) নাও তোমার ঘরে এটা টাঙ্গিয়ে রাখগে; তোমার নামটী কি ঠাকুর তলায় লিখে রাখতে হবে যে।

জটে। তোমার পায়ে পড়ি বন্ধু ওটা আমায় ফিরিয়ে দাও।

চমক। চেপে যাও না মশাই এ কি ছেলের হাতের মোয়া।

জটে। (বাসন্তীর প্রতি) ও গো তুমি আমার হয়ে একটু বল না।

চমক। শোন না বলি একটা কাষ আমার কর চ কিয়িয়ে দেব এই চিঠিখানা তোমার যজমান সুতন্ত্র গোঁসাইকে দিতে পার? কি ধনি মুখে হাসি ফুটেছে যে—

বাসন্তী। (হাসিয়া) তোমার ভেতরেও এত?—

চমক। ভাবছ কি? —মনে থাকে যেন জবাব আনতে হবে এখানে টিকি বাঁধা।

জটে। কি বল!—

চমক। তবে রইল টিকি নাম লেখা দেয়ালে লটকান ভেবেছ বুঝি তোমার চিনিনা নাম ধাম জানিনা।

জটে। ভারী বিপদে ফেল্লেদেখছি কোথায় গেলে জিজ্ঞেস ক'রে কি ব'লব বল দেখি?

চমক। তবে যা ভাল বোঝ, কর; আমি নাচার।

জটে। আমার ত ঘটে বুদ্ধি জোগাচ্ছে না আচ্ছা দাও যা থাকে কুল কপালে যা হোক একটা ব'লে দেব।

চমক। এই নাও, আজই দিও।

বাসন্তী। এতে কি লিখেছ দেখি।

চমক। (সুরে)

তোমার প্রাণের গোপান কথাটী
লিখে লিখে দিছি সখি গো।
আসিবে সে ছুটী পাছটীতে লুটি
গড়াগড়ি ধূলি মাখি গো!

বাসন্তী। মরণ আর কি!—

চমক। না না ভারী মনের মতন; যাও শিগগির বাঁ ক'রে এই চিঠিখানা নিজে হাতে লিখে নিয়ে এস ত ঠিক যেন তুমি লিখছ।

বাসন্তী। আবার কেন? তোমার অমন মুক্তর মতন অক্ষর।

চমক। আরে নেকী, এসব কাযে এঁক বেঁকায়ই জোর বেশী; যাও ঝট্ করে।

বাসন্তী। আর পারিনে বাপু!—

চমক। উঃ আহ্লাদে প্রাণ আটখানা ধুকপুকুনি যেন আমি কিছুই বুঝিনে।

(পত্র লইয়া বাসন্তীর প্রস্থান)

জটে। চলনা গো তোমার ঘরে ততক্ষণ বসি গে।

মাধবী। মিনষের বেভ্ ভম হ'য়েছে যে কাযে এসেছে একেবারে ভুলে গেছে।

জটে। বটে বটে সেইটে, ডাকনা ডাকনা ওটিকে চ'লে গেল যে, বলা হ'ল না ত।

চমক। নূতন ক'রে কি আর সোনাবে ওকে? সবই ত জানে, ধরনা সে হ'য়েই গিয়েছে।

জটে। তা, তা, তুমি বন্ধু যখন মাঝখানে আছ, কথাই নেই; দেখ সে ভণ্ড বেটা ভারী সেয়না আসবে টাস্‌বে না প্রথম এদেরই লুকিয়ে তার আস্তা-নায় যেতে হবে।

মাধবী। বাগো সন্নিসি, নোংরা, ছাই মাখে, তা হ'লে কিন্তু ঠাকুর ঢের প'ড়ে যাবে, যতবার আনা-গোনা সেই হারে পাওনা গণ্ডা চাই।

জটে। আমি তোমাদের আগাম এনে দিচ্ছি, আগাম এনে দিচ্ছি। মোট কথা জব্দ করা চাই, একবার তোমাদের সঙ্গে ধরিতে দিতে পারে হয় টিটি পড়ে যাবে।

চমক। ঠাকুর ধরিয়ে দিতে ভারি মজা, দেখিনা একবার তোমার ওপর দিয়ে, তাকি পাড়া-পড়শীদের ?

জটে। হে হে বন্ধু বেশ কৌতুক করছে।—চলনা গো তোমার বরটা একবার দেখে যাই।

চমক। সেটী হবার যো নেই ঠাকুর, ও ভারী সৌখীন তোমার ও গোঁপ কামান মুখ পছন্দই হ'চ্ছে না, দেখছ না কথায় আমলই দিচ্ছে না।

জটে। তা তা এবার থেকে গোঁপ দাড়ী রাখব, কি জান বামুন পণ্ডিত মানুষ, শুধু গোঁপ রাখা চলেনা দাড়ী শুদ্ধ রাখতে হবে।

মাধবী। মাগো দেড়ে মিনষে শুধু গোঁপটা কেমন মানায়।

জটে। তবে আর উপায় নেই। যজমান গুলো যাবে, তা যাক এখানে আসা যাবাটা ত থাকবে, এরা বেশ, রাখব শুধু গোঁপই !—

চমক। ভাবছ কি ? এই টিকিটায় খাসা গোঁপ বানিয়ে দিচ্ছি এস ত দেখি।

জটে। আমার—আমায় কি সং সাজাবে ?

চমক। আটায় সুবিধে হবে না, এই যে জুতোটা—(গোঁপ পরাইয়া) বাঃ কেমন মানাচ্ছে দেখ দেখি

জটে। সত্যি ? (হাস্য)

চমক। দেখে আমারই হিংসে হ'চ্ছে, এ হ'ল কি বন্ধু !—

জটে। চল, এইবার তোমায় ঘরে যাই।

চমক। আহা দাঁড়াও না নতুন বন্ধুর সঙ্গে দু'টো প্রেমালাপই কর না; একটু গান টান শোন দেখ দেখ কারা আসছে চন্দু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'য়ে যাক !

জটে। ওরা হাসবে না ত ?

চমক। আরে ছ্যাঃ, ক্ষ্যাপা নাকি ?

জটে। আমি তোমার পাশে দাঁড়াই

মাধবী। মিনষে করে কিগো !—

গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা অলসে ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
ওরা, আকুল নয়ানে চাহে।
আমরা হাসিতে কথাতে প্রাণে মারি ছুরী
ওরা মরমে মুরছে তাহে ॥
আমরা চাঁদের আলোয় চেয়ে বসে থাকি,
আর ফুল তুলে তুলে মালা গেঁথে রাখি
ওরা, নিরখি নিরখি পাগল পিয়াসে
শুধু গুমরি বিরহ গাহে।
আমরা শুনেও শুনি না বুঝিনা বেদনা
ওরা, তবু যে যতনে চাপে সে যাতনা,
আমরা জেনেও জানিনা ওরা তা মানে না
মিছে, সাধ ক'রে মরে দাহে ॥

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।)

জটে। আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? এ যে ইন্দ্র ভবন !

পত্র হস্তে বাসন্তীর পুনঃ প্রবেশ।

বাসন্তী। ওমা একি ?

জটে। এই তোমাদের কৃপায়।

বাসন্তী। (চমক চাঁদের প্রতি) একজন তোমায় আসে। দেখ দেখি কেমন হ'ল। (পত্র প্রদান।)

চম্পক। যেতে কাকতার বাচ্ছা কিলিকিলি কচ্ছে নে যাও ঠাকুর, আর দেরী ক'রনা।

জটে। লোকটা তাড়াতে পারে বাঁচে।

চম্পক। গোঁপটা খুলে দিয়ে যাও!

জটে। হ্যাঁ হ্যাঁ যখন আসব পরব আবার খুলে রেখে যাব।

চম্পক। (গোঁপ খুলিয়া লইয়া) আচ্ছা এখন যাও রাত হচ্ছে।

জটে। তা বলত রাতটা থেকে যাই, সকালেই ভোরে ভোরে উঠে পালাব, দেখে যদি কেউ ব'লব প্রাতঃস্নানে—

চম্পক। বামুনের কি নিষ্ঠে গো, আসনটী পর্য্যন্ত ছুতে চাচ্ছিলেনা না?

এস গো চ'লে।

(বাসন্তী ও চম্পক চাঁদের প্রস্থান।)

জটে। চ'লে গেলে যে গো ও সুন্দরী আহা হা ব'লে যাওয়া হ'ল না। চল চল তোমার ঘরেই নয় যাই।

মাধবী। কর বসে জ্যাকরা!—

জটে। আহা দাড়াও না ব'লতে না দাও ঘরটা চিনিয়ে দেবে চল।

মাধবী। মিনবে ক্ষ্যাপা নাকি?

(প্রস্থান।)

জটে। আহা হা রাগ ক'রনা। এ সুন্দরী কিছু প্রখরা।

(প্রস্থান।)

বিদ্যাসাগর।

(স্বর্গীয় পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত)

অমিত তেজস্বী মহাত্মা দেব কল্প ঋষি তুল্য মহাভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের জীবন চরিত।

জীবন চরিত বিষয়টা অতি মহান্। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রাম সীতা হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যাদির ন্যায় দেবত্ব সম্পন্ন মানবের জীবন বৃত্তান্ত লেখার যোগ্য। যাহার চরিত্র পাঠ করিব শুনিব ও কীর্ত্তন করিব তাহাতে যদি পুণ্য সঞ্চার না হয়, মনের মালিন্য দূর না হয়, চরিত্র বিশুদ্ধ না করে, মনে প্রীতি না জন্মে ও সদা আনন্দ বর্দ্ধন না করে এবং মূল ঘটনার সঙ্গে শাখা প্রশাখার প্রবেশ করিতে যদি সুরুচির উদ্রেক না হয় তবে তাহা জীবন চরিত বলিয়া উল্লেখ যোগ্য নহে। যে মহাত্মার নাম শ্রবণ মাত্র হৃদয় প্রফুল্ল ও আনন্দে চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুধারা বহির্গত হয় এবং ঐ অশ্রুবারি ক্রমে ভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃতের সাগর প্রস্তুত করে তবেই উহা জীবন চরিত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে উহা ছিল কিনা পাঠক

তাহা শুনিতে চাহেন। সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ তৎ-সহচরের অতি মাহাত্ম্য এবং ঐশী শক্তি দেখিয়াও বিশ্বাস করেন না অথবা ঈর্ষা হেতু তাহার গুণের প্রশংসা করেন না। অপিতু নিজে নিন্দা না করুন পরমুখে তাহার কোন বিষয়ের ত্রুটী জন্য অপ্রশংসা শুনিতে কর্ণকুহর পরিষ্কৃত ও বিস্ফারিত করেন। সুতরাং অসূয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধ বাক্য ধর্ত্তব্য নহে। একালে অধিকাংশ মানবে যাহার পক্ষ সমর্থন করে সেই ব্যক্তির কথা জীবন চরিত্রের আলোচ্য বস্তু হইয়া দাড়াইয়াছে। কাল মাহাত্ম্যে তৎকালোচিত ব্যক্তির মধ্যে অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ দেখা যায়।

— পূর্ব্বকালের ব্যক্তি অথবা অবতারের সঙ্গে তুলনায় এখনকার কালের কাল মাহাত্ম্যে পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ সমূহের লেশমাত্র থাকিলেই আমরা তাঁহাকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি। যাহার তাদৃশ গুণাবলীর অনেকটা ছিল বলিয়া লোক মণ্ডলীতে বিশেষ ভক্তি প্রণতি ও শ্রদ্ধা আছে তাহার চরিত্র জীবন চরিত্রে একটা আদরের বস্তু। সেই জন্য সাহস পূর্ব্বক তাঁহার স্বকীয় বদন নিঃসৃত বাণীগুলিই উল্লেখ করিব। এবং কতকগুলি বিষয় যাহা মহাজনের নিকট বিশ্বস্ত ভাবে শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-কারে ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করায় তিনি প্রসঙ্গ-ক্রমে স্বীকার করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

কোন বিষয় অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত হইলে উহা শুনিতে বা পাঠ করিতে সাধারণ পাঠকের তৃপ্তি সাধন করে না। সুতরাং নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র রূপ বর্ণনাই সাধারণে আদরগ্রাহী এবং অল্প সময় মধ্যে স্মরণ কথা স্মৃতিপটে প্রস্ফুট ভাবে অঙ্কিত হয়। সেই হেতু অনাবশ্যক প্রয়োজনীয় কথার বর্ণন হলে সংক্ষেপে কিছু বলিতে সমর্থ হইব না। এবং নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাগাড়ম্বরে পাঠকের ও শ্রোতার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিব না। তবে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের নিজ মুখ নিঃসৃত বাক্যের একেবারে সংহার করিতে সমর্থ হইব কিনা তদ্বিষয়ে সংশয় রহিল।

বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর পথে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে কলিকাতায় আসিয়া তৎকালোচিত সামান্যরূপ ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করেন। ইহাতেই তাহার কলিকাতায় বিষয় কর্ম্মে প্রবেশ ও চাকরী হয়।

ঠাকুর দাসকে শিক্ষিত ও কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় নিজ কন্যা ভগবতী দেবীকে তদীয় পাণি পীড়নে পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন জননী গর্ভে বাস করেন তৎকালে তাহার জননী উন্মত্ত প্রায়। ভগবতী দেবীর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী দুর্গাদেবী ভগবতী দেবীর গর্ভ লক্ষণ আয়তি ও চির সৌভাগ্য দেখিয়া পুত্রবধূর উন্মত্ততা কার্য্যে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না বরং তাহার অনুকূলে সদয় ব্যবহার করিতেন। ভগবতী দেবীর শ্বশুর রামজয় তীর্থযাত্রায় কেদার পাহাড়ে অবস্থান করিতেন। দীর্ঘ কালের তপস্যার পর একদিন স্বপ্ন দেখেন যে তদীয় পুত্র ঠাকুর দাসের ঔরসে পুত্রবধূ ভগবতী দেবীর গর্ভে অমীয় ইষ্টদেবতা জন্ম গ্রহণ করিতেছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তপস্বীদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ বিজ্ঞ ও বিশেষ ভক্তি ভাজন তাহাদিগের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন তাহারা কহিলেন তোমার তপঃ সিদ্ধি হইয়াছে। পৌত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। শীঘ্র গৃহাভিমুখে যাত্রা কর। তাহারা কহিলেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্ম ভূমি দর্শন করিয়া আপনাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিলেন। পরে বাটী আসিয়া নিজ পত্নী দুর্গাদেবীর মুখে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম বিবরণ শুনিলেন। তখনও নাড়ীচ্ছেদন হয় নাই। নাড়ীচ্ছেদ হইলে রামজয় তাহার জাতকরণ রূপ দশ সংস্কারের একতম সংস্কার সমাধা করিলেন। তৎকালে তিনি বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে মহাপুরুষ স্থির করিলেন। এবং তাহার জাতকরণের সমকালেই নিজ পত্নী দুর্গাদেবীকে কহিলেন অদ্যই বধূমাতা প্রকৃতিস্থ হইবেন। উন্মাদ রোগ পুত্রের বদন সুধাকর দর্শনে এবং ঐ পুত্রকে স্তন্যদানে বিলুপ্ত হইবে। ভগবতী দেবী পুত্রের আনন কান্তি সন্দর্শন ও তাঁহাকে স্তন্যদান করিয়া প্রকৃত দয়াময়ী অন্নপূর্ণা ভগবতীর ন্যায় হইলেন।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন বেলা দুই প্রহরের সময় মেদিনীপুর অন্তর্গত বীরসিং গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার জন্ম দিনে বাদ্যোদম হয় নাই। নৃত্যগীতও কেহ দেখে নাই। তবে সূতিকা ষষ্ঠী পূজার দিন অনেক বালক বালিকা খৈ মুড়্‌কী মোয়া পাইয়া আনন্দে গদগদ চিত্তে নৃত্যগীত ও শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল। জন্ম সময়ে দুই চারিজন সধবা পুরস্ত্রী মাঙ্গলিক উলুউলু ধ্বনি করিয়াছিলেন ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যের দৈব তৌর্য্যত্রিকের আড়ম্বর জনক সূত্রপাত। ঐ উলুধ্বনি চতুর্দ্দশ ভুবনে তৎকালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের নাম করণ তদীয় পিতামহ রামজয় নিজে সমাধা করেন। বালক ক্রমে ষষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিলে ষষ্ঠচন্দ্রে তাহার শুভান্নপ্রাশন হইল। তৎকালে বালক মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ সময়ে মস্যাধার ধান্য ও কাঞ্চন এই তিন বস্তুতে যুগপৎ হস্তদ্বয় সংস্পর্শ করিল। তাহা দেখিয়া পরিজনবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। শিশু ক্রমে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। ঈশ্বরচন্দ্রের কৌমার অবস্থায় তিনি কাহারও বিশেষ অপ্রিয় ছিলেন না তবে দুষ্ট বালকে যেরূপ চপলতা অনবধানতা বশতঃ ও কৌতুক দেখিবার জন্য সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে দুষ্টামী করে ঈশ্বরচন্দ্র তদ্রূপে দুষ্টামীর পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। তাহাতেই প্রতিবেশীগণের মধ্যে যাহার ক্ষতি হইত যে ব্যক্তি উপহসিত হইত সে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে অপ্রিয় বাক্যে গালি দিত। ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রত্যহ তদীয় পিতামাতার নিকট অভিযোগ হইত। তিনি সাপরাধ বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার সময়ে তাঁহাকে আহ্বান করিবামাত্র তিনি যে সদুত্তর দিতেন তদ্দ্বারা তিনি প্রায় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। এবং সে দোষটী অন্য লোকের স্কন্ধে পতিত হইত। অথবা দোষটী তাহার মস্তকে বিনিবেশিত হইবার উপক্রম দেখিলেই এরূপ

উপহাস জনক উত্তর দিতেন যাহাতে লোক মণ্ডলী দুইচারি দিন কৌতুক স্থলে নিজ নিজ সমবয়স্ক সখা ও সখীর সঙ্গে হাস্য না করিয়া মৌনাবলম্বী থাকিতে পারিত না। যাহারা কৌতুকামোদী তাহারা ঈশ্বরচন্দ্রকে উপহাস জনক রসিকতার শিক্ষা দিত। তিনি অবিকল ভাবে তদ্রূপে রহস্য করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রসিকতা আজীবন কাল অক্ষুণ্ণ ছিল। পাঠক উপযুক্ত সময়ে প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে বালকের বিদ্যারম্ভ হইল বিদ্যারম্ভের দিন হইতেই এই শিশু গুরুর নিকট যে উপদেশ পান তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন। তাঁহার সমাধ্যায়ী কোন বালকই তদীয় মেধা শক্তির ও অভ্যাসের নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। এইরূপে নিজ জন্ম ভূমিতে ৭ বর্ষ অতীত হইল। এখন কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পিতামহ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মাতামহ বা মাতুলগণও স্বচ্ছন্দ অবস্থার ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং সে পক্ষ হইতেও ঈশ্বরচন্দ্রের স্ফূর্ত্তিজনক বসন ভূষণ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। বসন ভূষণে তাহার দেহ বাহ্য শোভায় সম্পাদিত না হইলেও বালকবৃন্দের মধ্যে পরম শোভিত ও সুশ্রী ব্যক্তি অপেক্ষায় অন্তঃকরণের শোভায় পরম শোভিত ছিলেন।

পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং। সুতরাং সৎপুত্রের পিতা মাতাকে লোকে পুণ্যাত্মা মনে করে, তাহাদিগের দর্শনে শুভফল ফলে এবং স্মরণে চিত্তের মালিন্য দূর হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র সামান্য বেশেই পিতার সহিত কলিকাতা আগমন করেন। এবং ইংরাজী ১৮২৯ খৃঃ অব্দের জুন মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অষ্টম বর্ষ বয়ক্রম সময়ে প্রবিষ্ট হয়েন। তখন বাং ১২৩৫ সাল।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের নাম গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাহার অধ্যাপনা পদ্ধতিও অতি উত্তম ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস গঙ্গাধরের নিকট ঈশ্বরচন্দ্রকে শিষ্যত্বে সমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একাকী কলেজ হইতে বড় বাজারের বাসায় যাইতে সমর্থ হইতেন না অথবা তথায় হইতে কলেজেও একাকী আসিতে অগ্রসর হইতেন না। কারণ তৎকালে কলিকাতার পথে ছেলে ধরার ভয় ছিল। গাড়ী ঘোড়ার উপদ্রব ও ছিল। সুতরাং ঠাকুর দাস নিজে আফিসে যাইবার সময় পুত্রকে কলেজে বসাইয়া দিয়া যাইতেন। এবং আফিসের প্রতিগমন কালে পুত্রকে বাসায় সঙ্গে আনিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পল্লীগ্রামে প্রথম যাহা শিক্ষা হইয়াছিল তাহা তৎকালের পাঠশালার শিক্ষার চরম সীমা। কলিকাতা আসিয়া তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তাহার পাঠশালার শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় তৎকালে চাকুরী পান। এই সুযোগে তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন ও শিক্ষার সংবাদ লইতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রবণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট শ্রুতিধর বলিয়া সমুদায় ছাত্র অপেক্ষা বিশেষ-আদরণীয় হইয়াছেন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় একদিন গল্পচ্ছলে কহিলেন ঈশ্বর এই আট বছরের ছেলে বীরসিংহ গ্রাম হইতে কলিকাতা আসিবার সময় পদব্রজে আমাদিগের সঙ্গে সমভাবে ২৬ ক্রোশ পথ দুই দিবসে আসিয়াছে। এবং উহার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা শক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একদিন আমি ও ঠাকুরদাস উভয়ে ইংরাজী বিল সমূহের ঠিক দিতে ভুলিতেছি। ঈশ্বর তথায় বসিয়াছিল কহিল আপনারা অস্থির হইয়াছেন সেইজন্য ভুল হইতেছে। আমি ভুল বাহির করিয়াছি। আমি কহিলাম তুমি কি ইংরাজী অঙ্ক জান? ঈশ্বর কহিল শেয়াখালা হইতে শালিখার ঘাট দশক্রোশ পথ এই দশ ক্রোশ মধ্যে কুড়ীখানি মাইল ষ্টোনের চিহ্ন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিখিয়াছি আমি কহিলাম সে ত সোজা এ যে বাঁকা। ঈশ্বর উত্তর করিল দেখুন ত বাঁকা লেখা সোজা ভাবে বুঝিয়া লইব। তখনই পরীক্ষার জন্য বিলগুলি তাহাকে দিলাম। ঈশ্বর অনায়াসে অল্পক্ষণ মধ্যে নির্ভুল করিয়া ঠিক দিয়া দিল। তখন আমাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। ইহা শুনিয়া গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন আজি হইতে তুই আমার প্রিয়পাত্র হইলি।

ঈশ্বরচন্দ্র বড় একগুঁয়ে ও জেদী লোক ছিলেন। সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিনিই দুই বর্ষকাল সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। তৃতীয় বর্ষে তাহার সহাধ্যায়ী কাণা ঈশ্বর তদীয় পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন। সে সময় লিখিত পরীক্ষার পর একটী মৌখিক পরীক্ষা হইত। অধ্যক্ষ সাহেব কাণা ঈশ্বরের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র ধীর ও শান্তভাবে সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতেন। কাণা ঈশ্বর অতি সত্বর যথেচ্ছ উত্তর করিতেন। সাহেব লোক ক্ষিপ্রকারী ও সাহসিক ব্যক্তিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং কাণা ঈশ্বরের উত্তরে তিনি প্রতারিত হইলে উত্তম প্রাইজ উহাকেই দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র হতাশাস হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত মনে করেন। কিন্তু যখন শুনিলেন কাব্য শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়া কাশীধাম হইতে কলিকাতা আসিতেছেন তখন সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট দুইশত উদ্ভট কবিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং ভট্টি কাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। কোনখানে কিছুমাত্র ভুল হইত না। তর্কবাগীশ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা নৈপুণ্যের কথা কহিলেন। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কাব্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন কাব্যে ভাব গ্রহ করা বালকের কর্ম্ম নহে। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কহিলেন এ বালক রসিক চূড়ামণি বয়সে কম হইলে কি হয়। দেখিতে নাড়ু গোপাল বটে কিন্তু এ কাব্যামোদী ও ভাবগ্রাহী আমি উহার কুশাগ্র বুদ্ধি ও সংকাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ ও ব্যাজোক্তি দেখিয়া সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট হই। আপনি

দেখিবেন সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রেই কাব্যের তাৎপর্য্য বুঝিবে।

জয় গোপাল তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা পরীক্ষা করিবার জন্ত আদি রসাশ্রিত একটী কবিতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রথমতঃ বাচ্যার্থ মাত্র কহিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন ইহার অন্ত কোনরূপ অর্থ হয় কি না? তদুত্তরে ঈশ্বর কহিলেন এই কবিতার লক্ষ্যার্থ অন্ত প্রকার এবং ব্যাঙ্গার্থে তদ্বিপরীত। তর্কালঙ্কার মহাশয় ত্রিবিধ অর্থ শুনিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছাত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মধুসূদন বাচস্পতি প্রভৃতিকে কহিলেন তোমরা এই বালক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক এমন কি তোমাদিগকে যুবা বলিলেও দোষ হয় না। তোমরা কেহই এরূপ ভাবে বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থ একাকী বলিতে সমর্থ হও নাই। আমি এই বালকের প্রতিভা দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। ইহাকে তোমাদিগের সতীর্থ করিয়া দিলাম। সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ এখন কলেজ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইবে ইহা আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত মহেশপুর সমাজের অধীন বজরাপুর গ্রাম নিবাসী ভট্টাচার্য্য কুলসম্ভূত বারেন্দ্র শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। যাঁহারা পণ্ডিত তাহাদিগকে ছাত্র শিক্ষা দিতে হয়। ঐ কার্য্য করিতে হইলে ছাত্রগণকে অশন বসন দেওয়া ভারতীয় আর্য্যজাতির বিপ্রবর্গের চিরন্তন প্রথা। জয়গোপাল কাশীধামে তদ্রূপেই অধ্যাপনা করিতেন। তথায় টাকশালের অধ্যক্ষ উইলসন সাহেব কাব্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা বিষয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সময়ে সময়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। নিজের অধ্যাপকের নিকট যাহা দুর্ব্বোধ থাকিত তদ্বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দ্বারা সম্যকরূপে সংশোধন করিয়া লইতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় সাহেবের সমুদয় বোধ দূর হইত। উইলসন সাহেব কিছুদিন পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। এবং তিনি এখানে আসিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার অধিকতর রূপে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপকের পদশূন্য হইলে কাশীধাম হইতে পূর্ব্ব পরিচিত জয়গোপালকে আনাইয়া তাঁহাকে এই পদে বরণ করেন।

সাহেবের গুণ গ্রহণ শক্তি অসাধারণ ছিল তিনি একদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ছন্দোনির্ব্বাচন করিতে বসিয়া কহিলেন বাঙ্গালা দেশে প্রাকৃত ভাষায় ও ব্যাকরণে কাশী প্রভৃতি স্থলের পণ্ডিতগণের তুল্য অসাধারণ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত আছে কি না? তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন আছে বৈকি সাহেব। কৈ আমিত দেখিতে বা শুনিতে পাই না। তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন বাঙ্গলার অধিকাংশ পণ্ডিত নিস্পৃহ ও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী অধিকন্তু বৃত্তি সেবায় একান্ত বিরোধী। সাহেব কহিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার নাম করুন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন আমি যে সমাজের অধীন

সেই সমাজ গ্রামবাসী সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের নাম শুনিয়াছেন কি? হাঁ একদিন কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের জজ পণ্ডিত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমি তদনুসারে নিমচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তিনিও আপনার মত কহিয়াছিলেন যে তাদৃশ মান্য সমাজপতি কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু নিস্পৃহ পণ্ডিত অতি অল্পই আছে। তিনি সাহেব লোককে ম্লেচ্ছ বলিয়াই ঘৃণা করিবেন। খবৃত্তি করা তাহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিন্দার কার্য্য। ম্লেচ্ছের চাকুরী ত সুদূর পরাহত। কৃষ্ণানন্দকে যদি খবৃত্তি স্বীকার করাইতে পারিতাম তাহা হইলে একাধারে ন্যায় স্মৃতি দর্শন কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ ও প্রাকৃত পিঙ্গলাদির আলোচনার মূর্ত্তিমতী প্রতিভা দেখিতে পাইতাম। আমি কিন্তু পণ্ডিতগণের অত্যুক্তি মনে করিতাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ তাহাদিগের শিষ্য। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আমি তাঁহার নিকট পিঙ্গলাদি প্রাকৃত ছন্দঃ শাস্ত্র ও প্রাকৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া ছিলাম। দুই এক স্থলের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছিলাম কাশীধামের পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পাই নাই। এখানে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জন্মভূমি দর্শন ও সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক পিঙ্গলাদি গ্রন্থের অসংলগ্ন স্থলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসিয়াছি। সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জনের এমন আর দ্বিতীয় অধ্যাপক বিদ্যমান নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি ব্যাকরণকে কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন তাঁহার কৃত নাট্যপরিশিষ্ট নামক অঙ্ক-ব্যাকরণ ভূমণ্ডলে অতীব আশ্চর্য্য পদার্থ, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা নামক ন্যায় শাস্ত্রের সন্দেহ নিরাস গ্রন্থ আরও বুদ্ধিমত্তা ও কবিত্বের নিদান স্বরূপ। সাহেব কহিলেন একবার তাঁহাকে কোন ক্রমে কলেজে আনয়ন করুন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন অবশ্য তাঁহাকে দেখাইব। উইলসন সাহেব কহিলেন কদাচ ভুলিবেন না। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন যত্নাকৃতি সূত্র গুণা বলছি। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যা বাচস্পতি মহাশয়কে দেখিলে আপনার মন প্রফুল্ল হইবে। আলাপ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইবেন। অদ্য এই কথা প্রসঙ্গে সাহিত্য শ্রেণীর একটী ছাত্রের প্রতিভা বুদ্ধিমত্তা এবং অভ্যাসের পরিচয় দিয়া আপনাকে দেখাই যে বঙ্গদেশের ছাত্রগণ যেমন অল্প বয়সে অতি জটিল বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার কূটার্থ পর্য্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারে তেমন আর কোন দেশীয় মানব সম্বন্ধে আমি দেখি নাই। কাশীধামে আমিই অদ্বিতীয় কাব্যালঙ্কারের অধ্যাপক ছিলাম। বঙ্গদেশে এখনও মাদৃশ পণ্ডিত বহুতর বিদ্যমান আছেন। সাহেব কহিলেন সমুদায় বুঝিলাম। স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়াখ বৃত্তি গ্রহণে পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাদৃশ মহান্ত ব্যক্তিবর্গ কেন আবদ্ধ হইবেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি ভট্টাচার্য্যগণ অল্পেই সন্তুষ্ট সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইলেই তাহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন।

সাহেব কহিলেন আমি অল্পকাল পরেই সাহিত্য শ্রেণীর সেই ছাত্রকে দেখিতে যাইব। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাহেব শ্রেণীতে উপস্থিত হইলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছাত্রটীকে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তোৎলা ছিলেন কিন্তু এমন সাবধান যে প্রশ্নের উত্তর দান সময়ে সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে স্থির ভাবে প্রকৃত উত্তর দেন। সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন তর্কালঙ্কার মহাশয় আপনি কি এই ছাত্রের কথা কহিতেছিলেন। তিনি কহিলেন হাঁ আমি মনে করি এই বালক কালে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে। সাহেব কহিলেন আকৃতি বিজ্ঞানের লিখনানুসারে এই বালক দীর্ঘজীবী ও মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। এই ব্যাপারটী কালেজের সমুদায় ছাত্র ও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল।

ঈশ্বরচন্দ্রের একাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে উপনয়ন হয়। তিনি পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ ও কাব্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে তৎকনিষ্ঠ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ইনিও অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় একান্ত কষ্ট সহ নহেন। তবে লক্ষ্মণের ন্যায় জ্যেষ্ঠের ছায়ানুবর্ত্তী। তাহার নিদেশের বিন্দু বিসর্গও অতিক্রম করিতেন না। পিতা ঠাকুর দাসের আয় মাসিক দশটী টাকা মাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রও এই সময় মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। এই অল্প আয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বীরসিংহের গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ অর্থ পাঠাইতে হইত। সুতরাং পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে হইত। শয়ন ভোজন ও বিশ্রামের সুখ না থাকিলেও একমুহূর্ত্ত মনে কোন ক্লেশানুভব করিতেন না। দুই ভ্রাতায় পর্য্যায় ক্রমে তাহারা বাসার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যথা কালে যথাযোগ্য পাঠ অভ্যাস করিতেন। ঠাকুরদাস রাত্রিকালে আহারান্তে পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিতেন।

যখন ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে এবং দীনবন্ধু সাহিত্য শ্রেণীতে উত্থিত হইলেন তখন ঠাকুরদাসের তৃতীয় পুত্র শম্ভু কলিকাতায় আসিয়া ব্যাকরণ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। শম্ভুর আগমনে ঈশ্বরচন্দ্রের কষ্টের লাঘব না হইয়া কষ্টের একশেষ হইল। শম্ভু-চন্দ্র প্রতিদিন রাত্রিকালে অনবধানতা প্রযুক্ত বিছানায় মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ এবং পাছে পিতার ক্লেশ হয় বলিয়া সেই মলমূত্র স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। সময়ে সময়ে দীনবন্ধু রাত্রিকালে গান শুনিতে যাইতেন। সঙ্গীত ভঙ্গ হইলে আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ তথা হইতে তাড়িত হইত তদনুসারে দীন বন্ধুকে প্রায়ই পথি-মধ্যে নিদ্রায়—অবসন্ন দেখা যাইত। ঈশ্বরচন্দ্র অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বাসায় আনিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরচন্দ্র সে ওলাউঠা রোগে প্রাণবলীলা সংবরণ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র তাহার শোকে অধীর হইয়াছিলেন এবং রাত্রদিন একাকী বাসার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পাঠাভ্যাসে রাত্রি জাগরণ হেতু তাঁহাকে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এই পীড়া উপশম জন্য তাঁহাকে ছয় মাস কাল বীরসিংহ গ্রামে

বেস্থান করিতে হয়। বীরসিংহ হইতে সুস্থাবস্থায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছু দিন পর পরীক্ষার সময় নির্দ্ধারিত হইল। তিনি রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া অপঠিত স্থানগুলি তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসায় যাইয়া এমন করিয়া বুঝিয়া লইতেন যেন কেহ পঠিত স্থলের সন্দেহ মাত্র ভঞ্জন করিয়া লইতেছে। ব্যাকরণ কাব্য নাটকের আলোচনা করত দীনবন্ধুকে ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। এইরূপে তিনি অলঙ্কার শ্রেণীর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইলেন। তৎকালে অলঙ্কার শ্রেণীর পরীক্ষা অতি কঠিন ছিল। কাব্য নাটক ছন্দঃ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার গ্রন্থের পরীক্ষা দিতে হইত। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাদেব কল্প ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচনা দেখিয়া প্রাচীন কবিদিগের লিখন তুল্য বলিয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের নিকট দেখাইলেন। সাহেব কহিলেন আমি অন্যান্য ছাত্রের রচনাও দেখিতে ইচ্ছা করি। তর্কবাগীশ মহাশয় তৎক্ষণাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ ছাত্রগণের রচনা দেখাইলেন। সাহেব কহিলেন এ লেখা গুলিওত ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার অনুরূপ। তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন ন্যূন কল্প না হইলেও রচনার মাধুর্য্য ঈশ্বরচন্দ্রের অধিক আছে। সাহেব কহিলেন মদনমোহনের রচনা আমার নিকট আরও সুললিত বলিয়া বোধ হইতেছে। তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন মদনের লেখার কোন কোন স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। সাহেব কহিলেন আমিত বুঝিতে পারি নাই। তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন তাহা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা যায় না। সূক্ষ্ম বিচার দর্শন যোগ্য। সাহেব কহিলেন সে কেমন? তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন "যথা বাধতি বাধতে"। সাহেব অট্টহাসে কহিলেন আমি "জাল্ম"। সাহেব মদনমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন তুমি ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ কেন? মদন উত্তর করিলেন কবি প্রয়োগ আছে। সাহেব কহিলেন মহাকবি প্রয়োগ ও আর্ষ প্রয়োগ অনুসারে তোমরা চলিতে পার না।

সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের মুখ হইতে বাধতি প্রয়োগ হইয়াছিল বলিয়া মহাকবি কালিদাসের মনে ব্যথা হইয়াছিল। তোমার এমন সুললিত রচনায় পরস্মৈ পদ স্থলে আত্মনে পদের প্রয়োগ দেখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের অন্তঃকরণে দুঃখ হইয়াছে। পরে সাহেব মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কে আহ্বান করিলেন। তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে সাহেব কহিলেন "ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং।" মুক্তারাম অত্যন্ত মুখর ও প্রখর ছিলেন। সাহেব "অথ" এই বাক্য বলিবা মাত্র মুক্তারাম মনে করিলেন অনন্তর বাক্যের প্রয়োগ শুনিবার জন্য সাহেব আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কহিলেন "জাল্ম" সাহেব কহিলেন তুমি আমায় বর্ব্বর বলিয়া সম্বোধন করিলে। মুক্তারাম উত্তর করিলেন পরিবর্ত্তী বাক্য "জাল্ম" সেই বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিয়াছি কাহাকেও লক্ষ্য করি নাই। সাহেব কহিলেন যদি বলিয়াছ সমুদায় বল তোমার সতীর্থ মদনে "জাল্ম" এই পদ প্রযুক্ত হইবে। মুক্তারাম কহিলেন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্রগণ মধ্যে কেহ বর্ব্বর নাই। মদন ত পরম পণ্ডিত কল্প। তখন মধুসূদন বাচস্পতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন

তিনটী রচনা দেখ, কোনটীতে ব্যাকরণ দুষ্ট পদ আছে তাহা বাহির কর। মধুসূদন দুই তিনবার পাঠান্তে কহিলেন এইটীতে একস্থানে আত্মনে পদের প্রয়োগ স্থলে পরস্মৈ পদ আছে। সাহেব কহিলেন উহা দুষ্ট প্রয়োগ বলিতে হইবে। মধুসূদন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সাহেব এখন সাহিত্য শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "তথান বাধতিস্কন্ধঃ যথা বাধতি বাধতে।" এখন মুক্তারাম কহিলেন সাহেব মহোদয় আমাকে ডাকিয়াই "ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং" পর্য্যন্ত কহিলে আমাকে অপপদ প্রয়োগ করায় "জাল্ম" কহিয়াছি। এখন আমরা সকলেই মূর্খ হইলাম। আর একজন অর্ব্বাচীন ছাত্র কহিল আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ মূর্খ নাই যে সে যাহা তাহা লিখিয়া পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর করিবে। তর্কবাগীশ মহাশয় প্রত্যহ সমস্যা দেন পাদ পূরণ করিতে হয় এবং নূতন নূতন ভাব দেন তদনুসারে কবিতা রচনা করিতে হয়। তিনি তৎপরে সংশোধন করিয়া দেন কেন ভুল হইবে। আমরা কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের ব্যাপারটী জানি। পাল্কী বাহনে কালিদাসের শারীরিক ক্লেশ হইয়াছিল। রাজকীয় বচনে "বাধতি" পদ প্রয়োগে কালিদাসের অন্তরে ব্যথা জন্মিয়াছিল। তাই রাজার বাক্য "ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।" কালিদাসের উত্তর "তথান বাধতে স্কন্ধ যথা বাধতি বাধতে।" বাধতের অর্থ ব্যথতে। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন তোমাদিগের মধ্যে কাহার রচনায় ব্যাকরণাশুদ্ধি থাকে না বল দেখি। সে উত্তর করিল প্রায় কাহারও থাকেনা। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় আমরা একদিনও চ্যুত সংস্কৃতি দোষ দেখিতে পাই নাই।

সাহেব এখন তর্কবাগীশ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন। এবং ঈশ্বরচন্দ্রকে সর্ব্বো পুরস্কারে বরিত করিলেন।

বিবাহ।

ক্ষীর পাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়। এটী বাল্য বিবাহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ কন্যার বয়ক্রম অষ্টম বর্ষ মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহে ঠাকুরদাসকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঠাকুরদাসের ভ্রাতা কালিদাসও কলিকাতায় সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পৃথকান্ন ও পৃথক ক্রিয় ছিলেন কাজেই তাহার দ্বারা জ্যেষ্ঠের বা ভ্রাতৃ পুত্রগণের কোনরূপ সাহায্য হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। তিনি যাহা পাইতেন তদ্দ্বারা তদীয় পুত্র কলত্রাদি পরিজন বর্গের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত এই মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের শুভ বিবাহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন আপনি যদি বাধা দিতেন তাহা হইলে পিতাঠাকুর জমী বন্ধক দিয়া ঋণ করিতে সমর্থ হইতেন না। কালিদাস কহিলেন মাতা ঠাকুরাণী পৌত্র বধুর মুখ দর্শন করিয়া পরমানন্দিতা হইবেন বলিয়াই দাদা ঋণগ্রস্ত হইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহীর নিকট যাইয়া কহিলেন এখন নাতির বিবাহ দিলে, নাৎবৌ লইয়া নৃত্যগীত আমোদ আহ্লাদ কর। কিন্তু দেখ যেন ছেঁড়া

াই বিছানায় শুইয়া লাক টাকার স্বপ্ন দেখিও পিতামহী কহিলেন দেখিস আজি হইতে যে দেখিব তাহা সত্য হইবে। কত লাক টাকা পাইবি এ ছেঁড়া চাটা আর থাকবে না।

অলঙ্কার শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ রিতোষিক একশত টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। সংস্কৃত পদ্য রচনা দ্বারা পারিতোষিক গ্রহণ করার ব্যবস্থা া। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা অতি সুন্দর হইয়াছিল য়া তিনি ঐ সমস্ত পাইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন মনে করিলেন জেলা কোর্টের পণ্ডিত হইতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র পিতাকে াহের ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। নুসারে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই আবেদন রলেন যে তিনি অলঙ্কার শ্রেণী হইতে অগ্রে দর্শন স্ত্রর শ্রেণীতে না যাইয়া স্মৃতি শ্রেণীতে প্রবেশ রিতে ইচ্ছা করেন। উদ্দেশ্য ল কমিটির পরীক্ষা া জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্তি।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয় গোপাল তর্কালঙ্কার ও মচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি তদীয় আবেদনে অনুমোদন রিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ উইলসন সাহেব প্রথমে ত হয়েন নাই। পরে পণ্ডিতবর্গের মৌখিক বচনে ষ্ট হইয়া ঈশ্বর চন্দ্রকে স্মৃতি শাস্ত্রের শ্রেণীতে য়য়ন করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর নুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া সিলে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে রম্ভ করিলেন। এ সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক ৮৲ কা বৃত্তি হইল। সমুদায় পিতার হাতে দিতেন। ন্ধ দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের ভিক্ষাদানে ও সতীর্থদিগের মধ্যে কখন কাহারও অপ্রতুল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র সাহায্য করিতেন। সে সকল খরচ ঠাকুর দাস অম্লান বদনে ঈশ্বরচন্দ্রকে দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু ও শম্ভু এই তিন জনের বস্ত্র বীরসিংহ হইতে তাহাদিগের পিতামহী চরকায় সুতা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা পাঠাইতেন। পৌত্রগণ সুশীল ও সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হইতেছে শুনিয়া পিতামহী আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেন। এবং পুত্রবধূকে কহিতেন তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর বড় দাতা হইবে। এখনি যাহা পায় তাহার অধিকাংশ অনাথ অন্ধ ও গরীব দুঃখীকে দেয় এবং ছোট ভাই দুইটার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের নিকট ব্যবস্থা স্থির করিয়া লইতে পারিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র শ্রেণীতে উপস্থিত হইতেন মাত্র কিন্তু তিনি তাৎকালিক কলিকাতাস্থ বিখ্যাত স্মার্ত্ত চূড়ামণি হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে যাইয়া প্রত্যহ স্মৃতি শাস্ত্রের দুরূহ ও জটিল ব্যবস্থা সকল বাদানুবাদ পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। ১৮ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সংগ্রহ পূর্ব্বক স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ল কমিটীর পরীক্ষায়ও সর্ব্বোচ্চ হইলেন। অধ্যাপকবর্গ তাঁহার ধীশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।

এখন ঈশ্বরচন্দ্র সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন অথবা বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইবেন এই দুই প্রশ্ন লইয়া অধ্যাপক মণ্ডলীতে এবং তাহার

পরিজনবর্গের মধ্যে নানা কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এই সময়ে ত্রিপুরা জিলার জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পদের জন্য আবেদন করিলেন। ঐ প্রার্থনা স্বীকৃত হইলে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাদৃশ অজাত শ্মশ্রু যুবা ব্যক্তিকে তাদৃশ দূর দেশে এবং বঙ্গদেশের প্রান্তে অপিতু দূষিত জলবায়ু বিশিষ্ট স্থানে যাইতে অনুমতি করিলেন না। আশঙ্কা এই হঠাৎ পীড়িত হইলে তাহাদিগের দুঃখের ইয়ত্তা থাকিবে না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র জজ পণ্ডিতি পদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। এখন তাহাকে কালেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের চরমসীমায় প্রবেশের উদ্যোগ করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া অধ্যাপকগণ মধ্যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। মহামহোপাধ্যায় নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় সর্ব্বসমক্ষে প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জজ পণ্ডিতি পদে নিয়োগ শুনিয়া তাহার যুগপৎ হর্ষবিষাদ জন্মিয়াছিল। হর্ষের কারণ উপযুক্ত পাত্রের উপযুক্ত পদ প্রাপ্তি এবং পরিজনবর্গের দুরবস্থার অপনোদন এবং সুখস্বচ্ছন্দতার অভ্যুদয়। বিষাদের হেতু তাহার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত। তিনি মনে করিয়াছিলেন যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যাপনা না করাইতে পাইলাম তবে এত দিন কি ভূতের ব্যাগার খাটিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র চারিবর্ষ মধ্যে সমগ্রদর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। বার্ষিক প্রধান পুরস্কার দুইশতটাকা তাহাও পাইলেন। একশত টাকা দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারিত্ব হেতু। আর একশত মুদ্রা গদ্য পদ্য রচনার চরমোৎকর্ষ লাভ নিমিত্ত। এই চারিবৎসর কালের একবর্ষ মাত্র নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন হয়। তিনি ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য দর্শন শ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাহার উপদেশ ছাত্রগণের হৃদয়গ্রাহী না হওয়াতে ছাত্রবর্গের আবেদন হেতু দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদের ব্যক্তি নির্ব্বাচন জন্য পদপ্রার্থি বর্গের পরীক্ষা নির্ব্বাচন হয়। পরীক্ষায় শালিখার চতুষ্পাঠির অধ্যাপক বড়িষা নিবাসী জয় নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃতার্থতা লাভ করায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক বংশ সম্ভূত।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনবৎসর মধ্যে কালেজের নির্দ্দিষ্ট ন্যায় শাস্ত্রের পুস্তকগুলি পড়াইয়া দিলেন। যে সকল পুস্তক পাঠ করিতে অন্য ছাত্রগণ আট দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করে। তর্কপঞ্চানন মহাশয় সকলকে কহিতেন আমি এমন সুবুদ্ধি ছাত্র এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত শ্রেণীতে পড়িবার সময় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে তৎশ্রেণীর অধ্যাপক পদে অধিরূঢ় দেখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাহারই শিষ্য। এ বিষয়ের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ হইয়াছিলেন। এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ কালেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে তিনি কালেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিয়মানুসারে উপাধি পাইবার অধিকারী হইলেন। কলেজের পণ্ডিতবর্গের প্রতি উপাধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অর্পিত থাকায় তাহারা সমবেত হইয়া একবাক্যে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর এই সর্ব্বোচ্চ উপাধি দিলেন।

উপাধি সমিতির সভ্য ও অধ্যক্ষ মহোদয়গণের

নাম নির্দ্দেশ করিলেই বিদ্যাসাগরের প্রশংসা পত্রের সারবত্তা অনুভূত হইবে।

শ্রীগঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক
শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাব্য ,, ,,
শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অলঙ্কার ,, ,,
শ্রীহরচন্দ্রচূড়ামণি ও
ল-কমিটীর অধ্যক্ষ স্মৃতি ,, ,,
শ্রীশম্ভুচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বেদান্ত ,, ,,
শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায় ,, ,,
শ্রীযোগধ্যান মিশ্র জ্যোতিষ ,, ,,

ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একাগ্রতা তাহার প্রধান লক্ষ ছিল। অকৃত কার্য্যতায় তাহার মনে ক্ষোভ জন্মিত। সেই হেতু কহিতেন "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্। তিনি আরও কহিতেন মনুষ্য গণনায় যদি সর্ব্বাগ্রে নাম না হইল তবে জননী জঠরে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়স্কর। বিদ্যাসাগর এখন বিদ্যাশিক্ষায় সফল মনোরথ হইয়াছেন। এখন তদীয় চরিত্র ও ব্যবহারের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহার বিদ্যাভ্যাস সময়ে কর্ত্তব্য পরায়ণতার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিলেই পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুর দাস যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ অতি প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত হইল। প্রত্যহ অনেক ব্যক্তি যমসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ পীড়াকে অতি মারাত্মক এখনকার প্লেগ রোগের ন্যায় বিশেষ সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ মনে করিত। এখনও যে মনে করে না তাহা নহে।

ঠাকুর দাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের কোন পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল আপনকার পরিচিত অমুক সপরিবারে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে একান্ত দরিদ্র। কেহ তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবে এমন উপায় দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি শুনিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না। আন্তরিক বড়ই ব্যথা পাইলেন। সন্ধ্যার পরেই পাক সমাধা করিয়া দীনবন্ধু ও শম্ভুকে আহার করাইয়া পিতার ভোজনের আয়োজন করিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারা পাঁচ জনেই শয্যাশায়ী হইয়াছে জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। মধ্যে মধ্যে তাহারা বমি ও মলত্যাগ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক গৃহস্থের বাটী হইতে এক কলসী জল আনিলেন এবং চকমকী ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি সকলকে জল পান করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তদবধি তাহার মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে যদি কেহ ওলাউঠা রোগীর পিপাসা দূর করিতে পারে তাহা হইলে শতকরা বার আনা লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। একদিন একটা নিমন্ত্রণ সভায় ডাক্তার রূপচাঁদ বাবুর প্রমুখাত শুনিয়াছিলেন যে ওলাউঠা রোগে রোগীকে যত জল খাইতে পারিবে ততই তাহার উপকার হইবে। বমন ও রেচন উভয় ক্রিয়াই ক্রমে অল্প

হইয়া বন্ধ হইবে। মূত্রাধারে মূত্র সংস্থান হইবে ক্রমশঃ বিন্দু বিন্দু পরে সূত্রবৎ হইয়া ধারা প্রবাহে প্রস্রাব হইবে। তখন রোগী অনায়াসে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থিরভাব ধারণ করিবে। ক্রমে পিপাসা শান্তি হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। এইরূপ অনেক স্থলে রোগী রক্ষা পাইয়া থাকে। এই চিকিৎসার নাম জল চিকিৎসা। ইংরাজীতে হাইড্রোপ্যাথী কহে। হাইড্রো শব্দে জর্ম্মান ভাষায় জল বুঝায় এই চিকিৎসায় গাত্রদাহে জলসেক করিতে হয়। অন্য মতের চিকিৎসার বিপরীত কথা শুনিয়া অনেকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু জল চিকিৎসায় সহস্র সহস্র ওলাউঠা রোগী আরাম হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র রূপচাঁদ বাবুর অন্বেষণে যাইতেছেন সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত পথি মধ্যে দেখা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র রোগীদিগের অবস্থা সমুদায় যথাযথ রূপচাঁদ বাবুকে কহিলেন। রূপচাঁদ বাবু বলিলেন চল পুলিষে একবার জানাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি অনাথ বক্তিবর্গের যদি কিছু সাহার্য্য করিতে পারি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নেজামত হইতে দুঃখী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পুলীষের হাতে টাকা ও ঔষধ আছে। উভয়ে বড় বাজারের পুলীষের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুলীষ সাহেবকে সংবাদ দিবা মাত্র তিনি কতক গুলি ঔষধের পীল দিলেন। এবং কহিলেন খুব সাবধান যেন জল অনেক না খায়। জল না খাইলে ভাল হয়। রূপচাঁদ কহিলেন সাহেব আপনার উপদেশানুসারেই চলিব। কিন্তু এখন তাহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কারের জন্য একটা লোক আবশ্যক। সাহেবও অতি দয়ালু ও উচ্চ বংশের লোক ছিলেন; তিনি একটী মেতরাণীকে সরকার হইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং পথ্যের খরচ যাহা লাগিবে তাহার জন্য সর্কারে বিল করিতে বলিলেন। রূপচাঁদ কহিলেন কে অগ্রে খরচ দিবে যে পরে বিলের টাকা আদায় হইলে সে উহা পরিশোধ করিয়া লইবে। সাহেব কহিলেন আমি নিজ হইতে দুইটী টাকা দিলাম। ইহা আমার নিজের দান জানিবেন। এখন রূপচাঁদ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া রোগীদিগের নিকট আসিলেন। রোগীদিগকে দেখিয়াই কহিলেন বড় মন্দ অবস্থা। পুলীষের পীল খাওয়াইয়া উহাদিগকে অনর্থ কষ্ট দিওনা কেবল জল খাওয়াও। যদি উপকার হয় ইহাতেই হইবে। মেথরাণী দ্বারা মল ও বমি পরিষ্কার করাইয়া লও। আমি বাটী হইতে পুরাতন ধৌত কাপড় পাঠাইয়া দিতেছি। তাহা জলে ভিজাইয়া উহাদিগের গাত্র মার্জ্জনা করিবে। রূপচাঁদ ডাক্তার বাটী যাইয়া দুইটী বেদানা কিঞ্চিৎ মিছিরি ও এক কলসী উত্তম পানীয় জল ও ধৌত বস্ত্র খণ্ড পাঠাইয়া দিলেন।

মেথরাণী বিষ্ঠা ও বমনের অপবিত্রতা মাত্র দূরীভূত করিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বর এখন একাকী রোগীদিগকে রূপচাঁদ বাবুর উপদেশানুসারে পিপাসার জল যোগাইতেছেন। ক্রমে শিশুত্রয় কথা কহিল। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে শ্রম সার্থক বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাহার মনে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন মনে উদিত হইল।

জলেন পাচয়েদন্নং জলে জীবঞ্চ দৃশ্যতে।

এবং অগ্নি পুরাণের চিকিৎসা প্রকরণের যথা শ্রুত বচনও তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হইল।

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বল প্রদং।
এইরূপে রাত্রি অবসান কালে স্ত্রীলোকটী কহিল বাবা তুমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। একবার বাবু দিগের বৈঠক খানায় শয়ন কর। বাবুরা অতি ভদ্র লোক। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝিলেন ইহারও উপকার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী ভাবিল এমন দয়াময় বালক যদি না ঘুমাইয়া পীড়িত হয় তবে তাহাদিগকে আর কে দেখিবে। ঈশ্বরচন্দ্র দিবার প্রথম ভাগ তাহাদিগের নিকট অতিবাহন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মিছিরি ও বেদানা পথ্য দিয়া বাসায় প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাধা করিয়া না গেলে বাসার লোক ও গৃহস্থ জগদ্দুর্লভ বাবু যদি শুনেন যে ওলাউঠা রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ—অনায়াসে বাসায় প্রবিষ্ট হইবে বিশেষতঃ রাত্রি জাগরণের পর স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সেইজন্য বড় বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাইলেন। তথায় রূপচাঁদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন রোগীরা কিরূপ আছে। ঈশ্বর কহিলেন সমস্তই মঙ্গল। রূপচাঁদ কহিলেন তোমাকে আর দুই দিন ভুগিতে হইবে। ঈশ্বর কহিলেন তাহাও কি আপনাকে কহিতে হইবে। উহা আমার নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি। রূপচাঁদ কহিলেন আমার কর্ত্তব্যও আমি করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র স্নানান্তে বাসায় আসিলে দীনবন্ধু কহিলেন দাদা কালি আপনি রাত্রিতে গিয়াছেন এখন কত বেলা হইয়াছে দেখুন দেখি। আমাদিগের আহারাদি কিছুই হয় নাই। বাবা আপনাকে মধুসূদন ঠাকুর দাদার বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ঠাকুর দাস উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কালি রাত্রিতে কোথা ছিলি কাহাকেও কিছু বলিস নাই। আমি বেলা হইল দেখিয়া মধুসূদনের বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। সে কহিল কালি তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও কর নাই। সে আরও বলিল এ অঞ্চলে ওলাউঠার পীড়া প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে হয়ত কোন সতীর্থের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছে। ঈশ্বরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত মায়ায় আচ্ছন্ন পরোপকার করিতে পারিলে তাহার আহ্লাদের সীমা থাকে না। এই কথা শুনিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি শুনি।

ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। ঠাকুর দাসও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আর কিছু কহিলেন না। পূর্ব্ববৎ সকলের আহারাদি সমাধা হইয়া গেল। ঠাকুরদাস আফিস যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধুকে কহিলেন কলেজে যাইয়া আমাদিগের শ্রেণীর অধ্যাপককে কহিবি দাদা আজি এক স্থানে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছেন তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি তথায় উপস্থিত থাকিবেন। তাহারা অতি দরিদ্র সুতরাং দাদা শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না। দীনবন্ধুকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাপককে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করিলে অধ্যাপক মহাশয় কহিলেন সে কি তোমাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্ব অথবা

প্রতিবেশী। দীনবন্ধু ত দাদার ভাই তিনি কহিলেন

অয়ংপরো নিজোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

ঈশ্বরচন্দ্র রোগীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রূপচাঁদ ডাক্তার সভৃত্য তথায় উপস্থিত আছেন। রূপচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্রকে কহিলেন তোমার সেবায় সকলেই জীবন পাইল এবং আমার জল চিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিলাম। তোমার মত প্রকৃত সুবুদ্ধি কর্ম্মঠ এবং পরোপকারী ব্যক্তিকে না পাইলে আমার জলচিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিতাম না। আজি হইতে তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

সংসারাশ্রম প্রবেশ।

পূর্ণযৌবন অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক যুবা পুরুষের কি কর্ত্তব্য ঈশ্বরচন্দ্র সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। প্রথম—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গের প্রতিপালন ও যথারীতি সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়। ২য়—পরিজন সমূহের অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীকরণ এবং সুখ স্বচ্ছন্দ বিধান। ৩য়—আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশী জনগণের হিত সাধন এবং দুঃখ দূরীকরণ চেষ্টা। ৪র্থ—সর্ব্বসাধারণের হিতানুষ্ঠান ও শুভ সাধন করা। ৫ম—আত্মোৎকর্ষ বিধান ও লোক রঞ্জনে সময় ক্ষেপণ। ৬ষ্ঠ—দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায় সামাজিক আচার ব্যবহারাদির সুসংস্কার করিবার উদ্যোগ। ৭ম—পরপীড়া নিবৃত্তি বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা। ৮ম—বিত্তশাঠ্য বা কার্পণ্যের পরীহার। ৯ম—গুনিগণের গুণগ্রহণ, তাহাদিগের হিত চিন্তা এবং সদনুষ্ঠান দ্বারা মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা।

উপরোল্লিখিত সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে গেলেই প্রথমতঃ ধনাকাঙ্ক্ষা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। সে চিন্তা নিবৃত্তির পথ নানাবিধ থাকিলেও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ সন্তানগণের পক্ষে দুই একটী সুগম ও সুসাধ্য পথ বিদ্যমান ছিল একটী ষট্‌কর্ম্মশালিত্বে যাজনাধ্যাপনাদি অপরটী স্ববৃত্তির পক্ষে লিখন পঠন ও ব্যবহার শাস্ত্রের উপদেশে রাজদ্বারে অর্থিপ্রত্যর্থির বিবাদ ভঞ্জনের উপায় ও মীমাংসা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতৃপিতামহাদির যজমান শিষ্য ছিল না সুতরাং স্বাধীনভাবে সংসার যাত্রায় প্রবিষ্ট হইয়া চতুষ্পাঠীতে ছাত্র শিক্ষাদ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। যে কার্য্য সাধন করিতে হইলে ছাত্রগণকে পুত্রবৎ নিরন্তর অশন বসনাদি দ্বারা প্রতিপালন পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হয়। এই সুরীতিতে আত্মপরের অভিন্নভাব দূরীকৃত হয় জানিয়াও নিতান্ত অর্থাভাববশতঃ রাজদ্বারে স্ববৃত্তির পথে অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হইলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে ঐ পদের প্রার্থীর সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ মার্সল সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে পণ্ডিত নির্ব্বাচন হইবে এই কথা শুনিয়া কলিকাতা বহুবাজারের মলঙ্গানিবাসী কালিদাস দত্ত কোন এক ব্যক্তির জন্য মার্সল সাহেবের নিকট বিজ্ঞাপন করেন। সাহেব দত্তজাকে বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশ্বাস করিতেন। সাহেব দত্তজাকে কহিলেন

আপনার বন্ধু কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বিশেষ বিদ্বান তেজস্বী কৃতকর্ম্মা ও নিস্পৃহ ? দত্তজা মহাশয় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। সাহেব কহিলেন আমি স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যকুশলতার শিক্ষাপ্রণালীর সংমমুদ্যোচিত সদ্‌গুণ সমূহের ও বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি'। এবং স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি। সংস্কৃত কলেজের জুনীয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার সময় যে রীতিতে পরীক্ষা কার্য্য ঈশ্বরচন্দ্র সমাধা করিয়াছেন উহা সাধারণে ও গবর্ণমেণ্টে নিতান্ত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমি ঈশ্বরকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। তখন দত্তজা মহাশয় কহিলেন প্রকৃত যোগ্য পাত্রেই যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার পথ দেখান হইবে সুতরাং এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

বিদ্যাসাগর এখন মাসিক শতার্দ্ধমুদ্রা বেতনে বাঙ্গলা ১২৪৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ যে সকল সিভিলিয়ান বঙ্গদেশে বিচার ও শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত করা। এই পদের বিশেষ গৌরব ও সম্মান আছে। সুশিক্ষক কৃতকর্ম্মা ও সদ্ব্যবহারের লোক হইলেই সিভিলীয়ান সাহেবগণ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। বিদ্যাসাগর সেইরূপ ব্যক্তি সুতরাং সম্মান লাভ প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম-সংযম ও নিস্পৃহতার শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইলেন।

বিধাতা অনুকূল থাকিলে সময় উপস্থিত হয় এবং উদ্যোগের ফল স্বতই সিদ্ধ হয়। প্রাক্তন ও ইহলোকের কর্ম্মফলও তৎসম্বন্ধে সহায় হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের সৌভাগ্যশ্রীর আগমনের এবং ভবিষ্য জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তির সূত্রপাত এইস্থলেই হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। তাহার পরম বন্ধু মহা তেজস্বী ও অতি উচ্চমনা ধীরপ্রকৃতি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে যত্নবান হইলেন। ইনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত নহেন। দুর্গাচরণ বাবুর তুল্য ডাক্তার অদ্যাপি কেহ জন্মে নাই। তিনি রোগী দেখিয়া রোগের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের হেতু নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ ছিলেন। তাই অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ইউরোপীয় ডাক্তারগণও অতি দুশ্চিকিৎস্য এবং উৎকট রোগে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাহার পরামর্শের ব্যতিক্রম স্থলে সুবিখ্যাতনামা ডাক্তারও তিরস্কৃত হইতেন। ইনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোর জনক। যখন ইনি অবসরক্রমে বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন তখন তিনি হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের বাসায় ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নৈপুণ্য ও অভ্যাসের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে দুর্গাচরণ বাবু পরম আনন্দিত হইয়া প্রত্যহ অতিশয় আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগর ইংরাজী

ভাষায় বিশেষ প্রবিষ্ট হইলে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ডাক্তার তাহাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহারা যতটুকু শিক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্রের তাহাতে মানসিক তৃষ্ণার শান্তি হয় না। সুতরাং ইহাদিগের পরামর্শানুসারে এক-জন ইংরাজী ভাষাধ্যায়ী ছাত্রকে বাসায় আশ্রয় দিলেন। তাহার নাম রাজনারায়ণ গুপ্ত। তাহার কলেজের বেতন ও পুস্তকাদির ব্যয় ভার ঈশ্বরচন্দ্রের স্কন্ধে রাখিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যা-সাগরের শিক্ষা খরতর হইল। এখন বিদ্যাসাগর নিজ ছাত্র সিভিলিয়ানদিগের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে আলাপ পরিচয় ও উভয় পক্ষের শিক্ষার আদানপ্রদানে পার-দর্শী হইলেন।

এই সময়ে তিনি শিক্ষা সমিতির (কমিটীর) নিকট বিশেষ প্রতিভাশালী পরম পণ্ডিত ও তৎ-কালীন প্রচলিত বাঙ্গলা গদ্যকাব্যের দোষ নিকাষণে বিশেষ বিচক্ষণ এবং সুললিত গদ্য লিখনে দক্ষ বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহা কেবল সিভিলিয়ান ছাত্র-গণের লিখিত পত্র দলীল ও খতপত্রাদির সংশোধন প্রণালীতেই পরীক্ষিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা সংশোধন করিয়া দিতেন তাহা শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষের নিকট প্রত্যর্পিত হইত। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা দৃষ্টে বিদ্যাসাগরের প্রতি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা গদ্য কাব্য লিখিবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাসাগর দেখি-লেন বাঙ্গলা গদ্যকাব্যের অভাব আছে। যদিও শুভঙ্করের পত্রকৌমুদী লোকমুখে নামে মাত্র আছে কিন্তু হস্তাক্ষরে পুস্তকাকারে পাওয়া দুর্ঘট তন্নিবন্ধন তিনি হিন্দি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ঐ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া হিন্দী বেতাল পচিশীগ্রন্থ দৃষ্টে বাঙ্গালা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গদ্য কাব্য লেখেন। উহা বাঙ্গালা গদ্য কাব্যের ও ভাষার আদর্শ পুস্তক হইয়া আছে। ইহার পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য কৃষ্ণলীলার বাসু-দেব চরিত নামক এক খানি গদ্য কাব্য লেখেন। তাহা একবারও মুদ্রিত হয় নাই। পরে আর তাহার মুদ্রাঙ্কণের চেষ্টাও করেন নাই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা এ লেখকের সাধ্যের অতীত।

পূর্ব্বে যে সকল সিভিলিয়ান সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন অথবা বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন তাহাদিগের এদেশীয় ভাষায় বিশেষ অধিকার ও ব্যুৎপত্তি সাধন জন্যই ১৮০০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা ইংলণ্ড দেশীয় ভদ্র সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া তথাকার হালিবরী নামক কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ভারতে আসিয়া দেশীয় ভাষায় পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। দেশীয় ভাষায় অনুত্তীর্ণ সিভিলিয়ান দিগকে স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হইতে হইত। তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত না হইতে হয় এই কারণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি।

এই কলেজ রাইটার্স বিল্ডিংস্ মধ্যে সংস্থাপিত হয়। সিভিলিয়ানগণ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতেন। এই সকল সিভিলিয়ান গণ তৎকালে রাইটস্ অব দি কোম্পানী নামে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তৎপরে ১৮৫৪ খ্রীঃ

বাঃ ১২৬১ সালে সিভিল সার্ভিসে নির্ব্বাচন প্রণালীর পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ অন্তর্হিত হয়। যখন কলেজ বিদ্যমান ছিল তৎকালেও যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং ছিল এখনও তথায় ঐ বিল্ডিং আছে। ঐ অট্টালিকা মধ্যে সিভিলিয়ানগণের নাচ, ভোজ সংগীতাদির সঙ্গে নানাবিধ কৌতুক ও আমোদ হইত। এখনকার সৌধ কেবল নানা প্রকার অফিষের দফতর ও রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির দৈনিক ক্ষণিক অবস্থিতির স্থান মাত্র। কালেজের কার্য্যকালে ও কালেজের আফিস ছিল। আফিসে পণ্ডিত মৌলুবী কেসিয়ার ও তিন চারি জন কেরাণী দৈনন্দিন যথা সময়ে উপস্থিত মাত্র দেখা যাইত। দেশীয় ভদ্র লোকের মধ্যে এই কয় ব্যক্তির নৃত্যগীতাদি দর্শনের কিঞ্চিন্মাত্র সুবিধা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবারিত দ্বার ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে সর্ব্বদা তথায় যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজ সম্মান রক্ষার জন্ত কদাচ স্বেচ্ছায় একাকী তথায় যাইতেন না। উপরিস্থ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাদিগের আগ্রহের আতিশর্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে কদাচিত নৃত্যগীত দর্শন করিতেন।

তদীয় ছাত্রগণ বঙ্গদেশের শাসন ও বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে সময়ানুসারে দর্শন করিয়া যাইতেন। তৎকালের সিভিলিয়ানগণ মর্য্যাদাপন্ন লোকের মর্য্যাদারক্ষায় বিশেষ আস্থাবন্ত ছিলেন।

কিছুদিন পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্সল সাহেবের অনুগ্রহে তথাকার হেড কেরাণীর পদে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খ্রী অব্দে ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হয়েন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বাবু বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী হেড ক্লার্ক রূপে নিযুক্ত হয়েন। দুর্গাচরণ বাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ৪০৲ টাকা বেতনে নিম্ন কেরাণী রূপে ঐ কলেজে নিযুক্ত হয়েন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপনের পূর্ব্বাবধি ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা জন্ত মার্সম্যান, কেরী, কোলব্রুক, উইলসন, রজার্স রোজারিও এবং সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহামহিমান্বিত সাহেব মহোদয়গণ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তৎকালে প্রথমতঃ হালহেড সাহেব ইংরাজী ও বাঙ্গালা বাক্য-বলীর গ্রন্থ রচনা করেন। মার্সম্যান সাহেব পণ্ডিত দ্বারা বাইবেলের বাঙ্গালানুবাদ করান। কেরী সাহেব বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান লেখেন। কোল-ব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ ও অমর কোষের অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। উইলসনের সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান অতি উপাদেয় বলিয়া ইংরাজ মহলে বিশেষ প্রশংসিত হয়। বস্তুতঃ কোলব্রুক সর্ উইলিয়ম জোন্স ও উইলসন সাহেব যেমন শিক্ষিত হইয়াছিলেন তেমন শিক্ষা এখন অনেকে প্রাপ্ত হয় না। ম্যাক্স মূলার ও কাউয়েল সাহেব পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ হইতে নিতান্ত ন্যূন কল্প নহেন।

বিদ্যাসাগরের অধ্যাপনার পূর্ব্বতন সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের কৃত প্রবোধ চন্দ্রিকা সাহিত্য গ্রন্থের আদর্শ পুস্তক বলিয়া অধীত

হইত। ঐ গ্রন্থ খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলেও সর্ব্বত্র রুচিকর প্রস্তাব ছিল না। অনেক স্থলে অশ্লীলতা গ্রাম্যতা প্রভৃতি কটুতা ও ক্লিষ্টার্থাদি দোষে দূষিত থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে বিশেষ লজ্জা জন্মিত। সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিতোপদেশাদি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আগ্রহ হয়। তদনুসারে তৎকালের গবর্ণর জেনারল হার্ডিং সাহেব মহোদয় শতাধিক আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সেই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক লিখন বিষয়ে শিক্ষা সমিতির আদেশে অনেকে অনেক পুস্তক লেখেন কিন্তু মদন মোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা তিন ভাগ ও বিদ্যাসাগরের বোধোদয় স্কুলের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিত এবং অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইল। সুতরাং মডেলস্কুলে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে পণ্ডিত নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা হইল। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পণ্ডিতগণের পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

মডেল স্কুলের (আদর্শ বিদ্যালয়ের) শিক্ষকতা জন্য চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্কার বিদ্যালঙ্কার ও ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি অধ্যাপকগণ মাসিক ২৫।৩০ টাকার লোভে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তাহাদিগের চরিত্রাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইহাতে অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরক্ত হইলেন। অনেকে প্রকৃত কার্য্য পাইলেন দেখিয়া বিদ্যাসাগরকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যাধ্যাপক হয়েন তৎকালে শিক্ষা কমিটী তাহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করিবেন বলায় তিনি সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এই সময় রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বা সেক্রেটারী ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের তৎকালিক শিক্ষার অবস্থার বিজ্ঞাপন লিখিতে আদেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে এমন সুন্দর বিজ্ঞাপনী লেখেন যদ্দৃষ্টে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পরম পরিতুষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কলেজের ছাত্র সংখ্যার অল্পতা ও ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার একান্ত অভাব বশতঃ সংস্কৃত কলেজের স্থায়িত্ব পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞাপনীতে সে সকল কথার সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ স্বপ্নবৎ তাঁহাদিগের সমুদায় উদ্দেশ্য বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক মীমাংসা দেখিয়া পরমানন্দে কলেজের শিক্ষা বিধানের পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞাপনীর কথা শুনিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

রসময় দত্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগর

হিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক হইতে একেবারে প্রিন্সিপাল ইলেন। ঐ পদে কএক দিন এক শত টাকা পরে সিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ রহিত হইলে ১৫০ টাকা ইলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষেরা সংস্কৃত লেজের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্ত্তনে সুফল দেখিয়া দ্যাসাগরকে মাসিক ৩০০৲ তিন শত মুদ্রায় অধ্যক্ষ পে বরণ করিলেন।

এই সময়ে তাহার প্রণীত উপক্রমণিকা কলেজের াকরণ পাঠের অগ্রবর্ত্তী পুস্তক বলিয়া নিদ্দিষ্ট হয়। ঐ স্তকখানি উইলসন সাহেবের সংস্কৃত ইংরাজী ব্যাকণর অনুবাদ বলিয়া কেহ কেহ প্রতিবাদ করিলেও মরা কহিব উপক্রমণিকা ব্যাকরণ খানি প্রথম ক্ষার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। এই সঙ্গে সাহিত্য ক্ষার জন্য তিন ভাগ ঋজুপাঠ সংকলিত হয় পরে ব্যাকরণ কৌমুদীর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রস্তুত রন। তাহার সময়ে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ষা শিক্ষা সকল শ্রেণীর অপরিহার্য্য হইল। তাহাতে কমল, রামাক্ষয় ও সোমনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যারয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় অন্যান্য কলেজের ছাত্রগর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কৃত কলেজের ছাত্রগণের বি, এ, এম, এ, পরীক্ষার পাত বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধীয় পাঠ্য বর্ত্তন বিজ্ঞাপনীর ফল বলিতে হইবে। অনেকে হন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকে অর্থকরী বিদ্যার শ্রয় করিয়াগিয়াছেন। পূর্ব্বে কেবল জ্ঞান লাভের য বলিয়া নিদ্দিষ্ট ছিল।

সাধারণের এই আপত্তি দূর করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ র্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের মনস্তুষ্টির জন্য পৃথক্ ভাবে ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত ও ব্যাকরণাদির শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাহারা ইংরাজী না পড়িতে চাহেন তাঁহারা নির্দ্ধারিত সময়ে অভীষ্ট বিদ্যার আরাধনা করিতে পারেন। এই পদ্ধতির পুনরাবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের কর্তৃত্ব সময়ে তদীয় বিজ্ঞাপনীতে নির্ণীত হয়। সুতরাং তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

বিদ্যাসাগর এখন গবর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ পরিচিত ও আদৃত হইতে লাগিলেন। তাহার পরামর্শ ব্যতীত শিক্ষা বিভাগের কোন নূতন বিষয় মীমাংসিত হয় না। সুতরাং বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর তাহাকে সপ্তাহে একদিন তদীয় সভায় আহ্বান করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশেই রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন। তাহাতে তাহার অধিক সম্মান ছিল। একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে ছোটলাট হেলিডে সাহেব কহেন আপনি কেন ইজার চাপকান পাগড়ী অথবা পেণ্টুলেন হেট কোট পারেন না। লেডিগণ আপনাকে দেখিয়া উপহাস করেন। তাই তাহারা কাছে থাকেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন একেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আপনারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাহার উপর ঐরূপ পোষাকে সংসাজিলে তাহাদিগকে আরও ঘৃণা করিবেন। ছোটলাট বাহাদুর কহিলেন এমনও কথা। সাহেবেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ ভক্তি করেন। কারণ তাহাদিগের নিকট হইতে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পান ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। ওরূপ বেশধারী বড়বড় কর্ম্মচারীর নিকট আমরা জ্ঞানের কথা কিছু পাই না। ঈশ্বর

চন্দ্র কহিলেন তবে কেন আমাকে সংসাজিতে কহিতেছেন। তিনি উত্তর করিলেন আপনি আপনার চিরাভ্যস্তবেশেই আসিবেন। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে একদিন সংসাজার কথা লেখেন। কিন্তু আমরা কখনও তাহার মুখে সে কথা শুনি নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের সদস্যগণের মনে হইল যে প্রায় শতবর্ষের নিকটবর্ত্তী কাল ইংরাজগণ ভারতের অধিকাংশ স্থলের প্রজাপুঞ্জের উপরি আধিপত্য করিতেছেন কিন্তু তাহাদিগের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র হইয়াছেন কি না? তদুত্তরে ভারতস্থিত মহামনা রাজপুরুষগণ এই উত্তর দেন যে প্রজা সাধারণ মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা ও দেশীয় ভাষার শিক্ষা প্রসারণ করিতে না পারিলে প্রজাপুঞ্জের অন্তঃকরণে ইংরাজ শাসনের সুরীতি সুশৃঙ্খলা ও ন্যায়পরতা সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যাইবে না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্যদিগের মনে সে কথা যথার্থ—বলিয়া অনুভূত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ পূর্ব্বক সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

কিন্তু এখানে একটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক যে গবর্ণমেণ্ট একেবারে মুক্ত হস্ত হইলেন না। সম্মুখে সমুদ্রবৎ থাকিলেন। যে পাত্র যেমন তদনুসারে সমুদ্র তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করে। সুতরাং আধারের আধেয়তানুযায়ী ফল হইতে লাগিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থলে বাহুল্যরূপে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রসার হইল। দূরতর প্রদেশের লোকের অনভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার অভাবে অতি অল্প স্থলে বিদ্যার জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক তখন তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে বলিতেন সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া বিদ্যাবর্ষণ না করিলে প্রজাসাধারণে মঙ্গল হইবে না এবং ইংরাজ শাসনেরও প্রশংসা হইবে না। এখন সময় উপস্থিত হইল বিদ্যাসাগরের সে মহা বাক্যের ফল ফলিল। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি স্কুল স্বায়ত্ব এবং কতকগুলি স্কুল অর্দ্ধায়ত্ব অর্থাৎ সাহায্য প্রণালীতে রাখিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্ব বাঙ্গালা স্কুলের মধ্যে নদীয়া বর্দ্ধমান হুগলী ও মেদিনীপুরের বিদ্যালয় গুলির পরিদর্শন কার্য্যের ভার বিদ্যাসাগরের স্কন্ধে সমর্পিত হইল। এই নিয়োগে তিনি মাসিক দুই শত টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইলেন। এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং মধ্য বাঙ্গালা প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের Special Inspector। তাহার অধীন স্কুলগুলির নাম আদর্শ বিদ্যালয়। এই স্কুল গুলির শিক্ষা প্রণালী দৃষ্টে অন্যত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল। সে গুলির নাম সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় তাহার পরিদর্শন জন্য পাঁচটী প্রধান বিভাগে পাঁচজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েন। ১ম আসাম ও বাঙ্গালার উত্তর বিভাগ। ২য় পূর্ব্ব বিভাগ। ৩য় উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগ। ৪র্থ মধ্য বিভাগ। ৫ম বিহার ও ছোটনাগপুর বিভাগ। ইহাদিগের অধীনে প্রত্যেক জিলায় স্কুল পরিদর্শন জন্য অনেক গুলি তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল পদের নাম Deputy Inspector of School.

বিদ্যাসাগর ব্যতীত প্রধান ইন্‌স্পেকটরগণ সকলেই বিলাতের সুশিক্ষিত সদাশয় ইংরাজ। এখন এখানে শিক্ষা সমিতির পরিবর্ত্তে ডিরেকটর অব পাবলিক ইনিষ্ট্রকশন নামক আফিস সংস্থাপিত হইল। তথাকার অধ্যক্ষের নাম ডিরেকটর হইল। তিনি শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট কার্য্য শিক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগরকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন। এই স্থলে ডিরেকটর ইয়ং সাহেবের স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং এ দেশীয় নেটীভ ঈশ্বরচন্দ্র সাহেব অপেক্ষা কার্য্য-পটু সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন ও বিদ্যাবত্তায় অসাধারণ মান্য এবং গবর্ণমেন্টের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ও পরামর্শদাতা বলিয়া ঈর্ষায় অধীর হয়েন। সেইজন্য সর্ব্বদা বিদ্যাসাগরের কার্য্যের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকিতেন ক্রমে অসূয়ার বীজ অঙ্কুরিত হইল ফল পল্লবে শোভিত হইল। বিদ্যাসাগর অধীন কি করেন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সমুদায় কথা ছোটলাট হেলিডে সাহেব বাহাদুর ও সীশীল বিডন সাহেবকে জানান। কিন্তু তাঁহারা ইয়ং সাহেবকে কিছু বলেন কিনা তাহা বিদ্যাসাগর জানিতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর ঐ দুই মহাত্মার মৌখিক অনুমতি ক্রমে ঐ চারি জিলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ভাগ্যবন্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন। অবশিষ্ট ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেন্টকে প্রতিভূ বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিয়া রাখেন। ছয়মাস গত হইলেও ডিরেকটর সাহেব স্ত্রীশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের কোন সংবাদ গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং শিক্ষকগণ বিদ্যাসাগরের নিকট বেতন প্রাপ্তির দাবী করেন। বিদ্যাসাগর গবর্ণমেন্টকে এই সংবাদ জানাইয়া তৎকালে তৎক্ষণাৎ কোন ফল না পাওয়াতে নিজের কর্ম্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। কেবল ইন্‌স্পেক্টরী পরিত্যাগ নহে এই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা-পদ পরিত্যাগ করেন। তেজস্বিতা মনস্বিতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দৃষ্টে ছোটলাট হেলিডে সাহেব বাহাদুর ও সীশীল বিডন সাহেব বাহাদুর অবাক হইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা তাহার কার্য্য ভার পরিত্যাগে সম্মত হন নাই পরে অনেক জেদাজেদীর পর ঐ দুই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের কথা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে কার্য্যভার হইতে অগত্যা অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্তু তাহারা কহিলেন আপনি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু গবর্ণমেন্টের সুপরামর্শদানরূপ ভার হইতে মুক্ত হইলেন না। আপনার প্রতি আমাদিগের কেন সর্ব্বসাধারণের সম্মান বর্দ্ধিত হইল। আজিকার কালে এক কথায় অনায়াসে এ দেশীয় নিঃস্বব্যক্তি ৭০০৲ শত টাকা মাসিক বেতনের অতি উচ্চ সম্মান সূচক পদকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। সামান্য পদমর্য্যাদার জন্য অনেক ধনি সন্তান লালায়িত। বিদ্যাসাগর ইহাতে উচ্চ বাচ্য করিলেন না।

তিনি কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া বালিকা বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকগণের সমস্ত বেতন পরিশোধ করিলেন। এবং তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় দেশীয় লোকের সাহায্যে জীবিত থাকে কতকগুলি অন্তর্হিত হয়।

স্বার্থ ত্যাগ ও বন্ধুতা।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক হরনাথ চূড়ামণি মহাশয়ের লোকান্তর গমনে ঐ পদে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানাপন্ন পণ্ডিতের প্রয়োজন হইল। মার্সল সাহেব বাহাদুর মনে মনে ঈশ্বরচন্দ্রকে স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বিদ্যাসাগর আপনি এখানে পঞ্চাশ টাকা বেতন পান তাহাতে আমার মনঃক্ষোভ দূর হয় না। অদ্য সংস্কৃত কালেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে আপনাকে নিযুক্ত করিবার জন্য আমি শিক্ষা কমিটীতে লিখিব। বিদ্যাসাগর কহিলেন যদিও আমাদ্বারা ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সমাহিত হইবে বটে তথাপি আমি দেশের হিত ও কালেজের উন্নতি জন্য আমা অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তির নিয়োগ দেখিতে ইচ্ছা করি। সাহেব কহিলেন তেমন ব্যক্তিত আমার চক্ষে পতিত হয় না। বিদ্যাসাগর কহিলেন এই সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃতবিদ্য ছাত্র এবং কাশীধামে ৫।৭ বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক বেদান্তাদিদর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিয়োগ দেখিলে প্রকৃত পণ্ডিতের পুরস্কার বুঝিতে পারি। সাহেব কহিলেন তিনি এখন কোথা আছেন? বিদ্যাসাগর কহিলেন তিনি এখন নিজের আবাস গ্রাম অম্বিকা কালনায় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক নানা বিষয়ে দেশীয় ছাত্রবৃন্দকে অধ্যাপনা করিতেছেন। সাহেব কহিলেন তিনি আসিবেন কেন? বিদ্যাসাগর কহিলেন সংস্কৃত কলেজে নানা শাস্ত্রের পুস্তক আছে নানা শাস্ত্রের একত্র আলোচনা হয় এবং অবসরকালে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকেও শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। কারণ বিদেশীয় উচ্চ শিক্ষার্থীকে চতুষ্পাঠীতে রাখিতে হইলে অধ্যাপককে ছাত্রের আহার যোগাইতে হয়। সে কার্য্য এই ৯০৲ টাকা বেতনের কার্য্য স্বীকার করিলে অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে এবং নির্ব্বিঘ্নে সমাধান হইতে পারিবে। সাহেব কহিলেন আমি অবিলম্বে তাহার আবেদন পাইতে ইচ্ছা করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইদিন একজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া শালিখার ঘাট পার হইয়া অম্বিকাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। সেদিন দশ ক্রোশ মাত্র যাইতেই রাত্রি উপস্থিত হয়। অগত্যা রাত্রিকালের জন্য পথে বিশ্রাম করিতে হইল। পরদিন অবশিষ্ট ১৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার পিতৃদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে এই কার্য্য গ্রহণে সম্মত করাইয়া তাঁহার কলেজের প্রশংসা পত্র এবং অন্যান্য স্থলের শাস্ত্রীয় কৃতিত্বের নিদান পত্রগুলি সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রত্যুষে নৌকারোহণে রাত্রিকালে কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গী নিতান্ত ক্লান্ত এবং পদব্রজে গমনে নিতান্ত অসমর্থ বলিয়া নৌযাত্রিক হইতে হইয়াছিল। নতুবা তিনি পদব্রজে আসিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। কলিকাতা হইতে তাঁহার নিজ বাসস্থানের দূরতাও ঐরূপ। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশেষ আয়বান তখন পদব্রজে জন্মভূমি দর্শনে

:তেন। কহিতেন শক্তি থাকিতে পরাধীন হইব ন। বিশেষতঃ বেহারা মরণাপন্ন হইবে—আমি হাদিগের স্কন্ধে বসিয়া আরাম করিব। এই কার্য্যটা মর্থ্যহীনের পক্ষে শোভা পায়। পাল্কীর আরোহণে ব্যয় হইবে তদ্বারা অনেক দুস্থ লোকের দুঃখ দূর রিতে সমর্থ হইব। তাহা তিনি কার্য্যতঃ সম্পন্ন রিতেন। তিনি বাটীতে আসিয়াছেন শুনিলে নিকটস্থ নাথ ও দুর্ভাগ্য বক্তিবর্গ তাহার আশ্রয় লইত।

সাহেব মহোদয় তৃতীয় দিবসে বিদ্যাসাগরের কেট তারানাথের আবেদন সহ প্রশংসাপত্র পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। এবং বিদ্যাসাগরকে কহিলেন একজন বলিষ্ঠ সাহেবও অশ্বারোহণে ১৭ ক্রোশ গমন করিলে তিনি তৎপরে দুইদিন বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের নিকট তারানাথের ঐ নিয়োগ পত্র উপস্থিত হইল। তিনি কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। ধন্য বিদ্যাসাগর তোমার গুণের সীমা নাই।

সাধনা।

(Spanish কবিতার ইংরাজি হইতে)

(১)

প্রমোদ মগন শিশুরা খেলিছে
চারু অবকাশ ক্ষণে
তাসের উপরে তাস সাজাইয়া
একটি ঘরের কোণে।

(২)

দুই হাতে তুলি' দুইখানি তাস
হেলাইয়া গায়ে গায়
ত্রিতল রথের অনুরূপ গৃহ
নিরমিছে সুখমায়।

(৩)

ভাঙ্গিছে সৌধ মৃদুল পবনে
বিরচিছে আর বার—
সাবধানী শিশু, সাবধানে হাসে
বেদনা ত নাহি কা'র!

(৪)

হেথা কবি আমি কর্ম্মে শিথিল
কল্পনা সখী সনে
বসিয়া রয়েছি ধ্যান-গম্ভীর
চারু অবকাশ ক্ষণে।

(৫)

চিন্তার পরে চিন্তা সাজা'য়ে
গড়িতেছি নিকেতন—
ছিন্ন তাবের ভগ্ন পুরীতে
বেদনায় ভরা মন!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

সন ১৩২৫ সালের ১৯শে মাঘ তারিখে পুনরায় একবার শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেব দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া সপরিবারে রাত্রি ১০টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট খরিদ পূর্ব্বক ট্রেণে উঠিলাম, গাড়ীখানি যথা সময়ে প্লাট ফরম ছাড়াইয়া গর্ব্ব ভরে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি ষ্টেশন ছাড়াইয়া পর দিবস প্রাতঃকালে বালেশ্বর নামক ষ্টেশনে উপনীত হইলে বহুতর যাত্রী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিল। এই বালেশ্বর উড়িষ্যা বিভাগের একটী জেলা। এই জন্যই এখানে মামলা মকর্দ্দমা উপলক্ষে অনেক লোককে আসিতে হয়। রথ যাত্রার সময় এখানে মহা সমারোহ হয়, তখন বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীশ্রীক্ষীর চোরা গোপীনাথ জিউর সুন্দর মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য যাইতে হয়, ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ী প্রভৃতি যানাদি সকল সময়েই পাওয়া যায়। গোপীনাথ জিউর মন্দির যাইতে পথিমধ্যে নীলগিরি নামক গগন চুম্বী পর্ব্বতের মন মুগ্ধকারী দৃশ্যাবলী নয়ন পথে পতিত হয়। সুবর্ণ রেখা ও বুড়াবলঙ্গ নামক দুইটী নদীর সুন্দর শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়। শীতকালে যদিও নদী দুইটী শুষ্কাবস্থায় থাকে কিন্তু শুনিলাম বর্ষাকালে উহারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন উহাদের দেখিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। বালেশ্বরের জল হাওয়া স্বাস্থ্যকর বিশেষ যাঁহারা বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা স্থানে কিছুদিন বাস করিলে বিশেষ উপকার পাইবে। এখানে পিত্তল ও কাঁসার নানাপ্রকার বাসনাদি অা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদি নাই। বালেশ্বরের বাজার কোর্ট ইত্যাদি অন্যদিকে শ্রীশ্রীক্ষীর চোরা গোপীনাথ জিউর ঠাকুর বা অপর দিকে এই ঠাকুর বাড়ী দর্শনে যাইতে হই অন্য পথে যাইতে হয়, নিকটেই একটী সুন্দ শিব মন্দির দর্শন হয়। আমরাও এইস্থানে অবতর পূর্ব্বক মোট ৩৲ টাকায় যাতায়াত বন্দোবস্ত করিয় ২ খানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেশন হইতে রওন হইলাম এবং যথা সময়ে ঠাকুর বাড়ী পৌঁছিয়া তথা একটী ঘরে আশ্রয় লইলাম এবং স্নানাদি করিয় শ্রীশ্রীভগবানের ষোড়শউপচারে পূজা ও ভোগ এব ক্ষীর ভোগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মন্দি প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম নয়ন মন মুগ্ধকর সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে মন একেবারে ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া গেল, অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া পূজাদি সমাপনান্তে প্রসাদ (নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সহিত অন্ন প্রসাদ, মিষ্টান্ন ও পায়সান্ন প্রভৃতি অতি উপাদেয় দ্রব্যাদি) পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি দেখিতে সুন্দর এবং

সেবার বন্দোবস্তও মন্দ নহে আমরা তথাকার পূজারী প্রভৃতিকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়া পুনরায় শকটারোহণে বালেশ্বরের ষ্টেশনে পৌছিলাম তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পর দিবস সকালে ট্রেণে উঠিয়া বেলা প্রায় ১১ টার সময় "বৈতরণী রোড" নামক ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদীর দোকান আছে তথায় যাত্রীগণের উপযুক্ত হাঁড়ি কাষ্ঠ চাউল দাইল প্রভৃতি আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায় তবে খুব ভাল নহে। কয়েকটী কুয়া আছে তাহার জলও মন্দ নহে, নিকটে ছোট একটী ধর্ম্মশালা আছে, তাহাতে যাত্রীগণ অনায়াসে যে কোন সময়ে পৌছিলে একরূপ দাঁড়াইবার স্থান পাইবেন। ধর্ম্মশালার পিছনে করগেট টিনের একটী সরকারী পায়খানাও আছে এবং সম্মুখে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ থাকায় ধর্ম্মশালা অধিকৃত যাত্রীগণের বিশেষ উপকার হয়। আমরা ষ্টেশনের নিকটে একখানি দোকান ঘর ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম আমার সঙ্গে আহারাদি দ্রব্যাদি অর্থাৎ ভাল চাউল দাইল গব্যঘৃত ও গোলআলু প্রভৃতি থাকায় শীঘ্রই অন্নাদি প্রস্তুত হইল এবং পথিমধ্যে তাহাই অতি উপাদেয় বোধ হইল। বালক বালিকাদের জন্য দোকানদার আমাদের সম্মুখেই তাহার নিজের গাভী দোহন পূর্ব্বক কতকটা দুগ্ধ আনিয়া দিল, আমরা আহারাদির পর ৩৲ টাকা হিসাবে দুই খানি গো শকট যাতায়াতের ভাড়া করিয়া তীর্থস্থান বৈতরণী নদী তটে যাজপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম বৈতরণী নদী গোনাশা পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া নানাদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই বৈতরণী নদী বেষ্টিত স্থানটীকে যাজপুর কহে। প্রবাদ মহারাজ যযাতি কেশরী এই জনপদ স্থাপন পূর্ব্বক বহুতর ব্রাহ্মণ এখানে বাস করাইয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করিয়াছিলেন সেই জন্যই এই স্থানের নাম যজ্ঞপুর ক্রমে যাজপুরে পরিণত হইয়াছে এবং রাজা আনীত ব্রাহ্মণগণ এই স্থানের পাণ্ডা হইয়া আছেন। ভগবান বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই যজ্ঞস্থলে উদ্ভব হইয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দানে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৫১ পীঠের দেবীর নাভী পতিত হওয়ায় এই স্থানে বিরজা ক্ষেত্র বা নাভিগয়া নামে খ্যাত এবং গয়াসুরের নাভিদেশও এই স্থানে বর্ত্তমান। ষ্টেশন হইতে তীর্থক্ষেত্র ৭ ক্রোশ মাত্র, কেহ বা পদব্রজে এক একটী মুটের স্কন্ধে মালামাল বোঝাই দিয়া চলিয়াছেন কেহ কেহ বা গো শকটে যাইতেছেন, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিলে পাল্কীও পাওয়া যায়। ষ্টেশনেই অনেক গুলি পাণ্ডা উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীগণকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করিয়া দেন, তাহাদের পুনঃপুনঃ প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া আমরা শেষে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বৈজনাথ নামক পাণ্ডাকে মনোনীত করিলাম তাঁহারা ৪।৫ জন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন, বেলা ৩ টার সময় গাড়ি ছাড়িয়া আমরা প্রায় ৫॥০টার সময় কুরিয়া নামক একটী চটীতে উপস্থিত হইলাম। চটীটি মন্দ নহে অনেক গুলি দোকান ঘর ও যাত্রীগণের থাকিবার স্থান আছে, দ্রব্যাদি আবশ্যক মত

পাওয়া যায়, এই চটীর নিকটেই বৈতরণী নদী এবং সরকারী কাটা খালের আনিকেট ও কপাটের পোল নদীর ও খালের উভয় মুখে স্থাপিত। নদীর এক দিকে জলরাশি পরিপূর্ণ হইয়াছে আর অন্যদিকে শুষ্ক বালুকারাশিতে পরিণত। আমাদের শকট দুইখানি ক্রমে নদী গর্ভে নামিয়া নদী পার হইতে লাগিল, কেবল বালুকা রাশি মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প অল্প জল। আনিকেটের ছিদ্র দিয়া প্রচণ্ড বেগে যে জল নিঃসৃত হইতেছে তাহা যেন ঠিক জল প্রপাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সে দৃশ্য অতি সুন্দর। আমরা ধীরে ধীরে পদব্রজে আনিকেটের নিকটবর্ত্তী সেই জলের উপর দিয়া নদীটী পার হইয়া পরপারে আসিয়া পুনর্ব্বার শকট আরোহণ করিয়া নদীর তীরস্থ জঙ্গলাবৃত রাস্তায় উপস্থিত হইলাম বৈতরণী নদী পার হইবার সময় মনে মনে কতই চিন্তা উদিত হইয়াছিল। যে দিন সংসার ত্যাগ করিয়া যম দ্বারের উত্তপ্তা বৈতরণী নদী পার হইতে হইবে সে দিন কি ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে? এখন এই সামান্য নদী পার হইতে এত চিন্তা কিসের? প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে বৈতরণী পার হইতে হয়। সে নদীর রূপ বর্ণনা প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থে লেখা আছে।

"নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধির বহা
উষ্ণতোয়া মহা বেগা অস্থি কেশ তরঙ্গিনী।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নদী পার হইবার সময় ঠাকুর কহিলেন যে বাবুজি এই বৈতরণী নদী জীবদ্দশায় পার হইলে আর মৃত্যুর পরে বৈতরণী পারের ভয় থাকে না। যাহা হউক তাঁহার সময়োচিত আশ্বাস বাক্যটী বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। এই স্থানেই সন্ধ্যা হইল; আমরা বন্য পথ অতিক্রম করিবার সময় অন্ধকারে কষ্ট হইবে স্থির জানিয়া ৪।৫টী হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর তাঁহার সমভিব্যাহারি কয়েকজন এক একটী লণ্ঠন লইলেন এবং দুই খানি শকটে দুইটী লণ্ঠন বাঁধিয়া দিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমরা তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর তাঁহার লোকজন দ্বারা আমাদের মালপত্র গুছাইয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসা বাটিতে লইয়া গিয়া পরম যত্নে আমাদের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর প্রসাদি লুচি ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়া আমাদের রাত্রির জলযোগের প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা তাহার পর নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলাম ও পথশ্রান্ত ক্লান্ত থাকায় এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল। বৈতরণীরোড ষ্টেশন হইতে এখানে আসিবার কষ্টের জন্য আজকাল প্রায়ই এখানে যাত্রী সমাগম হয় না। পূর্ব্বে যখন পুরী যাইবার রেল হয় নাই তখন সকলকেই এই হাঁটাপথে যাজপুর হইয়া যাইতে হইত, সে সময় তীর্থের খুব উন্নত অবস্থা ছিল। এক্ষণে বড়ই হীনাবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাগণের খুব আর্থিক অসচ্ছলতা হইয়া পড়িয়াছে। যদ্যপি বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানি অথবা অন্য কোন কোম্পানি এই ১৪ মাইল একটা শাখা ছোট লাইন করিয়াদেন তবে হিন্দুর এই প্রাচীন ও অতিপবিত্র তীর্থটী রক্ষা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিশেষ লাভবান হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে আমাদের কৌন্সিলের [illegible]য়-

গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং দেশীয় সংবাদ পত্র প্রচারকগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্ব স্ব কাগজে এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করেন। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে দেখি অসংখ্য পাণ্ডা তাঁহাদের জীর্ণ খাতা লইয়া আসিয়া আমাদের বাসা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন এবং বাবু আপনার নিবাস, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র কুলীন কি ভঙ্গ ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন এরূপ বাঁধাবাঁধি পাণ্ডার গোলমাল আমি কুত্রাপি দেখি নাই। অবশেষে একজন পাণ্ডা আমার সাত পুরুষের নাম ধাম এবং আমার পূজনীয় পিতৃদেবের নামাঙ্কিত খাতা লইয়া হাজির হইলেন, এমন সুন্দর খাতা রাখার প্রণালী আর কোথাও নাই। কাহারও যদি জিনিওলজি দরকার হয় এবং তাঁহাদের কেহ কখন যাজপুর গিয়া থাকেন তবে তথায় ঠিক নামাদি পাইবেন। যাহা হউক আমাদের যে পাণ্ডা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন এবং যত্ন পূর্ব্বক বাসাআদি দিয়াছেন তাঁহাকে অগত্যা আমাদের পূর্ব্বের পাণ্ডার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারই সহিত একযোগে আমাদের তীর্থ কার্য্য করাইতে বাধ্য হইলেন। আমরা পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত বৈতরণী নদীতে স্নান করিতে বাহির হইলাম। পূর্ব্বে যে বৈতরণী নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছি সেই নদীই ঘুরিয়া ফিরিয়া ৩।৪ বার পার হইয়া আসিয়াছি এবং এখানেও সেই নদীর উপর তীর্থ ক্ষেত্রে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে এই বিরজা ক্ষেত্র স্থিত বৈতরণী নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"আস্তে বৈতরণী নাম সর্ব্ব পাপ হরানদী॥
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

আমরা সংকল্প করিয়া বরাহ দেবের মন্দিরের নিকট বাঁধা ঘাটে নামিয়া বৈতরণী স্নান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্নানান্তে বৈতরণীকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম।

"গোনাসিকা সমুদ্ভূতে! ধাতু যজ্ঞে সমাগতে।
পাপংমে হর কল্যাণি! বৈতরণী নমোঽস্তুতে॥"
বৈতরণী। মহাভাগে! গোবিন্দ শঙ্কর প্রিয়ে।
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরণী নমোঽস্তুতে॥
দুর্ভোজন দুরালাপ দুঃপ্রতিগ্রহ সম্ভবম্।
পাপং মে হর-কল্যাণি! বৈতরণী নমোঽস্তুতে॥

স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺বরাহদেবের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম এখানেই বৈতরণীর যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় অর্থাৎ গোদান ষোড়শদান প্রভৃতি। সমস্ত কার্য্য করিতে ১৫৲ ২০৲ টাকা ন্যূনকল্পে ৭৲। ৮৲ টাকা খরচ ধার্য্য আছে তবে পাণ্ডাগণ মনে করিলে তাহার কমেও কার্য্য করাইয়া থাকেন এবং অর্থবাণ যাত্রী পাইলে তাহার অধিক আদায় করিতে ক্রটী করেন না। এই, স্থানটী কেই বরাহক্ষেত্র বলে। এই প্রাঙ্গনের চারিধারে কতকগুলি দেব দেবীর মূর্ত্তি ছোট ছোট মন্দির মধ্যে বিরাজিত। ৺বরাহ দেবের মন্দিরটী ৺ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্য সম্পন্ন তবে তদপেক্ষা ছোট। আমরা যথাক্রমে ষোড়শদান ও গোদান ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিয়া গো পুচ্ছ ধরিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া শেষে যমদ্বারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিলাম।

"বরবারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ উর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চগাম্॥

পরে বরাহদেবের মন্দির মধ্যে ভগবান বরাহদেবের দর্শন ও পূজা অন্তে ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। বৈতরণীর এক পারে বরাহদেবের—মন্দির এবং পরপারে সোপানাবলীর সাহায্যে উপরে উঠিয়া অষ্টমাতৃকার মন্দির। এই মন্দির মধ্যে দেবদেবী দর্শন করিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। একটী ঘরের মধ্যেই অষ্টমাতৃকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, ১। শ্মশানকালী ২। ধর্ম্মরাজ যম ৩। যমের স্ত্রী কালিন্দী, ৪। যমের মা ৫। যমের মাসী ৬। যমের পিসী ৭। যমের খুড়ী ৮। যমের জেঠাই এই মূর্ত্তিগুলি নীল প্রস্তরগঠিত। মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড গণেশ মূর্ত্তি এবং নিকটেই প্রকাণ্ড জগন্নাথ দেবের মন্দির, মন্দির মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা, বাহিরে গরুড়স্তম্ভ। এখানকার মন্দিরগুলি যে বহুকালের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এসমস্ত দর্শনান্তে বিরাজাক্ষেত্র দেখিতে গমন করিলাম। বরাহদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২॥ মাইল পথ যাইয়া তবে বিরজাক্ষেত্রে পৌঁছিলাম। রাস্তাটী অতি সুন্দর দুই ধারেই প্রায় দোকান পসারি আছে। পথিমধ্যে পূর্ব্ব লিখিত বৈতরণী নদীর কাটাখাল, কপাট দ্বারা জল আটক করা আছে তাহা পার হইয়া মন্দির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মন্দিরের বাহিরে বৃহৎ একটী বাঁধাঘাট যুক্ত পুষ্করিণী দেখিলাম, ইহাকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে ইহাতে সংকল্প করিয়া জলস্পর্শ করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রায় ৪০০।৪৫০ ফিট মধ্য স্থলে দেবীর মন্দির। কৃষ্ণবর্ণ রত্নবেদীর উপর নানাভূষণে ভূষিতা পুষ্পমাল্য পরিশোভিতা অষ্টাদশ ভুজা কৃষ্ণ প্রস্তরের বিরজা দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। আমরা কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য সোনার নথ বিল্বপত্র প্রভৃতি যাহা আনিয়াছিলাম তাহা দ্বারা সাধ্যমত মায়ের ষোড়োশপচারে পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ধন্য হইলাম। ঐই বিরজাদেবী ৫১ পীঠের ১টী প্রধান পীঠ বলিয়াই এই স্থানে বিখ্যাত।

"উৎকলে নাভি দেশঞ্চ বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে"
(তন্ত্রচূড়ামণী)

সম্মুখে লোকনাথ বা অগ্নীশ্বর ভৈরব। মন্দিরের উত্তরদিকে একটী ঘরের মধ্যে একটী কূয়া আছে তাহাকেই নাভিগয়া বলে, ইহা গয়াসুরের নাভীদেশ বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

"গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবী তটে
অত্র পিণ্ড প্রদোষাতু ব্রহ্ম লোক মনাময়ম॥"

আমরা যথাক্রমে পিণ্ডদান ইত্যাদি কার্য্য শেষ করিলাম। পথি মধ্যে একস্থানে অথণ্ডেশ্বর নামক শিব আছেন। প্রবাদ দেবরাজ ইন্দ্র তথায় তপস্যা করিয়া গৌতম মুনির শাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অন্য একস্থানে অর্থাৎ বিরজা মন্দিরের ১ মাইল দক্ষিণে যাইয়া অষ্টাদশ হস্ত কালী মূর্ত্তি ও ত্রিলোচন শিব দর্শন হয়। আমরা যথা সময়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডাঠাকুরের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরে পাণ্ডাঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া ভোর ৫টার সময় শকটারোহণে যাত্রা করিয়া বেলা ১১টার সময় বৈতরণী রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

তথায় পূর্ব্বমত দোকানে আশ্রয় লইয়া রন্ধনাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে যাইয়া রাত্রি ১১টার ট্রেণে উঠিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে পুরীষ্টেশনে পৌছিলাম। তথা হইতে গাড়ি করিয়া একবারে স্বর্গদ্বারে আমার স্বর্গগত বন্ধু উপেন্দ্র মোহনচৌধুরী মহাশয়ের সমুদ্রতীরস্থ বাসাবাটীতে উপনীত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে বাসার অর্দ্ধেক অংশ পড়িয়া গিয়াছে এবং বাকি অংশে দুই একদিন পূর্ব্বে হইতে অন্য একটী ভদ্রলোক সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছেন তথায় আমাদের সংকুলান হওয়া কঠিন এই ভাবিয়া অন্য বাসার সন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইলাম। ইতিমধ্যে আমার পূর্ব্বলিখিত বন্ধু ধার্ম্মিকবর কলিকাতা হাঠখোলার—সুপ্রসিদ্ধ মহাজন বাবু শ্রীদামচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যাঁহার সহিত ৺গঙ্গাসাগরে এক সঙ্গে ছিলাম তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শুনিলাম যে এই বাড়ির ঠিক পশ্চাতেই তিনি একটী প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রায় ১৫।১৬ দিন রহিয়াছেন এবং বড় বাড়ী লোকজন কম থাকায় বড়ই নির্জ্জনতা বোধ করিতেছেন। আমরা তথায় যাইয়া আশ্রয় লইলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন। আমরাও পরম আহ্লাদে তাঁহার সহিত তাঁহার আলয়ে উপনীত হইয়া সুন্দর আশ্রয়লাভ করিয়া ইহা সেই ভগবানের অপার করুণা বলিয়াই মনে করিলাম। এই বাড়ীখানি সমুদ্রের কূলে থাকায় আমার সঙ্গের ছোট ছোট বালকবালিকাগণ সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিল। আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সমুদ্রে স্নান করিয়া শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব দর্শনে গমন করিলাম। স্বর্গদ্বার ঘাট হইতে শ্রীমন্দির প্রায় ১ মাইল। এই পথে আসিতে আসিতে কত প্রকার দুঃখী কাঙ্গালী ভিখারী দেখিতে পাইবেন এরূপ দুঃখীর দেশ আর দেখা যায় না, কেবল দেহি দেহি শব্দ যাহা হউক ক্রমে আমরা সিংহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাস্তার উপরেই লোহার রেলিং ঘেরা অরুণ স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম ইহা একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত অতবড় একটী স্তম্ভ দেখিয়া প্রকৃতই আশ্চর্য্য হইলাম। এই স্তম্ভটী ৩৫ ফিট উচ্চ এই স্তম্ভটী যে প্রস্তরে নির্ম্মিত সে প্রস্তর ভারতীয় প্রস্তর নহে কোন সুদূর দ্বীপ প্রদেশ হইতে আনিত এবং নির্ম্মিত, আশ্চর্য্যের বিষয় কি উপায়ে এই সমস্ত অসাধ্য সংসাধন হইয়াছিল। যাহা হউক ইহার পরই সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গনটী দৈর্ঘে ৬৬৫ ফিঠ প্রস্থে ৬৪৪ ফিট চতুর্দ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; চারিদিকে ৪টী দ্বার সংযুক্ত। পুরীর জগন্নাথের মন্দির ভারতের শিল্প নৈপুণ্যের একদিগন্ত বিস্তারী কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মন্দির পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং চারি খণ্ডে বিভক্ত, ১ম ভোগমন্দির ২য় নাট মন্দির ৩য় জগমোহন ৪র্থ রত্নবেদী। মন্দির ভিতরে গরুড় স্তম্ভ। এই স্থানে দাঁড়াইলে জগন্নাথদেবকে স্পষ্ট দেখা যায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থান হইতেই দর্শন করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। আমরা যথাক্রমে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদীর উপর নির্নিমেষ লোচনে প্রাণ ভরিয়া যে জ্ঞানাতীত শক্তিমান জগত পিতা সলিলে রসস্বরূপ, সূর্য্য চন্দ্রে প্রভা স্বরূপ, নীলাম্বরে শব্দ স্বরূপ, মেদিনীর অঙ্গে পবিত্র গন্ধ স্বরূপ, অনলে বিশ্ব বিধ্বংসী তেজ এবং সর্ব্বভূতে জীবনী শক্তি স্বরূপ সেই সর্ব্ব গুণাতীত

পরমপিতা জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মনের আনন্দে বদ্ধ করপুটে প্রণাম করিয়া নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। আমরা ভক্তিহীন পাষণ্ড আজ কি পুণ্যফলে যে ভগবান আমাদের দর্শন দানে উদ্ধার করিলেন তাহা ভাবিয়া না পাইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। এইরূপ জগন্নাথ বলরাম ও মধ্যে সুভদ্রা দেবী পার্শ্বে সুদর্শণ চক্র দর্শন করিয়া জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তি পাইলাম। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মন্দিরের উচ্চতা দর্শন ও শিল্পকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। শুনিলাম শ্রীমন্দির উচ্চে ১৮২ ফিট ভুবনেশ্বরের মন্দির ১৬৬ ফিট, ক্রমে আমরা চারি দিকের অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে, কৃষ্ণ, পটলেশ্বর জগন্নাথ, সূর্য্য, সূর্য্য-নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত, পশ্চিমে লক্ষ্মী, স্বরস্বতী মাখনচোরা গোপীনাথ, বড় গণেশ প্রভৃতি পূর্ব্বদিকে শ্রীচৈতন্য দেব, বদরী নারায়ণ রাধাশ্যাম, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দক্ষিণে রোহিণী কুণ্ড, ভূষণ্ডি কাক, বিমলাদেবী মুক্তি মণ্ডপ প্রভৃতি নানা প্রকার দেব দেবীর মন্দির এবং প্রত্যেক স্থানেই এক একটী পূজারী বা দ্বারপাল বসিয়া যাত্রীগণকে বলিতেছে "যা যা ভিতরে চলে যা সেখানে মাথা কর্ টাকা আধুলি, সিকি, দুয়ানি যার যা খুসি দিয়ে যা" ইত্যাদি রবে যাত্রীগণকে উত্যক্ত করিতেছে, যাহা হউক আমরা সাধ্যমত সকল স্থানেই কিছু কিছু প্রণামী দিয়া সেদিনকার মত বাসা বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর দিবস হইতে প্রত্যহই সমুদ্র স্নানের পর ঐ স্থানের যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান আছে একে একে দর্শন করিতে

লাগিলাম। নিমাই চৈতন্য মঠ বিদূরের মঠ, কা পাতা হনুমান, নানক পন্থীর মঠ, শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠি গোবর্দ্ধন মঠ, জগন্নাথ বল্লভ মঠ, কবীর পন্থীর ম ইত্যাদি বহু সংখ্যক মঠ আছে চক্রতীর্থ, সিদ্ধ বকুং মার্কণ্ড সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, টোটা গোপীনাথ, যমেশ শিব অলাবুকেশ্বর, কপাল মোচন, নরেন্দ্র সরোব ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, আঠার নালা, গুণ্ডিচা বাড়ী লোক নাথ শিব ইত্যাদি দর্শন আটকে বন্ধন ধ্বজা প্রদা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া মাঘী পূর্ণিমার দি গজ উদ্ধারণ বেশ দর্শন আশয়ে থাকিলাম। সংসারী মানুষ মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া একদৃষ্টে সমুদ্রে দিকে চাহিয়া ঐরূপ কত কি ভাবিতেছি, হায় বিষা ক্লিষ্ট মানব জীবনের কষ্টের অবসানের মহৌষধ ে নিসর্গ সুন্দরীর অঞ্চলে বাঁধা! যাহারা প্রাণে শান্তি হারাইয়া হায় হায় করিতেছে, শোভা সম্পদময়ী চন্দ্রালোক প্রোজ্জ্বলা, নৈশ প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের প্রাণের সে উদাস ভাবটা অনেক কমিয়া যায় পাঠক! কখন চন্দ্রালোকে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়াছেন কি? যদি বেড়াইয়া থাকেন ভালই নচেৎ সমুদ্র কি মহান্ প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার জন্মই বৃথা। সেই মহৎ অপেক্ষা মহান্ বিশাল মনোহর দৃশ্য লেখনী দ্বারা আঁকিয়া দেখাইতে পারি সে ক্ষমতা আমার নাই; সেই রজত ধবল সৈকতভূমি কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ শুভ্র চন্দ্র কিরণ অঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছে। সেই অনন্ত প্রসারিত দিগন্ত প্রধাবিত, সুনীল সমুজ্জ্বল নীলাম্বুধি তরল স্নিগ্ধ শশিকর সম্পাতে এক অনুপম

ধুর্য্যময় দিব্যকান্তি ধারণ করিয়াছে, যেন অনন্ত সাগরে চিদানন্দ সুধা উছলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখে দূরে অনন্ত নক্ষত্র খচিত ঈষৎ নীলাভ আকাশ সেই ঢ় নীলোজ্জ্বল বারি রাশির মধ্যে হেলিয়া পড়িতেছে। অনন্ত আকাশ অনন্ত সাগরকে আলিঙ্গন রলে যেন অনন্ত শয্যায় শয়ান অনন্ত বারিধি বক্ষে গবান অনন্ত দেবের চরণ স্পর্শ করিতেছে। সুদূর বং কম্পমান সাগর বক্ষ চন্দ্রালোকে টলমল করিতেছে কিন্তু তটপ্রান্তে উচ্চ উর্ম্মিমালা রজত মুকুট রে ধারণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে টিয়া আসিতেছে, আসিয়াই বেলাভূমি ডুবাইয়া দিয়া ৎক্ষণাৎ সবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। বীচিমালার ই অবিশ্রান্ত লাস্যলীলা সৈকত ভূমিকে একবার গাঙ্গিতেছে আবার গড়িতেছে, তাহাকে শুভ্র ফেনপুঞ্জে সুশোভিত করিতেছে। সৃষ্টির কোন সুদূর অতীত কাল হইতে এই লীলা খেলা চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর বারিধির সেই গম্ভীর বজ্র নির্ঘোষ কর্ণকুহর ভেদ করিয়া অতি প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেয়, খুলিয়া দিয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে লুক্কাইত গভীর ভাব সকল টানিয়া বাহির করে। অতি বৃহৎ অর্ণবযান খানিও তীর হইতে দেখিয়া বোধ হয় বারিরাশির মধ্যে যেন একটী কুবলয় কোরক ভাসিতেছে। অনন্ত সাগর যথার্থই অনন্ত দেবের সুবিশাল প্রতিকৃতি, সেই অকূল সাগর তটে দাঁড়াইলে সেই অনন্ত পুরুষের আভাষ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার অনাদি সৃষ্টির অসীম বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। হায় ভ্রমান্ধ জীব! এই অনন্ত সমুদ্রের উপর অনন্ত আকাশ অনন্ত কোটী তারকা রাজি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র আবার পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র যেন মহা সমুদ্রের বক্ষে একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ। এই বিশ্বরাজ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের স্থান কত টুকু একবার ভাবিয়া দেখ। কিন্তু মানুষ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে এক বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বস্তুর বীজ লুকাইত আছে, সে কি! না চিচ্ছায়া, সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, কিন্তু সেই অমূল্য বস্তুর অস্তিত্ব কয়জনে বুঝিতে পারে। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার সীমা কোথায়? তিনি যে চিন্তার অতীত। অন্তর্দৃষ্টিতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। চিন্তাশীল ভক্তি মান্ প্রশান্ত আত্মাই কেবল বহু আয়াসে তাঁহার মর্ম্ম অবগত হয়, কেননা ধর্ম্মব্রত পালনে জ্ঞান ও ভাব দীপ্তি পাইয়া থাকে। এক একটী প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাতে ঈশ্বরের কত মহিমা ব্যক্ত হয় এবং তাহাতে আত্মাতে কত জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া মানবের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়া শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। আমার প্রাণেও ঐরূপ দৃশ্য দেখিয়া কেমন একরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সস্ত্রীক জগন্নাথ দেবের গজ উদ্ধারণ বেশ দেখিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। চারিদিকে প্রায় ৫০হাজার লোকের কম নহে; মন্দির ঘিরিয়া কেবল হে জগন্নাথ দেখা দাও প্রভু বলিয়া প্রার্থনা করিতেছে। পাণ্ডাগণ ক্রমে ক্রমে আপনআপন যাত্রীগণকে লইয়া ভীড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে মন্দিরের ভিতরে লইয়া যাইতেছেন। আমরাও ক্রমে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্ন বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথা-

সাধ্য প্রণামী দিয়া লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। জীবনে এমন তৃপ্তি যেন কখনই হয় নাই আজ কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়া যে সুন্দর বেশ ভূষাতে সজ্জিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম এবং প্রাণে কিরূপ শান্তি পাইলাম তাহা এই সামান্য লেখনীতে জানান অসম্ভব। আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর বিমলা দেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেখানেও নাট মন্দির মধ্যে বিস্তর যাত্রীর ভীড় হইয়াছে। যাহা হউক কৌশলে কিছু প্রণামী দিয়া মায়ের দর্শন লাভ করিলাম এই বিমলা দেবীকে ৫১ পীঠের একটী পীঠ এবং জগন্নাথ দেব ইহার ভৈরব বলিয়াই অনেকে জানেন যথা "বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরব" কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে নয়ন সার্থক হয়, মনে প্রকৃতই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তথায় বসিয়া মায়ের স্তব পাঠ করিতে লাগিলাম, মনে একটী দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল "বিরজা উড্রদেশেতু" উড়িষ্যা দেশে বিরজা ক্ষেত্র ভগবতির নাভি পড়িয়াছিল কিন্তু সে বিরজাক্ষেত্র বৈতরণী তটে এখান হইতে ১০০ মাইল দূরে, সেখানে বিরজা দেবীকেই তথাকার পাণ্ডাগণ ৫১ পীঠের পীঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন "উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজা ক্ষেত্র মূচ্যতে

বিরজা সা মহাদেবী লোকনাথস্তু ভৈরব"।

আবার এখানেও বিমলা দেবীকে ঐ পীঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। জগন্নাথ দেবকে আমরা বিষ্ণু মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করিয়া থাকি, বিষ্ণু শক্তি বিমলা দেবী লক্ষ্মী রূপেই পূজিতা হওয়া উচিত। শিব শক্তি জগবতীর নাভিদেশ উৎকলে পতিত হইয়াছিল তাহাতে দেবী যত্তপি বিমলাই হয়েন তবে জগন্নাথদেব কি করিয়া ভৈরব হইতে পারেন বৈতরণীতে শুনিয়াছিলাম যে আমরা ভুল ছাপা দুই একখানি স্তবমালা পাঠে ও ভ্রম পীঠ মালা পাঠে এরূপ ভ্রমে পড়িয়াছি পঞ্জিকাতে ও ঐরূপ কোথায় বিরজা ক্ষেত্র এবং কোথায় ক বিমলা দেবী এক সঙ্গে লেখা হইয়াছে ইহা দেখিয়াও ভুল সংশোধনের চেষ্টা হয় না। পূর্ব্বেকার অনেকানেক পঞ্জিকাতে দেবী বিমলা এবং ভৈরব "লোকনাথ" লেখা দেখা যাইত কিন্তু আজকাল আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈতরণীতে ঐ সকল কথা শুনিয়াছি এবং আমার নিজের মনেও এই সন্দেহ অনেক দিন হইতে বদ্ধমূল আছে ইহার মীমাংসা জন্য আমি অনেক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম কিন্তু প্রকৃত উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পাঠক মহোদয়গণের মধ্যে যদি কেহ আমার এ সন্দেহটী মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। সুভদ্রা দেবীর উৎসব মূর্ত্তিকে এ দেশে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি, এবং জগন্নাথ দেবের উৎসব মূর্ত্তিকে এ দেশে মদনমোহন বলিয়া থাকে। সুভদ্রা দেবী বলরামের মাতা রোহিণী দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় ইনি জগন্নাথ দেবের ভগ্নি, নচেৎ ইনি শক্তি স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবী। এরূপ কথা স্কন্দ পুরাণান্তর্গত উৎকল খণ্ডে দেখা যায় যাহা হউক পরম পুরুষ ও প্রকৃতির এ সকল দেব লীলা সম্বন্ধে মানবের মনে কোনরূপ সন্দেহ করা অনুচিত ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সদলবলে শ্রীমন্দির হইতে বাসাবাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম ও আমার বন্ধু প্রবর

স্বামী বাবু শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আনীত নাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই-ম। বলিতে কি যে কয়দিন আমরা এই পুরীধামে লাম আমাদের জন্ত শ্রীরাম বাবু প্রত্যহ প্রসাদের নানা প্রকার মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত এবং বালক লিকাগণের জন্ত প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও জলখাবা-র ব্যবস্থা করিয়া আমাদের চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ আশ্রয় না পাইলে মাদের বিশেষ কষ্ট হইত সন্দেহ নাই। আশীর্ব্বাদ র তিনি সুখস্বচ্ছন্দে পুত্র পৌত্রাদি লইয়া কালাতি-ত করুন।

পর দিবস সকালে সকলে মিলিয়া সমুদ্রে স্নান রিতে গেলাম দেখি সহস্র২ নরনারী একত্র হইয়া স্নান রিতেছে ও নানা প্রকার ফল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পন আপন উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছে। হায় ান্ধ মানব! তীর্থ স্নান করিলেই কি মুক্তি লাভ ? এই সহস্র মানবের মধ্যে তীর্থ মহাত্ম্য জানা বা ক্তি কয় জনের আছে। এখন ঘোর কলিকাল খন লোকে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানমার্গ কি ভক্তিমার্গ বলম্বন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তির সহজ উপায় ল্পনা করিয়া লইতেছে। একবার হরিনাম রিলে সকল পাপ ধ্বংশ হবে বা একবার তীর্থ স্নান তীর্থ দর্শন করিলে জীব মুক্ত হইবে এইরূপ নানা ত প্রচার হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কি ইতে পারে? লোক ভাবে শাস্ত্রে "রথেতু বামনং ষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইহার আসল অর্থ কি? রথ র্থে শরীর আর বামন অর্থে এই শরীরস্থ আত্মা। ঠোপনিষদে এই রথের উল্লেখ আছে যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু" আর বামন শব্দের উল্লেখ আছে যথা "মধ্যে বামনং আসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে" অতএব জানা গেল রথে কিনা শরীরের মধ্যে, বামন কিনা আত্মাকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না যিনি শরীর মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তির অতীত সেই পরমাত্ম বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই মুক্তি লাভ করেন। ইহা জ্ঞান মার্গের কথা বড়ই কঠিন কলিতে ভক্তি মার্গই প্রশস্ত সেই জন্যই মহাপুরুষগণ এই তীর্থভ্রমণতীর্থ স্নান দেব দেবী দর্শন ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা অবোধ মনুষ্যগণকে ধর্ম্ম পথে লওয়াইবার পন্থামাত্র এবং এইরূপে ক্রমে ভক্তি পূর্ব্বক যে কোনরূপেই সেই একমাত্র ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে এবং তীর্থস্নান বা দেব দর্শনের ফল স্বরূপ সাময়িক ভাবে মনের মধ্যে ভক্তি ও শান্তি এবং পবিত্র ভাবের উদয় হয় কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংসার আবর্ত্তে পড়িলে তাহা কোথায় ধুইয়া যায়। সেই কারণেই মনের মধ্যে ভক্তি ও ভগবানের নাম সর্ব্বদা চিন্তা ও পুনঃ পুনঃ তীর্থাদি দর্শন করাই মানবগণের একমাত্র ভগবৎচিন্তা মন মধ্যে জাগরুক রাখিবার প্রধান উপায় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কোন কোন তীর্থে যাইয়া ভক্তগণ একটী করিয়া ফল দেবতাকে দিয়া থাকেন এবং জীবনে সেই ফল আর ভক্ষণ করেন না। এই ফল সমর্পণের মধ্যে অতি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ভগবানকে ফল সমর্পণ করার অর্থ সামান্য ফল নহে কর্ম্মফল অর্পণ করা। মহাপুরুষগণ তীর্থে আসিয়া ফল সমর্পনের ছলে ভগবানকে স্বীয় কর্ম্মফল সমর্পন করিয়া যাইতেন এবং গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিষ্কামভাবে

থাকিতেন অন্য কর্ম্ম আর করিতেন না এক্ষণে সেই আসন অনুষ্ঠানের অনুকরনে এই ফল সমর্পণ প্রথা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান অধম জীবগণের প্রতিদয়া করিয়া বহুতীর্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে অতি সহজে ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা যায়। বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন কলির জীব অতীব দুর্ব্বলচিত্ত তাহাদের উদ্ধারের উপায় কেবলমাত্র তীর্থদর্শন এবং ভগবানের নাম কীর্ত্তন। তীর্থদর্শন দ্বারা মায়ার খণ্ডন হয় ইহা শাস্ত্রসম্মত। ব্রহ্মাণ্ডে স্কান্দে লিখিত আছে

"কিং ব্রতৈঃ কিং তপোদানৈঃ কিং তীর্থৈঃ
ক্রতুভিস্তথা।
কিং অষ্টাঙ্গযোগেন সাংখ্যেন পরমেন চ॥
তীর্থরাজ জলে স্নাত্বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম।
দৃষ্ট্বা দারুময়ং ব্রহ্ম মোহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"
ইত্যাদি।

তীর্থ দর্শন দ্বারা জ্ঞান ভক্তি ও মুক্তি সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। যোগাদি দ্বারা যেরূপ বিলম্বে ফল লাভ হয় ভক্তিযোগে তাহাপেক্ষা অতি অল্প আয়াসে মনুষ্য সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে জগৎকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। "আপনি আচরিধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" তিনি স্বয়ং তীর্থ দর্শন করিয়া তীর্থ দর্শনের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মোক্ষ লাভের জন্য ভগবান বহু তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু জ্ঞান লাভ না হইলে কোন তীর্থই মুক্তিপ্রদ হয় না। কলির জীবের উদ্ধারের জন্য একমাত্র গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গাকেই প্রধান তীর্থ বলা হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও জ্ঞানপূর্ব্বক মৃত্যু না হইলে উদ্ধারের আশা নাই—

"গঙ্গায়া জ্ঞানতো মোক্ষ বারাণস্যাং জলেস্থলে।
জলেস্থলে চ অন্তঃরীক্ষে মুক্তি শ্রীপুরুষোত্তমে॥"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে একমাত্র জগন্নাথদেব দর্শনেই লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দক্ষিণে দধিতীরস্থং দারু ব্রহ্মবলোকিতং।
বিনা সাংখ্য মতং পুংসা দর্শনান্মুক্তিদং ধ্রুবং॥

বহু পুরাণাদি পাঠেই জানা যায় যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনেই মুক্তি হয়, তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে, নির্ম্মাল্য ধারণে এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলেই জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ত্রিমূর্ত্তি জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের প্রতিকৃতি, সে জন্য কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা যাহা লাভ হয় জগন্নাথ দর্শনে সে ফল হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা সহজতর মুক্তির উপায় আর নাই বলিয়াই বোধ হয়। মহাপ্রভু এই জগন্নাথক্ষেত্রেই নিজে অবস্থান করিয়া জীবগণকে এই স্থান দর্শনে উপদেশ দিয়াছেন এবং সর্ব্বদা হরিনাম করিয়া নাম মাহাত্ম্যে উদ্ধারের উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক কলিযুগে একমাত্র জগন্নাথ দর্শন এবং নাম সংকীর্ত্তনই মানবগণের উদ্ধারের উপায়।

"নাতঃ পরতরং নাম ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
ন গঙ্গাস্নান মেতাদৃক্ নকাশী গমনং তথা
জগন্নাথেতু সংকীর্ত্ত্য নরঃ কৈবল্য মাপ্নুয়াৎ॥

উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে—

ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে
দারুরূপী জগন্নাথঃ ভক্তানাম ভয়প্রদঃ

বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবং বসেন্নর।
প্রাপ্নোতি য়ৎফলং যাজনক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে
দিন মেকং বসেৎযত্ত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ
তৎফলং সমবাপ্নোতি ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে যদি॥"

ভগবানের লীলা ও মাহাত্ম্য আমি আর অধিক লিখিব এ বিষয় ভক্তগণ সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে আনন্দবাজার তথায় প্রসাদ বিক্রয় হয় এই প্রসাদ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিশ্চিতং
ভক্ত্যা মমান্নং ভুক্ত্বাতু সন্নিধ্যং মম গচ্ছতি॥
একতঃ সর্ব্বতীর্থানাং যৎফলংপরিকীর্ত্তিতং।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণ সিদ্ধান্নভোজনাৎ—
কুক্কুরস্য মুখ ভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে
ব্রহ্মাদ্যৈরপিতৎভক্ষং ভাগ্যাতো যদি লভ্যতে।
বায়ু পুরাণে
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ
দুর্জ্জনে ন্যাপি সংপৃষ্টং সর্ব্বমেবাঘনাশনং॥"

আমাদের ন্যায় পাপীতাপী যাহাদিগের আর কোন উপায় নাই তাহাদের পক্ষে জগন্নাথ দর্শন প্রসাদ ভক্ষণ নাম কীর্ত্তন একমাত্র অবলম্বন। সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া মনে এইরূপ নানাবিষয় আলোচনা করিয়া হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল প্রেমাবেশে নয়নকোণে ভক্তি-বারি আসিয়া জুটিল আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে সমুদ্রকে প্রণাম করিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

"নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণোরপাম্পতে।
নমো হিরণ্য শৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥

পর দিবস আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রী৺"সাক্ষী-গোপাল দর্শনে গমন করিলাম এই স্থানটী পুরী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত মধ্যে একটী ষ্টেশন ব্যবধান মাত্র। পুরীর বাসাতে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া সকালের ট্রেনে যাইয়া দর্শনাদি করিয়া পুনরায় বৈকালে ফিরিয়া আসা যায়।। আমরাও তাহাই করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আমার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবর কলিকাতা সভাবাজারের প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বাবু কুঞ্জবিহারী লাহা মহাশয় সস্ত্রীক ছিলেন এবং আমাদের পুরীধামে আশ্রয়দাতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীদাম বাবুও সস্ত্রীক ৺সাক্ষীগোপাল দর্শনে গমন করিয়াছিলেন তথায় যাইয়া মন্দিরের বাহিরে একটী পুষ্করিণীতে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দির প্রবেশের দ্বারদেশে একটী প্রস্তর-ময় স্তম্ভ বিরাজমান এবং উদ্যানমধ্যে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রধান মন্দিরমধ্যে প্রায় চতুর্হস্ত পরিমাণ উচ্চ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গমঠাম মুরলীধর প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজিত, গোপাল মূর্ত্তি নহে। আমরা ভগবানের অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইলাম এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি যেন জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। বামে শ্রীরাধিকার পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তিটী ৪ ফিট উচ্চ ইঁহাদের অন্নভোগ হয় না ৭ বার মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। মন্দিরটী ৭০ ফিট উচ্চ। লেটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত, প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান ১৩৭৲৩৮ ফিট। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া তাঁহাকে

সাক্ষী রাখিতে হয় নচেৎ জগন্নাথ দর্শনের ফল হয় না। পাণ্ডার নিকট ৺পূজার দ্রব্যাদি সমস্ত প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিতে লাগিলাম।

১

জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগতরে।
যদুনন্দন নন্দ কিশোর হরে॥
জয় রাস রাসেশ্বর পূর্ণতমে।
প্রণমামি বৃষভানু কিশোরি রমে॥

২

জয় তীহ কদম্বতলে ললীতম।
কলবেনু সমীরিত গানরতম॥
ব্রজরাজ সুত পরম প্রকৃতে।
প্রণমামি সাক্ষিগোপাল সুকৃতে॥

স্ফুট পদ্মমুখী বৃষভানু সুতা।
নবনীত সুকোমল দেহলতা॥
পরিবভ হরিং প্রিয়মাত্র সুখং।
পরিচুম্বতি শারদ চন্দ্র মুখং॥
জগদাদি গুরুং বসুদেব সুতং।
প্রণমামি সদা বৃষভানু সুতাং॥

৪

নব নীরদ সুন্দর নীল তনুং।
শশিলাঞ্ছিত রাজিত কোটী বিধং॥
শিখিকণ্ঠ শিখণ্ডক সন্মুকুটম্।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥

৫

কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্রযুগম।
পরিপূর্ণ শশাঙ্ক সুচারু মুখম্॥
মৃদুহাস সুধাময় চন্দ্র মুখম্।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তম্॥

৬

মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখম্।
মকরাঙ্কিত কুণ্ডল গণ্ডযুগম্॥
মণি কুণ্ডল মণ্ডিত কর্ণ যুগম্।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমঃ॥

৭

স্বর্ণমুরলী শোভিত বাহুধরম্।
মণি কৌস্তভ শোভিত হার যুগম॥
ঘনমুপুর ভূষিত পাদ দ্বয়ং।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥

৮

গুরুচন্দন চর্চ্চিত নীল তনুম্।
তুলসীদলদাম সুগন্ধি পরম্॥
বসনাম্বিত পীত নিচোল যুতাম্॥
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥

৯

তরুণীকৃত দিগ্ গজরাজ গতিম্।
কলনূপুর হংস বিমান গতিম্॥
রতিনাথ মনোহরবেশ ধরম্।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তম্॥

১০

রতি মন্মথ পঙ্কজ কামহরাম্।
মুরলি মধুর শ্রুতি রাগ পরাম্॥
স্বর সপ্ত সমন্বিত গান পরাম্।
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥

১১

জয় চাণুরমুষ্টিকং নিপাতনং।
কৃষ্ণ কংশ দানব নিঘাতনং॥
যশোদা জীবন নিত্য ধনং
প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥

১২

দ্বিজরাজ বিনিন্দিত চন্দ্রমুখং।
কোটী ভূষিত রঞ্জিত পীত বাসং॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভিত চরণং।
প্রণতি চরণে খগেন্দ্রনাথম॥

আমরা শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া অবশেষে সকলে মিলিয়া পাণ্ডা ঠাকুর প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য হইলাম এখানে মূড়কি ও মালপুয়া প্রসাদ অতি উত্তম এরূপ উপাদেয় প্রসাদ অন্যস্থানে পাই নাই। এখানে পীতল কাঁসার দ্রব্যের দর পুরী হইতে সস্তা বোধ হইল। এইরূপে এখানকার দর্শনাদি শেষ করিয়া বৈকালের গাড়িতে পুনরায় পুরীধামে ফিরিয়া আসিলাম। বলাবাহুল্য যে লক্ষ্মীর বরপুত্র আমার বন্ধু প্রবর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীদাম বাবু সঙ্গে থাকায় এবং পাণ্ডাদের বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করায় আমাদেরও এখানে প্রসাদাদি পাওয়া ও খাতির যত্নের ক্রটী হয় নাই। যাহা-হউক আমরা নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিতে পুরীর বাসা বাটীতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম সুখলাভ করিলাম। পর দিবস প্রাতে স্নানাদি করিয়া শ্রীমন্দির দর্শনে গমন করিলাম, পথি মধ্যে আমার পাণ্ডা শ্রীযুক্ত লোকনাথ পড়িহারির সহিত সাক্ষাৎ হইল ইনি ৺শ্যামসুন্দর পড়িহারির পৌত্র এবং ৺জগন্নাথ পড়িহারির পুত্র অতি সদাশয় ও অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তি ইঁহার বিষয় বৈভব পূর্ব্বে খুব ছিল কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য অনেকটা অবস্থাহীন হইয়াছেন কিন্তু তাহা বলিয়া যাত্রীগণের উপর জুলুম করা বা তাহাদের কোনরূপ অযত্ন করা তাহার স্বভাব নহে এই পড়িহারি শব্দটী প্রহরী শব্দের অপভ্রংস অনুমানে বুঝিলাম এবং সন্ধানে জানিলাম যে ৺জগন্নাথ দেবের সেবকমণ্ডলীর এইরূপ নাম আছে এবং তাঁহারাই পাণ্ডা নামে অভিহিত। শ্রীসদাশিব মিশ্রের প্রণীত "জগন্নাথ মাহাত্ম্য" পুস্তকে লিখিত আছে

১। পাণ্ডা নিয়োগ ইহারা ঠাকুরের পূজা করেন।
২। পশু পালক নিয়োগ বা পুষ্পপালক ইহারা বেশ করিয়া থাকেন।
৩। সুপকার নিয়োগ ইঁহারা পাক কার্য্য করেন।
৪। প্রতিহারী বা প্রহরী নিয়োগ ইহারা বাহিরের দ্বার রক্ষক।
৫। খুন্টিয়া ইহারা মন্দিরের ভিতরের কপাট রক্ষক।
৬। গড়াবড়ু ইহারা জল বাহক।
৭। বিমানবড়ু ইহারা দেবতাদের বহন করেন।
৮। দয়িতা ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্ত্তন কার্য্য করেন।
৯। বিদ্যাপতি নিয়োগ ইহারা বিদ্যাপতি বংশীয়, দয়িতাদিগের সহিত সমস্ত কার্য্য করেন ও মধ্যে মধ্যে পূজাও করেন।
১০। ভিতর ছোট নিয়োগ ইহারা ভিতরের দ্বার বন্ধ করেন।
১১। সেকাপ ইহারা মন্দিরের যাবতীয় পদার্থের রক্ষক।
১২। তটাউ ইহারা মন্দিরের যাবতীয় কার্য্যের লেখক।

১৩। দেউল করণ ইহারা আয়ব্যয় লেখক।

১৪। উড়িষ্যার রাজনিয়োগ ইহারা স্নান যাত্রা প্রভৃতি সময়ে কার্য্যাদি করেন।

১৫। মুদিরথ নিয়োগ ইহারা রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করেন।

শিঙ্গরী ইহারা শিঙ্গার বেশ করেন।

এইরূপ প্রায় ৩৬ ঘর পাণ্ডা দেবতার সেবার নিযুক্ত আছেন। আমরা পাণ্ডাঠাকুরের সহিত শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিতে দেখিতে কতকগুলি অশ্লীল ছবিও দেখিলাম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত; কেহ বলেন বৌদ্ধগণ মন্দির প্রবেশ করিয়া কোনরূপ উপদ্রব না করে এই জন্য ঐরূপ নানা প্রকার অশ্লীল ছবি দেওয়া হইয়াছে। আবার কেহ বলেন যে বজ্র পতন ভয় নিবারণ জন্য এই সব ছবি দেওয়া হইয়াছে কারণ অগ্নি পুরাণে ১০৪ অধ্যায় দেখা যায়

অধঃ শাখা চতুর্থাংশে প্রতিহারৌ নিবেশয়েৎ।
মিথুনৈ রথ বল্লিভিঃ শাখা শেষং বিভূষয়েৎ॥

[illegible]কায়াং "বজ্রপাতশঙ্কয়া ইন্দ্রাণ্যাদ্যাবন্ধাদেয়া"

কেহ বলেন যে বাহিরের শিল্প বিন্যাস দর্শকগণের একটী পরীক্ষা স্থল। অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে মন স্থির করিয়া এই বাহিরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইতে মনকে দূরে লইয়া যাইতে পারিলেই ভিতরে ভগবদ্দর্শন হইবে। কেহ কেহ বলেন বাহিরে কেবল জগতের চিত্রই দেখান হইয়াছে ভালমন্দ জীব জন্তুও সৃষ্টির কার্য্য দেখান হইয়াছে। সৃষ্টি স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে না হইলে হয় না তাই মন্দির গাত্রে এই স[ব] ছবি ইহার পর যাঁহারা সংসার মায়াতে বদ্ধ না হই[য়া] উচ্চ স্তরে উঠিলেন তাঁহারাই ভগবানের দর্শ[ন] পাইবেন ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে স্থানে দুই এক[টী] অর্দ্ধ ভগ্ন মূর্ত্তি দর্শনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম [যে] দুরন্ত কালাপাহাড় এই সকল মূর্ত্তি ধ্বংশ করিয়াছিল। কালাপাহাড় ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে সুল[তান] দায়ুদের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসেন এব[ং] রাজা মুকুন্দ দেবকে নিহত করিয়া জগন্নাথ দেবকে পোড়াইবার চেষ্টা করিলে পাণ্ডারা ঠাকুরকে লইয়া চিল্‌কাহ্রদে লুকাইয়া রাখেন, কিন্তু কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া সেখান হইতে জগন্নাথ দেবকে আনিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে আদেশ দেন বেসর মহন্তি নামক কোন পাণ্ডা সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন, তৎপরে কোন নিভৃতস্থানে তাহা হইতে ব্রহ্মমণিবাহির করিয়া কুজং দুর্গাধিপতি খাণ্ডায়তের নিকট অতিযত্নে রক্ষা করেন। এইরূপে বিংশতিবর্ষকাল শ্রীমন্দির শূন্য ছিল শেষে খুরদার রাজা রামচন্দ্রদেব নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা নবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত মনি আনাইয়া স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল বিস্তৃতভাবে লিখিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিতে চাহি না কারণ আজকাল অনেকেই হাওয়া খাইতে সমুদ্রতীরে আসিয়া পুরী দর্শন করিয়াছেন এবং নানা প্রকার তীর্থ ভ্রমন কাহিনী ও জগন্নাথ মাহাত্ম্য পুস্তকাদি পাঠে এখানকার ইতিহাস বিশেষভাবে অবগত আছেন। আমরা এখান হইতে পাণ্ডার নিকট সফলাদি লইয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সকালের ট্রেণে রওনা হইয়া বেলা ১২ টার সময় ৺ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে

পৌছিলাম। তথা হইতে ২ খানি গোশকট চারি য়ানা হিসাবে ভাড়া করিয়া শ্রীমন্দির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। ষ্টেশন হইতে মন্দির দুই ক্রোশ মাত্র। রাস্তাটী পাকা বাঁধান মধ্যস্থলে প্রায় অর্দ্ধ-পথে একস্থানে কতকগুলি শিবমন্দির আছে এবং একটী কূপ আছে, যাত্রীগণ তথায় নামিয়া দর্শনাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন। আমরা যথা সময়ে বিন্দুসরোবর তীরস্থ আমাদের পাণ্ডা শ্রীভাগীরথী বড়ুর বাসা বাড়িতে পৌছিলে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন মকদুম পাণ্ডা আমাদের বিশেষ যত্নসহকারে আশ্রয় দিলেন এবং কহিলেন যে অদ্য বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে আপনারা স্নান করিয়া আসুন আমি আপনাদের জন্ম প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া আনি। আপনারা অদ্য কেবলমাত্র ভগবান দর্শন পাইবেন পূজাদি দেওয়ার সময় উর্ত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য পূজাদি দিবেন আমরা তাঁহার উপদেশ মত বাসাতে দ্রব্যাদি রাখিয়া বিন্দু সরোবর স্নানার্থে গমন করিলাম। এই সরোবর প্রকাণ্ড চতুর্দ্দিকে প্রস্তর মণ্ডিত বাঁধা ঘাট, ইহার উত্তর দিকের নাম গোদাবরী দক্ষিণদিকের নাম ত্রিশুর, পূর্ব্ব মণিকর্ণিকা ও পশ্চিম বিশ্রাম ঘাট বলিয়া কথিত মনিকর্ণিকা ঘাটের উপর অনন্ত বাসুদেবের মন্দির তন্মধ্যে কৃষ্ণবলরামের সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত, এই মন্দির বহুদিনের নির্ম্মিত, ভুবনেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়াই শুনিলাম। বলদেবের মস্তকের উপর অনন্তদেবের সহস্র ফনা ছত্ররূপে বিরাজিত এই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণ ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া যায়। বিন্দুসরোবর হিন্দুর একটী প্রধানতীর্থ, বিন্দু বিন্দু করিয়া সকল তীর্থের বারি দ্বারা এই সরোবর পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থের স্নান ফল হয়। পদ্ম-পুরাণে উক্ত আছে

বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতন্তু পিনাকিনা।
বৃজিনং হরমে সর্ব্বং বিন্দুসাগরতেনমঃ॥

এই মন্ত্রে সরোবরে স্নান করিতে হয়। ভারতে যেমন চারিধাম তেমনি চারিটী সরোবর উত্তরে মানস সরোবর দক্ষিণে পম্পা সরোবর পশ্চিমে দ্বারকায় নারায়ণ সরোবর পূর্ব্বে বিন্দু সরোবর, এই সকল সরোবরে স্নান তর্পণ ও পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ভগবতী বিন্দুবাসিনী এই সরোবর তীরে দুষ্ট অসুর দ্বয়কে পদদলিত করিয়া বধ করেন। তাঁহার পদরেণু এইস্থানে পতিত হওয়ায় এবং ত্রিপুরারী বিন্দুবাসিনীর নাম চির স্মরণীয় করিবার জন্ম এই সরোবরের নাম বিন্দু সরোবর রাখিয়াছেন। শুনা যায় এই সরোবর মধ্যে কয়েকটী কুয়া আছে তাহা হইতে সর্ব্বদাই জল উত্থিত হয় যাহা হউক আমরা এই সরোবরে স্নান তর্পণ ইত্যাদি যথাক্রমে সমাপন করিয়া ভুবনেশ্বর দেব দর্শনে যাত্রা করিলাম। সরোবরের দক্ষিণের রাস্তা দিয়া অল্প দূরে আসিলেই ভুবনেশ্বর দেবের বৃহৎ মন্দিরের সিংহদ্বার। এই স্থানের নাম একাম্রকানন এবং দেবতার নাম ত্রিভুবনেশ্বর বা একাম্রনাথ কিন্তু আজকাল ভুবনেশ্বর বলিয়াই অভিহিত। আমরা সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম; সম্মুখে "অরুণ-স্তম্ভ" তৎপরে ভোগ মন্দির তাহার পর মূল মন্দির স্তম্ভের বামদিগে গনেশজীর একটী ছোট মন্দির এবং প্রাঙ্গণের চারিধারে যে কত দেব দেবীর ছোট বড়

মন্দির দেখিবার আছে তাহা বর্ণনাতীত। ৺ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির ১৬০ ফিট উচ্চ এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির ভরতে আর আছে কি না সন্দেহ; শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। এক সময়ে আমাদের দেশ যে শিল্পকার্য্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এই মন্দির দেখিলে তাহা সপ্রমাণ হয়। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান ত্রিভুবনেশ্বর দেবের সুবৃহৎ লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। প্রায় ৮ ফিট ব্যাস বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তরের গৌরীপট্টের উপর অসমান লিঙ্গভাগ প্রায় ৮ ইঞ্চি উর্দ্ধ দুইভাগে বিভক্ত, পাণ্ডারা বলেন যে হরগৌরী একসঙ্গে মিলন, বাস্তবিক একদিক কৃষ্ণবর্ণ এবং একভাগে শুক্লবর্ণ; আমরা যথাসাধ্য ভগবানের পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মন্দিরের বাহিরের মূর্ত্তিগুলি দেখিতে লাগিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাহিরের সকল দেব-দেবী গুলির অবস্থা অতি শোচনীয়; কাহার মস্তকে যে ফুল জল পড়ে এরূপ বোধ হয় না তবে প্রত্যেক দ্বারেই একজন পাণ্ডা পয়সা আদায় করিয়া থাকেন। আমরা যথাক্রমে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম ও পাণ্ডাঠাকুর প্রদত্ত প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এখানেও জগন্নাথের ন্যায় প্রসাদ বিক্রয় হয় এবং মহাপ্রসাদ বলিয়া সমান ভাবে আদৃত। আমরা আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া পরে দেবী পাদহরা সরোবর কেদারকুণ্ড জগন্নাথদেবের মন্দির প্রভৃতি সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই স্থানের ২ ক্রোশ দূরে উদয় গিরি ও খণ্ড গিরি নামিত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে তাহাতে কয়েকটী গুহা আছে তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন, এখানে উদয়গিরি পর্ব্বত কাটিয়া তাহার মধ্যে বৃহৎ একটী বাটী প্রস্তুত করিয়াছে দেখিলে মোহিত হইতে হইবে। অস্তগিরিতে অনেকগুলি গুহা আছে। তাহাতে অনেকগুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে ও কয়েকটী কুণ্ড ও আছে যাহা হউক এ সকল শোভা ও প্রাকৃতিকভাব দর্শনে মন ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। এই উদয়গিরি ও খণ্ড গিরি দর্শনের যাতায়াতের গাড়িভাড়া ১৲ টাকার বেশী নহে আমরা ভুবনেশ্বরের বাসায় রাত্রিতে অবস্থান পূর্ব্বক পর দিবস সকালে পুনরায় স্নানান্তে ভগবান দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া বাসায় আসিয়া প্রসাদ পাইয়া বেলা ১১ টার মধ্যে গোযান করিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া পুরী হইতে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিল তাহাতে উঠিয়া পরদিবস ভোর ৫ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম তিন চারি দিবস বিশ্রামের পর পুনরায় ১২ই ফাল্গুন তারিখে ৺চন্দ্রনাথ দর্শণে ধর্ম্ম প্রাণ পাণ্ডা হর কিশোর অধিকারী মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ পত্র লেখার দরুণ ৺শিব চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বে যাইতে বাধ্য হইলাম। শিব রাত্রির সময় তথায় খুব যাত্রীর ভীড় হয় এবং ট্রেনে স্থান হওয়া কঠিন। আমাদের বন্ধু প্রবর ষ্টীমার কোম্পানির চাঁদপুরের আফিসের বড় বাবু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথদে মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে আমাদের জন্য একখানি ইন্টারক্লাস কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া রাখেন এবং আমরা রাত্রিতে চাঁদপুরে পৌছিবামাত্র তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া পরম যত্নে আহারাদি করাইয়া আমাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার সে সৌজন্যতা আমার জীবনে ভুলিব না। ভগবান চন্দ্রনাথ তাঁহাকে ও তাঁহাতে পরিবার বর্গকে সুখে রাখুন এই প্রার্থনা করি।

ক্রমশঃ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ডাক্তার

৩।১।৩ এ, আনন্দ লেন,
শ্যামপুকুর কলিকাতা।

হিন্দু।

তন্ত্রী তোমার ছিন্ন যন্ত্রী তপোবন বুঝি শুব্ধ,
নহিলে কোথায় উদ্‌গীথ রব সামের মধুর শব্দ?
ধর্ম্মের ধ্বনি নীরব আজিকে, কাঁদে সকরুণে কর্ম্ম।
চতুর্ব্বর্গ সাড়া হীন ঠিক যেন প্রাণ হীন চর্ম্ম।
মহাকালস্রোতে যেতেছে ভাসিয়া
মহিমা তোমার সর্ব্ব।
ভুলিয়াছ, ছিল গরিমায় তব খর্ব্ব নিখিল গর্ব্ব।
হয়েছে আত্মবিস্মৃতি তব জগৎ ভোলেনি' কিন্তু
তুমি যে অনাদি জ্ঞানের মালিক শাশ্বত মহাহিন্দু॥
হৃদয় তোমার স্বচ্ছ-উজল বিজ্ঞান আলো স্পর্শে,
ধরার আঁধার ঘুচেছিল ওগো? তব উন্নতি দর্শে।
যদিও প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় শুষ্ক স্নেহের বিন্দু।
উচ্চ তবুও বিশ্বের মাঝে তুচ্ছ নহ ত' হিন্দু।
শতেক ঝঞ্ঝা শত পিপ্লবে টলে নি কেশের গুচ্ছ।
এ জগতীতলে নৈতিক বলে তুমি যে সবার উচ্চ।
তোমারি কীর্ত্তি বিশ্ব-প্রথিত ভুলেছ কি ও গো হিন্দু
তোমারি যে কোন পূর্ব্ব পুরুষ—
পান করেছিল সিন্ধু॥

চার্ব্বাক আদি নাস্তিক মত করিয়া এসেছ তুচ্ছ।
বেদান্ত তব অদ্বৈতবাদে বিতরে কিরণ উচ্চ।
সাংখ্যে কপিল ধরিল পুরুষে করিয়া বিহীন কর্ম্ম।
জগতের কাছে বুদ্ধ নিমাই ধরেছিল তব ধর্ম্ম।
বিশ্বামিত্র দেখাল বিশ্বে সাধনায় বলী শক্ত।
গুরুর নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে কর্ণ মাখিল রক্ত।
ধায় প্রভাকর রাবণ হুকুমে আবরিতে পুনঃ ইন্দু।
কর্ম্মের ভেরী থেমে গেল কেন
জগতে তোমার হিন্দু॥
দেখাল নিজের আত্মার বল বশিষ্ঠ হয়ে নিঃস্ব,—
পুত্রহত্যা-প্রতিশোধে ক্ষমা চমকে সারাটী বিশ্ব।
ভিক্ষুণী নিজে বিবসনা হয়ে হাসি মুখে দিল বস্ত্র।
দধিচির দান অমৃত মধুর অমরের সেরা শস্ত্র।
তাদের বংশে জনম তোমার ভুলনা এ কথা হিন্দু।
তোমার পূর্ব্ব পুরুষ ছিল যে নিখিল গুণের সিন্ধু।
যদিও সে যশ হয়েছে লুপ্ত তথাপি তাহার বিন্দু
একদিন তব উদয় অচলে টানিয়া আনিবে ইন্দু॥

ভারতী—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।
মহেশপুর—যশোহর।

১৪ই চৈত্র ১৩২১ সাল

সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা অনুশীলন এবং ঐ সকল ভা লিখিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতব অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজী প্রভৃতি দেশীয় নব্য প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ ও তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাবসমূহের লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদে শ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার অর্থসাহায্য প্রদান।

৫। উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নি মিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্র বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্তৎ-উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

শ্রীচুণীলাল বসু

সাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা পুস্তকালয়।—

প্রাতে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্য সর্ব্ব সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এখানে বসিয়া পাঠ করিবার জন্য ভাল চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলো সুবন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি অনেকগুলি নূতন উপন্যাস ক্রয় করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পুস্ত ও উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাহিত্য সভার সভ্যগণকে এবং সর্ব্বসাধারণকে পুস্তকাদি পাঠ করিব জন্য—সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।—

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

লাইব্রেরীয়ান।

সাহিত্য-সংহিতা।

সাহিত্য সভার মাসিক পত্রিকা।

নবম খণ্ড।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩১৫

কলিকাতা।

১২নং শিমলা ষ্ট্রীট্ বাই-লেন

কবিরত্ন যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫ সালের সাহিত্য-সংহিতার

সূচীপত্র।

প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ "কোহিনূর"। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য অতি মনোহর। তেমনি যত কেশতৈল আছে—তার মধ্যে সুরমা যেন কোহিনূর। কেননা, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয়, আর চিত্তভৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন স্বীকার করি, কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদক কি না? রমণীর কমনীয় কেশকলাপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কি না? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলনীয় কোহিনূর।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৴৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶৹ চৌদ্দ আনা।

সর্ব্বজন-প্রশংসিত আমাদের নূতন এসেন্স।

রজনী-গন্ধা।—রজনী গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ কোমল। এই কোমলতাই রজনীগন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী।—'সাবিত্রী' সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ।—আমাদের 'সোহাগ' এসেন্স,

মিলন।—মিলনের সুবাস মিলনের মতই মনোরম।

গন্ধরাজ।—সত্যসত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

মতিয়া।—আমাদের মতিয়ার সৌরভে বিলাতী জেস্‌মিনের গৌরব পরাজিত হইয়াছে।

রেণুকা।—আমাদের 'রেণুকা' বিলাতী কাশ্মীরী বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

পারিজাত।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ!

মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

হোয়াইট্ রোজ।—নামের অনুবাদ করিলেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আমাদের "শেউতি গোলাপ"।

কাশ্মীর কুসুম।—কুঙ্কুম বা জাফরান ইহার মূল উপাদান, আর অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ।৹ আট আনা। প্রিয়-
জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২।৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা।
ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার
আনা, ডাকমাশুল ।/৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ।৹ আট আনা। মাশুলাদি ।/৹ পাঁচ আনা।
আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয়
পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

রৌপ্য-পদক পুরস্কার।

যিনি সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় "পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য-রক্ষা" ও "বঙ্গদেশে যক্ষ্মা ও বহুমূত্র রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ ও তাহার প্রতিষেধ" এই দুই বিষয়ের মধ্যে একটী বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, সাহিত্য সভা হইতে তাঁহাকে একটী রৌপ্য-পদক পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ১৩১৫ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে প্রবন্ধটী সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

সাহিত্য-সভা কার্য্যালয়।
১০৬।১ নং গ্রে-ষ্ট্রীট।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

হিন্দুর পুনরুত্থান।

প্রথম প্রস্তাব।

মাননবর সভাপতি এবং সভ্যমহোদয়গণ!*

অদ্য একটি গুরুতর, অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিষয় লইয়া আমি বিনীতভাবে আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম "হিন্দুর পুনরুত্থান।" মহোদয়গণ! নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই, যে হিন্দুজাতি একদা সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের সভ্য সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ভূতলে অতুল হইয়াছিলেন, যে হিন্দুজাতির কৃপা-কটাক্ষ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া কত অগণ্য জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল, যে হিন্দুজাতির ধনে, ধর্ম্মোপদেশে, জ্ঞানে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশ ধনী, জ্ঞানী, সভ্য, শিক্ষিত ও ধর্ম্মতত্ত্বাভিজ্ঞ হইয়াছিল, আজি আমাদিগকে সেই প্রাচীন, পরাক্রমী এবং সনাতন ও সমুন্নত আর্য্য হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ লইয়া প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করিতে হইতেছে। যে হিন্দুজাতি সমুদয় জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল কারণ, যে হিন্দুজাতির ধনবলে, জনবলে, জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে বিশ্বমণ্ডল বলীয়ান্, সেই বীরাধিক বীর, ধার্ম্মিকাধিক ধার্ম্মিক, পণ্ডিতাধিক পণ্ডিত এবং দেবসমতুল্য হিন্দুর পুনরুন্নতির প্রসঙ্গ আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। হা হতোস্মি! কালে সকলই হয়! "হিন্দুর পুনরুত্থান" এই শব্দদ্বয় শ্রবণ মাত্রেই মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। জাগতিক কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে; যাহা কিছু সাংসারিক, তাহাই পতনোন্মুখ। হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, ধন, জন, যৌবন, সম্ভ্রম, অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতি নলিনীদলগত জলবৎ তরল। এত বড় বীর, এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী, এত বড় পুরাতন ও পরাক্রমী এবং এত বড় সমুন্নত ও সুশিক্ষিত জাতির যখন পতন হইয়াছে, তখন এই মায়াময় সংসারধামে কোন্ বিষয়টাকে নিত্য ও স্থায়ী বলা যাইতে পারে? হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে, মনোমধ্যে ঘোরতর বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনিত্য সংসারের সমুদয় বস্তুকে উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে ইহাও বুঝিতে পারি, ইহলোকের যাহা কিছু তাহাই অনিত্য, কিন্তু সেই পরমারাধ্য পরাৎপর পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য ও শাশ্বত। তিনি কোটি কোটি

* কাশীধামস্থিতা "তত্ত্বালোচনী সভা"র বার্ষিক

কল্প পূর্ব্বেও যেমন, অদ্যও তেমনি এবং অনন্ত

কালও তদ্বৎ; সুতরাং একমাত্র তিনিই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর ও মায়া-মরীচিকার সমতুল্য।

মহোদয়গণ! আমি অদ্যকার সভায় যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহার নামে দুইটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "হিন্দু" এবং "পুনরুত্থান।" শেষোক্ত শব্দটি অর্থাৎ "পুনরুত্থান" শব্দটির অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পুনর্ব্বার উত্থান। একবার উত্থান ও পতন না হইলে "পুনরুত্থান" শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। রাধানাথ ভট্টাচার্য্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন—এইরূপ বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে, রাধানাথ ভট্টাচার্য্য অশ্বপৃষ্ঠে উত্থান করিয়াছিলেন, তাহার পরে ঘোড়ার পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন। উত্থান না হইলে পতন হয় না, সুতরাং হিন্দুরও একদা উত্থান হইয়াছিল ইহাই নিশ্চিত বাক্য। কিন্তু কেবল "উত্থান হইয়াছিল" বলিলেই যথেষ্ট হয় না; হিন্দুর পতনও যেমন বিস্ময়কর, উত্থানও তেমনি কেবল বিস্ময়কর নহে, পরন্তু বিস্ময়কর হইতেও বিস্ময়কর। এমন আশ্চর্য্য উত্থান ও এমন অপূর্ব্ব পতন, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে কখন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অনেকে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রাচীন হিন্দুর কোন্ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল? পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য জাতির শাস্ত্র ও সাহিত্যে ইহার সুস্পষ্ট উত্তর লিখিত আছে। সমগ্র সংসার, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুর অসাধারণ উন্নতির অকাট্য সাক্ষী। প্রাচীন হিন্দুজাতি যে কোন্ বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন নাই, তাহা জানি না; এমন কোন বিষয়ের কল্পনাও হয় না, যে বিষয়ে পুরাতন আর্য্য হিন্দু অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করেন নাই। কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ন্যায়, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র; বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষি, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, সংগীত, রাজনীতি, সমরনীতি, চিকিৎসা, বীরত্ব, সাহস, ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভগবৎ সেবা, চরিত্রবল, যোগ, ধ্যান, ধৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য্য, পরিব্রজন, দয়া, সহানুভূতি, বদান্যতা ক্ষমা, সত্যপরায়ণতা, স্পষ্টবাদিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য গুণে হিন্দু একদা ভূতলে অতুল ছিলেন।

হিন্দুর তুলনা হিন্দু অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

এইজন্য শ্রীশ্রীমৎ বিষ্ণুপুরাণ শাস্ত্রের মহানুভব মহর্ষি লিখিয়াছেন, পূর্ব্বজন্মের অপরিমিত পুণ্যবল না থাকিলে মানুষেরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না—এবং ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনাবলে সিদ্ধ না হইলে পুনর্জ্জন্মে হিন্দুকুলে কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। ভবধাম হইতে অন্তর্দ্ধান হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে মহিয়সী মাদাম্ ব্লাভাটস্‌কি বলিয়াছিলেন Blessed be the man who calleth himself a Hindu অর্থাৎ ধন্য সেই মানব, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। মহোদয়গণ! এই জন্যই হিন্দুর হিন্দুয়ানী এত পবিত্র ধন এবং এত আদরের বস্তু। এই জন্যই হিন্দুস্থানের এত গৌরব ও এত সৌরভ। এই জন্যই প্রকৃত হিন্দু সন্তান তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রাণপণ যত্ন করেন। বাস্তবিক, ভারতভূমি যেমন পুণ্যভূমি, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করাও তেমনি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে এবং পুণ্যকুল হিন্দু কুলেই কেবল আদর্শ মানব ও আদর্শ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং এই কুলেই অসংখ্য অসংখ্য আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যদেহে দেবত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অতঃপর যদি আর কখন আদর্শ মানব

জন্মগ্রহণ করেন—একাধারে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও সম্পূর্ণ দেবত্ব লইয়া মহাদর্শ জন্মগ্রহণ করেন—তাহা হইলে তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হিন্দুকুলেই জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য; সুতরাং সুপবিত্র হিন্দুকে যে কেহ হিন্দুয়ানী হইতে স্বতন্ত্র করিতে চায়, সে ব্যক্তি আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির পরমশত্রু, ইহা নিশ্চয়।

মহোদয়গণ! গ্রাম্য ভাষায় একটা পুরাতন প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, লোকে বলিয়া থাকে, "যাহার গা শুদ্ধ ব্যথা, তাহার ঔষধ দিব কোথা?" অর্থাৎ যে রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক অংশ রোগগ্রস্ত এবং ব্যথায় ব্যথিত, তাহার শরীরের কোন্ অংশে ঔষধ দেওয়া হইবে আর না হইবে তাহা চিকিৎসকেরা সহজে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের অধঃপতিত হিন্দুর অবস্থা ঠিক তাই; এখনকার হিন্দু সকল বিষয়েই পতিত, সকল বিষয়েই ভাগ্যহীন এবং সর্ব্বত্রই হীনাদপি হীন বলিয়া গণ্য। জনশ্রুতি আছে, এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী দেবীর পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদিত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছিল "হে মা পতিতপাবনী! হে মা দুঃখহারিণী! এই পৃথিবীতে আমার তুল্য আর কেহ দুঃখী নাই। আমার সকল বিষয়েই কষ্ট এবং সর্ব্ববিষয়েই অভাব। আমার অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, জলকষ্ট, চাকুরীর কষ্ট, ছাতাকষ্ট, জুতাকষ্ট, বাসভূমির কষ্ট, গামোছার অভাব, উড়ানীর অভাব, এমন কি পৈতাগাছটির অভাব পর্য্যন্ত আমি ভোগ করিয়া থাকি, অতএব হে মা! তুমি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার সর্ব্ব কষ্ট ও সর্ব্ব অভাব দূর কর।" সভ্য মহাশয়গণ! আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান হিন্দুর কষ্ট ও অভাব ঠিক এইরূপ, কিন্তু এগুলি সাংসারিক অভাব; ধর্ম্ম জগতে যাহা কিছু অভাব বলিয়া বোধ হয়, হিন্দুর সে অভাবও চূড়ান্ত পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুর পতন অত্যন্ত বিস্ময়কর ও নিতান্ত বিষাদজনক। হিন্দু যেমন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তেমনি অতি নিম্নে পতিত হইয়া গিয়াছে। এখন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই হিন্দুর পুনরুত্থানের আর কি আশা ভরসা আছে? আশা ভরসা আছে কিনা তাহারই মীমাংসা করিবার জন্য অদ্যকার সভায় আমি উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং এই প্রসঙ্গটি প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আলোচনার যোগ্য। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, প্রাচীন ভারতের যদি কোন ঋষি, রাজা, বীর, পণ্ডিত, যোগী, মুনি অথবা অন্য শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন; পুরাতন ভারতের যে কোন লোক যদি আমাদের এখনকার এই ভারতবর্ষে আসিয়া পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতে বাধ্য হইবেন, ইহাতো সে ভারত নয়! ইহাতো আমাদের সমসাময়িক পুণ্যভূমি ভারতভূমি নয়! ইহাতো ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি, জ্ঞানভূমি, ঐশ্বর্য্যভূমি ভারতভূমি নহে! কোথায় আসিলাম! ইহা কি সেই জগন্মান্য দেবকুলবাঞ্ছিত ভারতবর্ষ? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্মকল্পদ্রুম যুধিষ্ঠির যাহার নরপতি; ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতি যাহার বীর; কালিদাস, বাণভট্ট, বেদব্যাস, বাল্মীকি, ভারতী প্রভৃতি যাহার কবি ও লেখক; মহাভারত ও রামায়ণ যাহার কাব্য; বেদ ও বেদান্ত যাহার ধর্ম্মশাস্ত্র; চরক সুশ্রুতাদি যাহার বৈদ্যগ্রন্থ; দধীচি মুনি প্রভৃতি যে দেশে আত্মোৎসর্গের অতুল দৃষ্টান্ত; হরিশ্চন্দ্র, বলি, কর্ণ, প্রভৃতি যে দেশে দাতার দৃষ্টান্ত, ভরত মুনি যাহার সঙ্গীতাচার্য্য; কণাদ, কপিল প্রভৃতি যাহার

দার্শনিক, শতঘ্নী ও সুদর্শনচক্র যাহার অস্ত্র, হরধনু যাহার ধনু, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রান্তর যাহার যুদ্ধের মাঠ, শত অক্ষৌহিণী সেনা যাহার রক্ষক, যে দেশের কন্যাসমূহ সতীত্বে ও বীরত্বে জগতে অতুলনীয়া, ধ্রুব যে দেশে যোগী, প্রহ্লাদ যে দেশে ভক্ত, বাল্মীকি যে দেশে সাধক, কুবের যেখানকার ধনরক্ষক, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষী পণ্ডিত, পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ এবং স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে ব্রাহ্মণরূপে উপদেষ্টা, এই কি সেই পবিত্রাদপি পবিত্র স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ? অহো হতোস্মি! কালের কি বিচিত্রা গতি! কালের কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা! এ সংসারে সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণস্থায়ী, সকলই পতনের দিকে প্রবহমান।

মহোদয়গণ! মানবশরীর যেমন দুইটি ভাগে বিভক্ত, সমাজও তেমনি দুইটি ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশরীরের এক অংশ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অধীন এবং আর এক অংশ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশীভূত। হিন্দুসমাজকে যদি মানব শরীরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে এবং বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত করা যায়। হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়। সমাজ শরীরের, ব্রাহ্মণ বর্ণ মস্তকস্বরূপ। মানুষের হাত, পা, অঙ্গুলি, কটিদেশ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে শক্তিহীন হইলে অথবা অঙ্গুলি প্রভৃতি বিকল হইয়া গেলে তাহার মেধা বা বুদ্ধির উন্নতি পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, অথবা সে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে, সেই পরিমিত জ্ঞানের হ্রাসতাও হয় না, কিন্তু মানুষের মাথা যখন খারাপ হয়, তখন তাহাকে লোকে পাগল বলে; মাথা খারাপ হইলেই সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, উন্নতি সামর্থ্য প্রভৃতি বিকৃত হইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তখন সে ব্যক্তিকে আর কেহ বিশ্বাস করিতে বা তাহার হস্তে কোন গুরুতর কর্ম্মের ভার অর্পণ করিতে অথবা তাহার সহিত পরামর্শ করিতে, এমন কি তাহার সংসর্গে থাকিতে বা তাহাকে সম্মান করিতে, লোকে স্বীকৃত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজ শরীরে ব্রাহ্মণগণ মস্তকস্বরূপ। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু সমাজ অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণ যতদিন প্রকৃত সুবর্ণ থাকে, অর্থাৎ যতদিন বিশুদ্ধ, খাঁটি, নিখাদ সুবর্ণ বলিয়া কোন সুবর্ণ খণ্ড বিবেচিত হয়, তখন সেই সোণার সকলে আদর করে এবং সর্ব্বত্র তাহার যত্ন হয়, কিন্তু সোণাতে যতই খাদ মিশ্রিত হয়, ততই তাহার মূল্য কমে এবং ততই তাহার আদর ও যত্ন কমিয়া যায়; কেবল তাহাই নহে, তাহার ঔজ্জ্বল্যও হ্রাসতা প্রাপ্ত হয় এবং হীনপ্রভ হওয়ার জন্য ক্রমশঃ জঘন্যভাবে মলিন ও দুর্গন্ধ হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা সরল হৃদয়ে বলুন দেখি, বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণগণ খাদে ভরা মলিন সোণার অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন কিনা? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, বৃথা জাত্যভিমান পরিহারপূর্ব্বক, ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া, বুকে হাত দিয়া ব্রাহ্মণেরাই বলুন দেখি, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া "প্রকৃত ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতে পারেন? মাথা বিকৃত হইলে মানুষ পাগল হয়, সমাজের মস্তক স্বরূপ ব্রাহ্মণেরা খারাপ হইয়া গেলে সমাজও খারাপ হইয়া যাইবে, ইহাতো আশ্চর্য্যের কথা নহে। প্রকৃত কথা এই, পর্ব্বতদেহ নিঃসৃতা নির্ঝরিণীর

জল আদিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ, শীতল, সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল থাকে, কিন্তু ঐ জল নির্ঝরিণী হইতে নির্গত হইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ধূলি, কর্দ্দম, আবর্জ্জনা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া মলিন হইতে মলিনতর হইয়া যায়; তখন ইহার স্বাদ, শৈত্য, স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা, স্বাস্থ্যকরতা প্রভৃতি গুণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়, অথবা একেবারে থাকে না। ব্রাহ্মণের অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শ্রেণীর অদূরদর্শী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বৃথা গর্ব্বী এবং লোভী ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, কলিকাতার কালীঘাটের কাটিগঙ্গা বা আদিগঙ্গা যতই শুখাইয়া যাউক, যতই ময়লা ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হউক, ইহার জল যতই অস্বাস্থ্যকর বা ব্যবহারানুপযুক্ত হউক, তথাপি ইহা গঙ্গা! ইহা আদিগঙ্গা! সুতরাং বরণীয় ও মাননীয় এবং পূজনীয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে তর্ক, ব্রাহ্মণে খাটে না। নিরপেক্ষভাবে এবং স্পষ্ট কথায় আমি সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, ব্রাহ্মণের এই বৃথা অহঙ্কারে, এই বৃথা জাত্যভিমানে, ব্রাহ্মণকুল আরও অসার হইয়া গিয়াছেন এবং দিনে দিনে অধিকতর উপহাসাস্পদ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এখনকার কালে এমন সহস্র সহস্র, অধিক কি লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কি নাই, যাহাদিগের দেহ, মন, মস্তিষ্ক, চরিত্র, শিক্ষা, ধর্ম্মবল, হৃদয়, আচার প্রভৃতির অবস্থা দেখিলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রণাম করিতে অস্বীকৃত হয় এবং ঘৃণার সহিত সেই ব্রাহ্মণের সংসর্গকে উপেক্ষা করিতে সম্মত হয়? খাদে ভরা সোণা যেমন যত্ন আদর ও মূল্য হারায়, তেমন তাহার ঔজ্জ্বল্যও হারাইয়া থাকে; ব্রাহ্মণের কেবল মানসিক, ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহাদের দেহের বর্ণ, বল, ঔজ্জ্বল্য, কান্তি ও সাত্বিকতা এত কম হইয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে অনেক ব্রাহ্মণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশোৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমরা সন্দিহান হই। মনুষ্যজাতি চিরকালই গুণের পক্ষপাতী, ব্রাহ্মণ যতদিন বিবিধ গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন বা থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং অবশ্য থাকিবেন ইহা নিশ্চয়, কিন্তু গুণবিহীন হইয়া প্রণাম, সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবার চেষ্টা করিলে কেহ তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, পূজা প্রভৃতি হৃদয়ের জিনিষ; বল প্রকাশ করিয়া কেহ কাহাকে মানাইতে পারে না। তুমি যদি নিজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হও, লোকের মস্তক আপনা হইতেই তোমার সম্মুখে অবনত হইয়া যাইবে, কিন্তু "অহং ব্রাহ্মণ" "আমি ব্রাহ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিলে আজি কালিকার দিনে কেহ কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিবে না ও করে না, ইহা জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় নিত্য সত্য। আমি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন পাপ কেহ কখন করে নাই বা এমন কোন পাপের কল্পনা কেহ কখন করিতে পারে না। অথবা এমন কোন পাপের নাম নাই, যাহা ব্রাহ্মণসমাজে প্রবেশ না করিয়াছে। অথচ ব্রাহ্মণবর্গের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বরং পাপকে প্রশ্রয় দিয়া জাত্যভিমান রক্ষার জন্য এবং সমাজের উচ্চ স্থানকে অধিকার করিয়া থাকিবার জন্য এখনও ব্রাহ্মণগণ নিজের মহাপাপ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, বরং অধঃপতনের দিকে, উৎসন্নের দিকে, নরকের দিকে অগ্রসর হইতে সম্মত। ব্রাহ্মণ যে

কেবল নিজে মরিতেছেন তাহা নহে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রগণকে লইয়াও মরিতেছেন, ইহাই পরম দুঃখ। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, মহতেরা যে কার্য্য করে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, নিম্নশ্রেণীর লোকের তাহা অনুকরণ ও অনুধাবন করিয়া থাকে, সুতরাং দেখুন ব্রাহ্মণের দোষে কেবল ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজ, সমগ্র হিন্দুজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষকে অধঃপতনের দিকে পাঠাইয়া দিতেছেন। অতি দুঃখে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত গাহিয়াছিলেন—

"তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় কর কালো।
আমি বলি, তোমাদের গোঁসাই চেয়ে
কশাই অনেক ভাল॥"

সভ্যমহোদয়গণ! হিন্দুর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ—ব্রাহ্মণের পতন। শাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কি লিখিত আছে, তাহা আপনারা অবশ্য অবগত আছেন; তথাপি দুই একটা শাস্ত্রীয় উক্তির উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহামতি মনু মহর্ষি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহা দেবতা স্বরূপ। "বিদ্যা তপঃ সমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু" অর্থাৎ বিদ্যাতপ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ অগ্নি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) সমতুল্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম
স্বভাবজং॥

মনুসংহিতায় ইহাও লিখিত আছে—

"যং শিষ্টা ব্রাহ্মণাব্রূয়ুঃ সধর্ম্ম
সাদশঙ্কিতঃ।"

মহর্ষি মনু সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্।
পিতা পুত্রৌ বিজানীয়াৎ ব্রাহ্মণস্তু
তয়োঃ পিতা॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্ক হয়েন, আর ক্ষত্রিয় যদি শত বর্ষ বয়স্ক হয়েন, তথাপি উভয়ের মধ্যে মান্য বিষয়ে পিতা পুত্রের ন্যায় পৃথক্ জানিতে হইবে। সভ্যমহোদয়গণ! তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখুন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের কতদূর সম্মান এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের আসন কত মহান্। রামায়ণে লিখিত আছে, অর্দ্ধ শত হস্ত দূর হইতে দেখিলে ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিয়া লওয়া যায়। পুরাণকারেরা বলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলে অর্দ্ধ ঈশ্বর দর্শনের ফল হয়। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে, যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্ব আদৌ নাই, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ নহে, পরন্তু চণ্ডাল অপেক্ষা অধম এবং অস্পৃশ্য। মহাশয়গণ! এইরূপ ব্রাহ্মণের দ্বারাই হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণের পাপেই সমগ্র হিন্দু সমাজ মহা কুফল ভোগ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্য পূজ্য—চির পূজ্য—চির শ্রদ্ধেয়; কিন্তু বলুন দেখি, তাঁহাদের সংখ্যা কয়জন?

হিন্দুর পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি নিজে নিজে ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে সংশোধনের আশা ভরসা কোথায়? ব্রাহ্মণগণের এ বিষয়ে যে আদৌ চেষ্টা নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। দিনে দিনে, উত্তরোত্তর, ব্রাহ্মণের উন্নতি বা সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের বিবেচনায় ব্রাহ্মণগণ যেন অধিকতর জঘন্য হইয়া যাইতেছেন। সমস্ত দেশ—সমস্ত হিন্দু জাতি—তাঁহাদের

অবনতি ও অপরাধের কথা লইয়া বারংবার আলোচনা করিতেছেন, তথাপি ব্রাহ্মণবর্গের মোহনিদ্রা কিঞ্চিৎ মাত্র ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণগণ অবনত হইয়াছেন বলিয়া, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গলা কাটিয়া দিলে মানুষ যেমন বাঁচে না, ব্রাহ্মণগণেরও উন্নতির পথ বন্ধ হওয়ায় অপর তিন বর্ণও অসার হইয়া পড়িতেছেন, কারণ সমাজের শীর্ষস্থান কলঙ্কিত হইলে অপর সমুদয় স্থান কলঙ্কিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। ব্রাহ্মণের অধঃপতনের আর বাকি কিছুই নাই। দেখুন, জগন্মান্য, ব্রহ্মবীর্য্যোৎপন্ন, অসাধারণ অপৌরুষেয় সামর্থ্যশালী, সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বগুণের উৎসস্বরূপ, ব্রাহ্মণবর্গ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে এত দূর হীন হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন ভদ্রলোকের ঘরে—অধিক কি নিম্নশ্রেণীর শূদ্রের ঘরেও—"বামুন" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে পাচককে অর্থাৎ রশুইয়াকে স্মরণ হয়। যদি কেহ বলে, "আজ আমাদের ভোজনে সুবিধা হয় নাই কারণ বামুনটা আসে নাই"—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পাচক অর্থাৎ রশুইকারী লোকটা আসে নাই। বামুন এই শব্দটা এখন সর্ব্বত্র বেতনভোগী—দাসত্ববৃত্তি অবলম্বী—ব্রাহ্মণকে বুঝায়; বামুন শব্দটা এখন সর্ব্বত্র রান্নাঘরের ব্যবসায়ী রশুইয়াকে বুঝায়। ইহা অপেক্ষা বামুনের অধোগতি আর কি হইতে পারে? আমি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে পরিব্রাজন করিয়াছি এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অসংখ্য গাড়োয়ান, কলের মুটে, কলের জল তোলা ভারী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের বাটীতে ব্যবহার জন্য গঙ্গাজলের ভারী, জুতার দোকানদার, ফেরিওয়ালা, মাংস-বিক্রেতা, ছুতার, কর্ম্মকার, দর্জ্জী, কশাই, শুঁড়ির দোকানদার, চাপরাশী, আর্দালী, কোচম্যান, বেশ্যার দালাল, আড়তের কয়াল, ডাকঘরের পিয়ন, স্বর্ণকার, পাখির পালক বিক্রেতা, মৃত জন্তুর অস্থি-বিক্রেতা, দপ্তরী, ছাপাখানার কম্পোজিটার, ছাপাখানার প্রেশম্যান্, হাঁসপাতালের ড্রেশার, ঘরের ঝাড়ুবর্দ্দার, মিউনিসিপাল মেথরদের সর্দ্দার, ইংরাজী হোটেলের কেরাণী, ঘোড়ার সহিস, বাজার সরকার প্রভৃতি অদ্ভুত পেশা অবলম্বী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিবাদিত হইয়াছি। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট ও অর্থকষ্ট দূরীকরণ জন্য—বিশেষতঃ সংসারস্থ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালন করিবার জন্য—ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণোচিত ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহাতেও তাঁহাদের নিন্দা করি না—কারণ অসময়ে ও দুঃসময়ে মানুষকে অভাব পূরণ জন্য সকল রকম কাজ করিতে হয়, ইহা সত্য—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সামাজিক বিধি বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া ইংরাজী হোটেলে, মুসলমানের হাতে বা খৃষ্টানের হাতে, অধিক কি ধেড়, চামার মেথর হাড়ী ডোম প্রভৃতির হাতে পাক করা গো-মাংস, শূকরমাংস প্রভৃতি অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া আবার সাধারণ সমীপে গর্ব্ব করিয়া বেড়ান? কোন্ বিধি অনুসারে বাজারের বেশ্যার ঘরে দিবারাত্র যাপন, সুরাপান, অধম পশুবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া আবার "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করেন? কোন্ বিধি অনুসারে রাশি রাশি মিথ্যাকথা, পুনঃপুনঃ জুয়াচুরি, জাল, কৃত্রিমতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে ঘোরতর রূপে অপরাধী হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন? মহাশয়গণ! আপনারা সমুদয় ভারতবর্ষের সেসন্ রিপোর্ট অর্থাৎ লোকসংখ্যার বিবরণী সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, সমগ্র ভারত মহাদেশের মধ্যে প্রত্যেক সত্তর

শত ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ রীতিমত তাহার মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং তের হাজার নয়শত একষট্টি ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, বিগত ত্রিংশ বর্ষকাল মধ্যে প্রত্যেক একলক্ষ ব্রাহ্মণ মধ্যে গড়ে ৩৩ হাজার চারিশত ৭১ জন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। খাস বাঙ্গালায়, অথবা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বামুণের সংখ্যা শতকরা ২২ জন কম হইয়া গিয়াছে। এখন দেখুন, হিন্দুসমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণের দুর্গতি কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদের দুর্মতি কি দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ বিষয়ে ব্রাহ্মণবর্গ এখন আর গৌরব করিতে পারেন? নিরপেক্ষভাবে বলিতে পারি, আজি কালিকার দিনে অসংখ্য শূদ্র, অসংখ্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর; অসংখ্য শূদ্র এখন অগণ্য ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব শিখাইয়া দিতে পারেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক কান্তি, অসাধারণ সামর্থ্য, চরিত্রবল, জ্ঞানবল, যোগবল, ধর্ম্মবল, মানসিক বল, আধ্যাত্মিক শক্তি, এখন আর কোথায়? শত সহস্র মূর্খ, অধার্ম্মিক ও নরকুলের কলঙ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ এক্ষণে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ব্রাহ্মণের মধ্যে যখন এত স্বেচ্ছাচার, অধার্ম্মিকতা, মূর্খতা এবং চরিত্রহীনতা প্রবেশ করিয়াছে, তখন হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের আশা ভরসা কোথায়? মানুষ যখন নিজে নিজে সংশোধিত না হয়, তখন তিন প্রকারে সে ব্যক্তি সংশোধিত হইতে পারে। ১ম—ঈশ্বর দ্বারা। ২য়—রাজা দ্বারা। ৩য়—সমাজ দ্বারা। পরমারাধ্য ভগবান্, যে সকল কারণে এবং যে সকল উপায়ে মানবকে সংশোধিত করেন, তন্মধ্যে প্রধান কারণটির উল্লেখ করিতেছি। মনুষ্য যখন সর্ব্ববিধ উপায়কে অবলম্বন করিয়া পরিণামে হতাশ হইয়া নিরুপায় হয় এবং নিজের চেষ্টা বা অপরের সহায়তা দ্বারা কোন প্রকার সুফলপ্রাপ্ত হয় না, তখন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজের দেহ, মন ও আত্মা ভগবানে পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া এবং তাঁহাকে অগতির গতি ও নিরুপায়ের উপায় ভাবিয়া তাঁহার শরণাগত হয় এবং উদ্ধারের জন্ত আত্মসমর্পণ করে, তখন পরম কারুণিক ভগবান্ তাহার উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা একথা কখনও কি ভাবিয়া দেখিয়া থাকেন? ভাবিয়া দেখা দূরে থাকুক, অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্য্যন্ত করেন না, অনেকে ঘোরতর নাস্তিক ও পাষণ্ড এবং অনেকে গায়ত্রীর অর্থ পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে।* কপটতা, তামসিকতা, কৃত্রিমতা, বৃথা অহঙ্কার, বৃথা জাত্যভিমান, কদাচার, অধার্ম্মিকতা প্রভৃতি যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পাষণ্ডের দিকে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়। দ্বিতীয় উপায়ের নাম—রাজা। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজা বা সম্রাট্ মহোদয় বিদেশীয় জাতির লোক এবং অ-হিন্দু। রাজপুরুষগণ এবং রাজকীয় জাতির লোকেরা বিধর্ম্মী, সুতরাং রাজার দ্বারা ব্রাহ্মণের সংশোধন অথবা হিন্দুসমাজের পুনরুত্থান অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ—সমাজ। আমাদের হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থান যুগাযুগান্তর ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিয়া আছেন। সেকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সহসা বা সহজে ব্রাহ্মণের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণের প্রতি অপর বর্ণত্রয়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে,

ব্রাহ্মণকে অনেকে প্রণাম করেন না এবং ব্রাহ্মণাপেক্ষা আপনাদিগকে কোন মতে হীনতর বলিয়া বিবেচনা করেন না। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্রবর্ণভুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হীনতর ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন, ইহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের দোষ নহে, ইহা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের নিজের দোষ। ব্রাহ্মণ যদি নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরের নিকটে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ মর্য্যাদা নষ্ট করে, তাহা হইলে কে তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারে, অথবা মর্য্যাদা দিতে স্বীকৃত হয়? মহাভারতানুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এবং তাঁহার জননী একত্রভয়ে হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণভক্তি বঙ্গের ঘরে ঘরে বিদিত ছিল, কিন্তু সেই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণের কদাচার ও অধার্ম্মিকতা দেখিয়া পরিণামে এবম্প্রকার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কপটাচারী, স্বেচ্ছাচারী, ভণ্ড ও পাষণ্ড ব্রাহ্মণকে দেখিলেই তাহার মাথার টিকি কাটিয়া লইতেন এবং আল্‌মরার ভিতরে তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহাতে নম্বরওয়ারী টিকিট লাগাইয়া রাখিতেন, ঐ টিকিটে ভণ্ড বামুনের নাম ও অপরাধের পরিচয় লিখিত থাকিত। গদাই ঠাকুর নামে এক বামুনের ঘটনায় সর্ব্বপ্রথম এই নবীন প্রথা অবলম্বন করিতে সিংহ মহাশয় বাধ্য হইয়াছিলেন। এই গদাই ঠাকুরের সম্পূর্ণ কৌতুককর বিবরণ আমার "প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে, আপনারা তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। শুনা যায়, এইরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় প্রায় ৫১ জন ব্রাহ্মণের টিকি কাটিয়া আলমারীর ভিতরে যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কতকগুলির নাম, নম্বর ও অপরাধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। টিকি নং ১৩, অপরাধীর নাম—উমেশ ঠাকুর চূড়ামণি। অপরাধ—যবনী সংশ্রব, যবনীর গৃহে ভোজন এবং পরিণামে তাহার রূপার হাঁশুলি নাম্নী গহনা লইয়া পলায়ন। টিকি নং ১৯, অপরাধী কৈলাস ঠাকুর (তত্ত্বনিধি)। অপরাধ—শুঁড়ীর গৃহে অন্ন ভোজন ও জাল তমশুক লিখিয়া দেওয়া। টিকি নং ২৫, অপরাধ—জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশসাধন। অপরাধীর নাম কানাই ঠাকুর। টিকি নং ২৮, অপরাধী আশু ঠাকুর। অপরাধ—ভয়ানক মিথ্যা কথা দ্বারা সোণাগাছি ও মেছুয়াবাজারের বেশ্যাদিগের স্বর্ণালঙ্কার ফাঁকি দেওয়া। টিকি নং ৩২, অপরাধী গোবিন্দ বিদ্যানিধি। অপরাধ—মন্ত্রশিষ্যের বিধবা কন্যাকে বিপথগামিনী করা। টিকি নং ৩৩, অপরাধী—রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ। অপরাধ—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীধর শিরোমণির সঙ্গে সুরাপান করিয়া গরাণহাটার মোড়ে এক ধোবার বাটীতে চারি দিন অবস্থান এবং তাহার ঘরে অশাস্ত্রীয় মতে ৺ শীতলাদেবীর পূজা করা। টিকি নং ৩৪, অপরাধী—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। সর্ব্ববিধ পাপের সর্দ্দার এবং বিশেষতঃ আদালতে পুনঃ পুনঃ মিথ্যা সাক্ষী দিয়া এখন পেশাদার সাক্ষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অনেক ধনবান্ বড়লোকের বাগানের সঙ্গী ও জলপাত্রের দালাল। সভ্যমহোদয়গণ! আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক করে না; চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া যাহা দেখাইয়া দেওয়া হইল, তাহাই যথেষ্ট। এখন বুঝা উচিত, জগতে মেকি চিরদিন চলে না এবং অত্যাচারীরও একটা সীমা আছে। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, বামুন কালাপাহাড় মুসলমান হইয়া যেমন হিন্দুর

হিন্দুরাণী নাশের জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিল, অসংখ্য ব্রাহ্মণ যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যেমন অগণ্য প্রকারে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, ভারতে ইউরোপীয় প্রাধান্ত স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, খৃষ্টীয় প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাঁহার নিবাস বালীগ্রাম, নাম জগদীশচন্দ্র গাঙ্গুলী, বেগোর গাঙ্গুলী এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান, তিনিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাম রামমোহন রায়। যে সকল খ্যাতনামা হিন্দু, খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশসাধনে সমস্ত জীবন যাপিত করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় এখন যাহা গ্রেট্ ইষ্টারণ হোটেল নামে খ্যাত, সেকালে তাহা D. Wilson's Hotel অর্থাৎ উইলসন হোটেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও অনেকে ইহাকে উইলসনের হোটেল বলিয়াই অভিহিত করেন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এই হোটেলের সর্ব্বপ্রথম বড় বাবু একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে দুইজন বাঙ্গালী, বঙ্গদেশকে ইউরোপীয় জাতির অধীন করিবার জন্ত স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিল, কোন কারণে এই সভায় তাহাদের নামোল্লেখ করিব না। যে সকল পণ্ডিত নবদ্বীপাধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেনকে কৃত্রিম পদ্মপুরাণের কল্পিত শ্লোক শুনাইয়া বলিয়াছিলেন যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগ অথবা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ বঙ্গদেশ মুসলমানের শাসনাধীন হইবে, ইহা বিধির বিধি, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন সেনা, ধন, বিত্ত, বুদ্ধি, পুরুষকার, রাজোচিত কর্ত্তব্য এবং স্বদেশ-প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলায়ন করেন এবং দেশটি মুসলমানের হস্তগত হয়। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। রাজা বল্লাল ও আদিশূরকে কিছু কাল যাঁহারা বৌদ্ধমতের পোষক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। অনেক কষ্টে সেন ও শূরবংশ পুনরায় স্বধর্ম্মে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশ, ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ করিয়া বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। সভ্যমহোদয়গণ! এখন বিচার করিয়া দেখুন, প্রায় সর্ব্বপ্রকার অনাচার ও অনিষ্টের মূলে ব্রাহ্মণ প্রভুই মূর্ত্তিমান্‌রূপে বর্ত্তমান। আবার শুনুন, পঞ্জাবের যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সম্রাট্ আকবরের অন্যতম সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, হিন্দু রাজাদের কন্তাকে বিবাহ করিলে অথবা হিন্দুর রমণীকে বাঁদী বা স্ত্রীরূপে উপহার গ্রহণ করিলে হিন্দুর দর্প খর্ব্ব হইয়া যাইবে, তাঁহার নাম ছিল পণ্ডিত শীউলা প্রসাদ, ইনি ব্রাহ্মণ। বোম্বাই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান একজন ব্রাহ্মণ; মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টান মধ্যে গণ্য এবং আদি খৃষ্টানের বংশ ব্রাহ্মণ। সভ্যমহোদয়গণ! কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ-সমাজ মধ্যে প্রতি এক সহস্র ব্রাহ্মণের সংখ্যায় প্রায় ৯৯৯ জন সারস্বত ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রায় অন্য জাতিকে শিষ্য করেন না। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের রমণীরা অত্যন্ত সুন্দরী এবং বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়া রমণীগণ প্রায় পদ্মীতুল্যা। দুষ্টাভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া সারস্বত ব্রাহ্মণেরা প্রথমে নিয়ম করিল, ক্ষত্রিয় শিষ্যের হাতের তৈয়ারি অন্ন গ্রহণ করিলে দোষ

নাই, কারণ শিষ্যগণ সন্তানসমতুল্য। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সারস্বত ব্রাহ্মণেরা কৃত্রিম শিষ্যের অন্দরে পাক করা অন্ন ভক্ষণ করেন এবং কেবল তাহাই নহে শিষ্যসনে একাসনে অধিক কি এক পাত্রে অন্ন গ্রহণে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপত্তি উপস্থিত করেন না। কেবল তাহাই নহে, পুরুষ শিষ্য হইলে পুত্রবৎ হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক শিষ্য হইলে স্ত্রী সমতুল্যা হইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া লউন, শিষ্যের সঙ্গে এতটা মিশামিশি, এতটা মাথামাথি এবং অন্দরের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতার কারণ কি? কাশ্মীরে ইহা ব্রাহ্মণের নিত্য কীর্ত্তি। আর গুরুগাঁই নামক সেই প্রাচীন ও পাশবীয় প্রথাটা কি পুনরায় উল্লেখ করিতে হইবে? ইহাও কি ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি নহে? বল্লভাচারী বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে, গুজরাট, কাটিয়াগড়, মধ্যভারত, রাজপুতানা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে, স্ত্রীলোক প্রথমবার ঋতুমতী হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ গুরু কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট না হইলে সেই স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর মাথার কেশটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকারিণী হয় না। ইহাও ব্রাহ্মণেরই কীর্ত্তি। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার উপকূল প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, যুবতী স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি যতই সতী হউন না, ইঁহারা ব্রাহ্মণের ভোগ্য এবং যখনই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করেন, তখনই ইঁহারা ব্রাহ্মণের নিকটে প্রেরিত হয়। ইহাও ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি। সভ্যমহোদয়গণ! এতক্ষণ যাহা বলিলাম বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট, পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কলঙ্কের কথা আর অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং ঘৃণার সহিত ইহাকে এই খানেই পরিত্যাগ করিলাম, নতুবা রাশি-রাশি প্রবন্ধ লিখিলেও কুলাচার্য্যদিগের কল-[illegible]

হৃদয়ে হাত দিয়া বলুন দেখি, ভগবানের দিকে তাকাইয়া বলুন দেখি, যদি অণুমাত্রও সত্য, ন্যায়, নিরপেক্ষতা ও ধর্ম্মভাব থাকে, তাহা হইলে বলুন দেখি, ব্রাহ্মণের পাপে কি হিন্দুসমাজ অধঃপতিত হয় নাই? এখনও কি হইতেছে না? ভাবুন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন হিন্দু রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না, ব্রাহ্মণের বেত্রাঘাত দণ্ড হইত না, জেলখানায় ব্রাহ্মণদিগকে কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে হইত না এবং ব্রাহ্মণ-কয়েদীরা ইচ্ছা করিলে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে পারিতেন, কিন্তু গোয়ালিয়র, ইন্দোর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুড়, মহিশূর প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুরাজত্বের শাসনকর্ত্তারা ব্রাহ্মণের ঘোরতর স্বেচ্ছাচার ও জঘন্য চরিত্র দেখিয়া এমনই চটিয়া উঠিয়াছেন যে, এখন হিন্দু রাজার জেলখানায় ব্রাহ্মণের ফাঁসী হয়, বেত্রাঘাত দণ্ড হয়, ঘানি টানিবার হুকুম হয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণকে কেহ আদরও করে না। বলুন দেখি, ইহার পরে আর কি দেখিতে চান? অবনতির আর বাকি কি! এখনও যদি ব্রাহ্মণদিগের চক্ষু না ফুটে, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহকালও নষ্ট, আর পরকালও নষ্ট।

মহাশয়গণ! আপনারা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্রাহ্মণজাতি খারাপ হইল কেন? সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে হইলে, ইহা বলা আবশ্যক, ব্রাহ্মণের হীনতার বহুবিধ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও, তিনটি প্রধান কারণকে আপাততঃ গণ্য করা যায়। ১ম কারণ—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। ২য়—ভারতে ম্লেচ্ছাধিকার; ৩য় কারণ—ব্রাহ্মণের নিজের দোষ।

এখন কথা এই, কিরূপে ব্রাহ্মণের পুনরায় উন্নতি হইতে পারে? কিরূপে [illegible]

সাত্ত্বিকভাব ও সাত্ত্বিক আচার প্রাপ্ত হইতে পারেন ? কিরূপে ব্রাহ্মণের আবার পূর্ব্বকার তেজ, পরাক্রম, শিক্ষা, দীক্ষা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে ? আমি পুনরায় বলি, ব্রাহ্মণ নিজে চেষ্টা না করিলে ব্রাহ্মণের উদ্ধারের উপায় দেখি না। তবে একথা সত্য, সমাজ যদি একমত হইয়া অনাচার ও কদাচার ব্রাহ্মণের শাসন করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের কদাচার ও অপব্যবহার দমিত হইতে পারে। সমাজ যদি সাবধান হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে কোন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাচারী হইবে এবং জঘন্য প্রবৃত্তির অনুযায়ী হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও চরিত্র নষ্ট করিবে, সমাজ তাহাকে কোনমতে প্রশ্রয় দিবে না এবং তাহাকে বিবিধ উপায়ে দমন জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সংশোধন হইতে পারে এবং তাহা হইলে ব্রাহ্মণের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতিরও পুনরুত্থান হইতে পারে। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে হয় না ? সমাজ-বৃক্ষের মূলেও ঘুণ ধরিয়াছে ; এই বৃক্ষে আর সুস্বাদু ও সুরম্য ফল নাই, সুকোমল ও সুদৃশ্য পল্লব নাই, বিবিধ বিমানবিহারী সুকণ্ঠ বিহঙ্গবর্গ আর সুতান ধরে না এবং ইহার ছায়াতেও পরিশ্রান্ত পথিকের আর শ্রান্তি দূর হইয়া শান্তি লাভ হয় না। বস্তুতঃ সমাজের এমনই জঘন্য ও অসার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত মানুষ মরিয়া যায় তাহাতে দৃষ্টি নাই, কিন্তু একটা জঘন্য পুরীষকীট মরিলে অমনি "দেশ গেল, দেশ গেল," "সাধু সাবধান, সাধু সাবধান," "জাগো দেশ, জাগো সমাজ," "পৃথিবী রসাতলে যায়, গেল, গেল, দেশ গেল, জাগো, উঠো" করিয়া ভূতের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতে অথবা পাগলের ন্যায় অর্থশূন্য প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। মনে করুন, এক সচ্চরিত্রঃও সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান, বিলাতে গিয়া, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক যত্নে, কষ্টে ও পরিশ্রমে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে পুনরাগমন করিল। এই ব্যক্তি যেমন সচ্চরিত্র তেমনি সুশিক্ষিত, সদাচার ও সমাজ-হিতৈষী এবং দেশ-হিতৈষী। ইনি ভারতে আসিয়া হিন্দুর দেবদেবীকে মানেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করেন, স্বধর্ম্মের প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকেন এবং সরল চিত্তে হিন্দুধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অকপটভাবে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে প্রবেশের জন্যও বিশেষ অভিলাষী। ইনি কালে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, কমিশনর, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইবেন এবং কালো চামড়া না হইলে বোধ হয় ছোট লাটের সিংহাসনও প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ এক হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ ভদ্রসন্তানের বাটীতে যদি কেহ এক গ্লাস জল খায় অথবা ইহার স্ত্রীর হাতের তৈয়ারী একটা পান খায়, অমনি সমাজ-বনের নেকড়ে বাঘেরা অথবা বরাহ কিংবা কুকুরেরা একেবারে বুক চাপড়াইয়া, চুল এলো করিয়া, গলা ছাড়িয়া দিয়া, চীৎকার করিতে থাকিবে—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! জাগো ভাই জাগো, জাগো ও উঠ, দেশ গেল, গেল, গেল ; আর রক্ষা নাই, রক্ষা নাই ; ভারতকে এবার জাগাইতে হইবে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে আবার জাগাইতে হইবে ; পৃথিবী গেল গেল, আর সয় না ; সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ। ভারত রসাতলে গেল, চন্দ্র সূর্য্য তিরোহিত হইল, বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল এবং হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদিকে ব্রাহ্মণ প্রভু এবং বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভু যে হিন্দুসমাজের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত

নিত্য দুই বেলা চিবাইয়া খাইতেছেন তাহার কি কেহ খোঁজ খবর লয়? সেদিকে তাঁহারা একেবারে চুপ, একেবারে মৌনী ফকির! এদিকে কত শত সহস্র ব্রাহ্মণের বৃহতোদর মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা গরু, কাহন কাহন মুর্গী, আর পণ পণ শূকরমাংসের পিণ্ড, মুচী মেথর ডোম হাড়ী যবন ইত্যাদি কর্ত্তৃক পাক করা খাদ্যাদি প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার কেহ কি খবর লন? ইহাতে হিন্দু সমাজ নষ্ট হয় না, ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু সাধুচরিত, সুশিক্ষিত, বিনয়ী, সদাচার ও স্বধর্ম্মনিরত ভদ্রসন্তান বিলাতে গিয়া লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার ঘরে এক গেলাস জল খাইলে অমনি দেশ নষ্ট হয়, সমাজ নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয়, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নষ্ট হয়, আর সমগ্র বিশ্বমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! কি ধৃষ্টতা! কি ব্যভিচার! কি ভণ্ডামি! কি পাষণ্ডতা! এদিকে শত সহস্র ব্রাহ্মণের পেটে আবকারীর খোলা ভাঁটি ভরা আছে, গায়ের চামড়ার উপরে কোদালি দিয়া চাঁচিলে গণিকা-বাটীর বোধ হয় তিন ইঞ্চি প্রমাণ পুরু ময়লা পাওয়া যায়, আর হৃদয়টা দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পেনেল কোডের পাপ এবং ব্যবহার ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের সমুদয় অপরাধের তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্ত কাহারও দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, কিন্তু একজন সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হিন্দুসন্তান যদি দেবচরিত্র এবং ঋষিকল্প নবাব হেয়াৎ খাঁর সহিত কিংবা লর্ড রিপণের স্থায় মহর্ষি সমতুল্য খৃষ্টানের সহিত করমর্দ্দন করে, অমনি ভণ্ডদের মুখ হইতে অথবা লেখনী হইতে বিকট চীৎকার উঠিল—"গেল, গেল, দেশ গেল, আর রক্ষা নাই, সাধু সাবধান! সাধু সাবধান! তাই সব জাগো, উঠ, হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যায়। হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ধর্ম্মরাজ! তোমরা এক্ষণে সহায় হও, হিন্দুর হিন্দুয়ানী রাখ।" সভ্য-মহোদয়গণ! এখন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, এইরূপ ভণ্ডামী, এইরূপ কপটতা, এইরূপ জাল্ জুয়চুরী যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুর পুনরুত্থানের আশা কোথায়?

প্রকৃত কথা এই, হিন্দুর পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি সমাজ হইতে সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, স্বধর্ম্মানুরাগী, উচ্চপদস্থ, ধনবান্ ও সদাচারী এবং ধার্ম্মিক লোকদিগকে বাদ দেন, তবে কে সমাজ রক্ষা করিবে? জন কয়েক ভণ্ড লইয়া কি সমাজ বা ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহা আমার কথা নহে, ইহা দেশ শুদ্ধ লোকের কথা। যে সকল তপপ্রভাবশালী মহাযোগী ও মহাসাধু এখনও ভারতকে আলোকিত করিয়া গোপনে বা প্রকাশ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদেরও মুখে শত স্থানে শতবার শুনিয়াছি যে, নূতন ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত না হইলে হিন্দুর পুনরুত্থানের আশা প্রায়ই নাই। ইহা যোগীর বাক্য, ইহা মহাপুরুষদিগের বাক্য, সুতরাং ইহা ব্রহ্মবাক্য। আমি ভরসা করি, ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই কথাগুলিকে লইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অনেক অপ্রিয় কথা বলিতে হইল। এই জন্ত আমি নিতান্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করি, সত্যের ও স্থায়ের খাতিরে, বিশেষ ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণকামনায়, আমাকে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই অপ্রিয় কথাগুলি বলিতে হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলে অনেকে দেখে না; গাত্রে গুরুতররূপে বলপ্রয়োগ না করিলে অনেকের ঘুম ভাঙ্গে না এবং অনেককে প্রকাশ্যভাবে লজ্জিত না করিলে

তাহার লজ্জা ঘুচে না। "বাপ্‌রে! ব্রাহ্মণ নিন্দা করিও না; ব্রাহ্মণের লক্ষ অপরাধ থাকুক, তবু ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতে নাই; মস্তক হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত পাপে পরিপূর্ণ থাকিলেও অথবা ঘোর নরককুণ্ডের পঞ্চাশ হাজার হাত নীচে ডুবিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণ সদাই শুদ্ধ," মহাশয়গণ! এরূপ ধারণা ও এবম্প্রকার বিশ্বাসের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সত্য, ন্যায়, সাহস, সৎযুক্তি ও স্পষ্টবাদিতার যুগ আসিয়াছে, এখন আর কেহ কাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, কেহ কাহাকে "যাদু" করিয়া যা' ইচ্ছা তা' করিতে বা বলিতে পারে না, সুতরাং ব্রাহ্মণবর্গের এখন খুব সতর্ক হওয়া উচিত। তবে এ কথা অবশ্য বলি এবং এখনও পুনরায় বলি, যাঁহারা অদ্যাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যগুণের পালন করিয়া আসিয়া চরিত্রবল, সাধুতা, সদাচার ও সুশিক্ষার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা অবশ্য সমাজের পূজ্য ও বরণীয়। আমি এরূপ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটিও নিন্দার কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। সভ্যমহোদয়গণ! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কোন সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, পাঁচটি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এই পঞ্চ বিষয়ের নাম এই—ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বাহুবল ও ধর্ম্মবল। ধন, জন, বিদ্যা, শারীরিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবল, এই কয়েকটি জিনিষ না থাকিলে কোন সমাজেরই সম্যক্‌ প্রকারে উন্নতি হইতে পারে না। ইহার একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতি প্রত্যেকটি যেমন দেহের পক্ষে পরমোপকারী, তদ্রূপ ধন, জন, বিদ্যা, বাহুবল ও ধর্ম্মবল এই পাঁচটির প্রত্যেকটি সমাজের শরীর ও সমাজের প্রাণরক্ষার পক্ষে পরম সহায়। মহাশয়গণ! সুখময় শরত ঋতুতে, শুভ্র শুক্ল পূর্ণিমায়, সনাতন হিন্দুর পবিত্র গৃহে যে আনন্দময়ী জগদম্বার মহোৎসবে পূজা হয়, সেই জগন্মাতা দুর্গামূর্ত্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। সংসারে বাস করিতে হইলে, যে সকল গুণ ও যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, জগন্মাতার দুর্গামূর্ত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে শিক্ষা করা যায়। মা দুর্গা মহাশক্তিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ মহাশক্তি। সংসারে বাস করিতে হইলে, দৈহিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন; যে সমাজে সুস্থ, সবল অর্থাৎ শক্তিমান্, দীর্ঘজীবী এবং রজোগুণসম্পন্ন আদর্শ দেহী মানব না থাকে, সে সমাজ কখনই উন্নত হইতে পারে না। যে সমাজে কেবল রুগ্ন, বলহীন, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ দেহধারী লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের অধঃপতন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অকাট্য সত্য। সুতরাং স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, শক্তি চাই, এইজন্য দেহরক্ষার প্রথম প্রয়োজন। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "আরোগ্যং মূলমুত্তমং" অর্থাৎ স্বাস্থ্য সকল ভালর মূল। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে শক্তি হইবে কোথায়? এই জন্য সুস্থ ও সবল লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়া আবশ্যক। কারণ দৈহিক শক্তি পরম সহায়। কিন্তু কেবল দৈহিক শক্তি থাকিলেই কি সমাজ উন্নত হয়? মানসিক শক্তি না থাকিলে কেবল দৈহিক শক্তি লইয়া মানুষ পশু হইয়া যায়, এইজন্য মানসিক শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। বিদ্যা ও সুশিক্ষা না হইলে মন কখন কি উর্ব্বর হয়? বিদ্যা ও সুশিক্ষা না থাকিলে মানসিক শক্তি কোথা হইতে হইবে? এইজন্য মহাশক্তিরূপিণী মাতা দুর্গার পার্শ্বেই বিদ্যারূপিণী—জ্ঞানরূপিণী—মা বীণাপাণি সরস্বতী বিরাজমানা। কিন্তু কেবল দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তি

লইয়াই মানুষ কখন বাঁচিতে পারে না। লোকে কথায় বলে, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"; পেটে অন্ন না থাকিলে সংসার অন্ধকারময় হইয়া উঠে; অন্ন সংস্থান না থাকিলে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, সদ্‌গুণ, শিক্ষা, দীক্ষা এ সকলই মাটি হইয়া যায়, সুতরাং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা, সদুপায়ে, অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন। ধন না হইলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ধন না থাকিলে কোন সমাজেরই কখন উন্নতি হয় না। পেটে যাহাদের অন্ন নাই, শয়নের যাহাদের স্থান নাই এবং প্রতিদিনই যাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দমনের জন্য বিষম চিন্তা করিতে বাধ্য, এমন দরিদ্রাদপি দরিদ্র ব্যক্তিগণের দ্বারা কখন সমাজ রক্ষা হয় না, এইজন্য দেখুন, বিদ্যাবুদ্ধিদাত্রী মা সরস্বতীর পার্শ্বে ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বর্ত্তমানা। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য, বিদ্যা ও ধন থাকিলেই কি মানুষ যথার্থ মানুষ হয়? তাহা নহে। দৈহিক বল, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি অলস, ভীরু, নিরুৎসাহ, কাপুরুষ এবং ক্লীববৎ বিচরণ করে, তাহার শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন প্রভৃতিতে কোন কাজই হয় না। এইজন্য দেখুন, মা লক্ষ্মীর পার্শ্বে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি কেমন সুন্দর ভাবে দণ্ডায়মান। কার্ত্তবীর্য্য কার্ত্তিক যেন জলন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, সাহস, যত্ন, পরিশ্রম ও বীরত্বের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। সভ্য-মহোদয়গণ! শারীরিক বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি থাকিলেও মানুষ "আদর্শ মানুষ" হয় না; আর একটা জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন, সে জিনিষটা না থাকিলে মানুষের সমুদয় গুণ, সমুদয় শক্তি, সমুদয় চেষ্টা একেবারে অসার ও বিফল হইয়া যায়, সে জিনিষটার নাম ধর্ম্ম-বল। ঐ যে গজমুণ্ডধারী গণপতি মহা-রাজকে দর্শন করিতেছেন, ঐ সিদ্ধিদাতা গণেশ ধর্ম্মরূপে অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিরূপে ঐ মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। সিদ্ধির নাম ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নাম সিদ্ধি। সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলের নাম ধর্ম্মবল, এই একটির অভাবে আর সমুদয় বল একেবারে সারহীন হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মকে অবশ্য আশ্রয় করা চাই। কথাগুলি ক্রমে ক্রমে আরও পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আসুন, আমরা সর্ব্ব প্রথমে, শিক্ষা লইয়াই আলোচনা করি। সত্য করিয়া বলুন দেখি, এখনকার শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা? প্রকৃত শিক্ষায় যে সকল গুণে মনুষ্য অলঙ্কৃত হয়, সে সকল গুণ এখন কোথায়? যে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন হিন্দুসন্তান সমগ্র জগত মধ্যে দীপ্তালোকরূপে শোভা পাইতেন, সে শোভা কোথায় গেল? সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল এক্ষণে একবার বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সন্তানের হিন্দুত্বের শিক্ষার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখুন, এ দেশে প্রকৃত সুশিক্ষা আদৌ নাই। বর্ত্তমান কালে এদেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি এই দুই ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করা যাউক। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এদেশে যাঁহারা শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, অথবা লোকের নিকটে যাঁহারা সুশিক্ষিত বা বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের একশত জনের মধ্যে প্রায় ৯০ জন ব্যক্তি মাতৃভাষা আদৌ প্রকৃতরূপে বুঝেন না এবং সম্পূর্ণরূপে জানেন না। অনেকে এখনও "আমি" লিখিতে গেলে "আমী" লেখেন; একখানা বাঙ্গালা পত্র লিখিতে

গেলে তিনশত তের প্রকার ভুল করিয়া বসেন। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, এক সময়ে এ দেশের সর্ব্বপ্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ছিল; তিনি এক মহা বিদ্বান্ বলিয়া সাহেব মহলে ও দেশীয় সমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি Kristo Das Pal এইরূপে নাম স্বাক্ষর ও নামের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন অবশ্য পরিণামে একজন সাহিত্য-সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ উপাধিরও তিনি যোগ্য ছিলেন; কিন্তু অনেক দিবসের চেষ্টার পরে তিনি বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনচরিত প্রণেতা যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, একদা তিনি সাগরদাঁড়ি গ্রাম হইতে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা লেখা আমার আসে না, তুমি আমার একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।" ইত্যাদি। সে দিন এক সভায় গিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় অতীব প্রশংসা ও যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৭ বৎসরকাল মুন্সেফী করিবার পরে ৭ বর্ষকাল সব্‌জজের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া সভাস্থ সকলে শেষে এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন যে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। দুইটা কথা ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কহিতে যাইয়া সে ব্যক্তির প্রাণবায়ু কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং বোধ হয় আর কিছুক্ষণ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন। তাহার পরে একজন লক্ষাধিক টাকার আয়ের জমিদারের কথা শুনুন। তিনি যখন তাঁহার নাম দস্তখত করিতে বসেন, তখন বোধ হয় যেন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়; চাকরেরা পাখা টানে, বাটীর ঝি-মাগী একটা পাণ ও এক গেলাস জল হাতে লইয়া দাঁড়ায়, গোমস্তারা কলমে কালি দিয়া তাহা বাবুর হাতে দেয়, তাহার পরে অনেক কাট্ খড় পোড়াইয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘামে কাপড় ভিজাইয়া, বাবু তাঁহার নামের বানান করিয়া লিখিলেন পেতাব (প্রতাপ), তাহার পরে চন্দ্র লিখিবার সময় বাস্তবিকই আকাশের চাঁদের দিকে মুখ ফিরাইতে হইল, তখন গোমস্তা "হুজুর! এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তাহার পরে যাহা লিখিতে হয় আমরা লিখিয়া লইব।" বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, জয় মা কালী বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, এক গেলাস জল পান পূর্ব্বক পাণ চিবাইতে চিবাইতে পুনরায় দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। সভ্য-মহোদয়গণ! বাবুদের বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞানটা কিরূপ তাহা বুঝিলেন কি? সত্য কথা বলিতে হইলে ইহা স্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় দেশের লোক এখনও শিক্ষিত হয় নাই, অথচ ইহা সকলেই জানে No Nation can attain to greatness without literature of its own অর্থাৎ স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। তাহার পরে স্ত্রীশিক্ষার কথা ধরুন। মহাশয়গণ! আমি যদি আমার হৃদয় খুলিয়া কথা কই, তাহা হইলে ইহা অকপটচিত্তে বলিতে পারি, আমি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী নহি, অন্ততঃ যে শিক্ষায় স্ত্রীলোক সৌখীন হইয়া যায়, "বিবাহ বিভ্রাট" বা "স্বাধীন জেনানা" নাটিকায় নায়িকা হইয়া যায়, যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা পরিয়া, বুট পরিয়া, পরপুরুষের সঙ্গে বাগ্বি-

নের ভিতর সায়ংকালে বা রাত্রে বেড়াইতে যায়, যে শিক্ষার দোষে রান্নাঘরে ঢুকিতে চায় না, আর বিলাসিনী মেমের মত খবরের কাগজ ও নাটক নভেল লইয়াই দিন কাটায়, আমি সে শিক্ষাকে বাঙ্গালা দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়া লোহিত সাগরের জলে অথবা মক্কার পাহাড়ের তলে ফেলিয়া দিতে চাই; আর এমন শিক্ষা যারা দেয়, অথবা এই রূপ শিক্ষার পোষকতা করে, কিংবা এই অতীব সর্ব্বনাশকরী শিক্ষার জন্ত স্কুল বা পাঠশালা স্থাপন করে, তাহাদিগকে আমি দেশের মহাশত্রু বলিয়া গণনা করি। তবে কি আমি স্ত্রীশিক্ষার একেবারে বিরোধী? তাহাও নহে। আমি বিবেচনা করি, এ দেশের লোকেরা যখন স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দেন, তখন যেন মনে করিয়া রাখেন যে, ক কখন খ নয় এবং খ কখন ক নয়, সুতরাং যাহা পুরুষের পক্ষে ভাল, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নয়। What is same for the gander, is not same for the goose. যে শিক্ষায় স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিখিতে পারে; পতির সেবা, পিতামাতার সেবা, সন্তান-সন্ততির পালন ও শিক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, সতীত্ব রক্ষা, গৃহের সুবন্দোবস্ত রক্ষা, প্রভৃতি বুঝিতে পারে, যাহাতে তাহার সাত্বিক প্রবৃত্তির ও সাত্বিকী বুদ্ধির উদ্রেক হয়, যাহাতে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বুঝিতে পারে, যাহাতে কাহারও দ্বারা সহজে প্রতারিতা না হয়, যাহাতে সাহস, ধৈর্য্য, বিপদে নির্ভীকতা, পরিশ্রমপরায়ণতা প্রভৃতি শিখে, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তক সমূহ পড়িতে পারে, ঘরের টাকা কড়ির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে পারে, আবশ্যক হইলে খাতাপত্রও লিখিয়া লইতে সমর্থা হয়, আমি বিবেচনা করি, হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই সুশিক্ষার অভাবে নারীসমাজবৃক্ষে ঘুণ ধরিয়াছে; এবং যেখানে ইহার বিপরীত শিক্ষা হইতেছে, সেখানে কি কুফল প্রসূত হইতেছে তাহাও আমাদের জানিতে বাকি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কোরাণসারকে জন্মান্তরবাদ।*

কেহ বা রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সেই সেই সময়োচিত সুখ সম্ভোগে জীবন কাটাইলেন; কেহ বা দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজন্ম দুঃসহ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া শীতে কম্পিত হইয়া, গ্রীষ্মে আতপে দগ্ধ হইয়া, বর্ষায় মস্তকে বারিধারা বহন করিয়া, মৃত্যুর শীতল অঙ্কে আশ্রয় লইল। কেহ বা জন্মান্ধ, চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগে অসমর্থ; কেহ বা জন্ম হইতেই খঞ্জ, অভিলষিত দেশে বা স্থানে যাইতে অসমর্থ; দয়ার সাগর ঈশ্বরের সর্ব্বত্র দয়াবর্ষণের নিদর্শন পাইয়াও যখন সর্ব্বত্র এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাই, তখন আর তাঁহাকে দয়াবান্ বলিতে পারি না। প্রাচীনকালে যেমন রোমের রাজারা মহিষীর সহিত প্রকাণ্ড সভায় মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য দাসদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিতে

অনুমতি দিয়া কাতরদৃষ্টি দাসদিগের উপরে সিংহ ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুর আক্রমণে ও তাহাদিগের আর্ত্তনাদে আমোদ পাইতেন, ঈশ্বরও সেই-রূপ কার্য্য করিয়া আমোদ করিতেছেন, মনে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে আর্য্যঋষিগণ সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন, আত্মা পূর্ব্বজন্মে যে সাধু কর্ম্ম ও অসাধু কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলে সেই সেই আত্মার পাপ ও পুণ্য জন্মিয়াছে। ইহজন্মে আবার সেই সেই আত্মার পুণ্যের ফল সুখ ও পাপের ফল দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, জন্মেরও আরম্ভ বা শেষ নাই; এক আত্মারই অনন্ত বার জন্ম হইয়াছে, মুক্তি না হইলে আবার অনন্ত বার জন্ম হইবে। এই জন্মান্তরবাদ, ন্যায়, বৈশেষিকে আছে, সাংখ্য, পাতঞ্জলে আছে, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসায় আছে। জন্মান্তরবাদ লই-য়াই উপনিষদ্, জন্মান্তরবাদ লইয়াই তন্ত্র, জন্মান্তরবাদ লইয়াই স্মৃতি, জন্মান্তরবাদ লই-য়াই পুরাণ ইতিহাস; হিন্দুর কোন্ পুস্তকে যে জন্মান্তরবাদ নাই, আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাই না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের চসমা চক্ষে লাগাইয়া হিন্দু পুস্তকের ও হিন্দুমতের আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা কেবল জন্মা-ন্তরবাদ কেন, দশহরা গঙ্গাস্নান হইতে ক্ষেত্র-পালের পূজা পর্য্যন্ত সমস্তই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রস্তাবে তাঁহাদের সহিত আমার কোন বিচার বিতর্ক নাই। আপ্তবাক্য ছাড়িয়া দিয়া যুক্তি-তর্কবলে আমি এ প্রস্তাবে জন্মান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহি। হিন্দুর বেদ যেমন ঈশ্বরের স্বরচিত পুস্তক, হিন্দুরা বেদের উপরে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন, মুসলমানেরাও সেইরূপ কোরাণ সরিফের উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্রে যেমন জন্মান্তরের কথা আছে ও জন্মান্তরের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব আপত্তির খণ্ডন হইয়াছে, সেইরূপ মুসলমানের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণসরিফে যখন জন্মান্তরের কথা নাই, তখন কি করিয়া জন্মান্তরে আস্থা স্থাপন করা যাইবে? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলি-লেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কোরাণ সরিফ অবতরণের অনেক পূর্ব্বে বেদের অবতরণ হইয়াছে, কোরাণ সরিফে বেদোক্ত যে যে মতের খণ্ডন হইয়াছে, মুসলমানসম্প্র-দায় অবশ্য সেই সেই বেদোক্ত-বাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। আর কোরাণ সরি-ফের দ্বারা বেদোক্ত যে যে বাদ খণ্ডিত হয় নাই, সেই সেই বাদ অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। "অপ্রতিষিদ্ধ মনুমতং ভবতি" যে মতের প্রতিষেধ করা হয় নাই, নবীন শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তেরও সেই প্রাচীন মত অনুজ্ঞাত ও অভিপ্রেত। ইহা কেবল হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নিয়ম নয়, মুসলমান শাস্ত্রেরও এই সিদ্ধান্ত। আমিরি পয়গাম্বর মহাত্মা মহম্মদের নিকটে কোরাণ সরিফে যে যে সুরার অবতরণ হইয়াছে, তাহা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পয়গাম্বরের নিকটে অবতীর্ণ যে যে সুরা নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সেই সুরার ব্যবস্থা অবশ্য মুসলমানদিগের নিকটে গ্রহণীয় নহে। আর যে সকল সুরা নিরাকৃত হয় নাই, পূর্ব্বোক্ত সেই সেই সুরা মুসলমানদিগের অবশ্য পালনীয় ও পূজনীয়।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, "অবতারাহ্য সংখ্যেয়াঃ"—অবতারের সংখ্যা নাই। মুসল-মান-শাস্ত্রে অবশ্য অবতারের (পয়গাম্বরের) সংখ্যা আছে, কিন্তু এত অধিক সংখ্যা শাস্ত্রে কথিত যে, মুসা প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র শাস্ত্রো-ল্লিখিত পয়গাম্বরের দ্বারা সেই সংখ্যার কোনও কালে পূরণ হয় না। কোরাণসরিফে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, যে দেশের অধি-

বাসীরা যে ভাষায় অভিজ্ঞ, সেই দেশে সেই ভাষা-ভাষী পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছে।* সুতরাং বলিতে পারি ভারতবর্ষের জন্ত সংস্কৃত-ভাষা-ভাষী পয়গাম্বর আসিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহম্মদের নিকটে অবতীর্ণ আরবী ভাষায় নিবদ্ধ সুরার আদরের স্তায় হিব্রু ভাষায় লিখিত সুরারও যখন মুসলমানের নিকট পূজা আছে, তখন সংস্কৃতে লিখিত বেদেরও আদর পাইবার জন্ত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের নিকটে আবদার করিতে পারি। পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ-সরিফেও জন্মান্তরবাদ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অনেকেরই বিশ্বাস, কোরাণসরিফের মতে আত্মার জন্ম আছে, বিনাশ নাই ও জন্মান্তর নাই। এই যে মাতৃগর্ভ হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, এই তাহার আত্মার প্রথম জন্ম, আর দ্বিতীয় জন্ম নাই, ইহার পূর্ব্বে এই আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহারা এই মতের পোষকতায় প্রমাণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত আয়েত (বচন) উদ্ধৃত করেন।

দহরকাল নাম ছিয়াত্তর সুরা—

১। "ইহা নিশ্চয় যে মানবজাতির উপর দিয়া অনন্তকালের এমন এক সময় চলিয়া গিয়াছে যে, তৎকালে সে কিছুই ছিল না।"

২। "আমি নানা উপাদান মিশ্রিত রেতঃবিন্দু হইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি"।

মুরসলাত ৭৭ সুরা—

২০। "আমি কি তোমাদিগকে অতি তুচ্ছ জলবিন্দু হইতে গঠিত করি নাই?"

অলক মাংসপিণ্ড নাম ৯৬ সুরা—

২। "মানবকে তিনি ঘনীভূত রক্ত হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন।"

৩। তিন পর্ব্বত নাম ৯৫ সুরা—

৪। "ইহা সত্য যে আমি মনুষ্যজাতিকে অতি সুন্দর উপাদানে সৃজন করিয়াছি।"

অবস—অসন্তোষ প্রকাশ হইল নামক ৮০ সুরা।

১৯। "রেতঃ হইতে তিনি তাহাকে গঠিত করিয়াছেন।"

আমরা পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফ হইতে এই সকল উদ্ধৃত প্রমাণ ও এতৎ সমানার্থ অন্তান্ত প্রমাণ দেখিয়া বলিতে পারি না, কোরাণ সরিফের মতে আত্মার উৎপত্তি আছে। ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত। তিন পর্ব্বত নামক ৯৫ সুরাতে স্পষ্টতঃ লিখিত রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "আমি সুন্দর উপাদানে মনুষ্যজাতিকে সৃজন করিয়াছি।" এই বচনস্থ উপাদান শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। উপাদান কারণেরই নামান্তর সমবায়িকারণ। কার্য্যের সহিত যে কারণের নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকেই সমবায়ি কারণ বলে। যেমন বস্ত্রের উপাদান কারণ বা সমবায়ি কারণ সূত্র। এক্ষণে জানা আবশুক, আত্মার সমবায়ি কারণ (বস্ত্রের সূত্রস্থানীয় কারণ) কি? এই সঙ্গে আবার জিজ্ঞাস্ত আত্মা কোন্ পদার্থ।—দ্রব্য (Matter), গুণ (Attribute) বা কর্ম্ম (Action)? সংযোগে দ্রব্যরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যেমন সূত্রসমষ্টির সংযোগে বস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সংযোগের ধ্বংসে আবার সেই কার্য্যের ধ্বংস হয়। যেমন সূত্র সমষ্টির সংযোগের ধ্বংস হইলে বস্ত্রেরও ধ্বংস হইয়া যায়। প্রাগুক্ত বচনে আছে, রেতঃ বিন্দু ও শোণিতে মানবের জন্ম হইয়াছে।

* হজরত ইসার হামকরী মোহম বলিতেছেন, আমি আমাদের মধ্যে অস্ত এক দূতকে দেখিলাম, তাঁহার নিকট সকল জাতীর সকল বাণীর মুক্তা ভাষায় কথোপকথন কারীদিগকে সুসমাচার জানাইবার নিমিত্ত ইত্যাদি।

বুঝিতে হইবে, এই উভয়বিধ পদার্থের সংযোগে যদি আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে আবার তাহার সংযোগে ধ্বংস হইলে আত্মারও ধ্বংস হইতে পারে। এটী দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য; ইহার ব্যভিচার হয় না। মানব শরীর অবশ্য কার্য্য, তাহার সমবায়ি কারণ পরমাণুসমষ্টি, সেই পরমাণু-সমষ্টির সংযোগে শরীরের উৎপত্তি হয় এবং পরমাণু-সমষ্টির ধ্বংসে শরীরের ধ্বংস হয়। আত্মাও যদি শরীরের ন্যায় অন্য দ্রব্য হইত, তবে ঐ প্রক্রিয়ায় শরীরের ধ্বংসে আত্মারও ধ্বংস হইত, ইহা স্বীকার করিবার সম্ভাবনা নাই। আত্মার ধ্বংস স্বীকার করিলে কেয়ামতের দিবস শরীরান্তর গ্রহণ হইবে কাহার? আর আত্মা যদি দ্রব্য না হইয়া গুণ বা ক্রিয়া হয়, তাহা হইলেও কোনরূপ উপপত্তি হয় না। রূপ প্রভৃতিকে গুণ ও স্পন্দন প্রভৃতিকে ক্রিয়া বলে। এ উভয়েই দ্রব্য-সমবেত, উভয়ের মধ্যে কেহই দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে অবস্থিতি করে না। দ্রব্য নাই, দ্রব্যরূপ আধার নাই, গুণ ক্রিয়া আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত কেহই দেখাইতে পারিবেন না। আশ্রয়-দ্রব্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি গুণ আর ক্রিয়া উৎপত্তির পরে অল্পক্ষণ থাকিয়াই আপনা আপনি বিনষ্ট হয়। আত্মার যখন কেয়ামৎ আছে, মহাবিচার আছে, তখন কি করিয়া মানব-আত্মাকে গুণ বলিব? ক্রিয়া বলিব? পক্ষান্তরে যে ভাব-পদার্থের উৎপত্তি আছে, নিশ্চয় তাহার বিনাশ আছে। ইহাও ন্যায়ানুমত। উৎপত্তি আছে, বিনাশ নাই এরূপ ভাব-পদার্থের সত্তা আমরা জানি না, দার্শনিকগণ জানেন না, বৈজ্ঞানিকগণ জানেন না। সুতরাং উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ—সকলেই মানবের উৎপত্তির কথা, আদিম মনুষ্য স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়াও আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আদিমের উৎপত্তি বা "আদমের" উৎপত্তি এক কথা। কোরাণ সরিফে যেরূপ শুক্র-শোণিত হইতে মানবের উৎপত্তি আছে, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি পুস্তকেও সেইরূপ শুক্র-শোণিত হইতে মানবের উৎপত্তির কথা আছে। "মানব" বলাতে আত্মা নয়, মানবীয় শরীর। শরীরই শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন, সংযোগেই শরীরের উৎপত্তি, সংযোগ ধ্বংসেই তাহার ধ্বংস। পূর্ব্বোল্লিখিত অলফ-মাংস পিণ্ড নামক ৯৬ সুরার তৃতীয় বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে আছে যে, "যে মানব আত্মাতে তিনি মহোন্নতির অসীম শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, সে মানবকে তিনি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটী পবিত্র কোরাণ সরিফের কথাই হউক, অথবা টীকাকারের কথাই হউক, ফল "মানব-আত্মা" বলাতে আত্মা মানব নহে বুঝা যাইতেছে। "রাজগৃহ" বলিলে আমরা কি বুঝি? রাজার গৃহ রাজ-গৃহ এইরূপ বুঝি। এখানে "মানব-আত্মা" এই পদেরও মানবের আত্মা, মানব-আত্মা এইরূপ বুঝি রাজগৃহ এই পদে আরও বুঝি রাজা ও গৃহ এক নয়। "রাজ-গৃহ" ও "মানবআত্মা" ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। ষষ্ঠীর অর্থ সম্বন্ধ। সম্বন্ধ বলিলেই দুইটী পদার্থের উপস্থিতি হয়। এক পদার্থে অভিন্ন পদার্থে সম্বন্ধ হয় না। "মানব-আত্মাতে তিনি মহোন্নতির অসীম শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন" বলাতে শক্তি দানের পূর্ব্বেও মানব-আত্মার বিদ্যমানতা বুঝা যায়। অবশ্য এই অংশটী কোরাণসরিফের বঙ্গানুবাদক বন্ধনীর ভিতরে নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং উহা আয়েতের অংশ নয়। আমি ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাননীয় মৌলবী তছলিম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল, মহোদয়কে

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তিনি কোরাণ সরিফের কথায় কথায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে, তাহাও প্রামাণিক টীকাকারদিগের মত। এস্থলে টীকাকারের বা ব্যাখ্যাকর্ত্তার ভ্রম আছে মনে করা যাইতে পারে না। দহরকাল নামক ৭৫ সুরার প্রথম আয়েতে আছে, "ইহা নিশ্চয় যে মানব জাতির উপর দিয়া অনন্তকালের এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে সে কিছুই ছিল না।" "সে কিছুই ছিল না" সে কথা পরে বিচার্য্য। "ইহা নিশ্চয় যে মানব জাতির উপর দিয়া এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে" এই অংশের অর্থ কি? ইহাও নিশ্চয় যে যাহার উপর দিয়া সেই সময় চলিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে সেও ছিল। সে না থাকিলে তাহার উপর দিয়া কোন কিছু চলিয়া যাইতে পারে না। আমার মাথার উপর দিয়া পাখী চলিয়া গেল বলিলে, যেমন সে সময়ে পাখিটী চাই, সেইরূপ সে সময়ে আমার মাথাটীও চাই, আমিও চাই; সেইরূপ যাহার উপর দিয়া সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন চাই, তেমনি যাহার উপর দিয়া সময় চলিয়া গিয়াছে, সেও সেই সময়ে চাই। কাজে কাজেই বলিতে হইবে, অনাদি অনন্ত সময়ের মধ্যে যে সময় চলিয়া গিয়াছে, সে সময়েও মানবজাতি ছিল। সময়ের যেমন আদি নাই, সেই পর্য্যন্ত মানবজাতি থাকিলে তাহারও তেমনি আদি নাই। সুতরাং তাহার সৃষ্টি হয় নাই। অবশ্য অনাদি সময় হইতে মানবজাতি আছে বলিয়া, পূর্ব্বে যে কিছুই ছিল না বলাতে, এই আয়েতের পূর্ব্বাংশের সহিত পরাংশের সামঞ্জস্য হয় না।

অসামঞ্জস্য হইলে, পূর্ব্বাপরের বিরোধ হইলে, লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ বলে, আনন্দের মৃত্যুর পরে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমরা এই বাক্যের কি অর্থ বুঝিব? আনন্দ বলিলে আমরা বুঝি আনন্দের দেহ-বিশিষ্ট তাহার আত্মা, বা আনন্দের আত্মবিশিষ্ট তাহার দেহ। আনন্দের মৃত্যুর পরে আনন্দের আত্ম-বিশিষ্ট দেহের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং মৃত্যুর পরে আনন্দকে দেখিয়াছি তাহার অর্থ, আনন্দের মৃতদেহকে দেখিয়াছি। লক্ষণার আশ্রয়ে এইরূপ অর্থ করা হইয়া থাকে। এ স্থলেও সেইরূপ মানব জাতি ছিল, ইহার অর্থ, মানবজাতির আত্মসমূহ ছিল। কিছুই ছিল না অর্থ, সেই আত্মসমূহের হস্ত, পদ কিছুই ছিল না, তাৎপর্য্য দেহ ছিল না। পবিত্র পুস্তক কোরাণ সরিফে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টির কথা আছে, সপ্তস্বর্গ, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টির কথা আছে, অগ্নি, বায়ু, জলের সৃষ্টির কথা আছে, কৈ আত্মার সৃষ্টির কথা তো কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বকরা সুরার ২৮ আয়েতে আছে, "তোমরা নির্জ্জীব ছেলে, খোদাতালা তোমা-দিগকে জীবনদান করিয়াছেন"। দান অর্থ সৃষ্টি নয়, শরীরের ভিতরে জীবকে আত্মাকে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বা জীবাত্মাকে চৈতন্য বুদ্ধি-বৃত্তি দান করা, ইহার তাৎপর্য্য। আদমের সৃষ্টির সময়েও মৃণ্ময় মূর্ত্তির ভিতরে খোদার আজ্ঞায় আত্মা প্রবেশ করিয়াছিল, এইরূপ স্পষ্ট আছে। এই সকল কারণেও কোরাণ সরিফের মতে আমরা আত্মা অনাদি বিশ্বাস করি। মুসলমান মাত্রেই আত্মা অবিনশ্বর স্বীকার করেন; সুতরাং সে জন্য আর প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস মৃত্যুর পরে সমস্ত আত্মা গোরের ভিতরে অজ্ঞেয়ভাবে অবস্থিতি করে। একদিন সকলেরই মহাবিচার হইবে। সেই দিন সেই মহাবিচারের দিনে সমস্ত আত্মা আমার নূবশরীর গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইবে। সেই দিনের মহাবিচারে পুণ্যবান্

অনন্ত স্বর্গ ও পাপী অনন্ত নরক লাভ করিবে। পুণ্যবানেরও আর পতন নাই, পাপীরও আর উত্থান বা উদ্ধার নাই। পবিত্র কোরাণ সরিফে সর্ব্বত্র পুনরুত্থানের, শরীরগ্রহণের কথা আছে। আমরা জন্মান্তরবাদী, মৃত্যুর পরে আমরাও পুনরুত্থানের কথা বলি, শরীরান্তর গ্রহণের কথা বলি। আত্মার শরীর গ্রহণের নামই জন্ম। মৃত্যুর পরে যখন আত্মার শরীরান্তর গ্রহণ আছে, তখন মুসলমানদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, আত্মার আত্মান্তর গ্রহণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আত্মার অনন্তবার জন্ম হইয়াছে, আবার অনন্তবার জন্ম হইবে, মুসলমানদিগের সহিত এই স্থানেই হিন্দুদিগের মতবিরোধ। তাঁহাদিগের মতে মৃত্যুর পরে একবারমাত্র শরীরান্তর গ্রহণ ও একবারমাত্র এক দিনে সমস্ত আত্মার মহাবিচার। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রত্যেক আত্মার মৃত্যুর পরেই বিচার হয়। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, মুসলমানদিগের এই বিশ্বাস পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ সরিফের মতানুযায়ী কি না। বকরা সুরার ৯৪ আয়েতে আছে যে, "বল যদি খোদাতালার নিকট অন্য লোক ব্যতীত তোমাদের জন্যই পরকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু ইচ্ছা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হ'ও"। বকরা সুরার ১৫৪ আয়েতে আছে, "যাহারা খোদাপথে মারা গিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা মৃত্যু বলিও না, বরং তাহারা জীবিত। কিন্তু তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না"। বকরা সুরার ১৬৩ আয়েতের তৃতীয় বচনের ব্যাখ্যায় আছে, তাহারাই খোদা সাক্ষাতের জন্য মৃত্যু কামনা করে। কোরাণ সরিফের এই সমস্ত ঈশ্বরীয় বাক্য হইতে আমরা কি বুঝিব? মৃত্যুর পরে যদি পাপী, পুণ্যবান্ সকলের পক্ষেই বিচারের জন্য তুল্যভাবে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারের অপেক্ষা করিতে হয়। তবে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু কামনীয় অর্থ কি? দুই বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইলেও যাহা, দুই বৎসর পরে মৃত্যু হইলেও তাহা, সেই নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতীত, সেই দিনের মহা বিচার ব্যতীত, পুণ্যবানের ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হইবে না, সেইজন্য বলিতেছিলাম, একটী মাত্র দিনে সর্ব্বসাধারণের মহাবিচার হইবে না, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর পরে মহাবিচার হইবে। তাহা হইলে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা সঙ্গত হয়। মৃত্যু না হইলে ঈশ্বরের সন্নিধিলাভ হয় না, কেবল অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া দুঃখময় জগতে অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যু না হইলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিয়া অবিনশ্বর, অবিশ্রান্ত সুখ-সাগরে মগ্ন হইতে পারা যায় না। ঈশ্বর-প্রেমিকের পক্ষে, পুণ্যাত্মার পক্ষে মৃত্যুর পরেই সেই অধিকার লাভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে মৃত্যু কামনা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে; যে বকরা সুরার ১৪৮ আয়েতে আছে যে, "যে স্থানে তোমরা থাকিবে, তোমাদিগকে খোদাতালা একত্র করিবেন, মর্‌শলাত সুরার ৩৮ আয়েতে আছে "এই দিবস পুণ্যাত্মাদিগকে পাপাত্মগণ হইতে এবং ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ করা হইবে, ইহাই বিচারের যুগ, দিবস।" "আমি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে একত্রিত করিব" এই পূর্ব্বোক্ত দুইটী আয়েতে ও এই আকারের অনেক আয়েতে এক দিবসে যে সকলের মহাবিচার হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে আমরা এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, উল্লিখিত আয়েতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়েতে যে "পূর্ব্ববর্ত্তী" শব্দ আছে, তাহার অর্থ কি? বিচার-ক্ষেত্রে ত সকলেই এক সময়ে উপস্থিত হইবে; তবে আর পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী থাকিল

কি করিয়া? যাহার অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়, তাহা হইলে অগ্রে পাপীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত পরবর্ত্তী-কালের মৃত পুণ্যাত্মার, আবার অগ্রে পুণ্যাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সহিত পরবর্ত্তী সময়ের মৃত পাপীর সমবেত করিবার সম্ভাবনা। অবশ্য পবিত্র কোরাণ সরিফের সেরূপ অর্থ নয়। যাঁহারা পুণ্যবলে স্বর্গে উন্নীত হইয়াছেন, তোমাদিগের যদি সেইরূপ পুণ্যবল থাকে, তবে তোমাদিগকেও স্বর্গে সেইরূপ উন্নীত করিব, তাঁহাদিগের সহিত তোমাদিগকে মিলিত করিব। পাপীর সম্বন্ধেও সেইরূপ একই কথা, যাহারা পূর্ব্বে নরকে পাতিত হইয়াছে, তোমরা পাপী হইলে তোমাদিগকেও সেই নরকে পাতিত করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত করিব, কোরাণ সরিফের এইরূপ অর্থই বোধ হয় ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসঙ্গত।

"তোমরা যে স্থানে থাকিবে খোদাতালা তোমাদিগকে একত্র করিবেন" একত্র করিবেন কোন্ স্থানে? শব্দশাস্ত্রে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন "যদ্" বলিলে সঙ্গে সঙ্গে "তদ্" শব্দের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। "তদ্" বলিলেও সেইরূপ "যৎ" শব্দের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। একটী আছে, অপরটী নাই, এরূপ স্থলেও সেই পদের অধ্যাহার (উহ্য) করিতে হয়। এখানে যখন "যে স্থানে" বলাতে "যদ্" শব্দ আছে, তখন আপনা আপনি "যদ্" শব্দের বিভক্তি লইয়া তৎশব্দের উপস্থিতি হইবে। শব্দবিজ্ঞানের এই নিয়ম, সুতরাং এই আয়েতের অর্থে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তোমরা যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানেই খোদাতালা তোমাদিগকে একত্র করিবেন। তাৎপর্য্য তোমরা যে স্থানেই কেন থাক না, যে স্থানেই কেন জন্মগ্রহণ কর না, পাপী হইলে পাপীদিগের সহিত, পুণ্যাত্মা হইলে পুণ্যাত্মাদের সহিত মিলিত হইবে; "ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ করা হইবে।" ইহারই বা অর্থ কি? পুণ্যাত্মা হইলেই যদি অনন্ত স্বর্গভোগ হয়; তবে ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা বলিয়া লাভ কি? আমরা কিন্তু এই আয়েতের অন্যরূপ অর্থ বুঝি। একান্ততঃ কেহই পুণ্যবান্ হয়েন না, একান্ততঃ কেহই পাপী হয় না। পাপ পুণ্য লইয়াই মনুষ্য-জীবন, পুণ্যবান্ হইলেও জীবনে একেবারে তাঁহাকে পাপস্পর্শ করে নাই, ইহা হইতে পারে না। পাপী হইলেও জীবনে কখনই সে পুণ্যানুষ্ঠান করে নাই, ইহাও হইতে পারে না। পুণ্যাধিক্য হইলেই মনুষ্য পুণ্যাত্মা নামের অধিকারী হন, পাপাধিক্য হইলেই মনুষ্য পাপী নামে অভিহিত হয়। সামান্য একটুকু পাপ করিল, আর তাহার অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা হইল, সামান্য একটুকু পুণ্য করিল, আর তাহার অনন্ত স্বর্গভোগের ব্যবস্থা হইল; ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের এরূপ বিসদৃশ বিচার হইতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি পাপ পুণ্য উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছে, পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফের মতে তাহার জন্য কোন্ লোকের ব্যবস্থা হইবে? তাহার পক্ষে স্বর্গবাস হইলেও অনন্তকালের জন্য হইতে পারে না। কোরাণসরিফে যে স্বর্গের বর্ণনা আছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায়, স্বর্গে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। নরকের বর্ণনা দেখিয়াও বুঝা যায়, নরকেও কণিকামাত্র সুখ নাই। সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গভোগ ও নরকভোগ না হইলে কোনক্রমেই উপপত্তি হয় না। পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গভোগ ও নরকভোগ বলিলে আবার কোরাণ সরিফে যে স্পষ্টতঃ অনন্ত স্বর্গ ও নরক আছে, কি করিয়া তাহার অর্থ হয়? এই আয়েতটী বুঝাইবার জন্য আমি এস্থলে আরও দুইটী

আয়েত উদ্ধৃত করিতেছি। বক্বরা সুরার সপ্তম আয়েতে আছে যে, "খোদাতালা তাঁহাদিগের অন্তরে মোহর করিয়াছেন ও কর্ণে মোহর করিয়াছেন। আর তাহাদের চক্ষে আবরণ আছে" টীকাকার বলিয়াছেন, "তাহাদের অন্তরে মোহর থাকা প্রযুক্ত অন্তরে সত্য কথা প্রবেশ করে না, কর্ণে মোহর থাকা বিধায় সত্য কথা শুনিতে তাহারা বধির।" চক্ষে আবরণ নিবন্ধন সত্য পথ দেখিতে তাহারা অন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। দহর সুরার ৩০ আয়েতে আছে "কিন্তু আল্লাই যাহা ইচ্ছা করেন তাহার অনুরূপ তোমরাও ইচ্ছা কর না" ঈশ্বর যদি চক্ষে ও কর্ণে ও অন্তঃকরণে আবরণ দিয়া কোন কোন মানবকে সৎপথ বুঝিতে বাধা দেন, তবে আর তাহার জন্ত সেই সেই মানবকে কেন দণ্ড ভোগ করিতে হয়? যদি মানবের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়িনী হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে যদি মানবের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলেই বা কেন পাপীর পক্ষে ঈশ্বরের দণ্ডের ব্যবস্থা? এই গভীর তত্ত্বটী বুঝিতে হইলে গভীর আলোচনার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনাদি, কাল অনাদি। সেই অনাদিকাল হইতে আত্মা আছে। আত্মা থাকিলেই আত্মার গুণ, ইচ্ছা ও সংস্কার প্রভৃতিও আত্মাতে আছে। যাহা হউক এ কথাগুলি পরে বক্তব্য। একটী উদাহরণ দেখাইলে এই আয়েতটীর স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন না, মৎস্য মাংসের গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন না, পলাণ্ডুর তীব্র গন্ধে তাঁহাদিগের নাসায় অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেই মৎস্য মাংস বর্জ্জন ও পলাণ্ডু বর্জ্জনকে কুসংস্কার মনে করিয়া মৎস্য, মাংস ও পলাণ্ডু ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ঐ বস্তুত্রয়ে তাঁহাদিগের এত আসক্তি জন্মে যে, এক বেলাও ঐ বস্তুত্রয় ভিন্ন তৃপ্তির সহিত আহার হয় না। কোন দিন যে ব্যক্তি মদ্য স্পর্শ করে নাই, মদ্যপায়ী বন্ধুর একান্ত অনুরোধে সে এক দিন অতি অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিয়া ক্রমে সেই মদ্যপায়ী বন্ধুকেও মদ্যপানে পরাস্ত করিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কি পুণ্যকর্ম্ম, কি পাপকর্ম্ম, যাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই আসক্তি জন্মিবে। আসক্ত হইলে আবার সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পাপ কর, পাপের প্রলোভনে তুমি উন্মত্ত হও, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি পাপী, তুমিও সেই পাপের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পার না। সুতরাং "ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তোমরাও তাহার অনুরূপ ইচ্ছা করিতে পার না।" ঈশ্বর কেন পাপীকে পাপানুষ্ঠানে পাতিত করেন, ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য, পাপী যে কিঞ্চিৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল, এই পাপে পাতন তাহারই শাস্তি। যে যাহা চায়, তাহাকে ঈশ্বর তাহাই দেন। পাপে পাতনের নামই নরকে পাতন। ইহাই পাপের নরকভোগ। এই নরকভোগের শেষ হয় না। বাসনাবশতঃ উত্তরোত্তর পাপীর নরক বৃদ্ধি হয়। পাপী পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিতেও পারে না, তীব্র বাসনাও তাহার অন্তর্হিত হয় না। এক জন্মে কেন, শত শত জন্মেও ইহার পরিহার হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে জলের এক নাম "জীবন" দেখিতে পাই। আবার অনেকে বলেন, "অন্নই প্রাণ।" জীবন ধারণের কারণ বলিয়া জলের নাম "জীবন" হইয়াছে। প্রাণ ধারণের কারণ বলিয়া "অন্নই প্রাণ" বলা

হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ নরক ক্লেশের কারণ বলিয়া কোরাণ সরিফে পাপকেই নরক বলা হইয়াছে। কোরাণ সরিফের এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এই কথাটী বুঝাইবার নিমিত্তই তাহাতে অনন্ত নরকের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্ত স্বর্গও এই-রূপ। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই সেই সংস্কারবশতঃ ক্রমে তাহাতে মানবের প্রবৃত্তি হয়, আবার অনুষ্ঠান হয়, আবার প্রবৃত্তি হয়, এই ভাবে পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গসুখের আস্বাদ গ্রহণ করেন। কোরাণ সরিফের এইরূপ অর্থই বোধ করি সঙ্গত। তাহা না হইলে স্বর্গের বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া দহর সুরার যে আঠার আয়েতে "জঞ্জবীল বারি যাহা সন্‌সবীল নামে খ্যাত" আছে, একথার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় মৌলবী তস্‌লি-মুদ্দিন আহম্মদ "সন্‌সবীল" শব্দের অর্থ "সৎপথ প্রদর্শনকারিণী স্রোতস্বিনী" লিখিয়া-ছেন। স্বর্গে আবার সৎপথ প্রদর্শনের আবশ্যকতা কি? স্বর্গেও কি সৎপথ, অসৎ-পথ আছে? থাকিলে স্বীকার করিতে হইবে, সেখানেও সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম আছে। সৎকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম থাকিলে আবার স্বীকার করিতে হইবে, সৎকর্ম্মের ফল পুরস্কার, অসৎকর্ম্মের ফল তিরস্কার আছে। সুতরাং স্বর্গেও পাপ, পুণ্য আছে। পাপ, পুণ্য থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবীতে পার্থক্য কি? আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, এইরূপ অনন্তকোটী ভূপৃষ্ঠ আছে, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডে হউক, আর অন্য ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, পাপ-পুণ্যের ভোগের জন্য আত্মার আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্মে যে সংসর্গ-বশতঃ বা অন্য কারণে প্রথম পাপে বা প্রথম পুণ্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাও তো পূর্ব্বোক্ত আয়েত অনুসারে ইচ্ছা ভিন্ন হয় নাই, তাহারই বা কারণ কি? কারণ, ঐ আত্মার যে প্রথম পাপে বা প্রথম পুণ্যে প্রবৃত্তি দেখিতেছি, ইহাও প্রথম প্রবৃত্তি নয়। প্রথম প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে সেই প্রথম প্রবৃত্তিটী ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হয় নাই, ইহা বলিতে হয়। কোরান্ সরিফ ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে, জন্মান্তরে এই আত্মার এই কার্য্যে অনুষ্ঠান ছিল। সেই জন্য সংস্কার হইয়াছে, সংস্কার ছিল বলিয়াই আবার ইহ-জন্মে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সেই জন্মের সেই কর্ম্মেও জন্মান্তরের কর্ম্মজন্য সংস্কারবশতঃ সেই আত্মার প্রবৃত্তি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বজন্মেও আবার জন্মান্তরের কর্ম্মজন্য সংস্কারবশতঃ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই ভাবে ক্রমে চলিলে বুঝা যাইবে, আত্মার জন্মেরও আদি নাই, সুতরাং ঈশ্বর যে পাপীকে পাপে ও পুণ্যাত্মাকে পুণ্যে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে ঈশ্বরের সেইরূপ ইচ্ছাতে পক্ষপাতিতা বা যথেচ্ছাচারিতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, অনাদিকাল হইতে আত্মা আছে বলিয়া আত্মা অনাদি, এক্ষণে এই আয়েত দুইটী দেখিয়া স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, আত্মার জন্ম, শরীর পরিগ্রহও অনাদি। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, কোরান্ সরিফের নরকে সুখের লেশ নাই, স্বর্গেও দুঃখের বিন্দুমাত্র নাই, তাহার মীমাংসা কি করিয়া হয়? ঈশ্বরের বাক্য কি করিয়া সত্য হয়? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, সুখ থাকে থাকুক, দুঃখ না থাকে না থাকুক, তাহা দ্বারা কিছু আসে যায় না। দুঃখের উপলব্ধি ও সুখের অনুভূতিরই হইতেছে কথা। এক সময়ে দুইটী পদার্থের অনুভূতি হয় না, এইটী দার্শনিক সত্য, সুতরাং সুখানুভূতির সময়ে দুঃখানুভূতি হয় না। দুঃখানুভূতির সময়ে সুখানুভূতি হয় না।

পুত্র জন্মিল মানুষের সুখ হইল, সুখ হইল অর্থ সুখানুভূতি হইল। আবার পরক্ষণেই সেই পুত্রটীর বা অন্য আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি হইল। ঠিক সেই সুখানুভবের সময়ে দুঃখানুভব হয় নাই। যে জাতীয়ই কেন সুখ হউক না, তাহার অনুভবের সময়ে যখন বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকে না, তখন স্বর্গে দুঃখ নাই বলাতে দোষ হয় নাই। যে জাতীয়ই কোন দুঃখ হউক না, তাহার অনুভবের সময়ে যখন বিন্দুমাত্র সুখের অনুভব হয় না, তখন নরকে বিন্দুমাত্র সুখ নাই বলাতে দোষ হয় নাই। এই মানব জীবনে যখন প্রত্যেকেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখের ভোগ হইতেছে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি, তখন এই মানবজীবনকে বা এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে স্বর্গ নরক বলিতে পারি। আমরা যখন আরও অনন্তবার জন্মগ্রহণ করিব, তখন অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক বলাতে দোষ হয় নাই। সুখী ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায়, দুঃখী ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে সুখভোগ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে তাহাদিগের সুখদুঃখের তারতম্য হইয়াছে বলিতে হইবে। আর বলিতে হইবে, এই জন্যই কোরান্ সরিফে ঈশ্বর বলিতেছেন, "ভিন্নশ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ পৃথক্ করা হইবে।" এক সময়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সে সময়ে দাউল চাউল কিনিতে মানুষের আয়ে কুলাইত না, আর মাছ দুধ কিনিবে কি করিয়া? সেইজন্য গয়লা ও জেলেদের বড় কষ্ট হইয়াছিল, জেলেদিগের মধ্যে একটী জেলের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাহারা স্ত্রী পুরুষ দুইটী মাত্র প্রাণী মাছ পোড়াইয়া ও কচু পোড়াইয়া কোনরূপে দিনপাত করিত। শীতকাল, দুরন্ত শীত, অর্থাভাবে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে নাই, পুরাতন পুকুরের দল শুকাইয়া তাহাই গায়ে দিয়া রাত্রি কাটাইত। এইভাবে একদিন রাত্রিতে দুইজনে শয়ন করিয়াছিল, সেই সময়ে জেলেনী জেলেকে বলিল, তুমি বলিতে পার আমাদের অপেক্ষা জগতে দুঃখী কে আছে? জেলে রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, আমাদের অপেক্ষা জগতে দুঃখী কে আবার আছে? দুঃখের সময়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। জেলেনী হাসিয়া বলিল, তুমি বলিতে পারিলে না, কেন, রাণী ভবানী। রাণী ভবানী আমা অপেক্ষা দুঃখী। আমার তুমি আছ, রাণী ভবানীর স্বামী নাই। এই গল্পটীতে, আমরা একটী মহামূল্য উপদেশ পাইতেছি। জগতে কেহই একান্ততঃ দুঃখী, কেহই একান্ততঃ সুখী নাই। যখন দুঃখানুভূতির সময়ে সুখানুভূতি হয় না, সুখানুভূতির সময়ে দুঃখানুভূতি হয় না, তখন সুখানুভূতির সময়ে স্বর্গভোগ, দুঃখানুভূতির সময়ে নরক ভোগ প্রত্যেক নরনারীর হইতেছে। আবার অনন্তজন্ম পর্য্যন্ত মানবের সুখদুঃখভোগ আছে, সুতরাং ক্ষুদ্র পুণ্যেরও জন্য অনন্ত স্বর্গ ও ক্ষুদ্র পাপেরও জন্য অনন্ত নরকভোগ হইতেছে। ক্ষুদ্র পুণ্যানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বশতঃ—আবার মানবের তাদৃশ পুণ্যে প্রবৃত্তি, ক্ষুদ্র পাপানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বশতঃ আবার তাদৃশ পাপে প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং সেই সেই পুণ্যের ফলে সেই প্রকার সুখ স্বর্গ ও সেই সেই পাপের ফলে সেই প্রকার দুঃখ নরক পুনঃ পুনঃ হইতেছে। পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সুখদুঃখের তারতম্য হইতেছে, স্বর্গনরকেরও তারতম্য হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত আয়েতের অন্য প্রকার অর্থ করিলে কোন প্রকারে উপপত্তি হয় না? পূর্ব্বাপরে বিরোধ থাকিয়া যায়, ন্যায়পর ঈশ্বরের উপরে যথেচ্ছাচারিতা দোষের আরোপ করিতে হয়।

কোরাণোক্ত সপ্ত স্বর্গের ও স্বর্গের সোপান শ্রেণীরও উপপত্তি হয় না। নিম্নস্তরে যে আত্মা বাস করিবে, তাহার উচ্চস্তরের জন্য, নিম্নসোপানে যে আরূঢ় হইবে, তাহার উচ্চ সোপানের জন্য, স্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা হইবে। যতকাল তাহা হইবে, ততকাল সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ সেই আত্মার দুঃখের উপলব্ধি হইবে। সুতরাং স্বর্গেও দুঃখ আছে বলিতে হয়। ইন্‌শকার্ সুবার ১৯ আয়েত "ল তরকবুন্না তবকান্ আন্ তবক্" "নিশ্চয় তোমরা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আরোহণ করিবে" (সাহে কাদেরের অনুবাদ), "এক সোপান হইতে অন্য সোপানে অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আরোহণ করিবে" (মৌলানা আবদুল হকের অনুবাদ)।

"এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আরোহণ করিবে" (মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহম্মদের অনুবাদ) এই আয়েতটী হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত স্তবক শব্দের অর্থ পুষ্পগুচ্ছ। তবক্ ও স্তবক শব্দের আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। নিশ্চয়ার্থবাচক "কিল" শব্দের সহিত "ল" শব্দের ও উত্তরণকারী অর্থে প্রযুক্ত "তরক" শব্দের সহিত "তরফ" শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইজন্য আমরা উভয় শব্দের (স্তবক ও তবক শব্দের) অর্থগত ভেদ নাই, এইরূপ বলিতে কথঞ্চিৎ সাহস করিতেছি। এই আয়েতটির পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬, ১৭, ১৮ ও এই আয়েতের পূর্ব্বাংশ এইরূপ। "আমি রজনীর রক্তিম সময়ের শপথ করিতেছি এবং রজনী এবং যাহা আচ্ছন্ন করে (তাহার শপথ করিতেছি) এবং চন্দ্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার শপথ করিতেছি।" এই সকল আয়েতের সহিত যোগ করিয়া তরকা তবকের অর্থ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মেরই উপলব্ধি হয়। অনুবাদক মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহম্মদ মহাশয় সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভাতের সঙ্গে মৃত্যুকে পুনরায় কেয়ামতের দিবসে জাগরণের তুলনা করিয়া এই আয়েতগুলির বিস্তীর্ণ ও বিশদ অর্থ লিখিয়াছেন। বিশ্বাসী মুসলমান ও হিন্দু ভ্রাতাদিগকে আমি সেই অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সেই তুলনাগুলির সঙ্গে আমি আর একটী তুলনার যোগ করিয়া এই আয়েতগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছি। সে আর কিছুই নয়, সন্ধ্যাকাল যেমন একবার মাত্র হয় না, রাত্রি যেমন একবারমাত্র হয় না, প্রভাত যেমন একবারমাত্র হয় না, চন্দ্রের ক্রমবর্দ্ধন ও ক্রমহ্রাস যেমন একবারমাত্র হয় না, সেইরূপ মৃত্যুও কেবল একবারমাত্র হয় না, জন্মও কেবল একবারমাত্র হয় না, শরীরের ক্রমবর্দ্ধন ও ক্রমহ্রাসও কেবল একবারমাত্র হয় না। সায়ংকালের মত, রাত্রির মত, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতেছে, প্রভাতের মত পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতেছে, চন্দ্রের পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধন ও ক্ষয়ের মত শরীরেরও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধন ও ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ অর্থই বোধ হয় সঙ্গত। ফজর নামক সুরার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আয়েতেও এইরূপ শপথ আছে। তৃতীয় আয়েতে যে "যুগ্ম" ও "অযুগ্ম" সংখ্যার শপথ আছে, তাহার তাৎপর্য্য যুগ্ম ও অযুগ্ম ভিন্ন সংখ্যা নাই। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে অসংখ্যও যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। এই আয়েতের দ্বারা অসংখ্যবার জন্মমরণের কথা বলা হইয়াছে। ফজর সুরার ২৭ ও ২৮ আয়েতে আছে (মরণকালে সাধু আত্মাদিগকে সস্নেহে বলা হইবে) "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, সানন্দে তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আইস। অতঃপর আমার আজ্ঞাবহদিগের দলে ভুক্ত হও এবং অতঃপর আমার উদ্যানে প্রবেশ

কর।” যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করেন, অবতীর্ণ পুস্তকের আদেশমত কার্য্য করেন, তাঁহারাই যে ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী, তাহাতে সন্দেহ নাই। “তাঁহাদিগের দলে ভুক্ত হও” বলাতে তুমিও তাঁহাদিগের মত ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হও, এইরূপ বুঝাইতেছে। অতঃপর অর্থ ক্রমে ভজন সাধন করিলে “আমার উদ্যানে প্রবেশ করিবে” অর্থ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবে। মৃত্যুর অনেককাল পরেই যদি একসঙ্গে সকলের মহাবিচার হয়, তবে মৃত্যুর পরে সেই বিচারের পূর্ব্বে সাধু আত্মাকে “শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা” বলিয়া কি করিয়া সম্বোধন করা হইল? কি করিয়াই বা ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহীদিগের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার আদেশ প্রচারিত হইল? কি করিয়াই বা পাপীদিগকে মৃত্যুর পরেই বিচারের পূর্ব্বেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইবে?* অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, বিচার করিবার পূর্ব্বেও তিনি সকলের পাপ পুণ্য অবগত। সুতরাং মৃত্যুর পরেই তিনি পুণ্যবান্ ও পাপীদিগকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিতে পারেন। রাখিতে পারেন সত্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞ তাহাও সত্য, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের তবে আবার একটা মহাবিচারের অভিনয় কেন? পূর্ব্বেই তো পুণ্যাত্মার উর্দ্ধগতি ও পাপাত্মার অধোগতি নিরূপিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরেই বা কি করিয়া পাপী ও পুণ্যাত্মা স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফল বুঝিতে পারিবে?† মৃত্যুর পরেই সুকৃতি অনুসারে উর্দ্ধলোকে, ফেরেস্তাগণের সহিত, দুষ্কৃতি অনুসারে অধোলোকে জীনদিগের সহিত বিচারের

* মুতফ একীন সুরার প্রথম হইতে ২৭ সাতাইশ আয়েত পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

† নবা সুরার চতুর্থ এবং পঞ্চম আয়েত দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই মিলিত হয়।* হিন্দুশাস্ত্রে যেমন কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ উভয়বিধ পদার্থের প্রত্যেকের উপরে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, কোরান্ শরিফের ফেরেস্তা (দেবতা) জীন (অপদেবতা) সেইরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্তঃকরণের সদ্‌বৃত্তিগুলি ফেরেস্তা, অন্তঃকরণের অসদ্‌বৃত্তিগুলি সয়তানের সেনা বা জীন। পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে পরজন্মে সদ্‌বৃত্তির সহবাস, পাপকর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে পরজন্মে অসদ্‌বৃত্তির সহবাস ভিন্ন ইহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য বোধ হয় না। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ভগবানের সিংহাসন বহন করিবার জন্য চারিটী ফেরেস্তা নিযুক্ত। এ পৃথিবী ধ্বংসের পরে ঈশ্বরের সিংহাসন আটজন ফেরেস্তায় বহন করিবেন, এই হইতেছে কোরান্ শরিফের উপদেশ। মর্ত্ত্যলোক অপেক্ষা পুণ্যাত্মার না হয় স্বর্গে বহুবিধ অবিনশ্বর সুখসমৃদ্ধি লাভ হয় হউক, সেই যুগে ঈশ্বরের জাঁকজমকের প্রয়োজন কি? তাঁহার আটজন বেহারার পাল্‌কির ব্যবস্থা করিয়া কতটা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইবে? কেবল বাহক বৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয় না। সিংহাসনের জাঁক্‌জমক্ চাই, ছত্রদণ্ডের জাঁক্‌জমক্ চাই, পরিচ্ছদের জাঁক্‌জমক্ চাই, কই তাহা তো পবিত্র কোরান্ শরিফে উল্লিখিত হয় নাই? আবার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র তিনি অবস্থিত, সকল পদার্থ তাঁহাতে অবস্থিত, কোরান্ শরিফে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন আবার কি? তাঁহার সিংহাসন বহনই বা কি? পুণ্যাত্মারা ইহজন্মে যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলে চারিজন ফেরেস্তা তাঁহাদিগের নিকটে ঈশ্বরকে ইহজন্মে উপস্থিত করেন, আবার আগামী জন্মে সেই সকল পুণ্যাত্মার নিকটে

* ইন্‌শকাক সুরার উনবিংশ আয়েতের বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

আটজন ফেরেস্তা ঈশ্বরকে উপস্থিত করিবেন, তাৎপর্য্য ক্রমে সদ্বৃত্তিগুলি সৎকর্ম্মের ফলে ঈশ্বরাভিমুখী হইবে, তাহার ফলে সেই সকল সৌভাগ্যশালী মানবের শীঘ্র ঈশ্বরোপলব্ধি হইবে, তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইবেন। গাশী (এ) আ-(ত) হ সুরার ২৪ ও ২৫ আয়েতে আছে, "আল্লাহ তাহাদিগকে অতি যন্ত্রণায় যন্ত্রণাগ্রস্ত করিবেন, আমারই দিকে নিশ্চয় নিশ্চয় ফিরিয়া আসিতে হইবে।" এই আয়েত দুইটীর আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, কোটী কোটী যুগ নরক ভোগ করিয়াও আত্মা আবার ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া থাকে। সুতরাং নরক হইতে উদ্ধার নাই, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে। মহাপ্রলয়ের কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে, কোরান্ শরিফে আছে, বাইবেলে আছে, জেন্দাভেস্তায় আছে। মহাপ্রলয়ে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পরে স্বর্গে বাস বা নরকে বাস অসম্ভব। কোরান্ শরিফের মহাপ্রলয়ের বর্ণনায় আছে, ঈশ্বরভিন্ন সে সময় কিছুই থাকিবে না, আকাশ পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে। ফেরেস্তাগণ ও জীবাত্মগণ সে সময়ে ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং স্বর্গের জন্য বা নরকের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট লোকের সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। আমি কোরান্ শরিফে জন্মান্তরবাদ বুঝাইতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছি। আর মহাপ্রলয়ের কথা তুলিয়া আমি সাহিত্য-সভার সহৃদয় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। সৌভাগ্য থাকিলে বারান্তরে মহাপ্রলয় লইয়া উপস্থিত হইব। এই স্থানেই আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্ত্তিক অবস্থা।

সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ,

যে জাতির অবস্থা ভাল, যাহাদের অন্নচিন্তা অন্যান্য চিন্তার সমতুল, তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে ফরাসি জাতির মত নিরুদ্ধ হইলেও সমভাবে থাকে। কিন্তু আদমসুমারির হিসাবমত বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। অতএব ইহাদের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইতেছে, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনা করিতে আমি প্রথমে নিম্ন শ্রেণীর ও পরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর কথা বলিব।

বঙ্গদেশে যে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে অথবা কোন মহকুমায় থাকিয়া আমরা বড় একটা তাহা বুঝিতে পারি না। পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে, কিন্তু ঘোর সন্দেহের আবির্ভাব হয়। যেখানে পূর্ব্বে গোয়ালা-পাড়ায়, তাঁতি-পাড়ায়, কুমার-পাড়ায়, নিকিরী-পাড়ায় শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ বিরাজ করিত, সেখানে খানকত জীর্ণ কুটীর, অথবা সাবেক ভিটা, কিংবা একটা বেলগাছ কি চাঁপাফুলের গাছ বা সিউলিফুলের গাছ দেখিয়া মনে হয়, এগুলি যে জনহীন ভিটার পরিচয় দিতেছে, সে ভিটার অধিকারীরা কোথায় গেল? ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থদের বাটী সহজে ধূলিসাৎ হইবার নহে, সেই জন্য সেগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও কত অতীতের কথা স্মৃতিপথে আনিয়া দিতেছে। কত ঢালতলোয়ারধারী নিধিরাম

সর্দ্দার, ভজহরি সর্দ্দার, তাহাদের দ্বারে ছিল, কত বঙ্গীয় দাস দাসী, কত রায়ত জন ও প্রজা, কত পূজারী ব্রাহ্মণ, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী, কত গাভী গোশালা ও রাখাল, কত চাল কাঁড়িবার ও ডাল ভাঙ্গিবার গ্রাম সম্পর্কের স্ত্রীলোক—যাহারা এ সব গৃহ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল?

অনেকে বিদেশে চাকরী বা ব্যবসায় করিতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা ভদ্রলোক না ছোটলোক? ভদ্রলোক ছোটলোককে লইয়া যান নাই এবং ছোটলোকও ভদ্রলোকের ভরসায় বিদেশযাত্রী হয় নাই। অতএব একের বিহনে অপরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার ও জানিবার বিষয়। আমার দেশের ভদ্রলোক চিরকালই কায়িক পরিশ্রমে কাতর। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার অভাব পূরণার্থ শ্রমিকের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। তিনি যে বঙ্গের এক পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্য পল্লীতে না গিয়া বঙ্গদেশের কোন নগরে অথবা কোন বড় ব্যবসায়ের স্থানে গিয়াছেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তথাকার শ্রমিকেরা তাঁহার আগমনে সংখ্যায় বর্দ্ধিত না হইলেও নবাগত ব্যক্তির আগমনে যেরূপ বেতন বর্দ্ধিত করিয়া লইল, তাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পল্লীর শ্রমিক সেই পরিমাণে স্বকীয় বেতনহ্রাস স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল যে কিছুকালের জন্য তথাকার শ্রমিক বঞ্চিত হইল এরূপ নহে, অনেকস্থলে তাহার সেই ক্ষতি চিরস্থায়ী হইল, কারণ তাহার পল্লীতে নূতন লোক-সমাগমের কোন সম্ভাবনাই হইল না; অধিকন্তু যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরিবারের অনুপযুক্ত ব্যক্তি অথবা বিধবা ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইল। এইরূপে পল্লীত্যাগ প্রায় তিন চারি পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম এই অনর্থের আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের পথ অপরে অনুসরণ করিলে অচিরে দেশের তরি-তরকারীর মূল্য দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইবে; তখন তাঁহারা মনে করেন নাই যে, তাঁহাদের মত বেতন পাইয়া তাঁহাদের ভাবী বংশধরেরা সে অর্থে আর সে পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে পাইবে না; তখন তাঁহারা ভাবেন নাই যে, যাহাদের লইয়া তাঁহার এই পল্লী গঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া শত শত শ্রমজীবী জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাঁহাদের ন্যায়পরতায় নির্ভর করিয়া সরল কৃষক নিজ গৃহ-উচ্ছেদকারী মামলায় লিপ্ত হয় নাই, অথবা বিজিগীষু, অর্থলিপ্সু ব্যবহারাজীবের প্ররোচনায় অলীক স্বত্বলাভের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হয় নাই, আজ তাঁহাদের অভাবে কুলালচক্র অচল, গাভীপ্রতিপালন অসম্ভব, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা সমলপঙ্কিল, রথ্যাদি গুল্মলতাদিতে সমাচ্ছন্ন, প্রজা দুর্ব্বল ও হতাশ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে ব্যগ্র করিয়া বিচারপ্রার্থী, তাঁহাদের অভাবে সর্ব্বত্রই নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান, সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ বহু অতীতের কথা। তাঁহারা ভাবেন নাই যে, ছিদ্র পাইয়া ম্যালেরিয়া ও জরা আসিয়া নিজ সংহারপক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক দীঘির কালো জলে বসিবে, তাঁহারা ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের ভগ্নচূড় গৃহে আর দুর্নীতির শাসন হইবে না।

দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া তদ্বিনিময়ে অন্য সামগ্রী পাইবার আকাঙ্ক্ষা এইরূপে নিষ্ফল ও প্রতিহত হওয়ায় অনায়াসে অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধনসামগ্রী-লাভের বাসনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিল।

স্বর্ণকারের কর্ম্মশালা দিবসে রুদ্ধদ্বার হইয়াও দস্যুতস্করের সুবিধার নিমিত্ত রাত্রে কর্ম্মময় হইয়া উঠিল। নিজ বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করা উচিত কি না, এই চিন্তায় আন্দোলনে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেল। এ দিকে পূর্ব্বকার ম্লেচ্ছ রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজার রাজত্ব সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আমাদের রাজার দেশের লোকেরা যে কেবল মুসলমানদের মত বলবীর্য্যবান্, এরূপ নহে; ইঁহারা জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও সর্ব্ববিদিত ব্যবসায়ী। যেখানে যে সামগ্রীর অভাব, ইঁহারা ব্যবসায়ের নিজেদের অথবা অপরের দেশ হইতে তাহা প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন; কিন্তু যে সামগ্রীগুলি আনিলেন, সেগুলি যে কেবল প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমনোহর এরূপ নহে, পরন্তু সেগুলি ধনবিজ্ঞান-সম্মত আপেক্ষিক ব্যয়ের (Comparative cost of production) তারতম্যানুসারে শ্রমবিভাগে উৎপন্ন ও প্রস্তুত বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ। ইংরাজগণের আবির্ভাবে মুসলমান অরাজকতা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া দেশীয় বণিক্গণের ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এদেশ হইতে কাঁচা মালগুলি বিদেশে রপ্তানী হইয়া তথাকার কল কারখানা সাহায্যে পাকা মালে পরিণত হইতে লাগিল। কলকারখানার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত কাঁচা মালের যথানিয়ম যোগান অপেক্ষা টান অধিক হইল; তন্নিমিত্ত কাঁচা মালের দরও চড়িয়া গেল এবং টাকার টান অনুভূত হওয়ায় সুদের হারও বর্দ্ধিত হইল। এজন্য পূর্ব্বেকার বণিকেরা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া মহাজনের কার্য্য করিতে লাগিল। নিরুদ্ধ বিলাসভোগ বাসনা, ভোগ সামগ্রীর বৈচিত্র্যে ও সুলভতায় উচ্ছৃঙ্খল হইল। বিলাসীর সহবাসে অনুৎপাদনকারীর বিলাস বাড়িল। নিত্য নব অভাব মোচনে নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। স্থির-নিশ্চিত-পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ আবশ্যক উপযোগিতার অভাব পরিদৃশ্যমান হইল। হিন্দু শিল্পী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। শিক্ষা দীক্ষার কোন বন্দোবস্তে দেশীয় ভদ্রলোকের আস্থা দেখা গেল না। শ্রমিকের কর্ম্ম-সামর্থ্য ব্যর্থ হইল। কর্ম্মকর্ত্তারও অভ্যুদয় হইল না।

এ দিকে পল্লীতে হাঁড়ি কলসী কিনিবার লোক নাই। পূর্ব্বে কুমারদের এমনি একতা ছিল যে, জমীদার জমী লইয়া গোলযোগ করিলেই ইহারা "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিত।" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই হাটে আর হাঁড়ি আমদানি হইত না; দেশের লোক মিলিয়া তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেন। আজকাল কয়লার জ্বালে সকল হাঁড়ি টিকে না। পরন্তু সহরে আনিবার অসুবিধা ও খরচ। এইজন্য অনেক স্থলে কুমারের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘাটালের মত কয়েকটী মাত্র স্থানের কুমারেরা সম্পূর্ণ শ্রম-সামর্থ্য দেখাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইলেও সমগ্র বাঙ্গালার কুম্ভকারদের কর্ম্মসংস্থান হইতেছে না।

তাঁতির অবস্থা জোলার অপেক্ষাও মন্দ। জোলারা কর্ম্মের অভাবে জমি কর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাঁতিরা তাহা এখনও করিতে পারে নাই। কেবল ধনী লোকেরই তাঁতের কাপড় খরিদ করা সম্ভব এবং বঙ্গদেশে ধনীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে; অধিকন্তু রাজসরকারে বা সভাসমিতিতে দুই তিন পুরুষ হইতে কাটা কাপড়ের প্রচলন বদ্ধমূল হইয়াছে।

কাঁসা পিতলের বাসনের প্রচলন এখনও আছে, তথাপি এনামেলের বাসন প্রায় অর্দ্ধেক স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছে। একটী পিতলের গেলাস যতদিন চলে, চারিটী

এনামেলের গ্লাস সে সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু পিতলের গ্লাস ভাঙ্গিলেও উহা পিতলের দরে বিক্রীত হয়। অথচ এনামেলের গ্লাস অব্যবহার্য্য হইলে তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। এই প্রকারে যে কেবল কাঁসারীর আয় কমিতেছে এরূপ নহে, যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী এনামেলের গেলাস ক্রয় করিতেছে, তাহাদেরও মোটের উপর ধননাশ হইতেছে।

বাঙ্গালী কামার আজকাল আর সকল পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রায় অনেক স্থান, খাঁড়া, কাস্তে, দা, কুড়াল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বাঙ্গালার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে নূতন দা অথবা বঁটী আমদানি হয়। দুর্গাপূজার সময় বলি দিতে কামার আবশ্যক হয়, কিন্তু দুর্গাপূজার ব্যয় প্রায় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ভাল ছুরি, কাঁচি ও ঢালাই কড়া ভারতের বাহির হইতে আসে এবং পেটা কড়া বেহার অঞ্চলে অল্প মজুরিতে প্রস্তুত হয়।

পল্লীগ্রামেও স্বর্ণকারের আবশ্যকতা এখনও অনুভূত হয়; হিন্দু গৃহে কন্যার জন্ম হইলেই স্বর্ণকার আবশ্যক। সহরে উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের সংখ্যা মোটের উপরে হ্রাস পাইতেছে। কারণ যাহারা অতিশয় দক্ষ ও কৃতকর্ম্মা তাহারাই সহরে আসিয়া অধিক নৈপুণ্য ও শ্রমসামর্থ্য দেখাইতে পাইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে পল্লীতে যে কয় ঘর স্বর্ণকার ছিল, এখন তাহার তুলনায় কিছুই নাই বলিলেই হয়।

কাঠের সিন্দুকের পরিবর্ত্তে এখন লোহার ট্রাঙ্কের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে; তবে পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী চেয়ার টেবিল প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি প্রায় কর্ম্মকর্ত্তার শ্রমবিভাগ-বৃদ্ধিতে প্রস্তুত হয় বলিয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিরাই সম্পূর্ণ শ্রমসামর্থ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু পল্লীর সূত্রধরেরা গো-শকটের চক্র অথবা লাঙ্গল নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পাইতেছে না।

এক্ষণে প্রস্তুতকারকদের ত্যাগ করিয়া একবার উৎপাদকদের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। বিবাদ বিসংবাদ আসিয়া শ্রম-বিভাগবিধিতে কর্ম্মসাধনে বাধা দিতেছে। কেবল নিড়ানে পটু বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে না এবং কেবল গভীর কর্ষণে পটু যুবা কৃষক ভাল করিয়া জমী নিড়াইতে পারিতেছে না। উভয়ের সমবেত শ্রমসামর্থ্য কোন ভূমিই লাভ করিতেছে না। এ দিকে জমীদার মহাশয় রাজধানীতে থাকেন বলিয়া ভাগাড়-গুলি অস্থিকঙ্কালশূন্য। এইরূপে ক্ষেত্র সমুদায় সারবর্জ্জিত হইতেছে। তাহার উপর কৃষক শ্রমবিভাগ প্রথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং জমীতে আর অধিক ফসল জন্মে না; যাহা কিছু জন্মে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সে তাহা নিজে কাটিতে পায় না; সেই জন্য অধিক মজুরী দিয়া তাহাকে কৃষাণ নিযুক্ত করিতে হয়। অপরকে অধিক মজুরী দিয়া কর্ত্তিত ধান্যে মহাজনের ঋণের সুদ বণ্টিত করায় উৎপাদন-ব্যয় (Cost-of production) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং অধিক সুদে নিয়োজিত মূলধন হইতে লাভের হার ক্রমিক হ্রাস (Law of diminishing returns) পাইতে থাকে।

উৎপাদকের মধ্যে দেখা গেল তাহাদের লাভ এখন ক্রমিকই হ্রাস পাইতেছে, এবং প্রস্তুতকারকদের অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়;

কারণ যাহারা সহরে আসিয়া আধুনিক উন্নত উপায়ে সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে, এরূপ নিতান্ত উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই কর্ম্মসংস্থানহীন। হিন্দু ও মুসলমান জাতির অভাবমত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যাহারা জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা উহাদেরই আধুনিক ভিন্ন জাতীয় অভাব মোচন করিতে অক্ষম। আজ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইউরোপীয়দের অনুকরণে আপনাদের বাসনাপ্রীতিকর সামগ্রীতে মুগ্ধ। অতএব দেশের খরিদ্দারগুলির ক্রয়সামর্থ্যও প্রাচীন শিল্পীর সাহায্যে আসিতেছে না। সচরাচর দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে লাভ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে পাটের চাষ করিতেছে বটে, তথাপি উন্নত কৃষি-পদ্ধতি আজিও প্রবর্ত্তিত হইল না; অধিকন্তু সস্তায় মূলধন-প্রাপ্তির কোন বিধিতেই দেশের ভদ্রলোকের আন্তরিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে পল্লীত্যাগী স্বদেশবাসী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া হিন্দু উৎপাদক ও নির্ম্মাতা যে নূতন রাজা ও ইউরোপীয়গণের অনুষ্ঠিত নানাবিধ কার্য্যে নিজেদের সামর্থ্য দেখাইবে, তাহারই বা উপায় কৈ?

হিন্দু চিরন্তন সংস্কারের অধীন। ধর্ম্ম তাহার কর্ম্মে বাধা দিতেছে। মুসলমানের এক মনিব ছিল, এখন দুই মনিব হইয়াছে; তন্মধ্যে একের ব্যয়-সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ের অন্ততঃ দুইটী মুসলমান চাকর দরকার। আদালতের দপ্তরি, পেয়াদা, ঘোড়ার গাড়ীর সহিস কোচুয়ান, রেল জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই মুসলমান। অল্প বেতনে হিন্দু তাহার ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারে না, তাই রামা শ্যামা আমাদের বাড়ীতে স্থান পায় না; নিকাতে ও এক পয়সায় ছাতুতে সন্তুষ্ট কাহার, কূর্ম্মী অথবা উৎকল দেশের পাঁকালে অভ্যন্তকরণ জাতি তাহার স্থান লইয়াছে। রাজধানীতে আসিবার সময় আমরা ভজহরি সর্দ্দারকে আনি নাই, তাই সে দস্যুদলে আশ্রয় লইয়াছে। কৈ ছোটলোক হিন্দুকে ত বাড়ীতে দেখিলাম না, আদালতে দেখিলাম না, রেলে জাহাজে দেখিলাম না, আমরা এখন কাপুড়ে বাবু হইয়াছি, তবু তাহাকে কাটা পোষাকের দোকানে দেখিলাম না, তবে সে গেল কোথা? আজ দুই তিন পুরুষ হইতে তাহার রোজগারের পথ একেবারে বন্ধ। বাবুরা পল্লীত্যাগ করায় ম্যালেরিয়া তাহার প্রভু; জমীদার তাহার কাতর মর্ম্মবেদনায় কঠোর হাস্য উপহার দিতেছে; তাহার বিপদে আর ভিক্ষার হাট* বসে না; হিন্দু সংস্কার তাহাকে বাটী হইতে বাহিরে ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করিতে দেয় নাই—তাহার ধনভাণ্ডার বহুদিন হইতে শূন্য। চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াও পিণ্ডের ব্যবস্থায় হালের গরু ও ঘোথ জমা বাঁধা দিয়া সে তিনকুড়ি বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর যৌবন উন্মেষের পূর্ব্বে তাহার ইহলীলা সংবরণ হইয়াছে। তাই আজ ঘোষের পো—তেলির পোর পরিবর্ত্তে গয়লাবৌ তেলিবৌ আসিয়া আবেদন অভিযোগ করিতেছে, বহু পুরাতন মনিবের বংশধরের নিকট পূর্ব্বপুরুষের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে। পল্লীর শ্মশান এখনও কিন্তু তাহাদের কাতরধ্বনিতে বাবুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। সমগ্র উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পরিবার নূতন রাজার

* পূর্ব্বে উৎপাদনকারী দরিদ্র হিন্দুর পিতৃশ্রাদ্ধাদির সময় ভিক্ষার হাট বসিত অর্থাৎ পটোলওয়ালার বিপদুদ্ধারের জন্য সে দিন হাটে আর অন্য পটোলওয়ালা আসিত না এবং পূর্ব্বোক্ত পটোলওয়ালার পটোল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

আবির্ভাবে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী হইবার নিমিত্ত, অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত, যে ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইতেছিল, তাহার বশে আজ তাহাদের চিরমুখাপেক্ষী দরিদ্র হিন্দু পিতৃহীন, অসহায়, সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভদ্র হিন্দু নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া, এবং নিজেও অনুতপ্ত না হইয়া আজ লাট সভার রাজার সহানুভূতি-প্রার্থী। তাই কবির কথায় বলিতেছি ;

"কিন্তু হায়! পল্লীগুলি—
সারা ভারতের প্রাণ—
হলে ধ্বংস, হবে ধ্রুব—
দেশলক্ষ্মী অন্তর্ধান!"
পল্লীবিলাপ।

"শ্রামিককে দেয় মূলধনের অনুপাতে শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক স্বরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে ; যথা— নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধনসম্পত্তির অধিকারী না হইলে সংসার-প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রামিকজাতি অর্থ দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তবায়, কুম্ভকার, গোপ প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে সেই নিয়ম আজিও প্রচলিত দেখা যায়। টাকার জোগাড় করিতে না পারাতে অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত বয়সে অর্থসংগ্রহ করিয়া বালিকাপত্নী লাভ করিয়া থাকে। সেই বালিকার যৌবনোদ্ভেদ হইবার পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই তাহার বৃদ্ধ স্বামীর লোকান্তর ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে ঐ সকল জাতির বংশবৃদ্ধি এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। আজি কালি অনেক গ্রামে একটীও কুম্ভকার বা কর্ম্মকার পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারগণের কঠোর নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্রদায়ের বংশলোপের অন্য একটী কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম-প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কি? দেশে যাহাতে শ্রামিকের সংখ্যা এবং তজ্জন্য জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি না পায়। বিবেচনা করুন, দেশে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে না ; কিন্তু লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি বঙ্গদেশের শ্রামিকদের বংশবৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, তাহা হইলে মজুরী হ্রাস পাইত এবং বর্দ্ধমান জনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভূমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইলেও নানা কারণে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না, অথচ অন্য দেশে শ্রামিকদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশ ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ এবং একপ্রকার স্থিতিশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে উপায়ে এদেশে শিল্পজাত বা কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হইত, আজি বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ কল কারখানা ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্র সৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশীয় স্থিতিশীল শিল্পী তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিনিবহ উন্নত বিজ্ঞান-বলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাতে আমরা অন্য দেশের অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতেছি, তাহাতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে নিজকর্ম্মদোষে ও

আমাদিগের নিজের বহুদর্শিতার অভাবে আমরা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য শ্রামিকদিগের দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ভূয়োদর্শন-বলে শ্রামিকদিগের বেতনসংস্থান বর্দ্ধিত করিবার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, অকর্ম্মণ্য আমরা বিজ্ঞানবলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কলকারখানা এবং শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রাদি সৃষ্টি না করিয়া বৈদেশিক সুলভ দ্রব্যসামগ্রী-লাভেই কৃতার্থম্মণ্য হইতেছি, তথাপি সরকার বাহাদুরের নিয়োজিত কামিং সাহেব ইত্যাদির বিজ্ঞজনোচিত মতের অনুমোদিত ব্যবস্থায় সুলভে বহুল পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী নবোদ্ভাবিত উপায়ে কলকারখানা সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং মূলধন না থাকিলে যে কার্য্যানুষ্ঠানের অভাবে শ্রামিকদের বেতন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন বংশ বৃদ্ধি হইতেছে না, শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান স্বরূপ মূলধনও পশ্চাৎপদ বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক শিল্প-বিস্তার অভ্যুদয়ে যদি উন্নত উপায়ে কৃষি-কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অথবা কাঁচা মালগুলি সুলভে পাকা মালে রূপান্তরিত করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলেই বর্দ্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশ-বাসী শ্রামিকের বেতনবৃদ্ধি হইবে, নচেৎ এতদ্দেশবাসী শ্রামিকের প্রাপ্য বেতন অন্য দেশবাসী শ্রামিক লইয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; আধুনিক বঙ্গদেশবাসী তাহাদের বেতন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে তাহারা ক্রমে অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর* বেতন অপেক্ষা-কৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়াও কেহ কেহ সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, বা বিলাস-সামগ্রী উপভোগ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরব্ধ না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশের মূলধন বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

(১) সস্তায় ও সুগমে মালের গতিবিধি,

(২) সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন প্রাপ্তি,

(৩) কাঁচা মাল উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার,

(৪) এবং ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ† হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়।

(১) এক রেল-বিস্তারে আজ পর্য্যন্ত ২৪০০ শত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষে ব্যয়িত হই-য়াছে; কত শত লক্ষ মুদ্রা খাল-খননে ও রথ্যা-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন খালে পর্য্যন্ত ষ্টীমার নৌকা এত অধিক যাতায়াত করে, পাকা রাস্তায় এত অধিক গরুর গাড়ী চলিতেছে এবং বহুবিস্তৃত রেলপথে মাল গাড়ীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, যে মালের গমনাগমন বিষয়ে ভারতবাসীকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না।

(২) মূলধন আমাদের দেশে সহজে

* ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

† ("Commerce of Nations" by C. F. Bastable).

অল্প সুদে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প ও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই। বিজাতীয় যে সকল ব্যাঙ্কে আমাদের ধনীদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহা ধনীদের হিসাবে জমা ও ব্যাঙ্কের হিসাবে ধার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে ধার করিয়া, তাহারা যাহাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের আবার ধার দেয়। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশিষ্টরূপে কোন ব্যবসায় চালাইতে পারি নাই। আমাদের বাজারসম্ভ্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া আমরা সহজে ধার পাই না। ব্যয় সংযম করিয়া লোকে যে মূলধনের সৃষ্টি করে, উহা নিজে ব্যবহার করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকে। এইরূপে দেশের অব্যবহৃত মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকর্ম্মা লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থ ব্যাঙ্কে জমা আছে যে, তদ্দ্বারা বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় বণিক্‌গণই এই অর্থের ব্যবহার করিতেছে। আমাদের দেশের অব্যবহৃত মূলধন লইয়া বিদেশীয় বণিক্‌গণ ব্যবসায় কার্য্য সুরু করিয়া লইতেছে। ফল কথা, আমাদের ব্যাঙ্কও নাই, বাজার-সম্ভ্রমও নাই, সুতরাং আমাদের দেশের অর্থ আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ধনীদের ধনভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ অংশ মূলধন করিয়া যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দস্তরমত ঐ অর্থের বিশ গুণ অর্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। নির্ম্মাতারা তাহাদের মাল দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে "ক্যাশ ক্রেডিট" পাইতে পারেন। বিশিষ্ট লোকের মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত ব্যবসায়িগণ ধার করিতে পারিবে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল ধনী একেবারে চাঁদা হিসাবে দান করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দান করিতে অপারক, তাঁহারা ব্যাঙ্ককে মধ্যস্থ করিয়া সুদের লোভে কৃতকর্ম্মা লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

"But ever let us beware of paternalism. Not charity but co-operation is the crying need of the hour" (H. H. The Gaikwar I. I. Conference.)

থিয়রি অফ্‌ ব্যাঙ্কিং (Theory of Banking) গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনামধন্য ম্যাক্‌লাউড (Macleod) সাহেব বলিয়াছেন, "Several professions require a certain amount of ready capital to start with. In England those who enter such professions must have the actual capital; in Scotland it is done by means of a credit guaranteed by their friends."

"These credits are granted to all classes of society to the poor as freely as to the rich. Everything depends upon character. Multitudes of men who have raised themselves from the humblest positions in life to enormous wealth began with nothing but a cash credit."

(৩) যথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তুত অথবা কাঁচা মাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্যরক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, দুঃখের বিষয় সেই বাঙ্গালার জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত ভূমিগুলি সস্তায় বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরম্ভ হইবে। কাঁচা মাল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন

হইবে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, দুই তিন জন জমীদার মিলিয়া কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ স্ব স্ব মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও মূলধন অল্প সুদে পাইয়া খাটাইতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজার বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দিতে অনুমতি দিলে, ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহাদিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতান্ত আবশ্যক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিপুণ জমীদারদিগের আত্মীয়গণ যদি নিজ নিজ জমীদারিতে চাষের উন্নতি সাধন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাঁচা মালে দেশ ভরিয়া যাইবে।

"Motherland is the source of all wealth, manufacturing as well as agricultural, and manufacturing industries rise and fall with the produce of the land, and therefore the man who holds the the land of Bengal holds the key to his country's wealth."

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হ্যামিল্টন সাহেবের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

আমেরিকার ওয়াকার সাহেব বলেন, আমেরিকার প্রজা ও জমিদার নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। জমিদার খাজনা চাহিলে প্রজা তাহার জমি ছাড়িয়া দিয়া দূরদেশে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্প খাজনায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকে। এদিকে জমিদারও যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার জমির কোন বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্য প্রজা অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইবে, তাহা হইলে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

ভারতবর্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার সংখ্যাই অধিক। জমির খাজনা কি উপায়ে বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া, কিংবা তাহার জমিতে তুল, রিয়া প্রভৃতির চাষে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদের বিঘা প্রতি বর্দ্ধমান ফসলের সেই বর্দ্ধিত ধনাগমের অনুপাতে খাজনা বাড়াইতে পারেন; কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই।

লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং সেই নিমিত্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নহে। ইংলণ্ডের গোধূমের দরের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৪০ খ্রী অব্দের যে দর ছিল, ১৮৯৪ খ্রী অব্দের প্রায় তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে। ইংলণ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও অন্য দেশে বিঘাপ্রতি অধিক ফসল ও মালের সুলভে পরিচালনই ইহার একমাত্র কারণ। অথচ যে সকল দেশে গোধূম উৎপন্ন হইতেছে, তথায় খাজনা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ ক্রমিকই অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানভূম ও সিংহভূম প্রদেশের জমির খাজনা সেলামীবাদে বিঘা প্রতি এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্তও দেখা যায়। তথাপি এই দুর্ম্মূল্য দেশের প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই সকল সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বঙ্গদেশীয় জমিদারও কত জমি পতিত রাখিতেছেন, তথাপি খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিবেন না। যে জমিদারের সকল জমিই প্রজাবিলিতে আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথায় মঙ্গলময়; কিন্তু যেখানে অনেক জমি পতিত আছে,

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না।

কলিকাতার দশ বার ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাওয়াতে তৎপ্রদেশস্থ প্রজাবর্গ জমি ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে; ইহাতে দ্রব্যসামগ্রী অধিক মহার্ঘ হইলেও তাহারা অধিক বেতন পায় বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জমিদারগণ ঐ সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক খাজনা পাইলেও প্রজাগণের ত্যক্ত জমির খাজনা হ্রাস করিতেছেন না—করিলে অল্প খাজনায় সেই সকল জমি অনায়াসে বিলি হইয়া যাইত এবং তৎসমুদায়ে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশে দ্রব্যসামগ্রী সুলভ হইত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারকে খাজনার জন্য ভাবিতে হয় না। তাঁহারা কলওয়ালাদের কাছে যাহা পান, তাহাতেই তাঁহাদের দেয় খাজনা বাদে লাভ থাকে; সেইজন্য তাঁহারা পতিত জমি সস্তায় বিলির উপর দৃষ্টি করেন না। পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে বোধ হয় আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না। বণিক্-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে ঐ সকল জমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তদুৎপন্ন ধনের বিনিময় করিয়া তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সঙ্গে দেশের ধনোৎপত্তি ও লোকপ্রতিপালনও হইতে পারে। অবশ্য এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ কলকারখানায় অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ পাওয়াতে ঐ সকল জমি ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়ের খাজনা কমাইয়া দিলেই অন্য গ্রাম হইতে শ্রামিক আসিয়া তথায় চাষবাসের অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে পতিত জমির উপর কর বসাইলে এই হয় যে, জমিদারগণ জমি পতিত না রাখিয়া অল্প হারে তাহাদের বিলি করিবেন, নচেৎ নিজেরা কৃষিকলেজের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে মনোনিবেশ করিয়া কাঁচা মালে দেশ পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা ধনোৎপাদনে সহায়তা করিবেন।

(৪) ব্যবহারিক শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক শিল্পের হাতে কলমে শিক্ষাবিস্তার না হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই যে দেশীয় কাঁচা মাল বিদেশে গিয়া প্রস্তুত মালে পরিণত হইতেছে, উহাকে এদেশে প্রস্তুত মালে পরিণত না করিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না।

যাহারা শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াও শিখিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সকলে শিল্প শিক্ষা করিয়া ধনোৎপাদনে পারদর্শী হইবেন। যে সকল পণ্য দ্রব্য স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, আজকাল অধিকতর কাট্তির নব বলে বলীয়ান্ হইয়া নব শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তায় ব্যয়পরিমাণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে প্রস্তুত হইয়া অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া আজ উহা দেশে প্রস্তুত করিতে সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা ধনবিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অধিক বেতনভোগী বিদেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধা পাইলে, তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব মোচন করিতে পারিবে। ছোট ছোট আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প অল্প পরিমাণে

প্রস্তুত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মূলধনের আন্দাজ পাইবে, ব্যয়সংক্ষেপ শিখিবে, কাঁচামালের রূপান্তর করিতে শিখিবে, নচেৎ অসম্ভব। এইরূপে শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

এই সুবিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে একজন চাষবাস করিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনের প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমী চাষ করিতে পারে বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই জমী হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দশগুণ জমীর খাজনা দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই বা উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিবার তদুপযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্তু পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তারা কোন স্থানে অধিক ভূমি লইয়া তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিযুক্ত করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বুদ্ধিকৌশলে দশগুণ কর্ম্ম করিয়া সেই পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।*

কোনও গ্রামে একঘর গোয়ালা দেখা গেল। গোয়ালা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বারটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে দুগ্ধ দোহন করিয়া মাসিক ছয় টাকা মাত্র পায়; তাহার স্ত্রী চাকরী করিয়া মাসিক তিন টাকা পায় ও বেলা তিনটার সময় দুই তিন বাটীতে বাসন মাজিয়া বাটী আইসে; সেই জন্য গোয়ালা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করে। গোয়ালা কিন্তু এক স্থানে পাইলে হয়ত বেলা নয়টার মধ্যে চব্বিশটী গাভী দোহন করিতে পারে এবং তাহার স্ত্রী অন্নপাক করিয়া দিলে বারটী গাভীর সেবাও করিতে পারে। তাহার স্ত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতে না হইলে সেও চব্বিশটী গাভীর গোময়ের ঘুঁটিয়া দিতে পারে। ঘরের গাভী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়া গোয়ালা তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যসামর্থ্য দেখাইতে পারে না। কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হইলে ঐ গোয়ালা ও গোয়ালিনী উভয়ে মিলিয়া আন্দাজ বিশ টাকা বেতন পাইবার মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তা উহাদিগকে বিশ টাকা বেতন দিয়াও লাভ পাইতে পারেন। কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে এই সকল লোক নিজ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল-কারখানায় কার্য্য করিতেছে; অথবা যেখানে কল-কারখানা নাই, সেই সকল স্থানে থাকিয়া দারিদ্র্যদুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য মত কার্য্য করিতে পাইলে, বহু সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হওয়াতেই শাক শব্‌জী ও দুগ্ধ এত মহার্ঘ হইয়াছে। ইহারা কলে কাজ করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা সেই অর্থে পূর্ব্বের মত অধিক সামগ্রী ভোগ করিতে পাইতেছে না।

দেশবাসীর অন্ন সংস্থান ও অন্ন সংস্থান

*Let special pains be taken for the development of an honest, intelligent entrepreneur class who will be content to organise and manage our new industries without saping their life by demanding exorbitant profits—H. H. The Gaekwar's inausural address. The II Confence.

বাদে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তাহা সমাজের লক্ষ্য স্থল। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজগত স্বার্থ কখনই এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আসাম দেশে যে এণ্ডী অথবা ভাগলপুর অঞ্চলে যে বাফ্‌তা প্রস্তুত হইতেছে, উহা কখনই সমাজগত স্বার্থের অনুমোদিত হইতে পারে না। মহাজনের দাদনে প্রস্তুত হইয়া এই কাপড়গুলি অনেক হাত ফিরিয়া কলিকাতায় বড় বাজারে আসিতেছে এবং বিদেশী বণিক্ ইউরোপ ও আমেরিকায় গন্তিকেই এখানকার দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। এই যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা কয়েকজন মাত্র মহাজনের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করিতে হইলে মহাজনদের লাভ অল্প হয়, অথচ এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত হইলে কাটতির আধিক্য অনুসারে বহুসংখ্যক দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়। ফলকথা দশ হাজার গজ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত না হইয়া শ্রম বিভাগে ও সমবেত মূলধনে পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর হইলে আড়াই গুণ অধিক শ্রামিকের কর্ম্ম-সংস্থান হয়। কিন্তু পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় করায় লাভের সমষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে কি কম হইবে, ইহার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মহাজনেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী লাভ প্রাপ্তিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহা যদি অল্পপরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহাদের পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান-চিন্তা তাহাদিগকে যে বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সমাজ-স্বার্থ নিজে ইহাকে পরিপোষণ করিবে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা এইরূপ দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে দ্রব্যাদি সুলভে প্রস্তুত হয় এবং কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবীরা সুখে কালাতিপাত করে।

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। এদেশের তৈজসপত্র বহুকাল স্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইয়ুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্গুর। এদেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বহুকাল স্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের ধন সম্পত্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ করা ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না, সেই জন্য ঐ সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহারা ধনোৎপাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী দৃশ্যমনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বা পরিশ্রমের ফলের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগান্তর তাহার সামান্য অংশও দেশে থাকে কি না সন্দেহ;—যদি থাকে, তাহা হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, এবং যে দেশে প্রস্তুতি কল্পে বিত্তবান্ বা কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের

চাষার মত ভোগ-বাসনা হওয়া উচিত। দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কৃত করে মাত্র। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত হয় বলা হয়। ইংলণ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সজ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎপাদন-বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্য একথা স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির যে পণ বাড়িতেছে এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে নিজের টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের পর একটী রঙচঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না।

সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে "রোজগার নাই বাবুয়ানী আছে।" সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই কথা প্রযোজ্য। চটের কলে ছুটির সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙিন জামা, উড়ানী, পায়ে মোজা, মুখে সিগারেট। আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, অধিকন্তু জুতা জামা ইত্যাদির ভোগবিলাসে তাহাদের ধন নাশ হইতেছে। সভ্য জগতে বাতি জালিতে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশলাই আবশ্যক হয়, কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্যক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। চক্‌মকি ব্যবহার না করিয়া সে মাসিক দুই আনার হিসাবে এক মণ ধান্যের বিনিময়ে এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিয়া থাকে! ইংলণ্ডের লোক প্রতি বার্ষিক আয় বিয়াল্লিশ পাউণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষে আয় প্রায় দেড় পাউণ্ড বা পনর মণ ধান্য!

যে দেশে, যে সময় যে অবস্থায় যাহার যে দ্রব্য ভোগ করা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সেই দ্রব্যের ভোগবাসনায় নিবৃত্তি হইলে তাঁহার ধনের অপব্যয় হয় না। মিতব্যয় বলিলে অনেকে সঞ্চয়ের ভাবও অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু মিতব্যয় বাস্তবিক ব্যয় বিশেষের নাম। অল্পকাল ভোগসাধ্য সামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম অমিত ব্যয়। আহারীয় ও পানীয় একবার মাত্র ভোগে বিনষ্ট হয়, অতএব অনাবশ্যক অধিক মূল্যের ঐ জাতীয় সামগ্রী ভোগের নাম অমিত ব্যয়। নিতান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য সামগ্রী বিশেষ, যাহার ভোগান্তে কিছু পাওয়া যায়, অথবা যাহা সম্পত্তিরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, উৎপন্ন ধনের বিনিময়ে ঐ সকল সামগ্রী গ্রহণ করাই মিতব্যয়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের international trade) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিমাত্রই নিজ নিজ কলা বিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী পরিচয় দিতে পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্ম্মভীরু কার্য্যক্ষম কর্ম্মকর্ত্তার (untrepreneuer) আবির্ভাব হইলে যতই দেশের অধিকাংশ শ্রামিকের

শ্রমবিভাগে কার্য্য-সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, ততই দেশে অধিক ধন উৎপাদিত হইতে থাকে এবং শ্রামিকেরও কর্ম্মসংস্থান হইয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বার্ত্তিক অবস্থা।

মানবমাত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্যত হয় এবং স্ব স্ব সমাজের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্নপ্রাশন, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি যে সকল সামাজিক প্রথা দেশবিশেষে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের অনুসরণে সমাজবিশেষে সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি বিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী বলেন। যে সমাজে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। এখন আমাদের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপের অভাব নাই। কিন্তু ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনান্তে বাহ্য আড়ম্বর হেতু ব্যয়াধিক্য বশতঃ অনেকেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান। জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন সমাজের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আবার কোন কোন সমাজ বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন নিয়মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্যোগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কায়িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, তাহার নিকট তদ্বিনিময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী করিবার স্বত্ব, বা অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার জমি নাই, সে জমিদারকে জমি-ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু দিয়া পরিশ্রম সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই অর্থও নাই, সে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাষ আবাদ বা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ বা এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে অধিক মূল্যযুক্ত করিয়া লাভবান্ হইতেছে, কেহবা সামগ্রী রূপান্তরিত করিয়া বা অধিককাল মজুত রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে। আবার কেহ বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ঐ সামগ্রীর অংশ বা তুল্য মূল্য অর্থ গ্রহণ করিতেছে। কেহ বা ওকালতী বা চিকিৎসা করিয়া বা বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্য্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তৎসমস্তই বিনিময় সম্ভূত। যে ব্যক্তি কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, উহা তাহার কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি উদারন্নের সংস্থান করিয়াও পরিধেয় ব্যবহার করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় অভাবমোচন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আরও নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করি-

তেছে, ইহা অবশ্যই কোন না কোন সামগ্রীর বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যে ব্যক্তি উদ্যম ও অধ্যবসায় গুণে বা পরিশ্রম করিয়া, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী ভোগ করিয়া জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহার সেই অবলম্বিত বৃত্তিকে বঙ্গভাষায় ব্যবসায় বলা যায়। কোন ব্যক্তির কি ব্যবসায়—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি করেন, ইহাই বুঝায়। বস্তুতঃ ব্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে—যথা বি—অব—সো (উদ্যোগ করা, শেষ করা) বিশেষরূপে উদ্যমকরণ, অথবা শেষ পর্য্যন্ত উদ্যমকরণ বুঝায়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহা একটী মহাজনবাক্য। বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্যোগী পুরুষদের সমস্ত কার্য্যই বিনিময়সম্ভূত। এই বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর কর্ম্ম সামর্থ্য নিয়োজিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ওকালতী বা চিকিৎসা বা ভিন্ন জাতির কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ধনাগমের অন্যান্য অতিশয় প্রশস্ত কোন পথেই তিনি বিচরণ করিতে পশ্চাৎপদ। হাতে কলমে ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যায় তিনি কোন কালেই পারদর্শী ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ ভদ্রলোক অনেকে ব্যবসায় করিয়া লোকসান দিয়াছেন। এই সুজল সুফল রত্নগর্ভ বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, তাহাতে আমাদের কি পরিমাণ অংশ বর্ত্তায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বড় মুদিখানায় মুহুরীর যে অংশ আছে, বড় বড় সদাগরী অফিসে আমাদেরও সেই অংশ বর্ত্তমান। আমরা বঙ্গদেশের উৎপন্ন ও প্রস্তুত ধনের ভাগীদার হইতে যে পন্থা অনুসরণ করিতেছি, সে পথের পথিকে আজ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। মালের টান ধরিলে এবং যোগান কমিলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু টান অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে মূল্য কমে। তাই আজ কুড়ি টাকার চাকরি খালি হইলে আবেদন পত্রে আফিস ঘর পূর্ণ হইয়া যায় এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। অন্যান্য সামগ্রী সস্তা হইলে লাভ কম দেখিয়া উহার যোগান আবার কমিয়া যায় এবং যত দিন না উহার মূল্য বাড়ে, তত দিন কেহ সে মাল বাজারে পাঠাইতে চাহে না; কিন্তু চাকুরে রূপ মালের আর যোগান কমিতেছে না। এ মালের অভাব আর অনুভূত হইতেছে না। কেবল বড় লোকের কন্যার বিবাহের সময় ইহাদের অধিক মূল্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

যে পথ আমরা অনুসরণ করিয়াছি, তাহারই ফলে গতিকে আমরা পল্লীত্যাগ করিয়াছি। অতএব পল্লীর ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাগানে তরিতরকারি দিয়া যাহা বিনামূল্যে পাইতাম, পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া যাহা ছিপে ধরিতাম, নারিকেল তাল যাহা পয়সা দিয়া কিনি নাই, গৃহের গোধন যাহার খাঁটি দুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া মস্তিষ্কের বলাধান হইত, আজ সেইগুলি পরিশ্রমের বিনিময়ে লব্ধ ধন নাশ করিয়া ক্রয় করিতেছি। পল্লী ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর প্রেতাত্মা শ্মশান হইতে বলিয়া দিতেছে "যে অর্থের নিমিত্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছ, তাহার অধিকাংশ না দিলে আর পূর্ব্বের মত খাদ্য সামগ্রী পাইবে না।" বাবুরা যখন পল্লীস্থ থাকিতেন, কৃষক ধান্যের সহিত তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া লাভবান্ হইত।

এখন সেই লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল ধান্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাহারা অক্ষম। তাই সে আজ বিদেশী বণিকের ক্রয়সামর্থ্য প্রার্থনা করিতেছে, নচেৎ ইহার উপর চাউলের মূল্য কমিলে তাহাকে চাউলের ব্যবসায়ে ইস্তফা দিতে হইবে।

কি অদ্ভুত নিয়ম! দেখিতে দেখিতে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়া গেল, আর পূর্ব্বের অর্থে পূর্ব্বের মত সামগ্রী পাওয়া যাইবে না। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা দ্বারাই ঐ দ্রব্যের মূল্যজ্ঞাপন করা হয়, অতএব অর্থের মূল্যজ্ঞাপন করিতে বিষম সমস্থায় পড়িতে হয়; যেহেতু অর্থই মূল্যজ্ঞাপক এবং ইহার পণনিরূপণকারী মধ্যস্থ কোন কিছুই নাই। সাধারণতঃ দ্রব্য-সম্ভারের পণের তারতম্যানুসারে অর্থের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে; কারণ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই উহার মূল্য। এবং অর্থও যখন ধাতুজ পণ্যদ্রব্যবিশেষ, তখন ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ চাউল বা যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে, উহাই অর্থের মূল্য স্বরূপ। যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অল্প অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থের মূল্য অধিক হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব অর্থের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য এবং দ্রব্যাদির মূল্য ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুলাদণ্ডের পাল্লার ন্যায়। যদি একটী উত্থিত হয়, অপরটী নিম্নগামী হইবে, এবং অপরটী উত্থিত হইলে অন্যটী নিম্নগামী হইবে।

কোন দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে বুঝায়; কিন্তু অর্থের আমদানী হইয়াছে বা উহা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, এরূপ কথা সাধারণতঃ শুনা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন দ্রব্য অর্থে ক্রীত বা অর্থ লইয়া বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, অর্থও ঐ দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত বা বিক্রীত হইয়া থাকে। যখন কেহ শস্য বা তুলা বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্রা ক্রয় করেন এবং যাঁহারা ঐগুলি ক্রয় করেন, তাঁহারা বিক্রেতৃগণকে অর্থ বিক্রয় করেন।

এই ত আমাদের "পথ ও পাথেয়।" পথিকের সংখ্যা অধিক বলিয়া পাথেয় আর অধিক পাওয়া যাইতেছে না; তাহার উপর ইহার ক্রয়কারিণী শক্তির কি অসম্ভব হ্রাস। এখনও কি এই অল্প মূল্যের সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদের এই পথ অনুসরণ করা উচিত। অন্যান্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে, সেইগুলির উৎপাদন ও প্রস্তুতিকল্পে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত নয় কি? আমরা দেখিতেছি যে আমাদের দেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে অধিক ধন সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে না ও সুদ কমিতেছে না। আমরা আরও দেখিতেছি যে, চরিত্রের গঠন হয় নাই বলিয়া আমাদের বাজার-সম্ভ্রম অল্প। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করিতে না পারিলে আমরা সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, এই জন্য প্রতিজ্ঞা-পালনে চেষ্টা করি না। আমাদের বাজার সম্ভ্রম অল্প বলিয়া আমরা অল্প সুদে বিদেশী মূলধন (কল কব্জা ইত্যাদি ধন সামগ্রী) ধারে ক্রয় করিতে পাই না। এইরূপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা ধনোৎপাদিনী শক্তির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই শক্তির বলে ব্যক্তিগত স্বার্থ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে দেশের অধিক মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে, অথবা বহুসংখ্যক লোক কার্য্য

বিশেষে শ্রম-বিভাগ প্রথায় নিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন ধনসামগ্রীর অংশ গ্রহণ করিয়া অন্ন পথগামী হইতে পারে।

এই অন্নক্রয়কারিণী শক্তি উপার্জ্জন করিয়া তদ্বিনিময়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আমরা ভোগের অথবা শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি, সেগুলি হইতে বিশেষ কোন ফল পাই না।

আমাদের সমাজ এখন নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। সমাজস্থায়িত্ব নামে শাশ্বত বা চিরন্তন। কালের প্রভাবে সমাজে নূতন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টি সমধর্ম্মান্বিত হইয়া মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইলে সেই সমাজে শ্রী পরিলক্ষিত হয়, এবং বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তনে সমাজ-শ্রী দূরে চলিয়া যায় এবং সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের মুখে নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। আমাদের এই সমাজে এখন উহা সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সেই জনক জননী হইতে হয়। ইহাদের পুত্র কন্যাগুলি যে দুর্ব্বল ও মেধাহীন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এবং দুর্ব্বল ও মেধাহীন বালক বালিকা দ্বারা আর্য্য জাতির গৌরব যে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতএব দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা যুবকদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত না হইয়া বিবাহ করা উচিত কি না তাঁহারা যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। অল্প বয়সে বিবাহ দিবার বাসনা-স্রোত বিপরীতগামী করিতে তাঁহারাই একমাত্র সমর্থ। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পরম্পরা সমধর্ম্মান্বিত করিতে আমরা তাঁহাদেরই মুখপানে চাহিয়া থাকি।

সামাজিক ক্রিয়াকল্পে অপব্যয় ও কৃত্রিম দান সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে সমাজের ব্যক্তিগণের মিলন হইয়া থাকে এবং সামাজিক উন্নতিকল্পে অথবা সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশে এরূপ মিলন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। এই সকল উপলক্ষে যাহার বাটীতে মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে অবশ্য ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। এই ব্যয়ের সহায়তাকল্পে পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া যে লৌকিকতা দেওয়া হয়, তাহা এক প্রকার অপব্যয়, কারণ ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া হয়, উহার উপযোগিতা কি? পাকস্পর্শে বা শ্রাদ্ধে যে প্রকারের কাপড় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে কয়খানি ব্যবহারযোগ্য? সমাজের যে পরিমাণ অর্থ এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য-সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, তাহাতে কি কর্ম্মকর্ত্তাদের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না? অবশ্য বাহককে অল্প বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া অনেক সমাজ কথঞ্চিৎ বহুদর্শিতার আভাস দিয়াছে, কিন্তু মূল অপব্যয়ের কি কোন প্রতিকার নাই? তুল্যমূল্য অর্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তাকল্পে কি ব্যয়িত হইতে পারে না? পরে যে অধিক মূল্যের সামগ্রী জামাতাকে দেওয়া হয়, বাস্তবিক কয়জন জামাতা তাহা পাইবার উপযুক্ত? যদি ভবিষ্যতে তিনি নিজে স্বাবলম্বন শিক্ষার পূর্ব্বে উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্রোত্তরীয় পাদুকা ও বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত করাইয়া লাভ কি? এই হঠাৎ পরিবর্ত্তন জানিয়া পরে তাহার অভাব অনুভব করা কি অকারণ দুর্ব্বহ ক্লেশভার বৃদ্ধি করা নহে?

"ওঁ স্বাচ্ছাদনালঙ্কতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিতে হয় বলিয়া

কি আচ্ছাদন ও অলঙ্কারের মূল্যের কথা ব্যক্ত আছে? এক ব্যক্তির সংসারের উপকারকল্পে যে কন্যাদান বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা কি যথেষ্ট নহে? কারুণ্যের উদয়েই ত দান হইয়া থাকে—এই দানের উপর আবার জুলুম কেন?

একেই ত আমাদের এই হতভাগ্য সমাজে ধনীর সংখ্যা অতীব অল্প এবং বর্দ্ধিষ্ণু। দুই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত দরিদ্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অল্প ছিল, যখন বেশ ভূষা ও বাহ্য আড়ম্বর অপব্যয় মনে করিয়া পূর্ব্বেকার গৃহপতি গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ ও গোলাজাত ধান্যে পরিপোষিত হইয়া নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যৎ ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, যখন উৎপন্ন ধনের মিতব্যয়িতা জানিতেন অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে এরূপ ধন গ্রহণ করিতেন যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথবা যাহার ভোগান্তেও মূল্য পাওয়া যাইত বা যাহা সম্পত্তিরূপ মূলধনে রূপান্তরিত হইতে পারিত, তখন সমাজের সেই স্বচ্ছল অবস্থায় যে সকল আচার ব্যবহার করিয়া লোকে কৃতার্থম্মন্য হইতেন, এখন এই দুর্দ্দিনেও আমরা ততোধিক ব্যয় করিতে একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প! সমাজের এখনকার ভ্রান্ত নিয়মগুলি বিমূঢ়ের ন্যায় অনুবর্ত্তন করিবার আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে জ্বলন্তবহ্নি শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের সিদ্ধান্তের অনুরূপ, অথবা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালকের কার্য্যপরম্পরার সমতুল্য, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

যিনি সন্দেহ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি এখন অর্থের মূল্য কি প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয় নাই? নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১০০ টাকা বেতনের চাকুরি গ্রহণ করিয়া আত্মীয়স্বজনের কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ কাল ৩০০টাকায় তাহা লাভ করিতে পারেন না। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। এখন যিনি ২০০ শত টাকা পাইয়া থাকেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ৬০ টাকা পাইতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বে ২০০ টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাইতেন, এখন প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ পাইতেছেন, এবং এখন যিনি পঞ্চাশ টাকা পাইতেছেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ১৭।১৮ টাকা পাইতেছেন। আজকাল একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শতকরা অধিক লোক ৫০৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহেন। যে সমাজের অবস্থা এখন এইরূপ, সে সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়-সংযম-বিধি প্রবর্ত্তিত না হইলে অধিক পরিবারে যে অশিক্ষিতের ও ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত ব্যক্তির অধিক আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টিতে সমাজশরীর গঠিত হয়। অতএব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অনুপযুক্ততা নিবন্ধন সমাজশরীর যে দিন দিন ক্ষীণ ও ভঙ্গুর হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সামাজিক ব্যক্তিমাত্রকে উপযুক্ত করিতে মূলধন আবশ্যক এবং মূলধন ব্যয় সংযমের ফল। অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব্যাপারে অপব্যয় হইলে আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় করিবার ধনসংস্থান শূন্য হয়। এ কারণে বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া কন্যাকে ত শিক্ষা দেওয়াই হয় না, অধিকন্তু নিজ বংশধরের শিক্ষাতেও বাধা উপস্থিত হয়। অনেকে হয় বাল্যবিবাহের ফলে শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত হওয়ায় নিজে শিক্ষালাভ করিতে পারেন

নাই, অথবা কর্ম্মের সাফল্যে শিক্ষিত হইলেও নিজে শিক্ষা দিবার অবকাশ পান না, অথচ বেতন অল্প এবং কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া শিক্ষকও নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহা সামান্য অসুবিধা নহে।

আজ উক্ত অসুবিধা জন্য তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যে কত অশিক্ষিত লোক বর্ত্তমান, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। এই কারণেই দুই একটী অনূঢ় শিক্ষিত যুবকের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেককেই প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই নিমিত্তই সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে অধীর হইয়া পড়েন। ব্যক্তি মাত্রেরই সৎপাত্রে কন্যাদানের ইচ্ছা বলবতী হওয়া অবশ্য দোষের কথা নহে, বরং সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু এই ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত অভিলাষ পূর্ণ করিতে গৃহস্থ যাহাতে সর্ব্বস্বান্ত না হন, তাহা কি সমাজের লক্ষ্যীভূত নহে? স্বীকার করি আজি কালিকার এই ভীষণ জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত ব্যক্তিরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যোগ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, উপযুক্ত হওয়া কঠিনতর ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়। মলিনমুখ, করতলন্যস্তগণ্ড, নৈরাশ্যে স্তিমিতহৃদয়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, নিজ পুত্রকে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করিতে, কিরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, তাহা কি উপলব্ধি করা সুকঠিন?—এই দরিদ্রপ্রধান দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদন ও নিজসংসার-মঙ্গলসাধন করে দরিদ্রের ব্যয়সংযমে ও বহু ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ, যদি কন্যার সহিত অন্য গৃহে চলিয়া গেল, তাহা হইলে সে পরিবারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কতটা আশা করা যাইতে পারে? একেই ত এই শ্রীহীন সমাজে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর এই সমাজ-নিয়মে যদি দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করা হয়, এবং উল্লিখিত অপব্যয়গুলি সমাজানুমোদিত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহাদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবাহের পূর্ব্বে স্বাবলম্বন* যে একটী অপরিহার্য্য অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া পূর্ব্বে বিবেচিত হইত, তাহা একেবারে আমাদের চিন্তাপথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, স্বাবলম্বনশিক্ষার অভাবে শতকরা কত নবীন জনক যে কিরূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা সহৃদয় অনেক পাঠকেই অবগত আছেন। আজকাল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করিবার সময় গোয়ালার নিকট ভাড়া করিয়া অথবা অন্য স্থান হইতে অজ্ঞাতকুল ক্ষুদ্রকায় বৃষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহার উপর সমাজ বন্ধন শিথিল হওয়াতে এবং দেশের ধন বৃদ্ধির উপায় দেশীয় লোকের বিদিত না থাকাতে

* যে জাতির উপনয়ন হয়, তাহাদের বিবাহের বয়স একপ্রকার বহুকাল হইতে স্থির আছে। গুরুর নিকট উপনীত হইলে তাহাকে বেদ ও বেদাঙ্গাদি পড়িতে হইত। সেই নির্দিষ্ট পাঠ সমাপন হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হইত অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে আগমন করিলে সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কিন্তু কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন! এখন সেই দিবসে সেই অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া শিষ্যকে যে সকল কথা বলান হয়, তাহা কি বাস্তবিক ধর্ম্মভীরুর কার্য্য? এখন তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যায় ত্রয়ীবিদ্যা শিক্ষা করা হয়, এবং একদিন ভিক্ষায় স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। পূর্ব্বে মহানাম্নী ব্রত, গৌদানিক ব্রত এবং আরণ্যক ব্রত সমাপনে রীতিমত স্বাবলম্বন শিক্ষার পর সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সমাপিত হইত এবং সমাবর্ত্তনের পর যুবক বিবাহের উপযুক্ত হইত। তখনই ব্রহ্মচারী সংসারী হইবার পাত্র হইতেন। এখন কয়জন উপনয়নের পর দশ বার বৎসর শিক্ষা করে এবং শিক্ষার পর স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হয়?

শত শত গাভী নগরীর কসায়ের হস্তে অর্থের নিমিত্ত বিক্রীত হইতেছে। যে প্রকারের সদ্যোপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গোখাদকদের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলে সেই প্রকারের বৎস সহ গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান বঙ্গদেশে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস পাইতেছে। এইরূপে যে পরিমাণ ধননাশ হইয়াছে, তাহার যদি সমষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের সমান হইবে। গো-জাতির ধ্বংস হেতু দুগ্ধ ও অন্যান্য সামগ্রী মহার্ঘ হওয়ায় কয়জন জনক তাহাদের পুত্রকন্যার শারীর ও মানসিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার ও পানীয় দান করিতে সমর্থ? ডাক্তারগণ বলেন, ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা অপেক্ষা পুত্রের অধিক আহার্য্যের প্রয়োজন; এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, এদেশে অল্পবয়স্ক বালকদের মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে আহার ও পানীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া ভবিষ্যৎ যুবক ধনোৎপাদনে সমর্থ হইবে, তাহার কিরূপ সংস্থান করিয়া যুবকগণ বিবাহ করিতে উন্মত্ত হয়েন? এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে অনর্থক মেধাহীন দুর্ব্বল সন্তান সন্ততির আবির্ভাবে সহায়তা করা কি স্বজাতির গৌরব-রক্ষার অন্যতম উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? দরিদ্র পিতার এরূপ অসার সন্তানের আবির্ভাবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্যা যে, নিম্নশ্রেণীর মত ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা যে, ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া পড়িবে ও অতৃপ্তির ভীষণ আর্ত্তনাদে দেশ যে আলোড়িত হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে যে সকল উপায় বিবৃত হইল, দেশে ঐগুলির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইলে দেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং হিন্দুজাতির সংখ্যা যে আর অধিক হ্রাস না পাইয়া আবার বৃদ্ধিলাভ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিবার কারণ দেখা যায় না। তাহা হইলে ভারতের গৃহে গৃহে আবার সুখসমৃদ্ধির বাসন্তী-কৌমুদী হাস্য করিবে; ভারত হইতে এই দারুণ জীবনসংগ্রাম ও অতৃপ্তির লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ বিদায় লইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করালমূর্ত্তি তখন ভারতে আর আবির্ভূত হইবে না। কমলার কৃপা-কটাক্ষে ও বীণাপাণির বাঞ্ছিত বর লাভে বঙ্গদেশের হিন্দুজাতি মাত্রই সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বোধ হয় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইতেছে। আমি আপনাদিগকে আর অধিকক্ষণ আটক না করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণরূপ গলগ্রহ হইতে শীঘ্রই উন্মুক্ত করিব। এইবার

দানধর্ম্ম ও দারিদ্র

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া আপনাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব।

সভাপতি ও সভ্যমহোদয়গণ,

পরিশ্রমলব্ধ ধনসামগ্রীর বা অর্থের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী না পাইলে কেহ সহজে উহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু দয়ার বা করুণার উদয় হইলে প্রাপ্ত ধনে নিয়োজিত পরিশ্রমের কথা মনে উদিত হয় না। পরোপকার-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ দান করিয়া থাকে। এই দান করিবার প্রবৃত্তি সকলের নাই বলিয়া দাতার যশঃ সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হয়; কিন্তু যাঁহারা স্বগৃহে বিপন্নের বা আতুরের সাহায্যে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং যশোলাভ বা উপাধি-লালসায় যাঁহারা সময়ে সময়ে মুক্তহস্ত হয়েন, তাঁহারা

দান করিয়াও প্রকৃত দাতার পরোপকার জন্ত দান বা আত্মবিস্মৃতি সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না।

দানের সহিত পরোপকার-ধর্ম্ম এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, "যে কোন উপায়ে দান কর—কেবলই দান কর—দানের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই" এই সকল মত সমর্থন করিয়া যে কোন প্রচারকই প্রচার করুন না কেন, তাঁহার শ্রোতারা একতানমনা হইবেন; কারণ সকলেরই মনে হইবে যে, তিনি মানব জাতির যথার্থ কল্যাণ কল্পনা করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত হইয়া জনহিতকর কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সমাজের দুঃখ যাতনা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু "এই প্রকার দান ভাল, এই প্রকার মন্দ" এ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, মানব-মন উহা দানকাতরতার লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া তিনি তর্কে জয়ী হইলেও মনে হয় যে, দানে বাধা দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প এবং সঙ্কীর্ণতার আবরণ করিতে তর্কপ্রপঞ্চের সাহায্য লইতেছেন। অনশনে প্রাণত্যাগ হইতে পারে, অনাহারে ক্লেশ পাইবে, এ কথা মনে ভাবিতেও কষ্ট হয় এবং সাধ্য থাকিতে উহার নিবারণকল্পে চেষ্টা না করিলে যেন পাপ করিতেছি মনে হয়। এই ভয়ে হিন্দুসমাজে "দিও কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিত" কথার প্রচলন হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত দানকাতর, তাহাদিগকেও হিন্দুসমাজে দান করিতে হয়; কারণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্ম এবং তীর্থদর্শনে গিয়া দান না করিলে সুফল লাভ হয় না। মহা মহা তীর্থস্থান ব্যতীত প্রতি গ্রামেই হিন্দুর দেবতা আছেন এবং গ্রামবাসী অনেককেই সময়বিশেষে তথায় পূজা দিতে যাইতে হয়। দান করিবার ইচ্ছা থাকিলে তথায় দানের উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব নাই এবং ধর্ম্মের সহিত দানের এমনই সম্বন্ধ যে, উপযুক্ত পাত্রে দান না করিলে পূজায় ফল লাভ হয় না বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হয়। দানকল্পে কি অদ্ভুত সমাজবিধি! ইংলণ্ডে কিন্তু এলিজাবেথের সময় হইতে আইনের সাহায্যে দরিদ্রকে দান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে মহকুমা বা পরগণা বিশেষের বিত্তবান্‌কে তথাকার দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ-কল্পে আইনসঙ্গত দণ্ডের ভয়ে চাঁদা দিতে হইত। ঐ চাঁদার টাকায় এক এক পল্লীসমাজ তথাকার দরিদ্রভরণভার গ্রহণ করিতেন। ব্যক্তিগত কারুণ্যের বিকাশ হইবার আশায় দরিদ্র ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই এই সকল সামাজিক দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল। তথাকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিকট সাধু সন্ন্যাসীর এবং শ্রমাসমর্থ আতুরদের অন্ন-সংস্থান হইত। দানের পাত্রাপাত্র বিচারভার অধিকারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। এই অধিকারী গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী দ্বারা গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ নির্ব্বাচিত হইতেন। এখন সে দান নাই, সে নির্ব্বাচনে যত্নও নাই।

মানব-হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি যত দিন জাগরূক থাকিবে, ততদিন এক প্রকার দানে মানব কখনই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সামাজিক দান করিয়াই কারুণিক ব্যক্তি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহার দানের যে কত প্রকার পাত্র, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জাতীয় লোকের দয়ায় সামাজিক দান ব্যতীত ব্যক্তিগত দানেরও ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। কিন্তু ভিখারী বুদ্ধিতেও বলিহারি। তাহারা গুপ্ত দান ও সামাজিক দান উভয় দানেরই পাত্র হয়। কূটনীতিও তাহাকে একপ্রকার

দান প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। ভিক্ষা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ভিক্ষা-লাভের অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা করে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে সন্ন্যাসী ফকিরকে দান করা হইত, এখন সে কারণে তাহাদিগকে আর দান করা হয় না। পূর্ব্বে তাহারা আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসবাসনা ত্যাগ করিয়া সমাজকে সৎশিক্ষা প্রদান করিত; পরন্তু তাহারা এখনকার বাক্‌পটু, চতুর, চটুল সন্ন্যাসী ফকিরের মত ভণ্ড ছিল কি না সন্দেহ। অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইলে তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাঘাত হইবে এবং তাহাদের অনুকরণে দেশে ধর্ম্মপ্রাণ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে ভাবিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দানবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সে বিধির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে সকল সন্ন্যাসী ফকিরকে কষ্টার্জ্জিত অর্থের একাংশ প্রদান করি, তাহাদের কয়জন ধর্ম্মচর্চ্চা করে? তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর ও ভেক কত যে সরলচিত্তকে মোহিত করে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। যে দেশে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থব্যয় সমাজানুমোদিত নহে, সে দেশে দেবতার দোহাই দিয়া যে কত কপট ধার্ম্মিক ও সেবায়েত প্রতারণা-সাহায্যে অপরের পরিশ্রম-লব্ধ ধন অনায়াসে ভোগ করিতেছে, তাহার কথাই বা কি বলিব? যে দেশে ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে কতকবার বিনীত হইতে হয়, কতবার মনে আশঙ্কা হয়—বুঝিবা শাপভ্রষ্ট হই—যে দেশে পাপমুক্ত হইতে অথবা নিজ কল্যাণ সাধন করিতে কিছু না দিয়া বঞ্চিত করিতে সদাই আশঙ্কার উদয় হয়, সে দেশের ভিখারী, প্রাতঃকালীন আহার সমাপনপূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে যে হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু "জয় রাধে" বলিয়া কঙ্কণবলয়াভরণা বৈষ্ণব-কন্যা অথবা "ভিক্ষা দাও মা" বলিয়া নধরকায় যুবা যখন আমাদের অনুকম্পার পাত্র হইয়া ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিতে থাকে, তখন সমাজে অলক্ষিত ভাবে যে অকল্যাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা কি ভৃত্যাভাবে ব্যতিব্যস্ত গৃহস্থ অনুভব করিতে অক্ষম?

স্বীকার করি শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রম-বিনিময়ে তাহারা অন্নধন উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু মজুরী অল্প হইলে অন্য নানাধিব ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান হইয়া পুনরায় যে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, একথা কে না বুঝিতে পারে? পূর্ব্বে এক টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া যাইত, এখন তাহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; অথচ পরিশ্রম বিনিময়ে উপার্জ্জিত বেতনেরও পরিমাণ-বৃদ্ধি হইতেছে না। অতএব সেই বেতনে পূর্ব্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ লোকের অন্ন সংস্থান হইবার কথা। যে দেশে ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে না, সে দেশে বেতনের এই অল্প ক্রয়কারিণী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অপাত্রে দান করাও সঙ্গত নহে। অনেকে বলেন, দেশের বিত্তবান্ ব্যক্তিরা যদি কেবল অপরিহার্য্য নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ভোগেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিরে উদ্বৃত্ত অর্থে ভিক্ষা দান করিলে দেশের দারিদ্র্য-নাশ হইতে পারে; কিন্তু দেশীয় নির্ম্মাতা ও প্রস্তুতিকারকদিগকে ধর্ম্মসঙ্গত উপার্জ্জনে বঞ্চিত করিয়া অলস ব্যক্তির অন্ন সংস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত লোকদিগের মধ্যে কি দারিদ্র্য আহ্বান করা হয় না? ফলতঃ এই সকল উপায়ে দেশে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই নিমিত্ত দানের পাত্র নির্দ্ধারণ করা কেবল যে সময়সাপেক্ষ, এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণসাধনচিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইলে উহা সম্পূর্ণ বিচারসাধ্য।

যখন আমরা ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অলীক সামাজিক ভয়ে, অথবা পাপ-মুক্ত হইতে কিংবা নিজ কল্যাণ-সাধন করিতে ইতস্ততঃ করি, তখন অবশ্য সমাজের কল্যাণ আমাদের মনে সকল সময় স্থান পায় না। বাস্তবিক সামাজিক জীব হইয়া সমাজের কল্যাণ না দেখা কি স্বার্থপরতা নহে? যদি সামাজিক দানে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যক্তিগত দানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে দানের কথা প্রকাশ করায় লাভ কি? শ্রমসমর্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে বিনা পরিশ্রমে তাহার অন্ন সংস্থান হইবে, দুষ্ট ভিক্ষাব্যবসায়ীকে এ কথা কেন জানিতে দিবে? এ রাজসিক দানে নিজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। এই জন্যই সাত্ত্বিক দান সমাজের মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাহা জানিতে না পারিলে, শ্রমসমর্থ অলস জগৎ উহা কিরূপে অবগত হইবে। ইহাতে যে কেবল নিজের রজোগুণ হ্রাস পাইবে এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণ অলক্ষিত ভাবে সাধিত হইবে বলিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বর কেবল উহার বিষয় জানিবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহামতি ম্যালথাস্ এককালে মহাপুরুষকণ্ঠনিঃসৃত অকাট্য প্রমাণসূচক বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের দীন-বিধির (poor Law) বিভীষিকায় পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া যে দানবিধি প্রচলিত ছিল, তাহারই ফলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, স্যার ম্যাথিউ হেল সেই দানসংগৃহীত বিপুল অর্থে ওয়ার্ক হাউস অর্থাৎ আবেশন সকল প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যবশতঃ ১৭২৩ সালে আইন সাহায্যে তাঁহার পরামর্শ প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সামাজিক দানের হিসাব নাই। ইংলণ্ডের পল্লী সমাজে যে সকল দানের ব্যবস্থা আছে, তাহার বাৎসরিক বিবরণ হইতে এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দানভাণ্ডার যতই পূর্ণ হইবে দেশে ভিখারীর সংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে দেশে দানবিধি নাই, সে দেশে ভিখারীও অল্প। পরিশ্রম না করিয়া অপরের উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশের অধিকারী হইতে পারিলে পরিশ্রম করিয়া যে ধনলাভ করিতে হয়, এ ধারণা চিরজীবনে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। রোগ না থাকিলে লোকে হাঁসপাতাল যায় না, কিন্তু অন্নবস্ত্রাভাব না থাকিলেও লোকে দাতার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট বস্ত্র বা তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া উহা অন্যের নিকট বিক্রয় করে, কিম্বা তদ্বিনিময়ে অন্য কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বা ধনীর যেরূপ অভাবের সীমা হইতে পারে না, সেইরূপ দরিদ্রও আপন অভাব অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। ফলতঃ দানের ভাণ্ডার থাকিলে এবং দাতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইলে ভিখারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃতকর্ম্মা শ্রমজীবী শ্রমাসামর্থ্য জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে উদর পূর্ণ করে। ইহার ফলে শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস হয়, উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীতে দেশের অভাব পূর্ণ হয় না; অপিচ দারিদ্র্য-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যক্তিনিচয়ের সমবায়ে যে দানসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে আবেশন (work-house) সংস্থাপিত হয়। কেবল শ্রমাসমর্থ ব্যক্তি যে তথায় আশ্রয় লাভ করে এরূপ নহে;

কর্ম্মসংস্থানহীন অথবা অঙ্গহীনের মধ্যে যাহাদিগের দ্বারা শ্রমবিভাগে যে পরিমাণ কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকেও কর্ম্ম করাইয়া নিজোপার্জ্জন সুখ অনুভব করিতে দেওয়া হয়। পদহীন কলে সেলাই করে, হস্তহীন পাদদ্বয়ের সাহায্যে কল চালনা করে; অলস ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়া কর্ম্মগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের মতে এরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, প্রকাশ্যে ভিক্ষা চাহিলে অথবা অকারণ ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহারা দণ্ডনীয় হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম্মগৃহে লইয়া গিয়া কর্ম্ম করাইয়া অন্নদান করা হয়; যাহারা শ্রমাসমর্থ তাহাদিগকে অন্নসত্রে (alms-house) প্রেরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে গোরক্ষিণী সভা ভিন্ন ইতর দরিদ্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত অন্য কোন সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। গোধন-বৃদ্ধিতে যে দেশের ধনাগম হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং উহার প্রতিপালনে বলিষ্ঠকায় হইতে করীষকারিণী বৃদ্ধারও যে অন্নসংস্থান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

একটী মাড়োয়ারী সমাজ সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে ভদ্র লোকদের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গো-মহিষাদি পোষণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্য ছিন্ন মূলে জলসেচনের ন্যায় বলিতে হইবে; কারণ যে প্রকারের সদ্যোপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গো-খাদকের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিয়া তাহাদের রক্ষক ও সেবকদের অন্নসংস্থান করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধবন্ধ হইলেই সেই প্রকারের দুগ্ধবতী গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং যেগুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে! ঐ সকল জীবের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছেন; অস্থিসংগ্রহকারীরা তাহাদিগের কঙ্কালগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে এদেশের ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে কারণে বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল কারণের বিষয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এখন কেবল ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিতে অনেক গোরক্ষিণী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে; কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে দেশে গাভীর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসী যে কেবল গাভী বিক্রয় করিয়া ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতেছে এরূপ নহে, অপরের গাভী সেবা করিবার সুযোগও পাইতেছে না। গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে তাহারা আর পূর্ব্বের মত দুগ্ধ খাইতে পাইতেছে না, কাজেই তাহারা শারীরিক ও মানসিক বলে বঞ্চিত হইয়া আপনারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় ও মেধাহীন সন্তান-সন্ততিতে বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেশে দরিদ্রতা আহ্বান করিতেছে।

দলে দলে আগত যত অপাত্র ভিক্ষুককে দান করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দরিদ্রতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রতীকার কল্পে নির্দ্ধারিত উপায়ে দান করা সমাজের সকলেরই বিবেচনার বিষয়। এক কলিকাতা সহরে মুষ্টিভিক্ষারূপে যে চাউল দান করা হয়, উহার সমষ্টির মূল্য বৎসরে যে

কত লক্ষ টাকা, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ অর্থে উহাদের মধ্যে যাহারা শ্রমসমর্থ, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইলে দেশের কি উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না? এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে অলসকে কি কর্ম্মঠ করা যায় না? আগাছার ডাল না কাটিয়া সমূলে উৎপাটিত করিলে দারিদ্র্য-দুঃখ কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। নচেৎ তাহারা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে। উহাতে পরের উপকার করা দূরে থাকুক, সমাজের অপকার সাধিত হইবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে আত্ম-প্রসাদ ত পরের কথা, সমাজ-কল্যাণও সুদূরপরাহত হইবে।

দেশে কমলার বরপুত্র বিলাস-পরতন্ত্র পরোপকার-প্রবৃত্তিশূন্য মানবের অসদ্ভাব নাই। কত শত মহাত্মার বাহিরে একপ্রকার, ভিতরে আর একপ্রকার; প্রবঞ্চকদের পক্ষে ইহাদের অনেকের ধনভাণ্ডারদ্বার অবারিত। কিন্তু এই হতভাগ্যদিগকে উপাধি-লোভ ও সমাজখ্যাতি দেখাইয়া রাজপুরুষ ও দেশহিতৈষিগণ কত না শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লয়েন। ইহাদিগের এই প্রকার দান কিন্তু সর্ব্বদাই মঙ্গলময়, কারণ দেশ-হিতৈষী বুদ্ধিমানের প্ররোচনায় উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের এই মতের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। হাঁসপাতাল, বৃহৎ পুষ্করিণী খনন, ব্যবহারিক শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি জনহিতকর বৃহদনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির দানে উহা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও উহার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু জগতে অধিক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল এবং উহাদের মধ্যে দানশীলের সংখ্যা আরও বিরল। মহম্মদ মহসীন্ বা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ-দান এবং এজ্রা বা শ্যামাচরণ লাহার হাঁসপাতালে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ঐ জাতীয় দানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইলে জগতের কল্যাণ-সাধনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অতএব যিনি যে পরিমাণে দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের'দেয় অর্থের সমষ্টি সংগৃহীত হইলে অতি সত্বর জগতের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের মত দেশে যখন এক বৎসর ফসল নষ্ট হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধনের অভাবে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত হইতে হয়, তখন শ্রামিক-দের কর্ম্মসংস্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। অনেকে শ্রামিককে স্থানান্তর করা উচিত বলিয়া প্রচার করেন, অনেকে চাঁদা করিয়া তাহা-দের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, অনেকে কিন্তু তাহাদের দিয়া বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শ্রামিকদিগের স্থানান্তরিত করিলে যে দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, সেই দেশের শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হ্রাস হইতে থাকে। যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সাহায্যে নূতন কর্ম্মের অনু-ষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাদের আগমন প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশে যথাসময়ে লোকাভাব হইবে ও তথায় শ্রামিকদের বেতন অযথা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অল্প-সংখ্যক বলিয়া সে দেশে অধিক ধনোৎপত্তি হইবে না।

চাঁদা করিয়া শ্রামিকদের জীবনধারণের সংস্থান করা ও ভিক্ষা দেওয়া একই কথা। ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে মূলধন অল্প হইবে না

বৃদ্ধি পাইবে না এবং মূলধন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মূলধনের অভাবে কার্য্যানুষ্ঠান রহিত হইলে শ্রামিকের ভবিষ্যৎ আশামূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে না দিয়া চাঁদার অর্থে স্থানান্তরে যাওয়া পর্য্যন্ত বা বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করা শ্রেয়ঃ।

বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ যে সকল কার্য্য অপরাপর সকলে করিতেছে, সেই কার্য্য করাইয়া লইলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়। এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজা এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মালামালের পরিচালনের সুবিধাপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় না এবং কর্ম্মসংস্থান হেতু শ্রামিকেরা সাহায্য (relief) পাইয়া থাকে।

এতাবৎ যে সকল দানের কথা বিবৃত করা হইল, আমাদের ভদ্রগৃহের পুরুষ বা কন্যা ঐরূপ সাহায্য কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। ইংলণ্ডেও ঐ জাতীয় লোকের দুঃখ-নিবারণের উপায় দেখা যায় না। স্কট্‌লণ্ডদেশে কিন্তু চরিত্রবান্ দরিদ্রকেও অর্থ সাহায্যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এরূপ কার্য্যকরী বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল যে, তাহার কল্যাণে ভদ্র ঘরের লোকে অন্নবস্ত্রের অভাব বড় একটা অনুভব করিতে পারেন নাই। একান্নবর্ত্তিতার কল্যাণে কেবল যে নিতান্ত আত্মীয় স্বজন একত্রে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সুখে দিনাতিপাত করিতেন এরূপ নহে, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীও অস্বজন বস্ত্র ও আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে সংসারের অন্য লোকাপেক্ষা অভিন্ন ভাবিয়া ঐরূপে কালহরণ করিয়া গিয়াছেন। অথচ চরকায় সুতা কাটিয়া অনাথা বিধবা কখন গৃহপতির গলগ্রহরূপে অবস্থান করেন নাই।

স্বীকার করি কলে সুতা কাটার ব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর চরকার সুতায় লাভ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ধনাগমের সহায়তাকল্পে আত্মীয় অনাথ ও অনাথারা কি কোনরূপে উপযোগী নহেন? এখনকার গৃহপতির মূলধনের সাহায্যে সেলাইয়ের কলে অথবা মোজার কলে কেবল পেট-ভাতায় কি তাঁহারা বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর কিংবা মোজা তৈয়ারি করিয়া বাজার পরিপূর্ণ করিতে পারেন না? পল্লীগ্রামে তেঁতুল কাটিয়া তাল করিয়া কি পর্ব্বতাকার করিতে পারেন না? সস্তায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম কাটিয়া অল্প শিক্ষাসাধ্য চাট্‌নি করিয়া কি সমগ্র পৃথিবীর চাট্‌নি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না? অথবা মসলা চূর্ণ করিয়া পরিমাণমত সংমিশ্রণপূর্ব্বক ইউরোপ ও আমেরিকার অভাবমত মসলা অল্পমূল্যে সরবরাহ করিতে পারেন না? তাঁহারা সকলই পারেন এবং তাঁহাদিগকে গলগ্রহও হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রম-বিভাগ-প্রথায় ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন।

আমাদের সমাজকর্ত্তারা ভূয়োদর্শন গুণে যে সকল সমীচীন রীতির প্রচলন বিষয়ে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, আজিকালি তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসপরতন্ত্র ও দৃষ্টিহীন হইয়া এবং পৃথক্ থাকিয়া, পরদুঃখকাতরতাকে স্বার্থোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়, কলিকাতায় থাকিয়া পৃথক্‌ভাবে আত্মোন্নতির পথ অনুসন্ধান করেন; কিন্তু

তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভার কে গ্রহণ করিবে। যাহা সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ আহ্বান করা কখনই দূরদর্শিতার লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ কিছু দান করিয়া মনে করেন, সমাজের কল্যাণ সাধন করিলেন, অথবা আত্মীয়স্বজনের উপকার করিলেন; কিন্তু দান কার্য্যকর বা সার্থক না হইলে দেশের অর্থনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং দানকাতরতা তাহার অন্যতম ফল। ভিক্ষুক হইতেই বা কাহার সাধ? যাহাকে সমাজ ভিক্ষুক হইতে দেয় নাই, আজ তাহাকে ভিক্ষুক সাজিতে বলা যে কেন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

আত্মা এক না অনেক ?

স্মরণাতীত কাল হইতে আত্মার স্বরূপ লইয়া আর্য্যমনীষীদিগের মধ্যে কতই বিচার না চলিতেছে; কতই গ্রন্থ না প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি প্রতীচ্য ভাবের এই অভ্যুদয় ও বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির যুগেও আত্ম-বিদ্যার গবেষণা চলিতেছে। যাঁহারা এক সময়ে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, দেখিতেছি তাঁহারাও এক্ষণে অন্তর্মুখ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ দেখিয়া ভরসা করিতে পারা যায় যে, "অপরা" বিদ্যা "পরা" বিদ্যাকে মেদিনীপৃষ্ঠ হইতে কোন প্রকারে বিদূরিত করিতে পারিবে না। "অপরা" বিদ্যায় যতই কেন নব নব ভোগ বিলাসের শাবর মন্ত্রে জনতাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক না, কিছুতেই "পরা" বিদ্যার কল্যাণপ্রসূ ও শান্তিপ্রদ উপদেশকে অন্ততঃ বিচারশীল ব্যক্তিরা ভুলিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশবাসীরা ইতঃপূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর ভক্তির খুটি নাটি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। যদিও রামমোহন রায়ের সময় হইতে উপনিষদী বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছিল, তবুও বড় কেহ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেবল এইমাত্র হইয়াছিল যে, কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদকে অবজ্ঞা করিতে ও অভিনব মনগড়া নিরাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের মহিমা গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। অবশ্যই এই গীতিকা নিষ্ফলে যায় নাই। কেননা ব্রাহ্মসমাজ তাহার ফল স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই ফলটা হিন্দুসমাজের পক্ষে সরস হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। যাহা হউক, এক্ষণে বাঙ্গালীরা যে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে শিখিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যগ্রতা তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে গীতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, উহাও বেদান্তানুরাগ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভগবান্ শঙ্করও গীতাকে বেদান্তের প্রস্থান বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আর

বেদান্তশাস্ত্র; যে আত্মতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা তদধ্যায়ীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্ত প্রকৃতপক্ষে আত্মার একত্ব বেদান্তশাস্ত্রের অভিধেয় হইলেও অনেকেই ইহাকে নানাত্ববাদে লিপ্ত করিবার প্রয়াসে ত্রুটী দেখান নাই। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সম্বন্ধে বড় বড় পুঁথিও লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ পুঁথিগুলি অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিপাদক শঙ্করভাষ্য প্রভৃতির ন্যায় সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এইত গেল পুরাকালের কথা। আবার বর্ত্তমান সময়েও সাময়িক পত্র প্রভৃতিতে কেহ না কেহ নানাত্ববাদের কোলাহল করিয়া থাকেন। যদিও এই কোলাহলে বিশেষদর্শীর কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তবুও অল্পদর্শীর মন তরঙ্গায়িত হইতে পারে, এইজন্য আমরা এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে সত্যের মীমাংসা করিয়া লইবেন।

আত্মার মৌলিক রূপের সহিত পরিচিত হইলে আত্মা এক বা অনেক ইহা বুঝিতে সুযোগ ঘটিয়া আসিবে, সুতরাং প্রথমে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আত্মা যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত দেহ হইতে পৃথক্ একটা অপরিণামী বস্তু, এই বিষয়ে কোন আস্তিক সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একত্ব বা অনেকত্ব লইয়া বিবাদ থাকিলেও তিনি যে অজর, অমর, নিত্য চেতন বস্তু এই বিষয়ে তাঁহারা একমত। বর্ত্তমান সময়েও যে আস্তিক আর্য্যেরা আত্মার নানাত্ব লইয়া কোলাহল করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মাকে উৎপন্ন জিনিষ মানিয়াও অনন্ত বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহাদের কথার কোনই অর্থ নাই। কেননা যে বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে এই মতটা দার্শনিক যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া কোন প্রকারেই বিজ্ঞমণ্ডলীর উপাদেয় হইতে পারে না। আত্মা বলিতে যখন একটা অপরিণামী বস্তু বুঝা গেল, তখন পরিবর্ত্তন স্রোতে যে সকল জিনিষ যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিতে পারা যায় না। আর বৈদ্যুতিক অণুকে বাদ দিয়া নিখিল জড় বস্তুই অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতেছে। সুতরাং অপরিণামী বলিয়া আত্মাকে অণু সংগঠিত কোন জিনিষ বলা যাইতে পারে না। অণুকে আত্মা বলিলে তাহার মৌলিক অপরিণামিত্ব কোন প্রকারে বজায় রাখিতে পারিলেও এক এক শরীর অসংখ্য অণুর মিশ্রণে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যেক শরীরই অসংখ্য আত্মার লীলাভূমি হইয়া পড়িল। আর এইরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা প্রভৃতির উৎপত্তি সামঞ্জস্য ও তদীয় নিয়ম সুশৃঙ্খলা রক্ষা করাও অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে অণু বিনষ্ট না হইলেও তাহার স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন তাঁহাকে আত্মার স্থানে অভিষিক্ত করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পর গুণ বা স্বভাব বিনিময়ের আপত্তিটা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ স্বতঃই পণ্ডিত মূর্খে পরিণত এবং মূর্খ পণ্ডিতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে; কেননা, অণুরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ আত্মা অবিরত প্রবেশে বা নির্গমনে রত রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝা গেল যে, অণুকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই জন্য বৈজ্ঞানিক শক্তিকে আত্মা বলিবার অধিকারটা বিলুপ্ত হইল না। শক্তিকে আত্মার আসনে বসাইলে ভূতগুলিও আত্মার অধিষ্ঠান

ভূমি হইয়া পড়ে, কেননা উহাদের মধ্যে শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার নহে; কারণ আত্মা সর্ব্বব্যাপী। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য-ধীরাঃ" শক্তির আত্মপদ স্বীকার করিলে তাহার মৌলিক রূপ এক হওয়াতে আত্মারও মৌলিকরূপ এক হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এক শক্তির বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বস্তুতে যে কার্য্য হইতেছে, ইহাও বিজ্ঞান বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থাতেও যদি কেহ প্রাণি-জগতে যে শক্তির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া উহার কারণীভূত শক্তিকেও এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়া লন, তবে আত্মারও প্রকারান্তরে নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু এই সিদ্ধান্তটাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত করা সহজ ব্যাপার নহে। আর কোন প্রকারে প্রমাণিত করিতে পারিলেও কার্য্যকারিত্বের দিক্ দিয়াই শক্তির ভিন্নতা প্রতিপন্ন হইবার কথা, কিন্তু মূল স্বরূপের দিক্ দিয়া নহে। এখন দেখিতেছি, শক্তির মূল স্বরূপটা যেরূপ একত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ইহাতে ভিন্নতা কোন প্রকারে উহার অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে আত্মা ও শক্তির তাদাত্ম্য স্বীকার করিলে আত্মা লইয়া যে নানাত্বের বিবাদ চলিতেছে, তাহারও উপশম হওয়া উচিত হইলে কি হয়? অনেকেই "আমার পাঁঠা আমি লেজে কাটিব" নীতির অনুসরণ করিতেছেন। যেরূপ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আত্মতত্ত্বের পর্য্যবসান করিলে তাহার একত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইতে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টির প্রত্যাহারেও সেইরূপই ঘটে কি না, ইহার আলোচনা করা যাউক। যখন আত্মা যে পরিণতির পরপারস্থ একটা জিনিষ, ইহা আস্তিক-মণ্ডলীর পক্ষে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তর্জগতের মধ্যে যাহাকে ঐরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইব, তাহা ব্যতীত অপর কাহাকেও আত্মা বলিয়া সনাক্ত করা উচিত নহে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাগুলির মধ্যে যাহাকে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিতে দেখি না, কিন্তু একই মৌলিকরূপে সকল ঘটনায় বা জিনিষে যে অনুস্যূত থাকে, অথবা যাহা ব্যতীত কোন ঘটনা বা জিনিষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইবার নহে, তাহাকেই মহিমান্বিত আত্মপদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য জানা উচিত। ব্রহ্মবিদ্যার অবলম্বন-ভূমি ও তদ্ অভিধেয় বলিয়া দেখিতেছি, ঐরূপ জিনিষ এক মাত্র জ্ঞানই হইতে পারে; কেননা, তাহা ব্যতীত আন্তরিক সমস্ত বস্তুই সাময়িক। সুখদুঃখ প্রভৃতি যে কোন জিনিষ আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, ঐগুলির মধ্যে কাহাকেও অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া ধরিতে পারি না। মনে কর, রামের পর্য্যায়ক্রমে সুখ, দুঃখ, শোক, ভয় হইতে লাগিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সুখ হইল, ঐ মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী ভাবগুলির অভাব; এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক ভাবের অভ্যুদয়কালে পূর্ব্ব-বর্ত্তী কোন ভাবই থাকে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না যে, রামের ঐ সমস্ত ভাবই পরিবর্ত্তনশীল এবং একে অপরের সহযোগী নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানকে একই রূপে অর্থাৎ প্রকাশরূপে ঐ সকল গুলিতে অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা সুখের প্রকাশরূপ জ্ঞান হইতে দুঃখের প্রকাশরূপ জ্ঞানের পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। অন্তর্জগতের সম্বন্ধেই আর বহি-র্জগতের সম্বন্ধেই বল, প্রত্যেক ঘটনার সহি-তই জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহা ব্যতিরেকে কাহারও অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবার নহে। এমন সময় বা ঘটনা অনু-সন্ধানে পাই না, যাহাকে জ্ঞান প্রকাশ না করিয়া দিতেছে, ও যাহাতে উহা নাই। যেরূপ জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার প্রত্যেক ঘট-নার জ্ঞান অনুস্যূত থাকিয়া তাহার প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তদ্রূপ সুষুপ্তিতেও বটে। সুষুপ্তিতে যে এইরূপ ভাবে জ্ঞান থাকে, তাহার প্রমাণ "আমি সুখ পূর্ব্বক শুইয়া-ছিলাম। কিছুই জানিতে পারি নাই" এই-রূপ স্মৃতি। যদি এই স্মৃতি সম্বন্ধে আপত্তি হয় যে, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিস্থলে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থার শেষ ও সুষুপ্তি অবস্থার প্রারম্ভে ইন্দ্রিয় গুলির শিথিলতাজনিত এক প্রকার সুখ হইয়া থাকে এবং ঐ সুখটাকে পুনঃ জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্মরণ করে। সুতরাং এই স্মৃতিটা সুষুপ্তি অবস্থায় সুখানুভূতির কোন খবর

আনিয়া দেয় না। তথাপি এই আপত্তিটীকে ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। কেননা জাগ্রত অবস্থার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তি ভঙ্গ পর্য্যন্ত সুখ ছাড়া অন্য কোন জিনিষের অনুভব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না; আর দেখিতে পাই যে, একটা কোন বিরোধী মনোবৃত্তির অভ্যুদয় না হইলে কোন প্রকারে পূর্ব্বোৎপন্ন মনোবৃত্তি লুপ্ত হইবার নহে। সুতরাং এই সুখানুভূতিটা যে সমস্ত সুষুপ্তি কাল ব্যাপিয়াই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে জ্ঞানটাকে মনোবৃত্তি বা বিষয়ের সহিত মিলাইয়া তাহার উপর অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ চাপাইতেও ত্রুটী করেন না। ইহার কারণ অগ্নিতে ইন্ধন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় লোকে যেরূপ ইন্ধনের ন্যায় দৈর্ঘ্য প্রভৃতি পরিমাণবিশিষ্ট মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানকে মনোবৃত্তি বা বিষয়ের সংস্রবে আনিয়া ঐ উভয়ের প্রকাশ করিতে দেখায় ঐ গুলিকে একাকার করিয়া তুলে এবং বিশ্লেষণ ব্যাপারে প্রয়াস করিতে চাহে না। বিষয় বা মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া দেখিলে অবশ্যই ঐ দোষগুলির অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের প্রকাশকে ঐ দোষে লিপ্ত করা যায় না। আর করিলেও ইহা বিচারশীলতার পরিচায়ক নহে। এইরূপে প্রকাশরূপ জ্ঞানের ঐ দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং সকল অবস্থা ও ঘটনায় জ্ঞান অনুস্যূত থাকে বলিয়া তাহাকে আত্মা বলিয়া ধরিতে কোন আশঙ্কা রহিল না। পক্ষান্তরে জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহাকে আত্মা বলিলে এটা কোথায় আছে, সপ্তম স্বর্গে না সপ্তম পাতালে, এইরূপ সন্দেহের বিভীষিকাটা চলিয়া গেল। আর উপনিষদেরও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

জ্ঞানকে আত্মা মানিলে যেরূপ তাহার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে কোন প্রতিবন্ধক রহিল না, তদ্রূপ তাহার মৌলিক রূপের একত্বও নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানের মৌলিক রূপ যে বস্তুমাত্রের প্রকাশ, ইহার আভাস পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, জ্ঞানের বিষয় গুলিই কেবল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু উহাদের প্রকাশরূপ জ্ঞান একই ভাবে একই স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। জল ও অনলের জ্ঞানে একমাত্র জল ও অনল এই বিষয়াংশেরই পার্থক্য দেখিতে পাই, উভয়ের প্রকাশ অংশে কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই, যে প্রকাশ জলের, সেই একই প্রকাশ অনলের। যেরূপ বিষয়ভেদে জ্ঞানের ভিন্নতা প্রমাণিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞাতৃভেদেও জ্ঞানের পার্থক্য নাই। "যদুর" জ্ঞানের বিষয়গুলি অবশ্যই "দিনুর" জ্ঞানের বিষয় হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু উভয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানকে কিছুতেই ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে বা ধরিতে পারি না। রামের প্রকাশরূপ জ্ঞানটা কৃষ্ণবর্ণ, আর শ্যামের প্রকাশরূপ জ্ঞানটা শ্বেতবর্ণ, এইরূপ আশ্চর্য্য ধারণা বিকৃতমস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভবপর। জ্ঞানের মূলতত্ত্ব ধরিতে না পারিয়া অনেকেই তাহাকে সাময়িক ও নানাত্ব দোষে লিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। কিন্তু ইহার কারণ বিচারৌদাসীন্য বা বিচারবিভ্রাট। পক্ষান্তরে যখন বেদান্তশাস্ত্রে "দৃশিস্বরূপং গগনোপমংপরং সকৃদ্বিভাতন্ত্বজমেকমক্ষরং অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তমোম্" অর্থাৎ "যাহা আকাশবৎ সূক্ষ্ম, একবারেই প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছেন, যাহা এক অনাদি, পরিণামশূন্য পরমবস্তু, যাহার নির্লেপত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বে কোন সন্দেহ নাই, সেই জ্ঞানস্বরূপ ওঁকারবেদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মা আমিই বটি" এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়; তখন আত্মনানাত্ববাদের গৌরব কি প্রকারে করিতে পারি। যদিচ উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা ভেদবাদের বিজয় লাভ অসম্ভব। কেননা "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেবাদেহং ব্রহ্মাস্মীতি" ইত্যাদি উপনিষদে অভয় পদ (মুক্তিপদ) প্রাপ্তির কারণ অভেদ জ্ঞান বলা হইয়াছে। এইজন্য নিম্ন অধিকারীকে দেহাত্মবুদ্ধি হইতে বিমুখ ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে উন্মুখ করিবার উদ্দেশে "শাখাচন্দ্র" নীতিতে আত্মভেদের অবতারণা অর্থাৎ যাঁহারা চৈতন্যকে দেহ প্রভৃতি উপাধির সহিত মিলাইয়া একটা

অভিনব আত্মা করিয়া লইয়াছেন, ভ্রান্তি-জ্ঞান অপনোদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অন্তর্মুখ করিবার জন্ত এইরূপ উপদেশ। বেদান্ত শাস্ত্র যে ছোট বড় সকলকে একই মাপের কোট পরাইতে উপদেশ দেয় না, তাহা তদধ্যায়ীকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ সমন্বয় না করিলে ভেদ ও অভেদের প্রতিপাদক বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্তের উপদেশ উন্মত্তের জল্পনায় পরিগত হইয়া পড়িবে। এই স্থলে দ্বৈতবোধক বাক্যকে মুখ্য, আর অদ্বৈতবোধক বাক্যকে গৌণ বলিলেও কিছু ফলোদয় হইবার নহে; কেননা অদ্বৈত জ্ঞানকেই মুক্তির অব্যবহিত কারণ বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মার স্বরূপকে ধরিয়া উঠিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সচরাচর বলিতে দেখা যায় যে, জ্ঞানের পথ বড় জটিল। কিন্তু ইহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, জটিল হইলেও এই পথ ব্যতীত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। বেদ ঘোষণা করিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার গবেষণায় পরিশ্রম করিয়াও অবশেষে উপাসনা বা ভক্তির দোহাই দিয়া ভেদবাদের চতুঃসীমার বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হন না। জিজ্ঞাসা করি, যদি বিচার-শক্তি অদ্বৈত ব্রহ্মকেই সত্য এবং তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানকে পরমপদপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, তবে তাহার প্রতিকূলে উপাসনা বা ভক্তির লোভটাকে সঙ্কোচিত করা কি বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? এই শ্রেণীর কোন না কোন মহোদয় জীবাত্মার মূল স্বরূপটাকে শুদ্ধ নিরুপাধিক ও নির্গুণ মানিয়াও পরব্রহ্ম হইতে তাহার পার্থক্য ঘোষণা করেন এবং অদ্বৈতবাদের উপর এইরূপ অভিযোগ আনেন যে, জীব নিজের স্বরূপটাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরব্রহ্ম হইয়া পড়িলে বৈনাশিকের আপত্তি আসিয়া পড়ে অর্থাৎ আপনাকে বিনাশ করিবার জন্ত জীব অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে যায়। এই পার্থক্য ঘোষণাটাকে আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যুক্তির সহিত মিলাইতে পারিলাম না। পারিব কি প্রকারে? ভেদজ্ঞানের মূলে উপাধি বা গুণই দেখিতে পাই। ফলতঃ আজ পর্য্যন্ত দার্শনিক জগতে এমন কোন যুক্তি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা নির্গুণ বা নিরুপাধিক বস্তুর ভিন্নতা বুঝাইয়া দিতে পারে। পক্ষান্তরে ঐ আপত্তিটাও যে আকাশের দুর্গস্থানীয়, ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কেননা অবিদ্যোপাধিক চৈতন্যকেই অদ্বৈতবাদ জীব বলিয়াছে, কিন্তু চৈতন্যকে বাদ দিয়া কেবল অবিদ্যা উপাধিকে নহে। সুতরাং অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পরে জীব উপাধিটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেও তাহার মূলস্বরূপ চৈতন্য সেই একই ভাবে বর্ত্তমান থাকে। বোধ হয়, আপত্তিকারীর অদ্বৈতবাদের বিদ্বেষটা অতিমাত্রায় চড়িয়াছে, তাই আপত্তি উত্থাপন কালে দিক্‌শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই স্থলে সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে, এইরূপ শত শত আপত্তির অবতারণা করিলেও সত্যানুসন্ধিৎসু মনীষীরা কখন অদ্বৈতবাদের উপর ভক্তি হারাইয়া আপত্তিকারীদিগকেও স্বর্গের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। আর বিদ্যামূর্ত্তি শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, রাম, শ্যামের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার অবজ্ঞা করিতে পারেন? আত্মার প্রকৃত স্বরূপটা একমেবাদ্বিতীয়ং হইলেও তাঁহার উপাধিগুলি অনেক, এই জন্য কৃতবিদ্য লোকেরাও বিচার-বৈধুর্য্যে পড়িয়া উপাধির অনেকত্বটাও আত্মার আসন স্বরূপে সংশ্লিষ্ট করেন। আবার এই শ্রেণীর মধ্যে ঐ স্বরূপটাকে বুঝিয়া লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহও দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে না পাইবার কারণও যে নাই তাহাও নহে; কেননা ইহাকে বুঝিয়া লইতে হইলে প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিতে হয়, পশ্চাতে বিচারার্থ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উপচয় ও আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা হউক, আত্মার উপাধিগুলি অনেক বলিয়াই যে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সকলেই যে আত্মার

মূলতত্ত্বকে ধরিয়া লইবে, এইরূপ আশা করিতেও পারা যায় না। অধিকন্তু ইহা বিবেচ্য যে, সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া এত বড় গুরুতর বিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত কি না। আজ কাল দেখিতেছি যে, "স্থানীপুনাকে" নীতিটা অজাতশ্মশ্রুদিগকে পর্য্যন্ত নিজের আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। যে কোন অতি গভীর তত্ত্ব হউক, দুই চারি পাতা উল্টাইয়াই অনেকে সাধারণ সমক্ষে আপন সিদ্ধান্তটা ব্যক্ত করিতে চাহেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে এই নীতিটার সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অথবা গভীর হইতে গভীরতম তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে ইহার সমাবেশ করিতে যাওয়া অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচায়ক হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গবেষণা এরূপ সহজ নহে যে, রাম শ্যাম পর্য্যন্ত ইহার অন্তস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ প্রবৃত্তিটা অবশ্যই কোন না কোন সময়ে তাহাদিগকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিবে। ইহা অতীব সত্য যে, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া কেহই মূলতত্ত্বের সহিত পরিচিত বা প্রকৃত কল্যাণের মার্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই শক্তি অনুসারে ইহার অনুশীলন আবশ্যক। পরন্তু এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, স্ব স্ব অধিকার হইতে অধিক বলিয়া যেন কেহ আপনাকে বিশ্বাস না করিয়া বসেন। আজকাল কতকগুলি লোককে যে অনধিকারচর্চ্চায় লিপ্ত হইতে দেখিতে পাই, তাহার মূলেও এই বিশ্বাসই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই ত গেল শ্লোকগ্রাহীর কথা, আবার যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না ও সংযুক্ত অক্ষরের সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন, তাঁহারাও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে সিদ্ধহস্ত; সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে যদি কোন বিশেষদর্শী উক্ত অভিনয়গুলিকে অনধিকারচর্চ্চায় পরিণত বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। অবশ্যই প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটা দিন দিন বাড়িতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু গাছে না উঠিতে এক কাঁদি এইরূপ নীতির অনুসরণ করা যে এক প্রকার অবিদ্যার অধীনতা, তাহা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নহে?

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও তন্ত্র পর্য্যন্ত আর্য্যগ্রন্থগুলিতে যে অদ্বৈতবাদের মহিমা গীত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে বাতুলের প্রলাপ বা মনোরাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কোন প্রকারেই বিচারশীলের কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। তবে অবশ্যই ইহা স্বীকার্য্য যে, ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে গেলে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। পাঠক, আত্মার আগন্তুক বা ঔপাধিক রূপটা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাঁহার মৌলিকরূপ যে অভিন্ন ও একত্বরসে পরিপূর্ণ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, এক্ষণে উপসংহারে এইমাত্র নিবেদন করা যাইতেছে যে, কেহ যেন "শ্যেনকর্ণ" নীতির অনুসরণপূর্ব্বক অযথা ভেদবাদের দিকে যাইয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত না করিয়া তুলেন। অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্বরূপের বিচার করিতে পারিলে অবশ্যই মাহেন্দ্রক্ষণের আগমনে তাহার মূলতত্ত্ব যে একমেবদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম, ইহা বুঝিয়া লইতে সমর্থ ও অভয়পদ প্রাপ্ত হইবেন।

ওঁ তৎসৎ—

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী

শম খণ্ড] ১৩১৬ সাল, কার্ত্তি [৭ম সংখ্যা ।

সম্পাদক—

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

কলিকাতা ।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,

সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত ।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী।)

সাহিত্য-সভা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা

দশম খণ্ড] ১৩১৬ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

সতীদাহ সম্বন্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পত্র।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত জার্ণাল নামক সাময়িক পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ আচার্য্য হোরেশ হেমন্দ উইলসন সাহেব হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আচার্য্য মহাশয় প্রতিপন্ন করেন যে, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আচার্য্য উইলসনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার তারিখ ৩০এ জুন, ১৮৫৮ অব্দ।

রাজা বাহাদুরের যুক্তি কিম্বা উইলসনের যুক্তি সারগর্ভ বা শাস্ত্রসম্মত কি না তাহার বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে; রাধাকান্ত দেবের ঐ পুরাতন পত্র প্রাপ্ত হওয়া এক্ষণে দুর্লভ; এই পত্রের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ইহা আমাদের দেশের একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ, বিশেষতঃ সেকালে এই পত্র সম্পর্কে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সপ্তদশ খণ্ডে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আমি রাজা বাহাদুরের সেই পুরাতন ইংরাজি পত্রখানি বঙ্গ ভাষায় নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম। কোন সময়ে ইহা আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে এই ভরসায় ইহা অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আচার্য্য উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা দেখিয়া লইতে পারেন।*

* সুবিখ্যাত আচার্য্য এইচ, এইচ, উইলসন সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে এদেশে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (ডাক্তার) হইয়া আসিয়াছিলেন। এদেশে অবস্থানকালে তিনি হিন্দি, পারস্য, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। মেঘদূত, বিষ্ণুপুরাণ, শকুন্তলা প্রভৃতি তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজিতে ভারতীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত বহু উপাদেয় গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। তিনি এল, এল, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ অব্দের ৮ই মে তিনি বিলাতে পরলোক গমন করেন। আচার্য্য উইলসন তাঁহার প্রায় সমস্ত জীবন সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় যাপন করিয়াছিলেন।

পত্রের অনুবাদ।

সুপ্রিয় আচার্য্য উইলসন,

সতীদাহ-প্রথা, রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায়, হিন্দু সমাজে প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু বিধবা আর "সতী" হয়েন না। আপনি সম্প্রতি এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমি পুনরায় এই প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি। এরূপ আলোচনার আর প্রয়োজন না থাকিলেও ইহাতে শাস্ত্র, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন হইতে পারে ভাবিয়া, আপনাকে আমি এই পত্রখানি লিখিতে সাহসী হইলাম।

বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের যোড়শ খণ্ডের ১ম ভাগে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। আপনি ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, বৈদিক শাস্ত্র বা সাহিত্যে সতীদাহের কথা আদৌ নাই। আমি আপনার এই মন্তব্য সম্বন্ধে যেরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার বিশ্বাস, মল্লিখিত এই পত্র পাঠান্তে আপনার কতকগুলি ধারণা ভ্রমাত্মিকা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বৈদিক শাস্ত্র ও সাহিত্যে সতীদাহ-প্রথার উল্লেখ আছে।

তৈত্তিরিয় সংহিতার অঙ্ক নামক শাখার দুইটি শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের চৌরাশি সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক, সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল। "অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।"—সায়ণকৃত ভাষ্য—হে অগ্নে! কর্ম্মসাক্ষিন। যতঃ ত্বং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদ্যখিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্ণান্যৎ ইতি নিয়ম বোধনায়। তস্মান্ময়াচর্য্যমানং যৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্যথাহং কর্ত্তুং শকেয়ং তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তা মিত্যর্থঃ। ধাতুনাম নেকার্থত্বাৎ। কিং ময়াচর্য্যমানং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমেতি পত্যা ভর্ত্রা সহ অনুস্মৃত্যা গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুরগ্রে।" সায়ণকৃত টীকা।—হে অগ্নে ইহ অস্মিন কর্ম্মনি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভোগেন। নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থ মিত্যাক্তৌ তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়েত্যর্থঃ সপ্তমর্থে দ্বিতীয়া ছন্দসি। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য অস্মিন্দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভোগেন। জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গপ্রদর্শনদ্বারা সহগমনবিষয়কসাহসপ্রদানদ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈক দেবতাং পত্যুর্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।

বাঙ্গালানুবাদ। ১ম শ্লোক। হে অগ্নে! তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার সহায় হও।

বাঙ্গালানুবাদ। ২য় শ্লোক। হে অগ্নে! এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নে! মৎপ্রদত্ত ঘৃতসংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান

করুন, আমি যেন সহমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।

উপরিউক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সহমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কন্যা হইলে, সুবর্ণ, ধনু কিম্বা রত্নখণ্ডকে চিতার উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃত দেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, 'দেবর কিম্বা ভর্ত্তার কোন বন্ধু, সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদিরস্ব" (ইত্যাদি) অথবা "সুবর্ণ গুঞ্জ হস্তাৎ" (ইত্যাদি) কিম্বা "মণি গুঞ্জ হস্তাৎ" শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যার শুদ্ধি হয়।* এই মন্ত্র উচ্চারিত শ্রুত বা পঠিত হইবার পরে বিধবা যদি সহমরণে সম্মতা হয়েন তাহা হইলে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদিকে শান্ত্বনা বাক্য কহিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। যদি তখনও ঐ বিধবার মনে কোন প্রকার সংশয় বা চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও (বোধ হয় মন্ত্রগুণে) তিনি এই সহমরণ ক্রিয়ায় সম্মতা হয়েন।

ভরদ্বাজ ও অশ্বলায়ন হইতে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমি দেখাইব, বৈদিক শাস্ত্রে সহমরণ বিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও সর্ব্বজনগৃহীত "সহমরণ-বিধি" নামক সুপরিচিত গ্রন্থ হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। আপনি এই সকল শ্লোক পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণশাস্ত্রে সহমরণ-বিধি, প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোক—"অথৈনং চিতাবুপর্য্যধ্যূহন্ত্যত্রৈব বা পত্ন্যাঃ সংবেশনা ক্রিয়তে ইতি।"—ভরদ্বাজ সূত্র। ১ম প্রশ্ন।

টীকা—অথৈতানি পাত্রানি যোজয়েৎ দক্ষিণে হস্তে জুহং সব্য উপভৃতং দক্ষিণে পার্শ্বে স্ফত্যং সব্যে অগ্নিহোত্র হবনীমুরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানীত্যাদি:—অশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোক, এবং Max Muller's Commentory, "Zeitschrift der de margenl. Ges."—IX, P. VI.

দ্বিতীয় সূত্র—"উত্তরতঃ পত্নীং"। টীকা —তত: প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি। শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশোয ইতি লিঙ্গাৎ এতাৎবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং। Ditto, Ch, II. Verse III,

উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ নিত্বমভিসং বভুথ॥

হস্তৌ সম্মার্ষ্টি সুবর্ণেন ব্রাহ্মণস্য সুবর্ণং হস্তাদিতি। ধনুষা রাজন্যস্য ধনুর্হস্তাদিতি। মণিনা বৈশ্যস্য মণিং হস্তাদিতি। (ভরদ্বাজ সূত্র)। তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়ো অন্তেবাসী জরদ্দাসো উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকমিতি। (অশ্বলায়ন। ২য় অধ্যায়, দ্বিতীয় সূত্র।)

উত্তরতঃ পত্নীং। তাং প্রেতস্যোত্তরতঃ সুপ্তাং সত্বরহিতাং দেবরঃ শিষ্যোবা করে ধৃত্বা নমস্কৃত্য উদীর্ষ্বেতি দ্বাভ্যামুত্থাপয়েৎ। সত্যাধিকাস্তু স্বয়মেব সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ পুত্রাংশ্চ সমামন্ত্রে ভর্ত্তারং বিষ্ণুরূপং ধ্যত্বা হুতাশনং প্রবিশেদত্যুক্তং। (সহমরণ-বিধি)।

সহমরণের বৈদিক বিধি দেখাইলাম। আপনি যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে আমি কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে অভিলাষ করি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য

* শূদ্র-কন্যা বিধবা হইলে এবং সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার সম্বন্ধে কোন মন্ত্রের উল্লেখ নাই। তবে কি শূদ্রাণী বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ? অথবা অফলদায়ক?—লেখক।

করুন। সপ্তম ও অষ্টম ঋক পড়ুন—"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ।"

আপনি যদি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত "শুদ্ধিতত্ব" দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঋগ্বেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহমরণ-প্রথা বেদবিধি-সম্মত। আচার্য্য কোলব্রুক সাহেব রঘুনন্দনের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাঁহার "বিধবার কর্ত্তব্য" নামক ইংরাজি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। (Asiatic Researches, Vol. IV. Article on the duties of a faithful widow) আপনি বিবেচনা করেন, ঐ শ্লোকে ভুল আছে এবং তজ্জন্য আপনি সায়ণাচার্য্যের টীকা ও অশ্বলায়নের ভাষ্য দেখাইয়াছেন। আপনি যদি ঐ উদ্ধৃতাংশের "অবিধবা" ও "সপত্নী" শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আপনার ভ্রম হইত না।

"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাষ্কলা, মাণ্ডুকেয়ী প্রভৃতি।" এস্থলে দেখা যাইতেছে, সহমরণের সময়ে বিধবাকে সধবার সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে হয়। এস্থলে "সতী" শব্দের অর্থ, স্বামী সনে চিতায় দগ্ধা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ কারিণী স্ত্রীলোক।

আমি আপনাকে ভরদ্বাজ ও অশ্বলায়নের শ্লোক দেখাইতেছি, ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিবেন বৈদিক যুগেও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং বেদশাস্ত্র তাহা নিষেধ করেন নাই। আপনি যে শ্লোক দেখাইয়াছেন, তাহাতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই; কারণ ঐ শ্লোকের যাহা অর্থ তাহা এই—সহমরণের নয় দিবস পরে অর্থাৎ দশম দিবসে এই শ্লোক শ্মশানে গিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, ঐ দিবসে সতীর জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ চিতাস্থলে একত্র হইয়া শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ক্রিয়ান্তে অধ্বর্য্যু মহাশয় কুশাগ্রে ঘৃত মাখাইয়া সমবেতা সধবা স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে লেপন করিয়া দেন, তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া দশমন্তোত্র আবৃত্তি করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। আপনার শ্লোক সহমরণান্তকালজ্ঞাপক, সহমরণজ্ঞাপক নহে।

"নবম্যাং বৃষ্টায়াং যজ্ঞোপবিতীত্যস্তরাগ্রামং শ্মশানং চাগ্নিমুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্যা পরেনাগ্নিং লোহিতং চর্ম্মানডুহং প্রাচীনগ্রীব মুত্তর লোমাস্তীর্য্য বেতসমানিনো জ্ঞাতি নারীহত্যারোহতেত্যথৈনানস্থ পূর্ব্বান কম্যয়তি যথাহানীতি প্রতিলোমকৃতয়া চারণ্যা স্রুচা দ্বে চতুর্গৃহীতে জুহোতি ন হি তে অগ্নে তমুব ইতি দশ চ স্রুবাহুতীর অমনোস্মো শুচদধমিতি হুত্বাপাশাং সম্পাতয়ন্ত্যা চোতয়ং প্রহরন্তি যেন জুহোত্যপরেনাগ্নিং লোহিতো অনৎ দ্বানপ্রাংমসো অবস্থিতো ভবতি তং জ্ঞাতয়ো অন্যারভন্তে অনন্নহ মন্যারভামহ ইতি প্রাচ্চি অশ্চস্তোমে জীবা ইতি জঘন্যো বেতসশাখয়া অরকাভিশ্চ পদানিত্য লোভয়ন্তে মৃত্যোঃ পদমিত্যথৈভ্যোঃ অধ্বর্য্যু দক্ষিণতো শ্মশানং পরিধিং দধাতির্ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি স্ত্রীয়ামজনিষু সংপাতানবনয়তীমা নারীরিতি ত্রৈমুখানি মৃজন্তে য়দাঞ্জনং ত্রৈককুদমিতি ত্রৈককুদেনাং জনেনাংক্তে যদি ত্রৈককুদং নাবগচ্ছে দ্বেনৈর কেনচিদাঞ্জনেনাজ্জীবন্।"—ভরদ্বাজ সূত্র। দ্বিতীয় খণ্ড। ১ম প্রশ্ন।

"উত্তরম্বাদধ্যগ্নিমুপসমাধায় যচ্ছাদস্যানডুহং চর্ম্মাস্তীর্য্য প্রাজীবমুত্তরলোম তস্মিন্নমাত্যাদিনারোহয়েদারোহতায়ুর্জর সংবৃণানাং ইতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিধিং দধ্যাদস্তমৃ্ত্যুং দধতাং পর্ব্বতেনিত্যস্নানমুত্তরতোগ্নেঃ কৃত্যা পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থামিত্যাদি চতসৃভিঃ প্রত্যূচং হুত্বা যথাহান্যনুপূর্ব্বং ভবন্তিত্যমাত্যাদীনীক্ষেৎ। যুবতয়ঃ পৃথক পাণিভ্যাং দর্ভতরণকৈর্ণবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকণিষ্ঠিকাভ্যামাজ্যেনাক্ষিণী আজ্যং পরাচ্চো বিসৃজেযুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরিতি অঞ্জনা ইক্ষেৎ। অশ্মন অতিরয়িতে সংরভধ্যমিতি।"—অশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র। তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃত কথা এই, বেদে যদি সহমরণ বিধি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না, কারণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আবশ্যক। বাস্তবিক বৈদিক শাস্ত্র সহমরণ নিষেধ করেন নাই। তৈত্তিরিয় সংহিতার অক্ষ শাখার শ্লোক, সহমরণের অনুকূল। অগ্নির প্রতি সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মীমাংসকেরা কহেন "যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়, তখন তৃতীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত"। তুল্য বল বিরোধে বিকল্পঃ—গৌতম-ন্যায়। কুল্লুক ভট্টেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক সূত্রকারেরা কিরূপ মিমাংসা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করুন। সূত্রকারেরা কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখা আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধা হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহাকে অগ্নি সমীপে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তিনি স্বয়ং চিতায় উপস্থিতা হয়েন। যে তথায় যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় যাইলে শুদ্ধা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধা হওয়া বা না হওয়া তাহার ইচ্ছা। এস্থলে শ্রুতি (বেদ) কহেন—বিধবাকে নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইতে দাও, বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা উচিত নহে। তর্ক এই, যদি বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য (নিষেধ) করা উচিত কি না? কখনই নহে। বিধবা যখন চিতায় শয়ন করে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছ কি না?" (দক্ষিণ দেশের সহমরণ বিধি নামক পুস্তক দেখুন)। যদি সে কহে "স্বেচ্ছায় সম্মতা আছি", তাহা হইলে সহমরণ ক্রিয়া অবশ্য হইতে পারিবে। যদি সম্মতা না হয়, চিতা হইতে বিধবা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম "চিতাভ্রষ্টা"। প্রাজাপত্য নামধেয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিধবার এই পাপ নষ্ট হইতে পারে। তদ্যথা—"চিতাভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাৎ বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধস্তু তস্মাৎ দ্বিপাপ কর্ম্মণঃ।" (সহমরণ বিধি)। ৮ম ঋকের সায়ণকৃত ভাষ্য পাঠ করুন। "যস্মাদ্ অনুসরণ নিশ্চয়ম্ আকর্ষীশ তস্মাদ্ আগচ্ছ"। ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করি, হিন্দু স্ত্রী বিধবা হইলে, সহমরণের পরামর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেয় না, বরং যাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক গার্হস্থ্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন তাহারই পরামর্শ দেওয়া হয়; কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা দেয় না। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঋগ্বেদের ৮ম ঋক, সহমরণের কেবল অনুকূল বলিয়া গণ্য নহে, বরং মন্ত্রস্বরূপ।

ভারতবর্ষীয় যাবতীয় হিন্দুর বিশ্বাস সহমরণ বেদশাস্ত্রসম্মত। এই বিশ্বাস অতীব প্রাচীন; এই বিশ্বাস সার্ব্বজনিক। বেদের প্রাদুর্ভাব কালেও সতীদাহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতে পড়া যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে সকল মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রীসমূহ স্বামীর চিতায় দগ্ধা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সময়ে রাজা ও সাধুগণ বৈদিক শাস্ত্রে অতীব পণ্ডিত ছিলেন; ইহা বেদ শাস্ত্রের বিরোধী হইলে ঐ সময়ে সহমরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পাইত না।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রপারটীয়স্ (Propertius) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বয়শেণ্ নামক ইংরাজ পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, আমি সেই ইংরাজি পুস্তক হইতে আপনাকে একটু অনুবাদ শুনাইতেছি।*

"Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There, whensoever the happy husband dies,
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air;
For partnership in death, ambitions strive,
And dread the shameful fortune to survive!
Adorned with flowers the lovely victims stand,
With smiles ascend pile, and light the brand!
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death."

আরও অনেক বৎসর অগ্রে সিসিরো নামক ভুবনপ্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার Tusculum গ্রন্থে সহমরণ প্রথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হেরোডোটশ নামে আর একজন বিশ্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, থ্রেশ্ দেশের এক জাতীয়া রমণীগণ স্বামীর কবরে আত্মবলি দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। আমার বোধ হয় হেরোডোটশ বর্ণিত এই জাতীয় লোকগণ এবং গেটে সাহেব বর্ণিত আর এক জাতীয় ব্যক্তিগণ আমাদের পূর্ব্বকালীয় কোন নিম্ন শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বংশধর।

যদি আপনি আমার এই প্রবন্ধ রয়েল আসিয়াটিক্ সোসাইটির সভায় পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অবাধে তাহা করিতে পারেন।"

কলিকাতা
৩০শে জুন
১৮৫৮

আপনার প্রিয় বান্ধব
শ্রীরাধাকান্ত দেব।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উপরিউক্ত পত্রখানি (৫২ বৎসরের) অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক পুরাতন। বিলাতের সুবুদ্ধিমান লোকেরা ইহা যত্নে রক্ষা করিয়াছেন; পাছে মূল পত্রখানি নষ্ট হয়, এই জন্ম রয়েল আসিয়াটিক জর্ণেলে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহার নকল নাই! না থাকিবারই কথা। বঙ্কিম বাবু তাঁহার পুরাতন "বঙ্গদর্শন" পত্রে লিখিয়া-

* "British Poets," Chalmer's edition, Vol. XIV. P. 563.

ছিলেন "সাহেবেরা শিকার করিতে গেলেও তাহার ইতিহাস লিখিত হয়", আর আমাদের দেশে মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় না। না হইবারই কথা, কারণ আমরা কেবল হুনর হুজুকে মাতি, দেশের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। উপরিউক্ত পত্রখানা যা'র তা'র লিখিত নয়, ইনি যে সে ব্যক্তি ছিলেন না; বিশ্বপ্রসিদ্ধ "শব্দকল্পদ্রুম" নামক অভিধানের সেই সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, নাইট, কে, সি, এস, আই, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজের নেতা ও প্রধান পুরুষ ছিলেন। এই সুপণ্ডিত ও ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীর শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। ধনে, মানে, রূপে, গুণে, চরিত্রে, বিদ্যায় ইনি অদ্বিতীয় মানব ছিলেন। এদেশের দুই শতাধিক দরিদ্র সাহিত্যজীবি লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইঁহার বৃত্তি ভোগ করিতেন এবং ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। ইনি বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য তুল্য পুরুষ ছিলেন। ইঁহার পত্রে লিখিত বিষয়ের সহিত অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ পুরাতন কাগজের (রেকর্ডের) রক্ষা করা, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় ইহা রক্ষিত হওয়া, নিতান্ত আবশ্যক। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি অতি যত্নে ইহা সংগ্রহ পূর্ব্বক ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম; ভরসা করি কোন সময়ে ইহা আমাদের প্রয়োজনে আসিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কাশ্মীর।

পথে—মরি পাহাড়।

কাশ্মীর যে খুব সুন্দর দেশ তাহা আমাদের দেশীয় কবি অপেক্ষা বৈদেশিক কবিগণ (প্রাচীন মুসলমান কবি) বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রত্যেক পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি এবিষয়ে বহু কবির রচিত শ্লোক সমূহ এখনও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন। আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহার সহিত কলিকাতা হইতে কাশ্মীরে যাই। মন্ত্রী মহাশয় একজন পারস্য ভাষাভিজ্ঞ (Persian scholer) তাঁহার নিকট এবং তাঁহার নিকটে সমাগত পারস্য ভাষাভিজ্ঞ বহু ব্যক্তির মুখে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য বর্ণনার বহু গাথা শ্রবণ করিয়াছি। আশা আছে সেই গাথাগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব। বৈদেশিক কবিরাই কাশ্মীরকে ভূস্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারাই বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে চিরবসন্ত বিরাজিত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা এখনও একথার প্রতিধ্বনি করেন। এই প্রতিধ্বনি শুনিয়াই আমার বন্ধুগণ আমার নিকট হইতে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের বিষয় জানিতে অভিলাষী। আমি যদি কবি হইতাম, তবে হয়ত তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতাম।

আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখে প্রথম কাশ্মীরে যাই এবং ৪ঠা আশ্বিন কাশ্মীর ত্যাগ করি। এই চারি মাস থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি ও অন্যান্য কয় মাসের বিষয় যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। ইহাতে কাশ্মীরের নিন্দাই হউক কি প্রশংসাই হউক,

তজ্জন্ত আমার চক্ষু ও কর্ণ দায়ী, কাশ্মীর দায়ী নহে।

কাশ্মীর একটী বড় উপত্যকা। উপত্যকার সহজ অর্থ পর্ব্বত-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সমতল ভূমি। সুতরাং কাশ্মীরের বর্ণনার জন্ত কাশ্মীরকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম পার্ব্বত্য কাশ্মীর, ২য় কাশ্মীর-উপত্যকা। কাশ্মীরের প্রথম ও প্রধান সৌন্দর্য্য এই উপত্যকা। যেরূপ পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া কাশ্মীরে যাইতে হয়, তাহাতে প্রথমে মনে হয় না যে, এই পর্ব্বতমালার শেষ আছে। তৎপর সেই দুরারোহ পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া যখন সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা সমতল কাশ্মীর ভূমিকে দর্শক প্রথম দর্শন করে, তখন তাহার মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হয়।

আমরা রাবলপিণ্ডীর পথে গিয়াছিলাম। রাবলপিণ্ডী হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর প্রায় দুই শত মাইল। এতন্মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন ৬৪ মাইল। এই চৌষট্টি মাইল পথই দুর্লঙ্ঘ্য। এই পথের মধ্যে মরি পর্ব্বত অবস্থিত। মরি পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফিট। আমাদের বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ৭১০০ ফিট উচ্চ। যখন প্রথম আমাদের গাড়ী পার্ব্বত্য পথে উপস্থিত হইল। তখন এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। সুউচ্চ পর্ব্বত আমাদিগকে যেন কোলে করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম যখন সেই পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন পর্ব্বতের কোল হইতে তাহার অগ্রভাগ দেখিতে পাইলাম না। একটা বড় প্রাচীরের মত বোধ হইল। কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী পর্ব্বত দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আমরা পর্ব্বতারোহন করিতেছি। এভাব অধিকক্ষণ রহিল না। বোধ হয় দেড় ঘণ্টা পরেই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। এবার আমরা একটী ছোট পাহাড়ের প্রায় মধ্যদেশে উপস্থিত হইয়াছি। পর্ব্বতের দিকে কি উচু দিকে চাহিলে বিশেষ কিছু বোধ হয় না। কিন্তু যখন নীচের দিকে চাহিলাম, তখন বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। দেখিলাম আমরা প্রায় দুই শত হস্ত গভীর একটা কূপের তীর দিয়া যাইতেছি। ঘোড়া যদি একবার ওদিকে ঝুকিয়া পড়ে তবে আমাদের যে কি দশা ঘটিবে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এদিকে বড় বড় পাথর। যদি পাথরের গায়ে গাড়ী লাগে, তবে গাড়ী চুরমার হইয়া যাইবে। মনে মনে শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া ঘোড়ার হাতে প্রাণটী সমর্পণ করিয়া চলিলাম। এখানে একটী চিত্র দিয়া বুঝাইলে পাঠক ভীষণতার কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।
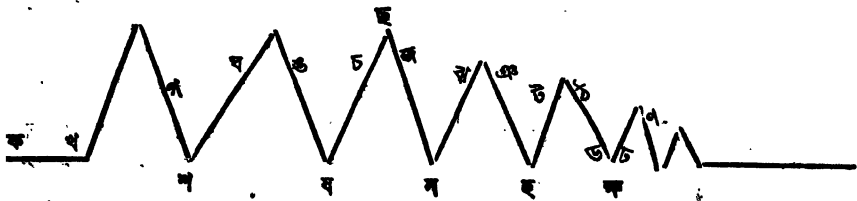
ক খ পার্ব্বত্য পথ হইলেও সমতল—খএর নিকটে পর্ব্বতকে প্রাচীরবৎ বোধ হইয়াছিল। গ স্থানে আসিয়া দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। তখন শ গর্ত্ত দেখিয়া ভয় হইল। এইরূপ পথ বাহিয়া ষ গর্ত্তও দেখিলাম। ছ স্থানটিকে মরি পর্ব্বতের মস্তক মনে করুন। এখানে

আসিলে আর সমুদায় পর্ব্বতকে নীচু দেখায়। এখানে নীচের দিকে (স) চাহিলে তখন যে ভীষণতার উপলব্ধি হয় তাহা বলিবার নহে।

ক্রমে চড়াইয়ের রাস্তা বহিয়া আসিয়া মরি পর্ব্বতের মস্তকে আরোহণ করিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। চারিদিকে "বনরাজী নীলা" পর্ব্বতশ্রেণী। যাঁহারা সমুদ্রে যাইয়া কখনও ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারা যদি মাথা তুলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে। উপরে শুভ্র আকাশ—নীচে ঢেউ খেলান পর্ব্বতশ্রেণী। তবে সমুদ্রের বেগ আছে, ইহার বেগ নাই—কেবল অনন্ত আকাশ। এস্থান হইতে মরি সহরের দৃশ্য বড় মনোরম। যাঁহারা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টে দাঁড়াইয়া কলিকাতার দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই দৃশ্যের কল্পনা করিতে পারিবেন। দূর হইতে সহরের সমুদায় বাড়ীগুলি দেখা যাইতেছে। টীনের চালাগুলি রৌদ্রে ঝকমক্ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দেবদারুশ্রেণী। ঘরগুলি নূতন রকমের। বিলাতী ছবিতে যেমন ঘর ও গাছের ছবি দেখিতে পাওয়া যায় এ তেমনই। আমরা কখনও চিমনীওয়ালা দোচালা ঘর দেখি নাই। সুতরাং আমাদের নিকট বেশ নূতন বোধ হইল।

দেবদারু ও সরলবন।

পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া যখন আমরা প্রথমে দেবদারু ও সরলবন দেখিলাম তখন চিনিতে পারি নাই। সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী দেখিয়া কি বৃক্ষ জানিতে কুতূহল হইল। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইহা স্তার বন। তখন দেবদারু ও সরলের নাম শুনিয়া কালিদাসের একটী শ্লোক মনে পড়িল। কুমারসম্ভবের হিমালয় বর্ণনায়—

কপোল কণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি॥*

কালিদাস যে সুগন্ধের কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই সুগন্ধ পাই নাই। তবে এ অঞ্চলে বন্য হস্তী নাই অথবা এমন অন্য কোনও জন্তু নাই যাহার গাত্র কণ্ডূয়নে বৃক্ষ ক্ষতযুক্ত হইতে পারে। তবে পাতা ছিঁড়িয়া শুঁকিয়া দেখিয়াছি তাহাতে বেশ সুগন্ধ আছে। এবং যেখানে কোনও বৃক্ষ বা শাখা নূতন ছিন্ন হইয়াছে, সেখানে একটী সুগন্ধ অনুভব করিয়াছি।

দেবদারু—খুব সরল সুদীর্ঘ বৃক্ষ। শাখাগুলি কাণ্ডের গাত্র হইতে বাহির হইয়া ক্রমে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। পাতা ঝাউ পাতার মত তবে ছোট ছোট। বোধ হয় ২।৩ ইঞ্চি হইবে। এক একটী গুঁড়ি এত বড় মোটা দেখিয়াছি যে, বোধ হইল চারিজনে তাহাকে অতি কষ্টে বেড়িতে পারে। লম্বাও খুব। ইহার ত্বক্ ছেদন করিলে যে ক্ষীর বাহির হয় তাহা নিকৃষ্ট গন্ধবিরজা। ইহার কাষ্ঠ হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয় তাহা নিকৃষ্ট ধুনা। ইহার কাষ্ঠে তৈলাংশ অল্প। কাঠ ঈষৎ পীতাভ। ভাল শ্বেত চন্দনের মত।

সরল—খুব সরল ও সুদীর্ঘ বৃক্ষ। শাখাগুলি কাণ্ডের গাত্র হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। পাতা ঝাউ পাতার মত। তবে দেবদারুর মত ছোট নহে। বোধ হয় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হইবে। ইহাও দেবদারুর মত লম্বা ও মোটা হয়। তবে ইহার পত্রে সুগন্ধ অধিক এবং ইহার ত্বক্ ছেদন করিলে যে

* অর্থাৎ যেখানে কপোলকণ্ডু নিবৃত্তির জন্য হস্তিগণ কর্ত্তৃক ঘর্ষিত সরল বৃক্ষ সমূহের নির্য্যাসজাত গন্ধ প্রস্তর সমূহকেও সুগন্ধি করিয়া থাকে।

ক্ষীর বাহির হয় তাহা উৎকৃষ্ট গন্ধবিরজা। এই বৃক্ষের তৈল হইতে উৎকৃষ্ট তার্পিণ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের ধুনা মধ্যম। ইহার কাষ্ঠে তৈলাংশ অত্যন্ত অধিক। পাহাড়ীয়া ইহার কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া মসালের কাজ সারিয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠে তৈলাংশ অধিক বলিয়া ইহার বর্ণও জমাট তৈলের মত।

সরল ও দেবদারুর বন দেখিলে মনে হয় কেহ যেন সাজাইয়া বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। বাদার সুন্দরের মত ইহার উৎপত্তিতেও কৃত্রিমত্ব কিছু নাই এবং ইহার শ্রেণীও স্বাভাবিক। শুনিলাম সরল ও দেবদারুর হাওয়া বড় স্বাস্থ্যকর। বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশে ইহার বাতাস ঔষধের মত কার্য্য করে। অধুনা ডাক্তারেরা যে জন্য ইউক্লিপটাস্সের গন্ধ লইতে বলেন, সরল ও দেবদারু পাতা কচলাইয়া শুঁকিলে সেই কার্য্য হয়। সরল পাতার গন্ধ লইয়া আমার সর্দ্দি সারিয়া গিয়াছিল।

ব্রহ্মী।

সরল ও দেবদারু যেমন পূত বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মীও তদ্রূপ। ইহার গাছও খুব বড় হয়। পাতা ছোট ছোট। কতকটা দেবদারুর মত। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে যজ্ঞের স্রুক্ ও স্রুব্ প্রস্তুত হয়। বৃক্ষের সারাংশ তাম্রবর্ণ। ইহার স্রুক্ ও স্রুব্ দেখিতে বেশ সুন্দর। এতদ্ব্যতীত ইহার কাষ্ঠে নানারূপ সুন্দর সুন্দর আসনও প্রস্তুত হয়।

আখ্‌রোট।

আমরা ঘোড়াগলি ছাড়িয়া গেলে এক নূতন জাতীয় বৃক্ষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই বৃক্ষগুলি খুব বড়। ইহার ত্বক্ খুব কৃষ্ণবর্ণ। পাতা ছাতিমের পাতার* মত। এই বৃক্ষের গোড়ায় গোছের ডুমুরের মত অসংখ্য গাঁট। খুব ছোট ছোট ডুমুরের মত সবুজ বর্ণ আখ্‌রোট ফলগুলি গাছে শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম কাঁচা অবস্থায় ইহা অখাদ্য। তবে যখন বীজের ভিতর দুধের মত হয়, তখন সেই দুধ কেহ কেহ খায়। এই দুধ বড় দুর্জ্জর ও রুক্ষ। কাশ্মীরে এই বৃক্ষের কাষ্ঠে নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার কাঠ অর্থাৎ সারাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন। ইহার আঁস বেশ নরম এবং পালিশ বেশ হয়। আখ্‌রোটের যে গাঁটগুলির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুনিলাম সেই গাঁটগুলি কোন কোন কলের অংশ বিশেষ সংযোগ করিতে প্রয়োজন হয়। এবং এই জন্য কে এক সাহেব আসিয়া অনেক আখ্‌রোট বৃক্ষ ক্রয় করিয়া কেবল সেই গাঁটগুলি লইয়া যায়। সে সাহেব বলিত যে গাছটা বিশ টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার গুটি ২০০৲ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে।

ষ্ট্রবেরী—সতাঅরী।

আমরা যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করি সেইখানে আমাদের ভৃত্য একটা লাল ফল লইয়া আসে। সে আসিয়া প্রথমে সেই ফলের নাম করিল সতাঅরী। নাম শুনিয়া কিছুই বুঝিলাম না। দেওয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা জঙ্গলী ষ্ট্রবেরী (Strawberry)। ষ্ট্রবেরীর নাম পুস্তকে পড়িয়াছি। জ্বরাতীসারে জিহ্বা ষ্ট্রবেরীর বর্ণ হয় এরূপ ডাক্তারী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। পূর্ব্বে কখনও ষ্ট্রবেরী দেখি নাই। এই ষ্ট্রবেরী দেখিয়া বুঝিলাম উপমাটী সুন্দর হইয়াছে। যেরূপ বর্ণের সাদৃশ্য আছে সেই জিহ্বার বহিরাবরণের মতই ফলটীর বহিরাবরণ কণ্টকিত।

* সপ্তপর্ণ—ছাইতান।

ষ্ট্রবেরী সাহেবদের অতি প্রিয় ফল। এই জঙ্গলী ষ্ট্রবেরী পাহাড়ীরা খায়। তবে তাহারা কিরূপ উপাদেয় ফল মনে করে তাহা জানি না। যাহা হউক ষ্ট্রবেরীর খুব প্রশংসা শুনিলাম। অবশ্য এই জঙ্গলীর নহে। এক্ষণে বিলাত হইতে যে ষ্ট্রবেরীর বীজ আনয়ন করিয়া কাশ্মীরে ফল উৎপাদন করা হইতেছে তাহার। অন্ততঃ খানিকটা স্বাদ ত পাইব মনে করিয়া একটা ফলে কামড় দিলাম। একটা টক্ মিষ্ট স্বাদ পাইলাম বটে কিন্তু ফলটা যেন ঘাসের মত খস্খস করিল। ফেলিয়া দিলাম। Straw অর্থ ঘাস, Berry অর্থ জাম। উভয়ে মিলিয়া হইতেছে ঘেসো জাম। পার্ব্বত্য অঞ্চলে বরফ গলিয়া গেলে প্রথম এই ফলই হয়। ইহার গাছ ক্ষুপ বিশেষ। পাতা বড় বড়। খুব বড় একটা গোলাপের পাতার মত পাতা। গাছ মুঠুম হাতের বেশী উঁচু দেখি নাই। এই ফলের বিশেষ বিবরণ কাশ্মীরের ফলবর্গে দিব।

চাষ ও আবাদ।

পাহাড়ের শস্য-ক্ষেত্র শীঘ্রই বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। থরে থরে সাজান জমিগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন লক্ষ্মীর আগমনের জন্য গৃহস্থেরা সিঁড়ী কাটিয়া রাখিয়াছে। সেই ক্ষেত্র সমূহে নবজাত বিভিন্নবর্ণের শস্য সমূহ বাতাসে হেলিতে দুলিতে ছিল। কোনও ক্ষেত্র শ্যামল, কোন ক্ষেত্র পীত, কোন ক্ষেত্র বেগুণে বর্ণের শস্যে সুশোভিত। এরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন সুন্দর শস্য-ক্ষেত্র দেখিব ইহা ভাবিই নাই। এই সমুদায় শস্য-ক্ষেত্র দেখিলে কৃষকের কঠোরতা ভাবিয়া দুঃখ হয়। ইহার উপর বন্য পশুর অত্যাচার আছে। শম্বু সদৃশ পর্ব্ব[illegible] সিঁড়ির মত করিয়া কাটা হয়। তা[illegible] প্রস্রবণের জল সেচন করা হয়। যেখানে প্রস্রবণ নাই সেখানে ভরসা ইন্দ্র দেবের। আমাদের বাঙ্গালী কৃষকদের তুলনায় ইহাদের শ্রম অনেক বেশী। এদেশে বৎসরে ২টী ফসল পায়। ক্ষেত্রের অনুপাতে শস্য ভূরি পরিমাণে হয়। জমির উর্ব্বরা শক্তি খুব। এখানকার উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যজাত সুস্বাদু। যেরূপ চড়াই উতরাৎ করিয়া ইহারা শস্য-ক্ষেত্রে যাতায়াত করে তাহা বাঙ্গালী কৃষকের দেখিবার বিষয়।

প্রস্রবন।

পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে বহু প্রস্রবন ও জলপ্রপাত দেখিলাম। প্রস্রবন সমূহের জল বেশ শীতল, সুস্বাদু ও পরিষ্কার। স্থানে স্থানে দেখিলাম গৈরিক স্রাব হইতেছে। কোথাও জলের বর্ণ গেরিমাটীর মত। কোথাও ঈষৎ পীতাভ ঘোলা। কোথাও কৃষ্ণ বর্ণ। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে অনবরত জল চুয়াইতেছে। সেখানে পাতকূয়ার ধারের মত নানাবনৌষধি জন্মিয়াছে। এই সকল স্থানে শৈবাল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন জল-প্রপাতের ধারে বিবিধ বর্ণের ফুল ফুটিয়া প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেবদারু বন এবং প্রস্রবনের নির্ম্মল জল দেখিয়া ও শীতল ও ধীর পার্ব্বত্য বাতাস স্পর্শ করিয়া কুমার সম্ভবের একটী শ্লোক মনে পড়িল—

ভাগীরথী নির্ঝর শীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্ট মৃগৈঃ কিরাতৈঃ
আসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥*

---

* যে পর্ব্বতরাজের সমীরণ ভাগীরথীর নির্ঝরের জলকণা বহন করতঃ দেবদারুকে কম্পিত করিয়া ময়ূরপুচ্ছে লাগিয়া মন্দ মন্দ ভাবে প্রবাহিত হয়, মৃগয়াশ্রান্ত কিরাতগণ সেই শীতল, সুগন্ধ ও মৃদুমন্দ সমীরণ উপভোগ করিয়া থাকে।

সেই ধীর, সুগন্ধ ও শীতল বায়ু আছে বটে কিন্তু আমাদের বিশ্রাম নাই সুতরাং তেমনভাবে ভোগ করিতে পারিলাম না।

পথে পুষ্প-শোভা।

কালিদাস বলিয়াছেন—

"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা
বনলতাভিঃ।"*
(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্)

পর্ব্বতের পুষ্প-শোভা দেখিবার বিষয়। আমরা যখন সেই পার্ব্বত্য পথ অতিবাহিত করিতেছিলাম তখন নানাজাতীয় পুষ্প আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কোন কোন স্থলে সেই সকল ফুলের সুবাস আমাদের দৃষ্টিকে নূতন একটী সৌন্দর্য্য দেখাইতে দৃশ্যান্তরে আকর্ষণ করিত। বনগোলাপের শ্বেত পুষ্পগুচ্ছ বাঙ্গালীর ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিধবার মত পবিত্র ও মনোহর। দূর হইতে গন্ধ লও। সুগন্ধং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। তোমার মন প্রফুল্ল হইবে, শরীর নীরোগ থাকিবে। যদি তুলিতে যাও কণ্টকে বিদ্ধ হইবে। ও পাপ মনেও স্থান দিও না। এ কণ্টক বিষাক্ত। এ বিষে মরে না। কিন্তু চিরজীবন জর্জ্জরিত থাকিতে হয়। যদি ফুল তুলিতেই হয়, তবে ঐ ডালিমের ফুল তোল। তোমার রূপজ মোহ ঐরূপ দাড়িম্ব পুষ্পের উপযুক্ত। খুব লাল টুক্টুকে ফুল। পাপড়ীগুলি বেশ কোমল, কিন্তু গন্ধ নাই। নাই বা থাকিল গন্ধ? পেটের পীড়ায় দাড়িম্ব পুষ্প কাজে লাগিবে। তোমার হাতে আসিয়া যখন এ ফুল চলিয়া পড়িবে তখন যত্ন করিয়া শুকাইয়া রাখিও। চিকিৎসক যখন দাড়িম্ব পুষ্পের ব্যবস্থা দিবেন, তখন খুঁজিতে হইবে না। এ জিনিস সব সময় টাটকা পাওয়া যায় না।

পার্ব্বত্য পথে বনগোলাপ ও ডালিম বিস্তর। এক একটা ডালিম গাছ ফুলে লাল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু শুনিলাম এখানকার ডালিম, ফুলেই শুকাইয়া যায়। ফল হয় না। মরির পথে শ্বেত ও রক্ত করবীরও প্রচুর দেখিতে পাইলাম। গাছগুলি ফুলের ভারে মাটিতে হেলিয়া পরিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভুইচাঁপা জাতীয় ফুল অনেক দেখিলাম। এবং কতকগুলি ফুল বিলাতী সিজন ফ্লাওয়ারের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। একটা লতায় লম্বা লম্বা কতকগুলি ফুল দেখিয়াছিলাম। তাহার বেশ সদগন্ধ। পার্ব্বত্য পুষ্প-শোভা দেখিবার বিষয়। শুনিবার বিষয় নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

* সৌন্দর্য্য শোভা ও সুগন্ধে উদ্যানলতা বনলতার নিকট পরাভূত হইয়াছে।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।)

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে দুগ্ধাভাবের কারণ ও তাহার বিষম পরিণাম।

যে ভারতবর্ষ এক সময়ে লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল এবং যে দেশে দুগ্ধ ও তজ্জাত নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সহজলভ্য ও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেখানে অধুনা দুগ্ধাদি এত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইল কেন? অনুধাবন করিয়া দেখিলে নানা কারণে গোজাতির লোপাপত্তি ও অবনতিই এই শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে গবাদির কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণ হইতে সবিশেষ উপলব্ধি হইবে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়া দেশে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ১১টী গো-মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধদাত্রী প্রাণী বর্ত্তমান ছিল এবং সেই বৎসরে ভারতবর্ষে—এই আসমুদ্র হিমাচল মহাদেশে ৯ কোটী ৭৫ লক্ষ ৬৫টী মাত্র উক্তবিধ পশ্বাদি বিদ্যমান ছিল, অথচ অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের আয়তন তুলনা করিলে, এখানে ২৬২ কোটি ৮০ লক্ষ গবাদি বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এখন একবার ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক; সে সকল স্থানে দেখিতে পাইবেন, কিছুকাল পূর্ব্বে ২,২৫০,০০০টী গাভী, বৎস ও বকন প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল এবং তখন বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১০০০,০০০,০০০ গ্যালন (gallon)। এক গ্যালন ৮০ তোলার সেরের প্রায় তিন সেরের তুল্য) এই অপরিমিত দুগ্ধ তত্রত্য বালক বালিকা এবং অন্যান্য অধিবাসীবর্গের ব্যবহারে এবং নবনীত ও পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল।

মেঃ মর্টনের গণনানুসারে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে (United Kingdom) ৩,৬৮২,৩১৭টী দুগ্ধদাত্রী গাভী এবং বৎসাদি বর্ত্তমান ছিল ও তখন বার্ষিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০,২১৯,৪৮০ গ্যালন ছিল; এখন ভাবিয়া দেখুন ১৯০৪ খৃঃ অব্দে সেখানে গবাদি ও দুগ্ধের পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে; যদি বলেন যে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ অনাবশ্যক, কেননা ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী চির প্রচলিত কলহ পরিত্যাগ করতঃ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন, অতএব সেখানে অবনতি কল্পনাতীত বা অসম্ভব।

এখন একবার দেখা যাউক আমেরিকার কি অবস্থা। সেখানেও দেখিতে পাইবে, বিগত ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে কেবল মাত্র United State এ (ইউনাইটেড ষ্টেট) ১৫,০০০,০০০টী গো-বৎস প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। সেখানে বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০,২১৯,৪৮ গ্যালন ছিল। প্রত্যেক গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ ৪০০ গ্যালন ধরিয়া এই হিসাব করা গেল। এখন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে গাভী এবং দুগ্ধের পরিমাণ কত হয় ইহা বর্ণনীয় নহে, অনুমেয় মাত্র। আমরা

গো-রক্ষক জাতি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান্ গোভক্ষক জাতি, তথাপি তাঁহারা গোরক্ষা ও তাহাদের উন্নতি কল্পে যাদৃশ মনোযোগী এবং যত্নশীল, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও নহি; ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। আমাদের মনে হয় ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় দৈনিক গোদুগ্ধে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় পূর্ণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যদেব! তুমি না "গো ব্রাহ্মণ হিতায়" ছিলে, এখন কি ভারতের পক্ষে "তত্ত্বধায়" হইয়াছ?

আমাদের দেশে গোজাতির ক্রমে বিলুপ্তির সহিত দুগ্ধের অভাবজনিত কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কীদৃশ ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যাউক। বিগত ১৯০১ সনের সেন্‌সসে (আদম সুমারীতে) জানা যায় যে, কলিকাতা মিউনিসিপেলিটীর অধীনে প্রতি সহস্রে গড়ে ৩৩০ জন নিরীহ শিশু অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং গত ১০ বৎসরে প্রতি সহস্রে গড়ে ৪০০ জন অপোগণ্ড বালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। চিকিৎসকগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে Infante Lever (শৈশব যকৃতের পীড়া) এই অকাল মৃত্যুর কারণ এবং অপরিস্কৃত জলমিশ্রিত কৃত্রিম গোদুগ্ধ পানই এতাদৃশ পীড়ার মূল। যদি একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই এই অবস্থা হইয়া থাকে, তবে ভারতের অন্যান্য নগরীতে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বড় বড় সহরেই এতাদৃশ মৃত্যু সংখ্যা অধিক, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আজকাল পল্লীগ্রাম সমূহেও যে প্রকার দুগ্ধাভাব ঘটিতেছে তাহাতে অচিরেই সে সকল স্থানেও নগরাদির ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবে, অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেশহিতৈষী ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় গোজাতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ তাহাদের রক্ষা ও উন্নতির উপায় বিধান না করিলে আর রক্ষা নাই; তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত গোবংশ ভারতবক্ষ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইবে এবং তৎসহ আমরাও বিলয় দশা প্রাপ্ত হইব। এ বিষয় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা কতকটা মঙ্গলের চিহ্ন বটে। সত্য বটে, আর্য্য মহর্ষিগণ গোদুগ্ধ ও অন্যান্য গব্য পদার্থের মহৎ উপকারিতা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিয়াই এই পশুর (গোজাতির) রক্ষা ও উন্নতি কামনায় নানা বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা হেলায় সেগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ গোবংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং আমরাও ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছি। ইয়ুরোপীয়গণ পক্ষান্তরে ইহার উন্নতি পক্ষে অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের অসদ্ দৃষ্টান্তের অযথা অনুকরণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের একাগ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুসরণ করিতেছি না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

গো-দুগ্ধ ও তজ্জাত পদার্থ নিচয়ের অপরিসীম উপাদেয়তা এবং উপকারিতা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক ব্যাপারে ও শ্রাদ্ধাদিতে গব্য নানা প্রকার পদার্থের ভূরি ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গোবৎসের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণকে গো দোহন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন; ব্রাহ্মণের পক্ষে গো বিক্রয়েও নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা;—

"গবাং বিক্রয়কারীচ গবি রোমানি যানি চ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রানি গবাং গোষ্ঠে কৃমির্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ—গোবিক্রয়কারী (ব্রাহ্মণ) গাভীর গাত্রে যত লোম আছে, তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত গো-গোষ্ঠে কৃমি হইয়া বাস করে।

"গাং দুহন্তি চ যে বিপ্রাঃ পাপিষ্ঠাঃ
ক্ষীরলিপ্সয়া।
দধি বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং মদ্য তুল্যং
ঘৃতং ভবেৎ॥
সদ্যঃ পতন্তি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ
ত্র্যহেন শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর
বিক্রয়াৎ॥"

অর্থাৎ—যে সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দুগ্ধ লিপ্সায় গো দোহন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই দুগ্ধজাত দধি বিষ্ঠাতুল্য, দুগ্ধ মূত্র সম এবং ঘৃত মদ্য তুল্য হয়। ব্রাহ্মণ লৌহ বিক্রয়ে লাক্ষা ও লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হন এবং দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা তিন দিবসে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে ক্রমশঃ ব্যবসায় লাভবান হওয়ার আশায় বৎসের প্রতি নির্দ্দয়তা হইবে এবং গো বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিলে তাহার প্রতিও নির্দ্দয়তা হইবে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ গো ও দুগ্ধ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এখন গো এবং দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীতও ব্রাহ্মণসন্তান ততোধিক গুরুতর নিষিদ্ধ কার্য্যও অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছেন, ইহা কতদুর সঙ্গত একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

প্রসঙ্গাধীন ইহাও বক্তব্য এই ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং বলদই কৃষি কার্য্যের প্রধান সহায়, অতএব গোজাতির অভাবে কৃষকের কত অসুবিধা ও অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। কৃষকের অনিষ্টে ভারতবর্ষের অমঙ্গল। ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯.৯২ জন কৃষিজীবী একথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গবাদির বিলোপের প্রধান প্রধান কয়েকটী কারণ নিম্নে কথিত হইতেছে যথা;—

(১) গোজাতির প্রতি অযত্ন ও তাহার অপালন।

(২) গোচারণ ভূমির অভাব।

(৩) গো-মড়ক ও অন্যান্য সাংক্রামিক পীড়াজনিত অকাল মৃত্যু।

(৪) যদৃচ্ছা গোবধ।

(৫) লাভের আশায় অতিরিক্ত গো দোহন এবং তজ্জনিত বৎসের দুর্ব্বলতা এবং অকাল মৃত্যু।

(৬) চর্ম্মকার ও অন্যান্য চর্ম্মব্যবসায়ীগণ দ্বারা বিষ প্রয়োগে গোবধ।

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রতীকার আমাদের আয়ত্বাধীন এবং কতকগুলির নহে; এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কেবল মাত্র গো মড়কে ভারতবর্ষে প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় ৯০০০০০০৲ টাকা ক্ষতি হইতেছে। অন্যান্য কারণে গবাদির মৃত্যু সংখ্যা গণনা করিলে ক্ষতির পরিমাণ কত হয় তাহা অনুমেয়।

দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ করুণা-পরবশ ও যত্নশীল হইয়া গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে অগ্রসর হইলেই দেশে দুগ্ধাদির প্রাচুর্য্য হইবে এবং আমাদেরও বল বীর্য্য উৎসাহ ও আয়ুবৃদ্ধি হওয়ার পথ উন্মুক্ত হইবে, নতুবা আমাদের অধঃপাতের গতি কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

উপসংহার।

দুগ্ধ বিষয়ে প্রায় সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইল; এ বিষয় আরও বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; সেই পন্থা প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অভিপ্রেত। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দুগ্ধজাত নবনীত, দধি, সর এবং তত্তজ্জাত

ঘৃত, তক্র, ছানা প্রভৃতির বিষয় এ গ্রন্থে কিছুই বলা হয় নাই ; এই সমস্ত বিষয় পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করা কৃতবিদ্যগণের কর্ত্তব্য। দুগ্ধাদি ও শর্করা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সংযোগে কত প্রকার উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। এ সম্বন্ধেও গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া উচিত। সুখের বিষয় অধুনা কেহ কেহ এতাদৃশ গ্রন্থাদি প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ভরসা আছে অচিরে এ সমস্ত বিষয় বিশদ ও বিস্তৃত গ্রন্থাদি প্রচারিত হইবে এবং তৎসহ বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি এবং শ্রী বৃদ্ধি হইবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোনও প্রকার ত্রুটী বা ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে তৎ সমস্তই আমার এবং কোনও গুণ থাকিলে তাহা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন এবং সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা ভগবানের কৃপাবিন্দু প্রসাদাৎ—বিশুরেনালম্।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

(সমাপ্ত।)

খাদ্যে ভেজাল।

(Food Adulteration)

মানব সমাজে সভ্যতার আলোক প্রতিভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে ভেজাল দিবার কুপ্রবৃত্তি দুষ্ট ব্যবসায়ীদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন নিজ পরিবারের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিত, যখন নিজে চাষ করিয়া স্বীয় পরিবারের অন্নের সংস্থান করিত, নিজের তাঁতে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া দেহকে শীত তাপ হইতে রক্ষা করিত, দুগ্ধ, দধি, মাখন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসমূহ স্বয়ং গোপালন করিয়া উৎপাদন করিত, তখন খাদ্যে ভেজাল হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আজিও পৃথিবীর অনেক স্থানে এমন জাতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে না এবং যাহারা এখনও স্ব স্ব পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন আড়ম্বরশূন্য বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সভ্যতার বিকাশে মানব যখন সমাজবদ্ধ হইল, তখন একের পরিশ্রমের ফল অপরের পরিশ্রমের ফলের সহিত বিনিময় করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে জাতি বিভাগ, ব্যবসা বিভাগ এবং কার্য্য বিভাগ সমাজে প্রচলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায় খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যাদিতে ভেজাল দিতে আরম্ভ করিল।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হইত ; অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারেরা ঔষধ ও খাদ্যাদিতে ভেজাল দিলে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে তিনটী বচন উদ্ধৃত হইল :—

ভেষজ স্নেহলবণগন্ধধান্যগুড়াদিষু।
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ আপ্যস্তু ষোড়শ॥

ঔষধ, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোড়শ পণ দণ্ড হইবে।

মৃচ্চর্ম্মমণিসূত্রায় কাষ্ঠবল্কলবাসসাং।
অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্টগুণোদমঃ॥

অপকৃষ্ট সুতরাং হীনমূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটিকাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।

অন্যহস্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বাদুষ্টবদ্ যদি।
বিক্রীণীতে দমস্তত্র মূল্যাৎ তু দ্বিগুণো ভবেৎ॥

অন্যের নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, কিম্বা সদোষ দ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

আমাদের দেশে যখন খাদ্য দ্রব্য সুলভ ছিল, তখনও অসাধু ব্যবসায়ীগণ খাদ্যে কতক পরিমাণে ভেজাল দিতে সঙ্কুচিত হইত না। তখন ময়দার কল হয় নাই, তখন গম অপেক্ষা চাউল সস্তা ছিল, উড়িয়ারা যাঁতা দিয়া গম ভাঙ্গিত এবং চাউলের গুঁড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ময়দার সহিত মিশাল দিত। আমাদিগের শিশুকালেও এ কালের মত ঘরের দুধ ব্যতীত বাজারের দুধ কখনও জল ছাড়া পাওয়া যাইত না। তখন ঘি এখনকার মত পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আমদানী হইত এবং কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ তাহার সহিত নানাবিধ তৈল মিশাইয়া বিক্রয় করিত। তখন আমাদিগের মধ্যে ঘিয়ের এত অধিক খরচ ছিল না। ঘিয়ের খরচ যতই বাড়িতেছে, ততই পশ্চিম হইতে টিনে করিয়া ভেজাল ঘি এদেশে আমদানী হইতেছে। এখন ভেজাল ঘি ব্যতীত বিশুদ্ধ ঘি বাজারে পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরিষার তৈল তখন ঘানিতে প্রস্তুত হইত এবং এই জিনিসটী প্রায় খাঁটী মিলিত। এখন জেলে এবং আম্‌স্ হাউসে (Alms House) যে সরিষার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যতীত খাঁটী সরিষার তৈল বাজারে কোথাও পাওয়া যায় না। তেলের কল প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতার মধ্যে ঘানির ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল শ্যামবাজার প্রভৃতি দুই একটী অর্দ্ধ সভ্য পল্লীতে ঘানির ক্যাঁ কোঁ শব্দ এখনও কদাচ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অধুনা ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য সকল প্রকার তৈলপ্রদ বীজ সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়া কলে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। কলুরা হয় এক্ষণে কলের তৈল ক্রয় করিয়া ব্যবসা করিতেছে, নতুবা জাতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যসামগ্রী যে দরে পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহার প্রায় তিন গুণ মূল্যে উহা বিক্রীত হইতেছে। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা অতি প্রবলভাবে চলিতেছে, মানুষের মনের উপর ধর্ম্মের ও সততার আধিপত্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অসাধু ব্যবসায়ীরা নানা কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়া অবাধে যেরূপ দ্রব্য সামগ্রীতে ভেজাল দিতেছে, তাহা এ দেশেও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণের সমবায়ে আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা যেরূপ দিন দিন পরিসর লাভ করিতেছে এবং ব্যবসার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া একেবারে নিবারিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে এই অহিতকর ও

অস্বাস্থ্যকর প্রথা দমন করিবার জন্য রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই ঐকান্তিক চেষ্টা হইতেছে। নূতন নূতন আইন প্রচলন, স্বাস্থ্য বিভাগে অধিক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার স্থানের যথারীতি পরিদর্শন, সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের জ্ঞানের প্রচার প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এই কুপ্রথা দমন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। সেই সকল উপায় আমাদের দেশে কতদূর প্রযোজ্য, তাহাও এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে প্রায় সকল খাদ্য সামগ্রীতেই আজকাল অল্প বিস্তর ভেজাল দেওয়া হইতেছে। অবশ্য চাউল, দাইল, আটা, ময়দা প্রভৃতি অনেক খাদ্যে সকল সময়ে বেশী ভেজাল দেওয়া হয় না কিন্তু দুধ, ঘি, মাখন, সরিষার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের সহিত এত অধিক পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে যে উহার মধ্যে আসল জিনিষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সকল খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল সম্বন্ধে আমরা প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

দুগ্ধ।

দুগ্ধ ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ। দুগ্ধ শিশুদিগের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হইলেও পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসী প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আকারে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইউরোপীয়দিগের যেমন মাংস ভিন্ন আহার সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ভারতবাসীর দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যাদি ব্যতীত ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জীবন ধারণের পক্ষে এরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কাহারও ভিন্ন মত হইতে পারে না।

দুঃখের বিষয় এই যে এদেশে বর্ত্তমান সময়ে সহরে বা পল্লীগ্রামে কোথাও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা সহরে যে সকল গোয়ালা-বস্তি আছে, তথা হইতে প্রায় ৪০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ সহরে সরবরাহ হইয়া থাকে।* এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বাহির হইতে রেলওয়ে দ্বারা প্রায় ১০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। দমদমা, কাশীপুর প্রভৃতি কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতেও প্রায় ২০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ ভারে করিয়া বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনীত হয়। বলা বাহুল্য যে ইহার কোনটী বিশুদ্ধ দুগ্ধ নহে। এই সকল দুগ্ধে যে শুদ্ধ ভেজাল আছে, তাহা নহে; নানা কারণে এই সকল দুগ্ধের সহিত বহুবিধ সংক্রামক রোগের বীজ মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা। কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক উৎকট রোগ যে অনেক সময়ে দুগ্ধ পান করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন; সংক্রামক-রোগ-দুষ্ট পুষ্করিণী বা কূপের জল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধকে এইরূপ বিষাক্ত করা হয়।

আমাদের দেশের গোয়ালাদিগের গৃহে গো-পালনের যেরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুগ্ধ যে নিকৃষ্টগুণ সম্পন্ন হইবে এবং শীঘ্র বিকৃত ও দূষিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের অনেক লোকেই নিরামিষভোজী। তাঁহারা দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, ঘৃত, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্য

* Dr. S. B. Ghose's Food Adulteration in Calcutta.

যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেন। সুতরাং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে দেশে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে যথোচিত চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের ন্যায় গোজাতিও অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিলে অথবা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাইলে, এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর আহারের অভাবে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সেই সঙ্গে দুগ্ধ প্রদানের শক্তিরও হ্রাস হয় এবং উহা নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সহরের মধ্যে এবং সহরতলীতে গোয়ালারা কিরূপ হীনাবস্থায় দুগ্ধবতী গাভীদিগকে পালন ও রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এক গৃহে বহু সংখ্যক গাভী ও বৎসদিগকে দিবারাত্রি আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; মল মূত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা না থাকাতে সেই গৃহের মধ্যে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে উহা বিকৃত হইয়া বায়ুকে অনবরত দূষিত করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গোয়ালার বাটীর অঙ্গনে গোময়ের একটী ছোট খাট হ্রদ বিরাজ করিতে দেখা যায়। উহা এতই গভীর যে কোনও গতিকে মানুষ উহাতে পড়িলে তাহার উদ্ধার হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। এই হ্রদের মধ্যে আবহমান কাল গোময় বিকৃত হইয়া সমস্ত পল্লীর বায়ু দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর করিতেছে। গোয়ালা-বস্তিতে গোরুর মড়ক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গোজাতিও মনুষ্যের ন্যায় নানা প্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক গোরু এইরূপে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গোজাতির সংক্রামক রোগের মধ্যে দুই চারিটী রোগ মনুষ্যকেও আক্রমণ করিয়া থাকে; উহাদিগের বীজ দুগ্ধাদির মধ্য দিয়া গো-কুল হইতে মনুষ্যে সংক্রামিত হয়। পল্লীগ্রামে স্থানের অভাব না থাকিলেও যথোপযুক্ত আহারের এবং গোচারণের মাঠের অভাবে, গো-কুল দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং তাহাদের দুগ্ধ প্রদান করিবার শক্তির যে হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৃদ্ধ পল্লীবাসীর নিকট শুনিয়াছি যে ৫।৬ সের করিয়া দুধ দেয় এইরূপ দেশী গোরু অনেক গৃহস্থের বাটীতে পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণে এরূপ দুগ্ধবতী গাভী গ্রামের মধ্যে কদাচ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যে জাতি গো-কুলকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, যে জাতির ভগবানের পূর্ণ অবতার বাল্যকালে গোচারণ ও গোপালন করিতেন, তাহাদিগের নিকট হইতে গোজাতির প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। বাঙ্গালী হিন্দু ব্যতীত বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য কোনও হিন্দু জাতি গোজাতির উপর এরূপ অত্যাচার করে না বা উহার প্রতিকার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় না। বাঙ্গালী গোয়ালারাই গোরুকে যন্ত্রণা দিয়া "ফুকা" প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। বৎসতরী গুলির আহারের খরচ বাঁচাইবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনাহারে উহাদিগকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণের হ্রাস হইলেই উহাকে কসাইয়ের গৃহে প্রেরণ করে এবং এইরূপে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা উক্ত হিন্দু পরিবারের উদরান্নের সংস্থান হইয়া থাকে। এই অর্থে ক্রীত খড়, ভুষি, খইল প্রভৃতি খাদ্যের দ্বারা দুগ্ধবতী অপর গাভীগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদেরই দুগ্ধ পান করিয়া আমাদিগের

শরীর পুষ্টিলাভ করিতেছে, সুতরাং গৌণ ভাবে আমরাও উক্ত হিন্দু-নিন্দিত ব্যবসার প্রশ্রয় দিতেছি। আমরা সর্ব্বদা হিন্দুয়ানী ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদিগের কুলদেবতা এই গো-কুল রক্ষা করিবার জন্ম আমরা কি সদুপায় অবলম্বন করিয়াছি? সুদূর রাজপুতানা হইতে মারওয়াড়ীগণ এদেশে আসিয়া গো-সেবার আশ্রম স্থাপন করিয়াছে, তাই বাঙ্গালী গোয়ালা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গো-কুল কসাইয়ের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় একটু শান্তি ও আরামের স্থান লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীহিন্দু কসাইকে গোরু বিক্রয় করিতেছে, আর মারওয়াড়ী হিন্দু নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া, এমন কি অনেক সময়ে আইন লঙ্ঘন-জনিত দণ্ডের ভয় না করিয়া, সেই গোরু কসাইয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে! এ অদ্ভুত দৃশ্য বোধ হয় জগতে অন্য কোনও জাতি বা অন্য কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; এ দৃশ্য দেবতাদিগেরও দর্শনীয়! হায়! কবে আমরা মৌখিক ধর্ম্মের ভাণ ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মজীবন ও মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব!

ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে গো মহিষাদি পশুই একমাত্র কৃষকের সম্বল ও সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ অঞ্চলে কৃষি-সহায় এই সকল পশুদিগের যেরূপ দুরবস্থা লক্ষিত হয়, বোধ হয় পৃথিবীর অপর কোনও স্থানে এইরূপ শোচনীয় দৃশ্য নয়নগোচর হয় না। সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতি বৎসর পশু-প্রদর্শনীয় (Cattle Fair) আয়োজন হইয়া থাকে এবং গো, মেষ, মহিষাদি বিভিন্ন প্রদেশজাত নানাবিধ গৃহপালিত পশু তথায় আনীত হয়। পশু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাঁহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন যে বঙ্গদেশের গবাদি পশু দিন দিন স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি সম্বন্ধে হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। তদুপরি বিবিধ সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এদেশের গো-কুল ক্রমশঃ নির্ম্মূল হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বলিষ্ঠ বৃষের অভাবে মহিষের দ্বারা কৃষিকর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে। তত্তৎ স্থানের বৃদ্ধ লোকেরা বলেন যে তাঁহারা পূর্ব্বে মহিষের দ্বারা চাষ দিবার দৃশ্য কখনও দর্শন করেন নাই। অবশ্য বৃষের পরিবর্ত্তে মহিষের দ্বারা চাষ দিলে কোনও দোষ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে দিন দিন এদেশের বৃষদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ব্বল গাভী হইতে সবল বৃষের উৎপাদনের আশা করা বাতুলের কার্য্য, আবার সবল বৃষের অভাবে গাভীদিগের সন্তান সন্ততিও দিন দিন হীনশক্তি ও খর্ব্বদেহ হইয়া পড়িতেছে। গো-জাতির জাতিগত উন্নতি সাধনের উপায়, তাহাদিগের যথারীতি পালনের নিয়ম, তাহাদিগকে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা এবং রোগ হইলে তাহার যথোচিত প্রতিকারের উপায়, এই সকল বিষয়ের জ্ঞান দেশের লোকের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব শিক্ষার জন্য আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কোন প্রকার সুব্যবস্থা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। স্থানে স্থানে পশুচিকিৎসালয় ও কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গৃহপালিত পশুগণের উন্নতি ও রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে

যত্নবান হইতেছেন। প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে পশুচিকিৎসা ও সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করতঃ গোজাতির অকাল মৃত্যু নিবারণ করিয়া দরিদ্র কৃষক মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। সুখের বিষয় এই যে পশুচিকিৎসাশিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চ বর্ণস্থ লোকের মধ্যে সবিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের দিন সেখানে কখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে অধিকাংশছাত্রই উচ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ সম্ভূত। কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ বিদ্যা শিক্ষা কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত হেয় ও অপমানসূচক বলিয়া গণ্য ছিল।

যখন আমাদিগের দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী না হইলে চলে না, তখন যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ও অনেক ইংরাজ ব্যবসায়ী স্থানে স্থানে ডেয়ারি (Dairy) স্থাপন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও মাখন প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল ডেয়ারি আদর্শ করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, লোভী গোয়ালার নিকট হইতে গোজাতির যথার্থ মর্য্যাদা ও যথারীতি সেবা প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দুগ্ধের ব্যবসা যৌথ কারবার রূপে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরম্ভ করিলে দুগ্ধও ভাল পাওয়া যাইবে এবং অনেকের উপার্জ্জনের নূতন পথও আবিষ্কৃত হইবে। যে সকল গ্রাম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সহজে সহরে আনীত হইবার উপায় আছে, সেই সকল স্থানে অধিক জমি লইয়া গো মহিষাদি পশুর স্বাস্থ্যবর্দ্ধক আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করা, গোচারণের জন্য বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত মাঠ পৃথক করিয়া রাখা, গোজাতির পুষ্টিকর খাদ্যাদি কৃষি দ্বারা উৎপাদন করা, সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবস্থার প্রণয়ন, পশুদিগের পানের জন্য পরিস্কৃত জলের ব্যবস্থা, এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া এক একটী বৃহৎ ডেয়ারি স্থাপন করা উচিত। ডেয়ারিতে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে, সহরে ও অন্যান্য স্থানে তাহার বিক্রয়ের রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং সেই দুগ্ধে পথে বা বিক্রয়স্থানে যাহাতে কেহ কোনও রূপে ভেজাল দিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। দুগ্ধ দোহন করিবার সময় সবিশেষ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন। দোহালকে মলিন দেহে মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া অধৌত হস্তে দুগ্ধ দোহন করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যে পাত্রে দুগ্ধ দোহা হইবে এবং ডেয়ারির মধ্যে যে স্থানে যে সকল পাত্রে উহা রক্ষা করা হইবে, ও যে সকল পাত্রে উহা বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইবে, তাহারা যাহাতে কোনরূপে মলিনতার সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডেয়ারির মধ্যে দুগ্ধ হইতে ছানা, মাখন, ঘৃত, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সূক্ষ্ম লৌহজালবেষ্টিত গৃহের মধ্যে উহাদিগকে স্থাপন করিয়া মাছি, কীট, পতঙ্গাদির সমাগম হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে সরকারী ও বেসরকারী অনেকগুলি ডেয়ারিতে উৎকৃষ্ট মাখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে এবং সকল স্থানেই এই মাখনের যথেষ্ট আদর দেখিতে

পাওয়া যায় এবং উহা বেশী দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত যদি আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত ডেয়ারি হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র যে সাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের সামাজিক উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণ দধি ও ক্ষীরের প্রয়োজন হয়। আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত ডেয়ারি হইতে নিজেদের পরিদর্শনে অতি উৎকৃষ্ট দধি ও ক্ষীর প্রতিদিন প্রস্তুত হইতে পারে। বাড়তি দুগ্ধে ডেলা ক্ষীর বা "ঘন দুগ্ধ" (Condensed milk) প্রস্তুত করিলে উহা নষ্ট হইয়া ব্যবসাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উৎপন্ন পদার্থের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে একবার লোকের বিশ্বাস জন্মিলে খরিদ্দার আপনা হইতেই আসিবে। তখন হয়ত এই সকল ডেয়ারী লোকের প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে না। দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করণ ব্যতিরেকে প্রতি বৎসর সুস্থ ও সবল বৃষ এবং বৎস চাষের জন্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। গোময় ও গোমূত্র যথারীতি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া উহাদিগকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যাইতে পারে এবং উক্ত সার ডেয়ারির চাষের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত এবং বাজারেও বিক্রীত হইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে এবং কেহ কেহ স্বল্প মূলধন লইয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধিক মূলধন ব্যতীত এ ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ ব্যবসা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কারবার রূপেই চালান উচিত।

বিলাত হইতে টিনের কৌটা করিয়া ঘন দুগ্ধ (Condensed milk) এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। টিন না খুলিলে এই দুগ্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এরূপ "ঘন দুগ্ধ" এ দেশে সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে যে কয়েকটী যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা বিলাত হইতে আনাইয়া যে সকল পল্লীগ্রামে সুলভ মূল্যে প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়, তথায় "ঘন দুগ্ধ" প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলে এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশে দুই এক জন লোক "ঘন দুগ্ধ" প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ব্যবসা এখনও চলিতেছে কি না তাহা আমি জানি না। তবে বোম্বাই অঞ্চলে "ঘন দুগ্ধ" প্রস্তুত করিবার যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তথাকার প্রস্তুত দুগ্ধ পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে এবং বাজারে উহার বিক্রয় প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য যে কোনও ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক, তাহা না হইলে ব্যবসায়ে নানারূপে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সেই দোষ ব্যবসায়ের নহে, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর। যাঁহারা এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এদেশে বা বিলাতে যে সকল ডেয়ারী আছে এবং যে যে কারখানাতে "ঘন দুগ্ধ" প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথায় যাইয়া কিছু দিন রীতিমত শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, নতুবা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি কোনও মতেই সম্ভবপর হইবে না।

দুগ্ধের প্রধান ভেজাল জল। কলিকাতায় যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত কলের জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করা হয়। কিন্তু কলিকাতার বাহির হইতে সহরে যে দুগ্ধের আমদানী হইয়া থাকে, তাহাতে গোয়ালারা পুষ্করিণীর অপরিষ্কৃত ও দূষিত

জল যোগ করিয়া থাকে। যদি কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি কোনও সংক্রামক রোগের বীজ ঐ জলে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ দুগ্ধ পান করিয়া আমাদিগের ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব দুগ্ধে জল মিশাইলে দুগ্ধের যে কেবল গুণ নষ্ট হয় তাহা নহে, উহা সংক্রামকতাদুষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে বিস্তর লোকের প্রাণ নাশের কারণ হইয়া থাকে। নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এ দেশের লোকে কাঁচা দুগ্ধ কখনও পান করে না। দুগ্ধ রীতিমত ফুটাইলে উহার সংক্রামকতা দোষ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অনেক সময়ে দুগ্ধকে আমরা রীতিমত ফুটাই না; একবার উথলিয়া উঠিলেই আমরা জ্বাল বন্ধ করিয়া দিই। মনুষ্যের যক্ষ্মা রোগের ন্যায় এক প্রকার যক্ষ্মা রোগ গোজাতির মধ্যে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে গো-যক্ষ্মার বীজ মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হইলে উহা মনুষ্য যক্ষ্মায় পরিণত হইয়া প্রাণনাশের কারণ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ফরাসি চিকিৎসক কাল্‌মীট্ বলেন যে গো-যক্ষ্মা-বীজ-সংক্রামিত দুগ্ধ রীতিমত ফুটাইলেও উহার ব্যবহারে অনেক সময়ে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। যাহাদিগের যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদিগের এবং শিশুদিগের পক্ষে এইরূপ দুগ্ধের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। গোয়ালার বাটীতে অনেক গোরু হয়ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া থাকিতে পারে। এই বিষয়ের যথার্থ তথ্য নিরূপণ করিবার উপায় কিছুমাত্র নাই। আমরা হয়ত অজ্ঞাতসারে সেই সকল গাভীর দুগ্ধ প্রত্যহ পান করিতেছি। আজ কাল আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। এদেশের অনেক প্রাচীন ও বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে এই দুঃসাধ্য রোগ পূর্ব্বে এদেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ বিস্তৃত ভাবে কখনও দেখা যায় নাই। গো-যক্ষ্মা-বীজ-সংক্রামিত দুগ্ধ পান দ্বারা যে এই রোগের বিস্তার হইতেছে না, তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, দুগ্ধ রীতিমত ফুটাইয়া পান করিলে আমরা অনেক দুঃসাধ্য রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারি। আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ যাহাতে এবিষয়ের গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। দুধ জ্বাল দিবার ভার দাসী বা পাচক ব্রাহ্মণের উপর না রাখিয়া গৃহলক্ষ্মীগণের তাহা সম্পন্ন করা উচিত এবং বাজারের দুগ্ধ রীতিমত দুই চারিবার না ফুটিলে উহাকে জ্বাল হইতে নামান উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলই দুগ্ধের প্রধান ভেজাল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী রসায়ণপরীক্ষক ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ তাঁহার "Food adultaration in Calcutta" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে মিউনিসিপাল ল্যাবরেটারিতে তাঁহারা ৫২১টী দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪৪৩টী দুগ্ধে শত করা ১০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত জল মিশ্রিত থাকিতে দেখিয়াছেন এবং ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ দুগ্ধে সিকি হইতে অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত জল মিশান ছিল। বাকী ৭৮টী অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র দুগ্ধ কোনও মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। গোয়ালারা বলে যে, যে দরে সাধারণে তাহাদিগের নিকট হইতে দুগ্ধ ক্রয় করে, তাহাতে তাহারা খাঁটী দুগ্ধ কোন মতেই যোগাইতে পারে না। কথাটী কতক পরিমাণে সত্য হইলেও ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যে দরেই

দুগ্ধ ক্রয় করা যাউক না কেন, গোয়ালারা তাহাদিগের কৌলিক ধর্ম্মানুসারে দুধে জল মিশ্রিত করিবেই করিবে।

যে দুগ্ধ কলিকাতায় বিক্রীত হয়, উহার সহিত যে কেবল জল মিশ্রিত থাকে, তাহা নহে। গোয়ালারা গোদুগ্ধের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মহিষ-দুগ্ধও মিশ্রিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক গোয়ালার বাটীতেই গোরু ব্যতীত দুই একটী দুগ্ধবতী মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ গোরু অপেক্ষা অনেক বেশী দুধ দেয়। মহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী ঘন এবং উহাতে মাখনের পরিমাণ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক থাকে। এজন্য মহিষদুগ্ধের সহিত অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেও পরীক্ষায় এবং বাহিক আকারে উহা খাঁটী গোদুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় মহিষ ও গোদুগ্ধে শতকরা ছানা, মাখন প্রভৃতি উপাদান কত থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইল—

উপাদান।		গো-দুগ্ধ।	মহিষ-দুগ্ধ।
জল	...	৮৭.২	৮১.০
ছানা	...	৪.৪	৪.৪
মাখন	...	৩.৩	৯.০
দুগ্ধ শর্করা	...	৪.৪	৪.৮
লাবণিক দ্রব্য...		.৭	.৮
		১০০.০	১০০.০

মহিষ-দুগ্ধ ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং যাঁহাদিগের ইহা ব্যবহার করা অভ্যাস নাই, তাঁহারা উহাতে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করিয়া থাকেন। গোয়ালারা মহিষ-দুগ্ধের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ জল এবং কিয়ৎপরিমাণ গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরে গো-দুগ্ধ বলিয়া অনেক সময়ে বিক্রয় করিয়া থাকে। মহিষ-দুগ্ধ শিশু ও রোগীর পক্ষে অপকারী। ইহা পান করিয়া অনেক সময়ে শিশুগণ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়, এবং কোন কোন ডাক্তার সন্দেহ করেন যে এইরূপ দুষ্পাচ্য দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশুর অসাধ্য যকৃতের পীড়ায় সূত্রপাত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দুগ্ধের সহিত এত অধিক জল মিশ্রিত করা হয় যে কেবল দুগ্ধের রং বজায় থাকে মাত্র। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে গৃহস্থের বাটীতে দুগ্ধ যোগান দিবার পর গোয়ালা বা গোয়ালিনী বাকী দুগ্ধের সহিত কতক পরিমাণে কলের জল মিশ্রিত করিয়া অপর গৃহস্থের বাটীতে দুধ দিতে গমন করে। আজকাল অনেক বাটীতে কল ফেলিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া লইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে কিন্তু চতুর গোয়ালাগণ কিয়ৎপরিমাণ চিনি বা কয়েক খণ্ড বাতাসা জল মিশ্রিত দুগ্ধে যোগ করিয়া কলের পরীক্ষার ফল ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যন্ত্রটী দুগ্ধ পরীক্ষার নিমিত্ত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম "দুগ্ধমান" (Lactometer)

এই যন্ত্রের উপর কতকগুলি দাগ অঙ্কিত আছে। ইহা দুগ্ধে ভাসাইয়া দিলে দুগ্ধে কত পরিমাণ জল আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুগ্ধের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া যদি উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি বা বাতাসা যোগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ জল মিশ্রিত দুগ্ধ যন্ত্রমধ্যে বিশুদ্ধ দুগ্ধ নির্দ্দেশক M চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কয়েকটী পরীক্ষার দ্বারা ইহা আপনাদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

১ম পরীক্ষা।—খাঁটী দুগ্ধ Lactometer দ্বারা পরীক্ষা কর। দুগ্ধের উপরিভাগ

যন্ত্রস্থিত M নামক চিহ্ন স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

২য় পরীক্ষা।—খাঁটী দুগ্ধের সহিত অৰ্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া উহাকে Lactometer দ্বারা পরীক্ষা কর। দুগ্ধের উপরি ভাগ যন্ত্রস্থ ২ অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করিয়া থাকিবে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, পরীক্ষাধীন দুগ্ধে অৰ্দ্ধেক দুগ্ধ এবং অৰ্দ্ধেক জল আছে।

৩য় পরীক্ষা।—দ্বিতীয় পরীক্ষার জল মিশ্রিত দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনি বা বাতাসা যোগ করিয়া, Lactometer দ্বারা উহাকে পুনরায় পরীক্ষা কর। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে এবং উহা খাঁটী দুগ্ধনির্দ্দেশক M চিহ্ন পুনরায় স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, Lactometer দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া গোয়ালাদিগের প্রতারণা ধরিতে পারা যায় না।

দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য আর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম দুগ্ধবীক্ষণ বা Lactoscope। ইহা দ্বারা দুগ্ধে কত পরিমাণ মাখন আছে তাহা জানিতে পারা যায় এবং মাখনের পরিমাণ অনুসারে দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে কিনা তাহা স্থির করিতে পারা যায়। খাঁটী দুগ্ধের সহিত যত জল মিশ্রিত করা যাইবে, ততই শতকরা যে পরিমাণ মাখন উহার মধ্যে থাকে তাহার হ্রাস হইতে থাকিবে। এই রূপে দুগ্ধে কত পরিমাণ জল মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা তন্মধ্যস্থিত মাখনের পরিমাণ স্থির করিয়া মোটামুটী ধরিতে পারা যায়। দুগ্ধের সহিত চিনি বা বাতাসা মিশাইলে এই যন্ত্রের পরীক্ষার ফলের কোনও রূপ পার্থক্য হয় না। এই যন্ত্রের মধ্যস্থলে একটী শ্বেতবর্ণ দণ্ড অবস্থিত থাকে এবং তাহার গাত্রে কতকগুলি কৃষ্ণ বর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। প্রথমতঃ যন্ত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (প্রায় ১ ড্রাম) দুগ্ধ ঢালিতে হইবে। যতক্ষণ দুগ্ধ ঘন থাকিবে ততক্ষণ এই সকল কৃষ্ণ চিহ্নগুলি দুগ্ধের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এক্ষণে যন্ত্রস্থিত দুগ্ধের সহিত অল্পে অল্পে জল যোগ করিয়া উহাকে পাতলা করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, পাতলা দুগ্ধের মধ্য দিয়া ঐ দাগগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখনই জল ঢালা বন্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যন্ত্রে রক্তস্থিত যে অঙ্ক ঐ জল-মিশ্রিত দুগ্ধের উপরিভাগ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে, ঐ দুগ্ধে শতকরা কত ভাগ মাখন বিদ্যমান আছে জানা যাইবে, সুতরাং কত জল উক্ত দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত আছে, তাহা মাখনের পরিমাণ হইতে স্থির করিয়া লইতে হইবে। গোদুগ্ধে গড়ে শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকিলেই উহা আমরা বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৪র্থ পরীক্ষা। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ল্যাক্টোস্কোপ্ দ্বারা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া উহাতে শতকরা কত মাখন আছে, তাহা স্থির কর।

৫ম পরীক্ষা।—উপরোক্ত বিশুদ্ধ দুগ্ধের সহিত সমপরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া উহাকে ল্যাক্টোস্কোপ্ দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ কত হইল, তাহা নির্দ্দেশ কর।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মহিষদুগ্ধে অধিক মাখন থাকে বলিয়া উহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া উহাকে গোদুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করিলে ল্যাক্টোস্কোপ্ দ্বারা এই প্রতারণা ধরা যায় না, কারণ এরূপে মহিষ-দুগ্ধের মাখনের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ গোদুগ্ধে যে পরিমাণ মাখন থাকে, তাহার সমান হইয়া থাকে। সুতরাং ল্যাক্টোস্কোপ্

দ্বারা উহা বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুগ্ধে জল মিশাইয়া উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি বা বাতাসা যোগ করিলে, উহা ল্যাক্টোমিটারের পরীক্ষা দ্বারা খাঁটী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং এই যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু যদি ল্যাক্টোমিটারের পরীক্ষার সহিত আমরা আর একটী পরীক্ষা করি, তাহা হইলে দুগ্ধ বিশুদ্ধ কি না তাহা মোটামুটি জানিতে পারা যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা দুগ্ধের সহিত চিনি বা বাতাসা মিশ্রিত করা হইয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায়। এই পরীক্ষার জন্ত যে দুইটী রাসায়নিক দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহা সকল ঔষধালয়েই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহাদিগের মূল্যও অধিক নহে। সুতরাং যাঁহারা বাটীতে ল্যাক্টোমিটারের দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সঙ্গে এই পরীক্ষা করিলে গোয়ালাদিগের প্রতারণা সহজেই ধরিতে পারিবেন। এই পরীক্ষার জন্ত একটী টেষ্ট্ টিউব্ এবং একটী স্পিরিট বাতির প্রয়োজন। যে দুইটী রাসায়নিক দ্রব্য এই পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহার একটীর নাম রিসর্সিন্ (Resorcin) এবং অপরটী জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Dilute Hydrochloric Acid)।

৬ষ্ঠ পরীক্ষা। একটী টেষ্ট্ টিউবে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ লইয়া উহাতে কিয়ৎ পরিমাণ রিসর্সিন্ এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ যোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ কর; দুগ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ করিবে।

৭ম পরীক্ষা।—বিশুদ্ধ দুগ্ধ এইরূপে রিসর্সিন্ ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ সংযোগে পরীক্ষা কর; উহার বর্ণ লাল হইবে না।

অনেক সময়ে গোয়ালারা দুগ্ধের "মাটা" তুলিয়া বিক্রয় করে। যদিও এরূপ দুগ্ধকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভেজাল দুগ্ধ বলিতে পারা যায় না, তথাপি এরূপ দুগ্ধকে খাঁটী দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করা প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধ নিতান্ত সারহীন হইয়া পড়ে। এরূপ দুগ্ধকে খাঁটী দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রেতা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। ল্যাক্টোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রবঞ্চনা ধরা যায় না, কিন্তু ল্যাক্টোস্কোপের পরীক্ষা দ্বারা এই দুগ্ধ যে খাঁটী নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

অনেক সময়ে "মাটা তোলা" দুগ্ধ খাঁটী দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে এবং এরূপ দুগ্ধ স্থল বিশেষে পরীক্ষায় খাঁটী দুগ্ধ বলিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে গোদুগ্ধে শতকরা ৩ ভাগ মাখন থাকিলেই আইনানুসারে উহা খাঁটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যদি কোন গোরুর দুগ্ধে শত করা ৪ বা ৫ ভাগ মাখন থাকে, তাহা হইলে উহার সহিত "মাটা তোলা" দুগ্ধ সিকি বা অর্দ্ধেক মিশ্রিত করিলেও আইন-নির্দ্দিষ্ট মাখনের নিম্ন সীমা অতিক্রম করে না। আমি দেখাইব যে আইনে গোদুগ্ধে মাখনের পরিমাণের যে নিম্ন সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত কম; এইজন্ত খাঁটী দুগ্ধে অনেক সময়ে সিকি বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল মিশাইয়া ঐ দুগ্ধ খাঁটী বলিয়া বিক্রয় করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় না। দুগ্ধের সহিত কখন কখন ময়দা, এরারুট বা অন্তান্ত দেশী পালো মিশ্রিত করিয়া ঘন করা হয়। এরূপ দুগ্ধ জাল দিয়া শীতল করতঃ উহাতে আইওডিনের দ্রাবণ যোগ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ ধারণ করিবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা

করিলেও দুগ্ধ পালোমিশ্রিত কিনা তাহা জানিতে পারা যায়। দুগ্ধের সহিত চা-খড়ি মিশাইবার কথাও শুনা গিয়াছে।

বিলাতে দুগ্ধ যাহাতে শীঘ্র বিকৃত না হইয়া যায়, তজ্জন্য সোহাগা, বোরাসিক্ এসিড্, ফর্ম্মালিন্ প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এইরূপ মিশ্রণ আইন-নিষিদ্ধ। এদেশে এরূপ কোন ঔষধ দুধের সহিত মিশ্রিত করিতে দেখা যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন গোরুর দুগ্ধ স্বভাবতই ঘন এবং অপর গোরুর দুগ্ধ একটু পাতলা হইয়া থাকে। একই গোরুর দুধ কারণ বিশেষে কখন একটু বেশী ঘন বা বেশী পাতলা হইয়া থাকে। যে সকল কারণে খাঁটী দুগ্ধের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল—

১। ঋতুভেদ—ঋতুভেদে দুগ্ধের উপাদানের পরিমাণের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। শীতকালে গোরুর দুধ একটু বেশী ঘন হয়; বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে দুধ ঘন হইলেও মাখন ভিন্ন অন্যান্য উপাদানের অংশ সামান্য পরিমাণে কমিয়া যায়। বর্ষাকালের দুগ্ধ সচরাচর একটু পাতলা হয় এবং উহাতে মাখনের অংশও কম থাকে। হেমন্তে দুগ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে আরম্ভ হয়।

২। প্রসবকাল—প্রসবের পর ৭।৮ দিন গোরুর দুধ গাঢ় থাকে, তখন উহাতে কোলষ্ট্রম্ (Cholostrum) নামক এক প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। প্রসবের পর প্রায় ১ সপ্তাহ কাল ঐ গোরুর দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে; আমাদিগের শাস্ত্রেও এরূপ দুগ্ধের ব্যবহারের নিষেধ আছে।

জাতি (Breed)—ভিন্ন জাতীয় গোরুর দুগ্ধের উপাদানের মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী, পশ্চিম দেশীয় গোরু এবং বাঙ্গালা দেশের গোরুর দুধের মধ্যে অল্প বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যে গোরুর দুধ খুব ঘন, সে গোরু সচরাচর কিছু কম দুধ দিয়া থাকে। বিলাতে জার্সি (Jersey) নামক গোজাতির দুধ বেশী ঘন। এই গোরুর দুধে শতকরা ৮৫ ভাগ জল থাকে। সর্ট্ হর্ণ্ (Short horn) নামক অপর জাতীয় গোরু বেশী দুধ দেয় বটে, কিন্তু উহাতে শতকরা ৮৭।০ ভাগ জল বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস যে কাল গোরুর দুধ বেশী ঘন হয়; এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা জানা নাই।

প্রসবের কাল নিকটবর্ত্তী হইলে অনেক গোরুর দুধ বন্ধ হইয়া যায়; যাহারা এরূপ অবস্থায় দুধ দেয়, সেই দুধ সচরাচর বেশী ঘন হইতে দেখা যায়।

গো-দোহন—হলণ্ডে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে দিবসে ৩ বার গো-দোহন করা হয়; ইহাতে প্রত্যহ প্রায় একই পরিমাণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলাতে এদেশের মত প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় গো-দোহন করা হয়। প্রাতের অপেক্ষা সন্ধ্যার দুগ্ধে কিছু বেশী মাখন থাকিতে দেখা যায়। অনির্দ্দিষ্ট সময়ে গো-দোহন করিলে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। গোরু নূতন স্থানে যাইলে বা নূতন দোহাল নিযুক্ত করিলে অনেক সময়ে কম দুধ দিয়া থাকে।

খাদ্য—খাদ্যের পরিবর্ত্তন অধিক দিন স্থায়ী হইলে দুগ্ধ পাতলা বা ঘন হইয়া থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যের যথোচিত অভাব হইলে দুগ্ধ সারহীন হইয়া পড়ে। বাড়ীর গোরুর দুধ গোয়ালা বাড়ীর খাঁটি দুধের অপেক্ষা সচরাচর অধিক সারবান হইয়া থাকে। জল খাইতে না পাইলে দুধে শতকরা ২॥০ ঘ

৩ ভাগের অধিক মাখন থাকে না; ঘরের গোরুর দুধে অনেক সময়ে শতকরা ৫ হইতে ৬ ভাগ পর্য্যন্ত মাখন দেখিতে পাওয়া যায়।

এক প্রকার ঘাস আছে যাহা গোরু খাইলে উহার দুধে রসুনের গন্ধ পাওয়া যায়; এরূপ দুগ্ধ অনেকেই পান করিতে পারেন না। গোরু চরিবার সময় বিষাক্ত গাছ খাইলে দুগ্ধের মধ্যে উক্ত বিষ স্বল্প পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়; এরূপ দুগ্ধ পান করিলে উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

যে সকল কারণে দুগ্ধ স্বভাবত একটু পাতলা হইতে পারে, তাহা উপরে নির্দ্দেশ করা হইল। দুগ্ধ পাতলা হইলে বিক্রেতা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। পাছে বিক্রেতা "এই দুগ্ধ স্বভাবতঃ পাতলা" এইরূপ অছিলা করিয়া দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করে, তজ্জন্য বিলাতের সাধারণ খাদ্য-পরীক্ষকগণ উপরোক্ত সকল কারণগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া খাঁটী দুগ্ধের উপাদান সমূহের নিম্ন সীমা (Minimum standard) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। দুগ্ধে শতকরা ৮৮॥০ ভাগ জল এবং অন্ততঃ ৩ ভাগ পর্য্যন্ত মাখন থাকিলে ঐ দুগ্ধ বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে; এরূপ দুগ্ধ খাঁটী বলিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রেতা দণ্ডনীয় হইবে না। ইহা অপেক্ষা অধিক জল বা অল্প মাখন থাকিলে ঐ দুগ্ধ ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে। আমি পরে দেখাইব যে এই নিম্ন সীমা নিতান্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে। এ কারণ ভাল দুধের সহিত শতকরা ২৫ ভাগ জল মিশাইলেও উহা ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

মাখন।

আমাদিগের মধ্যে মাখনের ব্যবহার অধিক নাই; মাখনকে আমরা ঘৃতে পরিণত করিয়া উহাই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইংরাজেরা রুটী ও অন্যান্য খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মাখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। গোদুগ্ধ হইতে যে মাখন উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা পূজার জন্য ও খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। যশোহর ও ঘাটাল হইতে কলিকাতা সহরে এই মাখনের আমদানি হইয়া থাকে। যশোহরের মাখন ঘাটালের মাখন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে জলীয় ভাগ কম থাকে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত দানাপুর, আলিগড়, দার্জ্জিলিং, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণ "ভয়সা" (মহিষ দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন) মাখনের আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল প্রদেশের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা স্ব স্ব গৃহে অল্পাধিক পরিমাণে মাখন প্রস্তুত করিয়া রাখে; মহাজনেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করে এবং কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে চালান দিয়া থাকে। স্থানে স্থানে মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারি (Dairy) স্থাপিত হইয়াছে; এই সকল ডেয়ারিতে উৎকৃষ্ট মাখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাখনের প্রধান ভেজাল জল। জল মিশাইয়া মাখনকে ভারী করা হয় এবং উহা পরিমাণেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট মাখনে শতকরা ১০ হইতে ১২ ভাগের অধিক জল থাকা উচিত নহে। ঘাটালের মাখনে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জল থাকে।

জল ব্যতীত দধি (Curd) মাখনের আর একটী ভেজাল। মাখন প্রস্তুত করিবার সময় কিয়দংশ দধি উহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া যায়; মাখন গালাইবার সময় দধির অংশ ঘৃতের নীচে জমিতে দেখা যায়। মাখন ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে না

পারিলে উহার সহিত অধিক পরিমাণ দধি মিশ্রিত থাকিয়া যায়; পুনশ্চ দুষ্ট ব্যবসায়ী-গণ ইচ্ছা পূর্ব্বক উহার সহিত অধিক পরিমাণ দধি মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঘাটালের মাখনে দধির অংশ অধিক পরিমাণ থাকে।

জল ও দধি ব্যতীত বসা (fat) এবং নিকৃষ্ট ঘৃত অনেক সময়ে মাখনের সহিত মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। শুনা গিয়াছে যে অসাধু ব্যবসায়ীরা কলা চটকাইয়া এবং কচু সিদ্ধ করিয়া মাখনের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে।

বিলাতে মাখনের সহিত মার্গারিণ্ (Margarine) নামক এক প্রকার চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়, কিন্তু বিলাতী আইন অনুসারে এরূপ ভেজাল মাখনকে কেহ মাখন বলিয়া বিক্রয় করিতে পারে না, ইহা মার্গারিণ্ বলিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিলাতী মাখনে অনেক সময়ে কৃত্রিম রং করা হয় এবং কখন কখন খাদ্য লবণ অল্প পরিমাণে মাখনের সহিত মিশ্রিত করা হয়।

ঘৃত।

অবস্থাপন্ন ভারতবাসীদিগের প্রধান খাদ্য ঘৃত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী বলিলে অত্যুক্তি হয় না; ইঁহারা মাছ মাংসের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরামিষাশী নহেন, তাঁহারাও খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর প্রায় ২১০০০০ মন ঘৃতের আমদানি হইয়া থাকে।* তন্মধ্যে বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতেই অধিকাংশ ঘৃতের আমদানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতেও কতক পরিমাণ ঘৃতের আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই "ভয়সা" ঘৃত; এই সকল স্থান হইতে "গাওয়া" ঘৃত অতি অল্প পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। যে সকল স্থান হইতে ঘৃতের আমদানি হয়, তথায় বড় বড় কুঠি আছে; সাধারণতঃ এই কুঠিগুলি "মোকাম" বলিয়া পরিচিত। যে যে স্থানে মোকাম অবস্থিত আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের ("দেহাত") লোকেরা স্ব স্ব গৃহে অল্পাধিক পরিমাণে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া থাকে। মহাজনেরা "মোকামে" এই ঘৃত একত্র সংগ্রহ করিয়া জ্বাল দিয়া "পাকা" করিয়া লয় এবং টিনের কানেস্তারার মধ্যে পুরিয়া কলিকাতায় রপ্তানি করে। এইরূপ "পাকা" করিবার সময় মোকামের মধ্যে নানাবিধ পদার্থ ঘি'এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়। পশ্চিম হইতে যে ঘৃতের আমদানি হয়, তাহার সহিত সচরাচর চীনের বাদামের তৈল বা মহুয়ার তৈল বা পোস্ত বীজের তৈল ভেজাল থাকে। ইহার মধ্যে চর্ব্বি ভেজাল বড় বেশী থাকে না। কলিকাতার সন্নিকটস্থ দুই একটী স্থানে চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চর্ব্বি বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি দোকান আছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতায় যে ঘৃতের আমদানি হয়, এই সকল স্থানে তাহার সহিত চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়া মফঃস্বলের ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতায় বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। ১৯০৫ সালে মিউনিসিপাল্ পরীক্ষাগারে ৭০০ সংখ্যক ঘৃত পরীক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭৫টী খাঁটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, আর বাকী ৫২৫টী ঘৃতের (অর্থাৎ

* Dr. Ghosh's food Adulteration in Calcutta.

শতকরা ৭৫ ভাগ ঘৃতে) সহিত অল্লাধিক পরিমাণে নানাপ্রকারের ভেজাল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল।

ঘৃতে বেশী ভেজাল থাকিলে অনেক সময় গন্ধের দ্বারাই উহা অবিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারা যায়। চর্ব্বি বা চীনের বাদামের তৈল ঘৃতের সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে গন্ধ দ্বারা এবং ঘৃতের বাহ্যিক আকার দ্বারা উহা যে বিশুদ্ধ নয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঘৃতের সহিত অধিক বসা মিশ্রিত থাকিলে উহা সহজ অবস্থাতেই বেশী জমাট বাঁধা থাকে। ঘৃতের সহিত অধিক পরিমাণ তৈল মিশ্রিত থাকিলে উহার অল্প অংশ দানাদার হয়, অধিকাংশ ভাগই তরল অবস্থায় উপরে ভাসিতে থাকে। অবশ্য অত্যন্ত গরমের সময় বিশুদ্ধ ঘৃতকেও এইরূপ অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। অল্প ভেজাল থাকিলে শুদ্ধ চক্ষে দেখিয়া বা গন্ধ দ্বারা ভেজাল ধরিতে পারা যায় না। কোন প্রকার তৈল বা চর্ব্বি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। সহজ সাধ্য দুই একটী পরীক্ষা দ্বারা ভেজাল পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভেজাল দ্রব্য ঘৃতের সহিত কত পরিমাণ মিশ্রিত আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আবশ্যক। এ সভাস্থলে বা এ প্রবন্ধ মধ্যে সে বিষয়ের অবতারণা সুসঙ্গত নহে। তবে এস্থলে সহজসাধ্য দুই একটী পরীক্ষা আপনাদিগকে দেখাইব মনস্থ করিয়াছি।

যদি ঘিয়ের সহিত চীনের বাদাম কিংবা মহুয়া প্রভৃতি কোনও প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা অনেক স্থলে উহা নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই পরীক্ষা ওয়েল্‌ম্যানের পরীক্ষা নামে পরিচিত।

৬ষ্ঠ পরীক্ষা—১ ভাগ ঘৃত ও ৪ ভাগ ক্লোরোফরম্ একটী টেষ্ট্ টিউবে ঢাল এবং উহার সহিত কয়েক বিন্দু ফস্‌ফোমলিব্‌ডিক্ এসিডের দ্রাবণ যোগ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন কর। এক্ষণে টেষ্ট্ টিউব্‌টী স্থির ভাবে রাখিলে তরল পদার্থটী দুইটী ভিন্নস্তরে পৃথক হইয়া যাইবে। যদি ঘৃতের সহিত কোনও প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে এই দুই স্তরের মধ্যস্থল সবুজ বর্ণে রঞ্জিত হইবে।

নিম্নলিখিত দুইটী পরীক্ষার দ্বারা ঘৃতের সহিত বসা মিশ্রিত আছে কি না জানিতে পারা যায়।

৭ম পরীক্ষা—সমভাগ ঘৃত ও গ্লেশিয়াল এসেটিক এসিড (Glacial acitic acid) একটী টেষ্ট্ টিউবে লইয়া টেষ্ট্ টিউব্‌টী অত্যুষ্ণ জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে উহাকে উঠাইয়া আলোড়ন করিতে হইবে। যখন এই মিশ্রিত তরল পদার্থটী সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া যাইবে, মোটেই ঘোলা থাকিবে না, তখন উহার উষ্ণতা (Temperature) কত তাহা থার্ম্মোমিটার্ দ্বারা গ্রহণ করিবে। অথবা একবার স্বচ্ছ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার ঘোলা হইবার সময় উহার উষ্ণতা কত থাকে তাহা থার্ম্মোমিটার্ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিবে। যদি ঘৃত বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ৩৩ হইতে ৪১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে ঘৃত ও এসেটিক্ এসিড্ একত্রে মিশ্রিত হইয়া স্বচ্ছ হইয়া যায়। যদি ঘৃতের সহিত বসা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত পদার্থ স্বচ্ছ হইতে ৬০ ডিগ্রি বা ততোধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয়, আর যদি ঘৃতের সহিত চীনের বাদামের তৈল বা অন্য কোনও প্রকারের তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে ৩৩ ডিগ্রির অনেক নীচে উক্ত দ্রাবণ স্বচ্ছতা ধারণ করে।

৮ম পরীক্ষা—কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণ (৯ ভাগ এসিড্ ও ১ ভাগ জল) ২॥০ ভাগ এবং ১ ভাগ ঘৃত টেষ্ট্ টিউবে লইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে যদি ঘৃতের সহিত বসা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে ঘৃতের ভাগ কার্ব্বলিক এসিডে দ্রব হইয়া যায়, কেবল বসার ভাগ পৃথক হইয়া পড়ে।

এই সকল পরীক্ষা দ্বারা ঘৃতে ভেজাল আছে কি না, তাহা মোটামুটি জানিতে পারা যাইলেও ইহাদিগের দ্বারা সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঘৃত যথারীতি পরীক্ষা করিতে হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুব্যবস্থিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(১) পতঞ্জলি-রচিত মহাভাষ্য সাকেত (অযোধ্যা) এবং মধ্যমিকা (মেবাড়ের প্রসিদ্ধ চিত্তোড়* দুর্গের প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত) নগরীর উপর যবন আক্রমণের কথা লিখিত আছে।† (২) বাৎস্যায়ণ প্রণীত কামসূত্রে কুন্তল দেশের রাজা শাতকর্ণি শাতবাহনের হস্তে ক্রীড়া প্রসঙ্গে তাঁহার মহিষী মলয়বতীর মৃত্যু হওয়ার কথা পাওয়া যায়। (৩) মৃচ্ছকটিক নাটককার মহারাজ শূদ্রক ১০০ বৎসর বয়সে চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪) অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশীয় সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন বৃদ্ধাবস্থায় নিজ মহিষী সমভিব্যাহারে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে জলপ্রবেশ করিয়াছিলেন। (৫) ১১৩২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের যাদব রাজা সিংহণ (সিংঘণ) এবং ধোলকার বাঘেল (সোলাঙ্কী) রাণা লাবণ্যপ্রসাদের (লবণ প্রসাদ) মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে যে সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল প্রতিলিপি "লেখপঞ্চাশিকা" গ্রন্থে পাওয়া যায়। (৬) পিঙ্গলসূত্রবৃত্তি গ্রন্থে হলায়ুধ মালব পণ্ডিত দেশের পরমার রাজা মুঞ্জের প্রশংসা লিখিয়াছেন। পরমার রাজা অর্জ্জুনবর্ম্মদেব অমরুশতক কাব্যের স্বপ্রণীত টীকায় জগদ্দেবকে (জগদেব—পরমার) আপনার পূর্ব্ব পুরুষ স্বীকার করতঃ তাঁহার প্রশংসাত্মিকা কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৭) ১৩০০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উলগ খাঁ কর্ত্তৃক মেবাড় আক্রমণ এবং চিত্তোড়ের রাজা সমরসিংহ (রাবল) কর্ত্তৃক দেশ রক্ষার বিবরণ জিনপ্রভসূরি রচিত তীর্থ-

* "মিবার, চিতোর" প্রভৃতি প্রচলিত বর্ণ বিন্যাস বিশুদ্ধ নহে। তত্তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের উচ্চারণানুযায়ী বিশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

† ব্যাক্‌ট্রিয়স য়ুনানী রাজাদিগের মধ্যে মিনন্ইডর কর্ত্তৃক যে গুজরাত রাজপুতানাদি দেশ বিজিত হইয়াছিল, তাহা তত্তদ্দেশ হইতে প্রাপ্ত বহুতর মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। এই মিনন্ইডরই মধ্যমিকাদি জয় করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

কল্প গ্রন্থের সত্যপুর (মারবাড়ের অন্তর্গত সাচোর) কল্পে পাওয়া যায়। (৮) প্রাকৃত পিঙ্গলসূত্রের টীকায় লক্ষ্মীনাথ ভট্ট চৌহান বংশীয় হম্বীর, কর্ণ প্রভৃতি রাজগণের প্রশংসাত্মক শ্লোক সমূহ উদাহরণার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৯) অশোক-অবদান গ্রন্থে শিশু নাগবংশীয় ভূপতিদিগের নামাবলী এবং (১০) হেমচন্দ্র (হেমাচার্য্য) রচিত ত্রিষষ্ঠী পুরুষ-শলাকা-চরিতের পরিশিষ্ট পর্ব্বে শিশু নাগ এবং মৌর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। (১১) মেরুতুঙ্গ-রচিত বিচারশ্রেণী নামক পুস্তকে গুজরাতের চাবড় ও সোলাঙ্কীবংশীয় নৃপতিদিগের পূর্ণ বংশাবলী, প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। (১২) ধর্ম্মসাগর নিজ প্রবচন-পরীক্ষা গ্রন্থে গুজরাতের চাবড় এবং সোলাঙ্কী দিগের সম্পূর্ণ বংশাবলী এবং রাজত্ব-সময় দিয়াছেন। (১৩) মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে সুঙ্গবংশ সংস্থাপক রাজা পুষ্পমিত্রের সময়ে তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র কর্ত্তৃক বিদিশা (ভেলসা) শাসন, বিদর্ভ (বরার) রাজ্য নিমিত্ত যজ্ঞসেন এবং মাধবসেনের মধ্যে বিরোধ, মাধবসেনের বিদিশাভিমুখে পলায়ন এবং যজ্ঞসেনের সেনাপতি কর্ত্তৃক অবরোধ, মাধবসেনের মুক্তির জন্য যজ্ঞসেনের সহিত অগ্নিমিত্রের যুদ্ধ এবং বিদর্ভ রাজ্যকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ একাংশ যজ্ঞসেনকে ও অপরাংশ মাধবসেনকে প্রদান, পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে (এই সিন্ধু নদী রাজপুতানায়, মেঘদূতের ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) যবন কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া এবং বসুমিত্র কর্ত্তৃক যবনদিগের পরাজয় এবং অশ্বের মুক্তি ও অবশেষে পুষ্পমিত্রের যজ্ঞপূর্ণ হওয়া ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যায়। (১৪) অজমেরের চৌহানবংশীয় বিগ্রহরাজের (বীসলদেবের) রাজকবি সোমেশ্বর রচিত ললিত বিগ্রহ রাজ নাটকে বীসলদেবের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। (১৫) মালবের পরমার-রাজ অর্জ্জুনবর্ম্মার রাজগুরু মদন প্রণীত পারিজাত-মঞ্জরী নাটিকায় অর্জ্জুনবর্ম্মার সহিত গুজরাতের সোলঙ্কী রাজা জয়সিংহের (যিনি দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছিলেন) পর্ব্ব পর্ব্বতের (পাবাগড়, গুজরাতে) নিকট যুদ্ধ হওয়া এবং ঐ যুদ্ধে জয়সিংহের পরাজয় ও পলায়নের উল্লেখ আছে। (১৬) কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে চেদী দেশের হৈহয় (কলচুরি) বংশীয় রাজা কর্ণ কর্ত্তৃক কালিঞ্জরের (বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজ্যবিলয় ও কীর্ত্তিবর্ম্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য পুনর্বিজয় ও কীর্ত্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে পুনঃ সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যায়। (১৭) গুণাঢ্য প্রণীত পৈশাচী ভাষার বৃহৎ কথা গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ কথা-সরিৎসাগরে বররুচি, ব্যাড়ী, পাণিনি, নন্দ, শকটাল, চাণক্য, শতবাহন, বৎসরাজ, চণ্ড-মহাসেন ও বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির কথা আছে। (১৮) শিবসিংহ দেবের আশ্রিত প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত পুরুষ পরীক্ষা পুস্তকে মিথিলার কর্ণাট বংশীয় নান্যদেব পুত্র মল্লদেব, গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন, ধারা নগরীর ভোজ এবং কাশীর রাজা জয়চন্দ্র প্রভৃতির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

(চ) পুস্তকাবলীর প্রারম্ভ ও শেষ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পশ্চাৎ রচিত গ্রন্থ সমূহের গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাপন পুস্তকের প্রারম্ভে বা শেষে আপনার ও আপনার আশ্রয়দাতৃ নৃপতির কিছু

কিছু পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ আপনার পুস্তকে রচনার সংবৎ এবং সমসাময়িক রাজার নাম লিখিয়াছেন এবং কেহ কেহ আপনার আশ্রয়দাতার বংশাবলী বিশেষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ প্রাচীন কালের অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি পুঁথি নকল করিবার সময় সংবৎ ও সাময়িক রাজার নাম লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উপাদান হইতেও ইতিহাস-সংকলনকারীর কিছু সাহায্য হইতে পারে। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) জল্হন পণ্ডিত স্বরচিত সূক্তি মুক্তাবলীর প্রারম্ভে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্তে দেবগিরির (দৌলতাবাদ) কতকগুলি যদুবংশীয় রাজার পরিচয় দিয়াছেন। (২) সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রি পণ্ডিত, যিনি দেবগিরির যাদব রাজা মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, আপনার চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি গ্রন্থের ব্রত খণ্ডের শেষে রাজ-প্রশস্তি-প্রকরণে পুরাণ-প্রসিদ্ধ যদুবংশীয় অনেকগুলি রাজার নামাবলীর অতিরিক্ত দাক্ষিণাত্য যাদব-রাজ্য-সংস্থাপক মহাবীর দৃঢ়প্রহার হইতে মহাদেব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বংশাবলী এবং কোন কোন রাজার কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। (৩) গুজরাতের সোলঙ্কীদিগের পুরোহিত সোমেশ্বর স্বপ্রণীত সুরথোৎসব কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে গুজরাতের সোলঙ্কীদিগেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। (৪) ধনপাল পণ্ডিত তাঁহার তিলকমঞ্জরী গ্রন্থের প্রারম্ভে পরমার বংশের উৎপত্তি ও বৈরিসিংহ হইতে ভোজ পর্য্যন্ত নৃপতিগণের বংশাবলী দিয়াছেন। (৫) খৃষ্টীয় ৬২৮ অব্দে ব্রহ্মগুপ্ত যোধপুর রাজ্যান্তর্গত ভীনমাল নগরে ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় তথায় চাঁপ (চাবড়) বংশীয় রাজা ব্যাঘ্রমুখ রাজত্ব করিতেছিলেন, ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। (৬) উক্ত ভীনমাল নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ মাঘকবি শিশুপালবধ কাব্যে নিজ পিতামহ সুপ্রভদেবকে তত্রত্য রাজা বর্ম্মলাতের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (৭) খৃষ্টীয় ৭৮৩ অব্দে জিনেশ্বর জৈন হরিবংশপুরাণ লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উত্তরে ইন্দ্রায়ুধ, দক্ষিণে বল্লভ, পূর্ব্বে বৎসরাজ এবং পশ্চিমে বেহার (জয়বরাহ) নামক নৃপতি চতুষ্টয় রাজত্ব করিতেছিলেন এইরূপ ঐ পুস্তকে লিখিত আছে। (৮) খৃষ্টীয় ৯৯৩ অব্দে অমিতগতি সুভাষিত-রত্নসন্দোহ নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত আছে যে, ঐ সময়ে মালব দেশে মুঞ্জ পরমার রাজা ছিলেন। বজ্রট পুত্র উধট উজ্জয়িনী নগরে শুক্লযজুর্ব্বেদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, ঐ সময় ভোজ পরমার উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। (৯) ১২০৫ খৃষ্টাব্দে প্রাগ্বাট (ওরবাড়) মহাজন ধবলের পুত্রী আশ্বিন মাসে মুঞ্জল পণ্ডিত দ্বারা জয়ন্তীবৃত্তি নকল করাইয়া অজিতদেব সূরিকে উপহার দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অনহিলবাড়ে নগরে সোলঙ্কী ভীমদেব রাজা ছিলেন। (১০) ১২২৮ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে শেঠ হেমচন্দ্র উঘনির্যুক্তি গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে মেবাড় রাজ্যের পুরাতন রাজধানী আঘাট দুর্গে (অহাড়) রাবল জৈত্র সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন এবং জগৎসিংহ তাঁহার মহামাত্য (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন।

এবম্বিধ সামগ্রী হইতে যতপ্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক রচিত হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকাবলীর কতকগুলি রিপোর্ট এবং কোন কোন পুস্তকালয়ের সূচী-

পত্র (Catalogue) এরূপ প্রস্তুত হইয়াছে যে, যাহাতে অনেক পুস্তকের আরম্ভ ও শেষাংশ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। অতি অল্প পরিশ্রমে ঐ সকল রিপোর্ট এবং সূচী হইতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ সংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে ডাক্তার কীলহার্ণ, বুলর্, ভাণ্ডারকর, পীটারসন ও শেষগিরি শাস্ত্রীর রিপোর্ট, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত Notices of Sanskrit Manuscripts এবং কলিকাতা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজ, কাশ্মীর, অলবর, বীকানের, নেপাল, ইণ্ডিয়া আফিশ, ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুস্তকের সূচী অতিশয় মূল্যবান্। ডাক্তার আফরেচ্ মহাশয়ের "কেটোলাগস্ কেটেলোগরম্" নামক পুস্তক (যাহার তিনভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে) এই বিষয়ের অপূর্ব্ব পুস্তক।

(ছ) বংশাবলী পুস্তক। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন নরপতি ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের অনেক বংশাবলী পুস্তক পাওয়া যায়; যাহা হইতেও প্রাচীন ইতিহাস রচনায় কিছু কিছু সহায়তা হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি প্রধান পুস্তকের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

(১) প্রসিদ্ধ কাশ্মিরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র রচিত "নৃপাবলী" (রাজাবলী) ইহাতে কল্‌হণের "রাজতরঙ্গিনী"র ন্যায় কাশ্মীর রাজ্যের নরপতিগণের বংশাবলী লিখিত আছে। (২)—(৩) জৈন পণ্ডিত বিদ্যাধর সংগৃহীত "রাজতরঙ্গিনী" ও রঘুনাথ রচিত "রাজাবলী"। জয়পুররাজ্য-সংস্থাপক মহারাজ জয়সিংহের সময়ে জয়পুরে এই দুই পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ভারত যুদ্ধ হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত নৃপতিগণের নামাবলী দিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কর্ণেল টড্ তাঁহার "রাজস্থান" নামক পুস্তক প্রণয়ন উপলক্ষে এই দুই গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন।

(৪) নেপাল-বংশাবলী। "পার্ব্বতীয় বংশাবলী" নামক এক পুস্তক নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নেপালের ভিন্ন ভিন্ন বংশের রাজাদিগের নামাবলী এবং প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নেপাল রাজ্য হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং অন্যান্য হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত এই বংশাবলীর সর্ব্বত্র মিল নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন ঠাকুরীবংশীয় রাজা অংশুবর্ম্মার রাজত্বের সময় এই বংশাবলীতে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী বলিয়া লিখিত আছে। অথচ অংশুবর্ম্মার শিলালিপি অনুসারে তিনি খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। শিলালিপির বিবরণ প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুএন্তসাঙ্ কর্ত্তৃক প্রমাণীত হইতেছে। এই চৈনিক যাত্রী খৃ ৬৩৭ অব্দে নেপালে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার নেপাল পৌঁছিবার অল্প সময় পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল, সুতরাং অংশুবর্ম্মা যে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এমতাবস্থায় প্রাচীন ইতিহাস সংকলনের নিমিত্ত এই বংশাবলী তাদৃশ উপযোগী নহে। Indian Antiquary পত্রিকায় Vol. XIII ৪১০—৪২৮ পৃষ্ঠায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

নিত্য ও প্রাকৃত প্রলয়।

প্রলয় কথার অর্থ লইয়া বিচার করিলে জগতের বিধ্বংসই বুঝিতে পারা যায়। উহা আবার চারি প্রকার—১ম নিত্য, ২য় প্রাকৃত, ৩য় নৈমিত্তিক, ৪র্থ আত্যন্তিক। নিখিল কার্য্য-জগতের প্রলয় স্বরূপ বলিয়া সুষুপ্তি আর নিত্য প্রলয় একই জিনিষ। অধিকন্তু সুষুপ্তি যে একটা প্রলয়, তাহা অনেকের নিকটেই আশ্চর্য্য রসের কিম্ভূত কিমাকার কথা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহার কারণও আছে, কেন না সুষুপ্তি সম্বন্ধে অতি কম লোককে চিন্তা করিতে দেখা যায়। তাঁহারা সাধারণতঃ উহাকে সুখ-নিদ্রা বলিয়া জানাই যথেষ্ট মনে করেন। আর সুষুপ্তির খুটিনাটি চিন্তায় কাল হরণ করিলে, কোন প্রকার বৈষয়িক উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা নাই, এইজন্য উহা তাঁহাদের মনকেও আকৃষ্ট করিতে পারে না। সুষুপ্তি-চিন্তার ন্যায় মুক্তি-চিন্তাকেও এই শ্রেণীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। দেখিতেছি বিজয় লাভটা কেবল কনক কান্তার কমনীয় কান্তির ভাগ্যেই রহিয়াছে। যাহা হউক, আর্য্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধে গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তাঁহাদের সহিত ঐকমত্য-সুখে বঞ্চিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

বেদান্ত-পরিভাষাকার লিখিয়াছেন—"প্রলয়ো নাম ত্রৈলোক্য নাশঃ। স চ চতুর্ব্বিধঃ নিত্যঃ প্রাকৃতো নৈমিত্তিক আত্যন্তিকশ্চেতি। তত্র নিত্য প্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ, তস্যাঃ সকল কার্য্য প্রলয়রূপত্বাৎ॥" ইহার অর্থ উপরে বিবৃত হইয়াছে। এইস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে, ত্রৈলোক্যের বিনাশকে যখন প্রলয় বলা হইল, তখন সুষুপ্তি কি প্রকারে প্রলয় হইতে পারে? কেন না এক ব্যক্তির ঐ অবস্থা হইলেও অপর অসুষুপ্ত ব্যক্তি, জগৎ প্রত্যক্ষত দেখিতে পান। এই আপত্তিটা যে, অনবধানতামূলক ইহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না; কারণ যিনি জগৎ দেখিতে পান, তিনি সুষুপ্তিতে বঞ্চিত, এইজন্য উহা ত্রিলোকীর বিধ্বংসরূপ এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র দোষ আসিতে পারে না। এইত গেল এক আপত্তির কথা, আবার গ্রন্থকার অনেক আপত্তির অবতারণা করিয়া স্বয়ংই নিরাশ করিয়াছেন—"ধর্ম্মাধর্ম্ম পূর্ব্বসংস্কারাণাঞ্চ তদা কারণাত্মনাবস্থানং। তেন সুপ্তোত্থিত তস্য ন সুখদুঃখানুভবানুপপত্তিঃ, ন বা স্মরণানুপপত্তিঃ ন চ সুষুপ্তাবস্থঃ করণস্য বিনাশে তদধীন প্রাণাদি ক্রিয়ানুপপত্তিঃ বস্তুতঃ শ্বাসাদ্যভাবেপি তদুপলব্ধেঃ পুরুষান্তর বিভ্রমমাত্রত্বাৎ সুপ্তশরীরোপলম্ভবৎ"।

আপত্তি উঠিতেছে, সুষুপ্তিতে কার্য্যরূপ সমস্ত জগতের বিনাশ স্বীকার করিলে, পুণ্য, পাপ ও পূর্ব্বসংস্কারের বিনাশও অবশ্য হইয়া থাকিবে, এবং সে কথা স্বীকার করিলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ, দুঃখ ও স্মৃতির পুনরাবির্ভাবটা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, কেন না ঐগুলির কারণ যে, পুণ্য, পাপ ও পূর্ব্বসংস্কার, সুষুপ্তিতে উহাদের বিনাশ হইয়াছে। সমাধানে বলা যাইতেছে উহাদের অত্যন্ত নাশ ঐ অবস্থাতে হয় না, উহারা কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। অন্য আপত্তি—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য, আর তাহা হইলে তদধীনস্থ প্রাণ প্রভৃতির শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া অনুপপন্ন হইয়া যায়। সমাধান—ঐ অবস্থাতে কারণরূপে অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্তব্যক্তি শ্বাসাদি ক্রিয়া স্বয়ং অনুভব না করি-

সেও তদন্ত জাগ্রৎ ব্যক্তি যে, অনুভব করে ইহা ঐ অনুভবিতার ভ্রান্তি মাত্র। অপর লোক কর্তৃক সুষুপ্ত ব্যক্তির দেহ প্রতীতিকে ইহার উদাহরণে রাখা যাইতে পারে। এই ভ্রান্তির কথা শুনিয়া হয় ত অবৈদান্তিক পাঠক বিস্ময়নীরে সিক্ত হইতে পারেন। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মাত্মা ব্যতীত সকল জিনিষকেই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার কারণ ঐগুলি অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহাদিগকে আমরা স্থূলভাবে অপরিবর্ত্তিত মনে করিতেছি, উহারাও প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থাতে ঐগুলির উপলব্ধিকে ভ্রান্তি নাম দেওয়াই উপযুক্ত; কেন না অস্থির বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রান্তিপদের প্রবৃত্তি নিমিত্ত অর্থাৎ রজ্জু সর্পভ্রম-স্থলে সর্প জ্ঞানকে এইজন্য ভ্রান্তি বলা যায় যে, ঐ জ্ঞানের বিষয়রূপ সর্পটা অস্থায়ী, আর তদপেক্ষা রজ্জু স্থায়ী।

সুপ্ত ব্যক্তির শ্বাসাদি ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাকে যদি ভ্রান্তি বলা হইল, তবে মৃতব্যক্তির তাহা হইতে কিছুই পার্থক্য রহিল না। এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"নচৈবং সুপ্তস্য পরেতাদবিশেষঃ সুপ্তস্যহি লিঙ্গ শরীরং সংস্কারাত্মনাত্রৈব বর্ত্ততে পরেতস্যতু লোকান্তরে ইতি বৈলক্ষণ্যাৎ। যদ্বা অন্তঃকরণস্য দ্বেশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিশ্চেতি। তত্র জ্ঞানশক্তিবিশিষ্টস্যান্তঃকরণস্য সুষুপ্তৌ বিনাশঃ, ন ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্টস্যেতি প্রাণাদ্যবস্থানমবিরুদ্ধং। "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণএবৈকধাভবতি অথৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্ণামভিঃ সহাপ্যেতি"। "সতাসোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিরুক্ত সুষুপ্তৌমানং"।

এইরূপ বলাতে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত তাদাত্ম্য আপত্তিটাও আসিতে পারে না, কারণ তাহার লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্মরূপে এই স্থূল শরীরের সংশ্রবে থাকে, মৃত ব্যক্তির তাহা নহে, কিন্তু লোকান্তরে এই বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আপত্তি—সুপ্ত ব্যক্তির লিঙ্গ শরীরটা কারণরূপে যদি স্থূল শরীরের সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ থাকে, তবে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সুপ্ত ব্যক্তির অপ্রতীয়মান শ্বাসাদি ক্রিয়াগুলির ভ্রান্তি হয়, তদ্রূপ অপরাপর হস্তপদাদি ক্রিয়ারও তাহা হইতে পারে (এই আপত্তিটাকে যদ্বার অবরসও বলা যাইতে পারে)। সমাধান—পক্ষান্তরে অন্তঃকরণের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে দুই শক্তি। সুষুপ্তিতে জ্ঞানবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অংশ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অংশ নহে; সুতরাং প্রাণাদি সঞ্চারে কোন বিরোধ রহিল না। এই আদি পদটা দ্বারা নাড়ী সঞ্চারের গ্রহণ।

"যখন এই জীব সুষুপ্ত হয়, তখন কোন স্বপ্ন দেখে না অর্থাৎ শুভ বা অশুভ কোন বাসনা বিলাস অনুভব করে না। কিন্তু প্রাণের সহিত একাকার হইয়া যায়। বাগিন্দ্রিয় ও ঐ সকল নামের সহিত প্রাণে লীন হয়।" (ইহা কৌষীতকী ব্রাহ্মণের শ্রুতি) "হে সৌম্য ঐ সুষুপ্তি সময়ে জীব সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্ব স্ব রূপেই সে লীন হইয়া থাকে।" (ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি) এই দুই শ্রুতিই উক্ত সুষুপ্তির প্রমাণস্বরূপ।

সুষুপ্তি সম্বন্ধে বেদান্ত-পরিভাষার মত দেখান গেল, এইক্ষণে বেদান্ত সূত্রের অনুসন্ধান করা যাইতেছে—

"তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনিচ॥"

৩য় অ, ২য় পা, ৭ সূত্র।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে জীব যে দেহাদির অভিমানে লিপ্ত ছিলেন, সুষুপ্তিতে তাহার

অভাব হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ অবস্থায় জীব সম্পূর্ণরূপে ঐ অভিমান পরিত্যাগ করেন; কেন না এই বিষয়ে "আসুতদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি নাড়ীভ্যঃ প্রত্যবসৃত্য পুরীততি শেতে পুরিততঃ প্রত্যবসৃত্য সতি শেতে সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে"। শ্রুতির প্রমাণ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সংসারে বিচরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া শরীররূপ নিজ পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নাড়ীতে যাইয়া শীঘ্র শুইয়া পড়েন এবং উহা হইতে নির্গত হইয়া পুরীতৎপর্য্যায়ক হৃৎপদ্মে শয়ন করেন। আর উহা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক তদধ্যুষিত পরব্রহ্মে গিয়া সষুপ্তি সুখ অনুভব করার সঙ্গেই তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন না যে, আমি পরব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। (কেন না তাদাত্ম্যভাবেরই এইরূপ মহিমা ভিন্নতামূলক কিছুই থাকে না।)

সুষুপ্তি অবস্থা নিরূপণের পরে জাগ্রৎ অবস্থা নিরূপিত হইতেছে—

"অতঃ প্রবোধো ঽস্মাৎ"

ঐ, ঐ, ৮ সূত্র।

সুষুপ্তি অবস্থার অবসান হইলে পর হৃৎপুণ্ডরীকস্থ অন্তর্যামী ব্রহ্ম হইতে জীব জাগ্রৎ অবস্থায় উপনীত হন।

কর্ম্মানুস্মৃত্যধিকরণ—

পূর্ব্বদিনের জীবই কি সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন অন্তঃকরণে হৃৎপুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্মে লীন হইয়া পরদিনে স্থূলাবস্থাপন্ন অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হন, অথবা পূর্ব্বদিনে সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ও তদীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মে লীন হওয়ায় পরদিনে অভিনব অন্তঃকরণের সহিত অভিনব জীব উৎপন্ন হয়? এই প্রকার সন্দেহে নির্ণয় করা যাইতেছে—

"স এব কর্ম্মানুস্মৃতি শব্দবিধিভ্যঃ"

ঐ, ঐ, ৯ সূত্র।

যে জীব পূর্ব্বদিনের সুষুপ্তি অবস্থায় হৃৎপুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল, সেই জীবই পরদিনের জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলান্তঃকরণে ব্যক্ত হয়। যেহেতু পূর্ব্বদিনে যে কার্য্যগুলি করা গিয়াছিল উহাদের স্মৃতি, "ত ইহ ব্যাঘ্রোবা সিংহোবা" ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ ও "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিবাক্য পাওয়া যায়। ফলতঃ সুষুপ্তির পরে অভিনব জীব মানিলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুগুলির স্মৃতি ব্যাপারটা উপপন্ন হওয়া অত্যন্ত কঠিন; কেন না অনুভব ও স্মৃতির এক কর্ত্তৃকত্বই দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অভিমত। এই নিত্য প্রলয়টা প্রায় প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির ঘটিতেছে—প্রায় প্রতিদিনই জীব কিছু সময়ের জন্ম সুখের সংসার হারাইতেছে। তথাপি অতি অল্প লোকেই বিবেকের আদেশ পালনে রত। পাঠকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন, যে স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া আমরা মুক্তির পথ হারাইয়া ফেলি ও এইজন্য দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি, সুষুপ্তিতে কি উহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে? ঐ অবস্থাতে কি উহাদের অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকেই আমরা হারাইয়া ফেলি না? বহির্মুখতাটা অনাদিকাল হইতে যে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে ইহা অতীব সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অন্তর্মুখতাকে কি দূরে ফেলিয়া রাখা উচিত? দিবা রাত্রির মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ও কি ইহার সহিত পরিচিত হইবার জন্ম দেওয়া বিধেয় নহে?

সুষুপ্তির সম্যক্ আলোচনা তত্ত্বজ্ঞান লাভের অন্যতম কারণ; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে বারম্বার ইহা আলোচিত হইয়াছে। আর এই সম্বন্ধে নবীন ঋষিদের নবীন মতটাকে আবিষ্কার করিয়া চলিলে যে, মহান

লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না তাহারইবা প্রমাণ কি? কেন না বহির্বিষয় লইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিলে মনটা যে, সুর-তটিনীর পূত নীরের ন্যায় অমল ধবল হইবে ইহা প্রমাণীত করা সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, কার্য্যের সময়ে তাঁহাদিগকে জ্ঞানীর অনুরূপ নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক হইতে কমই দেখিতে পাই। তবে ইহা সত্য যে, প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা এই পৃথিবীতে অতীব কম। আর কৃত্রিম জ্ঞানী সাজিয়া নিরীহ লোকদিগকে চেলা করা ওরফে বঞ্চিত করা অজ্ঞানেরই কার্য্য বিলাস।

এই নিত্য প্রলয়টার আদর্শেই অন্যান্য প্রলয়গুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কেন না ইহা সর্ব্বানুভূত সত্য। অপর প্রলয়গুলি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যে মানিয়া লইতে হয়। আবার শাস্ত্রকারদিগের এই সম্বন্ধে যে মতভেদ নাই তাহাও নহে।

প্রাকৃত প্রলয় সম্বন্ধে উক্ত পরিভাষাকার লিখিয়াছেন,—

"প্রাকৃত প্রলয়স্তু কার্য্যব্রহ্মবিনাশনিমিত্তকঃ সকল কার্য্যনাশঃ। যদাতু প্রাগেবোৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য কার্য্য ব্রহ্মণো ব্রহ্মাণ্ডাধিকারলক্ষণ প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তৌ বিদেহকৈবল্যাত্মিকা পরামুক্তিঃ তদা তল্লোকবাসিনামপ্যুৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাণাং ব্রহ্মণা-সহ বিদেহ কৈবল্যং।" "ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরং পদং" ইতি শ্রুতেঃ।

কার্য্য ব্রহ্মের অর্থাৎ প্রথম জীব-ব্রহ্মার বিনাশ হইলে যে নিখিল কার্য্যরূপ জগতের বিনাশ হইয়া থাকে তাহা প্রাকৃত প্রলয়। কিন্তু এই প্রলয়েরও বিশেষভাব আছে। যখন কার্য্যব্রহ্ম ঐ প্রলয়ের পূর্ব্বে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন এবং এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাররূপ তদীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে বিদেহ কৈবল্যরূপ পরামুক্তি লাভ হয়, তখন তল্লোকাধ্যুষিত ব্যক্তিরাও পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিদেহকৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। "প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হইলে যদি কার্য্য ব্রহ্মের মুক্তি হয়, তবে তদীয় লোকবাসী সকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারই সহিত পরম পদ (বিদেহমুক্তি) প্রাপ্ত হন এই শ্রুতি প্রমাণস্বরূপ এই বিষয়ে রহিয়াছে।

মুচ্যমান কার্য্য ব্রহ্মের সহিত তল্লোকবাসীর এইরূপ মুক্তিকে ক্রমমুক্তি বলা যাইতে পারে। ইহা একমাত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। আর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সগুণ ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অহংগ্রহোপাসকদিগের হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বেদান্ত সূত্রের প্রমাণ আছে, যথা—

"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং।" ৩য় অ, ৩য় পা, ৩১ সূত্র।

সগুণ ব্রহ্মের যে কোন অহংগ্রহোপাসক হউক না, তাহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতে কোন নিয়মের আড়ম্বর নাই অর্থাৎ সকল শ্রেণীর ঐ উপাসকদিগেরই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর ইহা বিরোধশূন্য (প্রামাণিক) ও বটে; কেন না শ্রুতি ও স্মৃতিতে এইরূপ বিধান আছে যে, যাঁহারা দহর, শাণ্ডিল্য, উপকোশল ও বৈশ্বানর প্রভৃতি অহংগ্রহোপাসনার সেবন করেন তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি হয়। সগুণব্রহ্মের অহংগ্রহ উপাসনাই যে কর্ত্তব্য এই বিষয়েও বেদান্ত সূত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়,—

ব্যতিহারাধিকরণ—

"ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ"

৩য় অ, ৩য় পা, ৩৭ সূত্র।

সগুণব্রহ্ম ও জীবের ব্যতিহার অর্থাৎ আমি সগুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম আমি, এইরূপ

পরস্পর অভিন্নভাবে ধ্যান করা বিধেয়, কেন না ত্বং ব্রহ্মাসি ও অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি বাক্যের ন্যায় "ত্বং বৈ অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে।

অহংগ্রহোপাসকদিগের ন্যায় যে, প্রতীক উপাসনাকারীদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ"। ৪র্থ অ, ৩য় পা, ২৫ সূত্র।

যাঁহারা প্রতীক উপাসক নহেন, কিন্তু অহংগ্রহোপাসক, তাঁহাদিগকেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহা বাদরায়ণের অর্থাৎ ব্যাস ঋষির মত; কেননা ঐ উভয় উপাসকদিগকেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় এইরূপ বলিলে দোষ হয়। দোষটা এই, অল্পায়াসসাধ্য প্রতীক উপাসনায় যদি ব্রহ্মলোক পাওয়া যায়, তবে বহু কষ্টসাধ্য অহংগ্রহোপাসনায় বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" অর্থাৎ মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ সংকল্প করে পরলোকে যাইয়া সেইরূপই হয় এই তৎক্রতুও একমাত্র অহংগ্রহোপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বুঝাইয়া দেয়।

আহার্য্য জ্ঞানপ্রসূত প্রতীক উপাসনা যে ব্রহ্মলোকে উপাসককে উপনীত করিতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে—"বিশেষঞ্চ দর্শয়তি।" ৪র্থ অ, ৩য় পা, ১৬ সূত্র।

"যে চারণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাসতে তে ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যন্তে" অর্থাৎ অরণ্যে যে বানপ্রস্থাশ্রমীরা শ্রদ্ধা সহকারে সত্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মলোকে যান, এই শ্রুতি সত্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদিগেরই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দেখাইতেছে, কিন্তু কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদিগের নহে। প্রতীক উপাসনা যে কল্পিত ব্রহ্মের তাহা "ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" সূত্র বুঝাইয়া দেয়। উহার অর্থ এই, সূর্য্য প্রভৃতি জড় বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে, কেন না অপকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট ভাবনায় ফলাধিক্য হয়।

প্রাকৃত প্রলয়ে যে, প্রকৃতি বা মায়াতে নিখিল কার্য্য জগতের লয় হইয়া থাকে তাহা পরিভাষাকার দেখাইতেছেন,—"এবং স্বলোকবাসিভিঃ সহ কার্য্যে ব্রহ্মণিমুচ্যমানে তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তি নিখিল লোক তদন্তর্ব্বর্ত্তি স্থাবরাদীনাং ভৌতিকানাং ভূতানাঞ্চ প্রকৃতৌ মায়ায়াঞ্চ লয়ঃ নতুব্রহ্মণি, বাধরূপ বিনাশস্যৈব ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃত ইত্যুচ্যতে॥"

এইরূপে নিজলোকাধ্যুষিত সকল জীবের সহিত কার্য্যব্রহ্ম যখন মুক্ত হন, তখন তাঁহার আশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তঃপাতী নিখিল পৃথিবী ও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থাবর জঙ্গম ভূত ভৌতিক যে সমস্ত জিনিষ আছে, ঐগুলির প্রকৃতি বা মায়াতে লয় হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। কেন না বাধরূপ বিনাশই পরব্রহ্মে হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, এইরূপ প্রলয়ের পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টিবিধান দেখিতে পাওয়া যায় এইজন্য প্রকৃতি বা মায়াতে প্রত্যেক জিনিষের পরিণতিরূপ লয় স্বীকার করাই সঙ্গত। কেন না ইহাতে অতি সূক্ষ্মরূপে সকল জিনিষই বর্ত্তমান থাকে। আর যদি পরব্রহ্মে বাধরূপ বিনাশ স্বীকার করা যায়, তবে কোন জিনিষেরই কোনরূপে অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং অকস্মাদ্ভূতিরূপ দোষ আসাতে পুনঃ সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যেরূপ "উৎপত্তিকালাবচ্ছিন্নো ঘটে। গন্ধবান্, শিখরাবচ্ছিন্নো মহীধরো বহ্নিমান্" প্রভৃতি স্থলে সাধ্যাভাববৎ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকত্বরূপ বাধ স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রলয়কালাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে সকল জিনিষের বাধ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে

নিখিল প্রপঞ্চের অত্যন্ত অভাবই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে সূক্ষ্মরূপে তদানীন্তন প্রপঞ্চসত্ত্ব স্বীকারটা অসম্ভব হইয়া যায়, কেন না কাহারও অত্যন্তাভাবাধিকরণে কোন প্রকারে প্রতিযোগিসত্ত্ব থাকিলে ঐ অধিকরণটাকে তাহার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বলিয়া জানা দার্শনিক যুক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং ভ্রান্তি। পক্ষান্তরে বেদান্তে অসৎকার্য্যবাদ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া কারণরূপে পরিণতিকেই কার্য্যের নাশ স্বীকার করা উচিত। এই স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যাঁহারা আম্বিক্ষিকী বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহাদের পক্ষে চিৎসুখী, অদ্বৈত সিদ্ধি, ভেদধিক্কার, বেদান্তমুক্তাবলী ও বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থের মর্ম্ম পরিগ্রহ এক প্রকার অসম্ভবই বটে। শঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শন না পড়িয়া একমাত্র ব্যাকরণের ভরসায় উহার আদ্যোপান্ত সকল অংশের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা তথৈবচ।

ঋগ্বেদে এই প্রাকৃত প্রলয়ের এমন সুন্দর বর্ণনা হইয়াছে যে, পাঠ মাত্রে সহৃদয় কৃতবিদ্য পাঠকের মন অপূর্ব্বভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সুতরাং কৃতবিদ্য পাঠকদিগকে এই ভাব উপহার দিবার জন্য উহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

> "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
> নাসীদ্রজো ন ব্যোমা পরো যৎ।
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্ম
> ন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥"

মণ্ডল ১০, সূক্ত ১২৯, মন্ত্র ১।

মহাপ্রলয়ে সংবস্তু পৃথিবী প্রভৃতি, অসৎ বস্তু নরবিষাণ প্রভৃতি, পরমাণু ও আকাশ আদি অপর কোন জিনিষ ছিল না। দুরধিগম্য অগাধ জলরাশিরও তদ্রূপ দশা, সুতরাং কোথায় কাহার ভোগ্যবস্তু আবরণ করিবে? (প্রকৃত প্রলয়কে মহাপ্রলয়ও বলা হইয়া থাকে।)

> "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
> তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥"

ঐ, ঐ, মন্ত্র ২।

ঐ সময়ে প্রাণীর জীবন, মৃত্যু ও দিবস রজনীর প্রকাশক চন্দ্রসূর্য্য ছিল না। মায়াশক্তির সহিত এক পরব্রহ্মই নিস্পন্দভাবে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

> "তম আসীত্তমসা গূড়হমগ্রেঽ
> প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
> তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসী-
> ত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥"

ঐ, ঐ, মন্ত্র ৩।

ঐ সময়ে মূলা প্রকৃতি মহামায়া ছিলেন এবং জলের দ্বারা তদভ্যন্তরস্থ জিনিষ যেরূপে আবৃত থাকে, তদ্রূপ উহা দ্বারা এইরূপভাবে এই নিখিল জগৎ আবৃত ছিল যে, উহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। আর তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত জগৎ ভবিষ্যতে তাঁহারই মহিমায় অবিভক্তরূপে (সূক্ষ্ম এক পিণ্ডাকারে) আবির্ভূত হইল।

> "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
> মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
> সতো বংধুমসতি নিরবিং দন্-
> হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।"

ঐ, ঐ, মন্ত্র ৪।

মন হইতে যে, প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হইল, উহা উৎপত্তির প্রাক্‌কালে সংকল্পরূপে বর্ত্তমান ছিল। বুধমণ্ডলী নিজ মনে বিচার পূর্ব্বক ঐ সংকল্পকে অনভিব্যক্ত মহামায়াতে জগৎ বন্ধনের হেতু বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

"তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত-
স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ।"
ঐ, ঐ, মন্ত্র ৫।

এই দৃশ্যমান জগতে কিরণরাশি বক্র ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নীচে কিরণ উপরে কিরণ। সকল বস্তুই পরমেশ্বরের সাররূপ ধারণ করাতে তাঁহার মহিমাস্বরূপে পরিণত—নীচে চন্দ্র উপরে সূর্য্য।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ-
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনে-
নাথা কো বেদ যত আবভূব॥"

কে জানে কাহা হইতে এই সৃষ্টি আবির্ভূত হইল! আর না জানিয়াইবা কে কহিতে পারে? সৃষ্টি অপেক্ষা অর্ব্বাচীন দেবতারাও জানেনা যে, অমুক বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত সো
অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"

যাঁহা হইতে এই সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ইহাকে ধারণ করেন কি না এবং ইহার অধিস্বামী পরমেশ্বর, ইহাকে জানেন কি না এই তত্ত্ব কে নিরূপণ করিতে পারে?

এই অমূল্য বেদমন্ত্র কয়টির অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া সমালোচনা করিতে এই ক্ষুদ্র লেখকের সাহস হইতেছে না; সুতরাং কৃতবিদ্য পাঠকগণ স্বয়ংই এই অভাবের পূরণ করিয়া লইবেন। পরন্তু ইহা ভুলিবেন না যে, এই মন্ত্রগুলির অর্থ ও মর্ম্ম অতি গভীর এবং একমাত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অধিগম্য। নিত্য ও প্রাকৃত প্রলয় নিরূপণ করা গেল, অগ্রিম প্রবন্ধে নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক প্রলয়ের কথা বলা যাইবে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

প্রাণায়াম ও মন্ত্রশক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রাণায়াম সম্বন্ধে আরও বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর—পৃথিবীতে মৃত্তিকা, জল, অনল ও বায়ু এই চারিটা পদার্থই অপর মলাক্ত পদার্থকে নির্ম্মল করে, উদ্ভিজ্জ-তেজ অম্লযোগে ও অনলদাহে নির্ম্মল হয়, কলঙ্কিত তৈজস পাত্র মৃত্তিকা ঘর্ষণে, মৃত্তিকাদিযুক্ত পাত্র জলদ্বারা প্রক্ষালনে এবং ধূলিযুক্ত পাত্র ফুৎকার মারুতে বা অন্যবিধ বায়ুর আঘাতে পরিষ্কৃত হয়, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়, কিন্তু এ সকল স্থূল মৃত্তিকা, জল, অনল বা বায়ু, শরীরাভ্যন্তর প্রবেশের অযোগ্য বিধায় পরিষ্কার করিতে পারে না, অথচ শরীরাভ্যন্তর পরিষ্কার দৈনন্দিন না করিলে অচির দিনেই লোক অকর্ম্মণ্য ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, এজন্য যোগবিজ্ঞানে বিজ্ঞ মহর্ষিগণ সূক্ষ্মরূপে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু শরীরের ভিতরে নিয়া পরিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিরা জানিতেন আকাশের সবিশেষ গুণ শব্দ, সেই কোন কোনও শব্দেতে সূক্ষ্মরূপে—শক্তিরূপে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু অবস্থিত আছে, সেই সেই শব্দবিশেষেরই নাম; বীজ মন্ত্র অর্থাৎ গুপ্তভাষণ, ইহা সাধা-

রণের জ্ঞানগম্য নহে, কেবল গুরুর নিকটে ভক্তিমান্ শিষ্যই উহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে।

যথা "লং" ইহার নাম পৃথিবী-বীজ বা মন্ত্র, ইহার নাম যে পৃথিবী-মন্ত্র, ইহা "কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচনের" মত নহে, বা "ভূয়ো" নাম নহে, সত্য সত্যই "লং" এই শব্দের ভিতরে মৃত্তিকার গুণ বা শক্তি আছে। এইরূপ জলবীজ, বহ্নিবীজ, বায়ুবীজ সম্বন্ধেও জানিবে। বহ্নিবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে মাঘ মাসের শীতেও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয়, ইহা স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিতে যে জিহ্বাগ্র দ্রুত কম্পিত হয়, তাহাতেই আভ্যন্তরীণ নিশ্চলাগ্নি প্রধ্মাপিত ও প্রকম্পিত হইয়া অগ্নির কার্য্য করে।

অতএব দেহাভ্যন্তরস্থিত দূষিত পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণু সমূহকে গুরূপদেশমার্গে পৃথিবী, বরুণ, বহ্নি ও বায়ুবীজ দ্বারা যথাক্রমে মাজিয়া, ধুইয়া, পুড়াইয়া ও উড়াইয়া দিতে হয়, তবেই ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সমস্ত নষ্ট হইয়া শরীর বিশোধিত হয়।

ইহাই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বলিয়াছেন, যথা—

"তথা নিরোধ সংযোগাদ্দেবতাত্রয় চিন্তনাৎ।
অগ্নের্ব্বায়োরপাং যোগাদাত্মাশুধ্যেত বৈ ত্রিভিঃ॥"

অর্থ—প্রাণায়ামানুষ্ঠান, তৎসহকৃত নাভিস্থানে সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা, হৃদয়ে রক্ষণশক্তিসম্পন্ন বিষ্ণু এবং সহস্রারে সংহারশক্তিসম্পন্ন রুদ্রের চিন্তা এবং তদানীং সেই সেই বীজমন্ত্র শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরে স্ফুরিত ক্ষিতি, অগ্নি, বায়ু ও জল, এই তিনের দ্বারা শরীর পরিশোধিত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণে কথিত আছে—

"নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততোজলং।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামৈর্ব্বিশুধ্যতি॥"

অর্থ—প্রাণবায়ুর যথারীতি নিরোধ করিলে হৃদয়াকাশচারী বায়ু উৎপন্ন হয়, এই বায়ু হইতে কুম্ভকে অগ্নি জন্মে, উক্ত অগ্নি হইতে ঘর্ম্মাদিরূপ জল উৎপন্ন হয়।* এই তিনের প্রক্রিয়া দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থিত ময়লা উঠিয়া যায়, তাহাতেই শরীর সংশোধিত—পরিষ্কৃত হয়।

এখন বুঝিতে পারিলে কেন প্রাণায়ামে শরীর সংশোধিত হয়? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ কেন নষ্ট হয়?

ফলতঃ যোগী যাজ্ঞবল্ক্য জেদ্ করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎকৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥"†

অর্থ—প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যথাবিধি সপ্ত মহাব্যাহৃতি ও প্রণবযোগে যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা, ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ কঠোর তপস্যা নাই। কাশীখণ্ডে আছে—

"প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাং প্রণবোযথা।"
২৭।৭১।

অর্থ—সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রণব শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার সমস্ত তপস্যার মধ্যে প্রাণায়মই শ্রেষ্ঠ।

ওহে যুবক! রুগ্ন বাপু! এখন বুঝিলেত পূর্ব্বে শারীরতত্ত্ববিৎ বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় ভীষটাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন—

"দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজ-দেবতা-গো-
গুর্ব্বর্চ্চনপ্রণতিভিশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
ইত্যুক্ত পুণ্যনিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ,
প্রাক্পাপজা যদিরুজঃ প্রশমং প্রযান্তি॥"

* "আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" ইতি শ্রুতি।

† প্রাণায়াম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বচন "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

অর্থ—যদি এই দেহে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত কর্ম্মফলে দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে, তবে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, প্রাণিগণে দয়া, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গাভী এবং গুরুদেবের অর্চ্চনা ও প্রণাম এবং কঠোর তপস্যা অর্থাৎ যথাশাস্ত্র গুরূপদেশমার্গে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম দ্বারা সেই অসাধ্য ব্যাধিও প্রশমিত হয়, অন্য রোগেরত কথাই নাই, তাহাত অল্প সময়ের মধ্যে অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠান করিলেই নিবৃত্তি হইয়া যায়।

তাহাই মহাযোগী ঘেরণ্ড বলিয়াছেন—
"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়ত্তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়োভবেৎ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কাশ্বাসশ্চকাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ॥
জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

অর্থ—পূর্ব্বকথিত প্রাণায়াম যদি গুরুর উপদেশ অনুসারে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা যায়, পরে প্রাণাদি বায়ুকে যথা ইচ্ছা তথায়—হয় পাদাগ্রে নয় মস্তকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়, এবং সমুচিতরূপে অভ্যস্ত প্রাণায়ামে সকল রোগই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যদি অনুচিতভাবে অর্থাৎ যেন খামখেয়ালি, যে দিন ইচ্ছা করা গেল, দুই দিন করা গেল না, এক দিন সকালে, এক দিন বিকালে, এক দিন অল্প মাত্রায়, এক দিন অধিক মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে বায়ুর ব্যতিক্রমে হিক্কারোগ, শ্বাসকাস, শিরঃশূল, কর্ণশূল, চক্ষুরোগ ইত্যাদি সকল রোগই হইতে পারে।

এইজন্যই ব্রাহ্মণগণ বালক অবস্থাতে আট বৎসর বয়সেই উপনয়নের পরে পুত্রাদিকে প্রাণায়াম অভ্যাস করাইয়া থাকে, প্রাণায়ামটা এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যায়াম। বালক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কোমল থাকিতে থাকিতে যেমন সুবিধা, পরে তত সুবিধা নহে।

দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবে, লোকে মেষের ঘুষাঘুসি ক্রীড়া করে, ঐ ক্রীড়াপটু মেষকে শিশু অবস্থায় হাঁটুর উপরে শোয়াইয়া আস্তে আস্তে শ্লথমুষ্টিতে উহার ঘাড়ে প্রহার করে—কিলায়, এরূপ কিলাইয়া কিলাইয়া দুই তিন মাস পরে ছোট মুগুর দ্বারা আঘাত করে, আবার দুই তিন মাস পরে তদপেক্ষায় ভারি মুগুর দিয়া সকাল বিকাল আঘাত করিতে থাকে, আবার কিছু দিন পরে পাঁচ সাত সের ওজনের মুগুর দ্বারা নির্ঘাতরূপে পিটাইতে থাকে, ক্রমে পিটান সহ্য হয়, তখন মেষের ঘাড় বজ্রসারবৎ সুদৃঢ় হয়, এমন কি পাষাণ ঘুষাইয়া দ্বিখণ্ড করে, ঘাড়ের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

মানবের দেহমধ্যে হৃৎপিণ্ড—ফুস্ফুসই প্রধান রক্তকারক যন্ত্র, এই হৃৎপিণ্ডটাকে বিশুদ্ধ দৃঢ় করিবার একমাত্র প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট উপায়, মেষগ্রীবা যেমন ক্রমে ক্রমে আঘাতে আঘাতে লৌহ সদৃশ সুদৃঢ় হয়, তেমনি বালকাবস্থা হইতে প্রাণায়ামের বায়ুর আঘাতে হৃৎপিণ্ড স্ফীত ও (প্রথমে মৃদুমাত্রায় পরে মধ্য মাত্রায়, শেষে তীব্র মাত্রায়) সুদৃঢ় হয়, হৃৎপিণ্ডের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষঃস্থলও স্ফীত হইয়া উঠে এবং হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে প্রবিষ্ট শ্লেষ্মা, দূষিত বায়ু ও দূষিত পরমাণু সমস্তকেই প্রাণায়ামের পূরক কুম্ভক বায়ু হৃৎপিণ্ড হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ইন্দ্রিয় পথে রোমচ্ছিদ্রে পরে বিরেচিত বায়ুর সঙ্গে বাহির করিয়া দেয়, তখন মনুষ্য নির্ব্যাধি দেবশরীর হয়।

ফলকথা শরীর শোধনের নিমিত্ত বৈদ্যের ঔষধ, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ একদিকে, আর সুধু সমুচিত প্রাণায়াম এক দিকে, ইহা ত্রিসত্য বলিতে পারি। ইহার

সত্যতা উপলব্ধি অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

মহাভারতে উক্ত আছে—

"শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণং॥
তেষামন্ততমোদ্রেকে বিধান মুপদিশ্যতে।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে॥"

(শান্তি-রাজ ১৬।১১—১২)

অর্থ—শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটা শরীরের উপকারক, এই গুণদায়ক পদার্থ তিনটা সমানভাগে থাকাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই তিনের মধ্যে একটা যদি উদ্রিক্ত অর্থাৎ সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া বাড়িয়া উঠে, তখনই শরীর অসুস্থ হইবে এবং তখন সমতা বিধানার্থ কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সেই উপায় মোটামুটি বুঝিতে হইলে, বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঔষধ আর সূক্ষ্মরূপে ধরিলে প্রাণায়াম বুঝিতে হইবে, কেন না, উষ্ণ বহ্নিবীজের প্রক্রিয়ায় শ্লেষ্মা এবং শীত নিবৃত্তি হয়, এবং বরুণ বীজ দ্বারা উষ্ণ পিত্ত এবং শারীরিক উত্তাপ নিবৃত্তি হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন যোগশাস্ত্রেও ইহার ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

তোমায় চিকিৎসক বলিয়াছে যে "তুমি 'ওয়াল্টিয়ারে' বা মধুপুর পাহাড়ে যাইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন কর" কি আশ্চর্য্য! বল দেখি এরূপে বায়ু পরিবর্ত্তন কয়জনের হইতে পারে? স্বাস্থ্যভঙ্গ কেবল বাছিয়া বাছিয়া কি রাজা, জমিদারের হয়? না দরিদ্রেরও হইয়া থাকে? তবে কি গরিব বেচারারা মরিয়া যাইবে? আর বড়লোকগুলি মার্কণ্ডেয় হইয়া থাকিবে? কৈ তাওত বড় একটা সুবিধা দেখিতে পাই না, অনেক বড়লোকইত স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া এদেশে ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোন্ দেশে যাইয়া কে কতগুলি স্বাস্থ্য পকেটে করিয়া আনিতে পারিয়াছে? স্বাস্থ্য কি একটা গাছের ফল?

"বায়ু পরিবর্ত্তন" কথাটা মিথ্যা নহে, কিন্তু তোমরা বায়ু পরিবর্ত্তন—বুঝ এদেশের বাতাস ছাড়িয়া অন্য দেশের বাতাস সংগ্রহ করা। আমরা কিন্তু শাস্ত্রের দাস, আমরা "বায়ু পরিবর্ত্তন" বুঝি কি? না যখন দেখিব যে তিথিতে যে সময়ে যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহ চলা উচিত, সেই তিথিতে সেই সময়ে সেই নাসায় বায়ু প্রবাহ না চলিলেই বুঝিলাম দৈহিক বায়ু ব্যতিক্রমে বহিতেছে, অচিরে আমাকে রোগে অভিভূত করিবে, অতএব এই বিপরীত ভাবাপন্ন বায়ুকে পরিবর্ত্তন করিয়া—উল্টাইয়া যথাযুক্ত ভাবে প্রবাহিত করান, ইহাই বায়ু পরিবর্ত্তন, ইহাই যোগিবর নাগভট্ট ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় গ্রন্থে বলিয়াছেন, যথা—

"আরভ্য শুক্লাৎ প্রথমামুদেতি
বামে পুটে ত্রীণিদিনানি দেবঃ।
পুটে দক্ষিণে ত্রীণি বামে তু পশ্চা-
দেবং ক্রমেনৈব বহেৎ সমীরঃ॥
একস্য পক্ষস্য ব্যতিক্রমেণ
রোগভিভূতিং বদতীতি প্রাণঃ॥"

অর্থ—সুস্থ শরীরে শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার সময় বিশেষে বাম নাসায় বায়ু প্রবাহিত হইবে, তৎপরে চতুর্থী পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিথিতে দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত হইবে, পুনর্ব্বার সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে বাম নাসায় প্রবাহিত হইবে,* এইক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে শ্বাস প্রশ্বাস রীতিমত প্রবাহিত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আমার কোনও রোগ বা শোকাদি উপস্থিত হইবে না, আর যদি এক পক্ষকাল তিথি অনুসারে যথারীতি বায়ু প্রবাহ না চলে, তবে নিশ্চয়ই

* এস্থলে শাস্ত্রের আদেশে সময়টা গোপনে রাখিলাম, প্রকাশ করিয়া লিখিলাম না।

বুঝিতে হইবে যে আমার রোগ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিয়া যথারীতি প্রবাহিত করিবার জন্ত গুরুর উপদেশানুসারে চেষ্টা করিয়া বিপরীত প্রবাহ ফিরাইবে। ইহাকেই বায়ু পরিবর্ত্তন শাস্ত্রে বলে।

অতএব আমার বিবেচনায় যদি তুমি যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা যদি দৈহিক বায়ুর পরিবর্ত্তনরূপ তপস্তা করিতে পার, তবে নিশ্চয় কেবল বায়ু প্রক্রিয়াতেই বাতপিত্ত ও শ্লেম্মার বৈষম্যভাব কাটিয়া যাইয়া তুমি নীরোগ হইতে পারিবে।

আরও বলি শ্রবণ কর—সুস্থ দেহের নিয়ম এই যে, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ যাবৎ একুশ হাজার নিঃশ্বাস (২১০০০) ও একুশ হাজার (২১০০০) উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়।* প্রাণবায়ু যত উপার্জ্জিত, ততই ব্যয়িত, সুতরাং তহবিল শূন্য। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"একুশ হাজার ছয়শ জমা, কোম্পানীতে মালগুজারি"। যদি কেহ গুরুর উপদেশানুসারে একুশ হাজার প্রাণ (নিঃশ্বাস) উপার্জ্জন করিয়া কৌশল পূর্ব্বক একুশ হাজার উচ্ছ্বাসের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে এক দুই তিন চার পাঁচ বা ছয় শত নিশ্বাস ব্যয় না করিয়া প্রত্যহ তহবিলে জমা রাখিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মনে কর এক বৎসরে কত প্রাণ সঞ্চিত হইয়া যায়, এই নিয়মে সে কত দীর্ঘজিবী হইতে পারে?

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজের ষোল বৎসর পরমায়ুকে বাড়াইয়া বত্রিশ বৎসর করিয়াছিলেন ইহা কে না জানে? এবং মার্কণ্ডেয়াদি ঋষির কথা আর কি বলিব? অতএব নিশ্চয় জানিবে যে, তাঁহাদেরও আয়ুবৃদ্ধির মূল কারণও প্রাণায়ামরূপ মহা তপস্তা।

মনে কর—এক বড়লোক, শিশুকাঠও উত্তম লোহার কজা দ্বারা একখানা নিখুঁৎ গাড়ী প্রস্তুত করাইল, এবং মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল এই গাড়ীখানা কতদিন টিকিবে? মিস্ত্রী বলিল—যদি প্রত্যহ কল কজাগুলি মাজিয়া ঘসিয়া সযত্নে রাখেন এবং প্রত্যহ দশটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত চালান, তবে নিশ্চয়ই দুইবৎসর বেশ চলিবে, তিন বৎসরের সময় মরিচা ধরিবে, তবুও আরও দুই বৎসর চলিবে, পরে গাড়ীখানা আর চলিবে না ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

বাবু মিস্ত্রীর কথা ভুলিয়া গেলেন, কল কজা পরিষ্কার রাখিতেন না, মরিচা ধরিল। আর এক প্রাতঃকাল হইতে অপর প্রাতঃকাল যাবৎ "কালীঘাটের ছেকড়া গাড়ী" উপাধি লাভ করিয়া এক বৎসরের সময় বাবুর শখের গাড়ী পঞ্চত্ব পাইল।

বাবু যে অবশ্যই দুঃখিত হইলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাবু মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মিস্ত্রী! গাড়ী ত এক বৎসরেই ভাঙ্গিয়া গেল, কৈ পাঁচ বৎসর ত গেল না। মিস্ত্রী কহিল—বাবু! আমার কথা মিথ্যা হয় নাই, খুঁতিয়া হিসাব করিলে বুঝিতে পারেন যে পাঁচ বৎসরের বেশীই গাড়ী চলিয়াছে, কেন না, দেখুন—আমি বলিয়াছিলাম দশটা হইতে ছটার কথা। মনে করুন এই আটঘণ্টা চালাইলে, কথার কথা ধরিয়া লউন যেন গাড়ীর চাকাকটা পঞ্চাশ হাজার বার আবর্ত্তিত হইত—ঘূরিত, কিন্তু আপনি আটঘণ্টা স্থলে চব্বিশ ঘণ্টা চাকাগুলিকে ঘুরাইলেন, এক দিনেই তিন দিনের আয়ু ক্ষয় হইয়া গেল, এই হিসাবে দুই বৎসরেই ছয় বৎসরের চাকার ঘুরানের কাজ হইয়া গেল সুতরাং গাড়ীর কি অপরাধ? তখন বাবু বুঝিলেন কথা ঠিক।

এইরূপ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও তাই বুঝিবে, যদি নিয়মিত একুশ হাজার ছয়শত

---

* ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিং।
অজপানাম গায়ত্রীং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥

নিঃশ্বাস হইতে প্রত্যহ আহার বিহারাদির দোষে অধিক ব্যয় হইয়া যায়, তবেই আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া গেল বুঝিবে, আর অধিক ব্যয় না হইলেই আয়ু জমা রহিয়া গেল বুঝিবে।

মানবের ললাটে সত্য সত্যই বিধাতাপুরুষ আসিয়া জন্মের ষষ্ঠাহে "এত দিন তুমি বাঁচিবে" এরূপ লিখিয়া যায় না, কিন্তু পিতা মাতার যে অবস্থায় যে উপাদানে যেমন সময় যে ভাবে গর্ভাশয়ে শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই শরীরে কতগুলি নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসরূপ বায়ু প্রবাহিত হইবে ইহাই নির্দ্দিষ্ট থাকে, এই নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসের হিসাব সূক্ষ্ম বিধায়—জ্যোতিঃশাস্ত্রে জন্ম লগ্নে তিথি ও নক্ষত্রাদি অনুসারে দিন পক্ষ মাস ঋতু অয়ন ও বৎসররূপে আয়ুঃ নির্ণয় করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রান্তরে বলিয়াছে—

"বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ব্বায়ুর্ধাতা শরীরিণা।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং প্রভুর্ব্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থ—প্রাণিগণের নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসরূপ বায়ুই আয়ু জানিবে, এবং বলও বায়ু, শরীর-টাকে বায়ুতেই ধরিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বায়ুময়, অতএব বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

মায়াপুরী হরিদ্বার দর্শনে।

(১)

অভ্রভেদী হিমাদ্রির গোমুখী-নির্ঝরে
লভিয়া জনম, না—না শ্রীহরির পদে—
পবিত্র শীতল শুভ্র জাহ্নবীর জল,
অনাদি-সময় হ'তে কুলু কুলু স্বরে
উলটি পালটি মৃদু চঞ্চল গতিতে,
বহি যায় মায়াপুরী এই হরিদ্বারে।
তরুণ অরুণ কিম্বা মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
সায়াহ্নে রঞ্জিত ভানু নেত্র-প্রীতিকর
ঢালেরে কিরণজাল যখন সাদরে
গঙ্গার উপরে, মরি! অতি মনোহর
লোহিত স্ফটীকময় তরঙ্গ নিচয়
পবন-হিল্লোল উঠি তাঁর বক্ষোদেশে
জুড়ায় নয়ন মন জীবন আমার।
ছোট বড় ঢেউগুলি আগু পিছু হ'য়ে
পড়িয়া এ ওর গায়ে কেমন খেলায়!
সুধুই আনন্দভরে এই স্রোতস্বিনী
হেলায়ে দুলায়ে বপু চলিয়া না যায়
শীতল মারুত-স্পর্শে; ওই বন-লতা
শ্যামল-রক্তিম-পীত পল্লব-শোভিতা
দুলে পড়ে তরু হ'তে আলিঙ্গন দিতে
পবন-দেবেরে কিবা! তা'দেখি আমরি
সুগন্ধি-কুসুম-গুচ্ছ কুঞ্জেতে কুঞ্জেতে
হাসিছে তুলিয়া মাথা, কভু হেঁট হ'য়ে,
চুমিয়া লতার আগে প্রাণের সখারে।
পবনের এ গৌরব হেরি তরুবর
সোহাগে তুলে না আর সরলা বল্লরী;
ছেড়ে যায় অলি-কুল ফুল্ল-ফুল-রাজি
অভিমান করি; তরল স্বভাবে কিন্তু
আসি পুনরায়, গুঞ্জরিয়া মনোব্যথা
কহিয়া ফুলেরে, প্রত্যাখ্যানে সমাদর
লভিয়া তখন, আবার বিহরে সুখে
প্রসূন উপর। অলি, তরু, বায়ু তিনে
লইয়া গৌরব, যদিও ঘটেছে বটে
চিত্ত-অকৌশল, তথাপি মধুর বায়ু
বহি নিরন্তর, সুশীতল করিতেছে

মম অন্তস্তল। মধুময়-পবনের
সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে, সুস্নাত হইয়া এই
পবিত্র-সলিলে, ধীরি ধীরি মিশাইয়া
প্রাণ-বায়ু সহ নূতন জীবন দেয়
এখানে আমারে!

(২)

ধূসর-জলদ-রাশি
প্রকাশি' আকাশে, উড়িয়া বাতাসে সবে
মিশিয়া রে শেষে, সুনীল বিরাট-মূর্ত্তি
ধরি' রহে স্থির, উচ্চ-শৃঙ্গাবলী যথা
তুলি' স্তরে স্তরে;—চূড়াময় হিমালয়
দেখিতে তেমতি, পড়িল নয়নে মোর
এই স্থল হ'তে। মহাশৃঙ্গগুলি তার
তুষার-মণ্ডিত, হীরক-মুকুট যেন
শোভে রাজ-শিরে! কিম্বা গিরি-রাজ বুঝি
তপে মগ্ন সদা, শিব-যোগ-ভূমি-আশে,
শ্বেত ভস্মে মাখা। কটি-তটে আচ্ছাদন
শ্যাম-বন-রেখা। শিলায় উৎক্ষিপ্ত-গতি
গিরি-অঙ্গে স্রোতস্বতী, ফেন-পুঞ্জে শুভ্র
অতি,—উত্তরীয় প্রায়। চন্দন বৃক্ষের
ছলে, যাহে ফণি-মণি ঝলে, ঢাকা তনু
পিঙ্গল জটায়। জ্যোতির্লতা ল'য়ে করে,
মঙ্গল আরতি করে, ভবানী ভবেশে
ওই সুদূর-অম্বরে; মরি কি মধুর
হয়, ঘণ্টা-ধ্বনি সে সময়, সমীরণে
গুহার ভিতরে!

(৩)

সৌন্দর্য্য-সম্ভার আরো
সে দিব্য-অচলে, প্রাণ বিমোহন করে
রহি' থরে থরে!—মন্দার কুসুম কত,
পারিজাত শত শত, ফুটিয়া রহে'ছে
মরি! সেই গিরি-দেশে; দিগঙ্গনা পরি'
অঙ্গে, আমোদিত করে গন্ধে, মন হরে-
হাসিয়া হাসিয়া। প্রফুল্লিত বন-লতা
সোনালি-রূপালি-পাতা, শ্যামল-পল্লবে
কায়ে জুড়ায় নয়ন; পাখির সরস-
তান, ঝরণার মিষ্ট-গান, মধুকর-
গুঞ্জরণ মুকুলে মুকুলে,—অবিরাম
ঢালে সুধা শ্রবণ-বিবরে। সুস্বাদু সে
ফলগুলি, গাছে গাছে রহি' ঝুলি, জ্ঞাত
করে কত তরুর বিনয়; শিলা-তলে,
কভু জলে, কপোত কপোতী মিলে, কেলি
করে মুখে মুখ দিয়া; ময়ূর ময়ূরী
সনে, চাহি' কাল-মেঘ পানে, নেচে বন
আলো করে পেখম ধরিয়া! কুরঙ্গিনী
ছুটে যায়, হরিণ পশ্চাতে ধায়, মৃগ-
শিশু ভয়হীন চরিয়া বেড়ায়, কাছে
থাকি' চিত্রসার কিছু নাহি কয়। হিংসা,
দ্বেষ, নাহি মিছে, তাপস-আশ্রম পাশে,
এ হেন সদ্ভাব তাই দেখিবে সেথায়।
দেব-কন্যা ঋষি-বালা, পরমা সরলা
তারা, ভক্তি-প্রেমে আত্মহারা, পূজা করে
মন্দাকিনী-তীরে—গড়িয়া মৃণ্ময়-শিব—
"বব বম্" বলে'।

(৪)

ঋষিগণ সাম-গানে
মাতাইছে গিরি-বনে,—লহরী উঠিয়া
তার সুদূর-গগণে, গলায় "ধবল"
গিরি কঠিন তুহিনে! মহাযোগী যোগা-
সনে, নিমগন থাকি' ধ্যানে, পরমাত্মা
দরশনে বিভোর সদাই! বেদ-মন্ত্র
পাঠে সদা, হোমাগ্নি জ্বালায়ে সেথা, মুনি-
গণ মহেশের মহিমা প্রচারে। সিদ্ধ
মুক্ত ভক্তজন, দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ,
প্রেমে মগ্ন অনুক্ষণ, হরিগুণ-গানে।
গন্ধর্ব্ব-কুমারী যারা, ল'য়ে বীণা সপ্ত-
স্বরা, সুস্বর মিলায়ে তারা হরি-নাম
গায়;—দেখি' শুনি' এ সকল, ভুলে যায়
সংসারী সংসার। সঁপি চিত্ত নারায়ণে,

পড়ে তাঁর শ্রীচরণে, জীবের শরণ
তিনি হন্ যে অন্তিমে ;—এখানে আসিলে
পার, বিভুর সে পদাশ্রয়, এ "মায়ার"
নাম তাই হরিদ্বার হয়।

(৫)

মুক্তি-পুরী

এই মায়া, গোপনে ঢাকিয়ে কায়া, কত
কাল ছিল আহা! বৌদ্ধ-অভ্যুদয়ে ; হয়
পুনঃ সুপ্রকাশ, হইতে ভারতাকাশ
শঙ্কর-পবনে মেঘ—"বৌদ্ধের বিহার"
উড়ে যায় যবে চীন, তিব্বত, তাতার।
পরম-অদ্বৈতবাদ করিয়া প্রচার,
বৌদ্ধ-অনুকল্পে মঠ করিয়া বিস্তার,
করে যবে সমুদ্ধার শঙ্করাবতার
আর্য্য-ধর্ম্ম, তীর্থ-রাজি ভারতে আবার ;
তখন হইতে কোটী সাধকের দল,
তেয়াগি' সংসার যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণে
থাকেন পর্ব্বত-গুহা, নিভৃত আশ্রমে,
পুরাকাল-প্রবর্ত্তিত "কুম্ভের মেলায়"
দেব-তরঙ্গিনী-তীরে আসিয়া এখানে,
মহা-স্নানে দরশন দিয়া রে গৃহীরে
জাগায় হৃদয়ে আর্য্য-ধর্ম্ম-সুবিমল।—
সহস্র বিপ্লবে আজ (ও) রহে যে অটল।

(৬)

আঁখি-ঘোর ভাঙ্গি' মোর চৈতন্য-উদয়
অবগাহি' পূত-বারি জাহ্নবীর স্রোতে,
সুপবিত্র করি দেহ, হৃদয়-মন্দিরে
বসাইয়া ইষ্ট-দেব-সুকোমল-জ্যোতিঃ,
পূজি তাঁর পা দু'খানি বীজ-মন্ত্র দিয়ে।
"বিষ্ণু-ঘাটে" পিতৃ-লোক করিয়া তর্পণ,
বন্দিলাম ভাগীরথী বসি' কর-যোড়ে।

(৭)

"অনন্ত-আকাশে ঊর্দ্ধে নেত্র-অগোচর
কোন স্থান হ'তে মাগো! বহি' নিরন্তর—
রজতের পাতাখানি দেখিতে সুন্দর—
পড়িছ শৈলের গায়ে না ধরি' ভূধর?
রজতের রেণু তোর সে উচ্চ-পতনে
উড়িয়া উড়িয়া মোর পড়িছে নয়নে।
নিরানন্দে ; তুমি মাগো শূন্যেতে রয়েছ,
তাই মা "আকাশ-গঙ্গা" নামটি পেয়েছ।
হরিপদ-সুধাস্রবে তোমার উদ্ভব—
শুনেছি, ভেবেছি তাহা তোমাতে সম্ভব ;
নহিলে বাইতে ওমা! পীতাম্বর-পুরী
তরল-তরঙ্গে তোর গাঁথা কেন সিঁড়ি?
শোভিতেছ বৈজয়ন্তী দেখায়ে সে পথ—
জ্ঞান কর্ম্ম যোগে লোকে না পায় যে পথ।
পশিলে সলিলে তোরে দূর হ'তে ডাকি'
সপ্ত লোকে দেয় মাগো! সর্ব্বপাপে ফাঁকি!
যদি না জনম তোর অচ্যুত-চরণে,
অমল-ধবল জল, মোক্ষদা কেমনে?
আছে এই শ্রুতি মাগো! দেব-লোকে খ্যাত
শিবের বিশুদ্ধ-বীর্য্যে তুমি যে সংবৃত।
তোমাতে গো তিন অগ্নি বিরাজে সতত,
তাই মা! বিদগ্ধ করে পাপ-পুঞ্জ এত।
ভূতল পাতাল স্বর্গে আছে তীর্থ যত,
তব জলে সে সকল হয় অবস্থিত।
মধু-পয়স্বিনি! সিদ্ধি-লক্ষ্মী-প্রদায়িনি!
অতি-পুণ্য-প্রবাহিনি! একা পুরাতনি!
করে যে অজ্ঞানে জ্ঞানে আশ্রয় মা তো'কে
ব্রহ্ম-কান্তা! ব্রহ্মলোকে লয়ে যাও তাকে।
সামান্যা নদী যে তুমি নও গো জননি!
ত্রিলোক উদ্ধার কর ত্রিপথ-গামিনি!
স্বয়ম্ শঙ্কর আহা! বলে হৃষীকেশে,
শ্রীশৈলে অগস্ত্যে পুনঃ স্কন্দ বলে হেসে,—
"গঙ্গাই সকল তীর্থ গঙ্গা তপোবন,
সিদ্ধি-ক্ষেত্র হয় গঙ্গা, গঙ্গাই সাধন।"

(৮)

থাক গঙ্গা পুরোভাগে, থাক গো পশ্চাতে,
থাক মা! দক্ষিণে বামে, থাক ঊর্দ্ধে অধে,
করি আমি নমস্কার তোরে বার বার,
দয়া করি' কোরো পার ভব-পারাবার।
জানিব মাহাত্ম্য গঙ্গে! এইবারে তোর,
যাতায়াত নিবারিতে পার যদি মোর।
নিজগুণে পুণ্যবান্ তরে এ সংসার,
কলুষ "পূর্ণ"কে হবে করিতে যে পার?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

SOVABAZAR RAJBATI.
106/1, GREY STREET,
The 19th August, 1909.

AN APPEAL FOR SUBSCRIPTION.

N. N. Ghose Memorial Fund.

At a Memorial Meeting held in honour of the late Mr. N. N. Ghose, Principal, Metropolitan Institution, Fellow, Calcutta University, Honorary Presidency Magistrate, and Editor, Indian Nation at the Star Theatre in Cornwallis Street on Monday the 16th instant at which the undersigned presided over a large representative and distinguished gathering of Indian and Europeans, Hindus, Mahammedans, Christians and Parsis, among others the following resolution was unanimously passed :—

That this meeting thinks it desireable that a portrait in oils of Mr. N. N. Ghose to be executed by some well-known artist should be put up in the Town Hall, and a medal or scholarship should be founded to commomerate his services and that for this purpose subscriptions be invited and that these be made payable to Raja Binaya Krishna Deb, 106-1 Grey Street, proposed by Babu Bhupendra Nath Bosu M.A., B.L., seconded by the Hon'ble Mr. W. C. Macpherson C. S. I., supported by the Rev. J. Lamb, the Principal, Scottish Church College and MR. R. H. M. RUSTOMJEE.

To give effect to the above resolution and thus suitably to commomerate the services of one whose public life as a man of letters, as an educationist, a sober journalist, a philanthrophist, a Municipal Commissioner, and an Honorary Magistrate bore impresses of great intellectual powers coupled with unswerving devotion to duty and manliness of character wedded to sincerity and desire to serve his country, subscriptions are invited.

May I hope you will come forward generously to aid the above movement.

Binaya Krishna Deb.

N. N. GHOSE MEMORIAL FUND.

LIST OF SUBSCRIBERS.

His Honor the Lieutenant Governor of Bengal Rs. 100, the Hon'ble Maharaja-Adhiraj Sir Bijoy Chand Mahatap Bahadur of Burdwan K. C. I. E., Rs. 251, Maharaja Rameswar Singh Bahadur of Darbhanga Rs. 100, H. H. the Maharaja of Tippera Rs. 160, Maharaja Manindra Chandra Nandy Rs. 100, H. H. the Maharaja of Mayurbhanja Rs. 50, Raja Peary Mohan Mukerjee C. S. I. Rs. 50, Raja Gopendra Krishna Deb Bahadur R. 10, Raja Ban Behari Kapur Bahadur Rs. 10, Raja Ranajit Singh Bahadur of Nashipur Rs. 30, Raja Jogindra Kishore Rai Chaudhury Rs. 10, Maharaj-Kumar Hrishikesh Law Rs. 50, Maharaj-Kumar Sailendra Krishna Deb Bahadur Rs. 16, Maharaj-Kumar Banwary Ananda Deb Bahadur Rs. 30, Kumar Manmatha Nath Mitra Rai Bahadur Rs. 100, Kumar Sarat Chandra Singh Bahadur of Paikpara Rs. 50, Sir Gooroo Das Banerjee KT. Rs. 10, the Hon'ble W. C. Macpherson, I. C. S, C. S. I. Rs. 25, the Hon'ble Mr. F. W. Duke I. C. S. Rs. 32, the Hon'ble Mr. M. G. Cumming I. C. S. Rs. 25, the Hon'ble Mr. R. T. Greer, I. C. S., C. S. I. Rs. 16, the Hon'ble Ray Kisory Lal Goswamy Bahadur Rs. 25, Babu Prafulla Nath Tagore Rs. 100, Dr. Rash Behari Ghose M. A., D. L., C. S. I, Rs. 51, Rai Jatindra Nath Chaudhuri M. A. B. L. Rs. 50, Babu Kiran Chandra Ray of Narail Rs. 25, Rai Dr. Chuni Lal Bose Bahadur M. B. Rs. 16, Babu Gopendra Lal Dey B. A. Rs. 25, Dr. D. N. Ray, M. D. Rs. 10, Mr. B. C. Mitra, M. A., C. S. District and Sessions Judge Rs. 16, A Friend (through Rai Mati Lal Haldar Bahadur, B. L.) Rs. 10, Rai Bahadur Shewprasad Jhoojhoonwala Rs. 16, Rai Jadu Nath Mozoomdar Bahadur Rs. 10, Babu Rajendra Nath Mitra Rs. 10, Babu Ambika Charan Law Rs. 10, Babu Jogendra Nath Mookerjee M. A. B. L. Rs. 10, Mr. J. R. Banerjee M. A. Rs. 10, Babu Taran Krishna Deb Rs. 10, Babu Satish Chandra Pal Chaudhury Rs. 10, Babu Chandra Sikhar Kar, Deputy Magistrate, Kalna Rs. 10, Mr. S. Sinha, Allahabad Rs. 15, Babu Gyanendra Narain Datta Rs. 15, the Hon'ble Mr. G. K. Gokhale, C. I. E. Rs 10, Dr. Amrita Lal Sarkar Rs. 20, Rai Rajendra Chandra Sastri Bahadur, M. A. Rs. 5, Kumar Anath Krishna Deb Bahadur Rs. 5, Rai Kunja Lal Ray of Bandipur Rs. 5, Babu Satkari Haldar (Munsiff) Rs. 5, Dr. Bepin Behari Ghose M. B. Rs. 5, G. C. G. Rs. 5, Babu Munindra Nath Bhattacharya M. A. B. L. Rs. 5, Babu Pramatha Chandra Kar M. A. B. L. Rs. 5, Babu Atul Chandra Kar Rs. 5, Babu Rameswar Mandal B. L. Rs. 5, Rai Bahadur Budh Sing Dhudhuria of Azimgange Rs. 10, Babu Jadunath Sarkar M. A. Professor, Patna College Rs. 5, Dr. J. N. Bose of Ranchee Rs. 8, Babu Kumud Bandhu Mukerjee Rs. 5, Rai Bahadur Krishna Rao Muljee B. A., a member of Regency, Indore Rs. 10, Babu Lachman Dass, B. A. Pleader, Ferojepur Rs. 5, Babu Gajendra Lal Chaudhuri (Retired Sub Judge) Rs. 10, Mr. P. N. Bose Rs. 5, Babu Kapali Charan Mookerjee Rs. 5. Babu Hem Chandra Mitra Rs. 10, Rai Bahadur Rasamoy Mitra, Head Master, Hindu School, Rs. 10, A Mouraing Friend Rs. 15, Babu Basanta Krishna Bose M. A. Deputy Magistrate, Hoogly Rs. 10, Monghyr Public Academy, (through Mr. N. C. Banerjee, Secretary, School Debating Club) Rs. 10, Babu Binoya Krishna Ghose Re. 1, Babu Kalipada Bose M. A. Professor, Dacca College Rs. 10, Dr. S. C. Sen, Khargapur Rs. 5, Professor Anath Nath Palit M. A. Rs. 4, Babu Kalikrishna Bhattacharya Rs. 2, Babu Fanindra Nath Dass Rs. 2, Babu Khirode Chandra Gupta Rs. 2, Pandit Amullya Chandra Vidyabhusan Rs. 2, Babu Nabin Chandra Banerjee of Suri Rs. 5, A Student Metropolitan Institution Rs. 13, Babu Ashutosh Mitra Re. 1, Mr. D. N. Das Re. 1, Babu Jitendra Lal Das Gupta of Rangoon Re. 1, Babu Baikuntha Nath Sen of Berhampur Rs. 10, Babu Debendra Chandra Ghose M. A. B. L. Rs. 10, Babu Manmatha Nath Mitra M. A. B L. Rs. 25 and Babu Moni Madhaub Sen of Berhampur Rs. 5.

(শিরোরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।)

[illegible]রঞ্জন—মস্তিষ্ক শীতল করে, মাথাঘোরা, মাথাধরা ও মাথার জ্বালা নিবারণ [illegible]নর প্রফুল্লতা ও চিত্তের সুস্থিরতা [illegible] শক্তির বৃদ্ধি করে এবং হস্ত-[illegible]জ্বালার শান্তি করে বায়ুরোগে, [illegible]রোগে প্রভৃতি বাতপিত্ত-জনিত যাবতীয় রোগেই ইহা অমৃতের অধিক উপকারী

কেশরঞ্জন—কেশের অত্যন্ত উপকারী [illegible] দৃঢ় করিতে, কেশ ঘন কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত করিতে, ক্ষুদ্র কেশ দীর্ঘ করিতে, কর্কশ কেশ কোমল করিতে ও রুক্ষ কেশের চাকচিক্য বাড়াইতে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট তৈল আর নাই। এত গুণের আধার বলিয়াই কেশরঞ্জন রমণীগণের আদরের সামগ্রী। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

জজ।

লাহোর চিফকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কেশরঞ্জনের গন্ধ অতি তৃপ্তিকর। এ অঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

ময়মনসিংহের বিখ্যাত সব-জজ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, বি-এল, মহোদয় লিখিয়াছেন,—"কেশরঞ্জনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি এত অনুরক্ত। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে জানিয়াছি, ইহা মস্তিষ্ক শীতল রাখে।"

আলিপুরের সব-জজ শ্রীযুক্ত বাবু করুণানাথ বসু মহোদয় লিখিয়াছেন,—"অনেক উৎকৃষ্ট কেশতৈল অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট। সুগন্ধে চিত্তস্পর্শী এবং ব্যবহারে শরীর-স্নিগ্ধকারী।"

কাণপুর ছোট আদালতের প্রসিদ্ধ জজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় মহোদয় লিখিয়াছেন,—"যাবতীয় কেশ তৈলের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—ইহা কেশের একটী উপাদেয় টনিক।"

মুঙ্গেরের সব-জজ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, মহোদয় লিখিয়াছেন, "কেশরঞ্জন অতি উপাদেয় তৈল। সুগন্ধে ইহা মন মাতাইয়া তুলে। স্নিগ্ধকারক গুণে মস্তিষ্ক শীতল করে।"

অর্শোহর বটিকা।

অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শোহর বটিকা সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সুনিয়মের সহিত ব্যবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বাহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানী, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, ও রক্তপূযাদি স্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়।

অর্শ হইয়াছে বলিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সেবন করিয়া দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পারে।

অর্শোহর বটিকা এক কৌটায় ৪০ চল্লিশটী থাকে; মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶০ তিনি আনা। কিছুকালের জন্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইলে, একেবারে এক ডজন লইলে, কিছু কমে পাওয়া যায়।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

একাদশ খণ্ড]　　১৩১৭ সাল, আষাঢ়।　　[৩য় সংখ্যা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত।

☞ সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

সাহিত্য-সভা।

PATRON:

HIS HONOUR SIR EDWARD NORMAN BAKER, K C. S I, &c., &c., &c,
Lieutenant-Governor of Bengal.

VICE-PATRON:

A. EARLE, ESQ I C. S—Offg. Secretary to the Home Department.
of the Government of India

PRESIDENT:

RAJA BINAYA KRISHNA DEB BAHADUR.

বিজ্ঞাপন।

১। সাহিত্য-সভার চাঁদা প্রভৃতি টাকাকড়ি মণিঅর্ডার এবং সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি পত্র আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

১০৮।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সাহিত্য-সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতার প্রকাশ জন্য প্রবন্ধাদি আমার নিকট ৬৮।৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট নিউ বেঙ্গল প্রেসে অথবা সভার ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১০৮।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।
সাহিত্য-সংহিতা-সম্পাদক।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্য প্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সাহিত্য-সভার সম্পাদক.

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

ভারতে গোজাতির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায়চিন্তা।

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো
নমো নমঃ॥"

আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতভূমি সম্প্রতি নানাপ্রকার দুঃখ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিয়ত ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; ইহার অশেষবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও গোজাতির অবনতি এবং ক্রমশঃ বিলোপই যে ইহার একটী প্রধান কারণ, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশসহকারে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, গো-কুলের রক্ষা ও উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের কল্যাণ নির্ভর করে। ফলতঃ "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। কৃষি, বাণিজ্য এবং পরিচালন, ভারবহন এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য উৎপাদনের মূলীভূত কারণই গোজাতি। ধর্ম্মকার্য্যেও গাভীই হিন্দুজাতির প্রধান অবলম্বন। গোসদৃশ মহোপকারী প্রাণীর অবনতিতে যে ভারতের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার অসীম উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই ত্রিকালদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ এতাদৃশ জীবের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে নানাবিধ সুব্যবস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী-স্বরূপ ভক্তি করিবার আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রাচীন মীসর (Egypt) দেশবাসী জ্ঞানিগণও গোজাতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মযাজকগণও বৃষভ-চিহ্নাঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের দেহ আবৃত্ত করিতেন। ইহা গোজাতির প্রতি ভক্তির নিদর্শন বলিতে হইবে। সত্য বটে যে, স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ গোমেধ-যজ্ঞে গোবধ করিতেন এবং খাদ্য স্বরূপ গোমাংসের ব্যবহারও তদানীন্তন কালে অপ্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এ বিষয়—দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার বেদ-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈদিক কালে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল না। এ বিষয় আমার মতামত প্রকাশ করার শক্তি নাই; কারণ আমি বেদে লব্ধাধিকারী নহি। কিন্তু যাহাই হউক, অসীম জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ যখন গাভীর আত্যন্তিক উপকারিতা এবং গোমাংসের

যথেষ্ট অপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই ভারতে গোবধ পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইল এবং ধর্ম্মের শাসনে সকলেই সেই শাস্ত্রবাক্য অবনতমস্তকে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অদ্যাপি সেই ধর্ম্ম-শাসনের বল অপ্রতিহতভাবে হিন্দুর হৃদয়ে ক্রিয়া করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, গোমাংস ভক্ষণে মানুষ অন্ধতা, কুব্জতা, খঞ্জতা চক্ষুর্হীনতা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, এই সকল ব্যাধি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চরক সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, গোমাংস ভক্ষণ জনিতই প্রথমতঃ অতিসার রোগের উৎপত্তি হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বহু গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, গোমাংসে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে, তাহা মানবের উদরস্থ হইলেই বহু প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এবংবিধ কীট অধিক জন্মিয়া থাকে; অতএব ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস যে মানুষের অখাদ্য, ইহা বোধ হয় অবিসংবাদিত সত্য। এই অবস্থায় যদি কেহ বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণ যখন গোমাংস ব্যবহার করিতেন, তখন বর্ত্তমান কালে তাহা কি অনিষ্টজনক হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা বহু অনুসন্ধান দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কূট তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহার পুনঃ প্রচলনের প্রয়াস পাওয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। একমাত্র গোমাংস ভক্ষণাভক্ষণ দ্বারাই ম্লেচ্ছ ও আর্য্যের মধ্যে পার্থক্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রমাণস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:—

"গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সদাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ:—যে গোমাংস ভক্ষণ করে, বেদবিরুদ্ধ বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে এবং শাস্ত্রোক্ত সদাচার বিহীন হয়, তাহাকেই নামে অভিহিত করা যায়। প্রসাধীন আমি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিশেষ কোনও কারণাধীনেই এইরূপ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

গোজাতির অবনতির অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) অপালন
(২) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
(৩) গোচারণ ভূমির ক্রমশঃ লোপ
(৪) গো-মড়ক
(৫) যথেচ্ছা গোবধ
(৬) চর্ম্ম ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক বিষাদি প্রয়োগে গোবধের আতিশয্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবে। অতএব সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করাই সমীচীন বোধ হয়।

প্রথমতঃ—অপালনজনিত গোজাতির অবনতিসম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে এতন্নিবন্ধন বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। গোরক্ষক হইয়া গাভীর প্রতি যে প্রকার অনাদর ও অযত্ন করিতেছেন, তাহাতে নিতান্তই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়। যাঁহারা এই মহানগরীতে ও অন্যান্য সহরে গোজাতির দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছেন,

তাঁহারা নিশ্চয়ই নীরবে অশ্রুপাত করিবেন। ফলতঃ, কলিকাতায় গাভীর দুর্দ্দশা দেখিলে আর আমাদিগকে গো-রক্ষকের জাতি বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। দূরস্থ পল্লীগ্রামেও অধুনা যেভাবে গো প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অচিরেই এই মহোপকারী প্রাণী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং আমরাও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবীর্য্য ও হীনবল হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইব। মহামতি মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থা এই যে—

"পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ অন্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার অথবা পিতৃতুল্য ব্যক্তির উপর, পাকশালা পর্য্যবেক্ষণের ভার মাতার অথবা মাতৃতুল্য স্ত্রীলোকের উপর এবং আত্মসম ব্যক্তির উপর গোরক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিবে। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, অজাতশ্মশ্রু, অর্ব্বাচীন বালকের উপর এই গুরুতর ভারার্পণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এক্ষণে যেভাবে গোশালা নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে যে প্রকার অযত্নে গোসকল আবদ্ধ থাকে এবং বৎসগুলির প্রতি যে প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে কখনই তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার ফলে গাভীগুলি ক্রমে ক্ষীণকায় ও ষণ্ডগুলি হীনবীর্য্য হইতেছে এবং নিরীহ বৎসগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। * এই কারণে দুগ্ধাদির অভাব হইতেছে এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদিরও বিঘ্ন ঘটিতেছে; ভারতের দুঃখ ও দৈন্যও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রসঙ্গাধীন এস্থলে বক্তব্য এই যে, ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতি দুর্ব্বল হওয়ায়, ক্ষেত্রকর্ষণের কার্য্য রীতিমত সম্পাদিত হইতেছে না। পল্লীগ্রামে এখন অনেক স্থলে মহিষ দ্বারা হলচালন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে নানা অসুবিধা আছে। রৌদ্রের সময় মহিষগুলি একবারেই পরিশ্রম করিতে পারে না এবং ইহাদের মলে কোনও সার নাই। বিশেষতঃ মহিষগুলি দীর্ঘজীবী হয় না এবং সময় সময় যথেচ্ছ চলিয়া যায়। মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন, যে—

"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং ব্যবসায়িনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং।"

এখন প্রায়ই একটি হালের জন্য ২টী মাত্র ক্ষীণকায় বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হয় এবং সময় সময় গাভী দ্বারাও হল চালিত হয়, ইহা একান্ত অন্যায়। কৃতক্লীব ষণ্ড দ্বারাও হলচালন নিষিদ্ধ ছিল, ষণ্ডই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

ক্ষেত্রকর্ষণ সময়ে বলদগুলিকে কৃষকগণ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাক, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই কষ্টানুভব হয়। ৮টী ষণ্ড দ্বারা একটী হল চালিত হওয়া এখন সহজ নহে, তথাপি ২টী দ্বারা হল চালন বড়ই অন্যায়, একথা বলিতেই হইবে।

পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয়গণ (যাঁহারা গোখাদক বলিয়া খ্যাত) গো পালন সম্বন্ধে কত প্রকার সুব্যবস্থা এবং কীদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পশুপালন (কৃষিকর্ম্মার্থ গো-অশ্বাদি-প্রতিপালন) ব্যাপারটা কৃষিকার্য্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট হই-

* শাস্ত্রে কথিত আছে:—"দ্বৌ মাসৌ পায়য়েদ্ বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ। দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথা রুচি:॥" আপস্তম্ব সংহিতা ২১ শ্লোক।

য়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সুপালন জন্য এক একটী গাভী ॥৫ সের হইতে ১/ মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং একটী এক ষণ্ড ৪।৫ হাজার হইতে ১০০০০ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভী বর্ত্তমান ছিল (৩২ সের দুগ্ধদাত্রীকে দ্রোণ-দোগ্ধ্রা বলা হইত)। একথা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গাভীগুলি যখন ২৫।৩০সের দুগ্ধ দিতেছে, তখন ভারতের ন্যায় শস্য-শ্যামল ও অযত্নসম্ভূত প্রভূত তৃণশস্যাদিপূর্ণ দেশে যে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভী বর্ত্তমান ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তাই আজ ভারতে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভীর অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতের ব্রহ্মণ্যদেব 'গোব্রাহ্মণহিতায়' ছিলেন; আমাদেরই কর্ম্মদোষে তিনি এখন 'তত্তদ্বধায়' হইয়াছেন, কি বিড়ম্বনা। ভারতের এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে, হিসারী, মুলতানী এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে গুজরাট দেশে, কাটেবারী, মধ্যপ্রদেশে নাগোরী এবং পাটনা অঞ্চলের গাভীগুলি প্রচুর দুগ্ধবতী। যত্ন করিলে ইহারা ২৫।৩০সের দুগ্ধ দিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা উদাসীন। বঙ্গদেশের গাভীগুলি /২। বা /২॥ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না, ইহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি এবং অস্থিচর্ম্মসার। বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা সর্ব্বত্র খ্যাত, কিন্তু বঙ্গদেশীয় জীব জন্তুর অবনতি দেখিলে আর সে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের এক একটী ছাগীতেও ৫।৬ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। কেবল অপালনজন্যই বাঙ্গালী গাভীগুলির এই প্রকার হীন দশা উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য জলবায়ুর দোষও যে কতকটা না আছে তাহা নহে, কিন্তু যত্ন চেষ্টা করিলে, এই দোষ অনেকপরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে দুগ্ধাদির যে প্রকার অভাব হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গোজাতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা গবাদির অপালনজনিত ক্ষতি প্রত্যহ গুরুতর হইতে থাকিবে। শিক্ষিত লোক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে অনেক উপকারের আশা করা যায়, কারণ "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" Example is better than precept, কেবল সভাসমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না। গোপালনসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে; বাঙ্গলা ভাষায় এবংবিধ গ্রন্থ ২।৪খানা মাত্র দেখিতে পাই। কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী, এ বিষয় প্রবন্ধের শেষাংশে বলা যাইবে।

গোজাতির অবনতির দ্বিতীয় কারণ—পুষ্টিকর খাদ্য ও গোচারণ-ভূমির অপ্রাচুর্য্য। কল্ক (খোল) ভূষি প্রভৃতি দেশে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে এবং তজ্জন্য খাদ্যদ্রব্যে নানাপ্রকার কৃত্রিমতা বাড়িতেছে, পক্ষান্তরে অন্য কোনও প্রকার পশু-খাদ্য উৎপাদনের রীতিমত চেষ্টা হইতেছে না, ইহার ফলে গো-কুল ক্রমে খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষে গোচারণ ভূমির অভাব ছিল না, এখন তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামেই গোচর রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং ইহা পুণ্যজনক ও ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; এখন অর্থই আমাদের পরমার্থ হইয়াছে; ধর্ম্ম হীনবল হইতেছেন এবং পুণ্যকার্য্যে আর আমাদের প্রবৃত্তি

নাই। প্রাচীন শাস্ত্রে গোচারণ-ভূমি রাখার সুব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু সেগুলি আর আমরা পালন করিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষিসম্প্রদায় কাহারও কাহারও নিকট দ্রব্য-বিশেষসেবী বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। এই প্রকার হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ "প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি।" সে দিন উত্তর অঞ্চলের ছোট লাট বাহাদুর গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতি করিয়া অনেক শুভজনক প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোচর ভূমি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ভূস্বামীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয়, এ বিষয়ে রাজবিধিও সত্বরই প্রচারিত হইবে। ভরসা করি, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষগণও এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন। আমাদের দেশে (ময়মনসিংহের উত্তরাংশে) সুসঙ্গ ও সেরপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি আছে, এবং তাহাতে এখনও গোচারণের সুবিধা আছে, কিন্তু কালে তাহাও লুপ্ত হইবে। অর্থ লোভ বাড়িলেই আর পতিত ভূমি থাকিবে না। পাশ্চাত্যদেশে পশুখাদ্য নানাবিধ তৃণাদি জন্মানর অনেক চেষ্টা হইতেছে। Silage প্রথা দ্বারা (ঘাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া) ঘাস রাখিবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। আমাদের দেশেও অনায়াসে তাহা অবলম্বিত হইতে পারে। অনেক স্থলে বিবিধ পুষ্টিকর তৃণ উৎপন্ন হয়, সে গুলি রীতিমত রক্ষা করিলেও গবাদির খাদ্যাভাব হয় না। এ বিষয়েও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগী হওয়া বিধেয়। খড় বিচালী হইতে Silage প্রথায় রক্ষিত ঘাস অনেক উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর। দূর্ব্বাঘাসের রীতিমত চাষ করাইলেও অনেক সুবিধা আছে। অতঃপর গিনি, বিয়ানা, সয়যোম প্রভৃতি বৈদেশিক ঘাসেরও চাষ করান যাইতে পারে। আমার বিবেচনায়, দূর্ব্বা, নল, খাগড়া, উলু, বিরণ এবং আরও অনেক প্রকার তৃণ প্রভৃতি ও এতদ্দেশজাত তৃণাদিই ভারতীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশু-খাদ্য নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S.) এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। কার্পাস বীজ দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতএব কার্পাসের চাষে মনোনিবেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইতে পারে, পশু-খাদ্য পাওয়া যাইবে এবং তুলাও উৎপন্ন হইবে। সর্ষপের কল্ক (খোল) ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির পক্ষে ভাল। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিল এবং তিষির খোলই উৎকৃষ্ট। গবাদির খাদ্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা করিতে হইলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, অতএব তাহাতে বিরত হইলাম।

অতঃপর গো-জাতির অবনতির অপর কারণ—গোমড়ক সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাউক। Rinderpest (গোবসন্ত), গলাফুলা (anthrax] পেটফুলা প্রভৃতি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতের প্রতি বর্ষে যে কত গাভী বৎস ও ষণ্ড প্রভৃতি অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল ব্যাধি উপস্থিত হইলে এক একটী গ্রাম একবারে গোশূন্য হইয়া পড়ে, ইহাতে কৃষক ও গৃহস্থগণ যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে ২।৪ জন গো-বৈদ্য থাকিত, তাহারা অনেক গোকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিত, অধুনা

তাহাদের প্রতি হতাদর হওয়ায় গো-বৈদ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভেটার্ণারী বিদ্যালয়ে যে সমস্ত যুবক শিক্ষালাভ করিয়া গো-বৈদ্য হইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা দরিদ্র কৃষক ও গৃহস্থগণ বিশেষ উপকৃত হইতেছে না, তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধাদিও দূরস্থ গ্রাম সমূহে সহজলভ্য নহে এবং সকলের পক্ষে তাহা ক্রয় করাও সম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় ইহাঁদের দ্বারা গো-চিকিৎসার বিশেষ সহায়তা হইতেছে না।

অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবগত না থাকাতে সামান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ গোমড়ক উপস্থিত হইলে তাহার কোনও প্রতীকারই করিতে পারে না। Siggngation এবং উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় এবিষয়ে তাহারা একেবারেই উদাসীন। গো-মড়কে দেশ গোশূন্য হইয়া যাইতেছে, ইহার ফলে দুগ্ধাদির অভাব বাড়িতেছে এবং গোময় ও গোমুত্রাদির অল্পতা হেতু ক্ষেত্রের সার দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তজ্জন্য ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইতেছে, এবং শস্যাদি ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে, ভারতবর্ষ নিত্য দুর্ভিক্ষের আগার হইতেছে। এক গোজাতির অপচয়ে কি হইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত Report এ ব্যক্ত হইয়াছে—

There is a fact much to be regretted in connection with Indian cattle *viz* that some of the best Breeds are deteriorating in quality and quantity. Among the many difficulties in the track of Indian Govt., I look to the degeneration of the indegenous Breeds, is likely to occupy a prominent place, * * * They are of far greater importance to India than they are to Great Britain. If by one fell swoop the Cattle of the British Isles were annihilated, the want of the public could be supplied from other sources,

* * * *

* * * but it is not so in India. Cattle there supply nearly all the motor power of the farm. Conditions are alike unsuitable for the employment either of Horse or the Steam Engine. In short, nothing, not even the foreign cattle, can be substituted for Indian Cattle to do the work for which they are now mainly bred and kept.

ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতির লোপাপত্তিতে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। বিগত ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের আদম সুমারীতে (Cencuss Report) দেখা যায় যে, প্রায় ২০৭, ৮৪৯, ২৫৬ জন (অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬৯-৯২ জন) লোক কৃষিকার্য্য ও তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত আছে এবং এবংবিধ কার্য্যাবলীতে গোই প্রধান সহায়। এইরূপ অবস্থায় গোমড়কে লক্ষ লক্ষ গো শমন ভবনে গমন করিলে কৃষকের ও সমগ্র দেশের কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এক্ষণে গোবধ ও চর্ম্ম-ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে গোহত্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মানুষের খাদ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ভারতবর্ষে সম্প্রতি অতি যথেচ্ছভাবে গোবধ করা হইতেছে, ইহা নিবারণ করা আমাদের সাধ্য নহে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। ইদপ্রভৃতি পর্ব্ব-উপলক্ষে যে গোবধ করিতেই হইবে, কোরাণ সরিফের বোধ হয় ইহা অভিপ্রেত নহে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমার ধৃষ্টতামাত্র। গোমাংস এ দেশের উপযোগী নহে, একথা

ভাল রকম বুঝিতে পারিলে বোধ হয় অনেক গোমাংসভোজীই ইহার ব্যবহারে বিরত হন। মুসলমান-নরপতি মহামনস্বী আকবর এক সময়ে গোবধ রহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যথেচ্ছ গোবধ হইতে পারে না, খাদ্যস্বরূপে ষণ্ডের মাংসই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, ইহা মন্দের ভাল বটে। বলিতে লজ্জা হয় এবং দুঃখও হয় যে 'হিন্দু' নামধারী আমাদের গোপাল (গোয়ালাগণ) প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে গোবধের সহায় হইতেছে। ব্যবসায়ের লোভে তাহারা গোবৎসগুলিকে ৮।১০ দিবস বয়স্ক হইলেই কষায়ের নিকট বিক্রয় করিতেছে, অতঃপর ফুঁকা প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে গো-দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে ত্রিগুণ কি ততোধিক জল মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ঐ জল সময় সময় এত দূষিত থাকে যে, তাহাতে নানা রোগোৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। গাভীটী বৃদ্ধা হইলে, অথবা দুগ্ধ ছাড়াইলে তাহাকেও কষায়ের নির্দ্দয় হস্তে অর্পণ করিতেছে। হায় রে অর্থ, তোর কি মোহিনী শক্তি ! অর্থলোভে মানুষ কতই না অপকার্য্য করিতেছে। মাড়োয়ারী ভ্রাতৃগণ দয়াপরবশ হইয়া পিঞ্জরাপোল স্থাপন করিয়া এই নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে গাভীগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল হয় নাই। দেশের সর্ব্বত্র পিঞ্জরাপোলের ন্যায় অনুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর চর্ম্মব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের লোভে বিষপ্রয়োগ দ্বারা অনেক গো-হত্যা করিতেছে। পল্লীগ্রামে এ প্রকার নিষ্ঠুরতার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। চর্ম্মব্যবসায়ে নিষ্ঠুরতা হয় বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে দ্বিজাতির পক্ষে ইহার ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা আমরা সেই নিষেধ অমান্য করিতেছি, ইহার পরিণাম শুভজনক কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত সত্ত্বেও প্রতি বর্ষে বিষপ্রয়োগে অনেক গো-হত্যা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি ?

গোজাতির অবনতির প্রধান কারণগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এবার কি উপায়ে ইহার গতিরোধ হয়, তৎসম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

প্রথমতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় ধনীসম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারিবর্গের মনোযোগ ব্যতীত গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সুদূরপরাহত। আমার বিবেচনায়—

১। স্থানে স্থানে গোশালা (Dairy farm) প্রতিষ্ঠা।

২। গো চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও গ্রামে গ্রামে গোবৈদ্য-প্রেরণ।

৩। গো-চিকিৎসা, ও পালন প্রভৃতি বিষয়ে সরল ভাষায় গ্রন্থাদি প্রচার।

৪। গোচারণ ভূমিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন।

৫। সর্ব্বোপরি যথেচ্ছ গোবধ নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গোশালা (Dairy) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যৌথসম্প্রদায় (Joint stock) গঠিত করা প্রয়োজন এবং গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কোনও বিখ্যাত Dairyতে কিছু কাল অবস্থান করিয়া কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত ;

নতুবা কেবল Theory (উপপত্তিতে) কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। আমরা অনেক সময়েই অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, পরিশেষে সফলতা লাভ না করিয়া হতাশ্বাস হই এবং কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম ভগ্ন হয়। এবংবিধ নিষ্ফলতাই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। Dairy farming সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী গ্রন্থ আছে; সেগুলি বঙ্গভাষায় অনুদিত করা উচিত।

সদ্যঃ পততি লোহেন ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ

দুগ্ধ ও গাভী বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু এখন অনেক তথা-কথিত ব্রাহ্মণসন্তান চর্ম্মাদি ও বিনামা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। অত্রাবস্থায় দুগ্ধাদি বিক্রয় করা একান্ত অন্যায় হইবে না। চর্ম্ম বিক্রয় অপেক্ষা ইহাতে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বোধ হয় না। গো-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে ব্যবসায়-লোভে গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা হইবে বিবেচনাতেই বোধ হয় তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রের ব্যবস্থা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে।

গোপালন ও গোচিকিৎসা সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গো-পালন নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথমস্থানীয়। অধুনা হুগলী (রাম নগর) নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ খণ্ডে গোজীবন নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গোজাতির উন্নতি ও গোধন রক্ষা নামক আরও দুই খানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনটীই আমাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট নহে। এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের গো সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গো-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ্য ঃ—

১৮৭১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত-বর্ষে গবাদির মারাত্মক রোগবিষয়ক এক খানি পুস্তক বঙ্গ ভষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানিও পাঠ্য বটে।

1. Cow keeping in India (by Isa Tweed).
2. Cows in India (by E. B. T.)
3. Amature Dairy Farming (by Landolicies.)
4. Plain Hints to the Deceases of Cattle in India (by Vety. Captn. Jame's Miller.)
5. Indian Cattle (by J. Shortt)
6. Diary Farming in India (Govt. publication by Vaughan & Nash.)

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতেও গোপালন এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে।—

1. Every man his own Cattle Doctor (by Bomatage.)
2. Bovine prescriber (by George Grasswell.)
3. Anlmal plague (by Fleming George.)
4. Principles and practice of Bovine Medicine and Surgery (J. W. Hill.)
5. Cattle Breeds and Management (by W. Housman.)
6. Stock Keeping and Cattle Nursing (A. Roland.)
7. Treatise on the Diseases of ox (by J. H. Steel.)
8. Farm Live Stock in Great Britain (by Robert Wallace)

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ইংলণ্ডীয় গোজাতির

জন্যই লিখিত, তথাপি আবশ্যক বোধে এগুলি হইতেও অনেক বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নাটক, নভেল প্রভৃতি বঙ্গভাষায় যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে (যদিও ইহারা অধিকাংশই পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না), অধুনা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষায় গোপালনসম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক পুরাণে অনেক প্রকীর্ণ শ্লোক আছে। সেগুলি একত্রিত করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, সহদেব গো-চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট ভবনে তিনিই গোচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বোধ হয় তাহা থাকিতে পারে, কারণ নকুলকৃত অশ্বশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে এবং Asiatic society কর্ত্তৃক তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবনে গোধন চরাইতেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আদর্শ মহাপুরুষ ভগবানের অবতার গোচারণ করিতেন, ইহা হইতে আমরা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ফলতঃ, এক সময়ে গোধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল।—

তৃণানি খাদন্তি বসন্ত্যরণ্যে
পীত্বাপি তোয়াস্যমৃতং স্রবন্তী।
যদ্‌গোময়াদ্যশ্চ পুণন্তি লোকান্
গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ॥

"গাবঃ পবিত্রা মাঙ্গল্যা গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
শকৃন্মূত্রং পরন্তাসাং অলক্ষ্মীনাশনং পরম্॥"

আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে গাভী একটী। যথাঃ—

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজদারিকা।
গাভী ধাত্রী ধরিত্রী চ সপ্তৈতে মাতরঃ স্মৃতাঃ

বস্তুতঃ গাভী আমাদের মাতৃতুল্যা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পঞ্চগব্য (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র) আমাদের প্রত্যেক দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে ব্যবস্থেয় হইয়াছে এবং হবির্ব্রহ্ম (ঘৃত ব্রহ্ম) এ কথাও বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রাদ্ধক্রিয়াতে গোদানের মন্ত্রগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ গাভীকে কি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কি পবিত্র ভাবে দেখিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। কুতূহলী শ্রোতৃবর্গ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থগুলি একবার পাঠ করিবেন। গোদানের অনেক ফল শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

উপসংহারকালে Breeding বৈজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাইতেছে। দেশে গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে হইলে Breeding সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বকালে শ্রাদ্ধবাসরে যে বৃষোৎসর্গ করা হইত, তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় গোবংশের বিস্তৃতিসাধন। হৃষ্ট পুষ্ট, সুস্থ ও উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতীর বৎসই উৎসর্গ করা শাস্ত্রের আদেশ। বৎসটী তিনি বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই, কারণ এই বয়স হইতেই ষণ্ড সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহা হইতে অপরিণত বয়স্ক ষণ্ডে বৎস ভাল হয় না। বর্ত্তমান কালে আমরা যে কোনও প্রকার একটা ষণ্ড উৎসর্গ করিতেছি এবং ইহাতেই অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের শাস্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য এই

প্রকারে বিফল হইতেছে। উৎকৃষ্ট জাতীয় ষণ্ড নিকৃষ্ট গাভীতে উপগত হইলে যে বৎস হয়, তাহা মাতা অপেক্ষা ভাল হয় এবং মাতার দুগ্ধও বাড়িয়া যায়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু তদ্বিপরীতে ফল বিরুদ্ধ হয়। অতএব এ বিষয়ে Breeding কারীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে যে অনুলোম বিবাহ বৈধ এবং প্রতিলোম অবৈধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহারও কারণ এই। রুগ্ন ষণ্ড, ৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক ষণ্ড, Bereding কার্য্যের অনুপযোগী। Breeding সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য। গাভী পুষ্পবতী হইবার অব্যবহিত পরেই ষণ্ডোপগতা হইলে স্ত্রীজাতীয় বৎস এবং কালবিলম্বে হইলে পুং-বৎস হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া গাভীর পাল দেওয়াইতে পারিলে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের ভূম্যধিকারিগণ ভাল ভাল ষণ্ড পালন করিলে নিজের গাভীসকল উন্নত হয় এবং প্রজাদেরও সুবিধা হয়। প্রত্যেক গ্রামে ২।১টী ভাল ষণ্ড মুক্তাবস্থায় রাখিতে পারিলে Breed ভাল হয়, ইহাতে শস্যহানির আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু যে ক্ষতি হয়, একটী উৎকৃষ্ট বৎস হইলে তাহার চতুর্গুণ লাভ হয়। অতএব এইরূপ সামান্য ক্ষতি গণনা করাই উচিত নহে। স্থানে স্থানে গো-রক্ষণী-সভা স্থাপন করিয়া কৃষক ও গৃহস্থগণকে গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও ভাল মনে হয়। কলিকাতা নগরীতে-ও অন্যান্য সহরে যাঁহারা বাস করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশেও তাঁহাদের (অবশ্য যাঁহারা সমর্থ তাঁহাদের) ২।১টী ভাল গাভী পালন করা উচিত, ইহাতে নানাপ্রকার সুবিধা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। বাজারের কৃত্রিম দুগ্ধ সেবনেই যে কলিকাতায় নানাপ্রকার পীড়ার প্রকোপ বাড়িতেছে, এ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় সে দিন খাদ্যসম্বন্ধে বক্তৃতায় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি সাহিত্য সভায় ইতঃপূর্ব্বে দুগ্ধসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত কথা এই যে, গোপালন ব্যতীত আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পত্তি কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্যই গোজাতির অবনতিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে এবং তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিলাম।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনেক অসম্বদ্ধ কথা থাকিতে পারে এবং অনেক কথা অনুক্তও আছে; কিন্তু ইহা দ্বারা যদি কাহারও গোপালনের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় এবং গোজাতির অবনতি নিবারণ ও তাহার উন্নতিসাধনের ইচ্ছা বলবতী হয়, তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন, গোমাতার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুগণ যেন তাঁহাদের হিন্দুনামের সার্থকতা রক্ষা করেন এবং "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" একথা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন। একথা যেন মনে থাকে যে, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাতেই ভারতবর্ষ সুরক্ষিত, ইহাদের অবনতিতেই ভারতের দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। *

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

* সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

ভারতী মঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পয়ার

সুখে রাজ্য করে, অংশুমান নরেশ্বর।
দিলীপ আখ্যান তার জন্মিল কুঞ্জর॥
রাজ্যে অভিষেক করি আপন নন্দন।
তপ হেতু অংশুমান চলে ঘোর বন॥
বহুকাল জাহ্নবীকে উগ্রতপ করি।
কালে বশ হয়ে রাজা গেলা স্বর্গপুরী॥
মহাসুর বীর হৈল দিলীপ রাজন্।
ভুজবলে জয় কৈল এ তিন ভুবন॥
পরম আনন্দে রাজ্য করেন ভূপতি।
যৎকিঞ্চিৎ মনে দুঃখ না হ'ল সন্ততি॥
মন্ত্রিগণ স্থানে রাজ্য করি সমর্পণ।
বিপিনে তপস্যা হেতু করিলা গমন॥
সহস্র বৎসর তপ গঙ্গাকে করিয়া।
লোকান্তরে গেলা ভূপ পঞ্চত্ব পাইয়া॥
তপোবনে নিরাশ্রয় রৈল দুই রাণী।
তীর্থ পর্যাটন হেতু এল সব মুনি॥
ঋষি সব দেখি দোঁহে প্রণাম করিল।
হইবা র পুত্রবতী মুনি বর দিল॥
শুনি অসঙ্গত বাক্য বলে দুই জনে।
পতিহীন জনে পুত্র হইবে কেমনে॥
মুনিগণ বলে ব্যর্থ না হবে ভারতী।
হবেক তনয় যেয়ে দুয়ে কর রতি॥
সে দোঁহার সংযোগেতে মুনিবাক্যফলে।
ভগীরথ নামে রাজা জন্মিল ভূতলে॥
কিছুমাত্র জ্ঞান দেহে জন্মিলে তাহার।
গঙ্গা আরাধনে চলে নৃপতি-কুমার॥
অনাহারে এক পদে সহস্র বৎসর।
বৃক্ষ প্রায় তিষ্ঠি তপ করে নরেশ্বর॥
মুদ্রিত নয়নে থাকে করি মহাধ্যান।
শরীর হইল শুষ্ক কাষ্ঠের সমান॥
নিরবধি ভাবে গঙ্গা অন্য নাহি মনে।
প্রসন্ন হইয়া দেবী আসিলা সেখানে॥
বর লহ বলি গঙ্গা কহিলা বচন।
ভগীরথ বলে মাতা শুন নিবেদন॥
ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ হয়েছে সংহার।
অন্যের শকতি নাই করিতে উদ্ধার॥
তুমি যদি যেয়ে স্পর্শ কর কৃপা করি।
মুক্ত হৈয়া পিতৃ সব পাবে স্বর্গপুরী।
গঙ্গা বলে যেতে নারি শিব আজ্ঞাধীনে।
চল ভগীরথ ভূপ শিব-আরাধনে।
ইহা বলি গঙ্গামাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
হর-আরাধনে রাজা গেলা অন্য স্থান॥
মালুর পাদপতলে স্থান নিরূপিল।
শিবপদ ভাবি মনে তথায় বসিল॥
সকল শরীর কৈল ভস্মে আচ্ছাদিত।
হস্ত বক্ষ গ্রীবা শিরে রুদ্রাক্ষমণ্ডিত॥
লোচন মুদ্রিত সদা জপে হর হর।
হেন মতে উগ্রতপ করে নরেশ্বর॥
তপফলে সাক্ষাতে আসিলা শূলপাণি।
করিল প্রণতি ভূপ লোটায়ে অবনী॥
অতি তুষ্ট হৈয়া বাক্য বলে বিশ্বনাথে।
লও নৃপমণি বর যেই ইচ্ছা চিত্তে॥
রাজা বলে ব্রহ্মশাপে ম'ল পিতৃগণ।
বিনা গঙ্গা-জলে তার নাই উদ্ধারণ॥
যদি মোকে কৃপাযুক্ত হৈলা বিশ্বেশ্বর।
জাহ্নবীকে দেও পিতা চাই এই বর॥
ভকতবৎসল অতি প্রভু দয়াময়।
জটা খুলি গঙ্গাকে দিলেন সে সময়॥
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ অতি হৃষ্টমন।
যোড় করে করে রাজা গঙ্গাকে স্তবন॥

এই নিবেদন বলি পদযুগে তোর।
কৃপা করি চল মাতা সঙ্গে সঙ্গে মোর॥
বলেন জাহ্নবী দেবী প্রসন্ন হইয়া।
আগে আগে চল তুমি শঙ্খ বাজাইয়া॥
ধ্বনি শুনি পাছে আমি করিব গমন।
অজস্র করিবে বাদ্য শুনহ রাজন্॥
গঙ্গাকে বন্দিয়া ইহা শুনি ভগীরথে।
শঙ্খ বাদ্য করি বলে উল্লাসিত চিতে॥
পশ্চাতে জাহ্নবী দেবী অতি দ্রুত চলে।
বিষম তরঙ্গ ঢেউ হিল্লোল কল্লোলে॥
সঙ্গে গঙ্গা যান অগ্রে চলে নৃপবর।
আসিয়া সলিল বেগে ঠেকে মহীধর॥
লঙ্ঘিতে না পারি গিরি কহে সুরেশ্বরী।
কহ ভগীরথ ভূপ কি উপায় করি॥
বলে রাজা অগোচর কি আছে তোমার।
মোরে কৃপা করি আজ্ঞা কর যুক্তি সার॥
মনে ভাবি ভাগীরথী বলিল বচন।
অতি তূর্ণ আন রাজা হস্তী ঐরাবণ॥
দণ্ডে গিরি আসি যদি ভাঙ্গে করিবরে।
তবে মোর জল যেতে পারে সেই দ্বারে॥
ইহা শুনি সুরপুরে চলিলা ভূপতি।
ঐরাবত কাছে উত্তরিলা দ্রুতগতি॥
সব বিবরণ নৃপে কহে করি-স্থানে।
শুনিয়া উত্তর গজে দিল রঙ্গমনে॥
যদি গঙ্গা দান করে আমাকে রমণ।
তবে গিরি দশনে করিব বিদারণ॥
ইহাকে আনিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি।
নিশ্চয় কহিল আমি শুনহ ভূপতি॥
বিষন্ন বদনে রাজা করিল গমন।
উত্তরিলা আসি পুন গঙ্গার সদন॥
মলিন মূরতি দেখি পুছে ভাগীরথী।
একা এলে রাজা কেন না আইল হাতি॥
অধোমুখে রহে রাজা অন্তরে দুঃখিত।
বলে ভূত ভবিষ্যৎ তোমার বিদিত।
অত্যন্ত অকথ্য কথা বলিছে কুঞ্জরে।
কি মতে কহিব আমি মুখে নাহি সরে॥
নিঃসন্দেহে বল রাজা দোষ নাহি ইথে।
শুনি ভগীরথ কহে গদগদ চিতে॥
তাকে রতি দান যদি কর অনুমতি।
তবে হাতি গিরি ভাঙ্গি দিবে দ্রুত অতি॥
জানি যেতে আমাকে পাঠায়েছে দন্তবলে।
যত বিঘটনা ঘটে আমার কপালে॥
বলিলা জাহ্নবী তুমি শুনি নৃপবর।
আনিতে দ্বিরদে তুমি চলহ সত্বর॥
কহিবে হস্তীকে মোর এই এক পণ।
যদি মোর বেগ সহে করিবে রমণ॥
ইহা শুনি ভগীরথ চলে হর্ষমনে।
উপস্থিত হৈল যাইয়া কুঞ্জর যেখানে॥
বলে ভগীরথ ভূপে শুন বাক্য করি।
যে বচন আমাতে কহিলা সুরেশ্বরী॥
যদি তুমি তাঁর বেগ পার সহিবার।
তবে সে পারিবে করি করিতে শৃঙ্গার॥
আপনার বল বুঝি চলহ বারণ।
হাস্য করি যুথনাথে বলিল বচন॥
অবলার সাথে যদি বলে নাহি পারি।
তবে ঐরাবত নাম ব্যর্থ কার্য্যে ধরি॥
জাহ্নবীর পদযুগ বন্দি নিজ শিরে।
ভনে রাজসিংহ নাম মূর্খ ধরাধরে॥

ত্রিপদী।

এই বলি হাতী, চলে দ্রুতগতি,
নৃপতি অগ্রজ সাথে।
আসিল সত্বর, গঙ্গার গোচর,
অধিক আনন্দ চিতে।
করি দেখে নীর, হ'য়েছে সুস্থির,
ঠেকি মহামহী ধরে।
ভিড়াইয়া দন্ত, গিরি কৈল অন্ত,
অতি মত্ত করিবরে॥
পেয়ে সেই দ্বার, চলে গঙ্গাধার,
অতি বেগে যায় জল।
সলিল তরঙ্গে, পড়িয়া মাতঙ্গে,
ক্ষণেকে হইল তল॥

গজেন্দ্র বিকল, খেয়ে বহুজল,
গঙ্গাকে করয়ে স্তুতি।
পশু বটি আমি, সুরধুনী তুমি,
কোপ ক্ষম ভাগীরথী ॥
হস্তীর বচনে, গঙ্গা কৃপা মনে,
বেগে তুলি দিলা পারে।
ছাড়ায়ে মরণ, চলিল বারণ,
লজ্জিত হইয়া ঘরে ॥
গঙ্গা বেগ ক্রমে, যথা স্তম্ভে রমে,
তুলি দিলা জল হনে।
হস্তিনা নগর, অতি মনোহর,
পুরী হইল সেইখানে ॥
কৌরব পাণ্ডব, মহাযোদ্ধা সব,
পঞ্চাধিক শত ভাই।
এ স্থানে বসতি, কৈলা নরপতি,
জগতে তুলনা নাই ॥
শুনি কালিদাসে, মুনিতে জিজ্ঞাসে,
কহ কেবা ছিল কুরু।
বলি শ্রীচরণে, কৃপা করি মনে,
বিস্তারিয়া কহ গুরু ॥
শুনি দ্বিজ বাণী, কহে মহামুনি,
শুন বলি কালিদাস।
শুন উপাখ্যান, অমৃত সমান,
ভারত-প্রসঙ্গ ভাষ ॥
শান্তনু নৃপতি, মহাধর্ম্ম মতি
জাহ্নবী রমণী যার।
দেবতার অংশে, জন্মে কুরুবংশে,
ভীষ্ম নামে পুত্র তার ॥
নৃপে সুত দিয়া, গেলেন চলিয়া,
গঙ্গা আপনার ধামে।
পরে নৃপমণি, বিয়া কৈল আনি,
কন্যা সত্যবতী নামে ॥
জন্মে কালান্তরে, তাহার জঠরে,
দুই সুত মহাতেজা।
বলে মহাবীর, সময়ে সুধীর,
হৈল ভবনের রাজা ॥

দুই সহোদর, গেল যমঘর—
সুত নাই তা সবার।
ব্যস্ত প্রজাগণ, নৃপতি কারণ,
হবে কোন পরদার ॥
পূর্ব্বে ভীষ্মবীরে, ধীবর গোচরে,
করিছে বিষম পণ।
সেই বাক্য লাগি, তিনি মহাযোগী,
রাজা হবে কোন জন ॥
পরে দুই নারী, আনি ব্যাস মুনি,
দুই সুত জন্মাইলা ॥
ধৃতরাষ্ট্র নাম, মহা গুণধাম,
জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্ধ হৈলা ॥
দ্বিতীয় কুমার, পাণ্ডু নাম তার,
তিনি হৈলা যুবরাজ।
সবে করে পূজা, অন্ধ হৈলা রাজা,
হস্তিনা নগর মাঝ ॥
গান্ধারী আখ্যান, অপ্সরা সমান,
ধৃতরাষ্ট্রে বিয়া কৈলা।
কুন্তীমাদ্রী নাম, রূপে অনুপম
পাণ্ডুর দয়িতা হৈলা ॥
গান্ধারী নন্দন, হ'ল শতজন,
দুর্য্যোধন আদি করি।
পুরীর নায়ক, কুলের অন্তক,
কলি-অংশে দুরাচারী ॥
পাণ্ডুর তনয়, পঞ্চ মহাশয়,
যুধিষ্ঠির সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ।
ধর্ম্ম অবতার, মহিমা অপার,
ক্ষত্রিয় ভিতরে শ্রেষ্ঠ ॥
কৃষ্ণ বৃকোদর, দুই সহোদর,
এ তিন কুন্তীর সুত।
নকুল সুস্থির, সহদেব ধীর,
দুই ভাই গুণযুত ॥
মাদ্রীর নন্দন, এই দুইজন,
শুন দ্বিজ কালিদাস।
বাণী ভাবি মনে, ভূপাত্মজে ভনে,
ভারতী মঙ্গল ভাষ ॥

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মানসিংহ।

বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, মানসিংহ আমার পিতার রাজ্যে একটী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে ছয় মাস সম্রাট্-দরবারে ও ছয় মাস তাঁহার জায়গিরে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের প্রমাণস্বরূপে বলিতেছি যে, যতবার তিনি পিতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন, প্রত্যেক বারেই অন্যূন দুই লক্ষ আসরফি তিনি পিতাকে সম্মান-উপঢৌকনস্বরূপে দিতেন। পিতামহ ভারমলকে ঐশ্বর্য্য-সম্পদে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের রাজগণমধ্যে ধনৈশ্বর্য্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।

খসরুর বিবাহ-সম্বন্ধ।

নিম্নলিখিত বিষয়টি, উল্লেখের অযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খাঁ আমাকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মির্জ্জাজান বেগের পুত্র গাজী বেগকে তিনি দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাহাকে তৎসন্নিকটে যাইবার জন্য যেন আমি অনুমতি প্রদান করি। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি লিখিলাম যে, এই গাজী বেগের ভগিনীর সহিত আমার পুত্র খসরুর যাহাতে বিবাহ হয়, সে সম্বন্ধে আমার পিতা কথাবার্ত্তা পাড়িয়াছিলেন; সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, গাজী বেগকে পাঞ্জাবে যাইবার অনুমতি দিব। গাজীবেগের পিতা মির্জ্জাজান (বা জানি বেগ) ফারেদ্দা মহম্মদের পুত্র, মির্জা বাকীর পৌত্র, মির্জা আবীর প্রপৌত্র এবং মির্জা আবদুল আলী তুর্খানের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতান মির্জার রাজত্বকালে বোখারার অধীশ্বর ছিলেন, এবং উজবেগদিগের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সাহী বেগ খাঁ ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ ইঁহার সামন্ত দলভুক্ত ছিলেন। এই আব্দুল আলী তুর্খান সুক্কিবেগ তুর্খানের বংশজাত। ইহার পিতা আয়গু তৈমুর তোকতেমাস খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন; সেই জন্য অজেয় তৈমুর আব্দুল আলী তুর্খানের কথিত পূর্ব্বপুরুষকে তাঁহার শৈশব অবস্থায়, "সুক্কি বেগ তুর্খান" —এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা আরঘুন খাঁর জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঁহাদের উপাধি—"তুর্খান" ও আরঘুন"।

রাজা মুকসুদ খাঁর পুত্র।

বাঙ্গালা ও বিহারের বিদ্রোহ ব্যাপারে সংলিপ্ত, মুখসুস খাঁর পৌত্র ও মুকসুদ খাঁর পুত্র আমাকে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। তদুত্তরে আমি আমার কর্ম্ম চারীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিতে আদেশ করিলাম;—আমি যতদূর জানি, তাহাতে তুমি আমার উপরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে, তোমার মনের অবস্থা তাদৃশ নহে; আমি তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র, কিংবা মর্ত্ত্য সম্রাটের অনুরাগভাজন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ঈশ্বরের নাম ও মদ্যপান।

ঈশ্বরের সহজ নাম যতগুলি সংগ্রহ

---

* Autobiographical Memoirs of the Emperor Jahangir নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

করা যাইতে পারে, ততগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য আমি কতকগুলি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি। তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ৫২২ টি নাম সংগ্রহ করে; এই সংখ্যা পিতার সংকলিত নামাবলীর ঠিক দ্বিগুণ। এই ৫২২টি নাম ২০টি সংখ্যাধীন হইয়া, আমার আদেশে আমার গাত্রাবরণে * লিখিত (সম্ভবতঃ সুচিকার্য্য খচিত) হইল। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি সকল শ্রেণীর পণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠগণের সহবাসে অতিবাহিত করিতাম। সিংহাসনগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, শুক্রবার রাত্রিতে আমি কিছুতেই মদ্য বা অন্য উত্তেজক পানীয় আস্বাদন করিব না। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এমন কি সেই ভয়ঙ্কর সার্ব্বজনীন হিসাবনিকাসের দিন পর্য্যন্ত, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকে, আশা করি, ঈশ্বর আমাকে সে সম্বন্ধে বল দিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমি প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিতে পারিয়াছি; জীবনের অবশিষ্টাংশও যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, ঈশ্বর সেইরূপ কৃপা করুন।

শোককালে উৎসবনিষেধ।

পাছে আমার অনবধানতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের স্ব স্ব পদোচিত বৃত্তিদানের ব্যবস্থা না হয়, সেই জন্য আমার পরিপার্শ্বিক অনুচরগণকে তদ্বিষয়ক অভাব জ্ঞাপন করিতে আমি উৎসাহ দিতাম। আমার পিতার মৃত্যুজনিত নির্দ্দিষ্ট শোককালমধ্যে সুফিদিগের অনুমোদিত ও ব্যবহৃত আহার্য্য-পানীয় ব্যতীত অন্যরূপ আহার্য্য-পানীয় ব্যবহার করিতে প্রজাগণকে নিষেধ করিলাম। আরও জানাইলাম যে, এই নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে আমার অধিকৃত রাজ্যে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে কেহ ঢক্কা, ভেরী বা অপর কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিবে না। রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী আমার বিশেষ বিরাগভাজন হইবে।

কথিত আজ্ঞা প্রচলনকালমধ্যে এক দিন আমি শুনিলাম যে, হাকিম আলী নামক জনৈক ব্যক্তি, তাহার পুত্রের বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে কাজীর সমক্ষে এক দল বাদ্যকর নিযুক্ত করিয়া উৎসব-সভায় উপস্থাপিত করিয়াছে। আর নানারূপ যন্ত্রসম্ভূত শব্দে সমগ্র সহরটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমি মহম্মদ তকীর দ্বারা হাকিম আলীকে তৎপ্রতি আমার পিতার বদান্যতা এবং তাহার বাধ্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। আর বলিয়া পাঠাইলাম যে, সমস্ত লোকের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্ব্বাধিক শোকাচ্ছন্ন হইবে, আমি এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম, পুত্রের বিবাহ দিবার এবং কোলাহলময় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইহাই কি একমাত্র উপযুক্ত সময়? আমার দূত যখন সেই ব্যক্তির সভা-মধ্যে উপস্থিত হইল, তখন অভ্যাগতগণ আমোদে উন্মত্ত। আমার আজ্ঞা জ্ঞাপন করিবামাত্র তাহাদের মধ্যে যে ভয় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তাসূচক আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা অতীব কৌতুকপ্রদ। অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপবিদ্ধ হইয়া হাকিম আলী প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা স্থাপন করিল। অনুগ্রহ-প্রদর্শন-অভিপ্রায়ে আমি সেটি তখন গ্রহণ করিলাম; কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহাকে আনাইয়া আমি তাহারই গলে সেই মালা ছড়াটি পরাইয়া দিলাম। সত্য কথা বলিতে

---

* লিপিকরপ্রমাদে এ স্থানটি দুর্ব্বোধ্য। সম্ভবতঃ ‘রেজাই”

কি, আমার অধীন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কোন প্রকারের উপহার গ্রহণ করা আমার প্রীতিকর নহে। পক্ষান্তরে তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বসময়ে আমার হস্তের উপরে নিক্ষিপ্ত রাখা কর্ত্তব্য; যতদিন আমার সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন তাহাদের গুণানুসারে আমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার বিতরণ করা আমারই কার্য্য।

পুরস্কার বিতরণ।

মহম্মদ খাঁকে এক্ষণে পাঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে লক্ষ টাকা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং রত্নখচিত তরবারি, কোমরবন্ধ ও পেশকবজ প্রদান করিলাম। এই ব্যক্তি ফেররা নামক স্থানের খাঁ-বংশীয়। এই সময় গরীবদিগের এবং দিল্লির পবিত্র মঠবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য মহম্মদ রেজার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলাম। উজীর খাঁকে আমি সাম্রাজ্যের উজীর-পদে বসাইলাম। যখন আমি যুবরাজ ছিলাম, তখন ইহাকে "উজীর উলমুলুক" উপাধি দিয়াছিলাম এবং পাঁচ শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলাম।

সেখ ফরীদ বোখারী, সেখ জল্লালের বংশসম্ভূত। সেখ জল্লাল, মুলতানের সেখ বেহা উদ্দীন জাখারিয়ার সুবিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। দিল্লির সায়েদ আবদুল গফুর, সেখ ফরীদের উচ্চতন চতুর্থ পুরুষ। এই আবদুল গফুর তাঁহার বংশধরগণকে কেবলমাত্র বিপদ্‌সঙ্কুল সৈনিককার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে বলিয়া গিয়াছিলেন। ইহারা বোখারা সৈয়দগণের মধ্যে প্রধান। সেখ ফরীদ পূর্ব্বে চারি হাজার অশ্বের অধিনায়ক ছিল; পরে আমি তাহাকে পাঁচ হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলাম, এবং বড় নাগরা ও নিশানও দিয়াছিলাম।

কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা মির্জা সুলতান হোসেনীর পুত্র মির্জা রুস্তমকে "খাঁ খানান" উপাধিকারী ও বৈরম খাঁ কজ্জলবাসের * পুত্র আবদার রহিম খাঁকে, তাহার পুত্রদ্বয় এরিদজী ও দারাবকে, এবং মির্জা আলীবেগ আকবর সাহী বংশ সম্ভূত সের খোজাকে, আমি তাহাদের স্ব স্ব পদোচিত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, রত্নখচিত তরবারি বক্ষোবেষ্টনকারী কোমরবন্ধ, অশ্ব এবং রত্নখচিত অশ্ব-পৃষ্ঠাসন প্রদান করিলাম। †

পক্ষান্তরে, আবদর রহমানের পুত্র বিনানুমতিতে কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে আমার অসন্তোষ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। কারণ আজ্ঞাবাহিতাই কর্ম্মশীলতার পরিচয়—মৌখিক অঙ্গীকার নহে।

আমার সিংহাসন অধিরোহণের পূর্ব্বেই কাবুলবাসী লাল বেগকে "বাজ বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলাম। সিংহাসন অধিরোহণের প্রায় এক মাস পরে, আমাকে সম্মান প্রদর্শন অভিপ্রায়ে সে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, আমি তাহাকে এক হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া দুই হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম এবং বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে বসাইলাম। এই সময়ে তাহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার দিলাম। আর সকল শ্রেণীর সামন্তগণকে জানাইয়া দিলাম যে,

* আকবরের প্রথম মন্ত্রীর পক্ষে এ উপাধিটি অবজ্ঞা-সূচক বলিয়া বোধ হয়। "কজ্জলবাস" অর্থে লাল টুপি। এটি সাধারণ পারস্যবাসীর উপাধি।।

† সম্ভবতঃ এই উপহারগুলি সম্রাটের অভিষেক-উপলক্ষে বিতরিত হইয়াছিল।

যে তাহার প্রভুতা উপেক্ষা বা প্রতিরোধ করিবে, রাজা বাহাদুর ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিহত করিতে পারিবেন। আরও ব্যবস্থা করিয়া দিলাম যে, তাহার অধীন কর্ম্মচারিগণের বৃত্তি বা জায়গীর অপেক্ষা তাহার বৃত্তি বা জায়গীর অধিকতর মূল্যের হইবে, কারণ সে যে আমার বংশের অতি বিশ্বস্ত সেনানী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, একথা আমি ভুলি নাই। তাহার পিতার উপাধি ছিল "নিজাম এ কাবাব" *; আর সেও আমার পিতৃব্যের চিরাগ্‌চী বা বাতি-প্রজ্বালন-বিভাগের কর্ত্তা ছিল।

কাবুলবাসী মহম্মদ হাকিম মির্জার একমাত্র পুত্র পূর্ব্বে পাঁচশত অশ্বের অধি-নায়ক ছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। আর কানাজন নামক জনৈক রাজপুত মাহারাট্টাকে আট শত অশ্বের অধিনায়ক পদ হইতে উন্নীত করিয়া পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। সমশ্রেণীস্থ সকলের অপেক্ষা এই ব্যক্তি আমাতে অধিকতর অনুরক্ত।

মীরণ সদর উদ্দিন পূর্ব্বে কেবলমাত্র তিন শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল; আমি তাহাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। এই ব্যক্তি আমার পিতার কর্ম্মচারিগণের নামের তালিকায় কার্য্যকাল হিসাবে সকলের শীর্ষস্থানীয়। যখন সেখ আবদুল নবী আমাকে "চল্লিশ হদিশ" পাঠ করাইতেন, সেই সময়ে সে (মীরণ সদর উদ্দীন) রাজকীয় পুস্তকাগারে কর্ম্ম করিত। সত্যই বলিতেছি, আমি এই ব্যক্তিকে "খলিফা" বা সর্ব্বপ্রধান ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু পিতার বিবেচনায় যদি মকদুম উল মুলকের নাম ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে আমার গুরুগণমধ্যে আবদুল নবীই সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী; এই শেষোক্ত ব্যক্তির আদিম নাম সেখ আবদুল্লা। এই ব্যক্তি বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং বিষয়বর্ণনা ও বাক্-পটুতায় তাহার সমসাময়িকগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। লোকটির অনেক বয়স হইয়াছিল। বাল্যকালে, আফগানী সের খাঁ ও তাহার পুত্র সেলিম খাঁর উপর ইহার অমিত প্রভাব ছিল। গ্রহগণ সম্বন্ধে ইহাঁর জ্ঞান অতুলনীয় ছিল, কিন্তু পিতার সময়ে ইহার গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল না। ফলতঃ সেখ আবদুল নবীরই পদোন্নতি ঘটিয়াছিল।

যখন হাকিম হাম্মামকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মা-ওয়ের-অন নেহের (Trans-oxiana) প্রদেশে পাঠান হয়, সে সময়ে মীরণ সদর জাহানকে (পূর্ব্বকথিত সদর উদ্দীনকে) উজবেগগণের অধিপতি আবদুল্লা খাঁর পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে তাহার সমীপে সহানুভূতি-জ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করা হয়। তিন বৎসর পরে সে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে, পিতা তাহাকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেন। সময়ে সময়ে সে দুই হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পদে এবং সাম্রাজ্যের "সদর" অর্থাৎ দাতব্য অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, সকল অবস্থাতেই সে সমভাবে আমার মঙ্গলকামী। প্রকৃত বীরত্ব ও সদ্‌গুণ সম্বন্ধে সে অপর অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নহে। তাহার শিশুকাল হইতেই আমার প্রতি স্নেহানুরাগ তাহার হৃদয় মধ্যে প্রতি-ষ্ঠিত আছে। সকল সময়েই সে তাহার কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে। যুবরাজ অবস্থায়, আমি তাহার অভিলষিত পদ প্রদান বা পরিমাণ

* রন্ধনশালার অধ্যক্ষ।

নির্ব্বিশেষে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন, এক্ষণে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে প্রস্তুত আছি, একথা তাহাকে লোক দ্বারা জানাইলাম। বক্সীগণের দ্বারা সে আমাকে জানাইল যে, চারি সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলে, সে আপনার আয় হইতেই তাহার দেনা শোধ করিতে সমর্থ হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে কাহাকেও এক শতের অধিক অশ্বের অধিনায়ক করিব না, এই আমার নিয়ম ছিল; কিন্তু সদর উদ্দীনের অনুকূলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। হৃদয়ই প্রকৃত ভক্তি-অনুরাগের আবাস; সহস্র তীর্থ দর্শন অপেক্ষা একটি বিশ্বস্ত হৃদয় অধিকার করা আমি অধিকতর পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করি। আমাদের ধর্ম্মে আস্থাবান্ হউক বা না হউক, আমি কাহারও ন্যায়মূলক প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সাধ্যমত অনবহিত হইব না। এই বহুযুগাগত পৃথিবীতে আমার মত অনেক লোক আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে; পরকালে প্রয়োজনে লাগিতে পারে, এমন কোন পুণ্য এই দ্রুতগামী সময়ে সঞ্চিত করা অপেক্ষা আর কি অধিকতর বাঞ্ছিত হইতে পারে? এই পৃথিবীতে সৎকার্য্য এবং লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করার ফল অমূল্য। নিজের কথা বলিতেছি। চরিত্রহীন উত্তরাধিকারী উড়াইয়া পুড়াইয়া দিবে, এমন ধনরত্ন রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটি হৃদয়ের প্রীতিসাধন করা আমি অধিকতর সন্তোষের বিষয় বলিয়া মনে করি।

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ।

স্মরণ রাখিও, বৎস! এই পৃথিবী চিরকালের জন্য অধিকৃত বস্তু নহে। ইহা নির্ভরতা ও আশার আবাসস্থল নহে। সকল পুরুষের আশীর্ব্বাদভাজন সলমনের সিংহাসন বাতাসে অর্পিত হইয়াছিল—এ কথা কি শ্রবণ কর নাই? যিনি জ্ঞান ও ন্যায়ের পরিচালনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহার চেষ্টা মানবজাতির শক্তির অনুকূলে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী, সেই ব্যক্তিই সকল সম্মানের অধিকারী। জ্ঞানীই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করে; কিন্তু তুমি যাহাই কর, স্মরণ রাখিবে যে, পৃথিবী তোমার নিকট হইতে অপসৃত হইতেছে। কেবলমাত্র সেই বস্তুই প্রয়োজনীয়, যাহা তুমি কবরে লইয়া যাইতে পার—তোমার সঞ্চিত ও পরিত্যক্ত ধনরাশি কোনই প্রয়োজনে আসিবে না। বিজ্ঞানুমোদিত কার্য্যই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। জানিবে শিকারী যেমন কৌশলী, বৃদ্ধ ব্যাঘ্রও তদ্রূপ। শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে, অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ব্যাঘ্রই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। যুবক সেনানীর তরবারি যতই তীক্ষ্ণধার হউক না কেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইও না। যুদ্ধকুশল বহুদর্শী রণবীরকে সাবধান। সিংহ বা হস্তীর সহিত মল্ল-যুদ্ধ করিবার শক্তি একজন যুবা ব্যক্তির থাকিতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ শৃগালের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার কোথায়? ভূয়োদর্শনে, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের প্রভাব অনুভব করিয়া, লোকে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। তোমার রাজ্য যদি সুখসমৃদ্ধিশালী দেখিতে চাও, ভুঁই-ফোড় লোকের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার বিশ্বস্তচিত্তে কদাপি ন্যস্ত করিবে না। বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে বহু-যুদ্ধে পরীক্ষিত সৈন্য ভিন্ন অন্য লোক নিযুক্ত করিবে না। সুশিক্ষিত

শিকারী কুকুর ব্যাঘ্র দর্শনে ভয়কম্পিত হয় না। সিংহ অদৃশ্য থাকিলে, শৃগাল যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। মৃগয়াকর্য্যে তোমার সন্তানকে সুশিক্ষিত কর; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সে ভয় দমন করিতে সমর্থ হইবে।

সুখের ক্রোড়ে লালিত হইলে, সাতিশয় সাহসী ব্যক্তিও যুদ্ধক্ষেত্রদর্শনে কম্পিত-কলেবর হয়। পৃথিবীতে দুইটি জীব আছে, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণঘোটকের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাদিগকে বালকেও সহজে আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধস্থলে যাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিবে, সে উহাদের অন্যতর; ভাগ্যক্রমে যদি সে শত্রুহস্ত হইতে অব্যাহতি পায়, তুমি তাহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করিবে। যে আপনার ভীরুতা স্বীকার করে, সে বরং ভাল, যে অসিধারী শত্রুসংঘর্ষে রমণীর ন্যায় মস্তক ঘুরাইয়া লয়, সে সাতিশয় ঘৃণ্য।

দেওয়ান।

মির্জ্জা ঘিয়াস বেগের * গুণ সম্যক্‌ভাবে বর্ণনা করা আমার অসাধ্য।

আমার পিতার সময়ে ইনি প্রাসাদের প্রধান ভাণ্ডারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা ইহাঁকে "এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক" এই উপাধি দিয়াছিলেন। আমার রাজত্বগ্রহণের কিছু কাল পরে আমি ইহাঁকে "দেওয়ান" করিয়া উজীর খাঁর পদে বসাইলাম এবং "এত্তেমদ উদ্ দৌলা—এই উপাধি এবং সঙ্গে সঙ্গ বৃহৎ দামামা ও নিশান দিলাম। পাটীগণিতবিদ্যায় এ সময়ে ইহাঁর সমকক্ষ কেহই নাই; লিপিকুশলতায় ইনি অদ্বিতীয়; পুরাকালের সকল শ্রেণীর কাব্যের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতায়, এবং অবলীলাক্রমে উহার আবৃত্তি বিষয়ে ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই; এমন গীতিকাব্যসংগ্রহ নাই, যাহা ইনি সযত্নে রক্ষা করেন নাই, এবং যাহার উৎকৃষ্টতম অংশগুলি ইনি প্রতিলিপি করেন নাই। সহস্র মুকেরা ইয়াকুতি * অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক বিষয় এই যে, উহাদের আবৃত্তিকালে ইহাঁর মুখ মধুর হাস্যে উদ্ভাসিত হয়। রাজকার্য্য বিষয়ে যে সকল বিধি ইহাঁর পরামর্শানুমোদিত নহে, সে সকল বিধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ সেরেস্তায় স্থায়ী স্থান পাইবার সম্ভাবনা সাতিশয় অল্প।

(এই স্থানে মন্ত্রীর প্রশংসাবাচক পাঁচটি বয়েদ আছে। তাহাদের অনুবাদ বিরক্তিকর হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।)

নুরজাহান।

বলা বাহুল্য, এই এত্তেমদ্ উদ্ দৌলা আমার সহধর্ম্মিণী নুরজাহান এবং আসফ খাঁর পিতা। আসফ খাঁকে আমার সহকারী সেনাপতি (Liuetenant-General) করিয়াছি এবং পঞ্চ সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই উপাধি দিয়াছি। আমার অন্তঃপুরবাসিনী চারি শত রমণীর মধ্যে নুরজাহান প্রধানা, ইহাঁকে আমি ত্রিংশ সহস্র অশ্বের অধিনায়িকা, এই উপাধি দিয়াছি। আমার রাজ্যমধ্যে এমন কোন সহর নাই, যেখানে ইনি স্বীয় রুচি ও বায়শীলতার পরিচয়স্বরূপ কোন বৃহৎ প্রাসাদ বা উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আমার বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া

* ডাউ সাহেবের মতে ইহার নাম "মাজা ক্লাইয়াস"।

* রিচার্ডসনের অভিধানে এই নামের একটি উত্তেজক পানীয়ের উল্লেখ আছে; চুনি ইহার উপাদানের অন্যতম।

পূর্ব্বে ইনি আমার পরিবার মধ্যে স্থান পান নাই। আমার পিতার সময়ে ইনি সের আফগানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধা হন। সেই ব্যক্তি নিহত * হইবার পরে, আমি কাজীকে ডাকাইয়া নুরজাহানের সহিত যথারীতি বিবাহিত হই। যৌতুক স্বরূপ আমি ইহাঁকে আশী লক্ষ আসরফি দান করি। জহরত ক্রয় করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইনি এই টাকা আমাকে দিতে অনুরোধ করেন। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া এই টাকা ইহাঁকে দান করি। ইহা ব্যতীত চল্লিশটি মুক্তায় গ্রথিত এক ছড়া মালা ইহাঁকে উপহার দিলাম। ইহার এক একটি মুক্তার মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। †

যে সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে কি গার্হস্থ্য ব্যাপারে, কি ধনরত্নরক্ষণে, ইনিই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ইনি সম্পূর্ণভাবে আমার বিশ্বাসভাজন। বলিতে কি, আমার সাম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এই সুশিক্ষিত, মেধাসমন্বিত বংশের কন্যা-রত্ন। ইহাঁর পিতা আমার দেওয়ান, পুত্র আমার অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি, এবং কন্যা আমার সকল চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশভাগিনী।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্রকে আমি তোপখানার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম। ইনি রায় রেঁয়ে "উপাধিধারী। আমার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যত কামান বা গোলন্দাজ আছে, তাহা ব্যতীত এই বিভাগে যে বাট হাজার উষ্ট্রচালিত কামান ও প্রতি কামানের জন্য দশ সের করিয়া বারুদ ও কুড়িটি গোলা আছে, আর বিশ হাজার অন্য প্রকার কামান আছে, উপযুক্ত বারুদাদি লইয়া সে সকল সময়েই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবে—আমি তাহাকে এইরূপ আদেশ দিলাম। এই বিভাগের ব্যয়ভারবহনার্থ আমি পনরটী পরগণার আয়—এক লক্ষ * বা পাঁচ ডাঁঙ্কি আসরফি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। এই সজ্জিত আগ্নেয়াস্ত্র সম্রাট্‌বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সকল স্থানেই যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

কথিত রায় রেয়েঁ আমার পিতার সময়ে কিছু কাল দাওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পিতার জনৈক পুরাতন কর্ম্মচারী। এক্ষণে ইনি সাতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে ইহাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও সৈনিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় ইনি ছয় বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার সহিত ইনি প্রভূত ধনরাশিও সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাঁর সমশ্রেণী কোন হিন্দু ইহাঁর অপেক্ষা ধনী নহে। যে সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে এককালে সহরের কতকগুলি স্বজাতীয় মহাজনের নিকট ইহাঁর দশ ক্রোর টাকা গচ্ছিত ছিল। পিলখানার তত্ত্বাবধায়ক-পদ হইতে উন্নীত হইয়া এক্ষণে ইনি উজীরউল্‌-ওমরা"—এই উপাধি পাইয়াছেন।

* সম্রাটের কৌশলে যে ইনি নিহত হন, এ কথার প্রসিদ্ধি আছে। ঘটনাটি কতকটা ডেভিড রাজা ও বাথসেবার গল্পের অনুরূপ।

† এইখানি আটটি কি নয়টি পদ বিশিষ্ট একটি বাক্য আছে। বাক্যটি পাঠ করা অতীব কঠিন। সম্ভবতঃ অহিফেনের চাষ বা বিক্রয় জনিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

* প্রায় নয় লক্ষ টাকা। এই বিভাগের পক্ষে ইহা নিতান্তই অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয়।

পদপ্রদান।

একটি সুযোগ পাইয়া আমি বোখারা নিবাসী সৈয়দচাঁদের পুত্র সৈয়দকামালকে সাত শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া, এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন সম্রাট্‌গণের রাজধানী দিল্লি নগর জায়গীর-স্বরূপ তাহাকে দান করিলাম। আফগান দিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কামালের পিতা পেশোয়ারে নিহত হয়। খোরম এ আজিমের পুত্র মির্জা খোররেমকে দুই হাজার অশ্বের অধিনায়কের পদ হইতে উন্নীত করিয়া তিন হাজার অশ্বের অধিনায়ক পদে বসাইলাম।

সতীদাহ।

হিন্দু বিধবারা মৃত স্বামীর সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হয়—এরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। পূর্ব্বে আমি এই নিয়ম করিয়াছিলাম যে, সম্মত থাকিলেও কোন পুত্রবতী বিধবাকে এইভাবে 'বলি' দেওয়া হইবে না। এক্ষণে আমি আদেশ করিলাম যে, লোকে যাহাই বলুক, কিঞ্চিৎ মাত্রও বলপ্রয়োগে এ কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে না। অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বাধা দেওয়া বা কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না। ঈশ্বর আমাকে তাঁহার মঙ্গলময়তার ছায়াস্বরূপ গঠিত করিয়াছেন। জাতিবিশেষের সমস্ত লোকের নির্দ্দয়ভাবে হনন-চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্য করা আমার ঈশ্বরদত্ত চরিত্রের অনুরূপ হইবে না। সমস্ত হিন্দুস্থানবাসীর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ* প্রতিমা-পূজক হিন্দু। সমস্ত ব্যবসায় বস্ত্র তন্ত্র বয়নপদ্ধতি হস্তজাত শিল্প, ও অন্যান্য লাভজনক কারবার, সমস্তই হিন্দুগণের নেতৃত্বাধীন। ইহাদিগকে যদি সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের ধর্ম্ম যাহাই হউক, ইহারা সেই ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। ইহারা আপনাদের নির্ম্মিত জালে আপনারাই পড়িবে। ঈশ্বরদত্ত দণ্ড হইতে ইহাদের অব্যাহতি নাই; কিন্তু একটা সমগ্র জাতি ধ্বংস আমার কার্য্য নহে।

* এখনও এই অনুপাত অক্ষুণ্ণ আছে। বিসপ হীর তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ড দেশে Protestant ও Roman Catholic গণের অনুপাত ঠিক মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাতের অনুরূপ।

অবসরদান।

নিম্নতর বিধির মধ্যে আমি আদেশ করিলাম যে, কোন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী স্বীয় জন্মভূমি দর্শনাভিলাষী হইলে, মীর বক্‌সী সেখ ফরীদের নিকট সে আবেদন করিবে; সহজেই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে।

সনন্দ দান।

বৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল সনন্দ দেওয়া হইত, তাহা সিন্দূরে লিখিবার রীতি ছিল। আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিলাম।

বাঙ্গালার দেওয়ান।

আমি অসীম ক্ষমতা দান করিয়া উজীর খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিলাম এবং সেখানকার রাজস্বের অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাকে সেই দেশে পাঠাইলাম। বিগত দশ বৎসরের প্রকৃত হিসাব এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মর্য্যাদাদান।

বাদাক্‌সনের অধিপতি মির্জা সারোখের পুত্রগণের মধ্যে মির্জা সুলতান সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত। আমি তাহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া থাকি। আমি তাহাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি করিয়া, আমীর-

উল্-ওম্রাহের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলাম। খান-এ-আজ্‌মের পুত্র মির্জা সেমসের দাবীর তদন্ত করিতে আমি বাজ বাহাদুরকে নিযুক্ত করিলাম। মানসিংহের প্রীতি-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার পুত্র ভাও সিংহকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক—এই সম্মান দান করিলাম। মানসিংহের পনের শত পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে দুই তিনটি করিয়া পুত্র জন্মিয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি; তন্মধ্যে কেবল এই ভাও সিংহই জীবিত আছে। পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে পারে, ইহার এমন কোন গুণ নাই। তত্রাচ আমি ইহার পদোন্নতি করিয়া দিলাম। আমার পিতার সময় এই ব্যক্তি পাঁচ শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল।

কাবুলবাসী ঘোর বেগের পুত্র জেমানা-বেগ বাল্যকাল হইতেই আমার অধীনে কার্য্য করিত। আমার সিংহাসন অধিরোহণের পূর্ব্বে সে পাঁচশত অশ্বের অধিনায়ক হইয়াছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম ও "মহবত খাঁ" এই উপাধি দিলাম; সেই সঙ্গে তাহাকে সাগ্‌রেদ বীসার উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। কারখানার শিক্ষানবীসগণের তত্ত্বাবধান করাই এই কর্ম্মচারীর কার্য্য। জিয়া-উদ্দীনকেও এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই সম্মান প্রদান করিলাম।

আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ও অপর অনুচরগণ মধ্যে বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে, আমি অশ্বালয়ের অধ্যক্ষ ভিকন্ দাসকে প্রত্যহ দুই শত অশ্ব আমার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলাম। খঞ্জ, জরাজীর্ণ বা শ্রমক্লিষ্ট অশ্বসমূহ যে আমার বাহিনীর অন্তর্গত ছিল, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

পরভেজের বিবাহ।

হিজিরা ১০১৯ বৎসরে, শ্রাবণ মাসের ১১ই তারিখে, * বৈরম মির্জার পৌত্র মির্জা রুস্তমের কন্যার সহিত আমি আমার প্রিয় পুত্র পরভেজের বিবাহ দিলাম।

যৌতুকস্বরূপ এক লক্ষ আসরফি দান করিলাম। উৎসব উপলক্ষে যে সকল আমীর ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল, তাহাদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হইল। উৎসবক্ষেত্রে প্রায় ১০০ হিন্দী মণ চন্দন, মৃগনাভি, অম্বরগ্রীশ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ভস্মীভূত করা হইল। ইহা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার অনুমিত হইবে। সন্ধ্যাকালে পাত্রী প্রাসাদে আগমন করিলে, আমি তাহাকে ষাটটি মুক্তাগ্রথিত এক ছড়া মালা উপহার দিলাম; এক একটি মুক্তা আমার পিতা দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। আমি বরকন্যাকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মাণিক দিলাম। পুত্রবধূর ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম, আর তাহার পরিচর্যার জন্য এক শত সুরঠবাসিনী রমণী নিয়োজিত করিলাম।

কর্ম্মনিয়োগ।

মির্জা আলী আকবর সাহীকে চারি সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম ও কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইলাম। সেই সময় উপহারস্বরূপে তাহাকে এক লক্ষ টাকা, রত্ন-খচিত পৃষ্ঠাসনসজ্জিত একটি মূল্যবান্ অশ্ব, রত্ন-খচিত কোমরবন্দ ও পেশ-কবজ, ও একটি শিরোভূষণ (শির-পেঁচ) প্রদান করিলাম।

* খ্রীষ্টাব্দ ১৬১০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর।

বখের খাঁ মুজ্জুম সানী আমার পিতার সময়ে তিন শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল। আমি ক্রমশঃ তাহার পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই উপাধি দিলাম, এবং পরিশেষে মুলতানের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলাম। আলী খাঁ নামক নদীর ও তৎপার্শ্বস্থ পরগণাসমূহের "ফৌজদারী" ভারও তাহাকে দিলাম। ইহা ব্যতীত, তাহাকে নূরজাহান বেগমের ভগিনী-কন্যার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিবার মনন করিলাম। সেইজন্য, তাহার কর্ম্ম নিয়োগ-পত্রে তাহাকে "পুত্র" আখ্যায় অভিহিত করিলাম। সামরিক কার্য্যে সে বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিয়াছে। সুযোগ পাইলেই তাহার আরও পদোন্নতি করিয়া দিব, মনে মনে আমার এই সংকল্প রহিল।

তিন সহস্র টাকার বৃত্তি দিয়া, আমি রাণ সিংহকে আমার পিতার সমাধিস্থানের তত্ত্বাবধারক-পদে নিযুক্ত করিলাম। সমাধি-স্থানে আগ্রা সহরের পশ্চিমদিকে তিন ক্রোশ দূরে *। আমার এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, শ্রেণীনির্ব্বিশেষে আমীরগণ অগ্রে সেই পবিত্র স্থানে সম্মান প্রদান করিয়া না আসিলে, আমাকে অভিবাদন করিবার অনুমতি পাইবে না।

আমীর উল্-ওমরা এক দিন আমাকে ইঙ্গিতে একটা কথা বলেন। সে কথাটি আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল বিবেচনায়, আমি এই মর্ম্মে নিয়ম করিলাম যে, বহুদর্শিতার কষ্টি-পাথরে অগ্রে পরীক্ষিত না হইলে, কোন ব্যক্তিকে রাজকার্য্যের ভার দেওয়া হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কার্য্যবিশেষ সুসিদ্ধ হইবার সম্ভব কি না, পূর্ব্বে তাহার একটা আনুমানিক নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। জনৈক গণ্ডমূর্খ গুরুতর কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আর অতি সামান্য বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা, মশকের বিরুদ্ধে বাজপক্ষীকে নিযুক্ত করার তুল্য। এবরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। সম্রাটের নিকটে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের চরিত্রের উপর রাজ্যের মঙ্গল ও সুশৃঙ্খল-কার্য্য বহুলভাবে নির্ভর করে।

(এইখানে চারিটি বয়েদ্ আছে। ইহার হস্তলিপিপাঠ দুঃসাধ্য।)

যুদ্ধ-কল্পনা।

যে সময়ে এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে শুনিলাম যে, সমরকন্দ দেশ (যাহা ইতিপূর্ব্বে উজ্‌বেগজাতীয় বকী খাঁর শাসনাধীন ছিল) ওয়ালী খাঁ নামক জনৈক সর্দ্দারের হস্তে পতিত হইয়াছে। তাহার প্রভুতার প্রথম অবস্থায়, সে আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, এইটি সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে হইল। তাহাকে বাধা দিবার জন্য পরভেজকে পাঠাইব, এবং পরে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ (দাক্ষিণাত্য) আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং মা-ওয়েরউল্-নেহের (Transoxiana) প্রদেশে যুদ্ধ যাত্রা করিব,—প্রথমে আমি এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্য করগত করিয়া আমার বিজয়ী সেনাকে সমরকন্দ দেশাভিমুখে লইয়া যাইব, এই ইচ্ছা আমি বহুদিন হইতে মনে পোষণ করিতেছিলাম। পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির লোভ আমি পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সৈন্য-সহায়হীন কোন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করা অযৌক্তিক, এইরূপ মনে করিয়া

* সেকেন্দ্রা অবস্থিত। এই সুন্দর সৌধের বিবরণ ১৮২৫ খ্রীঃ রচিত বিসপ্ হীবরের পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

আমি পরভেজকে পুনরায় উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে পাঠাইলাম। জায়গীরস্বরূপে ঐ প্রদেশটি পরভেজকে, এবং মূলতান ও আগ্রা প্রদেশ অন্যান্য পুত্রকে দিব এইরূপ স্থির করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমি এই বৎসরেই দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে যাত্রা করিবার অবসর পাইব। কুগ্রহচালিত হইয়া রাণা যদি আরও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আমার সমবেত সৈন্যকে তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিবার জন্য নিযুক্ত করিব।

যে সকল আমীরকে পরভেজের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে আসফ খাঁ সর্ব্বপ্রধান। এই ব্যক্তি আমার পিতার উজীর ছিল। এক্ষণে আমি ইহাকে পাঁচ হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, এবং বৃহৎ দামামা ও নিশান দিলাম। হীরক খচিত একটি তরবারি, একটি রণ-হস্তী ও একটি সুসজ্জিত অশ্বও এই সময়ে ইহাকে উপহারস্বরূপে দান করিলাম। ইহাকে "আতাবেক," অর্থাৎ আমার পুত্রের তত্ত্বাবধায়ক, এই পদে নিযুক্ত করিলাম। ইহার নিবাস কাজবীন দেশে। ইহার পূর্ব্বনাম জাফর বেগ। ইহার পিতার নাম বদিয়া-উজ্ জেমান, এবং পিতামহের নাম আগা বেল্ দাল। শেষোক্ত ব্যক্তিটি পারস্যের মৃত সম্রাট্ তামাস্পের উজীরগণের অন্যতম ছিল। পিতাই জাফর খাকে, "আসফ্ খা" নাম দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সে মীর বক্সীগণের অগ্রণী ছিল; পরে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণের প্রভাবে সে "উজীর" পদে উন্নীত হইয়াছিল। অসীম প্রভুতা লইয়া সে দুই বৎসর যাবৎ উজীর-পদে আসীন ছিল। তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন দেখিয়া, তাহাকে আমি আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করি। এই সময়ে আমি সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে বিনা আপত্তিতে এই ব্যক্তির বিচার-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলাম। ইহার বিচার-মীমাংসা যে সততা-প্রণোদিত হইবে, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

এই সময় সাহজাদা পরভেজকে পাঁচ লক্ষ টাকার মূল্যের এক ছড়া মুক্তার মালা উপহার দিলাম। রাণার রাজ্যমধ্যে বেণারসের তুল্য একটি নূতন সহর নির্ম্মাণ করাইতে এবং তাহার নাম "পরভেজাবাদ" রাখিতে পুত্রকে বলিয়া দিলাম। সৌধনির্ম্মাণশিল্পী আবদর রেজাককে, এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক আখ্যা দিয়া সাহজাদার বক্সীস্বরূপে নিযুক্ত করিলাম। আসফ খাঁর পিতৃব্য আটশত অশ্বের অধিনায়ক মোখতাওর বেগকে সাহজাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলাম। সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আমি আফগানী রোকণ-উদ্দীনকে "সের খাঁ" এই উপাধি দিয়াছিলাম। এখানে কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই ব্যক্তি অসাধারণ সাহসসম্পন্ন। কাশ্মীর দেশের কতকগুলি সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া ইহার পানদোষ জন্মিয়াছিল; কিন্তু লোকটির বিচক্ষণতা অতুলনীয়।

আবুল ফজল্।

আবুল ফজল অসংযতচরিত্র ছিল, ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, তাহার পুত্র সেখ আবদর রহমনকে আমি দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। আবুল ফজল্ আমার পিতার রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আমার জীবনের ন্যায় সহস্র জীবনেও সম্যক্‌ভাবে করিতে অসমর্থ, সেই মহম্মদ কেবলমাত্র অসাধারণ বাগ্মিতা-সম্পন্ন জনৈক আরব-বাসী, এবং কোরাণের পবিত্র উপদেশাবলী

কেবলমাত্র তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত, আবুল ফজল আমার পিতার মনে এই প্রকার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল। এই সকল কারণে আমিই তাহাকে নিহত করিতে ও তাহার মস্তক আমার সমীপে আনিতে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তজ্জন্য পিতার বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলাম।* সেই জন্যই হজরতের পবিত্র নামে শপথ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারই সাহায্যে, আমি হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইব। বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, এই কার্য্যে পিতা আমার উপর এতাদৃশ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি আমা অপেক্ষা আমার পুত্র খসরুকে অধিকতর স্নেহ-যত্ন দেখাইতে ও মান-মর্য্যাদা দান করিতে লাগিলেন, এবং স্পষ্টতঃ বলিলেন যে, তাঁহার দেহাবসানের পরে খসরুই সম্রাট্ হইবে। সেখ সাদী বলিয়াছেন—"ঈশ্বর যাহাকে লইয়া যাইবেন, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন; নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে, আমরাই তাহার মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত করিলাম।" যাহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিশেষে পূর্ণ হইল; আবুল ফজলের মৃত্যুর পরে পিতার মতি-গতি সুপথে ফিরিল; তিনি আবার বিশ্বাসী হইলেন।

পুরস্কারদান।

তুর্কমান কারাখাঁর উজীর সাদেক মহম্মদ খাঁর পুত্র, জাহেদ খাঁকে আমি দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি আমার পিতার অধীনে কামান-বিভাগের সেনাপতির কার্য্য করিত, এবং আসেরী অবরোধের সময় অশেষ কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিল; এই সব কারণেই এখন তাহার পদোন্নতি হইল। এই সময়ে আমি তাহাকে ত্রিশ হাজার টাকা ও একটি বুজুর্গ আদেম * প্রদান করিলাম।

মহাপুরুষ-চরিত।

রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা
স্বামীজি মহারাজ।

১৮৭৫ সংবতে (১৮১৮ খৃঃ) জন্মাষ্টমীর দিবসে আগ্রা নগরের পল্লী-গলিতে স্বামীজি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর বাল্য নাম লালা শিবদয়াল সিংহ। ইহাঁর পিতার নাম লালা দিল্‌ওয়ালী সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহাপুরুষগণের প্রতিভা ও কার্য্যাবলীর চিহ্ন শৈশবাবস্থা হইতেই বিকশিত হইয়া থাকে। স্বামীজিরও তাহাই হইয়াছিল। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলে, তিনি স্নানান্তে কোন নিভৃত স্থানে গিয়া একান্তচিত্তে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইতেন বলিয়া শুনা যায়। আরও শুনা যায় যে, তিনি অল্পবয়সেই নাগরী, গুরুমুখী ও পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই পার্শী ভাষায় উচ্চভাবযুক্ত ঈশ্বরবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

* জাহাঙ্গীর যে তাঁহার পিতার রাজত্বের ইতিহাস লেখকের হত্যাকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা সকলেই সন্দেহ করিত। এইখানে সম্রাট্ স্বয়ং সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন।

* কেহ কেহ বলেন, "আদেম" অর্থে মাণিক (চুনী)। তাহা হইলে একটা বড় চুনী দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

ইহার পর তিনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি পণ্ডিত ও মৌলবিগণকে পারমার্থিক উপদেশসূচক অনেক দোঁহা শুনাইতেন। তাহাদের মধ্যে একটী এই—

কবীর শোতা ক্যা করে, জাগন্ কী
কর চৌপ।
ইহ দম্ হীরালাল হ্যায়, গিন্ গিন্
গুরুকা সোঁপ॥

অর্থাৎ কবীর, তুমি শুইয়া কি করিতেছ? জাগরিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। তোমার এই শ্বাস প্রশ্বাসকে হীরা ও মাণিক্যের ন্যায় মূল্যবান্ জানিবে, এই শ্বাস প্রশ্বাসকে বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়, ইহাকে গণনা করিয়া গুরুকে অর্পণ কর, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম জপ কর।

এই সকল কথায় অনেকেই আস্থা স্থাপন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ মহাপুরুষগণের জীবনকথা অনেক সময়েই অতিরঞ্জিতভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। তবে এই সকল অতিরঞ্জিত বাক্য দ্বারা স্বামীজির বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। উত্তরকালে তিনি যে সকল শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সেই সকল শক্তির কিয়দংশে স্ফুরণ হইয়াছিল।

দিল্লীর সন্নিকটস্থ ফরিদাবাদ নগরে স্বামীজির বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুরের নাম লালা ইজ্জৎ রায়, এবং স্ত্রীর নাম রাধা। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীও অশেষগুণে গুণবতী ছিলেন।

মথুরার নিকটবর্ত্তী হাথরাস নামক স্থানে তুলসী সাহেব নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ অবস্থান করিতেন। স্বামীজির পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তুলসী সাহেব একদা স্বামীজিকে দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব-দয়াল কালে অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবে; ইহাঁকে সত্যপুরুষের অবতারস্বরূপ জ্ঞান করিবে, কদাচ অবহেলা বা অনাদর করিবে না।" গুরুর উপদেশানু-সারে পরিবারবর্গ সকলেই স্বামীজিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন।

স্বামীজি প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়া প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালক-গণকে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। কোন দরিদ্র বা ধনী ব্যক্তি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, এবং সাধ্যমত তাহাদের প্রার্থনা পূরণে যত্নবান্ হইতেন। তাঁহার স্ত্রী রাধাজিও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি নিজ অঙ্গের প্রায় সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া অনাথ আতুরদিগকে ভোজন করাইতেন, এবং এইরূপ কার্য্যে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

স্বামীজি কিছুদিন আগ্রা অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের বাঁদা সহরে সরকারী ডাক-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি লোকসকলকে নূতন ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অন্যের দাসত্ব করা তাঁহার পোষাইবে কেন? সুতরাং অল্পদিন পরেই তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার চাকরি করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামীজি তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "চাকরি

করিলে আমার ভজনপূজনের ব্যাঘাত হইবে।" পুত্রকে কিছুতেই সম্মত করিতে না পারিয়া পিতা পরিশেষে কৌশলক্রমে তাঁহাকে ফরিদাবাদে শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার শ্বশুরকে গোপনে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "যাহাতে শিবদয়াল চাকরি করিতে সম্মত হয়, তদ্বিষয়ে আপনি সাধ্যমত বুঝাইবেন।" শ্বশুরও জামাতাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বামীজি বলিলেন, "যদি দুই তিন ঘণ্টার জন্য কোন কার্য্য পাই, তবে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর সংবাদ পাইলেন যে, নিকটস্থ বল্লভগড় রাজবাটীতে রাজপুত্রকে পারসী পড়াইবার জন্য একটী লোকের প্রয়োজন। শ্বশুর ঠাকুর চেষ্টা করিয়া শিবদয়ালকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি স্বামীজি রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি বেতন ব্যতীত রাজবাটী হইতে প্রত্যহ একটী করিয়া রসদ (সিধা) পাইতেন। সে রসদের পরিমাণ এরূপ যে, আহারাদি বাদে তাঁহার যে উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা বিক্রয় করিলে কিছু কিছু অর্থাগমও হইত। রাজবাটীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এইরূপে উদ্বৃত্ত রসদ বিক্রয় করিত। কিন্তু স্বামীজি এই রসদের কিছুমাত্র নিজের জন্য রাখিতেন না, সমস্তই দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। কোন দীন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না।

বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া স্বামীজির প্রকৃতি এরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়কর্ম্মেই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, কোন কার্য্যই তাঁহার ভাল লাগিত না। রাজবাটীর শিক্ষকতা কার্য্যও তাঁহার ভাল লাগিল না। হঠাৎ এক দিবস তিনি চাকরিতে জবাব দিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা কোন বিবাহ উপলক্ষে সিকোহাবাদ নগরে গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুই দিন পরেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজি যেন পিতার এই আসন্নমৃত্যু পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই যেন সহসা চাকরিতে জবাব দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু-দিবসের পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি সমস্ত রাত্রি ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও ভজনা করিয়া পিতাকে সৎভাবে সংযুক্ত ও ঈশ্বরধ্যান-পরায়ণ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর স্বামীজি নিজ বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। স্বামীজি জ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম লালা বৃন্দাবন সিংহ। ইনি পরে বাহার বৃন্দাবন নামক এক মত চালাইয়া ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম লালা প্রতাপসিংহ। দ্বিতীয় ভ্রাতা পোষ্টাল বিভাগে ৫০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। কনিষ্ঠও ঐ বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বংশপ্রথানুসারে তেজারতি কারবারও চলিত। কিন্তু এই কারবার স্বামীজির মনোমত ছিল না। তিনি একদা কনিষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক্ষণে সংসার চলিবার মত এক প্রকার আয় যখন রহিয়াছে, তখন আর টাকার সুদ গ্রহণ করা কেন? এ কার্য্য নিতান্ত ঘৃণিত। অতএব আমার বিবেচনায় দেনাদারদিগকে ডাকাইয়া বল, তাহারা যদি দেনা পরিশোধ করিতে পারে ভাল, নচেৎ তাহাদের সম্মুখেই ষ্ট্যাম্প কাগজ পত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও।"

কনিষ্ঠ দ্বিরুক্তি না করিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

ইহার পর হইতে স্বামীজি এক নির্জ্জন বাটীর মধ্যে অভ্যন্তরস্থ গৃহে অন্ধকারময় স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে তিনি একাদিক্রমে চারি পাঁচ দিবস একাসনে বসিয়া থাকিতেন; আহারের নিমিত্ত বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও উঠিতেন না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অল্প সময় মাত্র সৎ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে সাড়ে সতর বৎসর কাল এই উপদেশ প্রদানে দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। এই উপদেশের ফলে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকেই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে নানাদেশীয় হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ সহস্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীও ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন ও আছেন। তন্মধ্যে মেট্রপলিটন কলেজের অধ্যাপক ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রের সম্পাদক সুবিখ্যাত পরলোকগত এন্ ঘোষ একজন।

স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মপ্রচলিত দেবদেবী-সমূহকে কাল্পনিক ও তদর্থ ব্রতাদিকে মিথ্যা বলিতেন। এজন্য অনেক লোক তর্ক করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিতেন, কিন্তু তাঁহার সামান্য উক্তিতেই তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, এবং তার্কিকগণকে বাধ্য হইয়া নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতে হইত। কেহ বা ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, কেহ বা তাঁহার বাক্যে ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সত্য পথ বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। এক সময়ে কাশী হইতে কোন এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বামীজির নিকট গমন করেন। স্বামীজি তাঁহার সহিত ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল সৎ আলোচনা করিয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর করিয়া দেন, এবং অবশেষে নানক প্রণীত গ্রন্থসাহেবের পাঠ ও অর্থ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলেন। পরে সেই পণ্ডিত স্বামীজির উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়া ছিলেন।

স্বামীজি সকল সম্প্রদায়েরই সৎ সাধক-দিগকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, ও তাঁহাদিগের সেবা করিতেন। পরমহংস, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সকলকেই তিনি দীনভাবে সেবা করিতেন। পরন্তু তিনি মিথ্যার খণ্ডনে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর ছিলেন।

সাধু আনন্দগিরি নামক এক অল্পবিদ্য সন্ন্যাসী আগ্রা সহরে বাস করিতেন। তিনি এক দিবস বিচারে স্বামীজির নিকট পরাজিত হইয়া আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে সহরের থানেদার সুদর্শন দাসের সাহায্যে স্বামীজির "সৎসঙ্গ" বন্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। স্বামীজির দরজায় দুই চারিজন কনষ্টেবল আসিয়া পাহারা দিতে লাগিল, বাহিরের কোন স্ত্রী বা পুরুষকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হইল না। ইহা দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, 'আমি কাহাকেও আসিতে বলি না; তোমরা যদি পার, ইহাদের যাতায়াত বন্ধ কর।' দুই তিন দিবস লোকজনের যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ রহিল। কিন্তু তাহার পর থানেদার একটী মোকদ্দমায় এমন বিপন্ন হইয়া পড়িল যে, সে স্বামীজির দরজা হইতে পাহারা উঠাইয়া লইল। ইহার পর সাধু আনন্দগিরির এমন একটী দুষ্কর্ম্মের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গোপনে আগ্রা হইতে পলায়ন করিতে

হইল। স্থানীয় অন্যান্য অনেক লোকও এই নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। তাঁহারা কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলয়ে সভা করিয়া, যাহাতে কোন বাড়ীর একটী লোকও স্বামীজির বাটীতে যাইতে না পারে, তাহার জন্য পরামর্শ ও অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ স্বামীজির উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, এবং সৎসঙ্গে যোগ দিয়া ও তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিল।

রাধাস্বামী নামের অর্থ এই যে, স্বামী শব্দে অখণ্ড মণ্ডলাকার জগতের আদিপুরুষ জগদীশ্বরকে বুঝায়; এবং চৈতন্যধারার বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধমুখী স্রোত রাধা শব্দ বাচ্য। প্রকৃতপক্ষে কোন মনুষ্যের নাম রাধাস্বামী নহে *। রাধাস্বামী মতে চারিটী কথা আছে; যথা—সত্যনাম, সত্য অনুরাগ, সত্যগুরু ও সৎসঙ্গ। নাম দুই প্রকার—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা যাহা লিখিত হয়, এবং যাহার কোন অর্থ আছে, তাহাই বর্ণাত্মক। যেমন গিরিধারী অর্থাৎ যিনি গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন; রাম অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতব্যাপী। এই সকল নাম বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক নামের অর্থ হয় না, এবং তাহা অক্ষর দ্বারা স্পষ্ট লিখা যায় না; যেমন ঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের শব্দ, মেঘগর্জ্জন, ইত্যাদি। দেহাভ্যন্তরে সুষুম্না নাড়ীতে যে চৈতন্যশক্তি জাগ্রদবস্থায় আত্মশক্তির মুখ্য ভাণ্ডার শ্বেতবর্ণ মস্তিষ্কের আধার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধারাক্রমে সর্ব্বশরীরে ব্যাপৃত হয়, সেই চৈতন্যধারার প্রবাহজনিত যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকে অনাহত শব্দ বা ধ্বন্যাত্মক নাম বলে। পরন্তু সেই চৈতন্য ধারার নিম্নমুখী স্রোত হইতে যে দশ প্রকার অনাহত শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাতে সাধকের প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়কে জাগরিত করে। সেই চৈতন্যধারার উর্দ্ধমুখী স্রোত হইতে যে দশ প্রকার অনাহত নাদ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই ধ্বন্যাত্মক নাম এবং যথার্থ পথপ্রদর্শক। ইহাই সত্যনাম বাচ্য। ইহা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য সহজে স্থিরীভূত হয়। ব্যষ্টিবাচ্য এই শরীরাভ্যন্তরে যে সাধক যতদূর অগ্রসর হন, মৃত্যুর পর তিনি সমষ্টিবাচ্য এই ব্রহ্মাণ্ডের ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র মনুষ্যশরীর সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র নমুনাস্বরূপ। আত্মা জগৎপতি পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মশক্তির বৃহৎ ভাণ্ডারের চৈতন্যধারা হইতে যতগুলি শ্রেণীবিভাগে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্য মনুষ্য শরীরেও ততগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। আত্মার ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র হইলেও পরমাত্ম-শক্তির অংশ বলিয়া উহা ক্ষুদ্রাকারে একই প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ। সত্য অনুরাগ ভিন্ন কেহই এ পথে অগ্রসর হইতে পারেন না।

যিনি পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যধারার অনাহত শব্দ অবলম্বনে মায়াতীত নির্ম্মল চৈতন্য-মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা জীবগণের উপকারার্থ সেই মায়াতীত মণ্ডল হইতে

* যেমন গোবিন্দসিংহ শিখদিগকে বাহগুরু নাম প্রচার করিতে বলিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সদ্গুরু আপনার ইচ্ছানুসারে নাম চালাইয়া থাকেন। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে। যে নামে পরব্রহ্ম পরমাত্মা অনুমিত হয়, তাহাই ভগবানের নাম, নচেৎ কোন নামই তাঁহার নাম নহে। কেননা তিনি নাম-রূপাদিবিহীন।

অবতীর্ণ হইয়া অবতাররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু শব্দবাচ্য। তিনি পূর্ণ ভক্ত ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ সদ্‌গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও ভক্তির আদর্শ দর্শন করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা করার নাম সৎসঙ্গ। নতুবা রাজাদিগের যুদ্ধ বা কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করাকে সৎসঙ্গ বলা যাইতে পারে না। উপরোক্ত সাধন প্রণালী রাধাস্বামী মতে এবং কবীর, নানক, পল্‌টু, দাদু, জগজীবন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মতে সুরত-শব্দ-যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুরত অর্থে আত্মা ও আত্মকিরণ শক্তি, তাহা হইতে উত্থিত অনাহত শব্দকে অবলম্বন করিয়া চলার নাম সুরত শব্দ সাধনা। সুরত-শব্দ-সাধনমার্গই সামবেদে দেবযান পন্থা নামে বিবৃত হইয়াছে। এই সাধনা ব্যতীত কেহই যথার্থ কৈবল্য ও নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। মুসলমানদিগের তরীকৎ-কারীরা এই 'সাধনাকে সুলতান উলজ্‌কার' বলিয়া থাকেন। বেদে লিখিত আছে, শব্দ ব্রহ্ম, নিঃশব্দ ব্রহ্ম ও প্রণব ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্ম ধ্বন্যাত্মক, নিঃশব্দ ব্রহ্ম বর্ণাত্মক ও তাহা ধ্বন্যাত্মকের অতীত স্থির অবস্থা। প্রণব ব্রহ্ম অর্থাৎ বর্ণাত্মক ওঁকার ও ধ্বন্যাত্মক ঘণ্টানাদরূপ ওঁকার। বাইবেলে লিখিত আছে, Word is God অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম। বৌদ্ধেরা ওঁকারকে হুং এবং মুসলমানেরা হু বলিয়া থাকে।

রাধাস্বামী পন্থীরা কবীর ও নানকের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। (বর্ত্তমান কবীর ও নানক পন্থীগণের মধ্যে অনেকেই কবীর ও নানকের গ্রন্থলিখিত সুরত শব্দ সাধনা অবগত নহেন)। রাধাস্বামী মতের অপর নাম সন্তমৎ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরুর অপর নাম সন্ত (নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি সন্তজি নামে অভিহিত হন, পরন্তু তাঁহাদের অনেকেই এই নামের উপযুক্ত নহেন বলিয়া বোধ হয়)। কবীর, নানক, তুলসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, পলটু সাহেব প্রভৃতি মহাত্মগণ সন্ত পদবী লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামীজির জীবনী কথা পুনরায় আলোচিত হইতেছে। একদিন প্রাতঃকালে তিনি নিজ বাটীতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় বুকীজি নাম্নী তাঁহার এক বিধবা শিষ্যা তাঁহাকে বলিল, 'আমাদের উদ্যানে (১) যে সকল সাধু দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন আছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন।' স্বামীজি বলিলেন, 'আমি কিরূপে তাঁহাদিগের উপর কৃপা করিতে পারি? কারণ আজি উদ্যানমধ্যস্থ সাধুদের মধ্যে কেবল সাধু বিমল দাস ও দয়াল দাস প্রাতে ছয়টার সময় সাধনায় বসিয়াছেন। অপর সকলেই নিদ্রিত রহিয়াছে।' সায়ংকালে সাধুরা স্বামীজির বাটীতে সৎসঙ্গ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্তা শিষ্যা সাধুদের বলিলেন, তোমরা সকলে সত্য করিয়া বল, আজি প্রাতঃকালে কে কোন্ সময়ে সাধনায় বসিয়াছিলে? তদুত্তরে সকলেই বলিল, কেহ সাতটার সময় কেহ বা আটটার সময় সাধনায় বসিয়াছিল, কেবল দয়াল দাস ও বিমল দাস ছয়টা হইতে সাধনা

(১) আগ্রা সহর হইতে এই উদ্যান প্রায় তিন মাইলউত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এক্ষণে তথায় স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। মহারাজা গোয়ালিয়রের সাহায্যে সমাধি মন্দিরটী রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা উহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় শ্বেতমর্ম্মরে মণি মাণিক্য জড়িত হইয়া নির্ম্মিত হইতেছে।

আরম্ভ করিয়াছিল। বুকীজি ইহা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃতা হইল।

স্বামীজির সম্বন্ধে আরও এমন অনেক জনরব শুনা যায়, যাহা অনেকেই কাল্পনিক উপন্যাস বোধে উড়াইয়া দিতে পারেন। সুতরাং এস্থলে আর সে সকল প্রবাদের উল্লেখ করা হইল না। তবে স্বামীজির উদারতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা এস্থলে বিবৃত হইল। আগ্রা সহরস্থ যমুনা নদীর তীরে সুস্বাদু জলবিশিষ্ট দুইটী কূপ আছে। শিষ্যেরা স্বামীজির সেবার জন্য সেই কূপ হইতে জল আনিতেন। একদিন অতিরিক্ত লোকসমাগম হেতু উক্ত সাধুদিগকে সর্ব্বপ্রথমে জল লইতে না দেওয়ায় তত্রস্থ কয়েকটী ব্রাহ্মণের সহিত সাধুদিগের বিরোধ হয়। পরে সাধুরা প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজিকে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করে। শুনিয়া স্বামীজি তাহাদিগের হস্তে একশত মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "তোমরা অবিলম্বে যমুনাতীরে গমন কর, এবং এই মুদ্রাগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া যোড়হস্তে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইস।" গুরুর আদেশানুসারে শিষ্যগণ সেইরূপই করিল। তখন ব্রাহ্মণেরা স্বামীজির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া রীতিমত উপদেশ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিল।

স্বামীজির সর্ব্বপ্রধান শিষ্যের নাম রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর। তিনি আগ্রা নগরীর পিপলমণ্ডি নামক স্থানে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, শৈশবাবস্থায় যখন তিনি দ্বিতল গৃহে কক্ষতলস্থ শয্যায় নিদ্রিত থাকিতেন, তখন এক বৃহৎকায় সর্প আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ফণা ধরিয়া দাঁড়াইত। এই ঘটনায় প্রথমতঃ তাঁহার মাতাপিতা ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার মাতা প্রত্যহ একটি পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া সর্পকে পান করিতে দিতেন, সর্প ঐ দুগ্ধ পান করিয়া চলিয়া যাইত।

সালিগ্‌রামের কুলপ্রথানুসারে সকলেই বাল্যকালে গোকুলবাসী গোঁসাইদিগের দীক্ষিত হইত। পিতামাতা সালিগ্‌রামকেও দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু সালিগ্‌রাম তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি তৎকালিক ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রথমতঃ সরকারি ডাকবিভাগে ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত হইয়া আঠার শত টাকা হইয়াছিল। তিনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও আগ্‌রা অযোধ্যাযুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বামীজির দেহান্তের পর রায় সালিগ্‌রাম তাঁহার পদাঙ্কানুকরণ করিয়া রাধাস্বামী মতের নেতা হন। তাঁহার সময়ে ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক এই মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। নানক পন্থী অনেক শিখও এই মত অবলম্বন করিয়াছিল। এই সময়ে এই মতাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্ম্মা ও ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

সালিগ্‌রামের প্রধান শিষ্যের নাম পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনি কাশীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে তিন শত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন।

রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর স্বামীজির ভ্রাতা প্রতাপের নিকট মিরাট সহরে স্বামীজির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে

দেখিবার জন্য প্রতাপের সহিত আগ্রায় উপস্থিত হন, এবং পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে স্বামীজির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সাক্ষাতে তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল স্বামীজির উপদেশ শ্রবণ করিয়া যারপর নাই পরিতৃপ্ত ও সংশয়বিহীন হন। ইহার পর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বামীজির জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সুকঠোর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বৈশাখের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে নগ্নপদে প্রস্তরাকীর্ণ প্রায় এক মাইল পথ অতিবাহন করিয়া গুরুসেবার জন্য কূপ হইতে জল আনিতেন। তদ্ব্যতীত দাঁতন কাটিয়া আনা, মৃত্তিকা যোগান, জাঁতায় গম পেশা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহও অবিকৃতচিত্তে উল্লাসের সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার আদর্শে অনেক শিষ্যই সেবা ভক্তি শিক্ষা করিত। তিনি যাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমুদয় আনিয়া স্বামীজির চরণে সমর্পণ করিতেন; স্বামীজি ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা কিছু উঠাইয়া দিতেন, তদ্দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কখন কখন শীতের গভীর রজনীতে গুরুশিষ্যে লণ্ঠন হস্তে যমুনাতীরে উপস্থিত হইতেন, এবং নিদ্রিত অনাথ দীন দরিদ্রের নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাদের গাত্রোপরি কম্বলাদি শীতবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেন।

এক সময়ে আগ্রা অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের হেড কোয়ার্টার কিছুকাল আগরাতেই ছিল। সে সময় রায় সাহেবকে দুই তিন ঘণ্টা মাত্র আফিসের কাজ করিতে হইত, অবশিষ্ট সময় স্বামীজির সহবাসে যাপিত হইত। পরে এই আফিস এলাহাবাদে উঠিয়া গিয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রায় সাহেবের কুলগুরু গোকুলবাসী গোঁসাইজিও স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে স্বামীজি কিছুদিন নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা করিয়া সকল লোককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। স্বামীজির অনভিমতে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু রায় সাহেব পূর্ব্বোক্ত আদেশ অবগত থাকিয়াও এক দিন তাঁহার নিকট গমন করেন। ইহাতে স্বামীজি নিজের খড়ম লইয়া তাঁহাকে ছুড়িয়া মারেন। রায় সাহেব তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথা প্রকাশ না করিয়া করযোড়ে আদেশ অবহেলার জন্য গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। স্বামীজি তখন তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। বস্তুতঃ স্বামীজি রায় সাহেবকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; তাঁহার কৃপায় রায় সাহেব পূর্ণ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন,—

সৎগুরু আউর পারশ্ মে, বড়ো অন্তরা জান্।
ওহ লোহেকো কাঞ্চন করে, এ করুলে
আপ্ সমান॥

অর্থাৎ পরশমণি ও সৎগুরুতে অনেক প্রভেদ। পরশমণি লোহাকে সোণা করে বটে, কিন্তু তাহাকে পরশমণি করিতে পারে না; কিন্তু সৎগুরু শিষ্যকে আপনার ন্যায় গুণসম্পন্ন করিয়া থাকেন।

স্বামীজি মধ্যে মধ্যে রায় সাহেবকে বলিতেন, তোমার জন্য অমৃতের সমুদ্র পূর্ণ করিতেছি; তুমি নিজে উহা প্রচুর পান করিবে, এবং অপর সকলকেও বণ্টন করিয়া দিবে। রায় সাহেব যে ভবিষ্যতে গুরুর এই অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কতিপয় বিধবা স্ত্রীলোক স্বামীজির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণা ছিল। তন্মধ্যে বিদ্রোজি, শিব্বোজি, বুব্বিজি ও বিজ্জোজিই প্রধান। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায়

আগ্রা প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া অনা-বৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। স্বামীজি তাহাদের কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন। এমন সময় তাঁহার শিষ্য বিষ্ণোজি গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা গৃহে গমন কর, কল্য অবশ্য বৃষ্টিপাত হইবে। শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানু-সারে জগতের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যখন গ্রামবাসীদিগকে বৃষ্টি হইবার কথা বলিয়াছ, তখন বৃষ্টি হওয়া অবশ্য উচিত। অতএব সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম গান কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় কল্য বৃষ্টি হইতে পারিবে।" তখন গ্রামবাসী ও শিষ্যবৃন্দ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। পরদিবস সকলে বিস্ময় ও আনন্দ সহকারে দেখিল যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া গেল।

আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময়ে স্বামীজি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েক দিবস ধর্ম্মালোচনার পর, তিনি স্বামীজির উপদেশ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন। স্বামীজি তাঁহাকে চিত্তনিরোধের উপায় স্বরূপ যোগের সাধনা করিতে বলেন। তদুত্তরে স্বামী দয়ানন্দ বলেন যে, ভারতীয় হিন্দুগণ একণে বৈদিক ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে বিবিধ কাল্পনিক নীতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পথে চলিতেছে। হিন্দুসমাজের আধুনিক নেতৃগণ স্বার্থসাধনের জন্য ব্যগ্র। এজন্য চতুরতাপূর্ব্বক নানা কাল্পনিক দেব-মূর্ত্তি ও তীর্থস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অর্থোপা-র্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মহান্ হিন্দুসমাজকে নিবিড় ভ্রম-জালে আবৃত করিয়া তাহার রুধির শোষণ করি-তেছে। সেই সকল শঠ সমাজ নেতৃগণের চাতুরী-জাল উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক যথার্থ বৈদিক মতের পুনঃ প্রচার করি, ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং একণে আমি চিত্তনিরোধের জন্য যোগ-পথের পথিক হইতে পারিব না।

স্বামীজি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হইতে বলিলেন। দয়ানন্দের জীবিতকাল এই উদ্দেশ্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে ৬০ বৎসর বয়সে স্বামীজি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে এক পক্ষ কাল গতে আমি দেহত্যাগ করিব। ইহা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, করজোড়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, আপনি জগতের উপকারের নিমিত্ত আরও কিছুকাল দেহ ধারণ করুন। কিন্তু স্বামীজি তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন না। এই পঞ্চদশ দিবস তাঁহার ভক্তমণ্ডলী সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া সৎসঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যাপন করিলেন। ক্রমে মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সেই দিন তিনি প্রাতঃকাল ৭টার সময় একবার সমাধিস্থ হইয়া ১৫ মিনিট পরেই উত্থিত হইলেন, এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য মধ্যাহ্নের পর আমি দেহত্যাগ করিব। অতএব তোমাদের যাহার যে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞাসা করিয়া লও।

স্বামীজির কথা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুদর্শন সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর যদি কিছু জানিবার আবশ্যক হয়,তবে আমরা তাহা কাহার নিকট জানিব ? স্বামীজি উত্তর করিলেন, অতঃপর যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিবে, তাহা সালিগ্‌রামের নিকট জানিয়া লইও। পরে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি সত্য-নাম ও সত্য-পুরুষের আরাধনা করিতাম। আমার দেহত্যাগের পর রায় সালিগ্‌রাম রাধাস্বামী মত প্রচার করিবে, তোমরা তাহাতে কোন বাধা দিও না।

স্বামীজি সকলের প্রার্থনার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ও অন্যান্য গৃহী ভক্তগণ তাঁহার চরণে অর্ঘ উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল। তাহাতে একজন শিষ্য বলিলেন, তোমরা এখন সরিয়া যাও, স্বামীজির আরাধনায় বিঘ্ন প্রদান করিও না। তখন স্বামীজি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে সেই শিষ্যকে বলিলেন, তোমরা সকলেই জান যে, আমি ছয় বৎসর বয়স হইতে এই পথের পথিক, এক্ষণে আমার বিঘ্ন করিতে পারে, এমন কেহই নাই। গত কল্য রাত্রিতেই আমি আমার অন্যান্য সমস্তই পাঠাইয়া দিয়াছি, এক্ষণে যাইতেই যাহা কিছু বিলম্ব। এই বলিয়া স্বামীজি পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন, এবং বেলা দুইটার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অমর আত্মা নিত্যধামে চলিয়া গেল।

গুরুর দেহত্যাগে শিষ্যবৃন্দ শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রধান শিষ্য বুকিজি এক সপ্তাহ কাল অনাহারে থাকিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজির প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি এগার বার বৎসর কাল দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও উপদেশ প্রদান দ্বারা সৎ-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তদীয় প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্ম-শঙ্কর মহারাজ উক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নায়ক হন। ইনি দশ বৎসরকাল এই সম্প্রদায়ের নায়কতা করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রায় সালিগ্‌রাম-প্রণীত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তাহা চারি পাঁচ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। স্বামীজি-প্রণীত দুইখানি সার গ্রন্থ তাঁহার সময় হইতেই প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থ দুইখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত, এবং উহাদের নাম সার বচন নজ্‌ম্ (পদ্য) ও সার বচন নস্যর (গদ্য) বর্ত্তমান কালে রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের শাখা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত বেলুচি-স্থান, বর্ম্মা ও আমেরিকা প্রদেশেও উক্ত মতাবলম্বী দুই এক ব্যক্তি আছেন। মহা-নগরী কলিকাতার মধ্যে উক্ত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে উক্ত মতাবলম্বীর সংখ্যা অন্যূন দুই লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন হইবে না। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্য-প্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজেই এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রাধাস্বামী মতে তামাক ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার নেশা ও মৎস্য মাংস আহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই মতাবলম্বীরা নিজ সৎ গুরুর চরণামৃত ও প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করেন বলিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; এবং অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার আলোচনা না করিয়াই রাধা-স্বামী মতের নিন্দা প্রচার করেন। এরূপ

কার্য্য, সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরণামৃত সেবন ও প্রসাদী গ্রহণ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নহে, ভক্তগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারেই ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয়।

সম্প্রতি গাজীপুরনিবাসী লালা কামতা প্রসাদ উকিল সাহেবের হস্তে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত ভার ন্যস্ত আছে। ডুমুরাও রাজ্যের মুরারে গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি এক সম্ভ্রান্ত জমীদার-বংশের সন্তান, এবং বি, এ, বি, এল উপাধিধারী। ইহাঁর বয়স এক্ষণে অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে।

শ্রীমনোমোহন মিত্র।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(৮)

উপন্যাস-লেখকদিগের প্রধান কার্য্য, একটি আগ্রহময়ী প্রেম-লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করা। আমি এ যাবৎ এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠকগণের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে এই ত্রুটীর নিরাকরণ জন্য চেষ্টা পাইব।

কিন্তু আমার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। আমার উপন্যাসের নায়কটি রূপ এবং অর্থ হীন। আমরা জানি, প্রেমিকার মন, ভ্রমরের মত রূপ-পদ্মের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অর্থ ব্যতীত প্রেম-লীলা একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক, জগৎসিংহকে, প্রতাপকে, গোবিন্দলালকে, নগেন্দ্রনাথকে রূপৈশ্বর্য্যসনাথ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার এক একটি নায়ক করিতে, আমি যদি সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা-সকলকে আমার এই উপন্যাস-মধ্যে সমবেতা করিয়া, ইহার বিশেষরূপ উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতাম। এবং পাঠকগণের মন বিনোদনার্থে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও জল-তরঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া, কাহাকেও বা তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া একটা কৌতুকাবহ মজার অবতারণা করিতাম। হায়! আমার মন্দাদৃষ্ট, আমার গদাধর কাল। তুমি, আমি "কালা আদমী"র মত কাল নহে— তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাল।

তবে কি আমার এই কাল নায়কটিকে তোমরা কেহ ভালবাসিবে না? তবে রাজাধিরাজ হারুন্-উল্-রসিদের বিপুল, ভাস্করপ্রভ ঐশ্বর্য্য এবং মোহন রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার মহিষীরা কেন কদর্য্য কান্তি ক্রীতদাসের অনুরক্তা হইয়াছিল?—তুমি বলিবে, ইহা প্রেম নহে, ইহা মূর্ত্তিমান্ পাপ। তবে মহারাজ মান্ধাতার কমনীয়া কন্যাগণ কেন উদ্গ্রীব হইয়া বৃদ্ধ, দরিদ্র, তপঃক্লিষ্ট-দেহ, বহুজলবাসে নির্ব্বাপিত-প্রেমাগ্নি সৌভরিকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল?— তুমি বলিবে, মহর্ষির তপঃ প্রভাবে রাজকন্যাগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভাপ্রসূতা অপূর্ব্বা দেসদিমনা কেন কৃষ্ণকায় মূর ওথেলোকে ভালবাসিয়াছিল?—তুমি বলিবে, ভ্রান্তি,

ভ্রান্তি, ওথেলোর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দেস্‌দিমনা এই ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। তবে কৃষ্ণকায় ত্রিভঙ্গ রাখাল-বালকের অদর্শনে মূর্ত্তিমতী প্রেম যমুনাতীরে কেন গাহিয়াছিল,—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে ॥ *

* * *

তুমি বলিবে, ইহাও প্রেম নহে, ইহা ঈশ্বরানুরক্তি বা ভক্তি।

তা, পাপে হউক, মোহে হউক, ভ্রান্তিতে হউক বা ভক্তিতে হউক, তোমরাত দেখিলে যে কালকে—দরিদ্রকে ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে আছে। তোমরা আবার দেখিবে, গদাধরকেও ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ভয়-ব্যাকুলা চারুশশীর নির্দ্দেশমত গদাধর অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। বহির্বাটীতে উপযুক্ত শয্যাদি প্রস্তুত না থাকায়, এবং দূরে থাকিলে, চারুশশীর বিভীষিকা বর্দ্ধনের সম্ভাবনা থাকায়, গদাধর অনন্যোপায় হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে চারুশশীর শয্যাগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। গৃহতলে আপন শয্যার অনতিদূরে চারুশশী গদাধরের জন্য একটি শয্যা রচনা করিয়াছিল। তাহাতে শয়ন করিয়া গদাধর অবিলম্বে নিদ্রিত হইল।

চারুশশী খট্টাঙ্গের উপর, আপন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহসা নিদ্রিতা হইতে পারে নাই। সে অনিদ্রিতা থাকিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। কে তাহার মত দুর্ভাগ্যা? কাহার স্বামী আপন পত্নীকে দুরন্ত চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনি সুরাপান করিয়া অচেতন থাকে? ভয়-ব্যাকুলা যুবতী পত্নীকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্বামী কিরূপে পর-গৃহে নিশাযাপন করিতেছে? কিরূপে হতভাগ্য, তাহার মত সুন্দরী এবং প্রেমিকা প্রণয়িনীর আহ্বান উপেক্ষা করিল? কিরূপে পাষণ্ড এই মহা বিপদের সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রহিল? হা ধিক্! ধিক্ তাহার দুরদৃষ্ট! তাহার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না। মৃত্যুও এ অপমান অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না!

ভাবিতে ভাবিতে ক্ষোভ-বিক্ষুব্ধ-হৃদয় চারুশশী আপন শয্যা-নিয়ে তাহার যৌবন চঞ্চ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, গদাধর আপন প্রশস্ত বক্ষঃ সুবিস্তৃত করিয়া শুভ্র শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে। তাহার নিরুদ্বেগ সুগঠিত কৃষ্ণ মূর্ত্তি, ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী কমলাপতির ন্যায় প্রদীপালোকোজ্জ্বল শুভ্র শয্যার উপর শোভা পাইতেছে। চারুশশী ভাবিল, "এই মহাপুরুষ আজ আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছে। আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইহার জয় হউক। দেবতাগণ ইহাকে রক্ষা করুন।" চারুশশী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উদ্ধারকর্ত্তার শুভ মঙ্গল কামনা করিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

স্বামীর প্রতি ঘৃণা এবং গদাধরের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া, চারুশশী আপনার চঞ্চল নয়ন স্থির করিয়া, নিদ্রিত, শান্ত গদাধরের প্রশান্ত এবং পীবর বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উন্নত ও অবনত হইতেছিল। প্রত্যেক আকুঞ্চনে এবং প্রত্যেক সম্প্রসারণে তাহাতে অসীম বল ক্রীড়া করিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে চারুশশী তাহা অবলোকন করিল।

* ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ৩১ অধ্যায়।

সাবধান চারুশশী! নির্জ্জনে, নিশীথে আপন শয্যাগৃহে পাইয়া, গদাধরকে দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইও না। সেই বক্ষঃ পৌরুষের আধার হউক, তাহার জন্য তুমি কুল-ললনার পুণ্য অধিকার অতিক্রম করিও না। আর তোমার স্বামীর নিন্দনীয় আচরণে যদি তুমি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমরা করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তুমি আপনাকে হিন্দু জানিয়া, তোমার মন হইতে সেই ক্ষোভকে দূর করিয়া দাও। তোমার ধর্ম্মের সেই পবিত্র কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও ;—

"নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা
শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি
চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥*

তুমি সীমন্তিনী, তুমি আপন লোলুপ লোচনকে সংযত করিয়া সনাতন পুণ্যের পথ অবলম্বন কর।

কিন্তু পিতামাতার সমস্ত আদরের আদরিণী, ভর্ত্তার মস্তকের মণি, কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী চারুশশী কখনও আপনার মন শাসিত করিতে শিক্ষা করে নাই। সে ভাবিল, 'যদি নির্জ্জনে স্ত্রীজনদুর্লভ যুবকের সুগঠিত অবয়ব নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তাহা দেখিয়া কেন চক্ষু সার্থক না করিব? ইহাতে ত পাপ নাই। আমি ত কুলত্যাগিনী হইতেছি না।' মূর্খা, পাপিষ্ঠা সে জানিত না যে, আমাদের মানসিক পাপগুলি, শারীরিক পাপ অপেক্ষা কোনক্রমে কম উপেক্ষণীয় নহে। নরকের পথ সুগম করিতে শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ পাপই তুল্য শক্তিশালী। মানসিক পাপে আমরা কখনও কখনও লোকলজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু দারুণ অন্তর্দাহে হৃদয়মধ্যে ভীষণ নরক-জ্বালার সৃষ্টি করি। অনেক সময় আমাদের শারীরিক পাপগুলি, মানসিক পাপের স্ফুরণমাত্র।

গদাধরকে দেখিতে দেখিতে চারুশশীর বার বার মনে হইল, কেন সে ঐ প্রশস্ত বক্ষের আশ্রয় লাভে বঞ্চিত থাকিল? কেন তাহার নির্ব্বোধ পিতা তাহাকে এক মদ্যপায়ী হৃদয়হীন কাপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিল? আরও অনেক কথা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কুৎসিত বাক্য আমার পাঠকগণের শ্রবণযোগ্য নহে; এজন্য আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখি না।

(৯)

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আখ্যায়িকার মধ্যে চারুশশীর ন্যায় এক পাপিষ্ঠার কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা না কহিলে আমার এ কাহিনী অঙ্গহীনা হইবে। আমার সকল কথা আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। এজন্য তাহার কথা আবার বলিব।

স্বপ্নশূন্য নিদ্রার পর, পরদিন সুন্দর প্রভাতে আমাদের গদাধর গাত্রোত্থান করিল। গবাক্ষ পথে প্রভাত-আলোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গৃহ-কোণে প্রদীপ-রশ্মি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। সারা নিশা অনিদ্র থাকিয়া, নিশাশেষে চারুশশী নিদ্রার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহার শ্লথদেহ খট্টাঙ্গের উপর শোভা পাইতেছিল। তাহার বিশৃঙ্খল কেশে অসংযতবেগে প্রভাত-বায়ু ক্রীড়া করিতেছিল। বায়ুর ক্রীড়ায় যুবতীর লাবণ্য-নদীতে তরঙ্গ উঠিতেছিল। নিদ্রিতার মুদ্রিত নয়ন কমল-কোরকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নিশ্বাস-বায়ুতে তাহার বেশরবিভূষিত

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

নাসিকা বিকম্পিত হইতেছিল। তাহার তাম্বুলরাগরঞ্জিত রক্তাধর মধুরতায় মণ্ডিত ছিল। তাহার অবশ অলস বাহুতে সরসতা সঞ্চিত ছিল। গদাধর ভাবিল, এ দৃশ্য নয়নাভিরাম বটে, কিন্তু ইহা দর্শন করিবার অধিকার তাহার নাই; অতএব সে ত্বরিত পদে গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, গদাধর দেখিল, তখনও অতুলানন্দ বাবু তন্দ্রাঘোরে অচেতন রহিয়াছেন। তাহার পূর্ব্ব নিশীথের সুখ-স্বপ্ন তখনও ভঙ্গ হয় নাই।

বেলা দশটার সময়, যখন গদাধর বিদ্যালয়ে যাইবার উদ্দেশে বাহির হইতেছিল, তখন অতুলানন্দ বাবু জাগরিত হইয়াছিলেন। তিনি গদাধরকে দেখিয়া কহিলেন, "গদাধর, স্কুল যাইবার পথে আমাদের বাড়িতে যদি তুমি সংবাদ দাও যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বাড়ী ফিরিতে পারিব না, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাহা না হইলে, বাটীতে বোধ হয় আমার আগমন অপেক্ষায় আহার করিতে বিলম্ব করিবে।" গদাধর স্বীকৃত হইয়া, অগ্রসর হইল।

কিন্তু সে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। পথে এক বৃহৎ জনতা অবলোকন করিয়া, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নিম্নজাতীয় এক আতুর ব্যক্তি কদর্য্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, একান্ত অসহায় অবস্থায় পথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বিকৃত শব্দ করিতেছে। কিন্তু সেই বৃহৎ জনতার এক ব্যক্তিও তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় নাই। রোগ-ব্যথিতের ব্যথায় তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় হিন্দু হইয়া কিরূপে অতি অস্পর্শীয় নীচ জাতীয়ের দেহ স্পর্শ করিবে? কিরূপে আপনাদের পুণ্য দেহ কলঙ্কিত করিবে? গদাধর আপনার সমস্ত দেহগৌরব লইয়া রুগ্নের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। এবং অতি সহজে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। তাহার পর, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া অতি দ্রুতবেগে বিদ্যালয়ের সময়ের অব্যবহিত পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে যাইতে হইলে, সে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইত না। এজন্য সে তথায় যাইতে পারে নাই।

বিদ্যালয় হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, সে দিবাবসানে অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়াছিল। বহির্বাটীতে ভৃত্যকে, বাবুর বাটী প্রত্যাগমনের সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া সে গমনোন্মুখ হইলে, ভিতর বাটী হইতে দাসী আসিয়া কহিল, "আপনাকে মা ঠাকুরাণী একবার বাটীর ভিতর আসিবার জন্য বলিতেছেন।"

"কেন, কি আবশ্যক?"

"বলিতেছেন যে, আপনি এখানে জলখাবার খাইয়া, পরে বাড়ী যাইবেন।"

"এ কথা ভাল; চল যাই।

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, চারুশশী গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এস, ঠাকুর পো।"

গদাধর। মা, আপনি যে আমার সহিত একটা নিকট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন।—আমি আজ হইতে, আপনার 'ঠাকুর পো' হইলাম।

চারুশশী। হাঁ ভাই! আজ হইতে আমার ঠাকুর পো হইলে। তুমি যে বিপদ্ হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে আমার পরম আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছি; এখন কিছু জল খাবার খাও।

গদাধর। দিন। উদরমধ্যে ক্ষুধার কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই।

চারুশশী স্বহস্তে পাত্রপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া গদাধরের সম্মুখে রাখিল। নিজে অলক্ত অধরে, বিলোল লোচনে, বলয়কঙ্কণ-মুখরিত বাহুতে তীব্র বিলাসাগ্নি জ্বালিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া গদাধরের বিশাল বীরমূর্ত্তি দেখিল। গদাধর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আহারে সবিশেষ মনোনিবেশ করিল। আহার সমাপ্ত হইলে, চারুশশী আপন হস্তে করঙ্ক ধরিয়া কহিল, "পান খাও।"

গদাধর। পান খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। কখনও খাই নাই।

চারুশশী। আমি স্বহস্তে সাজিয়াছি; আজ আমি অনুরোধ করিতেছি, একটি খাও। খাইলে আমি সুখী হইব।

গদা। আপনি অনুরোধ করিবেন না। উহা খাইতে আমার ভাল লাগিবে না।

চারুশশী। আমার হাতের সাজা পান ত কখনও খাও নাই; খাইলে জানিতে পারিবে কত মিষ্ট।

গদাধর। আমি কাহারও হাতের সাজা পান কখনও খাই নাই। উহা তিক্ত কিংবা মিষ্ট, তাহা জানিবার ইচ্ছা আমার নাই। তথাপি আমি স্বীকার করিতেছি, উহা দেখিতে মিষ্ট বটে। এখন তবে আমি যাই। অতুলানন্দ বাবু সন্ধ্যার পরই আসিবেন।

চারুশশী। না, না ঠাকুরপো! এখনই যাইও না। উপরে চল; সেখানে একটু বসিবে, গল্প সল্প করিব।

গদাধর। আমার গল্প করিবার কিছু মাত্র অবকাশ নাই। চলিলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে গদাধর চলিয়া গেল। চারু-শশী নির্ব্বাক্ থাকিয়া গমনশীল গদাধরের সরল সুদৃঢ় মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। সে ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। আকুঞ্চিত কৃষ্ণ ভ্রূ-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ কটাক্ষের বাণসকল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। প্রদীপ্ত যৌবনের লাবণ্য পরিপ্লুত দেহের সমস্ত আকর্ষণ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। হায়! বিমূঢ়া বিবশা নারী আর তুমি এ লাবণ্যের—এ কটাক্ষের অহঙ্কার করিও না।

কিন্তু চারুশশী ভিন্নপ্রকৃতির যুবতী। সে তাহার কদর্য্য প্রকৃতিকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল না। বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি গদাধরের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। সে ভাবিল, "আবার চেষ্টা করিব; এ কমনীয় দেহতটে নূতন শ্রী সঞ্চারিত করিয়া, পলাতক গদাধরকে ধরিবার নূতন ফাঁদ পাতিব। নয়নজ্যোতিতে প্রবল প্রমত্ততা পূরিয়া পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ-সন্ধানে পলাতককে জর্জ্জরিত করিয়া দিব।

(১০)

নাড়িচা গ্রামে গদাধরের মাতা আজ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। গদাই কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিল যে, তাহার পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, সে আজ বেলা বারটার সময় নৌকাযোগে বাটী ফিরিবে। কত দিন পরে প্রাণাধিক পুত্র আবার মাতার অঞ্চল-তলে ফিরিয়া আসিবে! আনন্দে মাতা সারারাত্র জাগিয়াছিলেন। জাগিয়া, প্রত্যুষে উঠিয়া পুত্রের জন্য কি কি আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিবেন, মনে মনে শত শত বার তাহার আলোচনা করিয়া-ছিলেন।

অতি সত্বর গৃহ-কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি জেলে-বৌএর পথ-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। জেলে বৌ রোজ কত সকালে

আসে; আজ আর তা'র বার হয় না। ঐ যে জেলে বৌ আসিতেছে। মাতা ডাকিলেন, "আয় জেলে বৌ! শীঘ্র আয়। আজ তুই বাছা এত দেরী করিয়া কেন আসিলি? তোর ঝুড়ি নামা, দেখি কি মাছ আছে। ও মা! তোর ঝুড়িতে যে একটিও ভাল মাছ নাই। আজ যে আমার গদাই বাড়ী আসিবে! কত দিন পরে বাছা আমার বাড়ী আসিবে, বল্ দেখি তাহাকে কি রাঁধিয়া দিব?

জেলে বৌ। আমি ত জানিনি মা যে দাদাবাবু আজ বাড়ী আসিবে; নহিলে কত ভাল ভাল মাছ লইয়া আসিতাম।

মাতা। তা' মা, যা' এনেছিস্ তাই দিয়া যা'। এই পুঁটি মাছগুলি ভাজিব। আর এই খড়িকা-বাটাগুলি ঝাল দিয়া রাঁধিব। আর এই কয়লা মাছগুলি তেঁতুল দিয়া অম্বল রাঁধিব।

জেলে বৌ বেশী দামে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আনন্দিতা হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর দুধের কেঁড়ে লইয়া, এবং কেঁড়ের মুখে, দুগ্ধপরিমাণজন্য সুমার্জ্জিত কাংস্য নির্ম্মিত ঘটীটি লইয়া এবং নিজের মুখে একটি মুখ দোক্তা ও পান লইয়া আতরের মা আসিল;—রোজের দুধ দিবে। গদাধর কলিকাতা যাইবার পর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় গৃহে গাভী রাখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। কে তাহাকে দোহন করিবে? কে তাহার সেবা করিবে? আর গদাধরের প্রবাসকালে তত দুগ্ধের আবশ্যকতাই বা কি? মাতা আতরের মাকে দেখিয়া বলিলেন,—"ও আতরের মা! শুনেছ, আজ আমার গদাই আসিবে।"

আতরের মা বলিল, "তা'ত শুনিনি। দাদাবাবু কখন্ আস্বে?

মাতা বলিলেন,—"এই বারটার সময় আসিবে। এখানে আসিয়া খাইবে।" আজ বাছা! রোজের দুধে হইবে না; এক সের বেশী দুধ দিতে হইবে।"

আতরের মা, রোজের দুধ এবং বেশী দুধ দিয়া, অন্য বাড়িতে যোগান দিতে গেল। তাহার পর ধোপা মিন্সে আসিল, তাহাকে মাতা বলিলেন, "বাবা, আজ আমার গদাই বাড়ী আসিবে, অন্য কাপড় দিতে না পার, আজ বিছানার চাদরখানি দিয়া যাইও।"

মাছ কিনিয়া, দুধ লইয়া, ধোপাকে চাদরের কথা বলিয়া, মাতা রন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রন্ধনকার্য্যে গদাইএর মাতা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এক্ষণে এই পারদর্শী পাককুশলার প্রত্যেক ব্যঞ্জনটি পুত্রস্নেহের সঞ্চিত সুধারসে পরিপ্লুত হইয়া আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। পরিচ্ছন্ন পাত্রে সুধাপূর্ণ ব্যঞ্জনগুলি শোভা পাইল। তাহাদের জিহ্বাসরসকারী সৌরভ দিক্সকলকে আমোদিত করিল।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সকালে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। এক্ষণে বেলা এক প্রহরের সময় তিনি রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের মাথায় রঙ্গিণ গামছার পাগড়ি, বাহুতলে ছিপ্. এবং বাম হস্তে অতি সুদর্শন, গোলাপ-বর্ণ-বিনিন্দিত-উদর-বিশিষ্ট-রোহিত মৎস্য। মরি, মরি, কি সুন্দর বর্ণ সে রোহিত মৎস্যের। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সে পুচ্ছ, নধর সে দেহ, রজত-বিগঠিত কোমল সে অধর, তাহার মধুর মর্ম্ম, হে আমার বাঙ্গালী পাঠক! তুমি যদি বুঝিতে সমর্থ না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বৃথায় বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিয়াছ। জানিও ভাই, এই রোহিত মৎস্যই, তাহার মুণ্ডপাত করিয়া, তোমাকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ করিয়া রাখিয়াছে।

মাছ দেখিয়া গদাই এর মার আর আহ্লাদ ধরে না।

মধুসূদন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওগো, এই মাছের ঝোল রাঁধিতে হইবে; আর পেটীর মাছ দুই চারি খানা ভাজা রাখিও, গদাই ভাজা মাছ খাইতে ভালবাসে। আর মুড়োটা দালে দিও। এখন আমি একটা মোচা সংগ্রহ করিবার জন্ত চলিলাম; মোচার দাল্না রাঁধিতে হইবে, গদাই মোচার দাল্না খাইতে বড় ভালবাসে।"

গদাইএর মা কহিলেন,—"না, না, তোমার মোচার জন্ত যাইতে হইবে না। এই দেখ আমি মোচার দাল্না রাঁধিয়া রাখিয়াছি।"

মধুসূদন বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহ'লে এখন আমি গঙ্গাতীরে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি; গদাইএর নৌকা দেখিতে পাইলেই আমি শীঘ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।"

এই বলিয়া নগ্নপদ এবং গামছার দ্বারা বিরচিত সেই অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারী মধুসূদন ভাগীরথী তীরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। পথে এক গ্রামবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে গদাধরচন্দ্রের পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এবং বাটী শুভাগমন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"দেখ, তোমরা বলিতে গদাধর মূর্খ হইবে, আমি বলিতাম, আমার আশীর্ব্বাদে সে বিদ্যালাভ করিবে। এখন আমার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে; গদাধর পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিতেছে।"

উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সহিত গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে, মধুসূদন কহিলেন, "উমাকালী ভাই! গদাই আমার পরীক্ষা দিয়াছে; আজ বাটী আসিবে।"

কালীকৃষ্ণ ঘোষ গঙ্গাস্নানের পর বাটী ফিরিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া মধুসূদন সংবাদ দিলেন, "ঘোষজা, তুমি বলিতে গদাইএর লেখা পড়া হইবে না; দেখ, আজ সে পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিতেছে।"

গঙ্গাবগাহন-অভিলাষী শ্রীযুক্ত হরিহর সিংহ মহাশয়, হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা তাঁহার জপ-ভঙ্গ হইল। মধুসূদন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"সিঙ্গি ম'শায়, আজ গদাই আমার বাটী ফিরিবে।"

এইরূপে মধুসূদন সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার সুখসংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বনের পাখীরা কিংবা জলের মৎস্যেরা যদি মানুষের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, বুঝি বা তিনি তাহাদিগকেও গদাধরের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিতেন। যদি গ্রাম্য বৃক্ষসকলের কিংবা বৃক্ষবিলম্বিতা লতাসকলের শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও আহ্বান করিয়া কহিতেন, "ওগো! আজ আমার গদাই বাটী ফিরিবে।" ফলতঃ গদাধরের আগমনবার্ত্তা ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রত্যেক কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। একটি লোকের হৃদয়ানন্দে সমস্ত গ্রামখানি আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু হায়! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের যেমন একটা সীমা আছে, বৃদ্ধ মধুসূদনের আনন্দেরও একটা সীমা ছিল। গঙ্গাতীরে বসিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি দেখিলেন, দূরে—গগনপটে সহসা এক খানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ উদিত হইয়াছে। দেখিয়া মধুসূদন চিন্তিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

তুমি ও আমি।

কাছে তুমি রয়েছ সতত,
তব কাছে আমিও সদাই
দুই—এক, দেখিতে না পাই !
মাঝে যেন ব্যবধান কত !
প্রাণে প্রাণে রয়েছ মিশিয়া,
তবু যেন কত দুরান্তরে—
আমা হ'তে আছ তুমি সরে,
পরভাবে পৃথক্ হইয়া।
মনে ভাবি তুমিই উত্তম,
তুমিই অসীম রূপবান্,
তুমিই গো অনন্ত মহান্
ক্ষুদ্র আমি কুৎসিত অধম।

ভাবি বুঝি ডাকিলে তোমায়,
তুমি কভু সাড়া নাহি দিবে।
কাছে গেলে ফিরে না চাহিবে,
অবসন্ন প্রাণ আশঙ্কায়
মাঝখানে এত ব্যবধান—
তাই তোমা দেখিতে না পাই
কাছে থেকে যেন কাছে নাই !
ভাবি শুধু 'তুমি আমি' আন।
ভেঙ্গে দিয়ে এই ব্যবধান
এস, হয় আমি হই 'তুমি'—
আর নয় তুমি হও 'আমি'—
এক হ'য়ে করি অবস্থান।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

প্রাপ্তিস্বীকার।

ভক্ত মনোরঞ্জন—শ্রীকৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

ইহা একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। ভক্তিমূলক ও নানাবিধ রাগরাগিণীসংযুক্ত কতকগুলি গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ গানেরই ভাব ও ভাষা সুমধুর। পরিশেষে কয়েকটী বিরহ-সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে।

পুরাণ দর্শন সূত্র—উপক্রমণিকা। (অথবা আর্য্য ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ)— শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। গ্রন্থকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এবং শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা এই গ্রন্থ সমালোচনা কার্য্য হইতে বিরত রহিলাম। গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রণয়নে বিশেষরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি কেহ আমাদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যসমূহের উদ্ঘাটন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না।

INDIAN INDUSTRIES AND POWER. No 80, Vol VII, No 8. এই মাসিক পত্রিকাখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। ইহাতে শিল্প বিদ্যা ও ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত আছে। বার্ষিক মূল্য ৯৲ টাকা।

CO-OPERATOR. Vol I. No 11, May, 1910. এই মাসিক পত্রিকাখানি ২৮৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ বোরো হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

REG. No. C. 280.

PRINTED BY B N NANDI AT THE 'KAVIRATNA PRESS', 12, SIMLA STREET BYE LANE, CALCUTTA

সুরমা

বটকৃষ্ণ পালের

অর্থাৎ

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু শান্তিকারক
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
,, ছোট ,, ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমারে পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম)

প্লীহা ও যকৃতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক
বা য়্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসেফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম
পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৶০ আনা, মাশুলাদি ।৶০।

এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরারুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ত সকল রোগীব পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মূল্য ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৶০ আনা।

সোল এজেণ্টস্ঃ—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন,—কলিকাতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

দ্বাদশ খণ্ড]. ১৩১৮ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

কলিকাতা।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য-সংহিতা

দ্বাদশ খণ্ড] ১৩১৮ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণন।

অদ্য যে প্রসঙ্গ—শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল, সে প্রসঙ্গ সাহিত্যসেবীর পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অনুভূত হয়। কারণ ইঁহারই বংশপরম্পরায় বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছে। সেই বংশের মহাত্মা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই কবি, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, সহৃদয়, সামাজিক, তেজস্বী এবং অশেষগুণসম্পন্ন। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি সমূহের গুণকীর্ত্তন শুনিতে পাঠকবর্গের অরুচির সম্ভাবনা অল্প। তন্নিবন্ধন ভরদ্বাজের নাম পুরঃসর তদীয় ধারার শ্রীহর্ষের বংশাবলী বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। লেখার পারিপাট্য না থাকিলেও তাঁহাদিগের বিষয় পাঠ করিলে, অনর্থক সময় নষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি মুকুটালঙ্কার শ্রীহীর। মেধাতিথি মানব-স্মৃতির প্রধান টীকাকর্ত্তা এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত। সুতরাং শ্রীহর্ষ পরমপণ্ডিত-তনয় বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বী ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষ না করিয়া, স্বকীয় বিদ্যাবত্তায় জগতে ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন—তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কৃতিত্ব বর্ণন করিতে হইলে, তাঁহাকে কবিকুলচূড়ামণি বলায় কোন দোষ স্পর্শ করে না। পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি বৃহস্পতির অন্যূনকল্প মনে করিতে হয়। কেবল কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন নহে; ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত পদ্ধতিক্রমে পরাৎপর পরমাত্মার সঙ্গে সর্ব্বদা পরিচিত ছিলেন। অবাঙমানসগোচর পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, নচেৎ কিরূপে বাক্‌সিদ্ধ হইলেন? যাঁহার কথায় নীরস পরিশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ মন্ত্রপূত জলবিন্দু স্পর্শে তৎক্ষণাৎ কাণ্ড পল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছিল, তাঁহার বিষয় বর্ণন করা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। তথাপি তদ্বিষয়ে একটা কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন করা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ দাসভাবে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহারা সেরূপ ভৃত্য নহেন; তাঁহাদিগের শরীররক্ষক ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত বীরপঞ্চক। এখানে সেই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য অবশ্যই কহিতে হইবে যে, যাঁহাদিগের কথায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাঁহাদিগের শরীর-রক্ষার জন্য আবার পাঁচজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গ আবশ্যক হইয়াছিল!—কি আশ্চর্য্য কথা!—যে পাঁচ জন মহর্ষি আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ ও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে সদাতৎপর। তাঁহাদিগের কি শত্রু থাকার সম্ভব? বিশ্বামিত্র যখন পরমপুরুষ রামকে সঙ্গে লইয়া জনক রাজার ভবনে যান, তখন রাম লক্ষণ আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার পরিত্রাণ-ক্ষমতা কাহার নিকট শিক্ষা করেন? বিশ্বামিত্রের নিকট, ইহা

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াই বশিষ্ঠাদি মহর্ষির নিকট সর্ব্বপ্রকার রক্ষা-মন্ত্র ও কবচাদি শিক্ষা করিয়া বাচস্পতি হয়েন।

এখানে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া, ঐ পঞ্চ মহর্ষি যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন সে কথা বলিব না।

যাঁহারা কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলেন, তাঁহারা কহেন, কায়স্থগণ হস্তীপৃষ্ঠে এবং মহর্ষিপঞ্চক গোযানে আগমন করেন। কথা সত্য হইলেও বিচার করিতে গেলে হস্তী অথবা অশ্বপৃষ্ঠে অতিদূর পথে ভৃত্যের আগমনে প্রভুর মর্য্যাদার ন্যূনতা হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা সভার্য্য এদেশে আগমন করেন। আর্য্য জাতীয় মহিলাবর্গের কেহই হস্তী অথবা অশ্বারোহণ করে না। সুতরাং মহর্ষি পঞ্চককে সস্ত্রীক গোযানে আগমন করিতে হয়। বিশেষতঃ অতি দূরপথে ও দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসী হইতে হইলে, গৃহস্থলীর উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে না আনিলে প্রতিদিনের শয়নোপবেশন ও ভোজনাদির নিতান্ত অসুবিধা জন্মে। তাহারই পরিহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত হস্তী-পৃষ্ঠে ও অশ্বপৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভৃত্যপঞ্চককে শ্রান্তিহরণমানসে তাহাদিগকে হস্তী বা অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পুরঃসর সঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি করেন। কেবল তাহাই নহে, কাণ্যকুব্জেশ্বর আড়ম্বর প্রদর্শন জন্য মহর্ষি পঞ্চকের সঙ্গে হস্ত্যশ্ব প্রেরণ করেন। ফল কথা মহর্ষিপঞ্চক ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন।

এখানে শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণের ধনুর্বিদ্যার শ্লোকদ্বয় কুলশাস্ত্রদীপিকা হইতে পাঠকগণের দৃষ্টি জন্য উদ্ধৃত করা গেল। যথা :—

"বেদান্তসিদ্ধান্ত সুনিশ্চয়ার্থো দীক্ষাক্ষমাদয়ার্দ্র-
চিত্ত।
পরাস্ত্রবিদ্যার্ণবকর্ণধার শ্রীহর্ষ নামা ভুবনং
তুতোষ ॥
নাম্নাহং শ্রীলহর্ষঃ ক্ষিতিপবরভরদ্বাজগোত্রঃ
পবিত্রো
নিত্যং গোবিন্দপাদাম্বুজযুগহৃদয়ঃ সর্ব্বতীর্থা-
বগাহী।
চত্বার সাঙ্গবেদা মম মুখপুরতঃ পশ্যপাণৌ
ধনুর্ম্মে
সর্ব্বং কর্ত্তুং ক্ষমোঽহস্মি প্রকটয় নৃপতে ত্বন্মনো-
ভীষ্টমাশু।" ১।
"বেণীসংহারনামা পরমরসযুতো গ্রন্থ একঃ
প্রসিদ্ধো
ভোয়াজন্ মৎকৃতোসৌ রসিকগুণবতা যত্নতো
গৃহ্যতে যঃ।
নাম্নাহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারু শাণ্ডিল্য-
গোত্রো
বেদেশাস্ত্রে পুরাণে ধনুষিচ নিপুণঃ স্বস্তিতে
স্যাৎ কিমন্যৎ ॥২।"

অন্য মহর্ষি ত্রয়ের ধনুর্বিদ্যার পরিচয় শ্লোক তাঁহাদিগের বংশবর্ণন প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীহর্ষ-কৃত নৈষধীয় কাব্য লোকমণ্ডলীতে প্রসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়বর্ণন এক কথায় হয় না। নৈষধ কাব্য বর্ণন প্রস্তাবেই তাহার প্রসঙ্গ করাই যুক্তিযুক্ত। তদীয় তর্কশাস্ত্র গ্রন্থের নাম খণ্ডন খণ্ড খাদ্য। তদীয় ব্যবহার শাস্ত্রের নাম যুক্তিরহস্য। তাহার এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের মীমাংসার নাম মুক্তিমার্গ। এই দুই গ্রন্থই সুদুষ্প্রাপ্য—নাম মাত্রেই আছে। সে যাহা হউক তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় পিতৃ-গুণের কিঞ্চিন্মাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন কি না তাহাই এখানে বিচার্য্য বিষয়। পুত্র চতুষ্টয় বেদপ্রচার জন্য মহারাজ আদিশূরের নিকট হইতে চারিখানি শাসন গ্রাম পাইয়া ছিলেন। শাসন শব্দের অর্থ এখনকার পরগণা। কেহ কেহ কহিবেন এমন কি হয়?

তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরাস জন্য কহিব যে, দ্বারভাঙ্গার রাজা ব্রাহ্মণ, তদীয় শিষ্য ক্ষত্রিয়ের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত দ্বারভঙ্গ রাজ্য পাইয়াছিলেন। ঐ রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আদিশূরের পক্ষেও তদ্রূপ হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে বিদ্যাও ব্রাহ্মণ্য প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। দেখ—

বলিরাজা একটী মূর্খ লইয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত হয়েন নাই। তিনি পাঁচজন পণ্ডিত লইয়া পাতালগমনেও সুখী হইয়াছিলেন। মূর্খ পুত্র যমসম। প্রজা ও সন্ততিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাই। সুতরাং রাজার পক্ষে প্রজাকে শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্তই আদিশূর কাণ্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদিগকে এদেশে রাজ্য দিয়া বাস করান। উঁহারাও কাণ্যকুব্জে নিঃস্ব ছিলেন না। পুত্র চতুষ্টয়ের পরিচয় —

"ধাঁধুকো মুকুটৌ গ্রামে জনো দিণ্ডীচ শাসনে।
রামশ্চ রাগ্নিশাস্যন্তে নানো সাহরিসঙ্গকে।
এতে বিদ্যাপ্রচারায় তথা ব্রাহ্মণ্যশ্রাবণে।
নিযুক্তা রাঢ়কেদেশে রাজ্ঞাসুপূজিতাঃ সদা॥"
কুলদীপিকা।

সুতরাং এই শ্লোক দ্বারা ইঁহাদিগকে বিদ্যাবন্ত বলিয়া বিশেষ অনুমান করা যায়।

এই চারিজনের সন্তানপরম্পরার মধ্যে ধাঁধু বা সাধু মুকুটী (মুখুথী) গ্রামবাসী। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীগর্ভ। ইনি মৃতবৎসা মাতার পুত্র ছিলেন বলিয়া ইঁহার প্রথম কালের নাম ধাঁধু অর্থাৎ ইঁহার জীবন সম্বন্ধে ধাঁধা আছে অর্থাৎ নিশ্চয়তা নাই। যখন যৌবন-সীমায় উপস্থিত হয়েন, তৎকালে চরিত্রাদির পবিত্রতায় সাধু সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে পারদর্শী হইলে, তাঁহার শ্রীগর্ভ এই আখ্যা হয়।

শ্রীহর্ষের ভ্রাতার নাম গৌতম। তিনি আদিশূরের যজ্ঞান্তে আদিশূরের প্রার্থনানুসারে কাণ্যকুব্জ হইতে পরবর্ত্তী কালে আনীত হইয়া বরেন্দ্রদেশে অধিষ্ঠাপিত হয়েন। বারেন্দ্র বংশীয়দিগের ভরদ্বাজগোত্রীয় বংশাবলীর তিনিই (গৌতম) আদিপুরুষ। শ্রীগর্ভের পুত্রের একতমের নাম শ্রীনিবাস (৩)। শ্রীনিবাসের পুত্রের নাম মেধাতিথি (৪)। শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আরব (৫)। ষষ্ঠ ত্রিবিক্রম। ৭ম কাক। অষ্টম ধাঁধু। ৯ম জলাশয়। ১০ম বাণেশ্বর বা সুরেশ্বর। ১১শ গুহ অথবা গুঞি। এই সময়েই বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হ্রাস হইতে আরম্ভ। তৎপুত্র মাধবাচার্য্য (১২শ)। ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা এখন সে টীকা দেখিতে পাই না। তৎপুত্র কোলাহল (১৩শ)। ইনি বিষয়বাসনাপরিশূন্য ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কোলাই সন্ন্যাসী হয়। এই ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই সন্ততিবর্গ শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত অর্থাৎ বেদান্তপারগ এবং সকলেই সমমর্য্যাদাপন্ন। কিন্তু এই সময়েই সকলেরই সন্ততি মধ্যে বিলাসিতা দেখা দেয়। বিদ্যাব্রাহ্মণ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া, মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন।

কোলাহলের পুত্র উৎসাহ ও গরুড় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। বল্লালসেন যাঁহাদিগকে নবগুণসম্পন্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। সমায়াতিপাতের অগ্রপশ্চাৎ ব্রহ্মানুষ্ঠানরূপ নিত্যক্রিয়ায় যথাযথ নিষ্পত্তি ও পরিসমাপ্তিহেতু সুব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া কৌলীন্য প্রদান করেন নাই।

যে নিয়মে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কৌলীন্য প্রদান হয়, তাহা ব্রাহ্মণ-সন্তান সকলেরই

বিদিত থাকিলেও সাধারণ পাঠকের পরিজ্ঞান জন্ত এস্থলে পিষ্টপেষণ করা হইল। যথা—
"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

এই সূত্রানুসারেই বল্লালের সময়াবধি লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত সকলকেই সাধু ব্যবহারে চলিতে হইয়াছিল। মহারাজ দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণ নারায়ণ, কুলীনগণের মধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সুস্থির রাখিবার জন্ত কৌলীন্য সমীকরণ করেন। উহাদ্বারা পঞ্চগোত্রীয় কুলীন মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সুরক্ষিত হয়। শ্রোত্রীয়গণও বিদ্যাব্রাহ্মণ্য রক্ষায় নিতান্ত অগ্রসর হয়েন।

উৎসাহের পুত্রের নাম আহিত, অভ্যাগত ও মহাদেব (১৫শ)। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে আহিত ফুলিয়া মেলের মুখুটীগণের আদিপুরুষ। মহাদেব খড়দা মেলের মূল পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফুলিয়া মেলের আদি পুরুষ আহিতের দুই পুত্র—উদ্ধব (অপভ্রষ্ট নাম উধ) সেই নামেই অভিহিত এবং লৌলিক (১৬)।

উধের সন্তান শিরঃ ও বিকর্ত্তন (১৭)। শিরঃ-সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর (১৮শ)। রাম হইতে রামফুলিয়া মেলের উৎপত্তি হয়। ঐ মেলের অনেক ধারা আছে। নৃসিংহ হইতে প্রকৃত পরিশুদ্ধ ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি হয়। ইনিই প্রকৃত ফুলিয়াগ্রামবাসী। ঐ গ্রামটী কুলীনপ্রধান পঞ্চ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী বড় ফুলিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য গ্রামচতুষ্টয়ের নাম যথা— শিমুলিয়া, নবলা (নবপল্লী) ইহা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের নপড়ীয় নাম প্রখ্যাত হয়। মালিপোঁতা ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের পূজার পুষ্প যোগাইবার জন্ত এই গ্রামে পূর্ব্বে অনেক মালাকার বাস ছিল, তজ্জন্যই এই গ্রামের নাম মালিপোঁতা। ফুলিয়ার উত্তরবর্ত্তী গ্রামের নাম বেলগড়িয়া। ইহাতেই যথেষ্ট কুলীনের বাস্তু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর বিদ্যমান দেখা যায়। ইহার পশ্চিমাংশ গ্রামের নাম রামফুলিয়া অথবা ছোট ফুলিয়া। রাম শব্দে একটী অর্থ ক্ষুদ্র। তদনুসারে ঐ গ্রামের নাম ছোট ফুলিয়া হয়। এই গ্রামে চৈতন্যের স্নেহাস্পদ মুসলমান হরিদাসের আশ্রম আছে। উহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের দর্শন-স্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে। অনেকে হরিদাসের পাঠ বলিয়া দর্শন করিয়া যান। এই সকল গ্রাম শান্তিপুরের দুই ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী। উৎসাহের সহোদর গরুড়ও (১৪) কৌলীন্য-মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার অধস্তন সন্তানের মধ্যে অনেক মেলের প্রকৃতির আদিপুরুষ বিরাজিত হইয়াছিলেন। তাহাও মেলমালা গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থ দেখ।) নৃসিংহ (১৮শ), তদীয় পুত্র গর্ভেশ্বর (১৯শ), তৎপুত্র মুরারি, গোবিন্দ ও সূর্য্য (২০শ)। মুরারি উপাধ্যায় নামে প্রখ্যাত। (উপাধ্যায়ের অপভ্রংশে ওঝা, তাহাতেই মুরারি ওঝা নামে প্রসিদ্ধ।) মুরারির পুত্র ভৈরব, বনমালী এবং অনিরুদ্ধ (২১শ)। বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস পণ্ডিত। ইনিই ভাষা রামায়ণ রচনা করেন। তদীয় গ্রন্থ বাঙ্গালা পয়ারছন্দের সুপরিশুদ্ধ সরল রচনার আদর্শস্বরূপ। মধ্যে মধ্যে ঐ গ্রন্থের রচনায় মনোহারিত্ব আছে। উহার কীর্ত্তন দ্বারা বঙ্গসমাজের আবাল বৃদ্ধ হিন্দু মাত্রের মুখে রামায়ণ গ্রন্থের সারভূত সুরীতি, সুনীতি, সুজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিদ্যার মর্ম্ম দেদীপ্যমান আছে। ইহা হইতে কবির পক্ষে আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তিনি লোকমণ্ডলীতে জীবিতরূপে বিরাজিত আছেন। অনিরুদ্ধ (২১শ)। তদীয় পুত্রের নাম লক্ষীধর হালদার (২২শ)।

লক্ষ্মীধর "হালদার" নামে বিশেষ পরিচিত। তৎকালে সেনাধ্যক্ষদিগের "হালদার" এই উপাধি ছিল। সুতরাং তিনি তাৎকালিক রাজাদিগের নিকট বীর পুরুষ বলিয়া বিশেষ পরিচিত না হইলে হালদার এই উপাধি পাইতেন না। লক্ষ্মীধর হালদারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দুর্গাবর, মধ্যম কিন অথবা তিনু ও কনিষ্ঠের নাম মনোহর। জ্যেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পরম পণ্ডিত ও বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন। মধ্যম তিনু বা কিনু বিদ্বান ছিলেন না, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ। দুর্গাবর পণ্ডিত বল্লভী মেলের নায়ক ও আদি প্রকৃতি (২৩শ)। ইনি শান্তিপুরনিবাসী। ইঁহার বাস্তভবনে অদ্যাপি অতি সমারোহের সঙ্গে তদীয় বংশাবলীর কৃতীপুরুষগণ ৺শ্যামাপূজা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তেমন পূজা প্রায় কোনখানেই দেখা যায় না। দুর্গাবর পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ও আবাস ভবনের স্থানের নাম এক্ষণে বল্লভীপাড়ার শ্যামা চাঁদনী।

(২৩শ) মনোহর পণ্ডিত হইতে পরিশুদ্ধ ফুলিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হয়। ইঁহাদিগের বাসস্থান ফুলিয়াগ্রাম—বেল গাড়িয়া।

দুর্গাবর ও মনোহরের স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের টীকা ছিল, এই কথা কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু কি ছিল তাহার নাম নির্দ্দেশ নাই। যথা—

"দুর্গাবর-মনোহরৌ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যবিশ্রুতৌ।
ন্যায়স্মৃতিসদাচারে টীপণ্যা লিখিতৌ পুরা।
তস্মাত্তয়োরভিধানং পণ্ডিতমিতি বর্ণিতং॥
বিদ্যাপ্রদানে সুকৃতী গুরুরিতিতু কথ্যতে॥
জ্ঞানব্রাহ্মণ্যসম্পন্নে পাণ্ডিত্যং দীয়তে তপৈঃ॥"

মনোহরের পুত্রের নাম সুসেন, জগদানন্দ এবং গঙ্গানন্দ (২৪)। ইঁহারা তিনজনে পরম পণ্ডিত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। গঙ্গানন্দ তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সুতরাং তাঁহার উপাধি ভট্টাচার্য্য হয়।

আচার্য্যো যাজ্ঞিকোখ্যাত-বিদ্যয়া ভট্ট এবচ।
সর্ব্বগুণসুসম্পন্নে ভট্টাচার্য্যো বিধীয়তে॥

মেলচন্দ্রিকা।

সুসেন, জগদানন্দ ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মেলবন্ধন সময়ে কৌলীন্য রক্ষা হয়। তজ্জন্য কুলগ্রন্থে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত রূপে প্রশংসা করে। যথা—

"সুসেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দো কুলেকৃতী।

(২৪) সুসেনের উপাধি পণ্ডিত। তদীয় পুত্রত্রয়ের নাম শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই। শেষ দুই ভাই ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। কানাই সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া ইঁহাকে ছোট ঠাকুর বলিয়া লোকে সম্বোধন করিত সেইহেতু বশতঃ ইনি ছোট ঠাকুর নামে বিশেষ খ্যাত। ইঁহার বংশধরগণ অনেক স্থলেই বিরাজিত আছেন। তন্মধ্যে উলাগ্রামই ইঁহাদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান। ইঁহাদিগের বংশে অনেক পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছে। অনেকেই বিদ্বান, সদ্‌গুণসম্পন্ন, দাতা ও কবি ছিলেন। অধুনাতন সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উলানিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুর্গাভক্তি চিন্তামণি কাব্য কবিত্বরসমাধুর্য্যগুণসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত করা যায়। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব দেখুন, অলীক বোধ হইবে না।

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
(নপ্তা) পৌত্র।
যার কণ্ঠে সদা বিরাজ করেন ভারতী॥
ভাষা রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, পিতামহ মুরারি ওঝা। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও [illegible]। তদীয়

কাব্য অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরাদির বিষয় এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবার বিষয় নহে। উহা পৃথক প্রবন্ধে প্রদর্শন না করিলে কাহারও মনঃক্ষোভ বিনিবৃত্ত হইবে না, সুতরাং এখানে উহা পরিত্যক্ত হইল। এই প্রবন্ধে শ্রীহর্ষের অন্বয়ে অর্থাৎ অধস্তন সন্তান পরম্পরার মধ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য সদাচার ও কবিত্ব অদ্যাপি যে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে তাহা দেখান উদ্দেশ্য। তদনুসারে দেখা যায়—

"বিষ্ণুধর বলরাম উদার রমণ।
বাঘাণ্ডার রঘুবিশু সম ছয়জন॥
দোসর সোসর নাহি মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা॥
মেলমালা।

বিষ্ণুধরের একজন নীলকণ্ঠ ঠাকুর-সন্তান। গোবিন্দ ঠাকুর-সুত বলরাম। শিবাচার্য্য-সুত রমণ ও রাজবল্লভ। রঘু ঠাকুর ও বিশ্বেশ্বর ঠাকুর যখন কুলীনগণের নবগুণের হ্রাস হইতে লাগিল, তখনই ইঁহারা ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিদ্যাবিনয়াদি সম্পন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের উপাধিও পৃথক হইল। যথা মুরহর, "তর্কবাগীশ" নামে বিশেষ বিখ্যাত। মধুসূদন "তর্কলঙ্কার" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। খড়দা মেলের প্রধান প্রকৃতি যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর "পণ্ডিত" নামেই সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহারা তৎকালে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া ঐরূপ উপাধির অধিকারী হয়েন। যাহাদিগের তাদৃশ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য ছিলনা, তাঁহারাই কেবল মুখোপাধ্যায় সংজ্ঞায় পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেছেন।

(১৮শ) ব্যাকর-বংশীয় কাচনার মুখুটী সারঙ্গসুত অর্জ্জুন মুখোপাধ্যায়ের উপাধি মিশ্র। বেদান্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসায় যে ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তাঁহারই মিশ্র এই উপাধি গ্রহণের অধিকার থাকিত। যথা—"পূর্ব্বোত্তরমীমাংসেজানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ" এই অর্জ্জুন মিশ্রের বেদান্তাদি গ্রন্থের ও মহাভারতের টীকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

শ্রীহর্ষ হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় ২৪শ পুরুষ অধস্তন। বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া তাঁহাকে সুধীগণ "পণ্ডিত" বলিয়া সমাহ্বান করিতেন। ইনি পণ্ডিতরত্নী মেলের নায়ক। ইনিও স্মৃতি গ্রন্থের টীকা লেখেন কুলগ্রন্থে তাহার উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। শ্রীহর্ষের অধস্তন অন্বয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ স্বীয় স্বীয় বিদ্যাবত্তায় নিম্নলিখিত মেলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। অশেষ গুণ, কার্য্যকারিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা এবং আত্মত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই নায়কতা অর্থাৎ সমাজের উপবিভাগে আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন না। ইঁহাদিগের সে সকল গুণাবলী ছিল বলিয়া, সমাজের নেতৃত্বভার পাইয়াছিলেন।

৬ ভৈরব মুখোপাধ্যায়—শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ ভৈরবঘটকী মেল।

৭ মালাধর মুখোপাধ্যায়		খাঁ	২৪শ মালাধর খানী মেল
৮ শতানন্দ	ঐ	খাঁ	২৬শ শতানন্দ খানী
৯ চক্রপতি	ঐ	বিদ্যালঙ্কার	২৪শ চক্রপতি মেলের
১০ চক্রপাণি	ঐ	তর্কালঙ্কার	২৩শ আচম্বিতা মেলের
১১ গোপাল	ঐ	ঘটক	২৩শ গোপাল ঘটকী
১২ দশরথ	ঐ	ঘটক	২৩শ দশরথ ঘটকী
১৩ জিতামিত্র	ঐ	মিশ্র	২৪শ প্রমোদনী
১৪ বাণীনাথ	ঐ	মিশ্র পণ্ডিত	২৫শ শুদ্ধে সর্ব্বানন্দী।

১ ফুলে, ২ খড়দা, ৩ বল্লভী, ৪ সর্ব্বানন্দী, ৫ সুবাই, এই পাঁচ মেল সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই পাঁচের মেল-নায়কও যে শ্রীহর্ষের অধস্তন সন্তানবর্গ, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বানন্দী মেলের নায়ক মহাদেবের অধস্তন মহেশ্বর প্রমুখ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ২১শ পুরুষ।

সুবাই মেলের অধিনায়ক কাঁচনার মুখুটী ভাস্কর-বংশীয় মধুদেব। ইঁহার অপরনাম বাণ মুখোপাধ্যায়। ইনি শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ।

এখন দেখা গেল যে, কুলীনগণের ৩৬ মেলের মধ্যে ১৪টী মেল মুখোপাধ্যায়গণের কৃতিত্বের লীলা-খেলার আধারস্থান, অবশিষ্ট ২২টী মেলের মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, গঙ্গ, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল মহোদয়গণের আংশিক ক্রীড়ার স্থল মাত্র। সর্ব্বত্রই মুখোপাধ্যায়গণের বিশ্রামস্থান দেখা যায়। যে কুলে মুখোপাধ্যায়গণের বিশ্রামস্থান নাই, সে কুল পবিত্র নহে। এইটী মেল-মালার বিশেষ উক্তি। সেই জন্য ঘটকেরাও প্রস্তাবনায় সর্ব্বাগ্রে মুখুটী বংশের প্রশংসা করিয়া, কুল-প্রশংসার গান করিয়া থাকেন।

শ্রীহর্ষের পুত্র নান সাহবিগ্রামী। তদীয় অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষে শূলপাণি মহোদয়ের আবির্ভাব হয়। ইনি যে সকল স্মৃতি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আচার, ব্যবহার দায়াদি গ্রন্থ লেখেন, তন্মধ্যে সম্বন্ধবিবেকও প্রায়শ্চিত্তবিবেক দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি ও কুশাগ্রধী বলিয়া [illegible] হয়। তদীয় মীমাংসা দৃষ্টে স্মার্ত্ত-শিরোমণি বন্দ্যঘটীয় হরিহরাত্মজ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দৃঢ়তা সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ সংগ্রহ গ্রন্থের কত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শূলপাণি মহোদয়ের লেখায় চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে এবং ঔদার্য্যে দোষ দেখাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

অনেকে কহেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু বাসুদেব সর্ব্বভৌম শ্রীহর্ষান্বয়-সম্ভূত। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার কোনস্থলে তদীয় পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ না থাকায় আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল। বস্তুতঃ তিনি যে প্রকার বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সদাচারসম্পন্ন পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীহর্ষের বংশের কুল-তিলক বলিয়া অনেকের বিশেষ প্রতীতি আছে। উহা বিপর্য্যয় কথা আমাদিগের অপ্রামাণিক কথায় শোভা পায় না।

কবিবর জয়ানন্দও মুখোপাধ্যায়-কুল-সম্ভূত। তিনি বাঙ্গালা পয়ারছন্দে অনেক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষ প্রতিভাত হইয়াছে।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

আসাম ও আসামবাসী।

যদিও আসামীয় ভাষায় আসামীয়া-সমাজে বলা আমার কতক দূর অভ্যাস আছে, তথাপি বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে [illegible] মান হইয়া বঙ্গভাষায় বলিতে অগ্রসর হওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। ইহাতে [illegible] আমার কতদূর ধৃষ্টতা ও [illegible]

প্রকাশ পাইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক অসমসাহসের কার্য্য করিতে হয়, ইহা মহোদয়গণের অবিদিত নাই। এই মনে করিয়া আমি এই রচনা লিখিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং সুধীমহোদয়গণ রচনার অশেষ দোষ উপেক্ষা করিয়া যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব, কারণ ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশের উপকরণ মাত্র।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আসাম কাহাকে বলে? এবং আসামীয়াই বা কাহারা?

মহাভারতে কি রামায়ণে কি রঘুবংশে কি অন্য কোন পুরাতন গ্রন্থে "আসাম" নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল ঐ সকল পুস্তকে "কামরূপ বা কামতা পুর বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। অধুনা "কামরূপ" বলিলে "গৌহাটী ও বড়পেটা" এই উভয়কে বুঝায়। "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" শব্দও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর" অর্থ কেহ কেহ—"a country of departed glory" করিয়া থাকে; আমার বিবেচনায় "a country of ancient glory" স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এই দুইটী শব্দের কোনটিই সমস্ত আসাম-বাচক নহে, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত। কোন কোন গ্রন্থকার এমনও বলিয়াছেন যে, করতোয়া নদী হইতে ডিক্রাই পর্য্যন্ত স্থানের নাম "কামরূপ" আর অবশিষ্টাংশের নাম "নামরূপ"। এই সকল বিষয় মীমাংসা করা সহজ ব্যাপার নহে, এবং আমার মত লোকের দ্বারা এই স্থলে স্থিরীকৃতও হইতে পারে না। এই স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, "আসাম" শব্দ প্রাচীন নাম নহে, ইহা আধুনিক অর্থাৎ আহোম রাজার রাজত্ব কাল হইতে প্রচলিত। আসাম এক সময়ে এমন দুর্গম ছিল যে, এই অঞ্চলের অর্থাৎ নিম্ন বঙ্গের কোন লোক সাহস করিয়া সেখানে গেলে আর প্রায় ফিরিয়া আসিত না। এজন্য "কামরূপ" যাদুবিদ্যার জন্য সমস্ত ভারতে বিখ্যাত; কিন্তু এক্ষণে বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকটের দিনে এইরূপ ভাবোদয় শিক্ষিতশ্রেণীর ভিতর হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ পূর্ব্বে যেস্থানে যাইতে জল-পথ কি স্থলপথ নানা বিপদসঙ্কুল ছিল ও মাসাধিক কাল লাগিত, আজ সেই কামরূপে যাইতে বাষ্পীয় শকটে ২৪ ঘণ্টা লাগে এবং অধিক কি, আসামের পূর্ব্ব সীমাস্থিত ডিব্রুগড় সহবে ৫৭ ঘণ্টায় পহুঁছিতে পারা যায়। বহুদিবসাবধি আসা-মের সহিত বঙ্গদেশের সম্পর্ক হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরী কি ব্যবসায় উপলক্ষে যাইয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া তথায় মহাসুখে পরমানন্দে বসবাস করিতেছেন উভয় সম্প্রদায়ের প্রবীন বৃদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ প্রীতি ও সদ্ভাব পরিলক্ষিত হইত, অদ্যকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে ক্রমে তাহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দিতাই এই অসদ্ভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাকে কখনও শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

আসামীয়া বলিলে সাধারণতঃ আসাম-বাসী বুঝায় সত্য, কিন্তু আমি এই প্রবন্ধে যাহাদের মাতৃভাষা আসামীয়া তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি; কারণ আসামের কোন কোন নদীর ধারে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ও সীমান্তভাগে অনেকগুলি আদিম অধিবাসী ও অসভ্য বর্ব্বর জাতি বাস করে। তাহা-দের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কথিত

ভাষা আছে; লিখিত কোন চিহ্ন কি পুস্তক নাই। আসামীয়াদিগের নিকট তাহাদিগকে প্রায় সকল সময় আসিতে হয়, এজন্ত তাহাদের অনেকে আসামীয়া ভাষা বলিতে পারে। তত্রাচ দেশাচারমতে উহাদিগকে আসামীয়া না বলিয়া সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত করিলাম যথা—নাগা, খাসীয়া, কুকি, কাচাঘি, মিরি, মিকির, আবর, ডফ্‌লা, খামতি, চিংফৌ ইত্যাদি। উহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ঘরবাড়ী সমস্তই আসামীয়া হইতে বিভিন্ন। উহাদিগকেও আসামীয়া নাম দিয়া, অনেকে স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়ার জন্মভূমিকে অসভ্য দেশ বলিতে কুণ্ঠিত কি লজ্জিত হয় না। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক শিক্ষিত লোকের পক্ষে—

> "বিদ্যাবিবাদায়, ধনং মদায়,
> শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
> খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ,
> জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥"

কিন্তু আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে :—

> "গুণৈরুত্তমতাং যান্তি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতাঃ।
> প্রাসাদশিখরস্থোঽপি কাকঃ কিং গরুড়ায়তে॥"

আসাম এক প্রাচীন দেশ। উহাতে অনেক জাতির বাস বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল জাতির ভিতরে এক একজন রাজা বা অধিপতি ছিলেন এবং এখনও কোন কোন জাতির মধ্যে এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অকারণে বা অতি সামান্ত কারণে সতত রণ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নিরীহ প্রজাদিগকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করিত। এমন সময়ে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বদিক হইতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া শ্যামবংশীয় আহোম জাতি আসামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া আসামের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইহারা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং সমরকুশল ছিল এবং সকল বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল। প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া জয়পুর নগর স্থাপন করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিল। পরে অভয়পুরে পহুছিয়া ভয়ের কোন কারণ না দেখিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিবন্ধকদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমস্ত আসামের একছত্র রাজা হইয়াছিল। যদিও বা ইহাদের পরেও কাঁকিয়াল, তুরুং আদি শ্যামজাতীয় লোক আসামে আসিয়া বসতি করিয়াছে, তথাপি আহোমেরা প্রজাদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ করিয়া আসামের বাসিন্দা হইল এবং তাহাদের অধিকৃত দেশ "আসাম" নামে অভিহিত হইল। ইহাদের ভাষা পৃথক এবং ইহারা যাজক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। এই যাজক সকলকে দেওধাই বাইলুং বলিত এবং ইহাদের সাহায্যে আহোম রাজারা অনেককাল শ্যামদেশীয় ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল। ইহারা ভূত প্রেতাদি অপদেবতাতে বিশ্বাস করিত এবং "কেঁচাইখাতি" নামক মন্দিরে নরবলি দেওয়া প্রথা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অপরাধীদিগকে অপরাধ অনুসারে দণ্ড প্রদান করিতে নানাপ্রকার যন্ত্রণা-বিধান ছিল এবং এই সকল নৃশংস ব্যাপার শ্রবণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চ হয় আর গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। যদিও বা আহোমেরা সম্পূর্ণরূপে আসামবাসী হইয়া ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি উচ্চ রাজপদে স্বজাতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা হইত না। টাঁকশাল ছিল, যাহাতে রাজার নামাঙ্কিত ফিরিঙ্গ সোণার ও রূপার মোহর

প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই সকল মোহর অদ্যাপি অনেক স্থানে পাওয়া যায়। রাজ সরকারে চাকরী করিতে ও রাজদত্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইতে সকলশ্রেণীর লোকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। কোন সম্ভ্রান্ত লোক ব্যবসায় বাণিজ্য করিত না; কারণ ব্যবসায়কে ঘৃণাচক্ষে দেখিত। কর্ম্মচারী-দিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না; কেবল জমিজমা আব খাটনির জন্য লোক জন দেওয়া হইত। দাসবিক্রয়-প্রথা ছিল বলিয়া সকল সম্ভ্রান্ত লোকের অনেকগুলি দাসদাসী ছিল। প্রজাদিগকে জমির জন্য খাজানা দিতে হইত না কেবল প্রত্যেক পরিবারের পূর্ণবয়স্ক লোককে রাজার নির্দ্দেশমত সরকারি কাজ ছয় মাসের জন্য করিতে হইত। এজন্য আসামের অনেক স্থানে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, অনেক দেউলদেবালয় এবং সুন্দর রাস্তা ঘাট সহজে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সৈনিক বিভাগ ও বন্দুক কামানের ব্যবহার ছিল। অদ্যাবধি অনেক ছোট বড় কামান শিবসাগর সহরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আসামের শাসন প্রণালী এমন সুন্দর ছিল যে স্বদেশ-হিতৈষী বিচক্ষণ লোকের হাতে ইহা দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন ও প্রজার সুখবর্দ্ধন করিতে পারিত; কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয়, অলস অশিক্ষিত কর্ম্মচারীর হাতে পড়িয়া দেশের নানা দুর্গতি হইয়াছিল। মুসলমানেরা অনেক বার আসাম আক্রমণ করিয়া দেশে হুলস্থূল লাগাইয়াছিল; প্রত্যেকবারেই আসামীয়ার হস্তে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের আক্রমণের চিহ্ন নিম্ন আসামে অনেক দৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলস্বরূপ অনেক মুসলমান আসামে রহিয়া গেল। [illegible] বিষয় এই যে, আসামে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে নাই।

আহোম নাম কি প্রকারে হইয়াছে তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না; কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আহোমেরা ব্রাহ্মণদিগের বশীভূত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা সুসময় পাইয়া নিজ স্বার্থ বজায় রাখিয়া রাজাকে পরামর্শ দিতে ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য তান্ত্রিক উপাসনার প্রভূত বিস্তার করিতে লাগিল। এমন সময়ে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আসাম নগাঁও জেলায় বট-দ্রবা গ্রামে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। ইনি কুসুম্বর ভূঞার পুত্র—জাতিতে কায়স্থ। দেশের শোচনীয় ধর্ম্মাবস্থা দেখিয়া মহাত্মা সক্রেটিশের মত শিশু শঙ্করের মন বিচলিত হইল। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতি চিন্তাশীল ছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। আপনাকে এই মহৎ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি বারজন অনুগত লোক সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; এবং স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিয়া ভাগবতী অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আসামীয়া ভাষা কথিত ভাষারূপে ছিল বলিয়া বোধ হয়; শঙ্কর ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য মাধব উভয়ে অনেক ধর্ম্মপুস্তক মূল সংস্কৃত হইতে নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া আসামীয়া ভাষার যেরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার উদ্ভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ঘোষা ও কীর্ত্তন আজিও আসামবাসী গৃহে গৃহে রাখিয়া অতি আদরে ও ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেছে। শঙ্কর ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় চৈতন্যের জন্ম ও মৃত্যু হয়। অনেকের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে শঙ্কর, চৈতন্য হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা

করিয়াছিলেন; কিন্তু শঙ্করের জীবনচরিতে এমন কথার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ নাই। শঙ্করের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে সাকার উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ—হরিনাম একমাত্র সার। সেই সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদ উদ্ধৃত হইল—

"অন্ত দেবী দেউ, নকরিবা সেউ,
গৃহকো নাখাইবা, প্রসাদো নাখাইবা,
ভক্তি হৈবে ব্যাভিচার।"
"হরিনাম হরিনাম এমূল মন্ত্র।
কলিত নাহি তপ যজ্ঞ যন্ত্র॥"

শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোকের গুরু হইবেন না; কারণ তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারা তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে গোল বাধিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন শেষে তাহাই ঘটিল। ব্রাহ্মণেরা ক্রমে হস্তক্ষেপ করিয়া শঙ্করের ধর্ম্মেও অনেক প্রমাদ ঘটাইয়াছে এবং উপসনাগৃহে প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখা গিয়াছে।

শঙ্কর নিজে গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন, এবং সেই দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, গৃহী হইয়া সহজে বিশুদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গ্রামে বড় বড় নাম ঘর অর্থাৎ হরিমন্দির আছে। সেই নাম ঘরে অনেক উৎসবোপলক্ষে গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া হরিনাম লইয়া থাকে। উহাতে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয় না; কেবল একখানি ভাগবত বা ঘোষা বা কীর্ত্তন পুঁথি কোন উচ্চাসনে রাখিয়া সকলেই নাম কীর্ত্তন করে। শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হওয়া উপলব্ধি করিয়া আহোম রাজাকে পরামর্শ দিয়া অনেক প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলে, শঙ্কর প্রাণভয়ে কোঁচবেহারের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় [illegible] সত্র স্থাপন করিয়া অনেক শিষ্য রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আসামের আপামর প্রায় সকলেই শঙ্কর দেবের বাৎসরিক উৎসব সমারোহে করিয়া আসিতেছে; অধিক কি, সকল শ্রেণীর নব্য শিক্ষিত যুবকেরাও সেই দিনে আধুনিক নিয়মানুসারে একত্রিত হইয়া সেই মহাপুরুষের গুণানুকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বকালে আসামের সঙ্গে কোঁচবেহারের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও কোঁচজাতি আসামের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোঁচবেহারের রাজারা অতি গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল রেল আর জাহাজের দিনে কালের কুটীল গতিতে আসাম আর কোঁচবেহার অতি দূর দেশ হইয়া পড়িয়াছে।

John Bull and his Island পুস্তকে ইংরেজদিগের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—"The grotesque state of things is the natural result of that constant splitting up into sects that the Reformed Church has undergone ever since the days of Cromwell. Many dissenting churches have set the example by vulgarising their services. They tried to make religion attractive, and they made it ludicrous. Ministers, transformed into actors, have been idolised, nay, almost worshipped, by congregations, who saw in them a Saviour instead of lifting their eyes to Heaven." আমাদের দেশেও প্রায় তথৈবচ; পাদরীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রোতৃবর্গ আকর্ষণ করে, আমাদের দেশে উহার অপরূপ সঙ্কীর্ণ বাহিক

সাধুবেশ, গম্ভীর্য্যশালী গুরুব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীর সম্মানের ও সেবার পাত্র হইয়া থাকে।

আসামে ব্রাহ্মণ, গণক, কায়স্থ, কলিতা, কেওঁট, কোঁচ, ছুটীয়া আদি অনেক জাতীয় লোক আছে। বঙ্গদেশের মত আসামে ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেই নামের শেষে "শর্ম্মা" লিখিবে; কেবল পদ ও কার্য্যকলাপ অনুসারে তাহাদের ইতর বিশেষ আছে। গণক অর্থাৎ গ্রহবিপ্রেরাও অবাধে "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের ব্যবসা হইতেছে কয়কোষ্ঠি গণনা আর তজ্জন্য ও গ্রহাদির উদ্দেশে দান দক্ষিণাদি গ্রহণ। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কোন ধর্ম্মকার্য্য করাইবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। আসামে কেবল এই দুই শ্রেণীর ভিতর বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু বালিকা রজস্বলা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মুখ দেখিতে পায় না আর শ্বশুরবাড়ীও যাইতে পারে না। এই সতর্কতাপূর্ণ নিয়ম থাকায় আসামে "Age of consent Act" চালাইবার আবশ্যক হয় না; এই দুই শ্রেণীর ভিতর কোন বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না।

আসামের কায়স্থরাও বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের মত নানাশ্রেণীতে বিভক্ত নহে। তাহারা উত্তরীয় গ্রহণ করে এবং ধর্ম্মগুরু হইয়া অনেকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যও করিতেছে। অধিকাংশ কায়স্থ কলমপেশা কাজ করে বলিয়া তাহাদিগকে "কাকতী"ও বলা যায়। "কাকত" হিন্দুস্থানী শব্দ = কাগজ। কলিতাদিগের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি চলিতেছে। কায়স্থ, কলিতা, কোঁচ, কেওট আদির ভিতর বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কন্যার ১৫।১৬ কি ততোধিক আর বরের ২০।২৫ কি ততোধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইতর লোকের ভিতর বরপক্ষ হইতে নগদ টাকা ও বিবাহের খরচাদি লওয়া নিয়ম আছে; এজন্য শাস্ত্রসম্মত বিবাহ তাহাদের ভিতর শতকরা দশজনার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। দেশাচারমতে স্ত্রী পুরুষ ভাবে থাকিয়া কত লোক মরিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শাস্ত্রমতে বিবাহ না হইলে শরীর শুদ্ধ হয় না এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে কলাগাছ, শিলনোড়াদির সহিত বিবাহ করিতে দেখা শুনা গিয়াছে। যোত্রবান, মান্য কি পদস্থ হইলে সকল শ্রেণীর ভিতর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইয়া থাকে আর বর কি কন্যা পক্ষ কেহই নগদ টাকা কি অন্য কোন খরচা লয় না। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র পাইলে কন্যাপক্ষ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়; তথাপি দূরদেশে বিবাহ কার্য্য করিতে হইলে বরপক্ষ অনিচ্ছা স্বত্বেও কোন কোন বিষয়ে সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। কন্যাকর্ত্তা হইতে টাকা লইয়া বিবাহ করা আসামীয়া ভদ্রশ্রেণীর ভিতর অতি নিন্দনীয় ও অপমানজনক। "বর" বলিয়া থাকে—"স্ত্রীর টাকা লইয়া বড় মানুষ হইতে চাইনা, পুরুষ জন্ম লইয়াছি পুরুষার্থ করিয়া পরিবারের ভরণ পোষণ করিব।" কন্যাকর্ত্তার অবস্থামত যেরূপ চলে কন্যার সঙ্গে তাহাই দেয়; বরপক্ষ তাহাতে কোন কথা উত্থাপন করে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল কোন কোন শিক্ষিত যুবক আসামের এই উন্নত নিয়ম পরিহার করিয়া বঙ্গদেশের জঘন্য বৈবাহিক প্রথার অনুকরণ করিতেছে। শাস্ত্রসম্মত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে আসামে ভদ্রশ্রেণীর ভিতর প্রাজাপাত্য আর জনসাধারণের ভিতর পৈশাচ অর্থাৎ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাওয়া প্রথা প্রচলিত আছে।

যখন বালকের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আসামের অভিভাবকগণ অতি উদাসীন, তখন বালিকা-

শিক্ষা কি প্রকার হইবে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও অনেকের এমন ধারণা আছে যে, লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক দুষ্টা ও ভ্রষ্টা হয়; আর লেখাপড়া শিখিয়াই বা তাহারা কি চাকরী করিতে যাইবে? যে শিক্ষায় স্ত্রী কি পুরুষের রুচি বিকার আর অনীতি-অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মায়, সে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। সাধু সুশিক্ষিত চরিত্রবান লোক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, শিক্ষার দুর্নাম ঘুচিয়া যাইবে ও সকল শ্রেণীর লোকে বালক বালিকাকে লেখা পড়া ও ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে উৎসুক্য প্রকাশ করিবে।

আসামের লোকের আজ এত হীনাবস্থা কেন? আহোম রাজার রাজত্বকালে একদিকে নিষ্পেষিত দুঃখী প্রজা আর অন্যদিকে অলস অত্যাচারী কর্ম্মচারীগণকে দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই উচ্চশ্রেণীস্থ লোকগণ কোথায়? আর আসামের অবস্থাই বা কি? তাহার উত্তর আসামের কমিশনর জেনেরেল জেনকিন্স সাহেব এইভাবে দিতেছেন—"Notwithstanding its greatly impoverished and depopulated state, and the disadvantage of being beyond all trade, having no connexion with any other Province of the empire, and only savages as its neighbours, Assam has greatly recovered its cultivation and much of its internal prosperity. It has had to labour, however, under other difficulties in its progress, the greatest perhaps of which has been the impoverishment of every man of rank in the country, first by the sequestration of their pykes and next by the emancipation of their slaves. These formed the estates of the native gentry, who were not generally land-proprietors, and though they had in many instances small patrimonial forms, that is, estates which they had originally cleared from jungle, called *khats*, they were unable to cultivate these when their slaves were librated, and they have with small exception either thrown them up or allowed them to be sold for arrears of revenue and debts."

ব্রহ্মদেশবাসীগণ আসাম তিনবার আক্রমণ করিয়া দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তাহাদের অমানুষিক কার্য্য ও উপদ্রবের কথা শুনিলে আজিও প্রাণ চমকিয়া উঠে এবং চক্ষে জল আইসে। আজিকার দিনেও কোন বিশেষ অন্যায় অবিচার বা উপদ্রব হওয়া দেখিলেই প্রজারা বলিয়া উঠে "মানের দিন কি ফিরিয়া আসিয়াছে?" আসামীয়েরা ব্রহ্মদেশবাসীগণকে মান বলে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার দিনে বাঙ্গালা দেশে যেরূপ অত্যাচার ও নৃশংস কার্য্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহাও ব্রহ্মদেশবাসীগণের অমানুষিক কার্য্যের তুলনায় অতি সামান্য বলিতে হইবে। পূর্ব্বকার লোকারণ্য আসাম শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। এই পামরদিগের হস্ত হইতে পরম সদাশয় ইংরাজরাজ আসামীয়াদিগকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাদের সুশাসনে আসাম দিন দিন উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে। জেনকিন্স সাহেবের নির্দ্দেশিত কারণে আসামে উচ্চ শ্রেণীর ধনী লোকের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাইবে এবং একারণে তাহাদের বংশধরগণই গবর্ণমেণ্টের চাকরীর নিমিত্ত লালায়িত।

আসামে রাজার রাজত্বকালে আফিমের চাষ হইত; তাহাতে লোকেরা অধিক আফিমসেবী হইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্নীতি নিবারণের নিমিত্ত ইংরেজরাজ আফিমের চাষ উঠাইয়া দিলেন বটে কিন্তু স্বহস্তে সেই ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়া কি কুদৃষ্টান্তই দেখাইতেছেন তাহা একবার মনে ভাবিলেও অতি কষ্ট হয়। কারণ আফিমখোরেরা বলে যে, যদি আফিম খাওয়া অনিষ্টজনক হয়, তাহা হইলে এমন সুসভ্য ইংরাজ রাজা এই ব্যবসায় করিবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর—রাজস্বের জন্য। সংস্কৃতে আফিমকে "অহিফেন" বলে এবং অহিফেন=সর্পের ফেনা, ইহার দ্বারা জানা যায় যে আফিম কি জিনিষ। ইহাকে ঔষধ রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু প্রত্যহ সেবন করা অভ্যাস করিয়া ইহার বিষম ফল বিস্তর লোকে ভোগ করিতেছে।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব যেমন,আসামে তিনটি বিহু তেমন। এই তিনটি উৎসব তিন সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। (১) জলবিষুব সংক্রান্তি; (২) মকর সংক্রান্তি; (৩) মহাবিষুব সংক্রান্তি। এই তিনটির ভিতর শেষেরটীতে নিম্নশ্রেণীর ভিতর ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

উপসংহারে বলিতে হইবে—ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে এক সময়ে অতি দুর্গম স্থানে অবস্থিত হইলেও আসাম অতি প্রাচীন এবং নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ প্রদেশ। বশিষ্ট, অগস্ত্যাদি আর্য্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের আশ্রম বা তপোবন যেস্থানে বর্ত্তমান, জামদগ্নিসুত রাম যে স্থানে মাতৃবধরূপ মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন আদি ক্ষত্রিয় মহাবীর সকলের যেস্থান ক্রীড়াভূমি বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত রহিয়াছে, সুরম্য অট্টালিকা, কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দেবদেবীর মন্দির ও সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের ভগ্নাবশেষ অটব্য অরণ্যের মধ্যে যেস্থানে অদ্যপরিমিত দৃষ্টিগোচর হয়—এমন আসাম অসভ্য—এমন আসামের কোন ইতিহাস নাই বলিতে যাঁহারা সাহস করেন, তাঁহারা কেবল নিজের অজ্ঞতা, অসারতা অলসতা ও অনবধানতা প্রকাশ করেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উঁহাদিগকে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ্গের লিখিত আসাম ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মাননীয় গেইট সাহেব মহোদয়-সংগৃহীত "আসাম-ইতিহাস" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অতি পূর্ব্বকালেই আসামে আর্য্যজাতির প্রবেশের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আসামীয়েরা নানা অসভ্য বর্ব্বর ও অর্দ্ধ সভ্য জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় অনেক সময় লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিসসিংহের সুশাসনে ইহারাও স্বভাবিক অলসতা পরিত্যাগ করিয়া উন্নতিপথে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। আসামের সেই দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে আসামেও যুগান্তর উপস্থিত হইতে চলিল। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক সকলদিকেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইবে। যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ কোন পাখী পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিলে, চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া মহৎ আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ ইংরেজ রাজপুরুষের অনুগ্রহে ইংরেজীধরণে শিক্ষালাভ করিয়া এবং ইংলণ্ডের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতত্ত্ব কতক পরিমাণে অবগত হইয়া, অনেকের স্বাধীনতা লিপ্সা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আত্মহারা হইয়া ভারতের উন্নতি কল্পে অন্তরায় হইতে বসিয়াছে। অতএব মহোদয়গণ, স্বদেশের অবস্থা বিষয়ে একবার স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া অন্তরাত্মাকে

পরীক্ষা করিয়া দেখুন; তাহা হইলেই অতি নিরীহ আসামবাসীদিগকে ঘৃণাচক্ষে না দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বড়ুয়া।

ভারতী-মঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিপদী

যেন আছে বেদে লেখা, বিচারিয়া কথ-শাখা,
জীবন প্রতিষ্ঠা কবি পবে।
তাম্র পাত্রে পূর্ণ করি, তিল কণ তদুপরি,
লয়া বসি আনন উত্তরে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ধরি, এমতে সঙ্কল্প কবি,
সামান্যার্ঘ্য করিবে স্থাপনে।
বিচিত্র মণ্ডলোপরে, অচ্ছাদিয়া শ্বেতাম্বরে,
ঘট স্থাপিবেক শুভক্ষণে॥
হয়া অতি ভক্তিমতি, অর্চ্চা করি গণপতি,
পঞ্চদেব পূজি শিব আদি।
আদিত্যাদি গ্রহগণে, অর্চ্চা করি হর্ষমনে,
দিকপাল পূজি যথাবিধি॥
গৌর্য্যাদি মাতৃকাসব, অর্চ্চা নতি পঠি স্তব,
এ সকল করি সমাধান।
পুনঃ করি আচমন, ভক্তিযুক্ত করি মন,
অত্যন্ত হইয়া সাবধান॥
শুন মাতা নারায়ণী, বলি হে তোমারে বাণী,
নিজ দাসে না ছাড়িও দয়া।
অতি মূর্খ নর আমি, পতিতপাবনী তুমি,
ইহা জানি তারগো অভয়া॥
দুর্গাপুরে নিজ ধাম, দ্বিজ রাজসিংহ নাম,
তব পদ ভাবি চিত্ত মাঝে।
ভারতী মঙ্গল পুথি, নিজ সাধ্য যথা শক্তি,
ভণে পদ ভূপতি-অনুজে॥

পয়ার।

ভারতী পদ্ধতি উক্ত ন্যাস আদি সারি।
তৎপরে বিশিষ্ট মতে ভূত শুদ্ধি করি॥
কথশাখা উক্ত মত ধ্যান করি পরে।
করিবে মানস পূজা পুষ্প দিয়া শিরে।
তদন্তরে দিব্য শঙ্খ স্ববামে রাখিয়া।
স্থাপিবে বিশেষ অর্ঘ্য সলিলে পুরিয়া॥
পীঠ দেবতাকে পূজা করি শুদ্ধ মনে।
হস্তে তুলি লবে পুষ্প মণ্ডিত চন্দনে॥
কুর্ম্ম মুদ্রা কবি ধ্যান লয়া সাবহিতে।
ঘটের উপরে দিবে কিবা প্রতিমাতে॥
তবে পুনঃ মন্ত্র মতে করি আবাহনে।
ষোল উপচারে পূজা করিবে বিধানে॥
আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী।
মধুপর্ক দিবে আর আচমনী পুনি॥
স্নানীয় বসন দিবে স্বর্ণ অলঙ্কার।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিস্তর প্রকার॥
নৈবেদ্য নানান মত যথা শক্তি দিবে।
অবশেষে ভূমিগতে প্রণাম করিবে॥
শুক্ল পুষ্প দিবে বহু অঞ্জলি ভরিয়া।
শর্করা সন্দেশ দিবে ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
নানামতে দধি দুগ্ধ গর্গরীতে ভরি।
সম্মুখে সাজায়ে দিবে করি সারিসারি॥
শুক্ল ছাগ ধবল বরণ পারাবতে।
বিনাবধে বলি দিবে দেবীর অগ্রেতে॥
জপ হোম নমস্কার করিবে তৎপরে।
স্তব পঠিবেক কথশাখা অনুসারে॥
যথা শক্তি সুরস্বতী পরে অর্চ্চা করি।

অপরে করিবে অর্চ্চা পুস্তক উপরি ॥
মস্তাধার লেখনীকে আগর চন্দনে।
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পে পূজা করিবে বিধানে ॥
যন্ত্র আদি সকল আনিয়া তদন্তরে।
করিবে উত্তম পূজা পঞ্চ উপচারে ॥
পুণ্য ইতিহাস বাণী শুন দ্বিজবর।
হেন মতে পূজা করি হবে অবসর ॥
নানা জাতি বাদ্য নৃত্য গীত মহোৎসবে।
অধিক আনন্দচিত্তে সে দিন থাকিবে ॥
এইরূপে সেই ক্ষপা প্রভাত হইলে।
স্নান অর্চ্চা সারিয়া আসিবে পূজাশালে ॥
দক্ষিণা করিবে মন্ত্র পড়ি বিধিমতে।
রজত কাঞ্চন কিবা তুলসীর পাতে ॥
সম্পূর্ণ করিবে পূজা শ্রীবিষ্ণু স্মরণে।
সন্ধি ক্রিয়া এরূপে করিবে ষষ্ঠীদিনে ॥
অপরে প্রতিমা লয়া গীত বাদ্য নাটে।
কান্ধে তুলি লয়া যাবে সলিল নিকটে।
সুসব্যস্তে জল মধ্যে বিসর্জ্জন করি।
হরিধ্বনি করি পরে আসিবেক ফিরি ॥
শুন দ্বিজ কালিদাস হয়া সাবধান।
কহিল তোমাতে সব পূজার বিধান ॥
সকলের মূল দেবী জানিবা ইহাকে।
ত্রিভুবনে সেই জয়ী কৃপা করে যাকে ॥
ইনি রুষ্টা হন যাকে তার নাই গতি।
কি করিবে অন্য কাজ না সরে ভারতী ॥
অতএব বলি দ্বিজ শুন সাবহিতে।
ভজহ ইহাকে যায়া ভক্তি করি চিত্তে ॥
বিদ্যা হেতু মৃত্যু ইচ্ছা করি আইলে বনে।
তপস্যা করিলে জয়ী হবে ত্রিভুবনে ॥
শুন বাপু থাক আজি নিয়মিত হয়া।
করাইব উপাসনা প্রভাতে উঠিয়া ॥
ইহা শুনি কালিদাস স্নান অর্চ্চা করি।
ভোজন করিল ফল সঙ্গলিতে বারি ॥
কুশ-শয্যা করি সেই ত্রিযামা বঞ্চিল।
ভারতী স্মরিয়া অতি প্রভাতে উঠিল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি ক্রিয়া করি সমাপন।
আসি উত্তরিল শীঘ্র মুনির সদন ॥
করিল প্রণতি দ্বিজে যুড়ি দুই কর।
গলবস্ত্র করি তিষ্ঠে মুনির গোচর ॥
মুনি বলে বৈস দ্বিজ বাম ভাগে মোর।
বুঝি আজি ভাগ্যোদয় হৈল আসি তোর ॥
ইহা শুনি কালিদাস মহা ভক্তিমনে।
বসিলেক নতি করি মুনির চরণে ॥
দ্বিজের দক্ষিণ কর্ণে মুনি কৃপা করি।
কহিলেন তাকে বাণী মন্ত্র অষ্টাক্ষরী ॥
মন্ত্র পায়া কালিদাস হরষিত হৈল।
সর্ব্ব পাপে তাকে ছাড়ি অতিদূরে গেল ॥
শরত শশাঙ্ক সম সুতেজ শরীর।
চপলতা খণ্ডি দ্বিজ হইল সুস্থির ॥
এই ভাষা যেই জনে ভক্তি করি শুনে।
বিদ্যা যশঃ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
শুন নিবেদন বাণী মাতা সরস্বতী।
অধম জানিয়া কৃপা কর মোর প্রতি ॥
নিজ মন মজাইয়া তব পদাম্বুজে।
ভারতী-মঙ্গল গীত ভণে ভূপাম্বুজে ॥

ত্রিপদী।

মন্ত্র পায়া দ্বিজে, মুনি পদাম্বুজে,
প্রণতি করিয়া বলে।
শুন মুনিবর, নিবেদন মোর,
বলি তব পদতলে ॥
কিবা আজ্ঞা হয়, আনিয়ে নিশ্চয়,
সে কার্য্য করিতে পারি।
কি হয় বিধানে, কহ বিদ্যমানে,
মোকে অনুগ্রহ করি ॥
ইহা শুনে মুনি, কহে প্রিয় বাণী,
শুন দ্বিজ কালিদাস।
সত্বর করিয়া, যাহত চলিয়া,
ভারতী সরিত্ পাশ ॥
যায়া সেই স্থানে, মন্ত্র জপ মনে,
তপস্যা করহ তুমি।
চল তথা তূর্ণ হবে বাঞ্ছাপূর্ণ,
এই বর দিল আমি।

শুনিয়া ব্রাহ্মণে, মুনির চরণে,
প্রণতি করিয়া চলে।
মন কুতূহলে, লঙ্ঘিয় বন জলে
অতি তূর্ণ তথা মিলে॥
বাণীনদীকূলে, বটবৃক্ষমূলে,
নিরমিল এক স্থান।
তথা দিবা রাতি, একাগ্রে ভারতী,
ভাবে মনে নাহি আন॥
ভারতী সাধিতে, অতি হরষিতে,
স্নান করি প্রাতঃকালে
একপদে দ্বিজে, দিবা রাত্রি ভজে,
অশ্বত্থ পাদপমূলে॥
দিবা অবসানে, করয় ভক্ষণে
ফল মূল যাহা পায়।
অতি তৃষ্ণাকালে, করিয়া অঞ্জলে,
সলিল তুলিয়া খায়॥
এমত প্রকারে, ঘোর তপ করে,
ভারতী ভাবিয়া মনে।
হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি, জপে বাণী বলি,
আরাধে রজনী দিনে॥
কত কাল পরে, ত্যজিল আহারে,
শুষ্ক হৈল তনু অতি।
অঙ্গুষ্ঠের ভরে, মন্ত্র জপ করে,
বৃক্ষ সম করি স্থিতি॥
শরীর পিষিত, নাহিক কিঞ্চিত,
অস্থি মাত্র হৈল সার।
জপে দিবা রাতি, ভাবিয়া ভারতী
মনে নাহি কিছু আর॥
শিশির সময়, যথা বারিচয়,
তাহে তনু মজাইয়া।
সকল যামিনী, দ্বিজ জপে বাণী
অত্যন্ত আরত্র হৈয়া॥
গ্রীষ্মে দিবাকালে, মার্ত্তণ্ডের জালে,
জালি বহু হুতাসন।
তার মধ্যে আসি, মন্ত্র জপে বসি,
ইষ্টে মগ্ন করি মন॥
হেনমতে দ্বিজে, সদা বাণী ভজে,
অত্যন্ত কঠোর মতে।
মন্ত্র অষ্টাক্ষরী, দিবা বিভাবরী,
জপেন একাগ্র চিতে॥
দ্বিজের ভকতি, দেখি সরস্বতী,
প্রসন্ন হৈলা মনে।
অতি তূর্ণ করি, দিব্য মূর্ত্তি ধরি,
আইলা দ্বিজ বিদ্যমানে॥
ভারতী সম্পাশে, দেখি কালিদাসে,
নতি কৈল ভূমিগতে।
ইহা দেখি বাণী, দিয়া এক পাণি,
স্পর্শ কৈলা দ্বিজ মাথে॥
উঠহ ব্রাহ্মণ, শুনহ বচন,
চাহ তুমি কিবা বর।
বল মোর স্থানে, দিব এইক্ষণে
বাঞ্ছা পূর্ণ করি তোর॥
শুনি-দ্বিজ সুতে, হৈয়া যোড় হাতে,
বাণীতে বলেন বাণী।
হীন ভৃত্যজনে, তারহ আপনে,
কৃপা করি ঠাকুরাণী॥
দুর্গাপুরে বাস, ভবানীর দাস,
রাজসিংহ নাম দ্বিজে।
নবীন সঙ্গীত, করিয়া রচিত,
ভণে বাণী-পদাম্বুজে॥

পয়ার।

দ্বিজ বলে শুন মাতা দেবী সরস্বতী।
কি বর চাহিব আমি কিবা মোর মতি॥
মোরে যদি দিবে বর ইচ্ছা থাকে মনে।
সতত রহুক মন তোমার চরণে॥
চরমে যখন ধরি নের রবিসুতে।
দাস জানি কৃপা করি তরাইবা তাতে॥
অন্য বরে মোর কিছু নাই প্রয়োজন।
কর তেন যেন ইচ্ছা লয় তব মন॥
ইহা শুনি তুষ্ট হৈয়া বলিলা ভারতী।
মোর বাক্য কালিদাস কর অবগতি॥
কিম্বা হেতু মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া অন্তরে।

দুষ্কর করিয়া বহু তপ কৈলা মোরে॥
আমি তোকে দিল বর হরষিত চিত্তে।
প্রধান পণ্ডিত হবে এ তিন জগতে॥
ক্ষিতিতলে বহুকাল সুখ ভোগ করি।
অন্তকালে প্রাপ্তি তব হবে সুরপুরী॥
এই নদীজলে স্নান কর যায়া তুমি।
রাখিবে বচন কিছু যাহা বলি আমি॥
না বর্ণিবে কদাচিত আমার অবস্থা।
আর যেই ইচ্ছা তব করিও কবিতা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বিজ প্রবেশিল জলে।
ডুবে কালিদাস গেল গভীর সলিলে॥
ক্ষণমাত্র তিষ্ঠি দ্বিজ কীলাল ভিতরে।
উঠে তূর্ণগতি অতি পারের উপরে॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কণ্ঠে হৈল আসি।
রাহুগ্রাস হৈতে যেন মুক্ত হৈল শশী॥
কৃশানু মূর্চ্ছিত যেন থাকে ভস্ম মেলে।
আধার সংযোগ হৈলে প্রজ্জলিতে জ্বলে॥
তেন দ্বিজ কালিদাস ভারতীর বরে।
স্নানে মহাকবি হৈয়া উঠিল সত্বরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
ভারতীকে কাছে দ্বিজ দেখিয়া তখন॥
নানা ছন্দে আরম্ভিল বর্ণনা তাঁহার।
তাহা শুনি সরস্বতী, কুপিত অপার॥
শুন দ্বিজ পূর্ব্বে তোকে করিছিল মানা।
তথাপিও কৈলা মোর শরীর বর্ণনা॥
হবে তোর অধোগতি বাক্য শুন মোর।
বারবধূ গৃহে প্রাণ ত্যাগ হবে তোর॥
এ বচন বলি মাতা নিজ স্থানে গেলা।
অন্তরে তাপিত দ্বিজ কিঞ্চিত হইলা॥
মনে মনে যুক্তি স্থির করি কালিদাস।
কি কারণে আমি আর করি বনবাস॥
সেই নদী জলে ঘট পরিপূর্ণ করি।
গমন করিল দ্বিজ হস্তে লৈয়া বারি॥
নিতান্ত দুর্গম পথে নদী গিরি জল।
মহাক্লেশে ছাড়াইয়া আইল সে সকল॥
ক্ষুধাকালে ফল খায় তৃষ্ণাকালে বারি।
চলে তূর্ণগতি অতি দিবা বিভাবরী॥
বহুদূর হাটি পাইল মনুষ্য আশ্রয়।
সেখানে ত্যজিল দ্বিজে মরণ সংশয়॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ওদন বিহনে।
কি করিলে কি হইবে ভাবে মনে মনে॥
শূদ্র বৈদ্য বৈশ্য দ্বিজ বিচারে নগরে।
দৈবযোগে মিলে এক কুলালের ঘরে॥
কুলাল বলয়ে দ্বিজ কিসের কারণে।
বহুশ্রমে আইলে কেন আমার ভবনে॥
দ্বিজ বলে উপবাস বহুকাল করি।
ক্ষুধায় আকুল হয়া যথা তথা ফিরি॥
কালিদাস বলে তুমি হও কোন জাতি।
শুনি সেই বলে আমি কুলাল পদ্ধতি॥
এথা যদি আইলে করি অনুগ্রহ মোরে।
স্নান করি আইস দ্বিজ এই সরোবরে॥
মৃণময় বাটী তৈলে পরিপূর্ণ করি।
বসিতে আসন দিল পাদ্যহেতু বারি॥
চরণ পাখালি দ্বিজ তৈল দিয়া অঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলে মনোরঙ্গে॥
এথাতে গৃহস্থে গৃহ পরিষ্কার করি।
প্রাণপণে আনি দিল রন্ধন সামগ্রী॥
অতি তূর্ণ কালিদাস স্নান করি আইল।
ভক্ষণ সামগ্রী দেখি হরষিত হৈল॥
রন্ধন করিয়া হর্ষে করিল ভোজন।
কুলালে দিলেক শয্যা করিতে শয়ন॥
সুষুপ্তিতে সুখে সেই সর্ব্বরী বঞ্চিল।
শ্রীরাম স্মরিয়া অতি প্রভাতে উঠিল॥
প্রাতঃক্রিয়া সকল করিয়া সমাপন।
গৃহস্থকে ডাকি দ্বিজ কহিল তখন॥
শুনহ কুলাল তুমি বচন আমার।
করিবে অবশ্য মোর এক উপকার॥
এই ঘট স্থাপ্য তোতে রাখিলাম আমি।
মাহুর সম্পূর্ণ ইথে না ছুইও তুমি॥
এতবলি ঘট থৈয়া চলে দ্বিজবরে।
কুলালে সযত্নে তাকে থৈল নিয়া ঘরে॥
দুই চারি দিন রহিয়া গেল এই মতে।

অন্য দিন দ্বন্দ্ব তার হৈল ভার্য্যা সাথে ॥
ধরিল পতিকে কুপি যাইয়া তার নারী।
হৃদে পদাঘাত কৈল অতি দৃঢ় করি ॥
মরণ সমান লজ্জা পাইয়া কুলালে।
বিষ জানি আনি ঘট পান করে জলে ॥
মৃত্যু ইচ্ছা করি মনে কৈল জল পান।
বাণী কৃপামতে হৈল পণ্ডিতপ্রধান ॥
কে বুঝিতে পারে ভাই বাণীর চরিত।
কুলালে কীলাল খাইয়া হইল পণ্ডিত ॥
সেইক্ষণে কুলাল চলিল রাজপুরে।
প্রশংসা বিস্তর মত করিয়া ভার্য্যারে ॥
তোমার প্রসাদে মোকে কৃপা কৈলা বাণী।
প্রকারে হইলে গুরু শুন নিতম্বিনী ॥
শুন ভাই যাকে বাণী হয় হর্ষমন।
সাফল্য জীবন তার সেই মহাজন ॥
সরস্বতী মাতা শুন নিবেদন মোর।
অনুক্ষণ রৌক মতি পদযুগে তোর ॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম ভূপাল অনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে তব পদাম্বুজে ॥

ত্রিপদী।

কালিদাস তথা হনে, ভ্রময়ে নানান স্থানে,
শুনে কাছে নৃপতির ধাম।
পণ্ডিত অনেক আছে, সেই ভূপতির কাছে,
বিক্রম আদিত্য তার নাম ॥
শুনি বলে কালিদাস, যাব ভূপতির পাশ,
দেখি কোন করে ব্যবহার।
যোগ্যমত করে মান, রহিব তাহার স্থান,
নতু পরে চেষ্টা পাব আর ॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি, চলে ভূপতির পুরী,
তূর্ণ যাইয়া তথা উত্তরিল।
নগরের এক পাশে, রৈল দ্বিজ গুপ্তবেশে,
পরস্পর বারতা জানিল ॥
নৃপের কেমত মন, কৃত আছে বিপ্রগণ,
কেন মত দ্বিজে সমাদর।
শুনিল লোকের মুখে, পণ্ডিতকে যত্নে রাখে,
ইহা শুনি হর্ষ দ্বিজবর ॥
বিচারিয়া শুভ তিথি, স্নান করি যত্নে অতি,
উত্তরিলা রাজা বিদ্যমানে।
দ্বারের নিকটে আসি, মধুর বচনে তোষি
নিজ কথা কহে দ্বারী স্থানে ॥
দ্বিজ জাতি বটি আমি, রাজাতে জানাও তুমি
যাইতে চাই নৃপ সন্নিধানে।
কেন মত আজ্ঞা করে, জানিয়া আসিবা তারে
হবে তব অবশ্য কল্যাণ ॥
দ্বারী চলে ইহা শুনি, ভূপে যাইয়া বলে বাণী,
এক বিপ্র আসিয়াছে দ্বারে।
বলে তার আছে কাজ, কিবা আজ্ঞা মহারাজ,
বুঝিলে কহিতে পারি তারে ॥
দ্বারীর এমত বাণী, শুনি কহে নৃপমণি,
কহ দ্বিজ আসিতে এথাতে।
ইহাকে শুনিয়া দ্বারী, গেল অতি তূর্ণ করি,
নৃপ আজ্ঞা কহিতে দ্বিজেতে ॥
হেন বাক্য শুনি দ্বিজে, প্রবেশিল পুরী মাঝে
রাজসভা দেখিয়া বিস্মিত।
নিন্দিয়া ইন্দ্রের পুরী, ইহার প্রসংশা করি,
কিবা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ॥
হেমময় হর্ম্ম্য সব, তেজে চন্দ্র পরাভব,
অপরূপ অধিক উজ্জ্বল।
কি কব নির্ম্মাণ তার, অতি পরিস্কার দ্বার,
দর্পণে করয়ে ঝলমল ॥
রত্নময় অট্টালিকে, ভূপতি বসিছে দেখে,
ইন্দ্র সম স্বর্ণ সিংহাসনে ॥
শিরোপরে শোভে ছত্র, মণিময় বাতপত্র,
দোলাইছে অনুচরগণে ॥
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ, সম্মুখেতে অনুক্ষণ,
দাড়াইয়া আছে যোড় করে।
বাহিনী বরুথ-পতি, যোদ্ধাগণ মহারথী,
সদা আছে ভূপের গোচরে ॥
কালিদাস ইহা দেখি, মনে বড় হৈল সুখী,
নৃপ অগ্রে তিষ্ঠে যোড় হাতে।

বিস্তর বর্ণনা করে, যেন মত বুদ্ধি ধরে,
ছন্দে বন্দে ভূপের সাক্ষাতে ॥
দেখি কাছে দ্বিজবর, নৃপতি যুড়িয়া কর,
ভক্তিভাবে কৈল নমস্কার।
কিঙ্কর সকলে আনি, স্বর্ণাসন দিল আনি,
কালিদাস দ্বিজ বসিবার ॥
শুন বাণী ঠাকুরাণী, অন্য কিছু নাহি জানি,
তব নাম জপি মাত্র মনে।
আমি জ্ঞানহীন অতি, তুমি দেবী সরস্বতী,
ত্রাণ কর আপনার গুণে ॥
সুসঙ্গ নগরে ঘর, হীনমতি ধরামর,
রাজসিংহ শর্ম্মা বটে নাম।
নূতন পয়ার ভণে, রাখ মাতা শ্রীচরণে,
কৃপা করি পূর মনস্কাম ॥

পয়ার।

মহীপাল মহা যত্নে পুছে দ্বিজ স্থানে।
কোথা ধাম কিবা নাম কিবা অধ্যয়নে ॥
দ্বিজ বলে কালিদাস অভিধান মোর।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যয়ন মিথিলাতে ঘর ॥
ভূপ শুনি বলে বাণী এ বড় বিস্মিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে একজন না হয় পণ্ডিত ॥
অনন্ত অপার সৃষ্টি কেবা জানে অন্ত।
মনুষ্য ভিতরে হেন নাহি গুণবন্ত ॥
কতকাল বাঁচে নর কি পঠিবে ইতে।
ইহার বৃত্তান্ত দ্বিজ বলহ আমাতে ॥
বিপ্রে বলে সত্য বলিয়াছি ধরাপতি।
যে রূপে হইল বিদ্যা শুনহ ভারতী ॥
পৃথিবীতে দিব্য স্থান মিথিলা নগর।
তথা বৈসে শত্রুজিত নামে নরেশ্বর ॥
তার এক কন্যা অতি গুণযুক্তা জানি।
করিল উৎকট পণ সেই নৃপমণি ॥
যেই জিনে বিদ্যাবলে সেই হবে পতি।
ই শুনি পণ্ডিত বহু হৈল উপস্থিতি ॥
সকলি হারিল পরে প্রশ্নে তার সনে।
যুক্তি স্থির কৈল বিহা দিব মূর্খ স্থানে ॥
অতি মূর্খ জানি সবে লয়া গেল মোরে।
সবে ছাত্র হয়া জিনে কপট প্রকারে ॥
নৃপে কন্যা বিহা দিল জ্ঞানী জানি মোকে।
প্রকোট প্রকার জান কতদিন থাকে ॥
নিশ্চয় জানিল রামা আমি মূর্খ অতি।
হৃদে মোর পদাঘাত করিল যুবতী ॥
অপমানে মৃত্যু বাঞ্ছি গেলাম কাননে।
তথাতে হইল দেখা শনকের সনে ॥
তাঁর কাছে নিজ দুঃখ কৈল সগোচর।
শুনি মোকে বাণী মন্ত্র দিল মুনিবর ॥
গুরুর আদেশে বাণী-নদী তীরে আসি।
নিজ সাধ্যমত তপ কৈল দিবানিশি ॥
দাস জ্ঞানে কৃপা করি মোর ভাগ্যফলে।
সাক্ষাৎ হইয়া মাতা সরস্বতী বলে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা দ্বিজ হইবেক তোর।
এ সরিতে কর স্নান বাক্য শুন মোর ॥
হেন শুনি স্নান আসি কৈল সেই নীরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল বিদ্যা ভারতীর বরে ॥
তথা হৈতে নিজ কার্য্য করিয়া সাধন।
আসি উত্তরিল আজি তোমার সদন ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া ভূপ জিজ্ঞাসিলা তুমি।
ইহার কারণ এই নিবেদিল আমি ॥
হেন জানি ভূপ বহুমান কৈল তারে।
সবের প্রধান হৈল সভার ভিতরে ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া ভূপ পুছে দ্বিজ স্থানে।
কহ ভারতীর অর্চ্চা কি তার বিধানে ॥
দ্বিজ বলে শুন রাজা নিবেদন মোর।
সতত থাকিব আমি বিদ্যমানে তোর ॥
উন্মনস্ক আছি আজি ক্ষুধা শ্রম মতে।
কল্য আসি সব কথা কহিব তোমাতে ॥
অনুচর ভূপ ডাকি বলে বিদ্যমান।
ভিক্ষিবার এই দ্বিজে দেহ দিব্যস্থান ॥
যোগ্যমত ভক্ষ্যদ্রব্য দেহ নানা জাতি।
কোন হেতু ত্রুটি যেন নহে কদাচিতি ॥
নৃপাজ্ঞায় অনুচর লয়া দ্বিজবরে।
বাসা দিয়া দিল দিব্য হর্ম্ম্যের উপরে ॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু খণ্ড গুড় চিনি।
তণ্ডুল লবণ তৈল সব দিল আনি॥
নানা জাতি ভক্ষ্য দ্রব্য কত কব নাম।
নৃপের ভাণ্ডারে যত আছে অনুপম॥
দাসগণে আনি দিল দ্বিজের সাক্ষাতে।
রন্ধন ভোজন দ্বিজে কৈল হর্ষচিতে॥
উত্তম শয্যাতে দ্বিজ রজনী বঞ্চিল।
হরি স্মরি কালিদাস প্রভাতে উঠিল॥
প্রাতঃক্রিয়া সারি গেল ভূপের গোচরে।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে আসন উপরে॥
প্রণতি করিয়া রাজা পুছে তার স্থানে।
ভারতী পূজার বিধি কহ কৃপামনে।
শুনি দ্বিজ বলে ভূপ শুন সাবহিতে।
বাণী পূজা প্রচার হইল যেন মতে॥
আদি পূজা কৈল প্রজাপতি আদি দেবে।
দ্বিতীয় করিল পূজা যত মুনি সবে॥
মহারাজা শক্রধ্বজ মহাপুণ্যমতি।
তৃতীয় করিল পূজা করিয়া ভকতি॥
তদবধি পৃথিবীতে হইল প্রচার।
শুন মহামতি ভূপ পুরাণের সার॥
শুক্লা পঞ্চমীতে পূজা উক্ত হয় অতি।
বিশেষ মকর মাসে শুনহ নৃপতি॥
মৃন্ময়ী বাণী মূর্ত্তি গঠন করিয়া।
চতুর্থীতে থাকিবেক নিয়মিত হৈয়া॥
ঘট স্থাপি পঞ্চদেব করিয়া অর্চ্চন।
নিরামিষ সেই দিনে করিবে অশন॥
পঞ্চমীতে প্রাতে উঠি স্নান আদি করি।
প্রতিমা স্থাপিবে আনি আসন উপরি॥
মণ্ডল অঙ্কিত করি বিবিধ প্রকারে।
স্বর্ণ ঘট বসাইবে ঢাকি শ্বেতাম্বরে॥
ষোল উপচারে বং-শাখা উক্ত মতে।
করিবেক অর্চ্চা স্তব অতি ভক্তিচিতে॥
শ্বেতবর্ণ পারাবত ধবল ছাগল।
বিনা বধে দিবে বলি উৎসর্গ কেবল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
সকল সাজায়া দিবে দেবীর গোচরে॥

হেনমতে সেই নিশা প্রভাত করিয়া।
পরদিনে দক্ষিণা করিবে স্বর্ণ দিয়া॥
অপার সলিল মাঝে বিসর্জ্জন করি।
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি আসিবেক ফিরি॥
বিক্রম আদিত্য ভূপ শুন ভক্তি মনে।
যে পূজে বিদ্যাধন বাড়ে দিনে দিনে॥
ইহ লোকে নানা জাতি সুখ ভোগ করি।
তনু অন্তে সেই নরে পায় স্বর্গপুরী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা শুনিতে মধুর।
শ্রবণে অবশ্য তার পাপ যায় দূর॥
ভারতী চরণে মোর শত নমস্কার।
নিজ ভৃত্য জানি মাতা করিবে নিস্তার॥
যেন মত বুদ্ধি ধরে যত মত জানি।
ভূপাম্বুজ ভণে পদ শিরে বন্দি বাণী॥

ত্রিপদী।

শুনি হেন বাণী, নৃপ-শিরোমণি,
ডাকি কহে মন্ত্রীগণে।
পূজিব ভারতী করি তূর্ণ অতি,
সবে কর আয়োজনে॥
শুনি মন্ত্রীগণে, অতি প্রাণপণে,
সর্ব্বত্র প্রেরিলা চর।
পুরীর পত্তন, করিল তখন,
শতে শতে কৈল ঘর॥
কনক রচিত, অতি সুশোভিত,
কি কব নির্ম্মাণ তার।
জিনি সৌদামিনী, তেজেতে ঝাথালি,
চারিভিতে শোভে দ্বার॥
আনে লঘুচরে, করি বোঝা ভারে,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা জাতি।
দেখি মন্ত্রীগণে, কহে ভূপ স্থানে,
শুনি হর্ষ নরপতি॥
আনি বিপ্রগণ, করি শুভক্ষণ,
বাণী পূজা অভিলাষে।
কৈল স্থির কাল, শুক্লপক্ষ ভাল,
পঞ্চমী মকর মাসে॥

ডাকি কারিকর, কহে নৃপবর,
গঠহ প্রতিমা চারু।
নির্ম্মিবা মূরতি, শুভ্রবর্ণ অতি,
কৃষ্ণবর্ণ দিবা ভুরু॥
দিবে দুই কর, গ্রীবা মনোহর,
বীণা মন্ত্র দিবা হাতে।
কেয়ুর কঙ্কন, নানা আভরণ
অসিত চিকুর মাথে॥
উত্তম কিরীটি, করি পরিপাটি,
জড়ি নানা রত্ন মণি।
কনক রচিত, করিয়া ত্বরিত,
শিরোপর দিবে আনি॥
শ্রবণ যুগলে, পরাবে কুণ্ডলে,
গলে দিবে দিব্যহার।
পদক কাঞ্চনে, নির্ম্মিয়া যতনে,
মণি মধ্যে দিবে তার॥
পীন পয়োধর, কাঁচলি তৎপর,
দিবে করি মণিময়।
ধবল বরণ, পরাবে বসন,
কটিতে কিঙ্কিনীচয়॥
যুগল চরণ, অতি সুলক্ষণ,
গড়িবে সব্যস্ত হৈয়া।
কাঞ্চনে জড়িত, মাণিক্যে শোভিত
সাজাবে মঞ্জির দিয়া॥
শ্বেত শতদল, দিবে পদতল,
সব্যস্তে নির্ম্মাণ করি।
হয়া সাবধান, মূরতি নির্ম্মাণ,
করিবা বচন ধরি॥
ভূপতির বাণী, কারিকরে শুনি,
অত্যন্ত সব্যস্ত হৈয়া।
জপিয়া ভারতী, মনে দিবা বাতি
গঠেন মৃত্তিকা লয়া।
গঠি অবসর, হৈয়া কারিকর,
অবশেষে চিত্র কৈল।
সপ্ত দিবা রাত্তি, করি-তূর্ণ অতি,
গঠি ভূপতিকে দিল॥

পায়া বহুধন, গঠনিয়াগণ,
বিদায় হইয়া চলে।
হরিষ অন্তরে, আপন বাসরে
অতি দ্রুত আসি মিলে॥
ডাকি কালিদাস, কহে তার পাশ,
ভূপতি যুড়িয়া কর।
বলি তব পায়, শুন দ্বিজ রায়,
পুরোহিত হবে মোর॥
শুন গো ভারতী করি শত নতি,
রাখিও চরণ তলে।
আর গতি নাই, পদে দিও ঠাঁই,
শরীর পতন কালে॥
যুড়ি যুগ্ম পাণি, কৃপা কর বাণী,
মাতা আপনার গুণে।
পুর মনস্কাম, রাজসিংহ নাম,
জ্ঞানহীন দ্বিজ ভণে॥

পয়ার।

ভূপতির হেন বাক্য শুনি দ্বিজবরে।
সবিনয়ে বলে বাণী নৃপের গোচরে॥
আমাকে বলিলা পূজা করিতে ভারতী।
তব আজ্ঞামত আমি কৈল অনুমতি॥
এত বলি কালিদাস গেল পূজাশালে।
স্নান করি শুচি হৈয়া আসি সন্ধ্যাকালে।
গেলা অধিবাস স্থানে আপনে ভূপতি।
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ বাহিনী সংহতি॥
পঞ্চ শব্দি বাদ্যেতে হইল মহা রোল।
ধমক মৃদঙ্গ কাড়া বাজে ডাক ঢোল॥
নৃত্য গীত নানা স্থানে হরষিত মনে।
মহামহোৎসব পুরে না শুনি শ্রবণে॥
স্বর্ণ ঘট পূর্ণ বারি আনি দ্বিজবরে॥
বসাইল সাবধানে ধান্যের উপরে॥
রসাল পল্লব তার উপরে রাখিয়া।
সিন্দুর চন্দন বিন্দু ঘটোপরে দিয়া॥
স্বস্তিক আসনে দ্বিজ বসিয়া কম্বলে।
বিষ্ণু স্মরি আচমন কৈল গঙ্গাজলে॥

চৌদিকে পণ্ডিত ঘটা বসিছে অপার ॥
স্বস্তি বাক্য সবে মিলি লাগে পড়িবার।
উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে।
নিকটেতে কারো ভাষা কেহ নাহি শুনে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা নানা বাদ্য বাজে সে সময়।
চারিদিকে ঘোর শব্দ হৈল জয় জয় ॥
গনাধিপ প্রথমত করিয়া অর্চ্চন।
তদন্তরে কৈল পূজা পঞ্চ দেবগণ ॥
নবগ্রহ দিকপাল পূজিল তৎপরে।
তবে ভারতীকে পূজে বিবিধ প্রকারে ॥
হেন মতে শুভক্ষণে অধিবাস করি।
গন্ধ তৈল আনি ফোঁটা দিল ঘটোপরি ॥
মন্ত্র পড়ি তৈল দিল প্রতিমার শিরে।
নৃপ-শিরোপরি ফোঁটা দিল দ্বিজবরে ॥
হেন মতে অধিবাস করি সমাপন।
আপন ভবনে চলি গেলেন ব্রাহ্মণ ॥
হবিষ্যান্ন শুচিমতে ভোজন করিয়া।
কুশ শয্যাপরে রৈল নিয়মিত হৈয়া ॥
ভূপতি গেলেন চলি আপনার ধামে।
সংযমিতে নরেশ্বর রৈলা ভক্তি ক্রমে।
প্রভাতে উঠিয়া সবে কৈল আয়োজন।
হেন কালে তথা আসি উত্তরে ব্রাহ্মণ ॥
স্নান অর্চ্চা করি তথা আসিল ভূপতি।
দ্বিজগণে দেখি নৃপ করিলা প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল সবে করি যোড় হাতে।
কনক আসনে বৈসে নৃপাদেশ মতে ॥
হেন কালে ভূপতিকে কহে কালিদাসে।
প্রতিমা মণ্ডপে আন ব্যাজ কর কিসে ॥
দ্বিজের বচন শুনি নৃপ শিরোমণি।
অতি তূর্ণ ডাকি বলে অনুচর আনি ॥
সকলে সব্যস্ত হৈয়া আনহ প্রতিমা।
হেন কালে কাড়া পড়া বাজয়ে দামামা ॥
মণ্ডপে প্রতিমা লৈয়া আইল শুভক্ষণে।
জয় দিয়া বসাইল কনক আসনে ॥
গোময় সলিলে গৃহ করি পরিষ্কার।
শূদ্র আদি করি সব হইল বাহির ॥

শুণ্ডিকাতে কৈল দ্বিজ মণ্ডল অঙ্কিত ॥
তদুপরে স্থাপে ঘট কাঞ্চনে নির্ম্মিত ॥
ঘট আচ্ছাদিল দিব্য ধবল অম্বরে।
বসিলেন কালিদাস আসন উপরে ॥
হেম পাত্রে দূর্ব্বাক্ষত শুভ্র পুষ্পসনে।
সুসর্জ্জ করিয়া তূর্ণ দিলেক ব্রাহ্মণে ॥
চন্দনে সম্পূর্ণ করি চন্দনের বাটি।
পূজকের কাছে দিল করি পরিপাটি ॥
গঙ্গাজলে কালিদাস করি আচমনে।
শরীর পবিত্র কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণে ॥
নানা জাতি মিষ্ট দ্রব্য বহু উপহার।
দধি দুগ্ধ পুরি ঘট দিলেক অপার ॥
যত দিল ভক্ষ্য বস্তু কত কব নাম।
পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে অনুপাম।
ভারতী অর্চ্চয় ভূপে অতুল সম্ভারে।
হেন কেহ না করিছে মরুতের পরে ॥
পাদ্য আদি ষোল উপচারমতে দ্বিজে।
ভক্তি করি করে অর্চ্চা বাণী-পদাম্বুজে ॥
ধূপ দীপ পুরীখান কৈল আমোদিত।
গলবস্ত্রে আছে রাজা অমাত্য সহিত ॥
অষ্টোত্তর শত সংখ্য কনক-কমলে।
নিজ হস্তে নৃপ দিল বাণী পদতলে ॥
শুভ্র ছাগ শতে শতে করাইল স্নান।
কিঙ্কর সকলে আনে পূজা বিদ্যমান ॥
শ্বেতবর্ণ পারাবত পিঞ্জরেতে ভরি।
দেবীর সম্মুখে থৈল সারি সারি করি ॥
উৎসর্গ করিয়া দ্বিজ বেদমন্ত্র মতে।
বিনা বধে দিল বলি দেবীর অগ্রেতে ॥
হোম স্তব করিলেন নানান প্রকারে।
ভূমিগতে যোড় হাতে কৈল নমস্কার ॥
রক্ষক ব্রাহ্মণরাখি পূজা মণ্ডপেতে।
কালিদাস চলি গেলা আপন বাসাতে ॥
নৃপতি প্রণতি করি অতি ভক্তি মতে।
অন্তঃপুরে চলি গেলা ভোজন করিতে ॥
সন্ধ্যাকালে পূজাশালে আইলা কালিদাস।
পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগি পরে শুক্ল বাস ॥

নৃপতি এমত কালে আসিলা তথাতে।
ভারতীকে নমস্কার কৈলা ভূমিগতে॥
চরণ পাখালি দ্বিজ করে আচমন।
ধূপ দীপ প্রতিমাকে করে নির্ম্মঞ্ছন।
দ্বিজ রাজহরি নাম ভূপতি অনুজে।
রচিল নূতন পদ বাণী পদাম্বুজে॥

ত্রিপদী।

মহা মহোৎসব করি, রৈল সেই বিভাবরী,
নৃত্য গীত বাদ্য কুতূহলে।
হেন রূপে সেই দিনে, বৈলা সবে রঙ্গমনে,
দ্বিজ উঠি আইলা প্রাতঃকালে॥
নিত্য নৈমিত্তিক সারি, অতি তূর্ণ স্নান করি,
উত্তম অম্বর পরিধানে।
আসিয়া মণ্ডপ ঘরে, চরণ পাখালি পরে,
বসিলেন কুশের আসনে॥
সাঙ্গ ক্রিয়া যত ছিল, একে একে সব হৈল,
দক্ষিণা করিল তদন্তরে।
ভূপতি এমত শুনি, শত স্বর্ণ দিল আনি
ভক্তি ভাবে ব্রাহ্মণের করে॥
তুলসীর পত্র সাথে, দ্বিজ লৈয়া স্বর্ণ হাতে
মন্ত্র পড়ি করিল দক্ষিণা।
ডাক ঢোল নানা বিধি, রাম বাদ্য পঞ্চশব্দি,
হইল ভারতী পূজা পূর্ণা॥
ঘট নিয়া দ্বিজবরে, বৈগ নিয়া অন্য ঘরে,
ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করি।
ব্রাহ্মণকে করি নতি, ভূমিগতে নরপতি,
ভক্তি ভাবে চরণেতে ধরি॥
যত সব দ্বিজগণে, গেলা নিজ নিজ স্থানে,
নৃপতি আনায়া অনুচর।
বিসর্জ্জন করিবার, ব্যাজ না করি বা আর,
সবে মিলি করহ সত্বর॥
এত শুনি রামগণে, প্রতিমা প্রাঙ্গনে আনে
বান্ধি ছান্দি কান্ধে করি গেল।
সঙ্গে চলে নৃপমণি, করি সবে হরি ধ্বনি,
আনন্দে গমন করিল॥
নৃত্য গীত বাদ্য রোল, তুরী ভেরী ডাক ঢোল
হৈল শব্দ ঘোর কোলাহলে।
কান্ধেতে প্রতিমা লৈয়া, হর্ষে জয় ধ্বনি দিয়া
উত্তরিল সরিতের কূলে॥
হরিদ্রা মিশায়া জলে, কেহ কার অঙ্গে ফেলে
কেহ কারে দেয় পঙ্ক দধি।
হরষিতে সবে মিলি, করে পঙ্কোৎসব খেলি,
বাদ্য গীত হৈল যথাবিধি॥
প্রতিমা সলিলোপরে, লৈয়া বিসর্জ্জন করে,
অতিশয় সাবহিত মতে।
যথা ছিল বহুজল, মূর্ত্তি তথা করি তল,
সবে ফিরি চলিল ঘরেতে॥
ভূপতি আসিলা পুরে, মন্ত্রীগণ গেল ঘরে,
অন্য সব যার যেই স্থানে।
বিক্রম আদিত্য রাজা, সাঙ্গ করি বাণী পূজা,
রহিলেন হরষিত মনে॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম, সুসঙ্গ নগর ধাম,
ভাবি মনে বাণী পদাম্বুজে।
নিজ বুদ্ধি যেন ধরে, তেন মত পরকারে,
নবপদ ভণে ভূপানুজে॥

পয়ার।

বিক্রম আদিত্য রাজা ভারতীর বরে।
অতর্ক ঐশ্বর্য্য আসি হৈল তার ঘরে॥
নানা শাস্ত্রে বিদ্যা তার হইল অপার।
ধরণীমণ্ডলে বৈরি না রহিল তার॥
প্রত্যক্ষ দেবতা হেন জানিয়া ভূপতি।
পাত্র মিত্র ডাকি রাজা বলিল ভারতী॥
দূত ডাকি প্রের তূর্ণ দেশে সর্ব্বস্থানে।
বাণী-পূজা বার্ত্তা দিতে প্রতি জনে জনে॥
অবশ্য করিবা পূজা তোমরা সকলে।
হবে মহাজন সব পৃথিবী মণ্ডলে॥
সর্ব্ব স্থানে দূত বাইয়া প্রের এইক্ষণে।
এত শুনি তূর্ণ করি গেলা মন্ত্রীগণে॥
দূত ডাকি দেশে দেশে পাঠাইয়া সত্বরে।
বিদায় হইয়া সব চলে নিজ ঘরে॥

ধ্যান অনুসারে করি প্রতিমা গঠন।
যথা শক্তি মতে কৈল ভারতী অর্চ্চন॥
হেন মতে সর্ব্ব স্থানে হইল প্রচার।
করে বাণী পূজা সবে যেই সাধ্য যার॥
ক্রমে ক্রমে দেশে দেশে হইল ঘোষণা।
তদবধি বাণী পূজা করে সর্ব্বজনা॥
বিক্রম ভূপের কাছে কৈলা কালিদাস।
সর্ব্ব স্থানে হৈল এই ভারতী প্রকাশ।
শক্রজিত-সুতা শুনি স্বামীর বাখান।
লাজে অপমানে হৈল মরণ সমান॥
হেন জনে অপমান কৈল না বুঝিয়া।
কি কাজ এখনে হেন পরাণি রাখিয়া॥
এই যুক্তি স্থির রামা করি নিজ মনে।
খনিল প্রচণ্ড এক কুণ্ড সেইক্ষণে॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠে জ্বালি হুতাশন।
স্নান করি কুণ্ড তটে আসিল তখন।
অনলে প্রবেশি প্রাণত্যাগ কৈল নারী।
বিমানে চড়িয়া বামা গেল স্বর্গপুরী॥
নবরত্ন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈয়া কালিদাস।
অতি প্রতিপন্ন হৈয়া রহে ভূপপাশ॥
বিদ্যায় অতুল কেহ না পাবে বিচারে।
নিরবধি থাকে দ্বিজ নৃপ সগোচরে॥
হেনরূপে বহুকাল গেল নানা সুখে।
কে খণ্ডিতে পাবে যেই অদৃষ্টতে থাকে॥
ইতিমধ্যে একদিন নৃপ মহাশয়।
গেলেন উদ্যান বনে বসন্ত সময়॥
তার মধ্যে কত আছে রম্য সরোবর।
প্রস্তরে নির্ম্মিত বেশ্ম পারের উপর॥
বসিলা ভূপতি মণিময় সিংহাসনে।
চামরে বাতাস করে অনুচরগণে॥
বিত্তর নর্ত্তকীগণ সেইখানে আছে।
সতত করয় নৃত্য ভূপতির কাছে॥
হেন কালে রবি অস্ত সন্ধ্যাকাল হৈল।
সে কালে নৃপতি এক আশ্চর্য্য দেখিল॥
সূর্য্য অদর্শনে হয় কমল মুদিত।
বিনা বায়ুযোগে কম্পে এ বড় বিস্মিত॥
হৈল দেখি ভূপে পুছে নৃত্যকরী হাসে।
অনাহেতু দেখ পুষ্প কাঁপে কি কারণে॥
সমীরের ক্ষীণগতি সুস্থির কীলাল।
কেন কাঁপে অরবিন্দ সংহতি মৃণাল॥
বল এই ক্ষণে বেশ্যা ইহার কারণ।
নহু হবে এইক্ষণে তোমার মরণ॥
ইহা শুনি বারবধূ চিন্তিত অন্তরে।
মহীধর টুটি যেন পৈল শিরোপরে॥
যোড় হাতে ভূপ কাছে নিবেদয় বাণী।
দর প্রত্যুত্তর রাজা ব্যাজ কর জানি॥
এত বলি বেশ্যা গেল আপন ভবনে।
কালিদাস পলাইয়া আছে সেই খানে॥
তার স্থানে কহে রামা সব বিবরণ।
শুনি হাস্য করি দ্বিজ বলিল বচন॥
শুন বলি নিতম্বিনী কারণ ইহার।
সরসিজে আইল অলি মধু খাইবার॥
হেন কালে অস্তাচলে লুকাল মিহির।
মুদিত সরোজ দেখি ষটপদ অস্থির॥
স্নেহ ভাবি দল ভেদি নির্গত না হয়।
এই হেতু কাঁপে পদ্ম জানিবা নিশ্চয়॥
কহ ধাইয়া ভূপতিকে এই সমাচার।
তবে প্রাণ রক্ষা আজি হইবে তোমার॥
এত শুনি বারবধূ চলে রঙ্গমনে।
কহিতে লাগিল যাইয়া নৃপ বিদ্যমানে॥
যেই মত শ্লোক দ্বিজ কহিছিল তাতে।
সেই শ্লোক কহে রামা নৃপের সভাতে॥
কান্তা সম্বোধন করি দ্বিজে বলি ছিল।
না বুঝি রমণী আসি সেমত কহিল॥
কান্তা সম্বোধন রাজা শুনি বেশ্যা মুখে।
হইয়া বিস্ময় অতি পুছিলা তাহাকে॥
কে কৈল কবিতা এই সত্য বল মোরে।
পুরুষ আনিয়া বুঝি রাখিছ বাসরে॥
এত বলি দূত প্রেরি দিল নৃপমণি।
কে আছে ইহার ঘরে তূর্ণ আইস জানি॥
দূতে ক্রত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া।
দেখে দ্বিজ কালিদাস তথারে বসিয়া॥

ধরি নৈয়া আইল তারা রাজার গোচরে।
তাকে দেখি নৃপবর কুপিত অন্তরে ॥
উত্তম পণ্ডিত পূর্ব্বে জানি ছিল তক।
এবে জানিলাম তুমি লম্পট নায়ক ॥
রাজসভা যোগ্য মত নহেত ব্রাহ্মণ।
ইহার মস্তক নিয়া কাট এইক্ষণ ॥
পদাতি সকলে হেন শুনি ধরে তারে।
তখনি কাটিল মাথা অসির প্রহারে ॥
ভারতীর বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই হেতু মহাজনে হেন গতি পায়।
বাণী বাক্য উপলক্ষে প্রাণত্যাগ করি।
সেইক্ষণ দ্বিজ চলি গেল স্বর্গপুরী ॥
সহসা করিল রাজা হইয়া কুপিত।
পরে ব্রহ্মবধ হেতু পাইল বড় ভীত ॥
কোন্‌রূপে হেন পাপে হইবে মোচন।
এত বলি নৃপবরে ভাবে মনেমন ॥
তুষানল বিনা গতি নাহি দেখি আর।
ইহা বলি চিত্তে রাজা তাহার প্রকার ॥
যেন আছে বেদে লেখা তেন মত করি।
প্রাণত্যাগ করি ভূপে গেল স্বর্গপুরী ॥
এই বাণী যেই শুনে ভক্তি ভাবি চিত্তে।
নাহি তার পাপ শঙ্কা এ তিন জগতে ॥
নানামত সুখে সেই থাকে ধনেজনে।
অন্তকালে ছুইতে তাকে না পাবে শমনে।
নির্ব্বাণ মুকতি পায়া যায় স্বর্গপুরে।
হেন মত ঘটে তার ভারতীর বরে ॥
যেইজনে ভক্তিমনে করে বাণীপূজা।
ক্ষিতিতলে সেইজন হয় মহারাজা ॥
শুন মাতা সরস্বতী নিবেদন বাণী।
না বুঝে তোমার গুণ ব্যাস আদি মুনি ॥
তাহেত অতি মূর্খ আমি অধম অজ্ঞান ॥
তবে কেন মতে হবে কবিতা নির্ম্মাণ ॥
কহাইলা যেন মত অনুগ্রহ করি।
ভণিল তেমতি তব পদ শিরে ধরি ॥
ইহা জানি ক্ষম দোষ হৈয়া কৃপামতি।
পুনঃ পুনঃ বলি বাণী শুন সরস্বতী ॥

যেন মত উপদেশ যে মত দীক্ষা।
তেমত হইল মাতা পাঁচালী রচনা ॥
তারহ তারিণী মাতা আমি তব দাস।
অন্তকালে তুমি বিনা নাহি অন্য আশ ॥
বলি আমি করপুটে ক্ষম মোর দোষ।
নিজগুণে কৃপা কর না করিও রোষ ॥
সুসঙ্গ আখ্যান দেশ দুর্গাপুর গ্রাম।
কিশোর কেশরী ভূপ তথা অনুপম ॥
রাজসিংহ নাম দ্বিজ তাহার অনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে বাণী পদাম্বুজে ॥

চৌপদী।

শুন সরস্বতী, আমি হীনমতি,
নাহি অন্যগতি, চরণ বিনে।
তোমার চরিত, হইল রচিত,
না হৈও কুপিত, অধম জনে ॥
সাঙ্গ হৈল পুঁথি, শুনগো ভারতী,
হৈয়া হৃষ্টমতি, ভবনে যাও।
দেও এই বর, পদযুগে তোর,
রৌক মতি মোর, শুনগো মাও ॥
পূজা সাঙ্গ হৈল, পদে নিবেদিল,
শত নতি কৈল, চরণোপরে।
না করিও রোষ, ক্ষমা কর দোষ,
হইয়া সন্তোষ, চলহ ঘরে ॥
তুমি নারায়ণী, মাতা শুন বাণী,
যুড়ি যুগ্ম পাণি, তারহ দাসে।
এ তনু পতনে, লইতে শমনে,
রাখিবে আপনে, চরণ পাশে ॥
যত দেবগণে, আসন্ন ভবনে,
আইলা আবাহনে, শুনহ বাণী।
করিয়া সত্বরে, চলহ বাসরে,
কৃপা করি মোরে, অধম জানি ॥
বলি নিবেদনে, হীন ভৃত্য জনে,
রাখহ চরণে, করি এ স্তুতি।
ক্ষম অপরাধ, করি কাকুর্ব্বাদ,
করহ প্রসাদ, অজ্ঞান প্রতি ॥
শুনহ বচন, আমি মূর্খ জন,

ক্ষমহ মার্জ্জন আমার দোষ।
সব দেবগণে, হেব সুনয়নে,
দাস জানি মনে, ক্ষমহ বোষ॥
হেদেগো ভাবতী, করি এ মিনতি,
হৈয়া হর্ষমতি, শুনহ বাণী।
সভাপতি সনে, যত সভ্যগণে,
করহ কল্যাণে, তনয় জানি॥
স্তুতি বাক্য বলি, হৈয়া কৃতাঞ্জলি,
তোমাব পাঁচালী, নির্ম্মাণ হৈল।
পূর্ণ হৈল গীত, কত অনুচিত,
সকলি বিদিত, চবণে কৈল॥
সুসজ্জ নগব, অতি মনোহব,
তথা নৃপবব, অপূর্ব্ব অতি।
বটে পুণ্যবান, সভাব প্রধান,
অতি জ্ঞানবান, সুন্দব মতি।
ভাবতীব গান, হইতে নির্ম্মাণ,
কবি প্রণিধান, কহিলা মোরে।
নৃপাজ্ঞা কারণ, কবিল বচন,
কাব্য বিলক্ষণ, মূর্খে কি পাবে॥
যেন সাধ্য ধবে, তেমন প্রকাবে,
বাণী বন্দি শিবে, ভণিল গীত।
করি লক্ষ নতি, কৃপা কবি অতি,
রাখ সরস্বতী, চরণে চিত॥

শোক-শতে শতে, [illegible]
সভায় বিদিতে, বলিছে বাণী।
শব্দবত্নাকরে, মূর্খে নাহি পারে,
ক্ষমা কর মোরে, ইহাকে জানি॥
করিল বিনয়, যেন বুদ্ধি লয়,
হইবা সদয়, আমাব প্রতি।
দোষ না ধবিবে, গুণ আদরিবে,
বলি ধীব সবে, এতেক স্তুতি॥
সমাপ্ত পাঁচালী, হৈয়া কুতুহলী,
হর্ষে সবে মিলি, বলহ হবি।
নিজ প্রাণপণে, জপি বাত্রি দিনে,
তাব পঞ্চাননে, মিনতি করি॥
শিব শিবাসনে, অন্য দেবগণে,
নতি দণ্ড মানে, চবণোপরে।
বলি এই ভাষ, পূর্ণ কব আশ,
জানি নিজ দাস, তাবহ মোবে॥
শত কোটী নতি, কবিছি ভাবতী,
হৈয়া হর্ষমতি, দেহগো বব।
ভণে ভূপানুজে, রাজসিংহ দ্বিজে,
জপি চিত্ত মাঝে, চবণ তোব॥

রাজা রাজসিংহ বিবচিত ভাবতী মঙ্গল কাব্য সম্পূর্ণ।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ব-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতেব পব।)

২১ সূত্র হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ, ইহাতে জীবাত্মাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইক্ষণে ২৯ সূত্র হইতে ৩২ সূত্র পর্য্যন্ত তাঁহার অণু-পরিমাণ সমীক্ষণ হইতেছে।

'তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥'

যেরূপ সগুণ উপাসনা প্রকবণে পব-ব্রহ্মকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণ জীবের সংসরণ অর্থাৎ উৎক্রমণাদি ব্যাপারে মুখ্য প্রয়োজক বলিয়া তাঁহাকে অণু বলা হইয়াছে।

ভাষ্য—

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণ সূচনা করিতেছে। আত্মার [illegible]

সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না তাহার উৎপন্ন হইবার কথা অশ্রুত। আর পরব্রহ্মের জীব রূপে প্রবিষ্ট হওয়া ও জীবের সহিত তদাত্মা উপাদিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য পরব্রহ্মই জীব ইহা অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং যখন পরব্রহ্মই জীব হইল, তখন তাঁহার যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই উচিত। অধিকন্তু পরব্রহ্মের পরম মহৎ পরিমাণই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব জীব ব্যাপকই বটে, কিন্তু অণু নহে। আর ইহাও অসত্য নহে যে, সেই এই আত্মা মহান্ ও অজন্মা, যিনি অন্তর্জগতে নিরন্তর বিজ্ঞানপূর্ণ থাকিয়া বিজ্ঞান জ্যোতি ঢালিয়া দিতেছেন— শ্রুতি এবং নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও অবিরাম একরূপে বর্ত্তমান স্মৃতির আত্মা যে ব্যাপক এই উপদেশ। আত্মাকে ব্যাপক স্বীকার না করিলে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ইহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, জীব অণু হইলেও তাঁহার সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনা উপলব্ধি হইতে পারে, কেন না তবে পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে পরও নিখিল অঙ্গ ব্যাপিয়া ব্যথার উপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এই জন্য যে, ত্বক্ ও কণ্টকের সংযোগ সমস্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে আছে এবং ত্বগিন্দ্রিয় নিখিল শরীর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। আর দেখিতে পাই বিপরীত, যেই প্রদেশে কণ্টক বিদ্ধ হয় কেবল সেই প্রদেশেই তজ্জনিত ব্যথার উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই রূপও বলিতে পারা যায় না যে, অণুপরিমাণ বিশিষ্ট বস্তু স্বয়ং সকল প্রদেশে ব্যাপ্ত না হইতে পারিলেও তদীয় গুণের ব্যাপ্তি সমস্ত প্রদেশে হইতে কোন বাধা নাই, কেন না তাহা হইলে গুণের অর্থ গুণীর কোন অংশ ব্যতীত অপর কিছু নহে বলিয়া গুণী ভিন্ন অন্য জিনিষকে আশ্রয় করিলে তাহার গুণত্বেরই অপলাপ হইয়া পড়ে। প্রদীপ-প্রভাকে দৃষ্টান্তে রাখিয়া যে গুণ ব্যাপ্তিকে নিখিল প্রদেশব্যাপী বলিবে তাহাও অসঙ্গত এই জন্য যে, প্রভা দ্রব্যান্তর বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ প্রভা প্রদীপাদি তেজ পদার্থ হইতে এক অতিরিক্ত দ্রব্য বিশেষ। এইরূপে গুণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার গন্ধও আশ্রয়ের সহিতই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে নচেৎ উহা গুণত্ব হইতেই বিচ্যুত হইয়া পড়ে। আর দ্বৈপায়নও বলিয়াছেন যে, অনিপুণলোকেরাই জল ও বায়ুতে গন্ধ আছে এইরূপ বলিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে উহা পৃথিবীরই বটে। (এই স্থলে এইরূপ অনুমিতির আকার উহ্য রহিল যে, গন্ধ আশ্রয় হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না যে হেতু উহা গুণ উদাহরণ রূপ।) পক্ষান্তরে যদি জীবের চৈতন্য সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়, তবে অনলের উত্তাপ ও প্রকাশের ন্যায় চৈতন্য জীবের স্বরূপ হওয়াতে তাহাকে অণু বলা যাইতে পারে না। আর এই স্থলে গুণগুণী ভাবজনিত ভিন্নতার সম্ভাবনা নাই এই জন্য যে, চৈতন্যকে জীবের স্বরূপেই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। যেরূপ জীবের অণু পরিমাণ অসঙ্গত, তদ্রূপ তাহার শরীরানুরূপ পরিমাণও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং পরিশেষে জীবের পরম মহৎ পরিমাণ প্রতিপন্ন হইল। তবে কি প্রকারে শাস্ত্রে জীবকে অণু বলা হইয়াছে এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে 'তদ্গুণ সারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ' এই সূত্রাংশ। এই স্থলে তদ্গুণ শব্দের অর্থ বুদ্ধির ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণ উহাই সার অর্থাৎ সংসরণ ব্যাপারে মুখ্য যাঁহার তিনিই তদ্গুণসার আর তাঁহার ভাবই তদ্গুণসারত্ব। ইহা অতীব সত্য যে, বুদ্ধির গুণ ব্যতীত কেবল আত্মার কোন প্রকারে জন্ম মরণাদি রূপ সংসারিত্ব হইতে পারে না, তাৎপর্য্য এই যে, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের ব্যাপারে

অবস্থিত অসংসারী নিত্যমুক্ত সত্যস্বরূপ আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ সংসারিত্ব কেবল বুদ্ধ্যাদি উপাধিজনিত। (এইরূপে তদ্ব্যপদেশ শব্দের অর্থ করা হইতেছে) ঐ তদ্‌গুণসারত্ব হেতু বুদ্ধির পরিমাণ আরোপ করিয়া আত্মার অণুপরিমাণ অভিহিত হইয়াছে। এই রূপে বুদ্ধির উৎক্রমণ প্রভৃতিও আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্লিপ্ত। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রমাণ আছে যে, "কেশের অগ্রভাগকে শতধা বিভক্ত করিলে যে ভাগ দাঁড়ায় জীবের পরিমাণ উহার তুল্য, আর ঐ জীবও অনন্ত অর্থাৎ অবিনশ্বর"। এই উপনিষদে জীবের অণুপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই আবার অনন্ত বলা হইল। সুতরাং তখনই জীবের অনন্ত হওয়ার সামঞ্জস্য হইতে পারে, যখন তাহার অণুত্ব ঔপচারিক (ভ্রান্তিসিদ্ধ) এবং অনন্তত্ব পারমার্থিক (সত্য) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, অণুত্ব ও অনন্তত্ব উভয়ই সত্য অথবা অনন্তত্ব আরোপিত ও অণুত্ব পারমার্থিক, কেন না সকল উপনিষদেই আত্মার ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। (এই স্থলে ইহা উহ্য রহিল যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তদ্ভাবাপন্ন জীব কোন প্রকারে অণু হইতে পারে না।) অপর অণুপরিমাণপাদক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যে "বুদ্ধির গুণ আত্মগুণ বলিয়া অধ্যস্ত হওয়ায় জীব আরাগ্র পরিমাণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।" অবশ্যই এই স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধির গুণ আত্মাতে আরোপিত হওয়াই আত্মাকে আরাগ্রপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ পরিমাণটা স্বয়ং আত্মার নহে। পক্ষান্তরে "এই আত্মাকে শুদ্ধচিত্ত দ্বারা জানিবে" এই বচনে শ্রুতিতেও জীবের অণুপরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়াই, [illegible]

তাহা হইলে পরব্রহ্ম বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগম্য ও শুদ্ধ জ্ঞানের অধিগম্য এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় উহার সঙ্গতি কোন প্রকারে হইতে পারে না। সুতরাং এই স্থলে অণু বলিয়া নির্দ্দেশ করার তাৎপর্য্য আত্মা দুরধিগম্য অথবা তদীয় উপাধিটা অণুপরিমাণবিশিষ্ট ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই "প্রজ্ঞা দ্বারা শরীর সমারোহণ করিয়া" এই কৌষিতকী শ্রুতির জীব ও বুদ্ধির পরস্পর ভিন্নতাসূচক উপদিষ্ট বিষয়েও উপাধিভূত বুদ্ধি দ্বারা জীব শরীরে আবেষ্টন করিয়া এই প্রকার অর্থেরই সমাবেশ করিয়া লওয়া উচিত। আর যদি এই স্থলে প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ চৈতন্যই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে শিলা-পুত্রের শরীর এইরূপ ব্যবহার-যেরূপে শিলা পুত্র ও শরীর একিভাবাপন্ন হইলেও হইয়া থাকে, সেই রূপে জীব ও চৈতন্য এক বস্তু হইলেও উহাদিগের ভিন্নতা ব্যপদেশ হইয়া থাকে। (শাস্ত্রে এই রূপ ব্যপদেশকেই ব্যপদেশী-বদ্ভাবের সংজ্ঞা বলা হইয়া থাকে)। এই স্থলে যে গুণগুণী বিভাগের সম্ভাবনা নাই তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবকে যে হৃৎপদ্মবাসী বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য জীবের উপাধিভূত বুদ্ধি তথায় বাস করে। এইরূপে "কাহার উৎক্রমণ হইলে আমার উৎক্রমণ হইবে, কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, উপাধিভূত বুদ্ধির উৎক্রমণ না হইলে জীবের গমনাগমন হইতে পারে না আর যে দেহ হইতে অপসৃত হয় নাই। তাহার পক্ষে কোন দেহ হইতে গমন এবং কোন দেহে আগমন অসম্ভব। সুতরাং উপাধিভূত বুদ্ধির গুণ জীবের সংসরণ ব্যাপারে প্রয়োজক হওয়ায় তাহার অণুপরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্তে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকে [illegible] বুঝা যাইতে পারে। আর বুদ্ধির গুণ আরোপ

করিয়া পরমাত্মা স্বগুণ উপাসনা প্রকরণে অণু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ—"ব্রীহি এবং যব হইতেও আত্মা অণুতর"। "আত্মা মনোময়, বুদ্ধি তাঁহার শরীরস্থানীয়, এজন্যই তাঁহাকে সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলা যায়।"

ইহা যেন প্রমাণিত হইল স্বীকার করিলাম, কিন্তু যদি বুদ্ধির গুণকে আত্মার সংসরণ দশার কারণ বল, তবে পরস্পর ভিন্ন বিভু আত্মা ও বুদ্ধির সংযোগটা যে এক সময়ে অবসানগ্রস্ত হইবে ইহাও বাধ্য হইয়া তোমায় স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ স্বীকার করিলে বুদ্ধিবিযুক্ত আত্মার কোন প্রকারে উপলব্ধি না হওয়ায় তিনি অস্তিত্বে বঞ্চিত বা অসংসারী হইয়া পড়েন; অতএব উত্তরে বলা যাইতেছে,—

"যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ নদোষস্তদ্দর্শনাৎ।"

ঐ ঐ ৩০।

আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত আত্ম সংযোগের অবসান হয় না; সুতরাং ঐ আপত্তিটা কোন দোষের মধ্যেই নহে; কেন না জীব আত্মার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বুদ্ধি সংযোগ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষ্য—

উক্ত দোষের অভ্যুত্থান আশঙ্কা করা যাইতে পারে না, কেন না বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগটা তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার বিশদ ও বিস্তীর্ণ ব্যাখা এই যে, যে পর্য্যন্ত এই আত্মা সংসারী থাকে, যে পর্য্যন্ত সম্যক জ্ঞান দ্বারা তাহার সংসার দশার অবসান না হয়, সেই পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত সংযোগ ব্যাপারটা আত্মার কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং যত সম্বন্ধ থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব ভাব ও সংসারিত্ব ভাবের বিরাম হয় না। এই ত গেল মায়িক দৃষ্টির কথা। পরমার্থ দৃষ্টিতে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত স্বরূপ ব্যতিরেকে জীব নামে কোন জিনিষ নাই। বেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের দিক্ দিয়া দেখিলে কোন স্থলে নিত্যমুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন একটা চেতন ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে প্রমাণ—"পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মননকারী নাই।" বৃঃ। "তুমি ব্রহ্ম।" ছাং। "আমি ব্রহ্ম"। বৃঃ। বুদ্ধি সংযোগটা যে, আত্মসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত থাকে ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে এই রূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"তদ্দর্শনাৎ" আর বেদ আমাদিগকে দেখাইতেছেন যে, "অন্তর্জগতে যিনি বিজ্ঞানময় যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতি ঢালিয়া দিতেছেন, সেই পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোকে ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকে, সেই যেন চিন্তন করে এবং চলিতে থাকে।" এইস্থলে বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ বুদ্ধিময়। আর বুদ্ধিময় শব্দের অর্থও বুদ্ধির বিকার নহে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রচুর অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ণ, ইহার কারণ এই যে স্থলান্তরে বিজ্ঞানময় শব্দ মন প্রভৃতির সহিত পঠিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত "বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়। (এই সকল ময়ট্ প্রত্যয় গুলির অর্থ প্রচুর, কেন না নিত্য আত্মা কোন প্রকারে অনিত্য বস্তুর পরিণাম হইতে পারে না) পক্ষান্তরে এই স্থলে বুদ্ধিময়ত্বের তাৎপর্য্যটা বুদ্ধির আনুগত্য। আর লোক নীতিতেও স্ত্রীর অনুগত দেব দত্তকে স্ত্রীময় বলা হইয়া থাকে। "সেই পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকে" শ্রুতির এই অংশ

পাদন করে। তুল্যভাবের স্থলেও বুদ্ধির সহিত ইহা উহ্য করিয়া লইবে, কেননা উহার ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহাই সূচিত হইতেছে "সেই যেন চিন্তন করে এবং চলিতে থাকে" এই অংশ দ্বারা। ইহার ভাবার্থটা আত্মা স্বতঃ চিন্তন করেন না এবং চলেন না, কিন্তু বুদ্ধি চিন্তন করিলে চিন্তনকারীর ন্যায় এবং বুদ্ধি গমন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলে গতিশীলের ন্যায় অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আর ইহাও অসত্য নহে, ভ্রান্তি জ্ঞান যাহার বিবরণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের উপরই আত্মার বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধটা নির্ভর করিতেছে। পরন্তু সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে এই মিথ্যা জ্ঞানটা বিনষ্ট হয় না বলিয়া, যে পর্য্যন্ত ঐ সম্যক জ্ঞান জীবের না হয়, সেই পর্য্যন্ত বুদ্ধি সম্বন্ধ অজ্ঞান দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী। ইহাই "আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানি তিনি চিন্ময় জ্যোতিতে নিরন্তর উজ্জ্বল ও মায়ার পরপারে অবস্থিত, তাঁহার একমাত্র সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে" শ্রুতি দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

সুষুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পায়া যায় না এই জন্য যে, "সুষুপ্তি অবস্থাতে হে সৌম্য, আত্মা স্বয়ং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি হইতে বিলীন হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন" এই শ্রুতি আত্মার নিখিল উপাধি হইতে বিমুক্তি উপদেশ করে এবং প্রলয়ে নিখিল মায়িক বস্তুর বিনাশ স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বুদ্ধি সম্বন্ধের অবস্থিতি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় সূত্রকার বলিতেছেন—

"পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ"

ঐ ঐ ৩১।

যেরূপ বীর্য্য শ্মশ্রু প্রভৃতি বাল্য অবস্থায় বীজরূপে বিদ্যমান থাকিয়াই যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয়ে বীজরূপে বর্ত্তমান যে বুদ্ধি তাহা হইতেই জাগ্রৎ ও সৃষ্টিকালে এই বুদ্ধি সম্বন্ধের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে"।

ভাষ্য—

যেরূপ জনসমাজে দেখিতে পাওয়া যে, বীর্য্য ও শ্মশ্রু প্রভৃতি বাল্য প্রভৃতি অবস্থার উপলব্ধি না হইলেও বীজরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই লোকের নিকটে যেন নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং যৌবন প্রভৃতি অবস্থায় আবার আবির্ভূত হইয়া পড়ে কিন্তু নপুংসক প্রভৃতির পক্ষে ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া মূলতঃ অবিদ্যমান ঐ গুলির আবির্ভাব অসম্ভব, সেইরূপ বুদ্ধি সম্বন্ধটা সুষুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বীজরূপে অর্থাৎ মূলাবিদ্যারূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রবোধ ও সৃষ্টি সময়ে আবির্ভূত হয়। আর ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে যে, কোন জিনিষ আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে মানুষীর গর্ভে শৃগাল ও শৃগালীর গর্ভে মানুষ উৎপন্ন হইবার আপত্তি আসিয়া পড়ে। আর শ্রুতিও দেখাইয়াছেন যে, সুষুপ্তি হইতে পুনরুত্থানটার অবিদ্যারূপ বীজ সম্ভাবই কারণ। ঐ শ্রুতি এই—"সুষুপ্তিতে বীজ পরব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকিয়াও জানে না যে আমরা ঐরূপে অবস্থিত আছি।" "সুষুপ্তিতে বীজ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকিয়াও আবার জাগ্রতে সেই ব্যাঘ্ররূপে সেই সিংহরূপে অভিব্যক্ত হয়"। ছান্দোগ্য। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, বুদ্ধি সম্বন্ধটা আত্ম সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত থাকে।

এই ভাষ্য দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা গেল যে- সুষুপ্তিতে জীবের উপাধি স্বরূপ বুদ্ধিটা মূল অবিদ্যাতে মিলাইয়া যায়। ঐ অবস্থাতে অবিদ্যা হইতে তাহার অতিরিক্ত

স্বরূপ থাকে না। আর বিভিন্ন জীবের সুষুপ্তিটা একীভাবাপন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্তও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক এমন কোন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা হইতে আমরা রাম, যদু ও উপেনের সুষুপ্তিটাকে বিভিন্নরূপে ধরিয়া লইতে পারি। এই রূপ নিয়মে বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্য, পশু, পক্ষি প্রভৃতি সম্বন্ধেও সুষুপ্তিটা একই প্রকার দেখিতে পাই বলিয়া ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায় বিভিন্ন জাতীয় নিখিল জীবের সুষুপ্তিটা একই রকমের। আর সুষুপ্ত এক বলিয়া ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতা জীব ও একই বটে। কিছুতেই আমরা সুষুপ্ত অবস্থাপন্ন জীবের ভিন্নভাব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সুতরাং নানা জীববাদীর পৃষ্ঠ প্রদর্শনই এই ভাষ্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতর
নিয়মোবান্যথা"। ঐঐ ৩২।

এই রূপ বুদ্ধি না মানিলে সর্ব্বদা মণি কাঞ্চনাদি বিষয়ের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি অথব আত্মার একটা অভিনব শক্তি স্বীকারের আপত্তি আসিয়া পড়ে।"

ভাষ্য—

আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। কোন স্থলে বৃত্তি গুলিকে বিভাগ করিয়া সংশয় বৃত্তকে মন নিশ্চয় বৃত্তকে বুদ্ধি বলা গিয়াছে। কাজেই এই প্রকার অন্তঃকরণ আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিপক্ষে স্বীকার না করিলে বিষয়েব সর্ব্বদাই উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, উপলব্ধির কারণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইলে পর সর্ব্বদাই বিষয়ের উপলব্ধি হউক এইরূপ একটা অভিযোগ খাড়া হয়। আবার কারণকলাপের সমবধানেও যদি ফলের অভাব মানিয়া লওয়া যায়, তবে নিত্য অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে অন্যতর অর্থাৎ আত্মা বা ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি অনুকূল একটা অভিনব শক্তি স্বীকারে লিপ্ত হইতে হয়। আর নির্ব্বিকার বলিয়া আত্মার এইরূপ শক্তির ব্যবস্থাটা কোন প্রকারে সুসঙ্গত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও এইরূপ দশা; কেন না তাহার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে কার্য্যকারিণী শক্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া অকস্মাৎ ঐ শক্তিটা প্রতিরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যাহার সমবধানে বা অনবধানে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হইয়া থাকে সেই মন। এই বিষয়ে শ্রুতির এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "অন্যমনা হইয়া ছিলাম বলিয়া দেখিতে পাই নাই এবং ঐ প্রকার অবস্থা হওয়ায় শুনিতে পাই নাই।" "মনের দ্বারাই শুনে এবং উহা দ্বারাই দেখে।" বৃহ। কাম প্রভৃতি যে মনের বৃত্তি বিশেষ ইহাও "কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, সন্তোষ, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় এই সকলগুলিই মন।" শ্রুতি দ্বারা জানা যাইতেছে। অতএব বুদ্ধির গুণ আত্মার সংসরণ ব্যাপারে মুখ্য বলিয়া তাহাকে অণু বলা হইয়াছে।

এই বুদ্ধি স্বীকার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায় যে, সুষুপ্তিতেও এই বুদ্ধিটা পূর্ব্ববৎ অক্ষতভাবেই বর্ত্তমান থাকে, কেন না অব্যবহিতপূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে সুস্পষ্ট ভাবে ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সুষুপ্তিতে মনের বিবরণরূপ বুদ্ধিদেবী মূল অবিদ্যারূপ জননীর অঙ্গে মিলাইয়া যান অর্থাৎ মূল অজ্ঞানের স্বরূপে তিনি বিলীন হইয়া যান। তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার সুসঙ্গতির জন্য কেবল ঐ অবস্থাদ্বয় স্থায়ী অবিদ্যার বিলাসরূপ সাময়িক মন বা বুদ্ধি মানিলে কোন ক্ষতি

নাই। ইহার কারণ এই যে, সুষুপ্তি অবস্থায় আলোচিত মন বা বুদ্ধির নিজ কারণে লয় হওয়ার কারণ শরীরবিশিষ্ট জীবের একত্বের কোনই প্রতিবন্ধক রহিল না। সুতরাং বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত একজীববাদের বিজয় না লইয়া রহিল না। দেখিতেছি একত্বেরই রাজত্ব।

পূর্ব্ব অধিকরণে আত্মার সম্বন্ধে অণু-পরিমাণ নির্দ্দেশ যে অধ্যাস নীতিমূলক তাহা দেখাইয়া তাহার স্বতঃসিদ্ধ মহৎ পরিমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ১৪ অধিকরণে তদতিরিক্ত আত্ম-কর্ত্তৃত্বের সংস্থাপন হইতেছে।

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ"। ঐ ঐ ৩৩ সূত্র।

আত্মা অর্থাৎ জীব পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের সম্পাদনকর্ত্তা, কেন না তাহা হইলেই "যজেত" প্রভৃতি বিধি শাস্ত্রের সার্থকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভাষ্য—

তদ্‌গুণসারত্ব প্রসঙ্গে জীবের অপর ধর্ম্মেরও আলোচনা চলিতেছে। এই জীব শুভাশুভ কর্ম্মের সম্পাদনকারীই বটে, কেন না তাহা হইলেই শাস্ত্রের সার্থকতা অব্যাহত থাকে। ফলতঃ জীবকে কর্ত্তা না স্বীকার করিলে, 'যজেত,' 'জুহুয়াৎ' 'দদ্যাৎ' প্রভৃতি বিধি শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, ঐ বিধিশাস্ত্রগুলি কোন কর্ত্তারই কর্ত্তব্য বিশেষ উপদেশ করে। এমন মানুষ বিরল যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া ঐ শাস্ত্রগুলির সমন্বয় করিতে পারেন। এই রূপ নীতিতে "এই পুরুষই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকারী, বোধনকারী, কর্ত্তা এবং বিজ্ঞানাত্মা" এই শাস্ত্রও নিরর্থক হয় না।

"বিহারোপদেশাৎ"। ঐ ঐ ৩৪ সূত্র—

এই জন্যও জীব কর্ত্তাই বটে যে, স্বপ্ন অবস্থায় তাহার বিহার শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্য—

জীবের কর্ত্তৃত্ব এই জন্য স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, জীব প্রকরণে স্বপ্ন অবস্থায় তাহার বিচরণ শ্রুতি উপদেশ করিতেছে। "সেই অমর আত্মা যে স্বপ্ন অবস্থায় যদৃচ্ছাক্রমে বিহার করিয়া থাকেন"। "আত্মা নিজের শরীরে ইচ্ছানুরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করেন"।

"উপাদানাৎ"। ৩৫ ঐ ঐ।

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, জীব প্রকরণে তাহাকে ইন্দ্রিয় সমূহের গ্রহীতা বলিয়া শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছে।

ভাষ্য—

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব প্রকরণে "অন্তঃকরণের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া"-"ইন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া" এরূপে জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ করা বেদ বলিতেছে।

"ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং নচেন্নির্দ্দেশ বিপর্য্যয়ঃ"। ঐ ঐ ৩৬ সূত্র।

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে যে, শাস্ত্রে লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর ঐ কর্ত্তৃত্বটা জীবের পক্ষে নহে। কিন্তু বুদ্ধির এইরূপ বলিলে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে।

ভাষ্য—

এই জন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় যে শাস্ত্র লৌকিক বৈদিক ক্রিয়াতে জীবের কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করে। ঐ শাস্ত্রটা এই-"বিজ্ঞানই যজ্ঞ করিয়া থাকে, উহাই কর্ম্ম করিয়া থাকে।" এই স্থলে এই রূপ আপত্তি করিতে পারা যায় না যে বিজ্ঞান শব্দ বুদ্ধির বাচকই দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি কি প্রকারে ইহা দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব সূচনা করিতেছ। কেন না জীবের কর্ত্তৃত্ব

না মানিয়া বুদ্ধির উহা মানিলে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ বিজ্ঞানেন তৃতীয়ান্ত নির্দ্দেশ হইতে পারে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, অপর স্থলে বুদ্ধি বিবক্ষাতে বিজ্ঞান শব্দ তৃতীয়ান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহার উদাহরণে "অন্তঃকরণের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিয়া" শ্রুতিকে রাখিতে পারা যায়। "আর বিজ্ঞান যজ্ঞ করিয়া থাকে" স্থলে 'বিজ্ঞানং' প্রথমান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃত্ব সামাধিকরণ্যই বিজ্ঞানের প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

যদি বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীবই কর্ত্তা হয়, সে স্বতন্ত্র বলিয়া নিজের প্রিয় ও হিতকার্য্যই নিয়তভাবে সম্পাদন করুক, কিন্তু অপ্রিয় ও অহিত কার্য্য কখন না করুক। আর দেখিতেছি বিপরীত অর্থাৎ স্থল বিশেষে সে নিজের প্রতিকূল কার্য্যও করিয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মার এইরূপ বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তি কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই রূপ আশঙ্কায় সমাধান হইতেছে যে—

"উপলব্ধিবদনিয়মঃ"। ৩৭ ঐ ঐ

যেরূপ এই আত্মা বস্তুর উপলব্ধিতে স্বতন্ত্র হইয়াও অনিয়মিতভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেরূপ অনিয়মিত ভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট কার্য্যের সম্পাদনেও তাহার পক্ষে কোন বাধা নাই।

ভাষ্য—

যেরূপ এই আত্মা উপলব্ধি ব্যাপারে স্বাধীন হইয়াও অনিয়ম পূর্ব্বক অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইষ্টানিষ্ট কার্য্য সম্পাদনেও তাহার পক্ষে নিয়মের ত্রুটি হইলে কোন ক্ষতি নাই। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া উপলব্ধিতেও তাহার পরতন্ত্রতাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কেন না উপলব্ধি করণরূপ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যটা কেবল চৈতন্যের সহিত মণিমুক্তাদি বিষয়ের সম্বন্ধের জন্য, কিন্তু নিজ সম্বন্ধের উপলব্ধিতে আত্মা স্বাধীনই বটে। পক্ষান্তরে কার্য্যকারিত্বের দিক দিয়া দেখিলেও কোন কার্য্যে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্য যে তিনি কোন কার্য্যে কোন প্রকারেও দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পান না। সুতরাং অপরের সাহায্যাপেক্ষা থাকিলেও কর্ত্তার কর্তৃত্বটা বিলুপ্ত হয় না। ইন্ধন ও সলিলাদির অপেক্ষা রাখিয়াও পাচককে পাচকত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে দেখা যায় না। আর উপকরণ সমূহের বৈচিত্র নিবন্ধন আত্মার অনুকূল ও প্রতিকূল কার্য্যে অনিয়মে প্রবৃত্তি হইলেও যে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না ইহা বলা কেবল পুনরুক্তি মাত্র।

"শক্তিবিপর্য্যয়াৎ"। ৩৮ ঐ ঐ।

এইজন্যও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত জীবের কর্তৃত্ব যে, বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার করণ শক্তির হানি ও কর্তৃত্ব শক্তি প্রসঙ্গরূপ বিপর্য্যয় হইয়া উঠে।

ভাষ্য—

এই জন্যও বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জীবই কর্ত্তা যে, যদি বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলা যায়, তবে শক্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ বুদ্ধির করণ শক্তির বিলোপ ও কর্তৃশক্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর যদি বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে তোমার অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইয়া থাকে, তবে স্বীকার কর, কিন্তু উহাতে আমাদের পক্ষে কোনই দোষ আসিতেছে না। এই জন্য যে, বুদ্ধির কর্তৃশক্তি হইলে অহং প্রতীতির বিষয়ও তাহাকেই

বলিতে হইবে, কেন না অহংকার পূর্ব্বকই সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। ইহার উদাহরণে "আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি খাইতেছি এবং আমি পান করিতেছি" প্রভৃতিকে রাখা যাইতে পারে। আর ঐ কর্তৃশক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধির সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত করণও তোমাকে মানিয়া লইতে হইবে, কেন না কর্ত্তা কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং শক্ত হইয়াও করণের সাহায্যেই কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয় সুতরাং তুমি করণ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকার করিলে বলিয়া কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ রহিল, কিন্তু বস্তুগত বৈলক্ষণ্য কিছুই রহিল না।

"সমাধ্যভাবাচ্চ"। ঐ ঐ ৩৭ সূত্র।

আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে যে জ্ঞান সাধনের উপায় স্বরূপ সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

ভাষ্য—

বেদান্তে যে আত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে সুসঙ্গত হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, "হে মৈত্রেয়ি, আত্মার সাক্ষাৎকার, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসু তাঁহারই অন্বেষণ করিবেও তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা রাখিবে"। "ওঁকারশব্দপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে"—শ্রুতির শ্রবণাদি কর্তৃত্বটা মুক্তিফল উপভোক্তার পক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। আর মোক্ষ অবস্থাতে যে বুদ্ধির বিধ্বংশ ঘটিয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং মুক্তিফলের উপভোগকারী আত্মারই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইল।

এই স্থলে ইহাও অনুসন্ধেয় যে সমাধি অবস্থাতে বুদ্ধি অদৃশ্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার পক্ষে সমাধি-কর্তৃত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমাধি প্রকৃতির অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসিদ্ধি [illegible] প্রভাকারের মতে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনসামগ্রী এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমত্রয়।

১৫ অধিকরণ।

"যথা চ তক্ষোভয়থা"। ঐ ঐ ৪০ সূত্র।

যেরূপ সূত্রধর কখন তাহার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা স্বকীয় কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কখন আবার কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বৃতি লাভ করে, তদ্রূপ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় অভিমানে লিপ্ত হইয়া ভাল মন্দ অনেক কার্য্য করে কিন্তু সুষুপ্তিতে আবার দেহাভিমান হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজানন্দে নিমগ্ন হয়; সুতরাং জীবের কর্তৃত্বটা ঔপাধিক, কোন প্রকারে ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ভাষ্য—

এই প্রকারে শাস্ত্রের সার্থকত্বরূপ হেতু দ্বারা জীব যে কর্ত্তা তাহা দেখান গিয়াছে, উহা স্বাভাবিক কি ঔপাধিক এইক্ষণে সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। বিপক্ষে যুক্তির অভাব মনে করিয়া যদি কেহ বলে যে, ঐ হেতু দ্বারা জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, তবে এই সম্বন্ধে আমরা উত্তরে ব্যক্ত করিতেছি যে, মুক্তির বিলোপ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ এই যে, যেরূপ অগ্নিদেব কখন নিজের স্বভাবরূপ উষ্ণতা হইতে অব্যাহতি পান না, সেইরূপ কর্তৃত্বটাকে আত্মার স্বভাব বলিলে উহা হইতে মুক্তিলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, আত্মার কর্তৃত্বশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কর্তৃত্বের কার্য্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মোক্ষরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হইবে; আর যেরূপ অনলের দহনশক্তিযুক্ত হইলেও কাষ্ঠের [illegible]

সেইরূপ আত্মা কর্তৃত্বশক্তিযুক্ত হইয়াও কর্তৃত্বের নিমিত্ত রূপ উপকরণ সমূহকে পরিত্যাগ করিলেই উহার কার্য্য স্বতঃই উপেক্ষিত হইবে; কেন না শক্তিরূপ সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ নিমিত্ত গুলির সর্ব্বথা পরিত্যাগ অসম্ভব। * ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, মোক্ষের সাধন করিলেই তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কেন না তাহা হইলে সাধনাধীন বলিয়া মোক্ষের অনিত্যত্ব আপত্তি আসিয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে আত্মা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্য মোক্ষ সিদ্ধি যে নিমিত্তক ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত। আর আত্মার কর্তৃত্বটা নৈসর্গিক হইলে শ্রুতির এইরূপ আত্মা প্রতিপাদন কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম্ম আরোপ করিয়াই আত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অকর্ত্তাই বটেন। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণও যে নাই তাহা নহে, কেন না "তিনিই যেন চিন্তা করেন, তিনিই যেন চলিয়া থাকেন" (ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিরূপ উপাধির প্রভাবে আত্মা না চলিয়াও যেন চলিয়া থাকেন এবং চিন্তন না করিয়াও যেন চিন্তিত হইয়া পড়েন)। "মনীষীরা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া থাকেন"। আর এই শ্রুতি যুগল দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না যে, উপাধিসংযুক্ত আত্মার পক্ষেই ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর। পরন্তু বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব নামে একটা কর্ত্তা বা ভোক্তা আছে এইরূপ উক্তি উন্মত্ত-প্রলাপেই পরিণত হইয়া থাকে। আর শ্রুতি বলিতেছে যে, "পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন দ্রষ্টা নাই"। এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, তবে পরব্রহ্মই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যতিরেকে কোন কর্ত্তাই রহিল না; কেন না অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করাতে কোন দোষের অভ্যুত্থান হইতে পারে না। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ এই যে, "অবিদ্যা অবস্থাতে যেন ব্রহ্ম দ্বৈতরূপে পরিণত হইয়া যান বলিয়া বোধ হয় সুতরাং ভিন্নভাবে এক অপরকে দেখিয়া থাকে"। এই শ্রুতি অবিদ্যা অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন করে। আবার "যে প্রবুদ্ধ অবস্থাতে তত্ত্বদর্শীর পক্ষে সমস্ত জিনিষ আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই অবস্থাতে দ্বৈতভাবে কে কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে" শ্রুতি তত্ত্বজ্ঞান অবস্থাতে ঐ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের নিবারণ করিতেছে। এইরূপে "সুষুপ্তিতে আত্মার স্বরূপকে কোন প্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহা আনন্দস্বরূপ বলিয়া আপনার কামনা আপনি করিয়া থাকে, আপনা হইতে অতিরিক্ত কাম্য বস্তু নাই এই জন্য অপর কিছুর কামনা করে না, সুতরাং আত্ম-কাম ও অকাম হওয়ায় উহাকে আপ্তকাম বলিতেও কোন বাধা রহিল না" আরম্ভ করিয়া "এই ইহার পরম গতি, এই ইহার পরম সম্পদ, এই ইহার পরম লোক ও এই ইহার পরম আনন্দ" পর্য্যন্ত শ্রুতি আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় আত্মার উপাধি সম্পর্ক জনিত ক্লান্তির বর্ণন করিয়া সুষুপ্তিতে আবার পরব্রহ্মরূপ আত্মায় একাকার হওয়ায় তিনি সমস্ত মায়িক জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া যান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণ প্রস্তাবিত সূত্র দ্বারা দেখাইতেছেন।

---

*শক্তশক্যাশ্রয়াশক্তিঃ স্বসত্তয়াবস্তং শক্যং আক্ষিপতি তথাচ তয়াক্ষিপ্তং শক্যং সদৈবস্তাৎ। রত্নপ্রভা। ইহার তাৎপর্য্য শক্তি আশ্রয় ও বিষয়ের আশ্রিত বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বিষয়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

সূত্রে 'চ' শব্দটা 'তু' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হই-য়াছে। এইরূপ মনে করিওনা যে, অগ্নির উত্তাপের ন্যায় আত্মার কর্তৃত্বটা স্বাভাবিক, কেন না, যেরূপ লোকনীতিতে সূত্রধর কুদ্দাল হস্তে স্বকার্য্য সম্পাদনে রত হইয়া ক্লেশে পতিত হয়, আবার স্বগৃহে যাইয়া কুদ্দাল পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ নির্ব্যাপার, নির্ব্বৃত ও সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যোপস্থাপিত দ্বৈত জঞ্জালে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় আত্মা লিপ্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে এবং এই জন্য দুঃখপঙ্কে মগ্ন হয়, আবার সেই ঐ দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সুষুপ্তিতে পর-ব্রহ্মরূপ নিজ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য ও করণ সঙ্ঘাত পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্তৃত্বে নির্লিপ্ত ও সুখী হয়। মুক্তি অবস্থাতেও এইরূপ নিয়মের যোজনা করিয়া লইতে পারা যায় অর্থাৎ ঐ অবস্থাতে আত্মা অবিদ্যাতিমিরকে বিদ্যা প্রদীপ দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া অসঙ্গ নির্বৃতি সুখে নিমগ্ন হয়। সূত্রধরের দৃষ্টান্তেও ইহা অনু-ধাবন করিয়া লইতে হইবে যে, সূত্রধর বিশেষ তক্ষণ ব্যাপারে তাহার অস্ত্র শস্ত্রের অপেক্ষায়ই কর্ত্তা বলিয়া প্রথিত হয়, কিন্তু কেবল নিজ শরীরের দিক দিয়া দেখিলে সে অকর্ত্তাই বটে। এইরূপ নিয়মে আত্মাও প্রত্যেক কার্য্যে মন প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষায়ই কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বস্বরূপের দিক দিয়া দেখিলে তিনি অকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চিত হন। আর সূত্রধরের ন্যায় আত্মার হস্তাদি অবয়ব নাই, সুতরাং সে যেরূপ কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করে, সেরূপ আত্মা মন প্রভৃতি উপকরণের গ্রহণ বা পরিত্যাগে লিপ্ত হন না।

শাস্ত্রের সার্থকতারূপ হেতু দ্বারা যে আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে তাহা নহে, কেন না বিধি শাস্ত্র কেবল আরোপিত কর্তৃত্ব লইয়াই কর্ত্তব্য বিশেষের উপদেশ করে, কিন্তু আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না। [illegible] ইহাও ব্যক্ত করিতে [illegible] আত্মা ব্রহ্ম বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় তাহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব অসঙ্গত। সুতরাং অবি-দ্যার উদ্ভাবিত কর্তৃত্ব লইয়াই বিধি শাস্ত্রের প্রবৃত্ত হইয়া উচিত। আর কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই প্রকার শাস্ত্র ও অনুবাদ রূপ বলিয়া যথাপ্রাপ্ত অবিদ্যোদ্ভাবিত কর্তৃত্বের অনুবাদ মাত্রেই প্রবর্ত্তমান হইবে। ইহা দ্বারা আত্মার বিচরণ ও ইন্দ্রিয়াদির পরিগ্রহ যে অবিদ্যারই ক্রীড়া বিশেষ ইহা বুঝিয়া লইতে কোন বাধা রহিল না, কেন না ঐ উভয়ই অনুবাদ মাত্র। এইরূপও আপত্তি করিতে পারা যায় না যে, স্বপ্ন-অবস্থায় ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগ্রাম প্রসুপ্ত হইলে আত্মা নিজের শরীরে স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রের বিহার উপদেশই আত্মার কর্তৃত্ব বুঝাইয়া দেয় এবং 'এই ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানকে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিয়া' এই স্থলে কর্ম্ম ও করণের বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, কেন না ঐ সবস্থায় সর্ব্বথারূপে আত্মার করণ গ্রাম স্বকার্য্য হইতে বিরত হয় না। আর এই বিষয়ে প্রমাণ এই যে, "ঐ বুদ্ধিই স্বপ্ন রূপে পরিণত হইয়া অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করে" শ্রুতি ও "ইন্দ্রিয় সমূহ স্বকার্য্য হইতে বিরত হইলে মন আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া যে বিষয় রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকে তাহাকে স্বপ্ন দর্শন জানিবে" স্মৃতি। পক্ষান্তরে শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হই-য়াছে যে, কামাদি মনেরই বৃত্তি বিশেষ, কিন্তু স্বপ্নে ঐগুলি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং স্বপ্ন অবস্থায় মনের সাহায্যেই আত্মা বিহার করে। আর কোন প্রকারে ঐ বিহারটাকে মায়াময় ছাড়া পারমার্থিক বলা যাইতে পারে না, কেন না শ্রুতি ইবশব্দের সহযোগেই স্বপ্ন ব্যাপারের বর্ণন করিয়াছে। "উতেব স্ত্রীভিঃ

সহ মোদমানো জক্ষদ্বুক্তেবাপি ভয়ানি পশ্যন্।" অথবা যেন রমণীদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে অথবা যেন তাহাদের সহিত পাশা খেলিতে খেলিতে ভয় দেখিয়া। লোকনীতিতেও "আমি যেন গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম আমি যেন অটবী সমূহ দেখিয়াছিলাম" এই ভাবে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট আপন স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়েও ইহা অনুধাবন করিয়া লওয়া উচিত যে, যদ্যপি আত্মার উপকরণ সম্বন্ধে কর্ম্ম ও করণের বিভক্তি নির্দ্দেশ হইয়াছে, তথাপি উপকরণসংপৃক্ত আত্মারই কর্তৃত্ব জানিবে, কেন না শুদ্ধ আত্মার যে কর্তৃত্ব অসম্ভব তাহা দেখান গিয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

সাহিত্য-সভার কার্য্য-বিবরণী।

১২শ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৭ই আষাঢ় ১৩১৮ সাল।

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকা।

১। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। " মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
৩। " কবিরাজ অঘোরনাথ শাস্ত্রী।
৪। " পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ শিরোমণি।
৫। " কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ সেন।
৬। " সুবলচন্দ্র মিত্র।
৭। " কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৮। " যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
৯। " অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
১০। " বোধিসত্ত্ব সেন।
১১। " হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।
১২। " কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত।
১৩। " অমৃতানন্দ ভট্টাচার্য্য।
১৪। " শিবগোপাল চক্রবর্ত্তী।
১৫। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৬। " অম্বিকাচরণ দেব।
১৭। " কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
১৮। " কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
১৯। " শশধর গঙ্গোপাধ্যায়।
২০। " বিহারিলাল সরকার।
২১। " রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।
২২। " পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
২৩। " কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ
২৪। " আশুতোষ স্মৃতিরত্ন।
২৫। " সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
২৬। " ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র।
২৭। " উমাচরণ তর্করত্ন।
২৮। " পণ্ডিত আলোকনাথ ভট্টাচার্য্য
২৯। " পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি।
৩০। " মহারাজ-কুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর।
৩১। " মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।
৩২। " খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩৩। " রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।
৩৪। " সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।
৩৫। " বলাই চাঁদ মল্লিক।
৩৬। " কুমুদবিহারী সেন।
৩৭। " চারুচন্দ্র বসু।
৩৮। " পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩৯। ,, শীতল প্রসাদ ঘোষ বি, এল্।
৪০। ,, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৪১। ,, পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, সভার নিয়মাবলীর ৮৩ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করিয়া, ৩২ ধারা অনুসারে ঐ সংশোধন সভার অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্রের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ সংশোধন অনুমোদিত হইল। সংশোধিত ধারাটী এই,—

"তিনি (সম্পাদক), সভ্যবর্গের দেয় অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন ও সভার ধনরক্ষকের সহিত একযোগে প্রাপ্ত অর্থাদির অঙ্গীকার-পত্র প্রদান করিবেন।"

৫। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ ও প্রসঙ্গতঃ তাঁহার পূর্ব্বলিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ সমূহের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "বৌদ্ধদর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

৬। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানানুসারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটী অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইয়াছে, তথাপি উহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রবন্ধটী হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ঐ প্রবন্ধোক্ত মত, এক পক্ষের মত, উহাতে প্রতিবাদী বৌদ্ধদিগের উত্তরের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ন্যায় বৈশেষিক প্রকৃতির সমকালীন বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি; ঐ দর্শন প্রথমতঃ পালি ভাষায় রচিত হয়। যখন উহা উদ্ভাবিত হয়, তখন বৈদিকমতা-

তাহা জানিতে চেষ্টা করেন নাই, পরে ৪০০।৫০০ বৎসর পরে সংস্কৃত ভাষায় ঐ দর্শনের তত্ত্ব সমূহ প্রচারিত হইলে, হিন্দু ও বৌদ্ধমতের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। উহা মহাযান সূত্রাদির সময় হইতে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরে কুমারিলের সময় বৌদ্ধমতের পরাজয় আরম্ভ ও শঙ্করের সময় শেষ হয়। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে প্রকৃত বৌদ্ধমতের উদ্ধার করেন নাই। তিনি কোন কোনস্থলে বৌদ্ধমত বিকৃতভাবে উদ্ধার করিয়াছেন, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এই দোষদুষ্ট নহেন। তিনি বৌদ্ধমতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষে উদয়নাচার্য্য স্বীয় "বৌদ্ধধিকার" গ্রন্থে এই বিকৃত ব্যাখ্যার চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধের অধিকাংশ (১২খানা) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে গৃহীত। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, হিন্দু দর্শনোক্ত বিরুদ্ধবাদ না থাকিলে বোধ হয় ভারতে বৌদ্ধদর্শন লুপ্ত হইত। পরে মাধ্যমিক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধোক্ত মতের সমালোচনা করিলেন ও বলিলেন যে, যে সকল বৌদ্ধ মধ্যমার্গাবলম্বী অর্থাৎ যাহারা অস্তিবাদীও নহে, অথবা নাস্তিবাদীও নহে, তাহারাই মাধ্যমিক নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরে সর্ব্বদর্শনে প্রতিপাদিত ক্ষণিকত্ববাদ ও শূন্যত্ববাদ যে যথাযথভাবে বিবৃত হয় নাই ও বৌদ্ধ গ্রন্থে যে ঐ সকল মত বিশেষ চাতুর্য্য সহকারে সমর্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন ও প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রবন্ধের বিশিষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যতীত অপরের পক্ষে এ সকল প্রবন্ধ পাঠ অসম্ভব। পরে তিনি পরমাণু বাদের কথার উল্লেখ করিলেন। তাঁহার মতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এ কথা প্রকৃত নহে। ভগবানের "মায়া মোহই" বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন নাই ইত্যাদি।

৯। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, বলিলেন, প্রবন্ধ বড়ই উপাদেয় হইয়াছে, উহাতে বৌদ্ধদর্শনের জটিল তত্ত্ব গুলি যথাসম্ভব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধকার মহাশয়কে তিনি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক হিন্দু দার্শনিকদিগের উপর কটাক্ষের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐরূপ কটাক্ষের কারণ কতদুর বিচারসহ তাহা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে, বৌদ্ধদর্শনের মত সমূহের বিকৃতভাবে উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার বাচস্পতি মিশ্র যে ঐ সকল মতের প্রকৃত ব্যখ্যা করিয়াছেন, এ কথার মূল কি? আশা করি বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া সাধারণের সংশয়াপনোদন করিবেন। আরও এক কথা- যখন বৌদ্ধদর্শনের সৃষ্টি, তখন উহা পালি ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল ও বৈদিক মতাবলম্বীরা উহার অর্থ গ্রহণে চেষ্টা করেন নাই, পরে মহাযানবাদের সৃষ্টি হইতেই হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, এ সকল কথাও প্রমাণসহ বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সকল কথার প্রমাণ্য সংস্থাপন করিলে সাধারণের সংশয় দূর হইতে পারে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্য্য দার্শনিকদিগের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীবিত ছিল, ও তাঁহারা সেই জীবিত ধর্ম্ম নিরাসেরই চেষ্টা করিয়াছেন, কোন রূপ কাল্পনিক মতের সহিত বিবাদ করেন নাই।

১০। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিলেন, প্রবন্ধটী সম্পূর্ণভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদিগের মতই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। আমার মতে তিনি যথাযথ ভাবেই ঐ সকল মতের আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যু হইতে অব্যাহিত লাভের উপায় উদ্ভাবনই হিন্দুদর্শনের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধকার এই উদ্দেশ্য স্বীয় প্রবন্ধে সম্যক উপপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শঙ্কর, কুমারিল্ল, উদয়ন প্রভৃতি মনীষীগণ বৌদ্ধ মত উল্লেখ করিবার সময় কোন সত্য গোপন করিয়াছিলেন কি না? তাঁহারা যে সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তখন বৌদ্ধমত জানিবার সুযোগ ও উপায় এখনকার কাল অপেক্ষা অধিক ছিল কি না? আর পালি ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐ ভাষায় অদ্যাপি শঙ্করাচার্য্যের লিখিত দর্শনের ন্যায় কোন দর্শন শাস্ত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন ইংরাজি লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুদর্শন উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে হিন্দু দার্শনিকদিগের উপর আনীত পক্ষপাতদোষের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের বিচার্য্য। বক্তৃতা বড়ই শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে ও তর্কবাগীশ মহাশয় এই প্রাচীন বয়সে যেরূপ গবেষণা ও পরিশ্রমশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়।

১১। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীশশিভূষণ মিত্র।
সম্পাদক। সভাপতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল।

নামে কি করে

কবি ঠিক বলিয়াছেন—"নামে কি করে ?"—গোলাপ যে নাম ডাকে সৌরভ বিতরে। নামের বিশেষত্ব কোথায় ? নামের জন্য লোক এত ব্যস্ত হয় কেন ? নামের গুণে লোকের মুখে হর্ষ ও বিষাদের আভা দেখা দেয় কেন ? নামে কি আছে ? নামে সব আছে। একমাত্র নামের জন্যই লোকে ভাল মন্দ জিনিষ চিনিতে পারে ও ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যেক জিনিষেরই নাম আছে ; নামহীন কোন বস্তুই নাই। যেমন সকল জিনিষের ভাল মন্দ আছে, তেমনই আবার নামের ভাল মন্দ আছে। গোলাপ বলিলে যেমন আমরা গোলাপ ফুলই বুঝি, অন্য কোন বস্তু বুঝি না, সেইরূপ "কেশরঞ্জন" নামে সর্ব্বসাধারণ একমাত্র মহাসুগন্ধি, সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈলই বুঝিয়া থাকেন। যদ্যপি আপনি "নামে কি করে ?" ইহার অর্থ বুঝিতে চান, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক "কেশরঞ্জন" নামটী ভুলিবেন না বা তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন তৈল লইবেন না। "কেশরঞ্জন" সর্ব্বসাধারণের বড় আদরের জিনিষ। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৶০ পাঁচ আনা। একত্র তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাঃ মাঃ প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা।

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

দ্রব্যগুণ না জানিলে, মানুষকে আত্ম-রক্ষার জন্য বড় বেশী বিব্রত থাকিতে হয়। কি খাইলে কি হয়, তাহা না জানার দোষেই অধিকাংশ লোক রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। আর চিকিৎসকদিগের দ্রব্যগুণইত প্রধান পাঁজিপুঁথি। আমাদের দ্রব্যগুণ-শিক্ষা অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত এবং অকারাদি বর্ণক্রমে সজ্জিত বলিয়া নিজে নিজে দ্রব্যগুণ শিখিবার ইহা বিশেষ উপযুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক একটী দ্রব্যের যত রকম নাম আছে, সেই সমস্ত নাম, দ্রব্যের পরিচয়, গুণ, প্রকারভেদ, প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি যে কিছু জানিবার বিষয়, সে সমস্ত এত পরিষ্কার করিয়া ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, সামান্য বাঙ্গালা জানা থাকিলেই বুঝিতে পারা যায়। মূল্য অতি কম, ৸০ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।০ চারি আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।